নব্যভারত

কলিকাতা।

পঞ্চস্ত্রিংশ খণ্ড—১৩২৪

পরিসমাপ্তির অবস্থায় কি ভাবিলাম ?

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি জানিবি তাহা অন্যে কেহ জানে না,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ॥"

৺দীনেশচরণ বসু।

এদেশের প্রচলিত কথা এই—"কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্ব্বনাশ।" কাহার ভাগ্যে যখন স্বর্গ-সুখ, কাহারও ভাগ্যে তখন নরক-ভোগ। ঘটনা-বিপর্য্যয়ে সুখ দুঃখ প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে মানব-নিয়তি রচনা করিতেছে। কখনও রাজা পথের ভিখারী, কখনও বা ভিখারী রাজ-রাজেশ্বর। আজ কেবল রুষিয়ায় এ চিত্র অঙ্কিত নয়, গৃহে গৃহে এ চিত্র প্রতিনিয়ত অভিনীত হইতেছে। তবু মনুষ্যের অহঙ্কার! দর্পহারী বিধাতা সকল দেখিয়া শুনিয়া শুধু যেন হাস্য করিতেছেন!

কাহার প্রতি কখন বিধাতার কি আদেশ আসিবে, তাহা কেহই জানে না। প্রাতে যে সুস্থদেহ, সন্ধ্যায় হয়ত সে চির-অচল,- মৃত্যুক্রোড়ে অনন্ত শয্যায় শায়িত। কে কতদিন এই পৃথিবীতে থাকিবে, কেহই জানে না; তবুও মানবের কত দর্প! ত্রিকালজ্ঞ বিধাতা সকল দেখিতেছেন এবং মানবের দর্প দেখিয়া শুধু যেন হাস্য করিতেছেন!

বিগত ১৩ই চৈত্র(১৩২৩)প্রাতে শরীরটা বড় খারাপ বোধ হইতেছিল, আফিস-গৃহে শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলাম, কবে এই আসক্তিময় ধরা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহ-পরকালের কত চিত্র নয়নের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল;—যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কথা; যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা,—যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথা; যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদের কত কথা মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল। কোথায় এই মর্ত্ত্য, এবং কোথায় ঐ স্বর্গ! দেহী এবং অদেহীতে প্রভেদ কি, জীবন মরণে পার্থক্য কোথায়, —সংসার এবং শ্মশানে ভিন্নতা কে গণিতে পারে? ভাবিতেছিলাম, প্রাতে ফুল ফুটে, সন্ধ্যায় শুকায়; সন্ধ্যায় ফুল ফোটে, প্রাতে ঝরিয়া পড়ে। সাগরে কত তরঙ্গ উঠে, আবার কত তরঙ্গ সৈকতময় তটে আঘাত করিয়া মিশাইয়া যায়। কেন, কেন প্রকৃতি নানা বিপর্য্যয়ে নানা পরিবর্ত্তনে মুহ্যমান? এই

WHOLE VOLUME. BLEED THROUGH.

সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার অন্তিম সময় যেন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। শেষ মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই,ঠিক সন্ধ্যার সময়, ছুটিয়া দ্বিতল গৃহে গেলাম;—যাইয়া আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, শয্যার আশ্রয় লইলাম। হস্ত পদ শিথিল হইতে লাগিল, অতিরিক্ত ঘর্ম্মে হস্ত পদ তুষারের ন্যায় শীতল হইল, নাড়ীর স্পন্দন মন্দীভূত, ক্রমে ক্রমে, যেন অন্তর্হিত;—জ্ঞান-চক্ষে দেখিলাম, আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন জীবন-লীলা শেষ হইবে। আবদ্ধ দরজা খুলিয়া আমার বড় সাধের একমাত্র বৌমাকে ডাকিলাম। সকলে ছুটিয়া আসিলেন, ডাক্তারও আসিলেন। তিনবার তিন রকম ঔষধ সেবিত হইল। কিন্তু তাহা পাকস্থলী ধারণ করিলেন না, উদ্বমিত হইয়া পড়িল। শেষে চিকিৎসকের শেষ উপায়—অস্ত্র প্রয়োগে শরীরে দুই বার ঔষধ প্রবিষ্ট হইল:—তৎপর ক্রমে ক্রমে নাড়ীর গতি ফিরিল। সেই দিন হইতে প্রায় এক মাস চক্ষে নিদ্রা বসিল না,—কখন যাই, কখন যাই, সদা এই ভাব। আহার একটু একটু শুধু তরলদ্রব্য, ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন দাস্ত হয় না,—শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। এত দিন বিছানায় চতুর্প্রহর পড়িয়া পড়িয়া, অনিদ্র অবস্থায়, কি ভাবিলাম এবং কি দেখিলাম, আজ একটু সবল হইয়া কেবল সেই সব কথাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সুদীর্ঘকাল আর যে পৃথিবীতে থাকিব, তাহা মনে হয় না। তাই লিখিতে ইচ্ছা, কিন্তু তাহা পড়িতে পাঠকগণের ধৈর্য্য থাকিবে কি?

প্রথম ভাবিলাম, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং বার্দ্ধক্যে কি কি করিয়াছি। কত কত ঘটনা চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল, নানা ঘটনাময় তুচ্ছ জীবনের সে সকল সুদীর্ঘ কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে নয়নে জলধারা বহিল;—কত উত্থান কত পতন, কত অহঙ্কার, আত্মাভিমান, কত নৃত্য আস্ফালন,—ভাবিলাম—হায় আজ সে সকলের পরিণাম কি এই আকস্মিক মৃত্যু? কিন্তু ভাবিয়া অকূলে যেন কূল পাইলাম,—আমি বাল্য হইতে যে "পবিত্রতা" আশ্রয় ও লক্ষ্য করিয়া জীবনের মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, অনেক ঘাত প্রতিঘাতে, অনেক অত্যাচার অবিচারে, অনেক নির্য্যাতন তিরস্কারে, অনেক অবহেলায় অত্যাচারেও তাহা অবিকৃত। আমি অনেক বন্ধু হারাইয়াছি, সংসারে অনেক ক্ষতি হইয়াছে, কত না কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু পবিত্রতাকে হারাই নাই। আমি মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, পর্য্যুদস্ত, অবহেলিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত, নিন্দিত হইয়াছি বটে, কিন্তু "পবিত্রতা" আমার চির-সম্বলই আছে। আমি পবিত্রতার জন্য অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি পরাজিত হই নাই। কোন লোক বলিতে পারিবেন না যে, আমি বাল্যকাল হইতে এই সুদীর্ঘ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কাহারও সহিত মিলিত হইয়া কোন কুকার্য্য বা কুচিন্তা করিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্য এবং অগণ্য নরনারী সাক্ষী, আমি রিপুজয়ী মানুষ, আমি অসংখ্যবার আগুন লইয়া খেলা করিয়াছি, কিন্তু কখনও পবিত্রতা হারাই নাই। আমার অন্তিম সময়ে ইহাই অকূল চিন্তায় যেন কূল দিল; এই চিন্তাই আমাকে নির্ভীক করিল, আমি হাস্য মুখে বিধাতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলাম এবং একমাত্র সন্তানকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার মৌখিক অন্তিম-ইচ্ছা (will) বিবৃত করিলাম। এই মুহূর্ত্তেই এই সংসার পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া একটুও যেন দুঃখ হইতেছিল না, বরং সহধর্ম্মিণী, কন্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী এবং অগণ্য আত্মীয়

আত্মীয়ার সহিত মুহূর্ত্ত পরে মিলিত হইব বলিয়া আনন্দিত হইতেছিলাম। অন্ধের নড়ী একমাত্র পুত্রকে বলিলাম,—"পিতা মাতাকে লইয়া কেহ চির দিন সংসারে থাকে না, পিতা মাতার যাহা বিশেষত্ব, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সংসার-পথে অগ্রসর হও। তোমার পিতামাতা যেরূপ রিপুজয়ী, সেইরূপ রিপুজয়ী হইয়া অন্তিমে যাহাতে পিতামাতার সহিত মিলিত হইতে পার, সেই চেষ্টা করিও।"

সমস্ত রাত্রি অনিদ্র অবস্থায় এইরূপ কত কথাই ভাবিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম। সেরূপ আনন্দের রজনী এ জীবনে আর কখনও যেন ঘটে নাই, কখনও ঘটিবে কি না, তাহাও সন্দেহ। রোগ-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া কত চিন্তাই করিতেছি। তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, সংক্ষেপে কয়েকটী চিন্তার কথা এখানে বিবৃত করিলাম।

আমার প্রথম চিন্তা এই—

1. Divinity.
2. Divinity in humanity—character.
3. Character brings unity.
4. Unity begets nationality.

অর্থাৎ—১। বিধাতা।

২। বিধাতা বিশ্বমানবে চরিত্ররূপে বিরাজিত।

৩। চরিত্র হইতে একতা।

৪। একতা হইতে জাতীয়তা।

এই চিন্তার কথা অনিদ্র অবস্থায় আমার সন্তান সদৃশ ছাত্রবর্গকে বলিতে ও বুঝাইতে লাগিলাম। বিধাতাকে অস্বীকার করিলে চরিত্র হয় না, চরিত্র ভিন্ন মানুষ স্বার্থ ছাড়িতে পারে না। সুতরাং একতা অসম্ভব, একতা না হইলে জাতীয়তা সুদূরপরাহত। ছাত্রগণের মধ্যে একজন ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এই সব কথা বুঝাইতেছিলাম। জাতীয় উত্থান পতনের কারণ একতার উত্থান পতন; একতার উত্থান পতনের কারণ, চরিত্রের উত্থান পতন; চরিত্রের উত্থান পতনের কারণ বিধাতৃত্বে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস। সমস্ত জাতীয় ইতিহাস এই কথারই জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমার দ্বিতীয় চিন্তা এই—

১। যোগ ও ভক্তি।

২। জ্ঞান ও কর্ম্ম।

৩। বিশ্বমানবের মহামিলন।

যোগ ও ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় না। "খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব"—যোগ ও ভক্তি ভিন্ন এই সনাতন পথে কেহই অটলত্ব লাভ করিতে পারেন না, ফলহীনতার নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং অসময়ে হাইল ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন, জয়পরাজয় কিছুই জানিনা, সবই অন্যের হাতে, বিধাতার ইচ্ছার সহিত মানব-ইচ্ছা না মিলিলে এইরূপ তন্ময়-জ্ঞান জন্মে না। এই তন্ময় জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সার জ্ঞান; ইহাই পরাবিদ্যা। ইহাই কর্ম্মনদীর মহাসেতু; ইহারই অর্থ কৃষ্ণার্পণ—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—গীতার এই অমূল্য উপদেশ, বিশ্বাসীদিগের একমাত্র অবলম্বন ও শিক্ষা।

তৃতীয় চিন্তা—সমঞ্জসীভূত উন্নতি—simulanious development)

১। শরীর ও মনের উন্নতি সাধন।

২। আধ্যাত্মিকতা ও চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন।

PARTIALLY DAMAGED.

৩। ইন্দ্রিয় ও রিপুদিগের সংযত অবস্থায় উপস্থিতি—অথবা—নৈতিক উন্নতি এবং প্রতিভার উন্মেষ সাধন।

অর্থাৎ "আমার রিপুপরিচারিকাদল
আনন্দে মিলে সকল
অনুদিন করিবে তোমার সেবার আয়োজন।
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে,বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গ-ধাম।"

ইহা সাধনা এবং অনুশীলন সাপেক্ষ, ইহার বিবৃতি অল্প কথায় সম্ভবে না।

চতুর্থ চিন্তা—

১। প্রেমে অনুগমন।

২। পুণ্যে দীক্ষা।

৩। সচ্চিদানন্দে আত্ম-নিমজ্জন, অথবা ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলন।

ইহাই মনুষ্যত্বের চরম উন্নতি। ইহা সাধিত হইলেই জাতীয়তায় উপনীত হওয়া যায়।

ইহার বিবৃতিতে গীতা এবং বাইবেল গ্রন্থ পূর্ণ।

পঞ্চম চিন্তা—

(১) পরিবার-সাধন।

(২) দেশ বা মানব-সমাজ-সাধন।

(৩) বিশ্বমানব-সমাজ-সাধন। অথবা আত্মায় আত্মায় যোগ সাধন।

এইরূপে সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া অসীমে পরিব্যাপ্তি। সীমায় আরম্ভ না করিলে অনন্তে কেহই উপনীত হইতে পারে না। দলে বা সমষ্টিতে না মিলিলে মানবের চরম উন্নতি লাভ অসম্ভব। এই জন্যই জাতীয়তায় নিমজ্জিত হইলে আত্মলোপ হয়, অথবা জাতীয়তার সৃষ্টি হয়। জাতীয়তার মধ্যেই কল্যাণী-সপ্তমাতৃকার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন অহং-জ্ঞান বিনষ্ট হয়, অদ্বৈত-জ্ঞানে দীক্ষা হয়। সর্ব্বঘটে চিন্ময়ীকে দেখা যায়। ইহারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ষষ্ঠ চিন্তা—জাতীয়তায় পৌছিলে—জাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষা হয়—অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে,সকল সত্যেই মানবের অধিকার,—সর্ব্ব-ঘটেই তিনি, সকল ধর্ম্মের মূলেই মুক্তি বা কৈবল্যে উপস্থিতি। ধর্ম্মে ভেদাভেদ গণনা করে অর্ব্বাচীনেরা; প্রকৃত ধর্ম্মে উপনীত হইলে সাম্য জ্ঞান না হইয়াই পারে না। তিনি এবং তাঁহার প্রকৃতি একাত্মক, তিনি সর্ব্বঘটে, সর্ব্ব মূলে, অথবা তিনি সর্ব্ব-মূলাধার। তিনি বীজাধার—তিনিই সব। তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তখন জলস্থল মরুৎব্যোমে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপই পরিদৃষ্ট হন। সাম্প্রদায়িকতা নিম্ন শ্রেণীর অধিকারীরা গণনা করেন, প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা প্রতি নরনারী-কেই সচল ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। মানব-চরিত্রে তাঁহার স্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইয়া সাধক ধন্য হন।

জাতীয়তার মূলে জাতীয় ধর্ম্ম। এই জন্যই আজকাল কত কত মহাজন উদার ধর্ম্ম-মত সংস্থাপনে ও প্রচারে বদ্ধপরিকর।

জাতীয় ধর্ম্ম কি? তাহা অর্থই মহাজ্ঞান,—এক-ধ্যান, এক-জ্ঞান, একরস-সুধাপানে বিভোর হওয়া। তাহা আর কিছুই নয়, তাহাই একেশ্বরবাদ। সকল ধর্ম্মের মূলেই একেশ্বরবাদ—পৃথিবীর আদি হইতে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদেরই অভি-ব্যক্তি হইয়াছে। সমন্বয়ের অভ্রান্ত শাস্ত্রে যাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছে, তাঁহারাই জানেন, সকল ধর্ম্মের মিলিত-ভূমিই একেশ্বরবাদ। চন্দ্র সূর্য্য পূজা বা প্রাকৃতিক পূজা, মানব-পূজা বা অবতারবাদ, দেবদেবী পূজা বা পৌত্তলিকতা

প্রভৃতি—সকল পূজার লক্ষ্যই তিনি। নামাতীত, গুণাতীত তাঁহাকে যে ভাবে যে দেখিয়াছে, সে সেই ভাবেই ডাকিয়াছে। সকল নদনদী যেমন মহাসাগরে মিলিত, সকল শাস্ত্র, তন্ত্র, বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল, গীতা, উপ-নিষদ, তেমনি, সেই একেরই গুণকীর্ত্তনে বিভোর—সকল নরনারী এক জ্ঞানে পৌছিবার জন্যই লালায়িত। বিশ্বচরাচরে—সেই চিরন্তন শক্তিরই অভিব্যক্তি;—মানব পরিবার যাঁহা-কেই পূজা করুক, সে সবই তাঁহাতে পৌছিবে। শাশ্বত ধর্ম্ম এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দে নিবদ্ধ। খণ্ডাকারে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে মানব শেষে অখণ্ডে উপনীত হইতেছে। তখন সকল জাতির মধ্যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দেখিয়া মানব ধন্য হয়,ভেদজ্ঞান বা জাতিভেদ তিরোহিত হয়; তখন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ" বলিয়া ব্যাকুল প্রাণে অঞ্জলি অর্পণ করে এবং জাতীয় মহাধর্ম্ম জগতে অভিব্যক্ত হয়।

সপ্তম চিন্তা—জাতীয়তার অঙ্গ—জাতীয় ভাষা। বিশ্বমানব-পরিবারে বিশ্বেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ অর্থাৎ চেনাচিনি হইয়াছে, কিন্তু আলাপ হয় নাই, পরিচয়ের জন্য প্রথম ইঙ্গিত বিবেক বা সহজাত জ্ঞান-পরে শব্দ সৃজিত হইল মহাসমুদ্র প্রতিনিয়ত এই শব্দ-ব্রহ্ম-ধ্বনিই উচ্চারণ করিতেছেন। বিজলী-লীলায় তাহারই অভিব্যক্তি। তাহাতেও যখন পরিতৃপ্তি হইল না, তখন শব্দ-ব্রহ্মরূপে তিনি অভিব্যক্ত হইলেন।

জাতীয় উন্নতির কথা ভাবিলে জাতীয় ভাষারও কল্পনা করিতে হয়। জাতীয় ধর্ম্ম নাই, অথচ জাতি আছে, ইহা যেমন অসম্ভব; জাতি আছে, অথচ জাতীয় ভাষা নাই, ইহাও তেমনি অসম্ভব। আর্য্য জাতি ছিল, আর্য্য ভাষা "সংস্কৃত"ও ছিল। গ্রীকল্যাটিনের ইতিহাসও এইরূপ। ভারতীয় জাতির অভ্যুদয়ের জন্য যাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন, জাতীয় ভাষাকেও তাঁহাদের আহ্বান করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় ভাবী জাতীয় ভাষা—"বাঙ্গালা ভাষা।" শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, কালে Survival of the fittest" মতের অনুসরণে এই ভাষাই ভারতের ভাষা হইবে। বহুপূর্ব্বে, ৺চন্দ্রনাথ বসু মহা-শয়ের সভাপতিত্বে, সিকদার-বাগান-বান্ধব সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল,তাহাতে এই মতই আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম,এখনও শেষ জীবনে এই কথাই ঘোষণা করিতেছি। নানা সাহিত্য-পরিষৎ,সাহিত্য সভা ও সাহিত্য-সম্মি-লন বাঙ্গালা ভাষার বিজয় নিশান উড়াইয়া দিতেছেন,নানা মনীষী ব্যক্তিগণ এখন বাঙ্গালা ভাষার পঠন পাঠন করিতেছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণ করিতেছেন, নানা সংবাদপত্র ও বহু বহু সুন্দর সুন্দর মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন—এতদিনে যেন কেরি মার্সম্যান, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে। হায়, আজ চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,কত কৃষ্ণচন্দ্রমজুমদার মদনমোহন,বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী,কত দীনেশচরণ বসু,আনন্দচন্দ্র মিত্র,নিত্যকৃষ্ণ বসু,কত রাজকৃষ্ণ রায়, মাইকেল, ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল,কত চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কত কাঙ্গাল হরিনাথ ও ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশদেউস্কর,কত দীনবন্ধুমিত্র, উপেন্দ্র-নাথদাস,গিরীশচন্দ্রঘোষ,কত কাব্যবিশারদজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ

সান্ন্যাল, উমেশচন্দ্র দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কত কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কত কত মহাপণ্ডিত এই ভাষার মহাশক্তির জন্য জীবন বলি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন-পাতে এই দেশে যেন কত রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, শিবনাথ, কত কত বিপিনচন্দ্র, কত কত সমাজপতি, কত কত পাঁচকড়ি, কত কত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ রায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, কত কত চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব হইতেছে। এখনও এই ভাষার জন্য কত কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে জীবনপাত করিতেছেন, তাঁহাদের চক্ষের জলে ধরা সিক্ত হইতেছে, কেহই তাহা জানিতেছেন না, কিন্তু তবুও তাঁহারা ব্রত পরিত্যাগ করিতেছেন না। কত জনের কত উৎকণ্ঠা, কত জনের কত তপস্যা, কত জনের কত তন্ময়তা এই ভাষার জন্য উৎসৃষ্ট হইতেছে। কত ব্যক্তি একাহারী হইয়া, তাল পত্রে শয়ন করিয়া, শীতাতপ নিবারণের আচ্ছাদন এবং লজ্জা নিবারণের বস্ত্রহীন হইয়া দিবারাত্রি খাটিতেছেন।

আজ যে জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ বা মণীন্দ্রচন্দ্র বা পূর্ণেন্দু-নারায়ণ বাঙ্গালা ভাষায় অভিভাষণ লিখিতেছেন, তাহা তাঁহাদের গৌরব, না বাঙ্গলা ভাষার ঐ পুণ্যপূত ঋষিদিগের গৌরব ? জানি. এই ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এখনও ধনীদিগের ধন-ভাণ্ডার অবারিত-দ্বার হয়. নাই ; জানি, এখনও মহামহা মণীষিগণ এই ভাষার প্রতি ঘৃণা-কটাক্ষপাত করিতেছেন ; আরো জানি, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রী কাতরতা—দলাদলিতে সাহিত্য-সমাজ আজ হতশ্রী, কিন্তু তবুও আমরা নিরাশ হইতেছি না। কি না জানি ? জানি সবই। জানি—কত ভাল ভাল পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়া ভাষাকে দরিদ্র করিয়াছে। কত চক্ষের জল যে জন্য ফেলিতেছি, তাহা কেহ জানে না, কিন্তু তবু আমরা নিরাশ হইতেছি না। যে ভারতে রক্তবীজের গোষ্টির এক সময়ে আবির্ভাব হইয়াছিল, যে দেশে সমস্ত হলাহল মহাদেব আত্মস্থ করিয়াছিলেন, সেই দেবোপম ভারতে আবার লক্ষ লক্ষ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইবে। কত মহাদেব সমস্ত হলাহল আত্মস্থ করিবেন, এবং তাঁহাদের শবসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কত কত মহাজন, বরাট এমেট এবং ম্যাটসিনি বা ঋষি টলষ্টয়ের ন্যায় ভবিষ্যৎ-বাণীতে ধরাকে কম্পিত করিবেন এবং কত কালিদাস এবং ভবভূতি আবার জাগরিত হইবেন। আবার কত ভাল পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইবে। যাহা পৃথিবীতে কখনও হয় নাই, আবার তাহা হইবে। মহাত্মা রোজবেরি বলিয়াছিলেন,—"যে ইংলণ্ড একবার গ্লাডোষ্টোনকে উদ্ভূত করিয়াছে, সেই ইংলণ্ড আবারও ভবিষ্যতে গ্লাডোষ্টোনের ন্যায় লোককে উদ্ভূত করিতে পারে।"আমরাও তাঁহার সঙ্গে এক বাক্যে বলি, যে ভারতে এক সময়ে কালিদাস ভবভূতিকে উদ্ভূত করিয়াছিল, যে ভারতে বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা ভাগবত রচিত হইয়াছিল, সেই ভারতে আবারও তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তি বা পুস্তক উদ্ভূত হইতে পারেন। আবারও বহু বহু বেদবেদান্ত প্রভৃতি রচিত হইতে পারে। দেবভাষা সংস্কৃত ভাষা যে ভাষার মূলে, প্রাকৃতিক এবং পালি ভাষা হিন্দিও মারওয়াড়ী যাহার সহচর এবং পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সকল ভাষা উপকরণ দ্বারা যাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ-জল সেচন করিতেছেন এবং যে ভাষার উৎকর্ষ

সাধনের জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র,নবীনচন্দ্র,বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, অক্ষয় কুমার প্রভৃতির ন্যায় লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা করিতে কালে আবার কত কত মহাজনের আবির্ভাব হইবে, কে জানে ? কত বিদ্যাপতি, কত চণ্ডীদাস, কত মুকুন্দরাম, কত কীর্ত্তিবাস কত কাশীরাম দাস, কত গোবিন্দদাস, কত কবিরাজ গোস্বামী, কত বৃন্দাবন দাস, আসিতেছেন, কে জানে ? অথবা কত গোবিন্দ অধিকারীর ন্যায় যাত্রাওয়ালা, কত নিধুর ন্যায় টপ্‌পাওয়ালা, কত দাশরথির ন্যায় পাঁচালীকার কত হরু ঠাকুরের ন্যায় কবিওয়ালা, কত কালীপ্রসন্ন সিংহ, কত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কত প্যারীচাঁদ মিত্র, কত কত মহাজন, কত হুতুম-পেঁচার নক্সা-রচয়িতা এবং স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনীর কবি যে আসিতেছেন, কে জানে ? অথবা কত কত সুষুপ্ত ধনীর সন্তান এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যে ধ্রব প্রহ্লাদের ন্যার তপস্যা করিতেছেন, তাহাই বা কে জানে ? আমরা নিরাশ হইব কেন ? সনাতন ব্রত ধরিয়াছি ত ব্রত ছাড়িব কেন ? দুঃখ কষ্ট ঢের পাইয়াছি, আরো আসুক, আরো আসুক, আমাদের রক্ত মাংস ছিঁড়িয়া খাক্, তবুও আমরা দাঁড়াইব। আমাদের বিত্ত বৈভব কাড়িয়া লও, তবুও আমরা চতুর্প্রহরে একমুষ্টি অন্নাহার করিয়া টিঁকিয়া থাকিব। "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—ইহা সাহিত্যিকগণের দর্পের একমাত্ররজ্জু, নির্ব্বাসনে বা কারাগারে পচিলেও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী, আমরা তবুও বিধাতার ব্রতধারী সন্তান, বাঁচি বা মরি, আমরা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবই করিব। পারি বা না পারি, চেষ্টা করিবই করিব। ইহকালে থাকি জীবন ঢালিব, পরকালে যাই—ক্রমাগত বিধাতার চরণে প্রার্থনা করিব। কেননা, ইহাই মহাধাঁরের মাণিক, অন্ধের একমাত্র নড়ী। আর যে উপায় নাই। সগর বংশকে উদ্ধার করিতে আর যে কেহই নাই। ভারতের মৃত জাতির উদ্ধারের জন্য একমাত্র বাঙ্গালা-ভাষা-ভগীরথের উপরই সকল নির্ভর। এই শিশুকে বাঁচাইতেই হইবে, অনুপ্রাণিত ভাই,প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও,প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা, কঠোর প্রতিজ্ঞা। লক্ষলক্ষ কঠোর প্রতিজ্ঞাধারী ব্যক্তি আগমন করিতেছেন, নিরাশ হইব কেন ? কাঁদিতে কাঁদিতে দিন যায় যাক্, তবুও আমরা প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হইব না।

অষ্টম চিন্তা—সুষুপ্ত নিম্নশ্রেণী এবং অনুন্নতা উপেক্ষিতা মাতৃজাতি।

জাতীয়তার রাজ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করা যে চলে না, কিন্তু কোথায় আজ নিম্নশ্রেণী এবং মাতৃজাতি ? বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের কথা বলিয়া আসিলাম—কিন্তু ঘর যে শূন্য—লক্ষজন, কোটী জন কোথায় ? তাঁহারা যে মাঠে গোঠে বা বঙ্গ-অন্তঃপুরে, ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা ?" হায়, নিম্নশ্রেণী এবং মাতৃজাতির চিন্তায় আমরা যে কি দুঃখে ম্রিয়মাণ, ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারি, সে সাধ্য নাই। তাঁহারা সুষুপ্ত, কাহাকে আজ ডাকিব ? তাঁহারাই যে দেশের একমাত্র আশা ভরসা। একশ্রেণী অন্নজল দিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন ; অন্য শ্রেণী স্তন্য দানে জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন, এবং বংশ রক্ষার জন্য তিল তিল করিয়া জীবন-রক্ত ঢালিয়া মানবকে জীবন দান করিতেছেন।

আজ তাঁহাদিগকে বলি, কৃষকভাই এবং মা জননি, জীবন দিলে ত জীবনী শক্তি দেও। কৃষকভাই, পুণ্যবতী, সতীসাধ্বিগণ, তোমাদের পুণ্য সাধনা বিনা এভারতের উদ্ধারের যে আর দ্বিতীয় উপায় নাই। শত শত মানকুমারী, শত শত কামিনী, ভাষার যজ্ঞে প্রাণ দিতে এস। এস শত শত বঙ্গের বার্ণস, সাহিত্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হও। তোমরা ভিন্ন যে উপায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতেন, নিম্ন শ্রেণীর কথা আর তুলিও না। আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মনে করে। মানুষের দ্বারা মানুষের উন্নতি হইতে পারে, পশুর উন্নতি হয় কি?" আর হেমচন্দ্র বলিলেন—"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওই রে?" বিদ্যাসাগরের সকল তপস্যা এই মাতৃজাতির উদ্ধারে নিয়োজিত হইল; কিন্তু আমরা চির-উদাসীন। কে তুলিবে, কে উদ্ধার করিবে? প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইল, কিন্তু মনের সকল কথা ব্যক্ত হইল না! এই দুই শ্রেণীর উদ্ধার না হইলে বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্যক উন্নতি অসম্ভব। বিবেকানন্দের "দরিদ্রনারায়ণগণ এবং বিদ্যাসাগরের "মাতৃজাতি" যত দিন উপেক্ষিত, এবং "না জাগিলে সব ভারত-ললনা এভারত আর জাগেনা,জাগেনা" দ্বারকানাথের এ উক্তি যতদিন পরিত্যক্ত, ততদিন জাতীয় ভাষার উন্নতি হইবে না।

নবম-চিন্তা। ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যান্য অসংখ্য নবোত্থিত সম্প্রদায়।

আমরা অনেক স্থলে প্রচার করিয়াছি, পৃথিবীতে মাত্র দুটী দল আছে,—সেশ্বর ও নিরীশ্বর। আর সম্প্রদায় জানি না, জানিতে মানিতে ইচ্ছাও হয় না। ধর্ম্মের জন্য যিনি যাহা করেন, তাহাতেই মানব-সমাজের কল্যাণ হয়, বিশ্বাস করি। সকল সম্প্রদায়ের ভাল মন্দের উপরই দেশের উন্নতি এবং অবনতি নির্ভর করে। এজন্য সব সম্প্রদায়ের দোষ ত্রুটির কথাই উল্লেখ-যোগ্য। সদ্‌গুণে ভূষিত না হইলে কোন সম্প্রদায়ের জীবন অসম্ভব। সংহিতা যে সমাজে নাই, সে সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার পরিণাম আশাপ্রদ নহে। স্ত্রীপুরুষের-অবাধ স্বেচ্ছা মিলনে সে সমাজের অমঙ্গল হইবেই হইবে। পৃথিবীর অনেক সমাজ এই কারণে কলঙ্কিত হইয়াছে, কালে আরো কত সমাজ মলিন হইবে, কে জানে? ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রশ্রয় না পায়, জাতিভেদ আবার জাগরিত না হয়, দলাদলি আবার জাঁকিয়া না দাঁড়ায়,সকল হৃদয়বান লোকেরই সে সকলের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শুধু পরিশ্রম করিলে হয় না, কেবল গাধার ন্যায় খাটিলে হয় না। নিজ জীবনে যেমন অনাসক্তি, সংযম ও পবিত্রতা সাধন করিতে হয়, সমাজেও যাহাতে অনাসক্তি, সংযম ও পবিত্রতা সাধিত হইতে পারে, সে চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। অনাসক্তি, সংযম ও পবিত্রতা ভিন্ন কোন সমাজ জগতে টিকে নাই; কোন সমাজ টিকিবেও না। যদি টিকে, তবে তাহা নরনারীর স্বেচ্ছা-বিহার-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

দশম চিন্তা। কংগ্রেস ও কনফারেন্স

কতবার কংগ্রেস ও কনফারেন্স হইল, কিন্তু পল্লী সমাজ ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন, কেহ তাহাকে পারিল না, কেহ উদ্বুদ্ধ করিল না। বহুদিন বলিয়াছি, বহুবার বলিয়াছি, "আবেদন নিবেদনে" বড় কিছু হইবে না। যে যতটুকু পার, আপন আপন কর্ত্তব্য পালন কর; নিজে জাগ, পরিবারকে জাগাও, নিজ পল্লীকে জাগাও,—তবেই দেখিবে দেশ জাগিয়াছে। সকলে সকলের কর্ত্তব্য পালন করিলে আপনিই দেশ জাগিয়া উঠিবে। নিম্নশ্রেণীর দারিদ্র্য এক কঠিন সমস্যা। ধনীদিগের ও মহাজনদিগের নিষ্পেষণে দরিদ্র-শ্রেণী নিষ্পেষিত। তদুপরি ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বাঙ্গালার এবং ভারতের জাতি সকলকে কিরূপে নির্ম্মূল করিতেছে, সকলেই তাহা অল্পাধিক পরিমাণে জানেন। রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর—প্রতিনিয়ত এই ধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে উঠিতেছে। যাহারা লুণ্ঠনে সিদ্ধহস্ত, তাহারা লুণ্ঠন করিতেছে, তাহারা ঐ আর্ত্তনাদে কর্ণপাতও করিতেছে না। যাঁহারা বারইয়ারিক তাণ্ডব-নৃত্যে মাতোয়ারা, তাঁহারাও পল্লীর এই ঘোর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিতেছেন না। কে বল এই জাতিকে জাগাইবে? যদি প্রাণপণ করিয়া থাক, পল্লীতে পল্লীতে যাও, দরিদ্র নারায়ণদিগকে ঔষধ ও আহার দিয়া উদ্ধার কর এবং জাগাও। তাহাদিগকে মহাজনদিগের দায় হইতে, ম্যালেরিয়ার তীব্র আক্রমণ হইতে এবং অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর; তবে বুঝিব, তোমার "পণ" সার্থক। সুদীর্ঘকাল নৃত্য করিয়াছ;—আর দলে দলে মিলিয়া নৃত্য করা সাজে না। শিক্ষিত-শ্রেণী শিক্ষার গুণেই মিলিবে। সে জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের আবশ্যক নাই, অশিক্ষিতদিগের উপায় কি? তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হও ও অর্থ ঢালো। তাহাদিগকে মিলাও, দেখিবে মহাবলে ভারত কম্পিত হইবে।

একাদশ চিন্তা।—এনার্কিজম্।

হায়, দেশের এ কি হইল? সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এই সোণার ভারতবর্ষে এ কি লোমহর্ষণ ব্যাপারের অভিনয় হইতেছে? কাহার দোষে এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে? রাজা আছেন, পুলিস আছেন, ধর্ম্মাধিকরণ আছেন, দেশময় সি-আই-ডি আছেন,—কেহ কি এজন্য দায়ী নহেন? দায়ী নহেন কি এদেশের অসংখ্য নরনারী, যাঁহাদের গৃহে এই সব দস্যুর অভ্যুদয় হইতেছে? কে এ কথার উত্তর দিবে? আমরা কি এই এনার্কিজম্ দেখিবার জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি? হায়, মরিলাম না কেন? এদৃশ্য আর ত দেখা যায় না? আর ত লুণ্ঠন বা ডাকাতি সহ্য হয় না। আর ত অপহরণ বা দস্যুবৃত্তি বা নরহত্যা সহ্য হয় না? আর ত দেশের আশা ভরসা সোণার ছেলেদিগকে এরূপ বিপথে ভ্রমণ করিতে দেখিতে ইচ্ছা হয় না? একের দোষে অন্যের সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত নির্দ্দোষী পরিবারে হাহাকার উঠিতেছে। এ সব ত আর সহ্য হয় না। সোণার দেশকে কে রক্ষা করিবে? সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন, রাজার দোষেই মারিভয় ও লোক ভয় উপস্থিত হয়। রাজা সতর্ক হইলে এরূপ ধর্ম্মভীরু জাতির যুবক বৃদ্ধবৃন্দ এরূপ হইত। ইতিহাস চিরকাল সাক্ষ্য দিয়াছে, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচারই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কে তাহা বুঝিবে? হায়, হায়, হায়!

দ্বাদশ চিন্তা।—রাজা।

সুদীর্ঘ দেড়মাস কাল বিষাক্ত-রক্তময় শরীর ধারণ করিয়া, অনিদ্র অবস্থায় দুর্ব্বল মস্তিষ্কে এই সকল এবং আরো কত কথাই ভাবিতেছিলাম! জানি না, পরিসমাপ্তি কত দূর;—এখনও যে মৃত্যুর আশঙ্কা দূর হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। শুধু এই দেড়মাস নয়, সুদীর্ঘ বহু বহু বৎসর ধরিয়া এই সব চিন্তা লইয়াই কত কত সুদীর্ঘ দিবস এবং রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। কত কাঁদিয়াছি, কত হাহাকার করিয়াছি—ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে প্রপীড়িত হইয়াও প্রতিবিধানের জন্য অর্থ-ব্যয় করিয়াছি এবং অক্ষম শরীর, মন এবং অযোগ্য মস্তিষ্কে এবং অশিক্ষার অন্ধকারে থাকিয়া প্রতিবিধানের জন্য কত কত দিন যে খাটিয়াছি, একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ বিশ্ববিধাতাই জানেন। আমি আজীবন শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল তাঁহার ইঙ্গিতই মানিয়া চলিয়াছি, আর কাহাকে গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু এখন শেষ বয়সে, অন্তিম কালের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতেছি, সবই যেন ব্যর্থ হইয়াছে;—কিন্তু সেজন্য একটুও দুঃখ নাই, তাঁহার হস্তেই ফলার্পণ করিয়া খাটিয়াছি। যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে দেখিতেছি, আজও অন্তরে বাহিরে শুধু "পবিত্রতা" আমাকে সকল অত্যাচার, অবিচার এবং ঘৃণা-বিদ্বেষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কত কত বন্ধু ভালবাসা দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, কত কত কত বন্ধু বিরক্তি বাণ নিক্ষেপ করিয়া দূরে, অতি দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু আজীবন অবিচলিত ভাবে আমার সম্বল রহিয়াছে শুধু "পবিত্রতা"। আজও সকল বিভীষিকা—সকল অত্যাচার অবিচারের রাজ্যে শুধু "পবিত্রতাকে" সম্বল করিয়া চলিতেছি। আমি ত চলিলাম—আজ হউক, বা দশ দিন পরেই হউক; চলিলাম ত চলিলাম, জন্মের মতন চলিলাম, কোন সাধু সাধ্বী ভালবাসা ও সদ্ভাবে আবদ্ধ করিয়া চিরকাল আমাকে রাখিতে পারিবেন না। এখন আর সত্য কথা বলিয়া যাইতে ভয় কি? তাই বলি—বিদেশী রাজা ধর্ম্মভীরু ভারতের অন্তরে সুদীর্ঘ কালেও সম্যক প্রকারে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পারিলে কখনও এরূপ হতশ্রী হইত না। খোসাকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আসলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। একটু সহানুভূতি থাকিলে দেশের এরূপ হতশ্রী কখনও হইত না। ইহা যারপরনাই পরিতাপের বিষয়। প্রকৃত ইংরাজ বিদ্বেষী এদেশে একজনও আছে কি না, সন্দেহ; কিন্তু ঘটনা-চক্রে এনার্কিজিমের অত্যাচারই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। রাজা ইচ্ছা করিলে, সময়ে সদুপায় অবলম্বনে, আমরা যে সকল চিন্তায় কুণ্ঠিত হইয়া আজীবন কাটাইয়া আসিলাম এ সকলই বিদূরিত করিতে পারিতেন। সোণার ভারতে আবার ধর্ম্মভীরু সোণার জাতি সৃজন করিতে পারিতেন;—আবার সনাতন সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণে দেশকে উজ্জ্বল করিতে পারিতেন। সাহায্য বা সহানুভূতির অভাবে অনেক কাজ হইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষায়—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা বিদ্বেষ, মামলা মকদ্দমা, অত্যাচার অবিচারে, ঘুষও চুরি ও ডাকাতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মাধিকরণ এখন

কি আকারে পরিণত—সকলে জানেন। শিব গড়াইতে বানর গড়াইতেছেন। সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে অপরাধ হয়,—কিন্তু কি করি, উপায় নাই। চতুর্দ্দিকে ঘুষখোরদের অবাধ-প্রশ্রয়ে কে না কষ্ট পাইতেছেন? রাজা বিদেশে থাকেন, তিনি সব সংবাদ- রাখেন না। মানুষ যখন বিবেককে একবার বলি দেয় তখন আর কে তাঁহাকে রাখিবে। মদ্যপানে, চাপানে, নানা নেশায় ও ব্যভিচারে যেন দেশ ডুবিয়া যাইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রসকল শ্মশানে পরিণত। যাও, অনুসন্ধান কর, বুঝিবে, কত তাহরপুর, গোবরডাঙ্গা, বেলগাছি আজ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে;—কত তাঁতির ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে কত ব্যবসায়ীর মাথায় বাজ পড়িয়াছে, জর্ম্মাণীর বাউণ্টিফেড চিনি যখন কারবার সকল মাটী করিল, রাজপ্রতিনিধিগণ চাহিয়াও দেখিলেন না। যখন তাঁতিকুল নষ্ট হইল, রাজা কি জানি কেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না; অষ্ট্রীয়া জর্ম্মানী যখন ভারতীয় বাজারকে গ্রাস করিয়া ম্যানচেষ্টারকেও হারাইল, তখনও সতর্ক হইলেন না। ক্রমে ক্রমে ভারত ঘোর দারিদ্র্যেপূর্ণ হইল, জীর্ণ শীর্ণ লোকদিগকে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিল। এইরূপে ষোল কলা যখন পূর্ণ হইল—সোণার ভারত তখন অশনে বসনে, বেশভূষায়, শয়নে স্বপনে দাসত্বের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে চিরতরে আবদ্ধ হইল! কবি গাহিলেন—

"তোমরা ব্রিটিস জাতি,
পবিত্র উৎসাহে মাতি,
ধরার দাসত্ব প্রথা করিলে বারণ
তোমাদেরই পদতলে, তোমাদেরই ছায়াতলে
ভারত দাসত্বে আজ হলো নিমগন।"

আর না—অতি দুঃখে এসব কথা বলিলাম, আমি রাজভক্ত প্রজা, রাজা আমাকে ক্ষমা করিবেন। এখনও সময় আছে—রাজা বিরক্ত না হইয়া এদেশের নর-নারীর ক্রন্দনে কর্ণপাত করুন। আবার রাম-রাজত্ব এদেশে ফিরিয়া আসুক, আবার বিক্রমাদিত্য, অশোক, রাণী এলিজেবেথ ও আনের সময়ের ন্যায় সাহিত্যিকগণ নির্ভয়ে লেখনী চালনা করুন,—আবার ধর্ম্মে ও জ্ঞানে এদেশ গৌরবে ভূষিত হউক। রাজা সবই করিতে পারেন, দোহাই ঈশ্বরের, দোহাই বিশ্বমানবের—রাজা তোষামোদকারিদের কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া আবার ভক্ত প্রজার কথা শুনুন, আবার প্রজার সহায় হউন, আবার দেশ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, কিন্তু সব চিন্তার কথা বলা হইল না। শরীর জীর্ণ, শীর্ণ ও দুর্ব্বল; শয্যাই একমাত্র সম্বল, অনেক দূর হাঁটিতে পারি না,—জিহ্বা অর্দ্ধ-শ্বেত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, অনেক ঔষধেও পাকস্থলী ও অন্ত্র সকল সুস্থতা লাভ করিতেছেন না, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, জানি না। বাঁচিব কি মরিব, বিধাতাই জানেন। নব্যভারত আমার মৃত্যুর পর থাকিবে, না যাইবে, তিনিই জানেন। সুদীর্ঘকাল ইহার পরিচর্য্যা করিয়া ধন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে যাইয়া কত জনের চরণে কত অপরাধী হইয়াছি, তাহা জানি না। ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আজ সকলের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা চাহিতেছি। বিধাতা দিন দেন এবং সুস্থ করেন যদি, আবার সেবা করিব। আর যদি সে সুদিন না পাই, পাঠকগণ সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, সহানুভূতির তপ্ত অশ্রু ফেলিবেন, তাহাতেই

সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব এবং আমার আত্মার কল্যাণ হইবে ও কৈবল্য মিলিবে। আজ তবে, নববর্ষে, সকলের চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া ধন্য হই। বিধাতা আমার ও নব্যভারতের চিরসাথী হইয়া থাকুন।

অন্ধকার ও আশা।

কাশিমবাজারের মহারাজা।

দুঃখ অনেক। দুরবস্থা নানা বিভাগে। অন্ধকার গাঢ়। মনুষ্য-জীবন দুঃখময়। তাই বুঝি সংসার দুঃখময়। এই সকল দুঃখের কি প্রতিকার নাই? (১) ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়া ভুগিয়া লোক মরিতেছে। ডাক্তার বেণ্টলি প্রভৃতি মহোদয়গণ তাহার নিদান অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু জল কষ্টে যে রোগ হয়, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি আজি কত গ্রামে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের অনলরূপী রৌদ্রে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়, অথচ লোকে স্বপেয় জল পায় না। (২) খাদ্যদ্রব্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য। শস্যের মূল্য বাড়িলে কৃষকদিগের অবস্থা পরিণামে উন্নত হয় না তাহা আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'নব্যভারতে' সবিস্তারে দেখাইয়াছি। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্র এবিষয়ে প্রায়ই নির্ব্বাক্। ইহাতেও মধ্যবিত্ত লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়াছে। দুগ্ধ ঘৃত ও মৎস্য দুর্লভ। দেশের লোক দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে। (৩) পূর্ব্বে, দেশের সঙ্গতিসম্পন্ন লোক দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে প্রতিপালন করিতেন। আজি কালি অধিকাংশ লোকই অতিশয় স্বার্থপর হইয়াছে। দেশের যে সকল ধনী লোক স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাও অনেকেই অন্নদানে কাতর। আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান কালে স্বদেশপ্রেমের অর্থটা বুঝা কঠিন। (৪) দেশের ধর্ম্মভাব দিন দিনই কমিতেছে। পূজা, অর্চ্চনা, আচারের লোপ হইতেছে। যেন বোধ হয় এখন অধিকাংশ লোকের ঈশ্বর, পরলোক ও পাপপুণ্যভেদে বিশ্বাস নাই। (৫) তাই তাহারা আধ্যাত্মিকভাব মূলক সমাজ সেবা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সেবায় অনুরক্ত। বিলাসের স্রোত দিন দিন পরিবর্দ্ধমান বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লোকে বিলাসে আহুতি দিতেছে; ইহাদিগের ত্যাগমূলক ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া পাশ্চাত্য ভোগ সুখসার জীবনের অনুসরণ করিতেছে। (৬) ধনীগণ মামলা করিয়া নিঃস্ব হইতেছে, পাপে দগ্ধ হইতেছে। দেশে প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক উকীল হওয়ায় অনেক উকীলের অন্ন হইতেছে না, কোন কোন উকীল বিবাদের ও মোকদ্দমার উৎসাহদাতা হইতেছেন। এদেশে আইন ক্রমশঃ ইংলণ্ডের জটিল আইনের অনুগামী হইতেছে। এতদূর জটিল হইতেছে যে বিখ্যাত আইনজ্ঞ মেন (Maine) মহোদয়ের মতে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের আইনও তত জটিল নহে। আইন প্রতি বৎসর নজির দ্বারা এমন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে যে স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিয়া-

ছিলেন যে, প্রতি বৎসর আইনের এক এক খানি সংশোধিত সংস্করণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া উচিত। গরিব ও ধনীর মধ্যে মোকদ্দমা হইলে গরিবের পক্ষে জয় লাভ করা দুঃসাধ্য। ফৌজদারী মোকদ্দমায় হত্যা অপরাধে ধনী লোকের ফাঁসী হওয়া প্রায়ই দেখা যায় না। হেন্‌রি জর্জ্জ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন অপরাধ করিয়া প্রচুর টাকা খরচ করিতে পারিলে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দেওয়ানি মোকদ্দমা পূর্ব্বে অনেক স্থলেই সালিসীতে নিষ্পত্তি হইত। এখন কথায় কথায় আদালত। ৭। দেশে কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত হইতেছে না, কৃষিকার্য্যও অত্যন্ত হীন অবস্থায় আছে। কৃষকদিগের অবস্থা, কি জমিদারি মহলে কি গবর্ণমেণ্টের খাসমহলে কিরূপ, তাহা প্রতি আদালতে বাকী খাজনার জন্য যে সকল জমিজমা নীলাম হইয়া যায়, তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়। মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে জমিদারি সভায় বলিয়াছেন, যে অধিকাংশ জমিদার প্রজা এবং জমি সম্বন্ধে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করেন না, কত প্রজা এবং জমির যাহাতে উন্নতি হয়, তাহা সকল জমিদারেরই করা চিত। (৮) ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার অধিকাংশ দেশীয় শিল্পের লোপ হইয়াছে। সুতরাং অনেক লোকের অন্নাভাব হইয়াছে। কুটীর-শিল্পের (cottage industryর) উন্নতির জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা খুব ভাল। কিন্তু শিল্পের বড় বড় কারখানা না চলিলে তাহার আনুষঙ্গিক কুটীর-শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে না। (৯) দেশের সাহিত্য, দেশে উচ্চভাবের সঞ্চার করিয়া দেশের অভাব মোচনের জন্য সতত চেষ্টা করিয়া দেশে জ্ঞান চিন্তা ও উদ্যম বিকশিত করিবে, স্বতঃ এই আশা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অভাব মোচন করা সম্বন্ধে, উপস্থিত সামাজিক আর্থিক সমস্যা সমাধান বিষয়ে, সাহিত্যের দৃষ্টি ও চেষ্টা অতি ক্ষীণ। সেদিন নাটোরের মহারাজা ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, প্রত্নতত্ত্ব দেশের একটা contagious disease হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্য পরিষদ আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীর্ণ পুঁথি ও ফাটা ফুটা পাথর লইয়াই বিব্রত। প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই সত্য কথা সাহিত্য-সম্মিলনে বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহামতিও এই ভাবের কথা তাহার পত্রে লিখিয়াছেন—"পুরাতন পুঁথি প্রকাশ পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে"। "মাসিক পত্র" যে সকল সমালোচনা প্রকাশ হয়, তাহা অধিকাংশেই লেখকের অজ্ঞতা ও অশিষ্টতা প্রকাশ পায়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত না করিয়া, গালি দিবার জন্য আবর্জ্জনা আহরণ করিয়া তাহার সহিত কটু কাটব্য মিশ্রিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দেওয়া হয়। সমাজ-হিতকর ভাল প্রবন্ধেরও বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়। (১০) শিক্ষা সম্বন্ধেও বিভ্রাট ঘটিতেছে। দেশে যেরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, কায়িক এবং মানসিক উদরাময় জন্মিতেছে, বালকগণ গুরুজনের প্রতি ভক্তিহীন হইতেছে, সব বিমুখ হইতেছে। অধিকাংশ ছাত্রই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। এদিকে সহরে গিয়া বিলাসী হইতেছে, কেহ বা প্রলোভনে পড়িয়া সুনীতি

হারাইতেছে। অনেকে পুস্তকের যে সকল কথা কণ্ঠস্থ করে, তাহা ভাল করিয়া বুঝে না, চিনির বলদের ন্যায় ভার বহন করে মাত্র।

এই সকল বিষয় ভাবিলে মন দমিয়া যায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকারের ভিতর ক্রমে আলোক ফুটিতেছে। "বেঙ্গল ডবল কোম্পানি" হইয়াছে। ভারত-রক্ষার জন্য বাঙ্গালী সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে দিন দিন অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দিতেছেন। বিলাতে সমর-সভায় দুই জন ভারতবাসীকে প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পাদি শিক্ষা করিবার জন্য অনেক ভারতবাসী যাইতেছেন। এদেশে কোন কোন স্থানে সেবাব্রত প্রচারিত হইতেছে। কবিত্বে বঙ্গসাহিত্য এখন বিশ্বসাহিত্যের গৌরবময় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঘাটে মাঠে বঙ্গীয় কবির গানে বাঙ্গালীর প্রাণ মহদ্ভাবে পুলকিত হইতেছে। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্বশ্রুত হইয়া বাঙ্গালীকে বিজ্ঞান-রাজ্যে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। স্যর রবীন্দ্রনাথের বোলপুরের শান্তিনিকেতনে যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কাশিমবাজারের মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী Polytechnic Institute এবং দামোদরে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি অন্ধকারের ভিতর আলোক।

এই প্রবন্ধে আমি দামোদর ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাতীয় উজ্জ্বল-তরঙ্গ শিরে জাতীয়-শিক্ষা সঙ্কল্প নাচিতে নাচিতে আমাদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নবপ্রসূত জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির বিবেচনার জন্য আমি ইংরাজি সংবাদ পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধে চতুর্বিধ শিক্ষা পদ্ধতি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে চতুর্থ শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলাম—

"I have to propose the last alternative course. It appears to be desirable to keep the present tol system in tact in Course IV only making Bengalee second language and communicate through it the truths of modern European science. The Hindu *Darshanas*, the *Vedas* and *Puranas* and *Smritis* will thus be brought under the X rays of of European science. It would then be seen * *. what interpretation the Pandits of our tols would give to the Hindu scriptures and philosophy. It may be hoped that many obscure passages will be illuminated * * shedding a new light on the natural mind. In this course the Pandits shall be entirely national in thought and habits just as is present in tols except that they shall have the great privilege of entering the Temple of Hindu Philosophy with the lamp of modern science and study the mysteries of the sanctuary from a new stand-point of view."

এই প্রস্তাব অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় দামোদরে যে ধর্ম্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে আমার আশা হয় যে, প্রস্তাবিত শিক্ষা পদ্ধতি কালে প্রশ্রয় পাইবে। এই ক্ষুদ্র দামোদর-বিদ্যালয়-বীজ হইতে এমন এক মহাবৃক্ষের উদ্ভব হইবে, যাহার ছায়াতলে বহু বঙ্গবাসী আশ্রয় লইবে,

এবং যাহার সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া অনেকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য লাভ করিবে। আমার মনে হয়, টোলের শিক্ষাপদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত।

নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পদপ্রান্ত বিধৌত করিয়া কলনাদিনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। দূরে, শ্যামল প্রান্তর, বৃক্ষরাজি আরও দূরে, আকাশের মনোমোহন নীলিমা পাদপ শ্রেণীর শ্যাম শোভার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে—সংক্ষেপে এই বিদ্যালয় পবিত্র প্রকৃতির লীলা-নিলয়ে অধিষ্ঠিত। তথায় মহানগরীর পাপ-প্রলোভন নাই। তথায় বায়ু বিশুদ্ধ, ধূম-গুলি কার্ব্বণিক গ্যাস দূষিত নহে। তথায় জন কোলাহল নাই, শকটের অবিরাম ঘর্ঘর নাদ নাই। চতুর্দ্দিকে শোভাশালিনী শান্তিময়ী প্রকৃতি বিরাজ করিতেছে। এরূপ স্থান জ্ঞানার্জ্জনস্বরূপ তপস্যার বিশেষ উপযোগী। *

দামোদরের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে বিশাল নিকেতনে ছাত্র ও শিক্ষক একত্র বাস করিতেন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকগণ যেমন শিষ্যদিগের সহিত বাস করেন, তাহাদিগের পাঠ চরিত্র ব্যবহারাদি তত্ত্বাবধান করেন, ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ থাকেন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষক তেমনি ভাবে ছাত্রগণের কুশলের নিমিত্ত সতত সচেষ্ট থাকিবেন; পিতার ন্যায় স্নেহের সহিত সদয় ভাবে, বালকগণের কায়িক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যত্ন করিবেন। আশা করি, এমন ব্যক্তি শিক্ষক হইবেন যিনি সাধুতায়, আন্তরিক স্নেহে, বিশুদ্ধ জ্ঞানে ছাত্রদিগের ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিবেন। পেষ্টালজির ন্যায় আরণল্ডের ন্যায় তাঁহাকে ছাত্রগণের প্রিয় ও বিশ্বাস-ভক্তি-ভাজন হইতে হইবে। আমাদিগের টোলের অধিকাংশ অধ্যাপকদিগের প্রতি ছাত্রগণের প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। সাধু ছাত্রবৎসল শিক্ষকের সহিত একত্র বাস করিলে ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা নাই।

৩। শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগের বেতন দিতে হইবে না। কেবল খাই খরচ বাবদে সাড়ে সাত টাকা মাত্র লাগিবে। এই খাইখরচের টাকা ও যদি না দিতে হইত, তাহা হইল আর ও টোলের অনুরূপ হইত। দামোদরের নিকট কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে এমন ভাবে কৃষি কার্য্য চালান যায় যাহাতে কৃষিকার্য্যের লাভের টাকায় খাই খরচের টাকাটা উঠিয়া যায়,—এই কৃষিকার্য্য প্রথমে পরীক্ষার জন্য অল্প আয়তনে করিলে হইতে পারে। বালকগণ যাহাতে কিছু বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পায় তজ্জন্য এই বিদ্যালয়ের সংযোগে একটী গোশালা থাকা বাঞ্ছনীয়। বালকগণ যাহাতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উচিত মত গোসেবা করিতে শিক্ষা করে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। গোশালা বৃহৎ হইলে চাকর রাখিয়া দুগ্ধ ঘৃতাদি বিক্রয় করিয়াও বেশ লাভ হইতে পারিবে। বালকেরা ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি ক্রীড়া করিয়া থাকে। যদি বালকদিগের রুচি এরূপ হয় যে গোসেবা কার্য্য তাহারা খেলিবার মত আমোদের সহিত করে তাহা হইলে তাহারা একটা উপকারী কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের খাই খরচও কম লাগিতে পারে, অন্ততঃ ভাল খাওয়া হইতে পারে। গাভীগণের জন্য বিবীত অর্থাৎ প্রচুর তৃণাদি বিশিষ্ট পরিরক্ষিত গোমেষাদির চরিবার স্থান আবশ্যক। farming এবং dairy সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। পূর্ব্বে নব্যভারতে এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

৪। সচ্চিদানন্দের বন্দনার পর পাঠ আরম্ভ হইবে বেশ বেশ! কিন্তু এই বন্দনার ফল শিক্ষকের সাধুতা ও ভক্তির উপর নির্ভর করিবে। একটী missionary schoolএ প্রার্থনা করার পর পাঠ আরম্ভ হইত। তাহাতে যতদুর বুঝিতে পারিতাম

* অনেক দিন পূর্ব্বে "নব্যভারতে" বিদ্যালয়ের উপযোগী স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। ফাল্গুন মাসে এই প্রবন্ধ প্রেরণ করায় পরই কঠিন নিউমোনিয়া রোগে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার অমর লেখনী থামিয়াছে—বঙ্গে হাহাকার উঠুক। এরূপ লেখক এদেশে বড় বিরল জ্ঞানেন্দ্র নাথের প্রবন্ধ পাঠকগণ পাঠ করুন। কোথায় আমরা যাইব, না তিনি অগ্রগামী হইলেন। নিয়তির চক্র!

বালকগণের মনে ভক্তি সঞ্চার হইত না। তাহা একটা বাহ্যানুষ্ঠান মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর কলেজিয়াট স্কুলে একটী শিক্ষক প্রতিদিন Pope রচিত universal Prayer আবৃত্তি করার পর পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। শিক্ষকের বিশেষ চরিত্রবল না থাকায় ঐ প্রার্থনার যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল তাহা আমার বোধ হয় নাই। ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যে যাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার প্রতি সতত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সচ্চরিত্র ভগবৎ প্রাণ ব্যক্তিই বাহ্য অনুষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে-পারেন। ছেলেদের সন্ধ্যাহ্নিক ক্লাসে যাইতে হইবে,সদ্‌গুরু স্তোত্র আবৃত্তি করিতে হইবে। ভাল! কিন্তু এই সন্ধ্যাহ্নিকের অর্থ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, পূজাতে যে তাহারা ভগবান্‌কে ডাকিতেছে, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে। অনেক স্থলে হিন্দু সন্ধ্যা আহ্নিক ও প্রতিমা পূজা প্রভৃতির মধ্যে যাহা সহসা অর্থহান বা অনিষ্টজনক বলিয়া বোধ হয়,গভীর ভাবে অনুশীলন করিলে দেখা যায় তাহা গভীর মঙ্গলার্থে পূর্ণ। এই অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন এমন শিক্ষকের আবশ্যক। যে প্রতিমা পূজা বা সাকার উপাসনা অনেক ব্রাহ্মর নিকট অতিশয় হেয় নিতান্ত জঘন্য বলিয়া বোধ হয়; কেশববাবু তাহার ধারাবাহিক প্রার্থনায় তাহার এমন গভীর সুন্দর, সঙ্গত, হৃদয়প্রফুল্লকারিণী ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নিরাকারকে বুঝিবার জন্য আকারকে এমন ভাবে খাটাইয়া লইয়াছেন, আকারের মধ্যে হইতে নিরাকারের গুণগুলি এমন বিশদ ও হৃদয়গ্রাহীভাবে বাহির করিয়াছেন, যে তাহা পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্ম ও ভক্তিভরে বলিয়া উঠিবেন—

নমস্তে নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ।

ফল কথা শিক্ষকের ভক্তি সাধুতা ব্যাখ্যা শক্তির উপর হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চার ফল বন্দনা স্তোত্র সন্ধ্যাহ্নিকের ফল নির্ভর করিবে। প্রার্থনা করি যেন ভগবৎকৃপায় দামোদর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তেমনি সুশিক্ষক ও সদ্‌গুরু লাভ হয়।

৫। শেষ কথা. এই ধর্ম্মবিদ্যালয়ে প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শ বর্ত্তমান কালোচিত ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া—তাহার অনুসরণ করা হইবে। এই কার্য্য যেমন প্রশংসনীয় তেমনি দুরূহ। কাল ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শ অনিবার্য্যভাবে ভাঙ্গিতেছে, পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিদেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মী গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে,নূতন সভ্যতার প্রতিযোগিতার পীড়নে প্রাচীন ঋষিগণ কুণ্ঠিত ভাবে পুঁথির মধ্যে অবস্থান করিয়া যেন হরিনাম জপ করিতেছেন। যেন পুঁথির মধ্য হইতে এক একবার বাহিরে আসিয়া চারিদিকে তাকাইয়া ভাবেন এই কি আমাদিগের সেই ভারত? যেন ক্ষণমাত্র এই ভাবিয়া আবার পুঁথির অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহেন। যে তপোবনে তাঁহারা তপস্যা করিতেন সে তপোবন নাই, যে হিন্দু রাজারা তাঁহাদের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য মানিয়া লইতেন তাঁহারা নাই, পূরাকালের যজ্ঞ নাই, যজন যাজন নাই, সেরূপ বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপন নাই, সেরূপ দান প্রতিগ্রহ নাই, সেই সেবা ও ত্যাগ ধর্ম্ম নাই, সেইরূপ অতিথি সেবা নাই, দয়া দাক্ষিণ্য নাই, পূজা অর্চ্চনা নাই—ঋষিগণ পুঁথির মধ্যে ভাবিতেছেন এই কি আমাদিগের সেই ভারত? না, তাঁহারা কেবল পুঁথির মধ্যে নাই। তাঁহারা স্বর্গে ও আছেন, স্বর্গ-হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, নূতনের ভিতর প্রাচীনকে জাগাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। কান পাতিয়া শুন ঐ আহ্বান ঐ সান্ত্বন বচন শুনিতে পাইবে। ঐ আহ্বানের ফলে, বোলপুরে শান্তিনিকেতন স্থাপিত হইয়াছে। ঐ আহ্বান হেতু দামোদরে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে—বিশেষতঃ প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শ কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিতে পারা যায়—এ বিষয় অনেক চিন্তা করিবার আছে,অনেক লিখিবার আছে। ভগবান্ যদি দিন দেন আবার লিখিব। *

* দামোদর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান পত্র আজি ও পাই নাই, সংবাদ পত্র দেখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

গ্রীক্-দর্শন।

নব্য আদর্শবাদ (Neo-Platonism.)।

প্লোটিনাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঈশ্বর বলিতে যে অনন্ত ঐক্য বা সামঞ্জস্য সূচিত হয়, তাহা সর্ব্বমঙ্গলের মূলীভূত কারণ এবং স্বয়ং পরাৎপর হইলেও ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় কাহারও শুভাকাঙ্ক্ষী নহে। বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ঈশ্বরের গুণ নয়, পরন্তু এই তিন বস্তু লইয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। এই তিনেই তাঁহার অস্তিত্ব। ঈশ্বরের অনুভব শক্তি আছে বলিলে তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব দোষ স্পর্শে এবং তাঁহার অনন্তত্ব ও নিরপেক্ষতার হানি হয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আত্মাবধারণের (self-conciousness) মূল্য আছে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে তাহার মূল্য নাই। অন্ধকার দূরীকরণের নিমিত্তই আলোকের প্রয়োজন, যাহা কিছু অপ্রকাশ, তাহার জন্যই দৃষ্টির আবশ্যকতা, যে বস্তু স্বপ্রকাশ,স্বয়ংই আলোক, তাহার নিকট আর আলোকের সার্থকতা কি? ঈশ্বরের নিকট আত্মাবধারণের মূল্য নাই বলিয়া যে তিনি মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় অন্ধ বা অচেতন, তাহা নহে। তিনি চেতনাচেতনের অতীত, চেতন এবং অচেতন বলিয়া তাঁহাতে বিরুদ্ধভাব নাই। তাঁহাতে বাসনা বা কামনাও থাকিতে পারে না, যেহেতু তিনিই সব, আত্ম সত্তার বাহিরে তাঁহার কাম্য কিছুই নাই? মানবেচ্ছার ন্যায় তাঁহার ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে হয় না। তিনি স্বয়ংই শান্তি, সন্তোষ ও আরাম। ঈশ্বরের স্বাধীনতা মানবাত্মার স্বাধীনতার ন্যায় সীমাবদ্ধ নয়, মানবদেহের ন্যায় তিনি কোন বহিঃ-শক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিতও নহেন; তিনি এই দুই অবস্থার অতীত বলিয়া তাঁহাতে স্বাধীনতা বা পরাধীনতার ভাবই আসিতে পারে না। গুণ মাত্রেই যখন তাঁহার অসীমত্বের বাধা জন্মায়, তখন তাঁহাতে কোন গুণই আরোপ করা চলে না। ঈশ্বর সর্ব্বগুণাতীত, অর্থাৎ নির্গুণ; তিনি একাধারে সব, অথচ কিছুই নন, এক কথায় তিনি মানব ধারণার অতীত। *

এস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পরম ঐক্য, পরম মঙ্গল, শুদ্ধচৈতন্য, পূর্ণতা প্রভৃতি যে কয়টী শব্দ প্লোটিনাস স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, সে কয়টীও গুণপ্রকাশক সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রযুজ্য নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে মোটের উপর এই বলিতে হইবে যে, ভাষায় তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না। সত্য বলিতে গেলে, তিনি যে আছেন, তাহাও বলা অন্যায়; কেন না, এক হিসাবে তিনি সত্য ভাবেরও অতীত। 'আছেন' বলিলেই সীমার ভাব আসে। বিষয়ানুভূতির সাহায্য

* The original essence is without limit, form, or definition, the unlimited or infinite; no corporeal and even no intellectual property can be ascribed to it.---Zeller's Outlines of Greek Philosophy (P. 329).

ব্যতীত যখন কোন বস্তুরই জ্ঞান জন্মে না, সৃষ্টিকে ছাড়িয়া যখন সৃষ্টির ধারণা বা আদর্শকে বুঝা যায় না, তখন ঈশ্বরের ত কথাই নাই। বিষয়ানুভূতি হইতে আদর্শগুলি যতদূরে, আদর্শ হইতে আবার চরমাদর্শ বা ঈশ্বরও ততদূরে। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে একেবারে চিন্তার শেষ সীমায় উপনীত হওয়া আবশ্যক। এই স্তরে উত্তীর্ণ হইয়া যে সিঁড়ি বাহিয়া উঠা গেল, সেই সিঁড়িখানি সরাইয়া লইলে যদি নিম্নের সহিত কোন সম্বন্ধই না থাকে, তবে সেই অবস্থায় চিন্তার পরিবর্ত্তে স্তুতি এবং জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভক্তির উদয় হইবে। ভাষায় ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা; চিন্তায়ও তাঁহার রূপকল্পনা অসাধ্য।

প্লেটো ঈশ্বরকে সৃষ্টির বহু উচ্চে স্থান দিলেও আদর্শ হইতে পৃথক করেন নাই; ঈশ্বর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বা আদর্শরাজ, কিন্তু তিনি মানববুদ্ধির অতীত নহেন। নব্য-আদর্শবাদের মতে ঈশ্বরের স্থান আদর্শেরও উপরে এবং মানব-ধারণার অতীত, অর্থাৎ কেবলমাত্র চিন্তায় তাঁহাকে ধরা যায় না। এইস্থলে এই দুই মতে অনৈক্য ঘটিলেও তাহা এত অধিক নয় যে, প্লোটিনাসকে প্লেটোর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে হইবে। প্লোটিনাস বলেন যে, মানবমন ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে পারে বটে, তবে তাহা সহজসাধ্য নয়। সেরূপ ক্ষমতার জন্য মানবকে চিন্তার অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমতঃ কুসংস্কার ত্যাগ করা আবশ্যক, তৎপরে সাধনার দ্বারা মানসিক উন্নতিবিধান করিতে এবং নিয়ত ঈশ্বরানুচিন্তনে রত থাকিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং তাহার ফলে ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারা যায়। কেবল চিন্তা করিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না বলিয়া প্লোটিনাস যে চিন্তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে; বরং তিনি চিন্তাকেই ঈশ্বরের মন্দিরে পৌঁছানের একমাত্র উপায় বলিয়াছেন। চিন্তাবলে একেবারে মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তবে মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। পক্ষান্তরে, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে যে রহস্যবাদের নব অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাহার সমস্ত উপকরণই প্লেটোর দর্শনমতে পাওয়া যায়। যে আদর্শ-জগতের জন্য যোগিঋষিগণ ব্যাকুল, পরমার্থের জন্য হৃদয়ের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং যে জ্ঞান-পিপাসা লইয়া দর্শনের গৌরব, প্লেটোর দর্শনে তাহার সমস্তই বিদ্যমান।

নিরপেক্ষ এক হইতে কিরূপে বিশ্ব বা জগতের সৃষ্টি হইল, প্লোটিনাস তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ যে ভাবে সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হয়, অগ্নি যে ভাবে তাপ বিকীরণ করে, স্বতঃসিদ্ধ হইতে যে ভাবে মন্তব্য নির্ণীত হয়, নিরপেক্ষ এক অনন্ত মহাশক্তি বা ঈশ্বর হইতেও বিশ্ব-সংসার সেই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ। সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি পিতৃস্থানীয়। সন্তানের মঙ্গলকামনা যেমন পিতার ধর্ম্ম, জগতের মঙ্গলকামনাও সেইরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম। জগতের স্থিতিই তাঁহার কামনা। সকলের মধ্যে এমন এক আকাঙ্ক্ষা বা আকর্ষণ জাগ্রত রহিয়াছে, যাহার বলে সকলেই সেই একের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিত্বভাব (individuality) সত্তার চরম রূপে নহে। এই ভাবটী ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়া, পুনরায় ঈশ্বরে প্রত্যাবৃত্ত বা লীন হওয়ার একমাত্র

পথ, উপায় বা সেতু। ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়া ঈশ্বরে মিলিত হওয়াই যদি জগতের কার্য্য, তবে এই কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, যে ঈশ্বর হইতে বস্তুজগতের উদ্ভব হইতেছে, সে ঈশ্বর কেবলমাত্র নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, অনন্ত শক্তিমাত্র (Dunamis); পরন্তু, যে ঈশ্বর সৃষ্টির মিলন-গ্রন্থি বা চরম-লক্ষ্য, সে ঈশ্বর কেবলমাত্র নিরাকার চৈতন্য বা অনন্তশক্তি নহেন, তিনি পূর্ণব্রহ্ম। প্লোটিনাসের মতে তিনিই 'অ্যাব্‌সলিউট'। এক শক্তিরই এই দুইরূপ বা অবস্থাভেদ। নিরাকার চৈতন্য হইতে অনন্তরূপগুণসম্পন্ন ভগবানে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই জগৎ যে অনন্ত মহাশক্তির লীলাভূমি, সেই অনন্ত মহাশক্তিই ঈশ্বর এবং তাহাই জগৎরূপে প্রকাশমান। জগৎ যদি কোন বিশিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলার অধীন হয়, তবে সেই নিয়ম শৃঙ্খলার অর্থ এই যে, দ্রব্যমাত্রই ভগবানের সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছে। চিন্তা, ধ্যান এবং প্রত্যক্ষদর্শন (Intuition) ব্যতীত এই প্রত্যাবর্ত্তন বা মিলনক্রিয়া অন্য কোন উপায়ে সাধিত হয় না। এই তিনের ভিতর দিয়াই ভগবানের মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ সম্ভব এবং এই তিন ক্রিয়ায়ই আত্মার পরমানন্দ বা মুক্তি। অনুভব, দর্শন এবং অনুচিন্তন ব্যতীত জগতের অন্যক্রিয়া নাই। যে কোন গতি, কর্ম্ম বা চেষ্টা সকলের ভিতরেই এই তিন ক্রিয়া লক্ষিত হইবে; কেননা, এই সকল ক্রিয়া লইয়াই জীবন। জীবমাত্রই কিছু না কিছু অনুভব করিতেছে, দেখিতেছে এবং ভাবিতেছে। জীব কাহাকে অনুভব করে, কাহাকে দেখে, কাহার ধ্যানে মগ্ন থাকে? যে দিক দিয়া হউক, আর যে ভাবে হউক, সেই অনন্তকেই অনুভব করিতেছে, দেখিতেছে এবং তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন আছে। সকলেই সেই একের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, যতক্ষণ তাহাকে না পাইতেছে, ততক্ষণ তাহাদের চেষ্টার বা কর্ম্মের বিরাম নাই। মানবমাত্রই এই নিয়মের অধীন এবং স্ব স্ব প্রকৃতি, জ্ঞান কর্ম্মানুসারে এই নিয়ম পালনে বাধ্য। জগতে দুই প্রকারের প্রকৃতি দেখা যায়। উহাদের একটীতে চিন্তার ভাগ অধিক, কর্ম্মের ভাগ অল্প; অপরটীতে কর্ম্মের ভাগ অধিক, চিন্তার ভাগ অল্প; একটী চিন্তাপ্রবণা, অপরটী কর্ম্ম-প্রবণা। চিন্তাপ্রবণা প্রকৃতির সাহায্যে অথবা চিন্তাপথে যতশীঘ্র ভগবানকে পাওয়া যায়, কর্ম্মপ্রবণা প্রকৃতির সাহায্যে অথবা কর্ম্মপথে ততশীঘ্র পাওয়া সম্ভব নয়। শেষোক্ত পথে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে হয়; তাহার কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চিন্তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। কর্ম্মে মানবকে ভগবানের স্বরূপ হইতে দূরে রাখে। জীবনের সহিত চিন্তার বিশেষ পার্থক্য নাই; ধ্যান চিন্তার চরম-পরিণতি। এই স্তরে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া যায় বলিয়া ধ্যান বা সমাধি এবং ঈশ্বরের স্বরূপেও বিশেষ পার্থক্য নাই। এদিকে আবার জগৎ এবং ঈশ্বরেও কোন প্রভেদ নাই। কেননা জগৎই ঈশ্বর। তাহাই যদি হইল, তবে অ্যারিষ্টটলের মতানুসারে ঈশ্বরকে কেবল চিন্তা বলিতে আপত্য কি? আর ইহাও সত্য যে, তিনি স্বয়ংই তাঁহার চিন্তার বিষয়, নিজে নিজেরই ধ্যানে মগ্ন। তিনি যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিবেকজ্ঞানের মূলকারণ, যাহার প্রভাবে আমরা যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি, কেবল সেই কারণকেই দেখিতে পাই না।

২। সত্তার অবস্থাত্রয়।

(১) বুদ্ধি (Intelligence) ঈশ্বরের

আত্ম-বিশ্বধারার প্রথম ধারা বুদ্ধি। প্রথম ধারা বলিয়া সারবত্তায় বুদ্ধির তুল্য আর কিছুই নাই? পরবর্ত্তী ধারাগুলি ইহার তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীনতেজ। সৃষ্টিকে এক হিসাবে নিত্যচৈতন্যস্বরূপের পতন বা অবনতিও বলা যায়, অর্থাৎ যে পরিমাণে তাঁহার আত্মসত্তার বিকাশ ঘটিতেছে, সেই পরিমাণে সেই-স্ফুরিত চৈতন্যে আবিলতা অসিতেছে। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর বুদ্ধিতেই দ্বিধা বিভক্ত হন, দুই ভাগের একভাগ কেবল বুদ্ধিই ('nous') রহিয়া যায়, অপর ভাগ জ্ঞান জগতে (Intelligible world) পরিণত হয়। আধুনিক পরিভাষায় এই দুই পদার্থের একটীকে ব্যক্তি অপরটীকে বস্তু (জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়) উপাধি দেওয়া হইয়াছে। দ্রব্য সমূহের তুলনায় বুদ্ধি প্রায় নিরপেক্ষ একের সমকক্ষ। মোটের উপর জ্ঞানজগৎ এবং সেই জগতের যিনি দ্রষ্টা বা সাক্ষী (Reason) উভয়ের মধ্যে এই স্তরে দেশ ও কাল হিসাবে কোন পার্থক্যের উদয় হয় নাই। দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও এই স্তরে উভয়ে এমন ভাবে আছেন যে, একের ভিতরেই যেন অপরের অবস্থিতি ঘটিতেছে। বিশ্বের আদর্শরূপ বা ধারণাগুলি বীজরূপে বুদ্ধিতে উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধিতে লীন রহিয়াছে। বুদ্ধি বীজরূপী আদর্শ হইতে পৃথক নহেন।

কেমন করিয়া যে এই স্তরের উদয় হইল, কেমন করিয়া যে "এক" হইতে বুদ্ধির প্রথম স্ফুরণ হইয়া 'দুই'য়ের উৎপত্তি হইল, সৃষ্টিতত্ত্বে তাহার মীমাংসা নাই। এই 'কেমন করিয়া' বা 'কেন'র উত্তর ঈশ্বরের স্বরূপের ন্যায় চির-রহস্যাবৃত। কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তর্কস্থলে বলা হয়, দুই এক হইতে আসিয়াছে, অতএব দুইয়ে একের গুণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। দুই যদি এক হইতে আসিয়া থাকে, তবে একেই বা দুই না থাকিবে কেন? দ্বৈত ভাব যে একের অন্তর্লীন ভাব, তাহাতে সন্দেহের কারণ কি? খ যদি ক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে ক ও খ যতই মিলিয়া মিশিয়া বা সূক্ষ্মভাবে থাকুক উভয়ের মধ্যে গোড়ায় যে একটু পার্থক্যভাব ছিল না, উভয়ের মধ্যে যে একটী সীমান্ত রেখা ছিল না, এমন নয়। অনেকে একথাও বলেন যে, এক এবং বহুতে প্রভেদ নাই, কেননা এককে বহুর সমষ্টি রূপে গণ্য করিতে হইবে। ঈশ্বরকে কেবলমাত্র বস্তুজাতের সমষ্টি বলিলে তিনি আর বস্তুজাতের উৎপত্তি-কারণ বা মূল চিচ্ছক্তি (Living principle) নহেন; তিনি তাহা হইলে সমষ্টি প্রকাশক শব্দমাত্র। ঈশ্বর সৃষ্টিমাত্রের পূর্ব্বভাব, পদার্থমাত্রের মূল-তত্ত্ব। গৌরবে ও মহিমায় তিনি অতুল। তবে একটী কথা এই যে, কাল সম্বন্ধে তাঁহার প্রাচীনত্ব কতদূর রক্ষা পাইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। ঈশ্বর কালের অধীন বা অতীত হউন, তাঁহাকে আমরা সর্ব্বব্যাপী (Pan) বলিয়া জানিব; কেননা সকলের মূলেই তাঁহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। কেহ কেহ বিশ্ব-বিকাশবাদের (Emanation theory) বিরুদ্ধে এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন যে, উহা-দ্বারা ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষে জগৎ হইতে অন্তর করাই হয়; ঈশ্বর এবং জগতের মাঝখানে যেন একটী প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। এ আপত্তের উত্তর এই যে, প্লোটিনাস প্রথমেই বলিয়াছেন, মূল এক অবিভাজ্য, উহা সংখ্যাবাচক এক নহে। তাঁহার মতে, ঈশ্বরের ধারণা করিতে হইলে, ঈশ্বরকে এক

অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সহিত তুলনা করা আবশ্যক। সূর্য্যের তাপ যেমন আপনা হইতে বিকীর্ণ হয়, হীরকখণ্ড হইতে আলোক-রশ্মি যেমন আপনা হইতে বিচ্ছুরিত হয়, ঈশ্বরের আত্মসত্তা বা আত্মশক্তি সেইরূপেই বিকাশলাভ করিতেছে। ঈশ্বর শক্তির এমন এক আধার, যাহাতে আধেয়ের স্থান হই-তেছে না, আধেয় প্রতিনিয়ত আধার হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনন্তপ্রবাহরূপে অনন্তমুখে ছুটিতেছে। এই সকল উপমার কথা বলিতে এবং শুনিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু উপমাগুলি মোটের উপর পার্থিব বস্তু হইতে গৃহীত। পার্থিব উপমায় কি অপার্থিবের ব্যাখ্যা হয়? অত-এব, বিশ্ববিকাশবাদ যতই সমীচীন হউক, উহাও একেবারে নির্ব্বিরোধ নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ন্যায় উহাও চিররহস্যমণ্ডিত।

প্লোটিনাসের মতে আদর্শগুলি দুই ভাগে বিভাজ্য; এক জাতি সম্বন্ধীয় আদর্শ এবং (২) শ্রেণীসম্বন্ধীয় আদর্শ। জাতিসম্বন্ধীয় বা জাতিবাচক আদর্শের অর্থে কেবলমাত্র সত্তা, সমত্ব ও বিসমত্ব, বিরাম ও গতি, পদার্থের এই কয়টী সাধারণ বা সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। শ্রেণীসম্বন্ধীয় বা শ্রেণীবাচক আদর্শ হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তুসমূহের স্বতন্ত্র আকার ও অবয়ব প্রতিপন্ন হয়। বস্তুমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম সত্তা, কিন্তু মানব বা পশু শব্দে যাহা বুঝা যায়, তাহা বস্তুমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম নহে। সাধারণ এবং বিশেষে যে সম্বন্ধ, জাতিবাচক এবং শ্রেণীবাচক আদর্শেও সেই সম্বন্ধ বিদ্যমান। শ্রেণীবাচক আদর্শসমূহ জাতিবাচকের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জ্ঞান হইতে শ্রেণীর জ্ঞান, শ্রেণীর জ্ঞান হইতে জাতির জ্ঞান এবং জাতির জ্ঞান হইতে সর্ব্বশেষ আদর্শ বিশ্বের জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় জগতে যে কোন দ্রব্য হউক, জ্ঞান জগতে (Intelligible world) তাহার অনুরূপ বস্তুর আকার বিদ্যমান। মূলে এই-রূপ আছে বলিয়াই দ্রব্যসমূহ এক একটী নির্দ্দিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যে বৃক্ষের বীজ, তাহাতে সেই বৃক্ষেরই উৎপত্তি সম্ভব, আম্রের বীজে তিন্তিড়ি জন্মে না। অশ্ব হইতেও মানবের উৎপত্তি অসম্ভব।

জাতিবাচক আদর্শ হইতে যেমন শ্রেণী-বাচক আদর্শগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, সক্রে-টিস, প্লেটো প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আদর্শও আবার তেমনি শ্রেণীবাচক আদর্শ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বিনা আদর্শে কিছুই উৎপন্ন হয় না। যতগুলি জীব, ততগুলি আদর্শ থাকা প্রয়োজন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, আদর্শের কি তবে সংখ্যা নাই? জীব যে অসংখ্য। প্লোটিনাস ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, জীবের যে সংখ্যা নাই, একথা কে বলে? সংখ্যা থাকাইত সম্ভব। জীবের সংখ্যা না থাকিলে বিশ্ব সম্পূর্ণ হইতে পারিত না। বিশ্ব ভগবানের সৃষ্টি অথবা বিশ্বই ভগবান বলিয়া, তাহাকে যখন অসম্পূর্ণ কল্পনা করা যায় না, তখন জীব যে অসংখ্য নহে, তাহাতে সন্দেহ কি? মানবের গণনায় জীবের সংখ্যা না হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের গণনায় নিশ্চয়ই সংখ্যা আছে। আর, প্রত্যেক আদর্শেরও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জীবের সৃষ্টি। জীবের ভিতর দিয়াই আদর্শের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

(২) আত্মা (Soul)—বুদ্ধি নিরপেক্ষ চৈতন্যে বা ঈশ্বরের অব্যবহিত সত্তা; এজন্য বুদ্ধি ঈশ্বরের ন্যায় ক্রিয়াত্মিকা হইলেও, তাহার উৎপাদনী শক্তি ঈশ্বরাপেক্ষা কম।

বুদ্ধি হইতে যে বিম্ব বা জ্যোতিঃ ক্ষরিত হইতেছে, তাহাতেই আত্মার উদ্ভব। আত্মার স্বভাবও বুদ্ধির অনুরূপ, তবে শক্তিতে তদপেক্ষা হীন। তাহার কারণ এই যে, আদর্শগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধির অধিগম্য, বুদ্ধি এবং আদর্শের মাঝে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান নাই। আত্মার পক্ষে আদর্শলাভ করিতে হইলে চেষ্টা এবং অনুসন্ধান আবশ্যক। সমাধি-বলে আত্মা আদর্শের স্তরে আরোহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু আদর্শকে পাওয়া তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন; অধিকাংশ স্থলে আদর্শের সামান্য ছায়া বা ধারণামাত্র লাভ করিয়াই নিবৃত্ত হইতে হয়। বুদ্ধির ন্যায় প্রত্যক্ষ-দর্শনশক্তি আত্মার স্বভাবজাত ধর্ম্ম নহে। বস্তুতত্ত্বলাভের জন্য আত্মাকে বিশ্লেষণ এবং বিচার প্রণালী গ্রহণ করিতে হয়।

আত্মা বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি যেমন ঈশ্বরের সহিত মিলন প্রয়াসী, আত্মারও সেইরূপ বুদ্ধির সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আত্মা ও বুদ্ধিতে প্রভেদ এই যে, বুদ্ধির যাহা স্বভাব, আত্মার তাহাতেই পরিণত হওয়া উদ্দেশ্য। একদিকে যেমন একই নিরপেক্ষ সত্তা; একই চৈতন্য এবং একটীমাত্র জ্ঞান-জগৎ সূচিত হইতেছে, অন্যদিকে আবার যাবতীয় মূলে একটীমাত্র বিশ্ব-জনীন আত্মা, জগতাত্মা বা পরমাত্মার কার্য্য অনুভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধি যেমন একপক্ষে ঈশ্বরানুধ্যানে নিমগ্ন আছেন, অথচ আত্মশক্তি প্রভাবে বিশ্বাত্মার সৃষ্টি করিতেছেন, আত্মাও তেমনি যোগবলে একদিকে আপনাতে আদর্শ সমূহের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন, অপরদিকে কর্ম্মশক্তি-বশে বিভিন্ন জীবদেহে সংক্রামিত হইতেছেন। বুদ্ধি এবং আত্মা, উভয়েরই দ্বিবিধ স্বভাব। দুইটী স্বভাবের একটী অন্তর্ম্মুখীন (চিন্তাপ্রবণ) অপরটী বহির্ম্মুখীন (কর্ম্মপ্রবণ)। উপরোক্ত ক্রিয়া হইতে এই দুই স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) দেহ (Body)—দেহ যদিও মূলাধার চৈতন্য বা নিরপেক্ষ এক হইতে বহুদূরে অবস্থিত, তথাপি দেহেও সেই নিরপেক্ষ একের সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বুদ্ধিতে যেমন বুদ্ধির আদর্শ সমূহ লীন থাকে, আত্মায় যেমন আত্মার সংস্কার সমূহ নিহিত থাকে, দেহেও তেমনি দেহের রূপ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইরূপই দেহের সংযোগসূত্র, অর্থাৎ রূপের দ্বারাই দেহ উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্তার ভিতর দিয়া সর্ব্বশেষ নিরপেক্ষ সত্তার সহিত সংযুক্ত। আদর্শের সহিত বুদ্ধির যে সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত রূপেরও সেই সম্বন্ধ। রূপ নিরপেক্ষ সত্তারই আভা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি। দেহে যদি নিত্য-বস্তু কিছু থাকে, তবে তাহা রূপ। দেহের যাহা উপাদান অংশ, তাহার পৃথক সত্তা নাই, রূপের অসদ্ভাব বা অন্ধতাই উপাদান, রূপই বিকাশপদ্ধতিক্রমে উপাদান ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সত্তার অসদ্ভাবে রূপের অসদ্ভাব এবং রূপের অভাবে উপাদান। বিকাশপদ্ধতি ক্রমে সত্তা-ভাবের হ্রাস হইতে হইতে সৃষ্টির এমন এক স্তর আসিয়াছে, যেখানে সাধারণতঃ সত্তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। জীবদেহসমূহ, একদিকে নিরপেক্ষ সত্তা, অপর দিকে কেবলমাত্র উপাদান, এই দুই সীমান্তের মধ্যে নানাবিধ নামে এবং নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। এই দুই সীমান্তের মধ্যে যাবতীয় পরিবর্ত্তন এবং যাবতীয় সৃষ্টি।

দেহ স্তরের পরবর্ত্তী স্তরই জড়নামে অভিহিত। এই স্তরটী যে কি, তাহা ঝাবু

কঠিন। ইহা যেন এক আদিহীন, অন্তহীন, পরিধিহীন অতলগর্ভ। প্লেটো ইহারই অসত্তা নাম দিয়াছিলেন। এই অতলের ভিতর দিয়াই জ্ঞান বা আদর্শ জগতের তেজঃপুঞ্জ স্ফুরিত হইতেছে। জড় স্বয়ং দেহ নহে, জড় এবং রূপের মিলনেই দেহের উৎপত্তি। জড়ের একমাত্র ধর্ম্ম এই যে, উহা বস্তু জগতের আশ্রয়স্বরূপ; দেহে যে জড়তার ভাব, সেই ভাবই জড়ের লক্ষণ, জড়ের রূপ বা অবয়ব কিছুই নিজস্ব নয়। রূপ মাত্রের কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর হইতেই রূপের আবির্ভাব হইয়াছে। ঈশ্বর এবং বুদ্ধি হইতে যাবতীয় শক্তি এবং জীবনের বিকাশ হয়; সুতরাং এই দুই বস্তুর বিপরীত গুণ সমূহ, অর্থাৎ জগতের যে কিছু অসার ভাগ, অক্ষমতা, দ্বৈতভাব, বহুত্ব অসংলগ্নতা, ব্যাপকত্ব, বৈনাদৃশ্য, কদর্য্যভাব, সমস্তই জড় হইতে উৎপন্ন। প্লোটিনাসের মতে এবং সাধারণতঃ হেলেনীয় দর্শনে একদিকে যেমন রূপ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য এবং মঙ্গল একার্থ-বোধক, অপরদিকে আবার তেমনি বহুত্ব, জড়তা, কদর্য্যতা এবং অমঙ্গলও একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

জড়ের কোন বিশিষ্ট সত্তা নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিয়া যেন মনে না করা হয় যে, প্লোটিনাস অসৎ (Evil) কিম্বা জড়ের (matter) অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। ধন না থাকা দারিদ্র্য নয়। ধনের যদি অভাবই বটে, তবে আর দারিদ্র্যের অর্থ থাকে না এবং দানের সার্থকতা নাই। যে অন্তহীন, পরিধিহীন আকাশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা একেবারে শূন্যগর্ভ নহে। উহা এমনই একটা কিছু, যাহার প্রকৃতি কল্পনা-বহির্ভূত হইলেও অস্তিত্ব রহিয়াছে। উহার প্রভাব কেবল মাত্র দেহের উপরে নয়, বুদ্ধি এবং আত্মাতেও বিদ্যমান। প্লোটিনাসের পক্ষে জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং ধনের অভাবকে দারিদ্র্য জ্ঞান করা, উভয়ই এক। একেবারে কিছু না থাকাকে জড় বলিলে, তাহার মানে হয় না। পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, দেহের সহিত মনের সাদৃশ্য যতই অস্পষ্ট হউক, এই সাদৃশ্যের এক মাত্র হেতু রূপ। আদর্শই দেহে পরিণত দেহ-বিশিষ্ট (Idea embodied) হয় বলিয়া এই সাদৃশ্য রক্ষা পায়। এই কথাই ফিরাইয়া বলিলে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, মন দেহাপেক্ষা যতই শ্রেষ্ঠ হউক, উহা দেহ ভাবের অধীন, অর্থাৎ একেবারে দেহভাব বর্জ্জিত বা অপার্থিব বস্তু নয়। মনেও জড় ভাব বিদ্যমান। মনের জড়াংশ গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় অন্তর্লীন অথচ জ্ঞেয় ভাবে অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ধারণা এবং প্রত্যেক সংস্কারের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিত। জড়ের অস্তিত্ব বা প্রভাব আছে বলিয়াই মন নিরপেক্ষসত্তা হইতে পৃথক কল্পিত হয়। এই প্রভাব না থাকিলে মন এবং নিরপেক্ষ-সত্তায় প্রভেদ থাকিত না। ঈশ্বরই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্তা, একমাত্র ঐক্য। যে অর্থে ঈশ্বরকে নিরপেক্ষ কল্পনা করা হয়, সে অর্থে বুদ্ধিরও নিরপেক্ষতা নাই। বুদ্ধিতেই দ্বৈত ভাবের প্রথম সূচনা এবং তাহারই ফলস্বরূপ বুদ্ধি সম্প্রসারিত হইয়া আদর্শ সমূহে পরিণত হইয়াছে। এই স্তরে যদিও আদর্শগুলি পরস্পর হইতে পৃথক (distinct), তথাপি একটী মাত্র প্রজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাহাদের উপলব্ধি হইতে পারে। আদর্শের এই পার্থক্য মনে আরও অতি মাত্রায় বিদ্যমান, তবে একেবারে গাছ পাথরের ন্যায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়। এমন ভাবে বিদ্যমান যে, কেহ কাহারও সহিত মিলিতও নহে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়াও

নাই। আদর্শগুলি যেন সকলে মিলিয়া একটী মাত্র বস্তু নয়, একের অধিক বস্তু, এইরূপ জ্ঞান মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছে। এই যে বহুত্ব বোধ, ইহা নিশ্চয়ই জড়ের কার্য্য। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, এই দ্বৈত জ্ঞান সৃষ্টির মূলেই বিদ্যমান ছিল, নতুবা বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের নিরপেক্ষ সত্তায় কিম্বা ঐক্যে প্রভেদ থাকিত না।

বুদ্ধির সহিত জড়ের এই যে সম্বন্ধ, ইহা একটী সমস্যা। এই সমস্যা বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জড়বাদিগণ জড়ের যেপ্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল এবং প্লোটিনাসের মতে জড়ের প্রকৃতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা শেলি এবং সপেঁনহর বর্ণিত ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি (will-to-be) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জড় স্বয়ং দেহ না হইয়াও দেহমাত্রের সম্ভবহেতু, নিখিল দেহভাবের মূল তত্ত্ব। ইহা ইন্দ্রিয়াগোচর এবং মনেরই ন্যায় অমূর্ত্ত। ইহার স্থান এত উচ্চে যে, মানব দূরে থাকুক, দেবতাদিগের নিকটও ইহা দুর্জ্ঞেয়। প্লোটিনাস এইজন্যই জড়ের আদর্শ কল্পনা করেন নাই। যদিও আমরা "এটি নয় ওটি" "ইহা নয়, উহা" (নেদম্ নেদমিতি) ইত্যাদি পার্থক্য জ্ঞানে জড়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি, তথাপি ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়ীভূত, বুদ্ধিতে যাহার পরিচয় পাওয় যায়, তাহাই যদি 'জ্ঞেয়' হয়, তবে জড়ের অস্তিত্ব সে গণ্ডীর মধ্যে আসে না। তাহার কারণ, উহা সর্ব্বপ্রকার রূপ, সীমাবন্ধন এবং সম্যগবধারণের অতীত। অন্ধকারকে দেখিতে চেষ্টা করা, আর জড়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া, একই কথা। অন্ধকারকে দেখা আর কিছুই না দেখা, যেমন এক, জড়ের ধারণা করা আর কিছুরই ধারণা না করাও সেইরূপ এক।

তবে কি জড় দ্বিতীয় সত্তা? প্লোটিনাসকে সময় সময় গোঁড়া দ্বৈতবাদী বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্ত সহজ, কিন্তু এই অভিযোগের বিরুদ্ধেও বলা যাইতে পারে যে, কোন অধ্যাত্মবাদী ই একসঙ্গে দুইটী নিরপেক্ষ সত্তার কল্পনা করিতে পারেন না। এই জন্য প্লোটিনাস প্রথম উপাদান এবং প্রথম রূপ যে একই পদার্থ, অ্যারিষ্টটলের এই উক্তি স্মরণ করিয়া জড়কে জ্ঞানাতীত বা অচিন্ত্য (supra-intelligent) আখ্যা দিয়াছেন। 'সুপ্র-ইণ্টেলিজেণ্ট' শব্দ একমাত্র ঈশ্বরেই প্রযুজ্য। অতএব জড়ের অর্থে তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহা দেহ এবং দ্রব্য মাত্রের আদি কারণ (First cause) রূপে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন (identical)। প্লেটো-প্রবর্ত্তিত আদর্শবাদে যে জড় কেবল মাত্র অনন্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছিল, অ্যারিষ্টটলের অনুকরণে তাহাই পরিশেষে প্লোটিনাস কর্ত্তৃক অনন্ত সামর্থ্য, অনন্ত উৎপাদনশীলতা, এমন কি, ঈশ্বরের ক্রিয়াত্মিকা শক্তিতেই পরিণত হইল। শক্তির চরমাদর্শই সামর্থ্যের (potentiality) চরমাদর্শ। কেমন করিয়া হইল, বলা যায় না। কিরূপে পরম ঐক্য হইতে বহুর বিকাশ হইল, তাহাও মানব বুদ্ধির অগম্য। বিকাশপদ্ধতি বা সৃষ্টি প্রকরণের তাহা হইলে মূল ব্যাখ্যা কি? সেই একই সমস্যা। *

* Light must, in the end, at the furthest distance from its origin, become darkness: the spirit must become matter; the soul must create the corporeal as its loca-

৩। নীতিবিজ্ঞান (Ethics.)।

আত্মা বুদ্ধি এবং দেহ, উভয় স্তরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া তাহাতে উভয়েরই প্রভাব বিদ্যমান। আত্মা বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। জগতের যাবতীয় শক্তি ও গুণ আত্মায় সম্মিলিত হইয়াছে। ন্যায়ের দুর্লঙ্ঘ্য শাসন যেমন জ্ঞানজগতের বিশেষত্ব, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য শাসনও সেইরূপ স্থূল জগতের বিশেষত্ব। আত্মার বিশেষত্ব এই যে, আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বর্ত্তমান। আত্মা বুদ্ধি এবং দেহ, উভয়ের আকর্ষণেই আকৃষ্ট হয়। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে আত্মা যেমন পরমার্থজ্ঞান লাভ করে, অবনতির পথে চলিতে চলিতে সেইরূপ আবার উহা দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। এই উর্দ্ধগতি এবং অধোগতির ফলে তিনপ্রকার আত্মার উদ্ভব হইয়াছে। ১মতঃ, দেবাত্মাসমূহ। পবিত্রজ্ঞানলাভ এবং ঈশ্বরের সহিত মিলনই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য; ২য়তঃ, প্রেতাত্মাসমূহ। ইহাদিগের ভিতর সদসৎ উভয় গুণই বিদ্যমান, এবং মন ও দেহ, অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যেই ইহাদের গতিবিধি; ৩য়তঃ, জীবাত্মাসমূহ। ইহাদের আশ্রয় জড়দেহ। দেবাত্মাসমূহ বিশ্বাত্মার মতই নিত্যসুখনিরত; নির্লিপ্ততা (apathy) ঈশ্বরাদেশপালন এবং নিরপেক্ষ সত্যস্বরূপের ধ্যানই তাহাদের সুখ। তাহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়, এবং পার্থিব সম্পর্কশূন্য, পূর্ণ এবং পরিবর্ত্তন রহিত; এজন্য তাহাদের স্মৃতি কিম্বা ভবিষ্যৎজ্ঞান, আশা কিম্বা অনুতাপ, কিছুই থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তন না থাকিলে ভাবান্তর আসিবে কেন? মানবাত্মার ন্যায় তাহাদের আত্মাবধারণ-যোগ্যতা নাই অর্থাৎ তাহারা স্বকীয় অস্তিত্ব অবগত নয়। তাহারা আদর্শানুধ্যান বা পরমার্থ চিন্তায় সতত নিমগ্ন। আত্মজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ 'আমি-তুমি' ভাব না থাকায় যে বিমলানন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দেই তাহারা বিভোর রহিয়াছে।

মানবাত্মা যে পূর্ব্বাপর পার্থিব দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ, তাহা নহে। প্রথমে ইহারাও দেবাত্মার ন্যায় একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বই অবগত ছিল; পরে, অহংজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে ক্রমান্বয়ে অনন্তজীবন-সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বার্থান্ধ ব্যক্তিসমূহে পরিণত হয়। আত্মার জড়দেহ প্রাপ্তি, পতন বা অবনতির ফল, এবং বর্ত্তমান জীবনে আমরা যে সকল দুঃখভোগ করি, সেই সকল দুঃখই তাহার উপযুক্ত শাস্তি। জীবদেহ ধারণ প্রথমে আত্মার ইচ্ছাধীন ছিল, ইচ্ছা করিয়াই আত্মা এই কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ এই ইচ্ছা আত্মাতেই বিলুপ্ত ছিল, কোন বহিঃশক্তি কর্ত্তৃক সঞ্জাত হয় নাই। কিন্তু বাসনা যখন একবার কার্য্যে পরিণত হইল, তখন হইতেই আত্মা স্বাধীনতা হারাইয়াছে। তখন হইতেই তাহার ক্রিয়া প্রকৃতির অধীন হইল। একপক্ষে মানবমাত্রেই যেমন আপনাপন অদৃষ্টের (Fate) কর্ত্তা (author), পক্ষান্তরে তাহার অদৃষ্টও আবার ব্যক্তিগত চরিত্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সত্য বটে অদৃষ্ট সম্বন্ধে আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এখন আমরা যে যে পথের পথিক, মূলে সে সেই পথই গ্রহণ করিয়াছিল; কেন না, সেই পথ ভিন্ন অন্য পথের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষাই ছিল না।

lity. But as the soul illuminates and forms that which is beneath it, it enters into relation with it.—Zeller's Outlines of Greek Philosophy. (P. 334.)

জীবদেহ ধারণ যদি আত্মার পতনের কারণ এবং দুঃখভোগ তাহার উপযুক্ত শাস্তি হয়, তবে কি জীবের মুক্তি নাই? দুঃখ-ভোগই কি জীবনের এবং সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য? প্লোটিনাস সাধারণ নৈরাশ্যবাদীর ন্যায় সৃষ্টিকে অত্যন্ত দুঃখের কারণ স্বরূপ গণ্য করেন নাই। আত্মার জীবদেহ ধারণ (in-carnation) আপেক্ষিক হিসাবে দুঃখজনক, চিরদুঃখের হেতু নয়। কেন না, একদিকে যেমন আত্মার অধোগতি হইতেছে, অন্যদিকে আবার তেমনি ঊর্দ্ধগতিরও উপায় রহিয়াছে। জড়কে উন্নতির পথে চালনা করাই আত্মার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত আত্মা মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া দেহভাব ধারণ করে। দেহবিশিষ্ট হয় বলিয়াই মর-জগৎ সম্বন্ধে আত্মার অভিজ্ঞতা জন্মে, আত্ম-শক্তি বিস্তারের সুবিধা ঘটে। উপাদানের অভাবে যে শক্তি নির্লিপ্ত ছিল, তাহাই জড়ে সংক্রমিত হওয়ায় নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। অধিকন্তু, দেহে আবদ্ধ থাকিলেও আত্মার স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় না, দেহরূপ জড়-পিণ্ড হইতে আত্মার পার্থক্য স্পষ্টই অনুভূত হয়। অভ্রভেদী অলিম্পাসের ন্যায় মানবাত্মা ঊর্দ্ধাভিমুখে অনন্ত প্রস্থিত, প্রশান্ত-গম্ভীর, নিম্নাভিমুখে বাত্যাবিক্ষুব্ধ এবং নিত্য চঞ্চল। দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয় না এবং দেহ বিচ্যুত হইয়া আত্মা বুদ্ধিমার্গে অনন্তে প্রস্থান করে।

প্লোটিনাসের নীতি-প্রণালীর আলোচনা করিলে প্লেটো এবং ষ্টোয়িক মতের কথা মনে পড়ে। আত্মার বিশুদ্ধি এবং ঈশ্বরে বিলীন হওয়াই মানব-জীবনের চরমোদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনটি পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা (১) সঙ্গীত (কলাবিদ্যা) (২) প্রেম এবং (৩) তত্ত্বজ্ঞান। এই তিন পথকে এক পথেরই তিন শাখা বলা যায়। শিল্পী বহিঃপ্রকৃতি হইতেই স্বীয় আদর্শ বাছিয়া লয়। প্রেমিকের আদর্শ মানবাত্মায় বিকাশ লাভ করে, আর জ্ঞানজগতে ঈশ্বরই দার্শনিকের আদর্শ। এই তিন আদর্শ এক হইলেও যিনি একবার ধ্যানলব্ধ পরমানন্দ-সুধা পান করিয়াছেন, তিনি আর প্রেম এবং সঙ্গীত বা শিল্পের আদর্শে তৃপ্ত হন না। রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্য-বিমুগ্ধ পথিক যেমন স্বয়ং প্রাসাদস্বামীকে পাইলে প্রাসাদ-সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হয়, সেইরূপ যিনি একবার আনন্দ-নিলয়ে পৌঁছিয়া স্বয়ং আনন্দ-ময়ের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি আর অপর কোন আনন্দেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। দার্শনিক অর্থাৎ যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার কাছে পার্থিব কোন সৌন্দর্য্যেরই মূল্য নাই। তিনি এমন এক অব্যক্ত আনন্দে বিভোর থাকেন যে, সেই সুখের জন্য তিনি ধন-জন-যৌবন-জনিত সর্ব্ব-সুখ বিসর্জ্জন দিতে, এমন কি নিজের এবং জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত। এই আনন্দ হইতে যে আবেশের উদয় হয়, তাহাই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগসূত্র। ইহাই পরমার্থ দর্শন এবং বর্ত্তমান জীবনে এই দর্শন কদাচিৎ লাভ হইলেও ভাবী-জীবনে ইহাতেই স্থায়ী দর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়। দেহের অবসানেই যে জীবন এবং আত্মার উন্নতি হয়, তাহা নহে। নিরন্তর দর্শনা-লোচনার ফলে বর্ত্তমান জীবনে আত্মার যে বিশুদ্ধি ঘটে, সেই বিশুদ্ধি দেহান্তে আত্মার সহিত পরজীবনেও সংক্রমিত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে আত্মবিশুদ্ধি হইতে হইতে আত্মার ব্যক্তিত্বভাব কাটিয়া গেলে আত্মা পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়-চৌধুরী।

কবিপূজা।

(ঐতিহাসিক মহাকাব্য পৃথ্বীরাজ প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের শুভ সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে)—

শুভক্ষণে বসি মা'র কোলে
এলে তুমি, তনয় রতন!
আরো শুভক্ষণে বীণাপাণি
তব পূজা করিলা গ্রহণ;
ভক্ত, তুমি—হৃদিরক্ত মাখি
পুষ্পাঞ্জলি দিলে শ্রীচরণে,
সাদরে তা' স্বদেশ জননী
তুলি নিলা সস্মিত আননে।
সেই যে অমর কবিবর
বিশ্বপূজ্য শ্রীমধুসূদন,
তুমি আঁকি চারুচিত্র তাঁর,
মাতৃকোলে করিলে স্থাপন;
অমনি মা' মরমে-মরমে
দিলা তোমা শুভ-আশীর্ব্বাদ,
"লহ বাছা! লহ অমরতা,
পূর্ণ হোক পরাণের সাধ"।
সেই বরে—পূতশুভ্র ফুলে,
বিরচিলে নব নব মালা,
সুপ্রতিভা দিলা বিকাশিয়া,
কল্পনা কল্যাণী দেববালা।

(২)

আজি তুমি বাণীর-মন্দিরে
প্রবেশিলে লয়ে পৃথ্বীরাজ,
ভারতের সে লুপ্ত গৌরব,
সুপ্তচিতে করিছে বিরাজ!
শুনি যেন, রণক্ষেত্র মাঝে
সে ভীষণ আয়ুধ নিঃস্বন,
দেখি, বুঝি মহাপরাক্রমে
বীর-বৃন্দ পাতিছে শয়ন!
যেন সেই মহা ভয়ঙ্করী
রক্তগঙ্গা ছুটিছে কল্লোলি,
সে বরেণ্য বীর্য্যের গৌরব
ছুটিতেছে সমীরে হিল্লোলি!
কভু দেখি শৌর্য্যবতী সতী
সংযুক্তা, সাজায়ে বীরপতি,
প্রাণ সহ প্রেরণিছে তাঁরে
দেব-পদে দিয়া শত নতি।
কোথা বা—কণোজ-জম্বুপতি
দেশ-দ্রোহী, জাতিদ্রোহী নীচ,
আমন্ত্রি সে দুরন্ত যবনে
বপনিছে বিষবৃক্ষ বীজ!
শেষে দেখি—পৃথ্বীরাজ সহ
অস্ত যায় ভারতের রবি,
অলক্ষ্যে নয়নে অশ্রু ঝরে,
মনে হয় ধন্য বটে কবি!

(৩)

তাই তব শুভ সংবর্দ্ধনা—
জননীর এ অভিনন্দন—
গুণমুগ্ধ ভাই বোন মিলি,
প্রদানিছে পুলকিত মন।
আমাদের পূজ্য সহোদর—
আমাদের জননীর ছেলে—
আমরা লভিনু এ গৌরব,
আনন্দ অমৃত পড়ে ঢেলে!
বিধাতা করুন চিরজীবী
বাণী দিন্ অজেয়া শকতি
যশঃ থাক্ রবি শশী সহ,
মোরা দিই অচলা ভকতি।
বিভূষিলে মাতৃভাষা দেহ
তাই তুমি এ কবিভূষণ,
কি আকাঙ্খা মা'র, তোমা কাছে,
সেইটুকু করিও স্মরণ।

শ্রীবীরকুমার বধ রচয়িত্রী।

ধর্ম্মজীবন।

(গ্রন্থ পরিচয়)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু [Lt. Col. D. Basu, I. M. S. (Retired)] মহাশয়ের প্রণীত "ধর্ম্ম-জীবন এর মত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অধিক নাই। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগ," পূজ্যপাদ স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'জ্ঞান ওকর্ম্ম' প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গ সন্তানের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার সহায়ক যে কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গভাষায় আছে, ডাক্তার বসু মহাশয়ের "ধর্ম্ম-জীবন"ও সেই শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতা, অধিকার, কর্ত্তব্য ও আশা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে কেবল আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া এবং নিজের মনীষা ও মনস্বিতার পরিচয় দিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি সেই সকল বিষয়ে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশ বচন ও পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষী মহাত্মাগণের অভিমত সঙ্কলন করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যুত আত্মা, মৃত্যু, পরলোকাদি মানবজীবনের চিরন্তন প্রহেলিকা উদ্ঘাটনের সহায়ক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ঋষি মনীষিগণের উক্তির এরূপ বিরাট ও সুনির্ব্বাচিত সঙ্কলন আর কোনও পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সে হিসাবে "ধর্ম্মজীবন" বঙ্গসাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পরন্তু এই পরকীয় অভিমত বিবৃতির মধ্যে গ্রন্থকারের স্বকীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই প্রত্যুত তাঁহার চিন্তাশীলতা আধ্যাত্মিকতা ও অপরাপর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব গ্রন্থের পত্রে পত্রে দেদীপ্যমান। গ্রন্থকার উপদেষ্টার উচ্চ আসন হইতে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। পাঠকের সহযাত্রীভাবেই গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—তবে জীবনমার্গে বিচরণ কর্ম্মে অক্ষম ও আতুরগণকে সহযাত্রী হইতে আহ্বান করিয়া তিনি যে পথপ্রদর্শকের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই একথা বলিতে পারি না। সুতরাং সেই দুরূহ কর্ম্ম গ্রহণ করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে—তিনি কতদূর যোগ্য—এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। গ্রন্থকার একজন কৃতবিদ্য, কৃতী ও স্বনাম ধন্য পুরুষ—যাঁহাদের তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আছে, তাঁহাদের মনে এরূপ সংশয়সূচক প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কিন্তু তিনি বহুবর্ষ হইতে জন কোলাহলের বহির্দ্দেশে খ্যাতি অখ্যাতির অতীত ভাবে, এক প্রকার নিভৃত বাস করিতেছেন—নবীন পাঠকেরা হয়ত তাঁহাকে ভালরূপ জানেন না। তাঁহাদের অবগতির জন্য, গ্রন্থের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, গ্রন্থকারের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

বলা বাহুল্য গ্রন্থকার প্রবীণ—তাঁহার বয়স এক্ষণে ৬৫ বৎসর। তিনি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ হইতে ১৮৭৩খ্রীঃ ডাক্তারী পাশ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। বাল্য বয়সেই তিনি পিতৃহীন হয়েন এবং তাঁহার সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। সেরূপ স্থলে বিলাতে গিয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা সুসম্পন্ন

করিবার আশা অপরের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, তখন বিলাত যাইলে জাতি যাইত এবং তৎকালে বিলাতে পড়িবার উপযোগী সরকারী স্কলার্শিপের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ডাক্তার বসু নিজের পুরুষকারে ও ভাগ্য বিধাতার সহায়ে সেই বাধা অতিক্রম করেন। তিনি ১৮৭৭খ্রীঃ বিলাত হইতে আই, এম্, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। এবং পঁচিশ বর্ষকাল বঙ্গদেশের নানাস্থানে সিবিল সার্জ্জনের কর্ম্মে, সার্থক চিকিৎসকের সমুচ্চ খ্যাতি ও মনুষ্যত্বের দুর্লভতর সুনাম সর্ব্বত্র অর্জ্জন করিয়া লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেলের পদমান্যে উন্নীত হইয়া তিনি ১৯০২ খ্রীঃ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালে অভিজ্ঞতায় ও সুযশে ভূষিত ডাক্তার বসু মহাশয় যদি কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে চিকিৎসকের ব্যবসায় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি চিকিৎসক সমাজে শীর্ষ স্থান লাভ করিয়া হয়ত ধনকুবের হইতে পারিতেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে সেই পরামর্শই দিয়াছিলেন। কিন্তু ধনের ও যশোলিপ্সার প্রবল প্রলোভন দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি বীরভূমে নিভৃত বাসে গমন করিলেন। ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি অপেক্ষা ধর্ম্মচিন্তা ও আত্মোন্নতিই প্রার্থনীয় বলিয়া তিনি বরণ করিয়া লইয়া আজ পনর বৎসর কাল সেই নিভৃত জীবন যাপন করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জন বিয়োগজনিত বহু শোক তাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহার স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইয়াছে—কিন্তু এসকল সংসারিক কঠোর পরীক্ষায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গতি বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি অধ্যয়নে ও ধর্ম্ম চিন্তায়, সংসারের মধ্যে যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত ভাবে শান্তিময় জীবনযাপন করিতেছেন। তিনি যখন রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়েই তিনি তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি "স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব" নামে যে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন কোনও পরবর্ত্তী লেখক এখনও সে গ্রন্থের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই। সেই গ্রন্থে যেমন তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও গবেষণার এবং নিজের বহু দর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ আছে, আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে ও তেমনি তাঁহার সাধারণ সাহিত্য কাব্য ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে বিশেষতঃ ধর্ম্ম গ্রন্থ চর্চ্চার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তাশীল গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন, তাহার উপর আর কোনও কথা বলিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না; শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন "ইহাতে আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির যে পরিচয় পাইতেছি, তাহা অতীব স্পৃহনীয়, অধিক কি, পাঠ করিয়া আমি নিজে আপনাকে বিশেষ উপকৃত মনে করিতেছি। অনেক স্থলে আমার ধর্ম্মভাবকে জাগাইয়াছে। অধিক আর কি বলিব? আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিবেন।"

তাহার পর গ্রন্থকারের চরিত্র গৌরব। তাহার মত মিষ্টভাষী অমায়িক সদয় স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্যে অটল উন্নত চরিত্রের আদর্শ পুরুষ বিলাত ফেরত সমাজে আর কে আছেন তাহা জানি না। তিনি যে কত বিনয়ী তাহার পরিচয় এই গ্রন্থেই জাজ্বল্যমান। গ্রন্থকারের স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ে নূতন কিছু না বলিয়া, বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে "দর্শক" পত্রে "তর্পণ" ও

"বন্দনা" নামে বঙ্গদেশের বরেণ্য মহাত্মাগণের উদ্দেশে, ধারাবাহিক ভাবে যে এক একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতার ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী দিয়াছিলাম, তাহা হইতে "লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল ধর্ম্মদাস বসু" শীর্ষক সনেটটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"তোমার জীবন কথা শিক্ষার বিষয়,
অনাথ, বিপন্ন দুস্থ গৃহস্থ-সন্তান,
শত বাধা লঙ্ঘি,স্বীয় উন্নতি সোপান
নিজে গাঁথি তুমি আজ পূজ্য দেশময়।
ব্রহ্মে মতি, লক্ষ্যে-স্থির, কর্ত্তব্যে নির্ভয়,
ফলাফল নাহি ভাবি হয়ে আগুয়ান,
জীবনের ব্রত তুমি করি সমাধান,
শিক্ষার্থীরে দেখায়েছ আদর্শ অক্ষয়।
বিনয়ী, চরিত্রবান,ধীর ধর্ম্মপ্রাণ
স্নেহে সুকোমল, দৃঢ় কর্ত্তব্যের কাজে,
সহিষ্ণু, নির্লোভ, সুধী, সত্যে নিষ্ঠাবান,
বিলাতে শিক্ষিত কৃতী বাঙ্গালীর মাঝে
শাল তরু সম তুমি উচ্চ সারবান,
জ্ঞানে, মানে, গুণে পূজ্য ভিষক্ সমাজে।

এরূপ গুণী জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মার উপদেশ বচন যে সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম যে কি তাহা আপনার মনে চিন্তা করিতে যাইয়া দেখি বিষয়টী অতিশয় গুরুতর ও উহাতে অনেক মত ভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন যুগের মত পৃথক দেখিয়া বিস্মিত হই। এই সময়ে মহাত্মা মেনজিসের (Menzis) "History of Religion," মোক্ষমূলারের "Natural Religion" জ্যাষ্ট্রোর (Jastrow) study of Religion," মার্টিনোর (Martineau)" study of Religion, কার্পেণ্টারের (Carpenter) "Permanent Elements of Religion" কেয়ার্ডের (Caird) "Philosophy of Religion" ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করি। * * * ক্রমে ধর্ম্ম বিশ্বাস ও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার হেতু এই দুইটী বিষয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা জ্যাষ্ট্রোর "Study of Religious" মহামতি মার্টিনোর "Study of Religion" আপটনের (Upton) "Basis of Religious Belief" ব্যালফোরের (Balfour) "Foundations of Belief" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হই। বলা বাহুল্য যে সকল সময়েই উপনিষৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও গীতা সম্মুখে উপস্থিত ছিল। * * *

পরিশেষে মানবের পার্থিব জীবন শেষ হইলে মৃত্যুর সময় ও তৎপরে কি হয় সেই বিষয়টী জানিতে উৎসুক হই। এই বিষয় আলোচনা করিবার সময় * * কঠোপনিষৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, মহর্ষির ব্যাখ্যান, বাইবেল গ্রন্থ, কোরানের ইংরাজী অনুবাদ, Grother's "Endless Life", James' "Human Immortality", Osler's "Science of Immortality" Uptons Basis of Religious Belief" পার্কারের উপদেশাবলী, Martineau's "Endeavours after Christian Life ও তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "Philosophy of Brahmoism" ইত্যাদি অনেক পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি ও সেই সেই সমুদয় মহাত্মাগণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। মৃত্যু পরলোক ও পর জীবন ইত্যাদি বিষয়টী লিখিবার সময় পারিবারিক যে

সমুদয় ঘটনা ঘটে ও শোক সন্তাপের কারণ হয় তাহা হইতেও কতক পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করি। মৃত্যুর দ্বারা প্রিয় আত্মীয়গণের হইতে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইব না, ইহলোক ও পরলোক একই জীবন চলিতে থাকিবে, উন্নত হইতে উন্নততর জীবন লাভ হইবে, ইহাই বুঝিয়াছি। যাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন যে পবিত্র প্রেমের বিনাশ নাই তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সহিত স্মরণ করি। * *

আমার মত লোকে রুগ্ন শরীর ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া যে ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে লিখিয়া উঠিতে পারিবে অনেক সময়ে সে বিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছিল; তবু ভগবানের প্রসাদে এখনও জীবন ধারণ করিতেছি, তাই সেই ভগবানেরই নাম প্রচার করিতে চেষ্টান্বিত থাকিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট এই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি। অনেক দিন অবধিই এই দুইটী মত অবলম্বন করিয়াই জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি।

"Let us then be up and doing
With a heart for any fate,
Still achieving still pursuing
Learn to labour and to wait."
"Let us in life and death
Boldly Thy truth declare
And publish with our latest breath
Thy love and guard in care."

"এক্ষণে এ জীবনের দিনগুলি ও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা ছিল তাহা আর হইল না। সর্ব্ব মঙ্গলময় বিধাতার প্রসাদে যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল সেজন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করি—তিনি আশীর্ব্বাদ করুন এই পুস্তক যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইল যেন সে উদ্দেশ্য সাধন করে ধর্ম্মোৎসাহী বন্ধুগণের ধর্ম্মজীবনের সহায়তা করে। ইহা যদি কাহার ও হৃদয়ের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হয়, যদি কাহারও বিশ্বাস বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

আমাদের আশা আছে এই গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসু গণের মনের বহু সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারিবে, এবং জন্ম হইতে মরণাবধি সংশয় যাত্রার বন্ধুর পথ, অনেক শ্রান্ত ও দিকভ্রান্ত পথিকের পক্ষে, এই গ্রন্থ, সুগম করিয়া দিবে—সহৃদয় গ্রন্থকারের শ্রম ও শুভ কামনা সার্থক হইবে।

গ্রন্থের দ্বাদশটী অধ্যায়ে যে কয়টী বিষয়ের আলোচনা আছে সে গুলির উল্লেখ করিলেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। বিষয় কথাটী ক্রমান্বয়ে এই :— (১) মানব জীবন, (২) ধর্ম্ম জীবন, (৩) ধর্ম্ম, (৪) ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও স্থায়িত্ব, (৫) ধর্ম্মের উপকারিতা ও প্রাধান্য, (৬) বিশ্বাস, (৭) ধর্ম্ম-বিশ্বাস, (৮) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের হেতু, (৯) ঈশ্বরের-স্বরূপ, (১০) উপাসনা, (১১) আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মান্দ্য, (১২) মৃত্যু—আত্মার অমরত্ব বা পর জন্ম।

এক্ষণে গ্রন্থকার উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া কিরূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মানব জীবনের সহিত অপরাপর প্রাণীর জীবনের প্রভেদ কোথায়? মানব জীবনের বিশেষ অধিকার কি? এই সকল প্রশ্নের

আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন এই যে, আমরা উন্নতিশীল জীব, আমাদের যে জ্ঞান তাহার ক্রম বিকাশ হয়। আমরা যে বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, প্রাচীনকালের ঘটনা অবগত হইয়া ভবিষ্যতের উপযোগী উপায় অবলম্বন করিতে পারি। ইতর প্রাণীদের জীবনে এই দুইটী লক্ষণ দেখা যায় না। মানব জীবনের বিশেষ অধিকার ধর্ম্ম-ভাব। "মানুষ নিজের হীনতা বুঝিতে পারে এবং আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উন্নত, সর্ব্বগুণ-সমন্বিত, সর্ব্বশক্তিমান এক পরম পুরুষকে জানিতে পারে" এবং তাঁহার শক্তির ও মঙ্গলময় ভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে। মানব যখন শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া, বিপদের সময় অনন্যোপায় হইয়া, তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন মৃত্যু আর তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না, এ জীবন ও পর জীবন কেবল অবস্থান্তর, ইহাই মনে হয়। ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠতা। এই ধর্ম্মভাবপূর্ণ জীবনই প্রকৃত মানব জীবন। মানব জীবন ও পাশব জীবনের প্রভেদ এইখানেই।

ধর্ম্ম জীবনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার প্রথমে "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে তাহাই বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মূল ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, মানব নিজের হীনতা বুঝিয়া এক বা ততোধিক উন্নত জীবের শক্তিতে বা সদ্‌গুণে বিশ্বাস স্থাপন করে; তাঁহার নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করে এবং আশান্বিত হইয়া তাঁহাতে নির্ভর করে। এই যে ধর্ম্ম, উহা কেবল জ্ঞানের কার্য্য নহে, উহা কেবল বুদ্ধি সিদ্ধ নহে। জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা যাহা বোধ গম্য হয়, বিশ্বাসের সহিত তাহাকে কার্য্যে পরিণত না করিলে উহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। * * সুতরাং ধর্ম্মের এক-দিকে বিশ্বাস, অপরদিকে পূজা উপাসনা, বা সেবা এতদুভয়ই থাকা আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গই নির্ভরশীলতা। * * সংক্ষেপে বলিলে নিজের অভাববোধে অন্য কোনও উন্নতশ্রেণীর জীবের শরণাপন্ন হওয়াই ধর্ম্ম।" "ধর্ম্মটী ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ধৃ ধাতুর এক অর্থ পোষণ করা; অতএব ধর্ম্মের অর্থ যাহা মানুষকে মানবাত্মাকে পোষণ করে।"

পরে "জীবন" কাহাকে বলে তাহার আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন যে শক্তির প্রভাবে জীবগণ জড় হইতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত, সেই শক্তির কার্য্য প্রকরণের পরে জীবন। শেষে তিনি বলিয়াছেন, "যাহা মানবাত্মাকে ঈশ্বরে সংলগ্ন করিয়া চিরদিন পোষণ করে, উন্নত করে ও ক্রমে তাঁহার সহিত সম্মিলিত করে, তাহাই ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা একটী শক্তি, এবং সেই শক্তি মানব-জীবনে কার্য্য করিতে থাকিলে সেই জীবনকে "ধর্ম্মজীবন" বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ ধর্ম্মভাবের বিকাশ ও নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "মানবাত্মাকে পরমেশ্বরের সহিত উপযুক্ত করিতে হইলে মানবকে ক্রমে, দেব-ভাব লাভ করিতে হয়। মানবাত্মাতেই সেই দেবভাবের বীজ নিহিত আছে। * * * মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্তপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অনেক সাধারণ ঘটনা হইতে ঐ জীবনের আরম্ভ হয়।"

ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহুগ্রন্থের মতামত বিশ্লেষণ ও অনুশীলন

করিয়া শেষে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "ব্রহ্মকে জানাই ধর্ম্ম। তুমি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হও, তাহাতেই সমস্ত অভাব দূর হইবে। সেই একই জ্ঞানে আমরা আত্মাকে জ্ঞাত হই ও আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হই; তিনি অজ্ঞেয় হইয়াও জ্ঞাত হয়েন। ইহাতেই মুক্তি, ইহাতেই শান্তি, ইহাতেই পরমানন্দ।"

ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "মানুষের সঙ্কীর্ণ দেহের মধ্যে যে আত্মা বাস করে, সেই আত্মাতে এক পূর্ণ পুরুষের স্বরূপের আভাস দেওয়া হইয়াছে, এবং মানবাত্মা সেই আদর্শকে জানিতে চায়।" "ধর্ম্মভাব মানুষের অন্তরতম স্থানে নিহিত আছে এবং সেই ভাবকে উপেক্ষা করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া বা অতিক্রম করিয়া মানুষ-জীবনধারণ করিতে পারে না।" "যদি মানুষের প্রকৃতিতে ঐ ভাব না থাকিত, "ধর্ম্ম কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারিত না।" এই যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইহা অতি প্রবল; ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে চলিবার জন্য মানুষ যত প্রকার ও যত পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, তেমন আর কোনও কারণে করে না।"

"ধর্ম্মের উপকারিতা ও প্রাধান্যের" কথা বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দেয় ও শাসন করে।" ধর্ম্ম আমাদিগকে যে আশা দেয়, তাহাতেই জীবনের ভার অনেক লাঘব হয়। ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, আশা দেয় যে এখানে যাহা সম্পূর্ণ রহিল, পরলোকে, পরজীবনে তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। সংস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ বিধাতার রাজ্যে অন্যায় ও অসংলগ্ন কিছুই থাকিতে পারে না।" পক্ষান্তরে ধর্ম্ম আমাদিগকে নানা প্রকার বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া আপনার শাসনাধীন করে, ধর্ম্মের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দণ্ড পাইতে হয়।" "সম্পদের সময় ধর্ম্মই আমাদিগকে প্রকৃতরূপে সুখী করে, নির্ম্মল আনন্দ বিতরণ করে।" "দুঃসময়ে ধর্ম্ম আমাদিগকে সৎসাহস দিয়া দুঃসহ ভার বহন করিতে সক্ষম করে। বিপদ আসিলে আমাদিগকে আরও অধিক পরিমাণে সেই পরমাত্মার সান্নিধ্য অনুভব করিতে সক্ষম করে।" "বিশ্বাস" কি তাহা বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "একটী বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে সত্য বলিয়া জানিতে পারি না, অথচ আমাদের মনে ধারণা হইতেছে যে, উহা সত্য। এই অবস্থাকে জ্ঞাপন করিতে হইলে বিশ্বাস শব্দ ব্যবহার করা হয়।" "আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশ্বাস করিতে হয়, বিশ্বাস-বিহীন হইয়া আমরা এ সংসারে বাস করিতে পারি না। ঐরূপ বিশ্বাস করা আমাদের মানবজাতির প্রকৃতিগত, বরং অবিশ্বাসী হওয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধ।"

"ধর্ম্মবিশ্বাসের" উৎপত্তি বিষয়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আমি আছি অথচ কিছুই আমার নহে। আমার অভাব আছে, তাহা আমি পূরণ করিতে পারিনা। এমন একজন আছেন, যিনি সেই অভাব দূর করিতে পারেন, আমি তাঁহার শরণাগন্ন হইলে তিনি আমার অভাব মোচন করিবেন, অতএব তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভর করি। এই প্রকারে ধর্ম্ম বিশ্বাসের উৎপত্তি।"

"ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের হেতু" অনুসন্ধানকালে গ্রন্থকার বাহ্য প্রকৃতির মানব-প্রকৃতির, আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং ব্যক্তিগত জীবনের

সাক্ষ্য দিয়াছেন। শেষে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে, তর্ক করিয়া এবিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না—সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য মানুষের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত ধর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তা লইতে হয়। অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে ধারণা করিতে হইলে মানবাত্মার মধ্যে যে অনন্তের আভাস আছে, তাহারই সাহায্য লইতে হয়।

"ঈশ্বরের স্বরূপ" নির্দ্দেশ করিবার আলোচনায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ঈশ্বর মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানবজাতির নিকট আপনার সত্ত্বা ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাধুগণ, অন্যান্য লোকের জন্য, মানব জাতির কল্যাণের জন্য স্বীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের আভাস দিয়াছেন। আমাদের উপনিষদ ও গীতা হইতে এবং বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এবং আর্য্য-ঋষিগণের ও অন্যান্য দেশের সাধুগণের আত্ম-প্রকাশ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার সেই গূঢ়-বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

"উপাসনা" শীর্ষক অধ্যায়ে গ্রন্থকার উপাসনার অর্থ, উপাসনার অঙ্গ, উপাসনার স্থান ও কাল, সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা, এবং প্রার্থনা ও প্রার্থনার সফলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত ও সুচিন্তিত আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা দেখি যে, সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম পুস্তকে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য বার বার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অতি প্রাচীন-কালাবধি এরূপ চলিয়া আসিতেছে। আর একটু বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, কত শত সহস্র নরনারী ঐরূপে উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।" প্রার্থনা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণা। ক্রন্দনই যেমন ক্ষুদ্র অসহায় শিশুর একমাত্র সম্বল, ক্ষুদ্র মানব-প্রাণেরও সেইরূপ এক-মাত্র উপায়—প্রার্থনা। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির, ও সমগ্র মানব জাতির সাধারণ অধিকার। ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট। যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা মানব দেহ রক্ষার উপায়-স্বরূপ, তেমনই উপাসনা, প্রার্থনা, মানবাত্মার স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় স্বরূপ। "স্বীয় অভাব জ্ঞাত হওয়া, তজ্জন্য ব্যাকুল হওয়া অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন, ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার চিন্তা, ধ্যান যোগে ভূমা ঈশ্বরের সহবাস লাভ, আশা ও বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা—এইগুলিই উপা-সনার অঙ্গ। কেবল প্রার্থনা করিয়া উঠিয়া পড়িলে তাহার ফল পাওয়া যায় না; প্রার্থনা করিয়া ক্ষণকাল প্রভুর আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। ক্রমে তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানিতে পারা যায়। যে স্থানে বসিলে কোনও প্রকার শরীরের ক্লেশ হইতে পারে না, মনের মালিন্য, ভয় বা ঔদ্ধত্য জন্মিতে পারে না, যেখানে চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না, এমন স্থান ঈশ্বরোপসনার উপযোগী। সকল সময়েই আমার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিতে পারি। পরমেশ্বরের করুণা লাভের কথা অন্যের কাছে বলা, তাঁহার যশোগান করা, নগরের পথে নাম কীর্ত্তন করা---অর্থাৎ সামাজিক উপাসনা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ এবং আত্মীয় স্বজন সন্তান সন্ততিগণকে লইয়া পারিবারিক উপাসনা ও গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রার্থনার প্রশস্ত বিষয় কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, আমরা শারীরিক প্রকৃত

অভাব মোচনের জন্য, মানসিক বৃত্তি সমূহের উন্নতির জন্য, অবিশ্বাস সংশয়াদি দুর্ব্বলতা অতিক্রমের জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য—পরমাত্মার সহিত একাত্মক হইবার জন্য, পরিবারের, স্বজাতি ও স্বদেশের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। পরিশেষে আমাদের মনে প্রার্থনার সফলতা সম্বন্ধে স্বতঃই যে প্রশ্নের উদয় হয়, সেগুলির গ্রন্থকার সুমীমাংসা করিয়াছেন। "যে যাহা প্রার্থনা করে, সে কি তাহা পায়? যদি না পায়, তবে কেন পায় না? যদি না পায়, তবে কেন প্রার্থনা করে?" এই প্রশ্ন-গুলির উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ইহা সত্য কথা, ইহা প্রমাণিত কথা যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যখন যাহা চায়, তখন তাহা পায় না এবং ঐরূপ না পাওয়াতেই তাহার ও জগতের মঙ্গল।" কারণ সকল মনুষ্যের বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে, মানুষই জগতের কর্ত্তা হইত, ঈশ্বর কেবল মানুষের ইচ্ছা পালন করিবার জন্য থাকিতেন। তাহা না করিয়া ঈশ্বর সত্য ও ন্যায় অনুসারে সমুদয় শাসন করেন এবং প্রেম ও করুণা অনুসারে সকলকে পালন করেন।"

"আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য" শীর্ষক অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম না করিলে যেমন দৈহিক ক্ষুধা-মান্দ্য জন্মে, তদ্রূপ উপযুক্ত সময়ে প্রতিদিন আত্মার অঙ্গ চালনা না করিলে উহার ক্ষুধা মান্দ্য জন্মে।" "আত্মার প্রিয় বস্তু পরমাত্মা ঈশ্বর, তাঁহার নিকট যাইতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহার সম্মুখীন হইতে লজ্জা বা ভয় হয়, তাঁহার বিষয় জ্ঞাত হইতেও ইচ্ছা হয় না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দৃষ্ট হয়। এই ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, কুসংসর্গ পরিত্যাগ, নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরোপা-সনা, ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, ধর্ম্মালোচনা, সত্যের অনুশীলন, ন্যায়ানুসরণ, গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন, প্রেম দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমার সদ্ব্যবহার এবং অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা পরিহার করিলে এই ক্ষুধামান্দ্যের নিবৃত্তি হইতে পারে।" "মৃত্যু, আত্মার অমরত্ব ও পরজন্ম" শীর্ষক পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার, ভৌতিক জগৎ হইতে আমরা যাহা বুঝিতে পারি, আমাদের স্ব স্ব চিত্তে যাহা যাহা উপলব্ধি করি এবং অন্যলোকে বা ইতিহাসে যাহা সাক্ষ্য দেয়, এই ত্রিবিধ দিক দিয়া আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আত্মা মৃত্যুর বশীভূত নহে ও আত্মা উন্নতি লাভ করিয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে। "আত্মা এই দেহে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কি ভাবে ছিল ও মৃত্যুর পরে কি ভাবে থাকিবে, তাহা আমাদের জানিবার সাধ্য নাই। তবে "এই আত্মারূপ সূর্য্য এই পৃথিবীতে অস্তমিত হইলে লোকান্তরে উদিত হইবে. ইহা নিশ্চয়। আত্মা, মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সুধীবৃন্দের মত, হিন্দু শাস্ত্রের মত, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মত, কোরাণের মত, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, সুনির্ব্বাচিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎসমুদয়ের সুচিন্তিত অনুশীলন করিয়া উপসংহারে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে, স্বকীয় ধার-ণার অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এই সমুদয় বিষয় আলোচনা, নিভৃত চিন্তা ও কোন কোন বিষয়ে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, এ জীবন ও পর জীবন একই জীবন। মৃত্যু কেবল নাট্যাভিনয়ের একটী যবনিকা স্বরূপ। এক অধ্যায় সমাপ্ত হইলে দ্বিতীয়

অধ্যায় আরম্ভ হয় এবং তদনুসারে অনন্ত কাল আমরা এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে গমন করি। ক্রমোন্নতি ঈশ্বরের বিধান, সুতরাং এক জীবনে যতদূর উন্নত হইলাম, পর জীবনে তাহা অপেক্ষা আরও উন্নত হইব। তাৎকালীন উপযুক্ত দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে। মনাদি যন্ত্র বিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানেতে, প্রেমেতে উন্নত হইব; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে থাকিব। একাকী এক স্থানে বসিয়া কেবল প্রভুর নাম গান করিব না, হয়ত অন্যান্য উপযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিব ও প্রিয় আত্মীয়গণের সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রভুর কার্য্য সাধন করিতে থাকিব। যখন যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত হইব, তখন প্রভু পরমেশ্বর তদ্রূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। দেবলোকবাসী দেবতাই হউন বা উন্নত মানবাত্মাই হউন, তাঁহাদের সহিত একই কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত হইব। চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও প্রেম থাকিবে। পবিত্র প্রেমের বিনাশ নাই। তাহাই ধরাধামবাসী ও অমরধামবাসী প্রিয় আত্মাগণের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র-কন্যা, স্বদেশী বা বিদেশী, আত্মীয় বন্ধু কাহাকেও একেবারে বিস্মৃত হইব না। হয়ত সময়ে সময়ে সকলের সহিত মিলিত হওয়াতে এক প্রেমের পরিবার গঠিত হইবে। সে পরলোকে পরিচ্ছদ কি হইবে, খাদ্য পানীয় কি হইবে, তাহা জানিনা; তবে যখন যে স্থানে বাসের উপযুক্ত হইব তাহারই উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইব। দয়াল পিতার গৃহে কিছুরই অভাব হইবে না। কখনও বিচার হইতে পারে, কখনও পাপের জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারি, অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু অনন্ত নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। মহান পরমেশ্বরের রাজ্যে উন্নতিই নিয়ম। তাঁহার মঙ্গল নিয়মানুসারে সকলেই কুপথ হইতে সুপথে আনীত হইবে, সংশোধিত হইবে ও পুনরায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। তিনি একটী মানব-সন্তানকেও পরিত্যাগ করিবেন না।"

"এ জীবনে যে সমুদয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, যে সমুদয় মিথ্যা কহিয়াছি ও প্রবঞ্চনা, কপটতা করিয়াছি, দুর্ব্বলতা ও মোহবশতঃ পাপ করিয়াছি, সেজন্য এখানেই অনুতাপ প্রকাশ করি; ও আশা করি, এখানেই সে সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে ও মৃত্যুকালে একপ্রকার পবিত্রভাবে এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিব। যদি এমত সৌভাগ্য না হয়, তাহা হইলে যেরূপ জীবনে এই সমুদয় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি, তাহার উপায় দয়াল-প্রভুই স্বয়ং করিবেন। সুতরাং ভয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হইব না; নিরাশ ভাবে নিমগ্ন হইব না; আশালতাকে ধরিয়া পুনরায় ভাসমান হইব। মৃত্যুর পর পুনরায় উন্নত জীবন লাভ করিব। বন্ধুগণ, একবার নিভৃত নিকেতনে গূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের অপার করুণা, অসীম ক্ষমার বিষয় স্মরণ করিয়া, জীবনে যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া, প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাস লইয়া প্রার্থনা করিলে অবশ্যই আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন—আশান্বিত হইবেন।"

ইহাই গ্রন্থকারের শেষ কথা। উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিকতা কত উচ্চ এবং ভক্তি ও বিশ্বাস কত গভীর।

এস্থলে একথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন

যে, আলোচ্য গ্রন্থের মত চিন্তাশীল ও গবেষণাপূর্ণ প্রায় চারি শত পৃষ্ঠা-ব্যাপী গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। গ্রন্থখানির বিশেষ পরিচয় পাইতে হইলে উহা পাঠ করিতে হইবে। এবং পাঠকের সেই ইচ্ছার সহায়ক হইবে বলিয়া আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। গ্রন্থখানির বিষয় গুরু বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের সুন্দর ও সহজ অভিব্যক্তির ও সুমিষ্ট ভাষার গুণে সে গুরুত্ব সহজে অনুভব করা যায় না। গ্রন্থকারের ভাষা কলনাদিনী তটিনীর জলপ্রবাহের মত অবাধ প্রাণ-মন স্নিগ্ধকর ও শ্রুতিমধুর। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সুখপাঠ্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আলোচ্য গ্রন্থখানি লিখিয়া গ্রন্থকার তাঁহার "ধর্ম্মদাস" নাম সার্থক করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনার্থিগণ তাঁহার বিতরিত বাক্যামৃত পান করিয়া উপকৃত হউন, তৃপ্ত হউন, ধন্য হউন, ইহাই আমাদের সানুর্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

"প্রার্থনা।"

(১)

তোমার মঙ্গল করে, মধুর প্রভাতে আজ
জ্বেলে দাও নব আলো হৃদে মম—বিশ্বরাজ?
ঘুচে যাক্ স্পর্শে তার পাপ-মায়া অন্ধকার;—
তোমারি আলোকে বিশ্বে হেরি মুখ সবাকার।
তোমার মঙ্গল ঘট, তুলিয়ে প্রণত শিরে,
বাহিরিব বিশ্বে আজি ছিটিয়ে সে পুণ্যনীরে।
তোমার চরণ-ধূলি আঁচলে বাঁধিয়ে নিব,
তোমারি ভকত জনে যতনে বাঁটিয়া দিব।
তোমার চরণপদ্ম মধুর চন্দন বাস
নিশ্বাসি লইব প্রাণে, দূরে যাবে ভয়ত্রাস।
তোমার বাঁশীর সুরে কণ্ঠ খুলে দিব সুর
মিশে তব সুরে মম কণ্ঠ হবে সুমধুর।
বিশ্বহাটে বাহিরিব লইয়ে তোমারি নাম,
অবহেলে পদে দলি সুখ দুঃখ পরিণাম।
জীবন-তরণী মোর তরঙ্গে যদি গো দোলে,
তুমিত আছহে মোর, তুলিয়া লবেনা কোলে?

(২)

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তোমারি করুণ আঁখি
প্রীতির মধুর আলো জ্বালিয়া দিয়াছে রাখি।
তোমারি প্রাণের টানে ভাই বোনে এত টান,
বাপের মায়ের প্রাণে ডাকে তব স্নেহবাণ।
পতি পত্নী প্রাণে প্রাণে এত ভালবাসাবাসি,
তব প্রেমে, তব হর্ষে ঘরে ঘরে হাসি রাশি।
সহস্র বাঁধনে তুমি বাঁধিয়াছ হৃদি মোর,
জানিনা তোমার ইচ্ছা—থাক্ শত মায়াডোর,
তোমারি শকতি বলে, অভয় চরণ খানি
সহস্রবাঁধন ছিঁড়ে নারিব লইতে টানি?
তোমার অনল স্পর্শে কবির লেখনী মুখে
বিদ্যুৎ চমকে যেন, জাগে প্রাণ দিকে দিকে।
তোমার ভৈরব গানে অধীনতা অত্যাচার,
টুটে যাক্—যাক্ দূরে বিষাদের অন্ধকার।
মুক্ত কণ্ঠে ওহে নাথ গাহিতে তোমার গান,
আসে যেন কণ্ঠে কণ্ঠে সাগরের কলতান।
জাহ্নবী-যমুনা-সিন্ধু-নর্ম্মদা-কাবেরী জল,
নাশুক কলুষ রাশি তুলি নব কল কল।
পাপের গগনস্পর্শী অসুর সুহর্ম্ম্য রাশি,
তোমার চরণস্পর্শে ধ্বংস জলে যাক্ ভাসি,
পাপীর মস্তক ঘিরে থাকে যেন অনুক্ষণ
কঠোর অনল বজ্র সমুজ্জ্বল সুদর্শন।
কাল পূর্ণ, এস হরি, রক্ষ রক্ষ জগজ্জন।
এ দগ্ধ শ্মশানে পুনঃ কর শান্তি সংস্থাপন॥

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য ও দরিদ্রের বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

জন্ম—১৭৭২ শকাব্দ, ১২৫৭ সাল।
মৃত্যু—১৫ই বৈশাখ, শনিবার ১৩২৪।
২৮শে এপ্রেল, ১৯১৭।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে যে মহাশক্তিশালী পণ্ডিত আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার বহুপ্রবন্ধ মজুত, প্রতিবার না ছাপাইলে শেষ হইবে না, কবে যাইতে হইবে, ঠিক নাই, দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে" —তাঁহার অকস্মাৎ দেহত্যাগের সংবাদে আমরা রোগ-শয্যায় দারুণ আঘাত পাইয়াছি। তিনি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রতিভা একত্র মিলিত হইয়া বঙ্গের ইতিহাসে যে চিরস্মরণীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা বঙ্গবাসী কখনও ভুলিবে না। "বঙ্গবাসীর" প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রমাণ। ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীতে তাহা পাঠকগণ কতকটা অবগত হইয়াছেন, পরে আরো জানিতে পারিবেন। জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রতিভার মিলিত ক্ষেত্র বঙ্গের একটী চির-স্মরণীয় পরিবার। ৺মহর্ষি এবং দীনবন্ধু মিত্রের পরিবারের ন্যায় তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের চির গৌরবের জিনিস। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার জন্য যে সকল পরিবার সুবিখ্যাত, এই বঙ্গে তাহার সংখ্যা বড় অধিক নহে। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহা গণনা করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ক্ষিতীশ-বংশাবলীর গ্রন্থকার ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পরিবার অন্যতর। জ্ঞানে,কর্ম্মে ও প্রতিভায় এই পরিবার শুধু কৃষ্ণনগরের নয়,সমগ্র বাঙ্গালার গৌরবের জিনিস। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের বরেণ্য জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও এই পরিবারকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র, ৺ রাজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল রায়, চতুর্থ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল রায়, পঞ্চম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল রায়, ষষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, সপ্তম ৺ দ্বিজেন্দ্রলালরায়,কন্যা ৺ মালতীমালা সকলের ছোট। ইঁহারা সকলেই স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। হায়! অসময়ে জ্ঞানেন্দ্রলালের তিরোধানে আমরা, শুধু আমরা কেন, অনেক বন্ধু বান্ধবের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং নব্য-ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নয়। তিনি নব্য-ভারতের জীবনব্যাপী অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে নব্য-ভারতের দক্ষিণ হস্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলই বিধাতার দুরবগাহ্য বিধান। সেই বিধানে আমরা আজ ব্যথিত-হৃদয়ে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।

জ্ঞানেন্দ্রলালের জীবনের বাল্য ইতিহাস এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা আশা করিতেছি, তদীয় গুণধর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি-এল মহাশয় তাহা অচিরে প্রকাশ করিবেন। তাঁহার পত্রের আভাসেও আমরা তাহা অবগত হইয়াছি।

তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এই। সম্ভবতঃ শকাব্দা ১৭৭২, সন ১২৫৭ সালে জন্ম, মৃত্যু ১৫ই বৈশাখ, ১৩২৪। ইং ১৮৭০খ্রীঃ বি-এ ও ১৮৭৪খ্রী এম-এ-পরীক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে পাশ করেন। তৎপর কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন। যদিও তিনি Natural and Physical Scienceয়ে এম-এ

পাশ করেন, কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ বি-এল উত্তীর্ণ হন। তৎপর ২।৩ বৎসর কৃষ্ণনগর-আদালত সমূহে ওকালতি করেন। তৎপরে ১৮৮১ বা ১৮৮২ খ্রীঃ "বঙ্গবাসীর" সম্পাদকতা করেন। তৎপরে মেট্রপলিটান কলেজের বি-এ ও এম-এ ক্লাস পর্য্যন্ত ইতিহাস ও বার্ত্তাশাস্ত্রের অধ্যাপকতা করেন। তৎপর ১৮৮৪ খ্রীঃ ভ্রাতা হরেন্দ্রলালের সহিত মিলিত হইয়া"পতাকা" প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ বা ১৮৮৭ খ্রীঃ কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের-অধীনে নদীয়া মহারাজের ম্যানেজারী করেন। তৎপর নদীয়ার মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের দাওয়ানী কয়েক বৎসর করেন। তৎপর কোর্ট-অব ওয়ার্ডস্-অধীনে মোটা মাহিনায় ভবানীপুর জমীদার-নাবালকের গার্জ্জিয়ান টিউটারী করেন। তৎপর ঐ ষ্টেটের ম্যানেজার হন এবং ভ্রাতা হরেন্দ্রলালের সহিত মিলিত হইয়া ১৩০৭ ফাল্গুন মাস হইতে ১৩১১ সাল পর্য্যন্ত"নবপ্রভা" প্রকাশ করেন। বহুদিন যাবৎ তিনি ভবানীপুর বরদাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের ম্যানেজারী করিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ও খয়রা রাজের ম্যানেজারী করেন। এই কাজের পর পুনর্ব্বার নদীয়ার মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের দেওয়ানী করেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বেও এই কাজে ছিলেন। শেষ জীবন কেবল সাহিত্য-সেবাতে নিযুক্ত করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, বিবিধ শাস্ত্রদর্শী, চিন্তাশীল সুলেখক জ্ঞানেন্দ্রলালের শেষ জীবনের সাহিত্য-সেবার সুফল হইতে পাঠকগণ বঞ্চিত রহিলেন।

তিনি কেবল,"প্রবন্ধ লহরী"ও"মায়া" উপন্যাস প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ঃ—তাঁহার কৃষ্ণচন্দ্র উপন্যাস লেখা আছে। নানা পত্রিকায় তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।"মায়া" ও "প্রবন্ধলহরী"অতি উপাদেয় পুস্তক। যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছেন।

এদেশে অনেক গ্রন্থকার জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন,—কত কবিতা, কত সন্দর্ভ, কত গল্প, কত উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রলালের লেখার ন্যায় আন্তরিকতা-পূর্ণ লেখা অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়। তিনি সমগ্র হৃদয়খানি প্রতি লেখায় যেন ঢালিয়া দিতেন। যেমন ৺রজনীকান্ত গুপ্ত ৺ভূদেব ও ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺দীনবন্ধু মিত্র মহোদয়ের এবং সারদামঙ্গলের বিহারীলালের লেখায় দেখা যায়, জ্ঞানেন্দ্রলালের লেখায় ও সেইরূপ প্রাণের কথা পাঠ করা যায়। তাঁহার ন্যায় দরিদ্রবন্ধু এদেশে বড় অধিক দেখা যায় নাই। তিনিই যেন ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র শিষ্য,যাঁহার হৃদয় দরিদ্রের জন্য সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইত। তাঁহার যে কোন লেখা পাঠ কর, তাহাতেই দরিদ্রদিগের প্রতি একটা প্রাণের টানের পরিচয় পাইবে। তিনি অনেক জমীদারের ম্যানেজারি এবং দাওয়ানী করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলিতেন,—কোনরূপে দরিদ্র-নিম্নশ্রেণীর উপকার করিতে পারেন কিনা, তাহারই জন্য বড় লোকের দ্বারে দ্বারে যাইতেন; কিন্তু যে সম্ভাবনা যেখানে দেখিতেন না, যেখানে হৃদয় পাইতেন না, সেখানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার সততা,সদাশয়তা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল কোন বড়লোকের অধীনে কাজ করিতে যে তিনি পারেন নাই, তাহার কারণ—অনেক স্থলেই তিনি হৃদয় পাইতেন না—অনেক স্থলেই অধর্ম্ম ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে

দেখিতেন। দরিদ্র-পীড়ন, দরিদ্র-নিষ্পেষণ দেখিলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইত। আজীবন দুঃখ দৈন্যের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু চাটুকারিতা দ্বারা কাহারও মনোরঞ্জন করিয়া কৃমিকীটের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া লাগিয়া থাকিতে পারেন নাই। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাকুরী করিতে যাইতেন, যখন তাহার অন্তরায় বুঝিতেন তখনই ছুটিয়া পলাইতেন; কিম্বা যখন কোন অসৎ কার্য্যের পোষকতা করিতে হয়,বুঝিতেন, তখনই কর্ম্মে ইস্তফা দিতেন। আমরা জানি এবং অনেকেই জানেন, তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততা, তাঁহার দরিদ্র-প্রেম, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সাহিত্যানুরাগ তাঁহাকে একাকিত্বের গহন বনেই সর্ব্বদা টানিয়া লইত, তিনি যেখানে যাইতেন, ঐ সকল চিন্তা তাঁহাকে তন্ময় করিয়া তুলিত, উঠিতে বসিতে, শুইতে যাইতে, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া শুধু গরীবদের কথা ভাবিতেন। যখন লিখিতেন---তখন সেই তন্ময়তা ফুটিয়া বাহির হইত। ফুটিয়া বাহির হইত যেন আন্তরিকতার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, কণায় কণায় বাহির অন্যের হৃদয়ে সেই ভাব যাইয়া উত্তেজনা বা উন্মাদনা জন্মাইয়া দিত। তাঁহার লেখা পড়িলে কখনও রাগে প্রাণ অস্থির হয়, কখনও দুঃখে হৃদয় দ্রব, কখনও ভাবে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়, কখনও সংসারের ঊর্দ্ধে মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার আন্তরিকতা-পূর্ণ লেখা পাঠ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কোন্ ধনী তাঁহার নব্যভারতের প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগী থাকিতে পারেন? কোন্ কৃত্রিমতাপূর্ণ স্বার্থান্ধ-হৃদয় তাঁহার সরল লেখা পাঠ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ না হইয়া থাকিতে পারে? তিনি ধনীর নহেন, তিনি সামাজিকের নহেন—তিনি শুধু দরিদ্রের জন্য যেন লেখনী ধারণ করিয়া গিয়াছেন। হায়, নিম্নশ্রেণি, তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের একমাত্র সুহৃৎ ও আত্মীয় দেহ রক্ষা করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন! কে আর তোমাদের জন্য ভাবিবে এবং তোমাদের জন্য কাঁদিবে?

তিনি দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর জন্য অনেক কাঁদিলেন, অনেক সহ্য করিলেন, কিন্তু এদেশের নিম্নশ্রেণী সুষুপ্ত,তাঁহাকে বুঝিল না! ধনী শ্রেণী, তিনি তাঁহাদের নহেন বলিয়া, তাঁহাকে উপেক্ষা করিল। যোগ্য ব্যক্তি কুত্রাপি যেন আদর পাইলেন না। শেষে নিভৃতে,হৃদয়ের গহনে দুঃখ-দারিদ্র্যের সেবায় আত্ম সমর্পণ করিলেন। এই অবস্থায় নব্য-ভারত প্রেস যখন বন্ধ হইল, তিনি লিখিলেন, "আর না, আর সাহায্য গ্রহণ করিব না। আপনি একাকী কষ্ট সহ্য করিবেন, তাহা হইবে না, আমিও তাহার অংশী হইলাম। আমার লেখার জন্য আর আপনাকে কিছু পাঠাইতে হইবে না।" এরূপ উদারতা, এরূপ স্বার্থত্যাগ, এবং সহৃদয়তা এদেশে বড়ই বিরল। আমরা জ্ঞানেন্দ্রলালের নিকট যাহা পাইয়াছি, আর কোথাও তাহা পাই নাই। জ্ঞানেন্দ্রলালের দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানেন্দ্রলাল। এরূপ সহৃদয়তাপূর্ণ উচ্চ হৃদয় এদেশে বড় কোথাও দেখা যায় না।

তিনি যোগী ছিলেন না, তিনি ভক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও কর্ম্মী, তিনি ছিলেন দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহৃৎ। তিনি ছিলেন দেশের, দেশ ছিল তাঁহার। দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি সাহিত্যের হাটে আপনাকে বিক্রয় করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পর অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিহীন নিরীশ্বর শিক্ষায়

ছাত্রগণের জীবনের বিশেষ রূপে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে না বুঝিয়া তিনি সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। মোক্তারদের কথা দূরে থাকুক, নিধু, বিশু, চারু, নরু, যদু, গোপু, প্রভৃতি উপাধিধারী উকীলগণ যেরূপে মিথ্যা মকদ্দমা গ্রহণ ও তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া, এক মাসে যাহা শেষ হইতে পারে, সেই মকদ্দমা দুই তিন বৎসর চালাইয়া, মক্কেলের ভিটা মাটী উচ্ছন্ন করিয়া পকেট ভারি করিয়া বাড়ী গাড়ী করিতেছেন, তাহা দেখিয়া তিনি বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, আদালত-সমূহে, কটকের ৺ নরেন্দ্রনাথ সরকার, বা ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় সত্য মকদ্দমার সেবা অতি অল্প লোকেই করেন, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত ও জাল দলিলাদি দাঁড় করাইয়া সর্ব্বত্রই উকীলগণ অদ্ভুত কার্য্যে নিযুক্ত। ইহাতেই তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি, অহঙ্কার, আনন্দ, বাহাবা, মান, সম্ভ্রম---সকলই। তাঁহাদের আস্ফালন দেখে কে? ক্রমাগত ঘুষ চলি-যাছে, ক্রমাগত চাটুকারিতা চলিয়াছে! হাকিমগণ ভ্যাবা গঙ্গারামের ন্যায় তাঁহাদের হাতে নড়িতেছেন, চলিতেছেন। আদা-লতের এ সকল কীর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞানেন্দ্রলাল হৃদয়ে দারুণ বেদনা পাইতে লাগিলেন। সত্যের আদর নাই, মিথ্যা সর্ব্বত্রই প্রশ্রয় পাইতেছে; —সততার সম্মান নাই, সর্ব্বত্রই তৈলমর্দ্দন চলিতেছে! টাউটগণ লোকদিগকে ঠকাই-বার নূতন নূতন ফাঁদ পাতিতেছেন, আজ না কাল, কাল না পরশ্ব, পরশ্ব না তার একমাস পর, এক মাস পর নয় দুইমাস, তিন মাস, ছয়মাস পর—নানা মিথ্যা অলীক অজুহাতে হাকিমগণের চক্ষে ভেল্কি লাগাইয়া কাল-হরণ করিয়া পেট পূরিতেছেন, অথবা কোথাও বা ভেট, কোথাও বা চাটুকারিতার দ্বারা ভুলাইতেছেন। এ সব তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ নরকে আসিলাম? মদ, বেশ্যা ও টাকাই দেশের সকলকে অধিকার করিয়া বসিতেছে, কেবল যশোহর বা খুলনায় নয়, বহু স্থানের উকীলগণই বেশ্যা-বাড়ীতে বাসা করিতেছেন; কেবল কটকে নয়, অনেক স্থানেই পরিবার লইয়া সহরে বাস করা নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মভীরু চিত্ত দমিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে, ম্যাট্সিনের সময়ে ইটালিতে কেহ উকীল হইলেই দরিদ্রের মকদ্দমা বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে হইত; বাঙ্গালার কোথাও এ চিত্র দেখা যায় না। দরিদ্রকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উদর পূরণ করা চাই, তবে ত বাহাদুরী! আইন আদালত যেন ধনীদিগের দরিদ্র-নিষ্পেষণের একটা আড্ডা, জব্দ করার একটা ফন্দি বিশেষ। তাঁহার প্রাণ সদা দরিদ্রের জন্য কাঁদিত—তিনি দারুণ বেদনা পাইতে লাগিলেন। এই-রূপ বেদনা-কাতর হৃদয়ে তিনি যখন লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিতেছিলেন, সেই সময়ে,১২৯০ সালে, তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায়চৌধুরী, ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহা-শয়ের সহিত পরিচিত হইয়া "বঙ্গবাসী"র সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময়ের ইতিহাসের কথা পাঠকগণ পত্রাবলী হইতে কিছু কিছু অবগত হইয়াছেন। তদীয় জীবনের সে এক মহা শুভ মুহূর্ত্ত। অক্ষয়চন্দ্রের "সাধারণী" ছাড়িয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মহাব্রত

গ্রহণ করিয়াছেন। ৺ কেশবচন্দ্রের সুলভ-সমাচার যাহা করিতে পারে নাই, ৺ রসিককৃষ্ণ মল্লিক,৺রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি যাহা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, সেই মহাপবিত্র ব্রত অর্থাৎ সাহিত্য দ্বারা নিম্নশ্রেণীকে জাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মুটে মজুর, মুদী পশারী বঙ্গবাসী পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বঙ্গদর্শনের যুগ চলিয়া গিয়াছে,নব্যভারত ও সঞ্জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-জগৎ যেন দৈব-বলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে বঙ্গবাসী যে মহা শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? বঙ্গবাসীর যুগে রবীন্দ্রনাথ "দামু বোস্ আর চামু ঘোষ এক কাগজ বেনিয়াছে" বলিয়া তীব্র ভাষায় বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে এই শক্তিশালী কাগজের আরো শক্তি বাড়িল। অক্ষয়চন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষপাত,—কিছুতেই কিছু হইল না, বঙ্গবাসী দেশকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বঙ্গবাসীর সহস্র সহস্র গ্রাহক হইয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রলাল এই মহা সুযোগে এই মহাযজ্ঞে আত্মসমর্পণ করিয়া খাটিতে লাগিলেন। যজ্ঞের মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিছুদিন এই ভাবে চলিল বটে, কিন্তু বঙ্গবাসীর প্রাণে সব সহিল না। যখন বঙ্গবাসী মহাশক্তিতে পরিণত হইল, তখন যোগেন্দ্রচন্দ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রলাল ও দ্বারকানাথের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন পর, ইন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে কতকটা কৃতকার্য্যও হইলেন। সে সকল অপ্রিয় কথার উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। কার্য্যদক্ষ উপেন্দ্রনাথ এই চক্রান্তে পড়িয়া আন্দোলিত হইলেন, কত দুঃখের কথা কত দিন, অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিলেন। এই সময়ে শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রধান সহায় হইলেন। এইরূপে পঞ্চানন্দের সহিত প্রকৃত বঙ্গের হিতৈষীর মৃত্যু হইল! নূতন আকারে ধর্ম্মান্দোলনে বঙ্গবাসী মাতিলেন এবং শিব-মন্দিরের টাকা এবং বিজয়-বটিকার লাভের প্রলোভনে পড়িয়া, হাইকোর্টের মকদ্দামার পর, বীর যোগেন্দ্রচন্দ্র সাহিত্য-জগতে মৃত্যুমুখে পড়িলেন, মডেল-ভগিনী প্রভৃতিও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। সাধনা ও সিদ্ধির লেখক ঢাকার কালীপ্রসন্নের এবং "সোণার বাঙ্গলা, তোমায় ভালবাসি"—গানের লেখকের মৃত্যু হইল, উপাধি-পিপাসায়;—প্রকৃত হিতৈষী চন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল, "নূতন পাঠের" টাকার মায়ায়। এদেশের চিরন্তন প্রবাদ—"লোভে পাপ,পাপে মৃত্যু"—এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। রুচির স্থানে বঙ্গবাসী কুরুচি ধরিলেন, উন্নতি ও সংস্কারের পরিবর্ত্তে, জাতিভেদের মামুলি পথ অবলম্বন করিলেন। ঠাকুরদাস বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুমুল ঝগড়া করিয়া, শেষে সব দিক পরিত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ কুরুচির হাটে আত্ম-বিক্রয় করিলেন এবং কতিপয় দালালের সাহায্যে দিগ্বিজয়ী হইতে চেষ্টিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতির কুরুচি ধরিয়া দিলে কি হইবে? কত কত কেটিকিষ্টগণ সহায়, তিনি শেষে "ঘরে বাইরের"কুরুচির হাড়ি সমাজে ভাঙ্গিয়া বাহাবা লইতেছেন। যাক্, সে সকল অপ্রিয় কথা থাকুক। নবীনচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাসীর সাহায্যে নিজ নিজ দুষ্কৃতি ঢাকিতে সচেষ্ট হইলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের তীব্র লেখনীর প্রতিবাদে সুধী ধর্ম্মপিপাসু হীরেন্দ্র

নাথ অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মের পোষক ধরিলে আর পায় কে? নবীনচন্দ্র মাদারীপুর ও অন্যান্য স্থলের কুকীর্ত্তি ধর্ম্মের পোষাকে ঢাকিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। পূর্ব্ব বঙ্গের দুই মহারথীর মৃত্যুতে জ্ঞানেন্দ্রলাল দারুণ কষ্ট পাইলেন। তিনি বঙ্গবাসী পরিত্যাগ দেশে সুরুচির "পতাকা" উড়াইয়া দিলেন। সে পতাকা যেন জ্ঞানেন্দ্রলালের জয়-পতাকা। এরূপ নিষ্কাম ব্রত এদেশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও উমেশ চন্দ্র দত্ত ভিন্ন আর কেহ গ্রহণ করেন নাই। হায় সোমপ্রকাশ, হায় ভারতসংস্কারক, তোমরা আজ কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইয়া জ্ঞানেন্দ্রলাল ভ্রাতা হরেন্দ্রকে লইয়া "পতাকা" বাহির করিলেন। এরূপ সুচিন্তা,গবেষণা, উদ্দীপনা,সুরুচি লইয়া এদেশে আর কোন কাগজ বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। কিন্তু হইলে কি হইবে, চুটকি সাহিত্যের অরাজকতা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অশ্রু ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, "ভারতবাসী" রুচিবিকারে মারা গিয়াছে, হরিদাসের গুপ্তকথা, পাঁচকড়ি দে ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভের গল্পের যে দেশে আদর এবং বঙ্গবাসীর হলাহল পানে যে দেশ বিভোর, সে দেশে "পতাকা" দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নয়। গ্রাহকের অভাবে "পতাকা" স্থায়ী হইল না। এডিসনের স্পেকটেটর ও গোল্ডস্মিথের "বি" (Bee) পত্রিকার অধিক গ্রাহক হইয়াছিল কি? বঙ্গের এডিসনের পক্ষে অন্য ব্যবস্থা হইবে কেন? তারাকিশোরের বেদান্ত, দেবেন্দ্রবিজয়ের গীতা, চন্দ্রনাথের শকুন্তলা-তত্ত্ব, প্রফুল্লচন্দ্রের "হিন্দু কেমিষ্ট্রি" অধিক বিক্রয় হইয়াছে কি? জ্ঞানাঙ্কুর,বান্ধব, নবজীবন, প্রচার, সাধনা, আর্য্যদর্শন টিকিল না কেন? যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, জ্ঞানেন্দ্রলালের পক্ষেও তাহাই ঘটিল—পতাকা টিকিল না। তৎপরও জ্ঞানেন্দ্রলাল নিরুৎসাহিত না হইয়া আবার "নবপ্রভার" আলোকে দেশকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুরুচিপূর্ণ প্রবন্ধ, অশ্লীল ছবি, যাহা চাকচিক্যের তখন এত আদর বাড়িয়া যাইতেছিল যে, "নবপ্রভাব" চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লোকের ভাল লাগিল না। নিম্নশ্রেণী সুষুপ্ত, তাহারা হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য, ধনীরা দরিদ্র-নিষ্পেষণে বদ্ধপরিকর, জ্ঞানেন্দ্রলাল সহায় পাইবেন কোথায়? হায়রে দেশ! কুরুচির হাটে বেচাকেনা করিয়া কত কত পত্রিকা বিকাইল, কিন্তু সোণার "নবপ্রভা" বিকাইল না, কয়েক বৎসর পরই কলেবর পরিত্যাগ করিল। তখন জ্ঞানেন্দ্রলাল তাঁহার অমূল্য পুস্তক "মায়া" প্রকাশ করিলেন, কিন্তু উপাদেয়তা, সহৃদয়তা, দেশের উন্নতির চিন্তা লইয়া এদেশে কেহ বাড়ী গাড়ী করিতে পারিয়াছে কি? ডিটেকটিবের গল্প-লেখকের বাড়ী হয়, ছবি ও অসার গল্পের সাহায্যে নব নব পত্রিকার বাড়ী গাড়ী হয়, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রলালের "বাড়ী ও গাড়ী" হইল না! তিনি মরমে মরিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যের সেবা করিতে কৃষ্ণনগরের কার্ত্তিক-ভবনে লুক্কায়িত হইলেন। তদীয় ভ্রাতা হরেন্দ্রলালের পত্রের এই অংশ কত মর্ম্মপীড়াদায়ক—

"প্রায় বছর-দুই-আড়াই সেজদাদা মহাশয় সাংসারিক নানাবিধ অসুবিধায় কাতর ছিলেন। আমার যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। অক্ষম আমি, প্রবাসী আমি, মনের একটা বড়ই কষ্ট, ইচ্ছা সত্তেও সেজ-

দাদার তেমন সেবা করিতে পারি নাই। [illegible] হইতে ভাগবান তাঁহাকে স্বস্তি দেন নাই, এখন তিনি শান্তিময়ের ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছেন।”

পত্রের আর এক অংশ আরো ক্লেশদায়ক—“যে জ্বরে সেজদাদা মারা গেলেন, সেই জ্বরের প্রাক্কালে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাব, ম্যালেরিয়া জ্বর। আমার আসার পর নিউমোনিয়া দেখা দিল এবং অতি অল্পদিনে সব শেষ হইয়া গেল! কলিকাতা হইতে ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সদাশয় ও স্নেহশীল পুত্র ডাক্তার জিতেন্দ্রকে মন্টু (৺দ্বিজেন্দ্রের পুত্র) লইয়া গেল, কিন্তু তাঁহারা সেজদাদাকে আর জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদিগের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার স্বর্গারোহণ হইয়া গিয়াছে!”

আমরা তখন দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত, জ্ঞানেন্দ্রলালের অন্তিম অবস্থার কথা কেহই জানাইল না। যে দেশে অর্থকষ্টে মাইকেল হাঁসপাতালে প্রাণ দিলেন, অর্থকষ্টে হেমচন্দ্র শেষ জীবনে কষ্ট পাইলেন, সে দেশে জ্ঞানেন্দ্রলালের অর্থের অভাবে তেমন চিকিৎসা হইল না, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। তিনি কত সময়ে অর্থাভাবের দারুণ কষ্টের কথা আমাদিগকে জানাইতেন, কিন্তু রোগে পড়িয়া কিছুই জানান নাই। জানাইয়া থাকিলেও সে সকল পত্র মজুত হইয়া আছে, আমাদিগের হাতে আজও তাহা কেহ দেয় নাই। এমন গুণী, জ্ঞানী, প্রতিভাশালী ব্যক্তি দরিদ্রদের অন্ন লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাই বুঝি দরিদ্র বেশেই তাঁহাকে যাইতে হইল! এদেশে ভণ্ড তপস্বী ব্রহ্মচারী বা পরমহংসদের বিলাস-উপকরণ যুটে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রলালের চিকিৎসার জন্য একজন ‘‘নীলরতন”বা‘‘বিধান রায়কে”ও দেখা গেল না,এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁইনাই! জ্ঞানেন্দ্রলালের অমর আত্মা বঙ্গের কি দৃশ্য দেখিয়াই না দেহ পরিত্যাগ করিলেন!! সব কথা ভাবিতে বসিলে প্রাণ অস্থির ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, আর কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

তিনি কি ছিলেন এবং কেমন ছিলেন, এক প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত করা যায়না। তাঁহার ভ্রাতা লিখিয়াছেন যে, “একবৎসরেও তাহা শেষ হইবার নহে।” আমরা এস্থানে একটী কথার উল্লেখ করিয়া আজ তাঁহার মহত্ত্বের উপসংহার করিতেছি।

একদিন তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—“আমি একদিন ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে লইয়া উপরে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখি,ঘরে কারপেট পাতা রহিয়াছে—ইত্যাদি দেখিয়া আমার হৃদয়টা দমিয়া গেল। আমি বিলাসিতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। দেবীবাবু, ধার্ম্মিকগণও বিলাসী হন?” আমরা একথার কোন উত্তর দিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন—“তাঁহার মেয়ের সাজসজ্জা দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়াছে। কি আর বলেন?” আমরা আর কিছু বলিতে পারি নাই। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু মূর্খকে ঘৃণা করিতেন না। তিনি বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বড় বড় চাকুরী করিয়াছিলেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজাদিগকে বরাবর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি বড় বড় রাজার বড় বড় দেওয়ানী করিয়াছেন, কিন্তু ঘুষ দিয়া কাহাকেও রক্ষা

করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি আজীবন ধার্ম্মিকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনও ভণ্ডামী দেখিতে পারেন নাই। তিনি বড় বড় রাজার দ্বারস্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু কখনও স্বাধীনতা হারাইয়া চাটুকার হয়েন নাই। তিনি আজীবন সাহিত্যসেবী, দরিদ্রের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, সুরুচির পক্ষপাতী, দেশের উন্নতিকামী দেশনায়ক। তিনি রাজনীতির আন্তরিকতা-শূন্য বক্তৃতামণ্ডপে যাইতে ভীত হইতেন। তিনি সরল অকৈতব বন্ধুপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কখনও কৃত্রিমতা বা কপটতার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি পরোপকারের সময় নিজের অবস্থা ভুলিয়া যাইতেন—দারিদ্র্য যেন আরো ডাকিয়া আনিতেন। ভেকের ডাকে সর্প আহূত হয়, তাঁহার সরল কাতর ডাকে যেন ঘোর দারিদ্র্য আহূত হইত—তিনি অভাবগ্রস্তের উপকার না করিতে পারিলে কাঁদিয়া সহৃদয়তা দেখাইতেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে কপটতাপূর্ণ এযুগের নিতান্তই অনুপযোগী ছিলেন। তিনি যেন প্রাচীন যুগের ঋষিদিগের সরল হৃদয় পাইয়াছিলেন। তাই শুধু মহৎ হৃদয় লইয়াই তিনি আজীবন ঘরকন্না করিয়া গিয়াছেন। তিনি বড় কিসে,কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমরা বলিব, তিনি হৃদয়-শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কর্ম্ম,জ্ঞান ও প্রতিভা তদীয় হৃদয়ে এমন অটল আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, তিনি কঠোর সন্ন্যাসীর ন্যায় আপনা ভুলিয়া অন্যের উন্নতির কামনা করিতেন। এরূপ নিষ্কাম জীবন দেশে অধিক হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। তাঁহাকে কাহার সহিত তুলনা করিব? তাঁহার তুলনা কেবল তিনিই। আজ দুঃখে হৃদয় অবসন্ন, অধিক আর লিখিব? তাঁহার ভ্রাতা লিখিয়াছেন—“তিনি এখন আমাদের কথা ও নব্যভারতের কথা ভাবিতেছেন।” আমরা বলি, তাহাই হউক, তাহাই হউক। আমরা তাঁহার অযোগ্য বন্ধু, অনন্তকাল পর্য্যন্ত যেন তাঁহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত না হই। তবে যাও, দেব, সেই নিত্যানন্দ ধামে, যেখানে প্রপীড়িতের বিচার আছে, আর্ত্তের জন্য দয়া ও সহৃদয়তা আছে, পরিত্যক্তের প্রতি সহানুভূতি আছে—সৎকার্য্যের পুরস্কার আছে, যাও সেখানে, যেখানে চরিত্র ও সংযমের আদর আছে। বিধাতা তোমার জন্য স্বর্ণ-সিংহাসন রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তোমার যোগ্যস্থান অধিকার করিয়া স্বর্গকে উজ্জ্বল কর, আমরা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিতেছি।

বঙ্গবীরগণের অভ্যর্থনা।

আজি আমাদের কি আনন্দ, বগুড়ার আজি কি শুভদিন, আজি আমাদের হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান, গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী ও জনসাধারণ নির্ব্বিশেষে সকলের কি বিমল সুখের দিন, আজি আমাদের দেশের গৌরব, ভভিষ্যতের আশা, নবীন বীরমণ্ডলী,আমাদের নয়ন-যুগলের তৃপ্তি বর্দ্ধন করিবার জন্য বগুড়া আগমন করিয়াছেন। আজি আমরা

গৌরবের সহিত বলিতে পারি, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মুখমণ্ডল নবোদিত সৌর-কিরণে সমুজ্জ্বল,আমাদের সমগ্র সভ্য সমাজের নিকট বালর্ক-জ্যোতি-বিনিন্দিত উজ্জ্বল মুখ-কান্তি, যখন আনন্দ সহকারে আমরা সেই কথার প্রতিধ্বনি করি, আমরা বাঙ্গালী,আজি জগৎ দেখুক, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণী, শত্রু মিত্র সকলে দেখুক, আমাদের বীর বালকগণ বীর-কান্তিতে মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া সকলের নিকট বলিবে, আমরা বাঙ্গালী। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা, তার স্বরে মধুর সঙ্গীতে জগৎবাসীকে স্তব্ধ করিয়া বলিব, আমরা বাঙ্গালী।

বৈদেশিক লোকের নিকট আমাদের কি লাঞ্ছনা, মেকলে হইতে সামান্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণের নিকট আমাদের কি গ্লানি, আমরা ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী। যে বাঙ্গালী ক্লাইবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে নিজেরা মণ্ড খাইয়া ইংরাজকে অর্থ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলবীর্য্যে দেশ অধিকার করিয়াছিল, যাহারা লালপল্টনরূপে ইংরেজকে বঙ্গদেশ বীরবীর্য্যে অধিকার করিয়া দিয়াছে, যাহারা প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের সহিত অসম সময়ে জয়লাভ করিত, সে স্মৃতি দূর হইয়াছে। আমরা দেশীয় ও বৈদেশিকগণের নিকট ভীরু, কাপুরুষ রূপে অবস্থান করিতাম। আজি সেই গ্লানি, সেই লাঞ্ছনা, সেই অপমান ঘুচিল, আমরা আবার মুক্তকণ্ঠে বলিব, আমরা বাঙ্গালী। কেন আমরা এ গঞ্জনা জগতে ভোগ করিতাম, আমরা কিসে কম? গত এক শতাব্দীতে বঙ্গদেশে কত মনস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমণ্ডলের অন্যত্র কোথাও এরূপ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মধ্যে রামমোহন, দেবেন্দ্র,কেশব,বিবেকানন্দ; সাধক মধ্যে রামকৃষ্ণ অঘোর, বিজয়কৃষ্ণ; বক্তা মধ্যে রামগোপাল, কেশব, প্রতাপ, কালীচরণ.লালমোহন,সুরেন্দ্রনাথ; সাহিত্যেক মধ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, বঙ্কিম, দীনবন্ধু; কবি মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র; বৈজ্ঞানিক মধ্যে জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র। যেদিকে দেখিনা কেন, বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী, বোধ হয় এসিয়া খণ্ড মধ্যে জাপান ভিন্ন আর কোন জাতি বাঙ্গালীর সহিত সমকক্ষ নহে। বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা বলে যত না হউক, বাঙ্গালী জগতে ধর্ম্মনেতা। তথাপিও বৈদেশিক গর্ব্বিত জাতিগণের অহঙ্কার আমাদের মুখ ম্লান করিত কেন? মেকলে সাহেবের সেই কথা, শত শত ক্রোশ-নিবাসী নদীতীরবর্ত্তী লোক মধ্যে একজন লোক অস্ত্র ধরিতে পারে না,আজি তোমাদের দ্বারা আমাদের সেই অপমান বিদূরিত হইল। আজি আমরা আনন্দ মনে, উৎফুল্ল হৃদয়ে এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব। আবার আমাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, রাম-লক্ষ্মণ, পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ, আকবর ও বাবর,সেরশাহ,বক্তিয়ার বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিবে, আবার বঙ্গের বীরত্বে, যেমন বৌদ্ধযুগে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন জাপান পূর্ব্ব-উপদ্বীপ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, বঙ্গের সেই দিন আসিবে।

তাই এস, বঙ্গের সুসন্তানগণ! তোমাদের নিজ বাসগৃহ বঙ্গভূমি তোমাদের গৌরবে আজি আনন্দিত। আমরা যদি বৃদ্ধ না হইতাম, তোমাদের সঙ্গে একত্র অস্ত্র ধারণ করিয়া ভারত-মাতার ও বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতাম,কিন্তু তোমাদেরই আমরা,পিতার গৌরব পুত্রের, পুত্রের গৌরব পিতার, ভ্রাতার গৌরব ভ্রাতার। আজি তোমরা বীর, বীর্য্যে

অস্ত্র ধারণ করিয়া জগতের নিকট দেখাও যে, বাঙ্গালী বীরত্বে কাতর নহে। আজি তোমাদের মধ্য হইতে রবার্টস্ ও কিচ্‌নার, জফার ও হিণ্ডেনবর্গের ন্যায় সেনাপতিগণ উত্থান করুক। দেখাও তোমরা জগৎকে, সেই আদিম সভ্য বাঙ্গালী জাতি বার্দ্ধক্যেও শূর। আজি তোমরা রাজভক্তি-প্রণোদিত হইয়া, যে ইংরাজ তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এই নব গৌরব-পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন, তাহাদের নিকট আত্ম গৌরব প্রকাশ কর। যেমন এক সময়ে মানসিংহ, টোডরমল্ল, জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহ মোগলসম্রাটের গৌরব-স্তম্ভ ছিলেন, তেমনি বাঙ্গালী বীরগণ, বীরত্বে মণ্ডিত হইয়া স্বদেশে বিদেশে ইংরাজের রাজত্বের গৌরব সাধন কর। এই বিপদ সময়ে ইংলণ্ডের সহিত স্কন্ধে স্কন্ধে, হস্তে হস্তে, বক্ষে বক্ষে সমর-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বিপদের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার কর। তোমরা জর্ম্মণের নিকট অসীম বীরবীর্য্যে দণ্ডায়মান হইয়া সভ্যতা ও স্বাধীনতার সমরে অগ্রসর হও। জর্ম্মণ-অত্যাচার, জর্ম্মণ-প্রতিহিংসা, জর্ম্মণ-বর্ব্বরতা নিবারণ করিতে ইংরাজের দক্ষিণ-হস্ত হও। জগৎকে দেখাও, বীরত্ব ধর্ম্মের সহচর, বীরত্ব দয়ার সহচর, বীরত্ব সতীত্বের রক্ষক, বীরত্ব সাধুতার অঙ্গ, বীরত্ব পুণ্যের অঙ্গ, বীরত্ব দেবত্বের সোপান। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান বাঙ্গালী বীরত্বের সহিত দয়া,তেজের সহিত কোমলতা, শক্তির সহিত হৃদয়বত্তা, দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্ম, শূরত্বের সহিত দেবত্ব একত্রিত কর। সংক্ষেপে এই কয়টী কথা বলিয়া আমি তোমাদিগকে এই নগরীতে আহ্বান করিতেছি। দয়াময় বিধাতা তোমাদের সহায় হউন।

এস এস আজি বীরবীর্য্যে সাজি
বাঙ্গালার সুসন্তান।
জগৎ জুড়িয়া জগৎ ছাইয়া
গাউক তোমার গান।
গাউক জগৎ বাঙ্গালীর বীর্য্য,
বঙ্গের গৌরব-কথা।
ধরমে করমে বীরত্ব গৌরবে
ত্রিদিব সমান যথা।
বাঙ্গালার এই শস্যশ্যামলা
সুজলা সুফলা ভূমি।
চিরদিন যেন কর্ম্মভূমি রূপে
থাকহে গৌরবে তুমি।
জগৎ গাউক তোমাদের যশ,
গাইব আমরা সঙ্গে।
বীরত্ব বীরত্ব সহ অলঙ্কৃত
আজি এ নবীন-বঙ্গে।
এস বীরগণ বঙ্গের গৌরব
মোদের প্রাণের আশা।
হৃদয় খুলিয়া লও আমাদের
পরাণের ভালবাসা।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

"ঘরে বাইরে"।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ফরাসী-বিপ্লবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণের উদ্‌গম দেখিয়া Burke সক্ষোভ বিদ্রূপের সহিত বলিয়াছিলেন যে, ফরাসীদেশের পরিত্যক্ত হাবভাব আমদানী করিয়া ইংলণ্ড গৌরব বোধ করেন। আমাদের দেশেও "নারায়ণ" ও "সবুজপত্রে"র কোন কোন রচনা ও প্রবন্ধ দেখিয়া সেই কথাই বলিতে ইচ্ছা করে। Ruskin-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বহুপূর্ব্বে "Art for art's sake" সম্বন্ধে যেসকল সিদ্ধান্ত দিয়া গিয়াছেন, এখন সেই সকলের দোহাই দিয়া প্রথিতনামা বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণকে অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্রবর্ত্তনে নিরত দেখিতে পাই।

বিগত চৈত্র সংখ্যক "সৌরভে" "হৃদয়বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথঠাকুরের "ঘরে বাইরের" সমালোচনা বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটীর আরম্ভ এইরূপ "৬—১২-১৬. রাত্রি ৭টা" (যেন এমন কোন বহুমূল্য অনাবিষ্কৃত সত্য প্রবন্ধকারকে সহসা আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, যাহা অনুভূতিমাত্রেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন!) "রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' শেষ করা গেল...এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় তো এমন কোনও গ্রন্থ পড়ি নাই, অন্য ভাষায়ও নয়, grand book!... লিখিতে হইলে এমন বইই লেখা উচিত" ইত্যাদি।

লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় ঈষৎ ভ্রমে পড়িয়াছেন। যখন তিনি নানা ভাষার অধিকারী, তখন অনায়াসেই ফরাসী ভাষায় এমন পুস্তক আরো অনেক দেখিতে পাইবেন।

"ঘরে বাইরে" পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, পরিণত বয়সে এমন অশ্লীলভাবে হিন্দু "ঘরের" এমন জঘন্য চিত্র 'বাহির' করিতে ঋষি-আখ্যাত রবীন্দ্রনাথের কিরূপে প্রবৃত্তি হইল।

"ঘরে বাইরের" ২০-২১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, দুই একবার মাত্র দর্শনের পরেই সন্দীপচন্দ্রের "মন হরণ করিবার জন্যে" বিমলা নির্ল্লজ্জ প্রয়াস পাইতেছেন। "আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য্য সুন্দর ক'রে গড়লেন না? সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ চুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়ে ছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির-পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি সাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড় দেওয়া হাতকাটা জ্যাকেট।"

অবশ্য ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও হাল ফ্যাসানে হাতে হাতে দেওয়া আছে "কারো মনহরণ করবার জন্যে যে তা নয়।...সন্দীপ বাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রৎ শক্তিকে দেখতে পাবেন না?"

কিন্তু মেজরাণীর সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিক apt—"তোমার বিলিতী দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরী হ'ত।" * * অন্যত্র মেজজা গান ধরিলেন—'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে, অগাধ জলের মকর যেমন, ও তার চিনি চিটে জ্ঞান নাই'।"

বিমলা দেশের "জাগ্রৎশক্তি" কি "যে আগুণ ঘরকে পোড়ায়, যে আগুণ বাহিরকে জ্বালায়, সেই আগুণের সুন্দরী দেবতা" দশ পৃষ্ঠা পরে সন্দীপ স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া

দিয়াছেন। বিমলা ও মাষ্টার মহাশয়ের "ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন" এই আশীর্ব্বাদে "চমকভেঙ্গে" স্বীকার করিয়াছেন, "ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন ছিল"। কেন না, ৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি মানিয়া লইয়াছেন "আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্বন্ধের মধ্যে তখন ছুরি চলছিল।" পাঠকগণ মনে রাখিবেন, সন্দীপের সহিত এই হিন্দুকুললক্ষ্মীর এই প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ!

বীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন (সৌরভ—চৈত্র ১৭৪ পৃষ্ঠা) "সন্দীপচন্দ্র গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র (!!) গোরার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এমন চরিত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যে নাই, অন্য কোথায়ও আছে কি না, জানি না। ইনি ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ অবতার—ইহার এক একটি কথা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, নিতান্ত যে কাপুরুষ, তাহার মনেও সাহস এবং উৎসাহ জাগিয়া উঠে। ...রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখে Nietzcheর দর্শন প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন"।*

তুলনার কি অপব্যবহার! Nietzche কি woman flesh huntingকেই superman-এর উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন? সন্দীপ তো তাহার আত্মকথায় এই উদ্দেশ্যকেই তাহার চরম অভিপ্রেত বলিতেছেন। "ঘরে বাইরে" ৪২ পৃঃ "আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের জয় করতে আমার দেরী হয় না। বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁস থাকেনি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায়, সেইটেই হ'চ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি।"

Artএর নামে কি জঘন্য চিত্র সাহিত্যের বাজারে এত বড় শিল্পী অকুণ্ঠিতভাবে চালাইয়াছেন, এখন তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিব।

সন্দীপের আত্মকথা ৫৪পৃঃ "আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে পরদা উড়ে উড়ে পড়ছে, ঐ যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চল্‌ছে—ঐ যে লাল ফিতে ছোট্ট-এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ওযে কাল বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙ্গা, ঐ যে পাড়ের এতটুকুভঙ্গী, ঐ যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ।" ইত্যাদি। আবার ৫৭ পৃষ্ঠায়—"আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরিজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলন-নীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কি জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষিরাণী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়ছে। পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপরে আরেকটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল।"

তৎপরে এই বই লইয়া "চোখের-বালি" বিনোদিনী-মহেন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" কাড়াকড়ি ব্যাপারের refined অভিনয়।

বিমলা একস্থানে সন্দীপের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথেই বিশেষরূপে প্রযোজ্য—"আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে সব ছবির, যে সব কথার

* বীরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"সন্দীপচন্দ্র! কি বিঁদঘুটে নাম, অর্থ কি?" নবদ্বীপচন্দ্র বা বঙ্গচন্দ্রের analogyতে অবশ্যই এই নামের উৎপত্তি।

আলোচনা করতে ভালবাসেন, আজো আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচেনি।" আশা করি, পাঠক পাঠিকাগণের সে অভ্যাস সহজে ঘুচিবে না।

অন্যত্র ১৫০ পৃষ্ঠায় "সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম।...এখন আমার কাজের ভীড়—অতএব এখনকার মত রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্য্যন্তই থাক্, তলানি পর্য্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ কর এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহিতারে মিড় লাগাতে থাক।"

ক্রমে মাত্রা বাড়িতেছে। ১৯৭ পৃষ্ঠা বিমলার আত্মকথা—"এক মুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কাল মোড়ক খুলে গেল। তার মুখ চোখ আনন্দে ঝক্‌মক্ করতে লাগল।...সে চৌকীথেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কি তার মৎলব ছিল জানিনে...আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম।"

২১৩ পৃষ্ঠায় ইহা অপেক্ষাও বাড়াবাড়ি। "সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখ তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন আকাশের তৃষ্ণার মত জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই একবার চঞ্চল হয়ে উঠল, বুঝতে পারলুম সে উঠি উঠি করছে, এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতর দুলতে লাগল ...দরজার দিকে ছুটলুম...সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা নাই। এইত গেল উপন্যাসের villain। Heroর চরিত্রবিশ্লেষণ সন্দীপের মুখেই বেশ ফুটিয়াছে—"অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয় না কেন? আমি জানি ও অপেক্ষা করে আছে বিমলা কি করে। বিমল যদি ওকে বলে তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলে নি তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে তা'হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে।...ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্ররকমের গল্প কি নাটক গড়া চলেনা, ঘর করা ত দুরের কথা।"

সমগ্র গ্রন্থে দুইটি মাত্র ভাল চরিত্র আছে—অমূল্য ও চন্দ্রনাথ। অথচ এই মাষ্টার মহাশয় সম্বন্ধে বীরেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "নিখিলেশ যতই কেন প্রশংসা করুন না, ইনি শ্রদ্ধা অপেক্ষা ঘৃণাই অধিকতর উৎপাদন করেন।" কিন্তু গোরার পরেশ বাবুর ন্যায়, গ্রীক নাট্যের কোরসের ন্যায়, ইনিই একা ঘটনাবলীদ্বারা অবিচলিত, শান্ত, সমাহিত-চিত্ত।

ভালকথা, ১১১ পৃষ্ঠার এই লাইনটীর অর্থ কি? "পরমাশক্তি এক এক জন বিশেষ মানুষের কাছে এক একজন বিশেষ মানুষেরই-রূপে দেন"—!!

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নব্যভারত।

সার্থক জনম তব, সার্থক এ নাম,
কৃতার্থ হয়েছ তুমি—সিদ্ধ মনস্কাম!
নবীন জাপান চীনে সাফল্য সূচনা,
তুরুস্ক পারস্য দেয় রক্তে আলিপনা!
স্থাপিছে মঙ্গল ঘট নব মঙ্গলিয়া,
তিব্বত দিয়াছে আম্রপল্লব পাতিয়া!
শ্বেত হস্তী রুষ বর্ষে অভিষেক বারি,
পুণ্যময় প্রাজাপত্য সর্ব্ব পাপহারী!
অযোধ্যার বীর্য্যলব্ধা, বাঙ্গালীর বীর
পবিত্র করিলা যেই জলধি-মন্দির—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে ভারত-সাগর
সজ্জিত স্বস্তিকে আজ শোভে মনোহর!
শাপ-ভ্রষ্টা ইন্দিরা সে সিন্ধুরাজবালা
সাজাইয়া মাঙ্গলিক বরণের ডালা—
কিরীটে কুণ্ডলে দণ্ডে ছত্রে সিংহাসনে,
ঐক্যে সখ্যে নবশক্তি নবীন জীবনে,
জগতের পূজা অর্ঘ্য পারিজাত হারে
মহিমা গৌরবপূর্ণ নতি নমস্কারে,
ধর্ম্মে কর্ম্মে বিজয়ের শ্বেত পতাকায়,
দগ্ধ ধরা স্নিগ্ধ করা শান্তির সুধায়!
উজলিয়া অতীতের অনন্ত অতল
উঠিতেছে, উঠে যেন রক্ত উতপল
ভেদি নীল বারিরাশি! সাগরের সিঁড়ি
চরণ অলক্তে তার হাসে ঘাটগিরি!
অগস্ত্য ফিরেছে, বিন্ধ্য তুলিয়াছে শির
ভেদিয়া পাষাণ বক্ষ বজ্র নিয়তির।
বাজে বিশ্বে রণবাদ্য—ঘোর অট্টহাস—
নব্যভারতের আজ নব অধিবাস!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নব্যভারতের বিগত চৈত্র সংখ্যায় আমার এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, সে সকলের উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। আমি তাঁহার সহিত "এ ভাবে আর আসরে নামিব না"। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে কথিত প্রতিবাদ লিখিতে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু তাহা নহে। আমি তাঁহাকে "নব্যভারতের পর সংখ্যায়ই" অনুতাপ করিতে বলিয়াছিলাম। আমি কাহারও "ইঙ্গিতে" পরিচালিত হইয়াছিলাম, এরূপ অসত্য কথা প্রচার করায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে অনুতাপ করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু তিনি পাঁচ কলম লিখার পর যে ভাবে অনুতাপ করিয়াছেন এবং তাহার পরেও যে সাত কলম লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করাই আমার পক্ষে সঙ্গত। আমি তাঁহার সহিত আর আসরে নামিব না। অন্য কেহ এরূপ করিলে দুঃখিত হইতাম না, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার যেরূপ বন্ধুতা, তাহাতে আমি মনে

করিয়াছিলাম যে, তিন চার লাইনেই অনুতাপ প্রকাশিত হইবে। অনুতাপ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ক্ষমা প্রার্থনাও হইয়াছে; কিন্তু পাঁচ কলমের পর উহার মিষ্টতা থাকে না। সে যাহা হউক, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অতিশয় প্রাচীন হন নাই; একটুও প্রাচীন হন নাই। ইহারই মধ্যে স্মৃতি-শক্তি এত কমিয়া গেল, দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে। নব্যভারতের চৈত্র সংখ্যার ৭১৮ পৃষ্ঠার বাম কলমে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে আমি যে কথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে "স্বয়ং" বলা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি বলি নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লর্ড কারমাইকেলের প্রতিকৃতির "আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে সার আশুতোষ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সুতরাং "বঙ্গভাষার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন" লিখা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভ্রম; সুতরাং এই সম্বন্ধে কথিত ৭১৮ পৃষ্ঠায় বাম কলমে ৫ ও ৬ লাইনে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এইভাবে প্রকৃত হইতে পারে না। স্মৃতি-বিভ্রাট ও কদর্থ গ্রহণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে বিপথে লইয়া গিয়াছে। সার আশুতোষের "মাতৃ ভাষায় তাদৃশ দখল না থাকা" প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অতিমাত্র আগ্রহ কেন? এরূপ প্রয়াস তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির যোগ্য হয় নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এইরূপ প্রয়াস শ্রদ্ধাপদ শাস্ত্রী মহাশয় কখনই অনুমোদন করিবেন না।

শ্রীশশধর রায়।

সঙ্গণিকা।

(১)

৺ সুকুমার রায়।

Bar-at-law.

জন্ম—৫ই জুলাই, ১৮৮০ খ্রীঃ।

মৃত্যু—৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩২৪।

২০শে মে, ১৯১৭।

(ক)

পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্রহীনা সোণার অবলা আজ মহা-পাথারে ভাসিয়া চলিয়াছেন, পাঠক সে চিত্র দেখিবে কি? পীড়িত স্বামীকে রক্ষা করার জন্য বাঁকীপুরে "দাসী-ব্রত" গ্রহণ করিয়া, অঘোর-দুহিতা, দেবীত্বে উপনীত হইতেছিলেন, সহসা কাণে সংবাদ পৌঁছিল, স্বামী মৃত্যু-শয্যায়; অমনি ছুটিয়া কলিকাতার আনন্দ-আশ্রমে আসিলেন। আনন্দ-আশ্রম, ভাবিয়াছিলাম, সাধ্বী বিদ্যুল্লতা, সাধুরসিকলালেরই তুমি পুণ্যখচিত দেহ-রক্ষার ধাম ছিলে; তোমাকে আজন্ম-পবিত্র সুকুমারও যে এত ভালবাসিত, তাহা ত জানিতাম না। তিনি কাহার মায়ায় কি দেখিতে অন্তিম-সময়ে আনন্দ-আশ্রমে ছুটিয়া আসিলেন? যে ধামকে তাঁহার জননী অলকা দেবী, মাসী-মাতা কাদম্বিনী ভালবাসিতেন, এবং বিনোদিনী, হেমাঙ্গিনী স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং যে ধামে তাঁহার পিতা কত সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই ধামে দেব-শিশু সুকুমার কাহার মায়ায় আসিলেন? সাধ্বী কমল-কামিনী নাই, প্রতিষ্ঠাতা পীড়িত-অবস্থায় দূরে পুরুষোত্তমে, সুকুমার কি অন্তিমে শান্তির আর স্থান পাইলেন না? তদীয়

গভীর ভালবাসার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত—তিনি বহু আত্মীয় আত্মীয়াকে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ-আশ্রমের সামান্য কুটীরে আসিলেন! আমরা যত ভাবি, অবাক্ হইয়া যাই—কি দুঃখের কথা শুনিলাম! আজ অঘোর-দুহিতা স্বামীর শ্মশান আনন্দ-আশ্রমকে শান্তি ধাম বলিয়া বরণ করিতেছেন। বরণ করিয়া জন্মের মত, জীবনের আশা ভরসা সব জলাঞ্জলি দিয়া, ভ্রাতার সহিত নিভৃতে যাইতেছেন! আমরা ভাবিতে পারি না, মুহূর্ত্তে কি দৃশ্য প্রকটিত হইল! সোণার ঘটে কালিমা অঙ্কিত—ঘোর বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ!

(খ)

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহা-তপস্যায় সাধ্বী পুণ্যবতী অলকাকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। এই মিলনের ৪ পুত্র, ও তিন কন্যা সংসারকে উজ্জ্বল করিতেছিল। লীলা, প্রভা, বিভা;—সুকুমার, রাজু, নান্নু, খোকা – কত আদরে লালিত পালিত হইয়াছিল। আমরা কত সময়ে বিস্মিত নেত্রে দেখিয়াছি, বিপত্নীক ক্ষীরোদচন্দ্র সাদরে সকল সন্তানের পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন কুড়াইয়া খাইতেছেন! তাঁহার পূর্ব্ব-সংসারের পুত্রকে ক্রোড়-শূন্য করিয়া বিদায় দিয়াছিলাম যখন, সেদিন ক্ষীরোদচন্দ্রের এক অমানুষী মহত্ত্ব দেখিয়াছিলাম,—আর মহত্ত্ব দেখিয়াছি—এই সকল সন্তান-পালনে। ইঁহাদের শিক্ষার জন্য তিনি কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন। অবশ্য সকল পিতাই তাহা করিয়া থাকেন, কিন্তু এক জনকে ইংরাজী সাহিত্যের প্রোফেসর, একজনকে I. M. S. ও দুই মেয়েকে বি-এ পাশ করাইতে কত ব্যয়, তাহা সকলে জানেন না। ক্ষীরোদচন্দ্র ধনী ছিলেন না, অথচ ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়াও কাহারও দ্বারস্থ হন নাই,—ইহাদিগকে মানুষ করিতে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন;—আজ তাঁহার কটকের বাড়ী দেনার-দায়ে আবদ্ধ! তাঁহার কাগজ গেল, স্কুল গেল, প্রেস বন্ধ হইল—তিনি পৌত্র-জন্মের সংবাদ পাইয়া মহানন্দে দেহ-ত্যাগ করিলেন। বহুকাল পরে সুকুমারের পুত্ররত্ন লাভ হইল;—কিন্তু এক বৎসর বয়সের মধ্যে সেও গেল। পুত্রও পিতৃবিয়োগের বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে ঐ সাত রত্নের এক রত্ন সোণার চাঁদ সুকুমারও গেলেন! শোকের অগ্নি আজ ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

(গ)

লীলার যখন বিবাহ হইল, ক্ষীরোদচন্দ্রের কত আনন্দ! সুকুমার যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিল, ক্ষীরোদচন্দ্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। রাজু যখন এম-এ পাশ করিল, প্রভা ও বিভা যখন বি-এ উত্তীর্ণ হইল, নান্নু যখন I. M. S. হইল, ক্ষীরোদচন্দ্রের কত আনন্দ। সুকুমারকে তদীয় বাল্য-বন্ধু অঘোরনাথের সোণার দুহিতার সহিত বিবাহ দিলেন, কত আনন্দ! তৎপর বিভার বিবাহ হইল, কত আনন্দ। তৎপর সুকুমারের পুত্র লাভ হইল, ক্ষীরোদ চন্দ্রের কত আনন্দ। কঠোর ব্রতধারী ক্ষীরোদ পেন্সন লইয়াও, নিজের পায়ে ভর করিয়া, উৎকলের উন্নতির স্বপ্নে বিভোর হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋণের দায়ে কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিলেন, তবু মনে করিলেন,—বিধাতার কৃপায় আবার দাঁড়াইবেন। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। কঠোর রোগে আক্রান্ত হইলেন। পুরীর "নীলিমায়" আশ্রয় পাইয়া একটু ভাল হইয়া আবার উৎকলের উন্নতির চিন্তায় বিভোর ক্ষীরোদ কাজে নিযুক্ত হইলেন। সকলের প্রাণে তাহা সহিল না, ক্ষীরোদচন্দ্রকে

দমন করিবার জন্য "Star of Utkal"এর জামিন তলব হইল। কাগজ ও প্রেস বন্ধ হইল। ক্ষীরোদচন্দ্র স্কুল করিয়া ছেলেদিগকে—উৎকলের ভাবী বংশকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুকুমার তখন পূর্ণ উদ্যমে কটকে ব্যারিষ্টারি করিতেছেন, ভয় কিসের? তিনি আমাদের এবং আর আর কত বন্ধুর উপদেশ উপেক্ষা করিয়াও পূর্ণ উদ্যমে স্কুল করিলেন। কিন্তু সংসারে যেমন হইয়া থাকে, অনুগৃহীত ও প্রতিপালিত কেহ কেহ স্কুল আত্মস্থ করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন! কিন্তু তবুও ক্ষীরোদচন্দ্র দমিলেন না—সে উদ্যম যে দেখিয়াছে, সে-ই বলিয়াছে, এত পরিশ্রম সহ্য হইবে না। আবার গত বৎসর সে মাসে পুরীর নীলিমায় যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। আমরা যাইতে লিখিলাম, তিনি লিখিলেন, 'সেবার নীলিমায় যাইয়া কাগজ হারাইয়াছি, এবার যে মাসে যাইয়া স্কুল হারাইব না, জুন মাসে যাইব।" কিন্তু জুন মাস ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল! পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-ব্যাধির আক্রমণে হতচেতন হইলেন—আর জাগিলেন না। সোণার মূর্ত্তি, উৎসাহের উজ্জ্বল দীপ্তি, কটকের রায়বাহাদুরদিগের শ্মশানের পার্শ্বে ভস্মে পরিণত হইল!

(ঘ)

বৌমা প্রসবের জন্য হায়দরাবাদে ভ্রাতার আশ্রয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে পুত্ররত্ন লাভ হইল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই, আয়ার ক্রটীতে সন্তান কালগ্রাসে পড়িল! সুকুমার বৈরাগী সাজিয়া উন্মত্তের ন্যায় কটকের কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া সেখানে গেলেন। কিছুদিন পর একদিন আনন্দ-আশ্রমে আসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি নিরাশ্রয়, আমাকে আশ্রয় দিন। একটী চাকুরী যুটাইয়া দিন; আমাকে বিধানরায় বলিয়াছেন, আমি আর বাঁচিব না!" আমরা প্রবোধ দিলাম। শেষে ক্ষীরোদ-বন্ধু ছাপবার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহকে ধরিলাম। তিনি দয়ার সাগর, সুকুমারকে নিজ গৃহে রাখিয়া উন্নতি করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। সব ঠিক হইল, কিন্তু কাল ব্যাধি সোণার চাঁদকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। পিতৃশোক ও পুত্র-শোক কি ব্যাধি আকারে তদীয় শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল? ক্ষীরোদচন্দ্রের মহা তপস্যা ও সাধনার পরিণাম যেন ঘনাইয়া আসিল!

(ঙ)

পীড়িত অবস্থায় গৌহাটি-কলেজের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা শুনিলাম, "সুকুমার গৌহাটী ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট যাইয়া ভাল আছেন, শীঘ্রই শিলং যাইবেন।" পীড়িত অবস্থায় পুরী যাইয়া শুনিলাম, প্রফুল্লচন্দ্র (রাজু) শিলং গিয়াছেন, কিন্তু পীড়িত সুকুমার কলিকাতায় অসিয়াছেন। কিছুদিন পরই বৌমার পত্রে জানিলাম, সুকুমার আনন্দ-আশ্রমে আসিয়াছেন। আমরা সুকুমারকে যত্ন করিতে বৌমাকে লিখিলাম। সুকুমার আমাদের ভালবাসা স্মরণ করিয়া আনন্দ-আশ্রমে আসিলেন, কিন্তু আমরা পীড়িত, দূরে, অতি দূরে। যাইয়া দেখিতে পারিলাম না, এত শীঘ্র যে যাইবেন, তাহা বুঝি নাই। আমাকে রক্ষা করিতে বৌমা ডাক্তারের হাতের পুত্তলিকা সাজিয়াছেন, আমার আহারের সময় যে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন, সংবাদ দিবার বেলায়ও সেই কঠোরতা! পত্র আর আইসে না। শেষে হঠাৎ একদিন লিখিলেন—"রবিবার রাত্রি ১২টার সময় সুকুমারবাবু দেহ রক্ষা করিয়াছেন!" আরও

লিখিলেন, "সুপ্রসন্ন সৈন্য হইয়া করাচিতে গিয়াছেন।" ক্ষীরোদচন্দ্র সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে যেন আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন! হায়, এই সাজ্ঘাতিক সংবাদে দারুণ পীড়ার সময় সামলাইতে পারিব কি?

(চ)

গত রবিবার (১৩ই জ্যৈষ্ঠ) আনন্দ-আশ্রমে সুকুমারের আদ্য-শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৌমা লিখিয়াছেন—"প্রভা শিলং গিয়াছেন, নেলি আনন্দ-আশ্রমে আছেন, ৩।৪ দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবেন। তাহার ভ্রাতা ভূপেন বাবু **নিতে** আসিয়াছেন।" শুনিয়াছি, বৌমা এবং **প্রভাত** সুকুমারকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়ালেন। শুনিয়াছি, বিধান রায় মহাশয়ও যথেষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! সুকুমার অনন্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এইবার বড় সাধের সোণার প্রতিমা জন্মের মত ভাসিয়া চলিলেন। এলোকেশীর মৃত্যুর পর শাস্ত্রীজী বড় কষ্টে লিখিয়াছিলেন, "নবীন জন্মের মত জলে ভেসে যায়!" আজ কোন্ কবি, নেলির অবস্থা বর্ণনা করিতে পারেন? সাধের সংসার ভাসিয়া গিয়াছে, সাধের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, সংসারকে ভাসাইয়া দিয়া মা আমার চির-বৈরাগিনী, যৌবনে যোগিনী সাজিয়া চলিলেন! হায়, ক্ষীরোদচন্দ্র আজ কোথায়? দেবী অলকা আজ কোথায়? সুকুমার আজ কোথায়? কিরূপে সহ্য করি? বিধাতা আজ প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া তুমি বলিয়া দাও, কি করি, কোন্ পথে যাই, আজ কাহাকে ডাকি?

(ছ)

আজ কাল নিভৃতে চক্ষের জল ফেলিতেছি আর ভাবিতেছি, কি দৃশ্য, কি বিষাদের চিত্র! এ সব স্বপ্ন কি? সুকুমার প্রকৃতই সুকুমার, আজীবন পবিত্র। বিলাতে যাইয়া ছেলেরা মদ ধরে, চুরুট ধরে, কত কি করে, কিন্তু সুকুমার নিষ্পাপ—কিছুই স্পর্শ করেন নাই। সুকুমার কি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন। সুকুমারের সরলতা—তাহা যেন তাহাকে অমানুষী সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছিল। চিত্র এ জীবনে অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ দেবোপম সরলতা-মাখা-চিত্র আর দেখি নাই। দেখি নাই—এমন নীরব ভালবাসা, যাহার মায়ায় তিনি আনন্দ-আশ্রমে দেহ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। প্রভাত, লিখিয়াছেন "আর কিছুদিন পূর্ব্বে আসিলে সুবিধা হইত—যথাসাধ্য সেবা করিলাম।" কিন্তু পূর্ব্বে আসিবেন কেন? সরলতা জমিয়া জমিয়া নিষ্পাপ অতি-সৌন্দর্য্য সু-কুমার-চিত্র রচনা করিয়াছিল, সংসার দুর্দ্দৈবে মলিন হইয়া যাওয়ার ভয়ে বুঝি বিধাতা ক্ষীরোদ চন্দ্র ও অলকার সোণারচাঁদকে তাঁহাদের ক্রোড়ে তুলিয়া দিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্রের সংসার-আনন্দ-নিকেতনে আজ চিতার আগুন ধুধু জ্বলিতেছে। হায়রে হায়—কি আর লিখিব!!

(২)

এবারকার প্রাদেশিক সম্মিলনে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যে সুচিন্তাপূর্ণ অভি-ভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। উহাতে অনেক অবান্তরিক কথা আছে বটে, কিন্তু নব্যভারতে বহুদিন হইতে ডিষ্ট্রীক্ট কনফারেন্স সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলাম, সে সকল কথার আলোচনা এবং আমরা ফরিদপুর-জেলা-সম্মিলনের সভাপতি

রূপে স্বরাজ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার পুনরুক্তি দেখিয়া সুখী হইয়াছি। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় রাজনৈতিক সভায় অভিভাষণ পাঠ বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের কুরুচিপূর্ণ গল্পের প্রশ্রয় না দিয়া,এইরূপ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের আদর করিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে এবং "নারায়ণ" পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হইবে। আবেদন নিবেদনের পরিবর্ত্তে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদরের যোগ্য।

চিত্তরঞ্জন বাবুর সকল মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই বটে, কিন্তু তিনি জাতীয়তা সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা প্রচলিত হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একদেশদর্শিতা বহুদিন থাকিবে না। বাঙ্গালা ভাষার গৌরব আরও বৃদ্ধি হইলে কে উহাকে আদর না করিয়া পারিবে? বিগত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে নৈরাশ্যের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিধাতা বাঙ্গালা ভাষার ললাটে উন্নতির তিলক অঙ্কিত করিয়া বিশ্ববিজয়ী শক্তিতে অনুপ্রাণিত করুন, ইহাই নববর্ষের প্রার্থনা।

(৩)

"সব জাতি এক ঠাঁই, আমরা সব ভাই ভাই"—ইহাই বঙ্গের নূতন বিধানের নূতন বিধি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই বিধানের আমলে টিকিবে না। এসম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বাবু ঠিক কথা বলিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার সকল একনিষ্ঠ সাধককে এসম্বন্ধে বীরদর্পে দাঁড়াইতে আমরা আহ্বান করিতেছি। নিম্নশ্রেণী, উচ্চশ্রেণী, সকলে সমবেত না হইলে বাঙ্গালা ভাষার কখনও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময় ছিল, এখন আর তাহা নাই; এখন "সব ভাই এক ঠাঁই" হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের" নিশান-তলে সকলে না দাঁড়াইলে এই ভাষা এবং তৎসহ এই দেশের আর মঙ্গলের উপায় নাই।

(৪)

সাহিত্যসেবিগণ কোন্ দেশে না জীবিত কালে উপেক্ষিত হইয়াছেন? মাইকেল, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি দুঃখ দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হইতেছেন, ভাবিলে দারুণ কষ্ট হয় বটে, কিন্তু দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? দুঃখ দারিদ্র্য এবং বিপদ আপদ আসুক, সাহিত্যিকগণ বীরদর্পে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া অচলা ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করুন। কে বলিতে পারে যে, নিষ্পেষিত এবং নির্ব্বাসিত টলষ্টয়ের লেখায় এবং পুণ্যের জোরে আজ রুষিয়ায় প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? ম্যাট্‌সিনি এবং টলষ্টয়ের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের সৎসাহস বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণকে অটল কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় দীক্ষিত করুক। নববর্ষে সকলে বলুন, মাভৈঃ মাভৈঃ।

(৫)

"আমরা বলি, তোমরা কর, তোমরা আমাদিগকে করিতে বল"—এরূপ করিলে কখনও দেশ উদ্ধার হয় না। ইউরোপের মহাযুদ্ধে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, সকলের কর্ত্তব্য সকলকে করিতে হইবে—সকলে এক-প্রাণে চেষ্টা না করিলে কখনও দেশ রক্ষা হয় না। মহাযুদ্ধে আমরাও বহুরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বটে, কিন্তু মহামিলনের মহাশিক্ষা যদি এদেশে জাগ্রত হয়, এদেশ ধন্য হইয়া যাইবে। বিধাতা কি সে শিক্ষা দিবেন না?

(৬)

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যে দেখিয়াছে, সে-ই মোহিত হইয়াছে। দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কি মহা নৃত্যে সমুদ্র মাতোয়ারা। কবে ভারতীয় নরনারীর হৃদয়-সমুদ্র এইরূপ কর্ত্তব্য-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে? আমরা সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। নববর্ষের নব-জাগরণে সে-ই নৃত্য এদেশে জাগ্রত হউক।

(৭)

আমরা চৈত্র সংখ্যা নব্যভারতের ৩৭নং সঙ্গণিকার ২য় পংক্তিতে লিখিয়াছিলাম যে, "কেহ কেহ মনে করেন যে ব্রাহ্মসমাজ এদেশ বা সাহিত্যের অঙ্গ নহে"—ইত্যাদি। এ দেশের প্রাচীন এবং নবোত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সম্বন্ধেও তাঁহাদের এরূপ ধারণা। ব্যক্তি বাদ দিলে যেমন সমাজ হয় না,ছোট ছোট সমাজ বাদ দিলেও তেমনি দেশ হয় না। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য ছোট বড় সকল নরনারী এবং ছোট বড় সকল সমাজই দায়ী। এই জন্য সকল ব্যক্তি এবং সকল সমাজের দোষগুণ উল্লেখ করাই প্রত্যেক সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। কাহারও অনুরক্তি বা কাহারও বিরক্তির দিকে চাহিয়া চলা সঙ্গত নহে। সৎসাহস এ দেশ হইতে যেন অন্তরিত না হইয়া যায়।

নানা ছোট সম্প্রদায়ের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য তাহাদের সহিত মিশিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, ব্যক্তিত্ব, বিলাসিতা এবং স্ত্রীপুরুষের অবাধ-মিলন চতুর্দ্দিকে কালিমা লেপন করিতেছে। রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ে মহিলা-সঙ্ঘ নাই বটে, কিন্তু উৎসবে অবিদ্যা-গমন নিষিদ্ধ নহে। এজন্য বেলুরমঠে কলঙ্ক কালিমা অঙ্কিত হইয়া থাকে। চা ও তাম্রকূট সেবন সেখানে সন্ন্যাসীদের নিত্য-সহচর। দরিদ্র-ভোজন ওরফে গলা-ধাক্কা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! বিশেষতঃ রামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জনের উপদেশ এখন কথা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। ধনী ও ধন দেখিলে সেবকগণের যত্ন ও সেবার ভাব ষোলকলা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এমন উদাহরণ জানি, দরিদ্রা মহিলার জন্য কাশী-সেবাশ্রমে যে মুহূর্ত্তে স্থান হয় নাই, সেই মুহূর্ত্তে ধনী রোগী আদৃত ও সাদরে গৃহীত হইয়াছেন। এমন ঘটনাও জানি, ধনীর নিকট চাতুরীজালে উইল লেখাইয়া লইয়া মামলা মকর্দ্দমা চলিয়াছে। এই জন্যই বুঝিবা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মৌনী অবস্থায় কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যোগীরা ধনীদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরেন কেন?" সেই শিক্ষা শিষ্যগণে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে, ব্রহ্মচারীগণ এখন ধনীর পদলেহনে সদা ব্যাপৃত, ধনীদের শত দোষ ত্রুটীও তাঁহাদের নিকট মার্জ্জনীয়। ৺ গোস্বামী মহাশয়ের মৃত্যুদিনের উৎসবে যাইয়া দেখিয়াছি, দরিদ্রেরা গলা ধাক্কা খাইতেছে, দরিদ্র ভদ্রলোক উপেক্ষিত হইতেছেন; সাদর আহ্বান করা থাকুক, প্রবেশা-

ধিকারও পাইতেছেন না, এদিকে ধনীর পশ্চাতে দলে দলে শিষ্যবর্গ ছুটিতেছেন। ইহার কারণ আর কি হইতে পারে? বিলাসিতার উপকরণ ধনীগণ না যোগাইলে কে অলসদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবে? রাজযোগ্য বিলাসিতাতেই বা কে তাহাদিগকে লালিত পালিত করিবে? এ সকল দেখিয়া, আমরা দিবারাত্রি অশ্রু-বর্ষণ করিতেছি। ভিক্ষার ঝুলি যাঁহাদিগের সম্বল, রাজোচিত বিলাস-বেশ ভূষায় তাহাদিগকে শোভিত দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? বিধাতা, দুর্নীতি এবং বিলাসিতার হস্ত হইতে সকলকে উদ্ধার করুন।

(৮)

আমরা আবাল্য স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজকাল স্ত্রীশিক্ষায় যে সকল পাপ সমাজে প্রবেশ করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। মাতৃজাতির নিন্দা-ঘোষণায় আমরা বড় ক্লেশ পাইতেছি। সে সকল সংশোধিত হওয়া উচিত। চতুর্দ্দিকে ঘোষিত সে পাপ-সকল এই—

(ক) আত্মহত্যা।

(খ) বিলাসিতার অনুকরণ। নানা সংবাদ-পত্র পাঠের ফলে সুবাসিত তৈল এবং দেশী ছাঁচে প্রস্তুত নানা বিলাতী সুগন্ধি-দ্রব্য ও নানারূপ বসন ভূষণের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি।

(গ) স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধি, অবাধ-স্ত্রীপুরুষের মিলনে প্রবৃত্তি।

(ঘ) স্বামী-গ্রহণে অসম্মতি বা স্বামীর প্রতি, শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি ভক্তির অভাব।

(ঙ) গৃহ-রক্ষা এবং সন্তান ধারণ ও পালনে বিতৃষ্ণা।

(চ) পাশ্চাত্য নানা পাপে দীক্ষা।

(ছ) পরনিন্দা, অহঙ্কার এবং পরশ্রী-কাতরতার অনুগমন এবং বিনয়ের অভাব।

(জ) চাকুরীর প্রতি স্পৃহা-বৃদ্ধি অর্থাৎ গৃহধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছা-বিহারের প্রবৃত্তি। কদর্য্য গল্প পাঠে আসক্তি। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা সংবাদ পত্রের লেখায় উৎসাহ পাইয়া চলিতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হউক, কিন্তু তাঁহারা যখন আদর্শ স্থানে দণ্ডায়মান, তখন তাঁহাদিগের পাপ-প্রবৃত্তিসকল দমিত না হইলে দেশের সর্ব্বত্র তাহা সংক্রামিত হইবে। স্বামী দরিদ্র হইলে নিগ্রহের আর সীমা থাকেনা। ধাত্রী, লেডী ডাক্তার এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের কলঙ্কের কথা এখন দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মে মতি নাই, নীতিতে আস্থা নাই, ব্যভিচারীদের সংসর্গে থাকিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিতা নহেন। এ সকল ঘটনার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। স্ত্রীত্ব এবং মাতৃত্বের স্থান যেন পুরুষত্ব অধিকার করিতেছে। মহিলারা যে ভাবে আজকাল পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে দারুণ কষ্ট হয়। উপাখ্যানের "নির্ম্মলার" ন্যায় মহিলারাও আজকাল কুরুচিপূর্ণ গল্প পড়িয়া ধর্ম্মে আস্থা, গুরুজনে ভক্তি, গৃহ-রক্ষণে-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিতার মোমের পুত্তলিকা সাজিতেছেন! প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির এই সকল পাপের নিরসনে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। নচেৎ বঙ্গ-গৃহ অচিরে ধর্ম্মহীন হইয়া নরকে পরিণত হইবে।

(৯)

কাহারও জীবনচরিত লেখা অপেক্ষা গুরুতর কঠিন কাজ আর কিছুই নাই। বহুরূপীর ন্যায় মানুষেরও নানা রূপ, এক এক সময়ে এক এক রূপ ফুটিয়া উঠে। তাহা ভিন্ন, প্রত্যেক মানুষেই, অণুপরমাণুর ন্যায় অনন্তের আভাস পাওয়া যায়। সান্ত জীবের পক্ষে

তাহা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন। একজনকে বহুরূপে বহুজনে দেখিয়া থাকেন। কেহ স্বামীরূপে, কেহ গুরুরূপে, কেহ পিতারূপে, কেহ ভ্রাতারূপে, কেহ বন্ধুরূপে, কেহ সহচররূপে, কেহ পাপ কার্য্যের পোষকরূপে, কতরূপে কত জন এক মানুষকে দেখিয়া থাকে। তাই জীবনচরিতে সকল দিক ফুটাইয়া তোলা বড়ই কঠিন কাজ। বিশেষতঃ তাঁহারা যে স্তরের লোক, সে স্তরের লোক ভিন্ন অন্যের নিকট তাঁহারা সম্যকরূপে ধৃত হন না। এজগতে তাহা ধরিতে কেহ কখনও পারেনও নাই। এক এক জন এক এক রূপ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের তিন খানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, একখানি শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর, একখানি শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র, ও একখানি শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন। যাঁহারা ভাষা-জ্ঞানবিহীন, তাঁহারাও আজকাল বড় বড় গ্রন্থকার সাজিয়াছেন। এই তিনখানি জীবনচরিত তিন রকম, কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। কোন একটী ঘটনাও মিলিতেছে না। না মিলুক, কিন্তু মিথ্যা কথার বিবৃতি কিরূপে হইল, বুঝিনা। প্রকৃত গোস্বামী-চরিত যেন প্রহেলিকার ন্যায় থাকিয়া গিয়াছে। সাধুপ্রতিম মনোরঞ্জন বা বিপিনচন্দ্র এ সকল দেখিয়া নীরবে আছেন কেন? এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার নরপূজা নবাকারে ঘোষিত হইতেছে। যেখানে সেখানে নরপূজা ষোড়শোপচারে ঘোষিত হইতেছে। মহাপুরুষ-সম্মান দেশের আপামর-সাধারণে বদ্ধমূল হয়, তাহা মন্দ নয়, কিন্তু ভোগ, আরতি, মন্ত্র পাঠসহ পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি কিরূপে যে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান যুগে প্রদত্ত হইতেছে, বুঝা বড় কঠিন। যাঁহারা সেবক, তাঁহাদের অহঙ্কারই বা দেখে কে? তাঁহারা কতরূপে যে মানুষকে অপমান করে, তাহা ব্যাখ্যাত হওয়ার নয়। কোন স্থলে কোন ধনী একটী মন্দির করিয়া দিয়াছেন, অমনি গুণ্ডার দল তাহার সেবকরূপে যুটিয়া গিয়াছে;—তাঁহারা বর্ণজ্ঞানহীন, নীতিচরিত্রহীন, তাঁহারা নানা কুকার্য্য করিয়া যণ্ডামার্ক সাজিতেছেন। হায়, গোস্বামী মহাশয় এরূপ কৃষ্ণরূপে চিত্রিত হইবেন, স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যিনি কেশবচন্দ্রের সময়ে নরপূজার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তিনিই আজ দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন, এদুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। তিনি আজ জীবিত থাকিলে না জানি কত বেদনা পাইতেন। সখীদের লীলাময় পুরুষোত্তম নানা ভণ্ডের কীর্ত্তিতে পূর্ণ। যেখানে আবার নূতন নূতন ভণ্ডের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা সব কুকার্য্য করিয়া থাকে, শুধু জুতা-বর্জ্জিত হইয়াই সব চাপা দেয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, সে সকল সম্প্রদায়ে যে সকল সাধু প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহারা নিরীহ, ভণ্ডামি নিবারণে নিতান্তই অসমর্থ, বা উদাসীন। ধর্ম্মের নামে নানা কলঙ্ক অবাধে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মবেশধারীদের হাত হইতে দেশ রক্ষার উপায় কি, কে বলিতে পারে?

(১০)

কুলবধূদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া পুরুষোত্তমের এক আশ্রমে রাখা হইতেছে। সে স্থানের নানা কলঙ্কের কথা আমরা শুনিতেছি। পুলিস সাহায্যে এক স্বামী সেখান হইতে স্ত্রী উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল কুলবধূ আজও উদ্ধৃত হন নাই। ধর্ম্মেরনামে অধর্ম্মের স্রোত দেশে বড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের কুলস্ত্রীহরণ থামিয়াছে

বটে, কিন্তু নূতন "হরণ" কাহিনী শুনা যাইতেছে। কত পরিবারে হাহাকার উঠিয়াছে! প্রতি গৃহস্থেরই সতর্ক হওয়া উচিত। কোন মাতাজীকে গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়া সঙ্গত নয়।

(১১)

"দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা—" বড় বড় লোকদিগের ব্যবহারে এই কথারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা যতই চেষ্টা করুন, দোশ যাহা নাই, তাহা কোথায় পাইবেন? শেষে ছেলের ক্রন্দনই সার হইতেছে!!

(১২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার বারম্বার প্রশ্ন চুরি যাওয়া একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ নিরীশ্বর শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। এ কলঙ্ককালিমা বাঙ্গালী জীবন-ইতিহাস হইতে কখনও প্রক্ষালিত হইবেনা। ইহাতে ছাত্রগণ, কর্ম্মচারীবর্গ এবং প্রেস সকলের দোষ প্রকাশ পাইয়াছে। তবু কঠোরতা অবলম্বিত হইতেছে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। আর একবার কোন এম্-এ-পরীক্ষার্থী ছাত্রের কাগজ বাড়ীতে বসিয়া লেখা হইয়াছিল; প্রমাণিত হইল, ছাত্র দণ্ডিত হইলেন, কিন্তু কর্ম্মচারীদের দণ্ড হইল না! এবার কতদূর কি হয়, দেখিবার আশায় আছি। কিন্তু যাহাই হউক, এ কলঙ্ক অপনীত হইবার নয়।

বেদান্ত-দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সম্প্রতি পরমাণুবাদ খণ্ডিত হইবে। ন্যায়দর্শনে চারিজাতীয় সূক্ষ্ম পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। বায়বীয়, তৈজস, জলীয় ও পার্থিব—এই চারিজাতীয় পরমাণুকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। স্থূল পদার্থকে বিভাগ করিতে করিতে যখন আর বিভাগ করা যায় না, সেই অবিভাজ্য অতিসূক্ষ্ম বস্তুর নাম পরমাণু। ইহাঁরা এই পরমাণুর পরিমাণুরও (Extension) স্বীকার করিয়া থাকেন। পরমাণুর পরিণামের নাম তাঁহারা "পারিমাণ্ডিল্য" রাখিয়াছেন। পরমাণুগুলি—পরিমণ্ডল পরিমাণ, অর্থাৎ spherical। একটী পরমাণু অপরটীর সহিত সংযুক্ত হইলে 'দ্ব্যণুক' উৎপন্ন হয়। উহার সহিত অপর একটী সংযুক্ত হইলে, উহাকে 'ত্রসরেণু' বলে। কার্য্যে এমন গুণ আসিতে পারে না, যাহা উহার কারণে ছিল না,—ইহা নৈয়ায়িকদিগের একটী নিয়ম। একটী জলীয় পরমাণু, অন্য একটী পার্থিব পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া, যে বস্তুটী উৎপন্ন হইল, তাহাতে গন্ধগুণ অভিব্যক্ত হইতে পারে না; কেন না, জলীয় অণু গন্ধহীন। কার্য্যদ্রব্যে গন্ধগুণের অভিব্যক্তি হইতে হইলে, আরো একটী পার্থিব পরমাণুর সংযোগ হওয়া আবশ্যক। কারণে যে জাতীয় গুণ থাকে, কার্য্যে সেই জাতীয় গুণের অভিব্যক্তি হয়। এই নিয়মের বলে নৈয়ায়িকগণ আপত্তি করেন যে, চেতন ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিলে, জগতেও, চৈতন্যের অভিব্যক্তি

দেখা যাইত। কিন্তু জগৎ যখন জড়, তখন উহার কারণকে চেতন বলা যাইতে পারে না। অতএব, পরমাণুই জগতের কারণ। ন্যায়ের ইহাই আপত্তি।

কিন্তু নৈয়ায়িকদিগের এ প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিবার আদৌ কোন অধিকার নাই। কারণ-দ্রব্যগত গুণ যদি, কার্য্যদ্রব্যে অভিব্যক্ত হওয়াই নিয়ম হয়, তাহা হইলে পরমাণুগত পরিমাণও ত কার্য্যদ্রব্যে অভিব্যক্ত হইবে। কিন্তু ন্যায়মতে তাহা ত হইতে দেখা যায় না। যখন দুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইয়া, উহার ফলে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তখন পরমাণুগত শুক্লাদিগুণ যেমন দ্ব্যণুকে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ পরমাণুগত 'পারিমাণ্ডিল্য' পরিমাণও ত দ্ব্যণুকে ব্যক্ত হইতে পারিত। এই প্রকারে দ্ব্যণুকগত পরিমাণও ত উহার কার্য্য 'চতুরণুকে' ব্যক্ত হইতে পারিত। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা তাহা ত স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকেরা দ্ব্যণুকের পরিমাণকে 'অণু ও হ্রস্ব' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্ব্যণুকের পরিমাণকে তাঁহারা ত 'পরিমণ্ডল' (spherical) বলেন না। এইরূপ, তাঁহারা চতুরণুকের পরিমাণকে 'মহৎ ও দীর্ঘ' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কার্য্যদ্রব্যে কারণ দ্রব্যগত গুণের অভিব্যক্তি হওয়াই যদি নিয়ম হয়, তাহা হইলে দ্ব্যণুকগত পরিমাণ 'অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব'—উহার কার্য্য চতুরণুকে কেন ব্যক্ত হইল না? তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, কার্য্যদ্রব্যে যে বিস্তৃত (Extension) দৃষ্ট হয়, উহা উহার কারণগত বিস্তৃতি (Extension) হইতে অভিব্যক্ত হয় না; উহা কারণগত পরমাণুর সংখ্যা হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব, যখন নৈয়ায়িকগণের নিজের প্রক্রিয়াতেই ঐ নিয়মের অন্যথাচরণ দৃষ্ট হইতেছে, তখন চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জড়জগৎ উৎপন্ন হইবে, ইহাতে আর তাঁহাদের আপত্তি টিকে কৈ?

আর এক কথা। এক বা অধিক সংখ্যক পরমাণুর অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ হইলে, সেই সংযোগের ফলে কার্য্যবর্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সংযোগ ত এক প্রকার গুণবিশেষ। গুণকে ত নৈয়ায়িকেরা দ্রব্য হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। সংযোগ একপ্রকার গুণ; এবং পরমাণুর সংযোগহইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্যগুলি—দ্রব্য বিশেষ। সুতরাং গুণ হইতে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে কার্য্য কারণের তুল্যজাতীয় জিনিষই অভিব্যক্ত হইবে,—এ নিয়মই বা টিকিতেছে কৈ? দ্রব্য ও গুণ ত তুল্যজাতীয় বস্তু নহে।

আরও একটী কথা। দুইটী পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। এস্থলে, পরমাণুতে যেমন পরিমণ্ডল পরিমাণ আছে, তেম্‌নি দ্বিত্ব সংখ্যাও ত উপস্থিত আছে। এইরূপ, দুইটী দ্ব্যণুক, অপর দুইটী দ্ব্যণুকের সহিত সংযুক্ত হইয়া চতুরণুকের উৎপত্তি হইল। এস্থলেও, দ্ব্যণুকে যেমন উহার পরিমাণ—অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব উপস্থিত আছে, তেম্‌নি উহার চারি সংখ্যাও ত উপস্থিত আছে। এইরূপ সর্ব্বত্র। কারণগত সংখ্যার একত্ব, দ্বিত্ব, বহুত্ব প্রভৃতির দরুণই কার্য্যে কারণগত পরিমাণ অভিব্যক্ত হয় না, কারণগত সংখ্যানুসারেই কার্য্যে অন্যপ্রকার পরিমাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা যদি এই কথা বলেন, তাহারও আমরা উত্তর দিতে পারিব। আমরা বলি যে, সংখ্যাই বল, আর পরিমাণই বল,—ইহারা ত কারণেই থাকে;—কারণেরই আশ্রিত। সুতরাং কারণাশ্রিত সকল গুণই ত কার্য্যে অভিব্যক্ত হইবে। তবে আর, কারণগত পরিমাণটী কার্য্যে অভিব্যক্ত না হইবে কেন? অতএব, নৈয়ায়িককে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, কারণগত পরিমাণগুলি, উহাদের স্ব স্ব কার্য্যে স্বভাবতঃই অভিব্যক্ত হয় না। তদ্রূপ, স্বভাবতই চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জড়জগৎ উৎপন্ন হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? কার্য্যের স্বভাবটী, উহার কারণ হইতে কিছু বিভিন্ন ত হইবেই। নতুবা কারণ ও কার্য্য—এক হইয়া উঠে। কার্য্যে কিছু বিশেষত্ব ত থাকিবেই। বিশেষত্ব স্বীকার না করিলে, কার্য্যকারণবাদই টিকে না। সুতরাং চেতনব্রহ্মকে অচেতন জগতের কারণ বলায় আমাদের পক্ষে কোন দোষ আসিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী-বিদ্যারত্ন, এম্-এ।

কবি-প্রশস্তি।

[“মাইকেল” জীবনী, “অহল্যাবাঈ” ও “তুকারাম” চরিত-প্রণেতা এবং “পৃথ্বীরাজ”মহাকাব্যের কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, মহাশয়ের“কবিভূষণ”উপাধিলাভ উপলক্ষে]

(১)

জয়-গানে দিগন্তের আদ্য-অন্ত ভরি,’ রচিয়াছে
ভক্তবৃন্দ প্রীতির সম্ভার,
বহিয়া এনেছে অর্ঘ্য তোমার(ই) দুয়ারে, শুভদিনে,
ধর কবি! ধর উপহার!
কাব্য-অঙ্গ-গন্ধ-লাভে আত্মহারা পূজা-উপচারে
কোন্ এক সুন্দর প্রভাতে,
ভক্তি-ভরে কাব্য-রাণী-পাদ-যুগ পূজিলে পূজারি!
নতশীর্ষে শত প্রণিপাতে;
স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি উন্মেষিয়া নেহারিলে যেইদিন
দেবতার অনন্ত মহিমা,
হৃদয়-এস্রাজ্ হ’তে করুণ মূর্চ্ছনে দিকে দিকে
ভরাইলে তাঁহার গরিমা!—
সেইদিন, সেই শুভক্ষণে, হে বরেণ্য! কাব্য রচি’
বাণী পদে দিলে অলঙ্কার,
নিখিলের জড়, সুপ্ত হৃদি-তারে কোমল-পরশে
চেতনার তুলিলে ঝঙ্কার!
মন্ত্র-মুগ্ধ, স্পন্দহীন, বিশ্ববাসী শুনিল বিস্ময়ে
সকরুণ সেই তব গান,
আত্ম-প্রবঞ্চনা-মদে উন্মত্ত পরাণে পাশরিল
দিতে তব অতুল সম্মান;—
অনুতপ্ত উচ্ছ্বসিত চিত্ত লয়ে এসেছে আজিকে
শোধিবারে পুরাতন ঋণ,
হৃদিমন পরিপূর্ণ করিয়াছে আজি তব সুনিপুণ
করাঘাতে সকরুণ বীণ!

(২)

হে গুণি! কি যাদুমন্ত্র-বলে, গদ্যময় শতাব্দের
শুষ্ক, রুক্ষ, মরুভূ-প্রান্তরে,
ফুটাইলে শত পুষ্প, পারিজাত-স্পর্দ্ধা-ম্লানকরা
কল্পনার কুঞ্জে থরে-থরে?
যাদুকর-মন্ত্রপূত কোন্ মায়াদণ্ড স্পর্শ করি’
গেহে গেহে, প্রতি গৃহাঙ্গনে,
মুকুলিত মুঞ্জরিত করে দিলে অশোক-মঞ্জরী
অনুরাগে লোহিত বরণে?
“আলাদিন-প্রদীপ” ঘর্ষণে স্বপ্নময় কোন্ রাজ্য
বহি’ আনি’ দিলে উপহার?
বিশ্বের নয়ন-তলে অনুরাগে ফুটাইলে শত
অমরার শোভন-সম্ভার!

(৩)

ব্যথাহত মানবের অশ্রুজল মথি,’ উঠে তব
কবিতা যে সুন্দরী তরুণী,
লক্ষীসম জন্ম লভে, হস্তে ধরি’ আশীর্ব্বাদ-চরু

বাণীর করুণা লেখা উঠিল ফুটিয়া প্রেমমুগ্ধ
অনুরাগী হৃদিপদ্মদলে,
ব্যথিতের দীর্ণ হৃদি পাইল আশ্রয় তৃপ্তি লভি’
কবিতার স্নেহের অঞ্চলে!

(৩)

আপন প্রশংসা-গানে তোল নাই তুমি কোনদিন
আপনিই উচ্চ সিংহনাদ,
আপনার অধিকার কতটুকু, লয়ে কর নাই
কারো সাথে বাদবিসংবাদ।
কর্ত্তব্যের রুক্ষ, ভীম বজ্রাদেশ নীরবে সেধেছ
শুদ্ধি-পূত প্রশান্ত ঋত্বিক্!
তা’রি অন্তরালে দিলে রাজটীকা সৌন্দর্য্যের শিরে
মন্ত্রশোকে ভরি’ দশদিক।
সুকোমল তুলিকার প্রান্তভাগ দিয়ে রূপরাজ্যে
আনিয়াছ মধুর প্রভাত,
সবিস্ময়ে মুগ্ধ আত্মহারা হ’য়ে ঘন-নীলাম্বরে
অপ্সরীরা করে নেত্রপাত!
রাগারুণ নয়ন বিস্ফারি, “বালুকণা-মাঝে বিশ্ব
বন্যপুষ্পে ত্রিদিবের ছবি”,
নেহারিলে স্বপ্নালোকে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়-আবেগে
চিত্তহর, হে কোবিদ-কবি!

(৫)

প্রথম দেখালে পথ, ভক্ত তুমি, কবি পূজা করি’
পূজাদানে শ্রীমধুসূদনে,
সাধ্বী অহল্যার কীর্ত্তি-যশোগাথা ধ্বনিলে চৌদিকে
পূত হ’লে দেবী আরাধনে।
মাহেন্দ্র-ক্ষণেতে আজি তোমারও শুভ-অবসর
লভ তুমি অনন্ত-জীবন,
আঁখি মেলি’ হের আজি, সবে মিলি’ কবির সভায়
তোমারেই ক’রে আমন্ত্রণ!

(৬)

তোমার গৌরবে গর্ব্বান্বিত যত ভক্তদল তব—
তুমি যে হে একান্ত আপন,
তোমার লেখনী-মুখে পেয়েছে প্রকাশ আমাদের(ই)
রুদ্ধমুখ শতেক সাধন!
নিরালে নিভৃতে বসি’ বাঁশরীর তানে এনে দিলে
সুপ্ত প্রাণে নবজাগরণ,
পুলকে শিহরি’ বীণাপাণি, বরপুত্ররূপে
অমরত্বে করে নিমন্ত্রণ!
—সাধনার পল্লবের কোলে উঠে শিহরিয়া
কল্পনার কদম্ব-কেশর,
হৃদয়ের অভিব্যক্তি, কাকচক্ষু নির্ঝরের মত,
গিরিগাত্রে বহে ঝর ঝর!
পুলকে সম্বিৎহারা বিশ্ব আজি প্রণমে তোমারে.
অর্ঘ্য রচে, হে কবিভূষণ!
বাণীর মন্দিরে তুমি পুরোহিতরূপে চিরদিন

১। স্যর বাসুদেব সুচলদেব। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। সচিত্র গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধা। রাজযোগ্য উপকরণে মুদ্রিত।

স্যর বাসুদেব উৎকলের বিদ্যাসাগর। অমর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী লিখিয়া চণ্ডীচরণ অমর হইয়াছেন;—উৎকলের বিদ্যাসাগর-জীবনী সঙ্কলন করা তাঁহার পক্ষেই শোভনীয়। ৺ ডাক্তার রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয় ওড়িয়া ভাষায় স্যর বাসুদেবের যে জীবনী-রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণের অসাধারণ ক্ষমতাবলে এ গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। চণ্ডীচরণের লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। এরূপ ভাষার পারিপাট্য অতি অল্প গ্রন্থেই দেখা যায়। এরূপ শক্তিশালী লেখকের অকাল মৃত্যু বঙ্গের পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয়। ইহাই গ্রন্থকারের জীবনের শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পরিপক্ক জ্ঞানের চরম শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। ধন্য চণ্ডীচরণ, এই গ্রন্থও তাঁহাকে অক্ষয় অমরত্বে চির-প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। এহেন লেখকের পরিত্যক্ত পরিবার দুঃখ কষ্টে জীবনপাত করিতেছেন। বামড়ার বর্ত্তমান মহারাজা ইচ্ছা করিলে এই পরিবারকে দারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। আমরা আশা করি, তাহা তিনি করিবেন। দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ চণ্ডীচরণ-জীবনী বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ। যিনি দুই মহাপুরুষের জীবনী লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, কোন্ ভাগ্যবান তাঁহার জীবনী লিখিবেন? সাহিত্য-সেবা রূপ যে তপস্যায় চণ্ডীচরণের জীবন দুঃখ দারিদ্র্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সেই তপস্যার সুফল ফলুক। বঙ্গ তাঁহার যশোরাশিতে পূর্ণ হউক।

স্যর বাসুদেবের জীবন আদর্শ জীবন ছিল। বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ মহৎ হৃদয়ের পরিচয় অতি অল্প লোকেই দিয়াছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, পবিত্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য---সর্ব্বগুণে স্যর বাসুদেব ভূষিত ছিলেন। তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হউন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। উড়িষ্যায় এখন যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জাগিতেছে, এই উদার জীবনের শিক্ষা যদি তাহা অপনয়ন করিতে পারে, তবে বড়ই সুখের বিষয় হইবে। বিধাতা তাহা করুন; জাতি-বিদ্বেষ ভারত হইতে তিরোহিত হউক।

২। বেস্সান্তর। সচিত্র। শ্রীগজেন্দ্রলাল চৌধুরী অনূদিত, মূল্য বার আনা। ইহা অন্তর জাতক। সিংহল, ব্রহ্ম ও তিব্বতে ইহার খুব আদর। ইহা কোন কোন স্থানে নাট্যাকারে অভিনীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাকসমুলর ইহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপর অলিভার হোয়াইট ব্রহ্মদেশের ছাত্রদিগের উপকারার্থ আর একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র আদৃত এই জাতকের বাঙ্গালা অনুবাদে বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত হইলেন। এই অনুবাদ সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

৩। সপ্তস্বর। শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সচিত্র গ্রন্থ। মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার বাল্য-রচনা। হউক বাল্যরচনা, তাঁহার ইহাতে অসাধারণ গুণপনা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি এত সুন্দর হইয়াছে যে, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী উদ্ধৃত করিব, তাহা বুঝি না। গ্রন্থকারের হৃদয়খানি যেন পবিত্রতায় মাখা—তাহারই প্রতিচ্ছায়া এই গ্রন্থে অঙ্কিত। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইবার যোগ্য।

৪। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী। শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র পূততুণ্ড কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য এক টাকা। পুরাতন বঙ্গের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহা পাঠে জানা যায়। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

৫। ছত্রভঙ্গ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা। সুন্দর ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা।

৬। বাল্যভূষণ। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত, মূল্য আট আনা। এই পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই উপকৃত হইলাম। অতি সুন্দর পুস্তক। ছাত্রগণের বিশেষ উপকারে আসিবে।

৭। ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরুণাচল মিশন। প্রকাশক শ্রীঅটলবিহারী বসু. মূল্য আট আনা। এই পুস্তকে ঠাকুরের দোষ ক্ষালনের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকের বিবৃতির কথা সত্য হইলে বড়ই সুখের বিষয়। কে তার সাক্ষ্য দিতে পারে?

মনুসংহিতায় জীবন-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব।

সমস্ত জীবই পঞ্চভূতের সৃষ্টি, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্ ভূতটী যে জীবোৎপত্তির বিশেষরূপে মূলীভূত, তাহা আমরা অবগত নহি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে যে তত্ত্বানুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে জীবসৃষ্টির মূল উপাদান মধ্যে জলেরই নির্দ্দেশ দেখা যায়। এস্থলে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এতৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"All organisms, from the lowest to the highest, whether plant or animal, consists very largely of water, and its constant presence either in the liquid or gaseous form is essential for organic life." Harmsworth's History of the world, Vol.I, Man and the Universe p. 95.

"উদ্ভিদই হউক আর প্রাণীই হউক, উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর যন্ত্রই অধিকাংশরূপে জলপূর্ণ। জীবিত যন্ত্রব্যূহে তরল অবস্থায়ই হউক বা বাষ্পীয় অবস্থায়ই হউক, জলের বিদ্যমানতা নিত্যই আবশ্যক।"

জল যেমন জীবোৎপত্তির আদি কারণ, তেমনই ইহা জীবন রক্ষার পক্ষেও প্রধান উপায়। আকাশস্থ বায়ুমণ্ডলে জল সূক্ষ্ম-বাষ্পাকারে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সকলেরই জীবন রক্ষা হইতেছে। নিম্নে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এতৎসম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The atmosphre is so intimately associated with water in its life-relations, and is itself so absolutely essential to the existence from moment to moment of the higher animals, that the two require to be duly proportioned to each other and to the globe of which they form a part." ibid p. 95.

জলের মধ্যে যে অম্লজান ও উদজান নামক দুইটী বাষ্প আছে, সে দুইটী বাষ্প জীবনধারণের পক্ষে কিরূপ উপযোগী, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই তাহা জানিতে পারা যায় :—

"When we consider that water consists of two gases oxygen and hydrogen---in definite proportions, and that without their presence in these proportions and in the necessary quantity the development of organic life would have been impossible, we find that we have here a remarkable and very complex set of conditions which must be fulfilled in any planet to enable it to develop life." Ibid p. 95.

ক্রম-বিকাশ-বিজ্ঞানে জীবন-বিকাশের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জলেতেই যে জীবনের প্রথম অঙ্কুরের উদ্গম হয়, তাহাই জানিতে পারা যায় :—

"In the last picture we travel back in imagination to the dawn of life itself, at least forty millions years ago, when in the waters which covered the earth, the first specks of protoplasm awoke to vital functions," Ibid—Vide Chart showing "The beginnings of life and ascent of man"—annexed between p. 96-97.

ইহার অনুবাদ এই "শেষ চিত্রে কল্পনায় আমরা অন্যূন চারি কোটি বৎসর পূর্ব্বে জীবনের প্রথম ঊষাকালে যাইয়া উপনীত হই। এই সময়ে, যে জলরাশি পৃথিবীকে ব্যাপ্ত

করিয়া বর্ত্তমান ছিল, তন্মধ্যেই জীবন-বীজের **প্রথম বিন্দু, জীবন ব্যাপারের উদ্বোধন প্রাপ্ত হয়।"**

পাশ্চাত্য জীবন-বিজ্ঞানের উল্লিখিত মূলতত্ত্বের বিষয় পাঠ করিয়া মনুসংহিতার **সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিলে** তাহা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য **বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। মনুসংহিতা হইতে সৃষ্টি-বিবরণের প্রথমাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত** করিয়া দিতেছি :—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥" ১।৮

"সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া আকাশাদিক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন।" ৺ ভরতশিরোমণির অনুবাদ।

এই সৃষ্টিপ্রকরণেই "নারায়ণ" নামের যেরূপ নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও তিনিই জলে বীজরূপেঃ বর্ত্তমান, তাহা পরিস্কাররূপেই বুঝিতে পারা যায় :—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ১।১০

"নর নামক পরমেশ্বরের দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহাকে নারাশব্দ বলা যায়. যেহেতু এ জল সকল প্রলয় কালে পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়, এইজন্য পরমাত্মা নারায়ণ শব্দে কথিত হইয়াছেন।" ৺ ভরতশিরোমণির অনুবাদ।

জলেতে যে বীজ আহিত হওয়ার কথা মনুতে উক্ত হইয়াছে, তাহা যে জীবন-বীজ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না, কারণ **'জল' স্বয়ংই 'জড়'বস্তু। জড় নামটীও জল** নামেরই রূপান্তর বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। কারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রে রকার ও লকারের অভিন্নত্বই স্বীকৃত হইয়াছে।

বেদের **সৃষ্টিবিবরণ মনুর** উক্ত "অপ্" যে কিরূপ **জল**, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। নিম্নে আমরা বেদোক্ত **সৃষ্টির** সূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ঋতংচসত্যংচাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥১
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবংচপৃথিবীংচান্তরিক্ষমথোস্বঃ॥৩

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৯০ সূক্ত।

এখানে প্রথমেই নিয়ম ও সত্যস্বরূপ সত্তা হইতে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হওয়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে। এই সমুদ্র হইতেই পরে সংবৎসর, দিনরাত্রি, সূর্য্যচন্দ্র, আকাশ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ স্বর্গ প্রভৃতি উৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং সমুদ্রই প্রথম সৃষ্টিবস্তু, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই সমুদ্র আমাদিগের নিকট সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বব্যাপী বাষ্পরাশি বলিয়াই বোধ হয়। সমুদ্র যে বেদে বাষ্পপূর্ণ আকাশকে বুঝায়, তাহার বহু দৃষ্টান্তেই পাওয়া যায়। রমেশবাবুও এসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"ঋগ্বেদ আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং অনেক সময় "সমুদ্র" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।" ঋগ্বেদানুবাদ, ১৬৮৯পৃ।

এইপ্রকারে সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্পই যে কেবল জীব সৃষ্টির নহে, পরন্তু সমস্ত সৃষ্টিরই মূল,

তাহাই আমরা বেদের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিতেছি।

"কারণ বারি" ও "প্রলয় পয়োধি" এই দুইটী কথা আমাদিগের শাস্ত্র হইতে বিশেষ রূপেই আমাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। এই দুইটীতেই জল যে বিশ্বের আদি কারণ, তাহার অন্তস্তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিশ্বের উৎপত্তি যেমন জলরূপ আদি কারণ হইতেই প্রসূত হয় বলিয়া তাহার "কারণবারি" নাম হইয়াছে, তেমনই সমগ্র বিশ্বজলরূপ পরিণত হইয়াই ইহার লয় হয় বলিয়া সৃষ্টি শেষের জলরাশি "প্রলয় পয়োধি" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টি শেষ হইলে পরেই তাহা হইতে আবার সৃষ্টি আরম্ভের সূচনা হয়। সুতরাং শেষ ও আরম্ভ যে মূলে একই প্রকৃতি হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। **জলেই সৃষ্টির আদ্যন্ত** হওয়ায় আমরা জলেতেই সেই মূল প্রকৃতির পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু এইজল স্থূল জল নহে, পরন্তু ইহা সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্প।

আমাদের অবতারের যে কল্পনা পাওয়া যায়, তাহাতেও প্রথম জলীয় জীবন বিকাশেরই প্রমাণ উপলব্ধ হয়। মৎস্য ও কূর্ম্ম যথাক্রমে আদি অবতার। উভয়টীই জলীয় জীব। বিষ্ণু কর্ত্তৃক হস্তেধৃত শঙ্খ ও পদ্মরূপ, উপকরণ জলীয় জীবও উদ্ভিদেরই নিদর্শন। পদ্ম আদি না হইলেও শঙ্খ যে আদি নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জল জীবন-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বলিয়া ঋষিগণের যে পরিষ্কার ধারণা ছিল, তাহার ইহাও অন্যতম দৃঢ় প্রমাণ যে, তাঁহারা জলকে "জীবন" নামেই আখ্যাত করিয়াছেন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেদান্ত দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায় (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ন্যায়-মতের এক অংশের আলোচনা করা **হইয়াছে। এখন অপর অংশটীর** আলোচনায় **প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। জগতে আমরা চারি জাতীয় দ্রব্য দেখিতে পাই। ইহারা স্থূলও অবয়ব-বিশিষ্ট।** ইহাদিগকে বিভাগ করিতে করিতে যখন শেষ সীমার কল্পনা উপস্থিত হয়, তখন আর বিভাগ করা যায় না। **অবিভাজ্য পরম সূক্ষ্ম দ্রব্যটী**কেই পরমাণু বলা যায়। পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়—এই চারি জাতীয় পরমাণুই, দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সংযুক্ত হইয়া, জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে। **ইহারাই জগতের কারণ। প্রলয়ে এই সকল পরমাণু সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সৃষ্টিকালে, জীবের অদৃষ্টের প্রভাবে, বায়বীয় অণুতে ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া, একটী অপরটীর সহিত সংযুক্ত হয়। এইরূপে স্থূল বায়ু, স্থূল অগ্নি—প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমাণু-গত শুক্লাদিরূপ, কার্য্যদ্রব্যেও অভিব্যক্ত হয়। ইহাই ন্যায়-মত। পূর্ব্বেও আমরা ইহার উল্লেখ করিয়া** আসিয়াছি।

এখন কথা হইতেছে এই যে, পরস্পর

বিভক্ত এই যে পরমাণুগুলি কথিত হইয়াছে, ইহাদের সংযোগ ক্রিয়া-সাপেক্ষ। গতি ব্যতীত, ক্রিয়া ব্যতীত,—একটী পরমাণু অপরটীতে সংযুক্ত হইবে কি প্রকারে? অতএব, পরস্পর মিলনার্থ ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবামাত্রই, এই ক্রিয়ার কারণ কি, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইবে। কোন্ হেতুতে, কি কারণে, এই গতি বা ক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল? কে ইহাদের এই গতি জন্মাইয়াছিল? প্রযত্ন (Effort of Volition), অথবা আঘাত (Impact)—দ্বারাই পরমাণুগুলিতে প্রথম ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহাই বলা আবশ্যক হইবে। কিন্তু প্রযত্ন বা আঘাত—ইহাদের কোনটীকেই ঐ ক্রিয়ার কারণ বলিতে পারা যায় না। কেন না, প্রযত্ন ত আত্মার গুণ। চেতন জীবের ইচ্ছাপ্রসূত চেষ্টার নামই প্রযত্ন। কিন্তু সৃষ্টিকালে জীব-দেহ ত উৎপন্ন হয় নাই। জীবদেহে মন প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে ত আত্মার যত্নাদি গুণ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তৎকালে, তখন ও ত দেহ বা মন, কোনটীই উৎপন্ন হইয়াছিল না। সুতরাং প্রযত্ন আসিবে কোথা হইতে? সৃষ্টির পূর্ব্বে আঘাতই বা কিরূপে আসিবে? সৃষ্টির পরে বরং ঐ সকলকে ক্রিয়ার কারণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু আদিম বা প্রথম ক্রিয়ার কারণরূপে আঘাতাদিকে স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? জীবের 'অদৃষ্ট'কেও ঐ ক্রিয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। অদৃষ্টকে যদি কারণ বল, তবে তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে যে, ঐ অদৃষ্ট কাহার? উহা কি তখন আত্মাতে অবস্থান করিতেছিল? না, উহা পরমাণুর মধ্যেই বসিয়াছিল? যাহাই বল না কেন, অদৃষ্টকে কখনই ঐ ক্রিয়ার কারণ বলিতে পারা যাইবে না। অদৃষ্ট,—অচেতন, জড়। চৈতন্য দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইলে, পরিচালিত না হইলে, জড় কখনই আপনা আপনি, নিজেও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, অপর কাহাকেও প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। এ কথা আমরা, সাংখ্যমতের আলোচনা করিতে গিয়া, পূর্ব্বেই যুক্তিদ্বারা দেখাইয়া আসিয়াছি। সৃষ্টিকালে, নৈয়ায়িকেরা জীবাত্মারও চৈতন্যের অভিব্যক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং তৎকালে জীবও একরূপ জড়ের ন্যায় পড়িয়াছিল। অতএব, এই অদৃষ্টকে জীবদ্বারা চালিতও বলা যাইতে পারিতেছে না। জীবাত্মা ছাড়া অন্য কোথাও অদৃষ্টশক্তি থাকিতে পারে না, এ কথা বলিলেও, পরমাণুতে অদৃষ্ট, ক্রিয়া জন্মাইবে কিরূপে? কেন না, অদৃষ্টের ত আত্মার সহিত সম্বন্ধ; পরমাণুর সহিত উহার সম্বন্ধই ত থাকে না। সম্বন্ধ না থাকিলে, অদৃষ্টদ্বারা পরমাণুতে ক্রিয়াই বা উৎপন্ন হইবে কিরূপে? যদি বল যে, পুরুষ-চৈতন্য ত সর্ব্বব্যাপক বিভু। অদৃষ্ট যখন পুরুষ-চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ, আর পুরুষ যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন পুরুষ-সংযোগেই অদৃষ্টের সহিত পরমাণুগুলিরও তৎকালে সম্বন্ধ ত থাকিবেই। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, সেরূপ সম্বন্ধ ত নিত্য বর্ত্তমান। তাহা হইলে, পরমাণুতে উৎপন্ন ক্রিয়াও ত নিত্য বর্ত্তমান হইয়া উঠে।—এই সকল হেতুতে পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার যখন কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইতেছে না, তখন পরমাণুতে ক্রিয়া হওয়ার কথাটাই স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতেছে না। আবার, পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকার না করিলে,—একটী পরমাণু

অপরটীর সহিত সংযুক্ত হওয়াও স্বীকার করা চলে না। ক্রিয়াই যদি না থাকিল, তবে আর একটী অপরটীর সহিত সংযুক্তই বা হইবে কি প্রকারে? পরস্পর সংযোগ না ঘটিলে, জগৎই বা উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে?

আবার, এই যে একটী পরমাণু অপরটীর সহিত সংযুক্ত হয়,—একথাটারই বা প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ? কেমন করিয়া একটী সূক্ষ্ম পরমাণু, অপরটীর সহিত সংযুক্ত হয়, মিলিত হয়? এ মিলন কিরূপ? একটী পরমাণু কি অপরটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়া, সর্ব্বাংশে মিলিয়া যায়? কিন্তু এ প্রকারে মিশিয়া গেলে ত, স্থূলাকার ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত! সর্ব্বদাই, পরমাণুর মতই, সকল দ্রব্য পরম-সূক্ষ্মভাবেই মিলিয়া থাকিত! অবয়ব বৃদ্ধির সম্ভাবনাই রহিত হইয়া উঠিত!!

আর যদি পরস্পর মিলনকে, এক অংশের সহিত অপর অংশের পরস্পর মিলন বল, তাহা হইলেও দোষ উপস্থিত হইবে। কেননা, পরমাণুর ত তাহা হইলে অংশ স্বীকার করিতে হয়। অংশ স্বীকার করিলে, পরমাণুকে আর নিরবয়ব বলাও চলিবে না? পরমাণুকে সাবয়ব দ্রব্য বলিতে হয়! আর যদি, পরমাণুর অবয়বকে কল্পিত বস্তু বলিয়াই স্বীকার কর, তাহাতেও দোষের হাত এড়াইতে পারিবেনা। কেননা, যাহা কল্পিত, তাহাত অবস্তু, শূন্য দ্রব্য মাত্র। তাহা হইলে সংযোগটাও অবস্তু হইয়া উঠে! একটা অবস্তু, কল্পিত সংযোগকে,—কার্য্যদ্রব্যগুলির কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়? সংযোগ না ঘটিলে দ্ব্যণুকাদিই বা উৎপন্ন হইবে কিরূপে? সুতরাং সংযোগকেও ত অবস্তু, কল্পিত বলিয়া—উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই সকল কারণে, আদি সৃষ্টির সময়ে, পরমাণুর ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার কোন কারণ যখন স্থির করিতে পারা যাইতেছে না, তখন পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। বিনা কারণে ত কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে, জগৎ যখন ধ্বংস হইয়া যাইবে, তখনও স্থূল দ্রব্যগুলিকে বিভাগ করিতে করিতে যে মূল কারণ পরমাণুতে পৌঁছিবে, এই বিভাগ-ক্রিয়ারও কোন কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং জগতের সৃষ্টির ন্যায়, জগতের ধ্বংসও অসম্ভব হইয়া উঠিবে!! জীবের অদৃষ্টকেও কারণ বলা চলিবে না। কেন না, সুখদুঃখাদি-ভোগের নিমিত্ত বরং অদৃষ্টের সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু জগতের নাশের নিমিত্ত ত অদৃষ্টের সত্তা কেহই স্বীকার করেন নাই! অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ন্যায়-মতে, কি পরস্পর সংযোগের জন্য, কি একটী হইতে অপরটীর বিভাগের জন্য,—কোন প্রকারেই পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারা যাইতেছে না। অতএব, সংযোগ এবং বিভাগ, উভয়ই যখন সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না, তখন জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়—কিছুই সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। কেননা, সৃষ্টি—পরমাণুর সংযোগের উপর একান্ত নির্ভর করে। আর প্রলয়—পরমাণুগণের বিভাগের উপরে একান্ত নির্ভর করে।

এই সকল যুক্তির বলে, আমরা পরমাণুবাদ মানিয়া লইতে পারি না। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যা-রত্ন, এম-এ।

কপিল সাংখ্য।

বেদান্তদর্শন প্রবন্ধে বাদরায়ণ ব্যাসদেব প্রণীত বেদান্ত-দর্শন অনুসরণ করিয়া মহাত্মা কপিল ঋষির উদ্ভাবিত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অসারতা এবং তাহা মুক্তিলাভের প্রকৃত পথ নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বেদান্তে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব খণ্ডিত হইয়াছে এবং জড়প্রকৃতি যে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, কপিলের মত অবৈদিক বলিয়া অবজ্ঞাত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যোগশাস্ত্রও খণ্ডন করা হইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে হইলে কপিলের মত ও তাহা বেদবিরুদ্ধ কিনা,তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। যে মহাত্মা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সিদ্ধপুরুষ এবং গীতা ও মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাঁহার পবিত্র জ্যোতি সাংখ্য শাস্ত্রে বিকীর্ণ রহিয়াছে, সেই মহাত্মার মত দোষদুষ্ট বলিয়া কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ?

আজকাল শিক্ষিত সমাজে বেদান্ত ও কপিল সাংখ্যের সমধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়দর্শন তর্ক ও বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ, তাহাতে বৈদিকধর্ম্মের অবজ্ঞাও করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই নিজপক্ষ সমর্থন ও বিপক্ষকে পরাজয় করার উদ্দেশ্যে বিবিধ জটিল তর্কের অবতরণা করা হইয়াছে। তজ্জন্য ন্যায়দর্শনের সমধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্যযুগে বেদ যেমন প্রকাশিত হয়, সাংখ্য বিজ্ঞানও তদ্রূপ প্রথম প্রকাশ হয়। (৩য় অংশ ২য় অধ্যায়. বিষ্ণুপুরাণ)। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা কপিল সাংখ্য বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাংখ্য বিজ্ঞানে শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ উপপত্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সকল জ্বলন্ত আভাময়। মহামতি কপিল যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা উপনিষদ ও পুরাণাদি রচনার দীর্ঘকাল পর সমালোচনা হইতেছে। এরূপ অপবাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ এই যে, কপিল মুক্তির জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার কোন উল্লেখ করেন নাই, তিনি জ্ঞানই মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যুত তিনি নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ১ম অধ্যায় ৯২ সূত্র।

এই সূত্র হইতেই তাঁহার ঈশ্বর অস্বীকারের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে, ঐ সূত্রদ্বারা ঈশ্বর অস্বীকৃত হয় নাই। বোধ হয়, কপিলের সময় ব্রহ্ম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তজ্জন্যই কপিল বলেন যে, তোমরা বেদের দেব-দেবী ছাড়িয়া দিয়া যে এক নির্গুণ, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান, পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার কথা বল, তিনি যুক্তি ও বিচারের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যান। যুক্তি অনুসারে ঐরূপ ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রথমতঃ তাদৃশ ঈশ্বরের সত্বার প্রমাণ নাই। কেননা,ঈশ্বরকে কেহই প্রত্যক্ষ করে নাই। ঈশ্বর সিদ্ধিতে শব্দ ও অনুমান, এই উভয় প্রমাণই অসিদ্ধ।

প্রমাণা-ভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫ম অধ্যায় ১০ম সূত্র

কপিল আরও বলেন, সেই ঈশ্বর বদ্ধ কি মুক্ত। যদি মুক্ত হন, তবে সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যদি বদ্ধ হন, তাহা হইলে অক্ষম হইবেন। যদি ঈশ্বর অস্বীকৃত হওয়াই কপিলের মত হইত, তাহা হইলে তিনি "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্রের অবতারণা করিতেন। তিনি বলেন যে তোমরা নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা যে বল,তাঁহাদ্বারা এরূপ ক্লেশময় সংসার সৃষ্টি হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যদি নিত্যঈশ্বর অসিদ্ধ হয়, তবে ঈশ্বর প্রতিপাদক শ্রুতির কি উপায় হইবে, তদুত্তরে কপিল নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসনা সিদ্ধস্যবা। ১ম অধ্যায়,৯৫ সূত্র।

কপিল বলেন যে, আমি তোমাদের কল্পিত নিত্য ও অনাদি ঈশ্বর স্বীকার না করিতে পারি, তাহা হইলেও আমি "জন্য ঈশ্বর" স্বীকার করি। তজ্জন্য তিনি আর এক বিখ্যাত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা। ৩য় অঃ, ৫৭।

আত্মা বা পুরুষ সকল মনুষ্য, কীট, পশু ও পক্ষীর দেহে যখন সংযত বা বদ্ধ থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রকৃতি-লীন বলা যায়। এই প্রকৃতি-লীন আত্মা ক্রমশঃ উর্দ্ধগতিলাভ করিতে করিতে উপাসনাদ্বারা লব্ধাতিশয় হইয়া ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ প্রকৃতির উপর অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ লব্ধাতিশয় মহাপুরুষ বা ঈশ্বরকে সাংখ্য পরিভাষায় "জন্য ঈশ্বর বলা যায়"। ইহা যে কপিল কেবল তাঁহার নিজের মত বলিতেছেন, এরূপ নয়। তিনি ইহা ঋষিদিগের সর্ব্ববাদীসম্মত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শন এই জগতের মূল উপাদানকে প্রকৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যমতে এই প্রকৃতি স্বাধীন বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতি কখনও স্বাধীনভাবে, পুরুষ নিরপেক্ষ ভাবে ক্রিয়া করিতে পারেন না। এ কথা সাংখ্যদর্শনে জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। প্রকৃতিস্বরূপ দর্শনার্থ এবং পুরুষ মুক্তি লাভার্থ পরস্পর যুক্ত হয়॥ এইরূপে উভয়ের সংযোগ হইলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রকৃতির স্বত্বগুণাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষ-চৈতন্য-শক্তি সুখ দুঃখাদিশূন্য। ইনি অকর্ত্তা, কোন কার্য্যই করেন না। সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। এই প্রকৃতি পুরুষ-সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক সমীপস্থ হইলে সেইদিকে গমন করে, তদ্রূপ প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধান প্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যদি এইরূপেই সৃষ্টি হইল, তবে পুরুষ কিরূপে সর্ব্বস্বামী হইলেন? ইহার জন্য কপিল সাংখ্যদর্শনে একটী সূত্রের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—যেমন সৈন্যবর্গের জয় পরাজয় রাজাতেই সেই জয় পরাজয়ের উপচার হয়, তদ্রূপ পুরুষেরও সর্ব্বকর্ত্তারূপে উপচার হয়।

মহাত্মা কপিলের প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব বেদবিরোধী কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য মহাত্মা কপিলের পরিচয় জানা প্রয়োজন। তিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সিদ্ধপুরুষ। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতির গর্ভে কর্দ্দম ঋষির ঔরসে জন্ম। তিনি দক্ষপ্রজাপতির সহস্রপুত্রকে সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী

করান, মহাভারত, সম্ভবপর্ব্ব, ৬৬ অঃ।

সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।

ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায়।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৫ অঃ ২শ্লোক।

অন্য স্থলে তিনি অগ্নি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।

মহাভারত।

শ্রুতিতে পুরুষের স্থষ্টি-কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। কপিল প্রকৃতির স্থষ্টিকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন, সুতরাং এই উভয় মতের বিরোধ দেখা যায়। মহাত্মা কপিল এই উভয় মতের সামঞ্জস্য জন্য নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রকৃতি বাস্তবে চ পুরুযস্যা ধ্যানসিদ্ধিঃ।

সাংখ্য ২য় অঃ। ৫ম সূত্র।

শ্রুতিতে যে পুরুষের স্থষ্টিকর্ত্তৃত্ব উক্ত আছে, তাহা প্রকৃতির স্থষ্টিকর্ত্তৃত্বের অধ্যাসমাত্র অর্থাৎ প্রকৃতিরই বাস্তবিক স্থষ্টিকর্ত্তৃত্ব, পুরুষেতে তাহার আরোপমাত্র। "পুরুষকে স্থষ্টিকর্ত্তা বলিলে "পুরুষ কূটস্থ ও চিন্মাত্র" এইসকল শ্রুতির বিরোধ হয়, আর তাঁহার স্থষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে তিনি পরিণামী হইলেন, সুতরাং তাঁহাকে কূটস্থ বলা যায় না। বিজ্ঞানভিক্ষুর টীকার অনুবাদ। অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও প্রকৃতির স্থষ্টির কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ আছে। মহাত্মা কপিল সেই প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্ব তাঁহার কৃত সাংখ্য দর্শনে যুক্তি ও বিচারদ্বারা বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলেও তাহা ব্রহ্মের অধ্যাসমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বশত প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে স্থষ্টি হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতার নানা স্থানে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, পুরুষকে অকর্ত্তা বলা হইয়াছে। পুরুষ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কিছুই করেন না।

প্রকৃত্যৈবচ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥

১৩শ অঃ। ২৯ শ্লোক।

অনুবাদ যাবদীয় কর্ম্মই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। আত্মা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না। যে ব্যক্তি ইহা দর্শন করেন, তিনিই সম্যগদর্শী।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎবিপরির্ব্ততে॥

৯ম অঃ, ১০।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধঃ প্রকৃতি সম্ভবান্॥

১৩শ অঃ ১৯।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
কারণং গুণ সঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥

১৩শ অঃ, ২১।

অনুবাদ। আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ স্থষ্টি করিতেছে এবং এইজন্য এই জগৎ বারম্বার উৎপন্ন হইতেছে। ৯অঃ ১০।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১৩শ অঃ ১৯।

পুরুষ দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তদীয় সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মধারণের একমাত্র কারণ। ১৩শ অঃ ২১।

মহাত্মা কপিল যে প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন, গীতায়ও প্রকৃতিতে

ব্রহ্মসত্বার অনুপ্রবেশ বলা হইয়াছে। যাহা বেদান্ত মতে "ঈক্ষণ" হইয়া স্থষ্টি হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে ব্রহ্মের এই অনুপ্রবেশই প্রকৃতির গর্ভাধান।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভ্তং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়ঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহেদেহিনমব্যয়ম্॥৫

গীতা ১৪অঃ, ৩।৪।৫ শ্লোক।

অনুবাদ। হে ভারত, মহৎ প্রকৃতি মদীয় গর্ভ ধান স্থান; আমি তাহাতে নিখিল জগতের বীজ প্রক্ষেপ করিয়া থাকি, সেই হেতুই ভূতগ্রামের উৎপত্তি হয়। ৩॥ হে কৌন্তেয়? যাবতীয় যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই সকল মূর্ত্তির মাতৃস্থানীয় এবং আমি বীজদাতা পিতা। ৪॥ হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটী প্রকৃতিজাতাগুণ শরীরের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিত আছে। ৫॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ বা ব্রহ্মকে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। বেদান্ত মতে আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বেদান্তের ব্রহ্ম ও সাংখ্যের আত্মায় কোন ইতর বিশেষ নাই। কপিল-দর্শনের সহিত গীতার মতের কোন পার্থক্য থাকা দেখা যায় না। সামঞ্জস্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য দুঃখ নিবৃত্তি। কি উপায়ে দুঃখময় সংসারে পুরুষার্থ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহাই সাংখ্যদর্শনে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ।

কপিল-সাংখ্য।১।১

এই পুরুষার্থ কি উপায়ে লাভ হয়, তাহাই সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হইয়াছে। মহাত্মা কপিল জ্ঞানই পরম পুরুষার্থ এবং মুক্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্ত ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন।

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। বেদান্তদর্শন। ১।১

কপিলদেব প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান এবং মুক্তির উপায় এবং তাহার যুক্তি ও প্রমাণ তৎকৃত সাংখ্যদর্শনে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বেদকে শব্দ প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পুরুষের সহিত প্রকৃতি লীন অবস্থায় থাকেন। স্থষ্টির সময় সগুণত্ব প্রাপ্ত হন। তজ্জন্যই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে স্থষ্টি ব্যাপার সম্পন্ন হয়। প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা বিশ্বব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। আদিকারণের নামই কপিল ঋষি প্রকৃতি বলিয়াছেন। ইহা ভিন্ন প্রকৃতি কোন পদার্থ নয়। প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব সহজে বুঝিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে শক্তি বলে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা যাহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলে, মহাত্মা কপিলের প্রকৃতি পুরুষের সংমিশ্রণই তাহার অন্যতম নাম। যাহা প্রকৃতি আদ্য কার্য্যোন্মুখী শক্তি, তাহারই নাম মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যকার প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হয় বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর মহত্তত্ত্বের নাম হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন।

বেদ ও দর্শন শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। বেদ অদৃষ্ট বিষয় লইয়া হইয়াছে। তাহা দর্শন শাস্ত্রের অতীত।

বেদ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের শিক্ষা দেয়, সুতরাং বেদের সমুদায় বিষয় দর্শন শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। এই বিশ্বসংসার একজন বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও পরিচালিত এবং পরিরক্ষিত হইতেছে, একথা বেদের বিষয়। দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি দৃষ্ট বিষয়ের উপর সংস্থাপিত। তজ্জন্য দর্শন শাস্ত্র দৃষ্ট বিষয় এবং অনুমানের উপর অধিক নির্ভর করে। যে মহাভারত হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতেও সাংখ্যমতের উৎকর্ষতা বর্ণিত হইয়াছে। মহাত্মা ভীষ্ম কপিল সাংখ্য ও যোগের ভূয়সীপ্রশংসা করিয়াছেন।

"ভীষ্ম বলিলেন,সাংখ্যমতাবলম্বীরা সাংখ্যের ও যোগিগণ যোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন, যোগীরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কিন্তু সাংখ্য-মতাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহ নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে সমর্থ হন। * * * এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসঙ্গত।"

শান্তিপর্ব্ব ১০৩অঃ, প্রতাপ রায়ের অনুবাদ।

ঈশ্বর-নিরূপণ কপিল দর্শনের উদ্দেশ্য নয়। প্রবাদ যে, কপিলের একটী পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার বর্ণিত মুখ্য বিষয়ের সহিত বেদ ও গীতার বিরোধ থাকা উপলব্ধি হয় না। সৃষ্টিতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। তাঁহার আদিম তত্ত্ব উদ্ভাবন অনন্তব। সৃষ্টি-কার্য্য কেহই প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথবা সৃষ্টি-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই। হিন্দু ঋষিগণ যোগ-বলে, যুক্তি ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বেদের পথ অনুসরণ করত ঐ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহাতে সকলের মত ঐক্য না হওয়া অসম্ভব নয়। প্রাচীন ব্যবহার এবং হিন্দু গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, কপিল হিন্দু সমাজে বিশেষ সমাদৃত। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব অনুসরণ কবিয়াই তন্ত্র শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে, তাঁহার সেই প্রকৃতি-পুরুষই কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেব দেবী। তাহারই উপাসনা হিন্দু সমাজে প্রচলিত। প্রকৃতি-পুরুষের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই হিন্দু ঋষিগণ সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন।

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধীতি॥

ঈশোপনিষদ।

মাতরং প্রকৃতির একটী নাম। সুতরাং বেদ ও উপনিষদের সহিত মহাত্মা কপিলের প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বের কোন বিরোধ নাই। জগৎ সৃজন প্রকৃতির কি চেতন ব্রহ্মের কার্য্য? গীতায় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইয়াছে—

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।

ঈশ্বর প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া জগৎ সৃজন করিয়াছেন। পুরুষে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব যেজন্য আরোপিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে আর তাহা সমালোচনা করার প্রয়োজন নাই।

অবিশেষ শ্চোভয়োঃ।৬।১অয় ৬।

কপিল-দর্শন।

এই সূত্র দ্বারা কপিল ঋষি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ধনাদি দ্বারা দুঃখনাশ ও বৈদিক কার্য্যদ্বারা দুঃখ নাশ, উভয়ই তুল্য। ধনাদির অপগম হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়। পশুহনন প্রভৃতি দ্বারা বৈদিক

যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে পশুহনন জন্য পাপ ভোগ করিতে হয়। ইহা দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু মোক্ষ লাভ হয় না। কারণ পুণ্য ক্ষয়ে পুনঃ জন্মভোগ করিতে হয়, সুতরাং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভই পরম পুরুষার্থ। তাহার আর ক্ষয় নাই। হিন্দু গ্রন্থে বেদান্ত-দর্শন প্রণেতা মহর্ষি ব্যাস অপেক্ষা সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রণেতা কপিলের সমধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল কোন কোন স্থলে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং সাংখ্য মত আমরা কিরূপে নিন্দনীয় বলিতে পারি?

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

বাঙ্গালায় ভাষা-বিভ্রাট।

বঙ্গবাসীর বীণার অমৃতস্রাবী মধুর ঝঙ্কার সুদূরস্থিত এই প্রবাসীর কর্ণকুহরে সদাই প্রতিধ্বনিত হয়, আর সে প্রতিধ্বনিতে মনপ্রাণ মাতাইয়া তোলে। তাই আজ মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া তৎসম্বন্ধে দু-চার কথা বলিতে বসিয়াছি। আজ যদি এই প্রবাসী অকৃতী সন্তান বঙ্গবাসীর সেবায় কথঞ্চিৎ আসিত, তাহার জীবন ধন্য হইত। যদিও দৈবদোষে পেটের জ্বালায় বঙ্গমাতার প্রেম-পূরিত ক্রোড়চ্যুত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—বঙ্গজননীর যে ভালবাসায় আজন্ম-পরিবর্দ্ধিত হইয়া একত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত লালিত পালিত হইয়াছি, তাহার মধুর স্মৃতি এখনও আমার এক্ষুদ্র জীবনে কি এক অভিনব ভাব আনিয়া দেয়, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম, তাই মনে বড় কষ্ট হয়। আজ বঙ্গের নব-উদ্বোধনের দিনে কত শত সুকৃতী সন্তান বঙ্গবাসীর সেবায় নিযুক্ত, তাহার সংখ্যা নাই। সকলে কিরূপে মাকে সাজাইবে, মায়ের কোন অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার শোভা পাইবে, তাই ভাবিয়া ভাবিয়া যেন সকলে অস্থির। সকলেরই প্রাণে যেন একটা নূতন ভাব আসিয়াছে যে, বঙ্গমাতাকে মনোমত করিয়া সাজাইতে হইবে। বঙ্গভ্রাতৃগণ! আপনারা মাকে ইচ্ছামত সাজাইয়া মনের সাধ মিটাইতে পারেন—যাঁর যেমন শক্তি, তিনি সেই ভাবেই মায়ের অঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে পারেন, কিন্তু দেখিবেন্ যেন মাকে সাজাইতে গিয়া বিজাতীয়-ভাব প্রণোদিত হইবেন না! মায়ের অঙ্গের বরণ কদর্য্য বলিয়া একেবারে চাঁচিয়া ছুলিয়া গৌরাঙ্গী করিতে প্রয়াস পাইবেন না! করিলে সে প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। মায়ের সৌষ্ঠবাকৃতি বিকৃত হইবে মনে রাখিবেন। সতর্ক করিবার আশায় দু-চার কথা বলিব। সকলেই যে এ গরিবের কথা শুনিবেন, সে আশা রাখি না, তবে কর্ত্তব্য বোধে মনের সাধ মিটাইবার জন্য বলিব।

২। নবীনালোকোদ্ভাষিত এই বিংশ-শতাব্দীতে কোন কোন বঙ্গবাসী-সেবক মায়ের প্রতিমার আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত। তাঁহাদের আর মায়ের পুরাতন মূর্ত্তি ভাল লাগে না। তাঁহারা মাতৃমূর্ত্তির আমূল পরিবর্ত্তন চান।

৩। আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের এই নবভাব সমাজ-সংস্কার-বৃত্তি-জাত। উন্নতিশীল

যুগে সকলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া স্ব স্ব সমাজ-সংস্কার জন্য উৎসুক। অবশ্য সমাজের পক্ষে ইহা একটী সুলক্ষণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ-ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস বাক্‌সর্ব্বস্বে পরিণত হইতেছে, তাই দুঃখ হয়। পরমেশ্বরের রাজ্যে সকলই উন্নতিশীল হউক, ইহা কে না চায়? আর জগৎ যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন ইহাই স্বাভাবিক যে, মানবদেহের পরিবর্ত্তনের ন্যায় ধর্ম্ম ও সমাজ নিত্য পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলুক। এই পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়মচক্রের সংঘাত যে ভাষার উপর কার্য্যকারী নয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কেননা মানব-সমাজ যেমন পরিবর্ত্তনীয়, ভাষা সম্বন্ধেও কতকটা তদ্রূপ। নূতন নূতন শব্দ আসিয়া যে ভাষার কলেবরকে পুষ্ট না করিবে, এরূপ নহে। জাগতিক নিয়মানুসারে মানব সমাজের পরস্পর আদান প্রদান হইয়াছে ও হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। তাহার প্রতিরোধ-প্রয়াস যে যতদূর সম্ভবপর, তাহা বলিতে পারি না।

৪। যে সকল সাহিত্যিকরথী আজকাল বঙ্গভাষা সহজ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের ধারণা, বঙ্গভাষার মা বাপ নাই, অর্থাৎ ব্যাকরণ নাই, আইন কানুন নাই, কাজেই ইহার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন সাধ্য। কাজেই তাঁহারা ভাবেন "আমরা যাহা লিখিব, তাহাই ভাষা"। যাঁহারা একার্য্যে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় ভাষা-বিদ্রোহিতার দোষে দুষ্ট। যে বঙ্গভাষাকে গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র, মানবদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ, দত্ত অক্ষয়কুমার, সেন রামপ্রসাদ প্রভৃতি গড়িয়া গিয়াছেন—যে বঙ্গভাষা স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও সরস্বতীর বরপুত্র মাইকেল এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ মহারথীদিগের বড় আদরের, বড় সাধনার ধন, সেই প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী জননী বঙ্গভাষার প্রতি যথেচ্ছাচারিতা বোধ হয় কোন বিবেচক পাঠক পাঠিকা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন না। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাই মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন "পরমারাধ্যা চিরাদৃতা আমাদের শ্বেত-শতদল-বাসিনী বঙ্গভাষার অঙ্গে নব্য সাহিত্যিক্ চিকিৎসকদিগের ছুরিকাঘাত দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়—জানিনা কবে কোথায় এ শবচ্ছেদের ছেদ আসিয়া পড়িবে। মা আমার শবের মত পড়িয়া আছেন, আর ঐ সকল চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে মা আমার ক্ষতবিক্ষতা। জানিনা কবে কোন্ রাসায়নিকপ্রবরের সিদ্ধ মলমে মায়ের আমার ক্ষতাঙ্গ জোড়া লাগিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে!"

৫। যাহা হউক, আমাদের মনে হয় না, যদিও বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাকরণ নাই, তথাপি—পূর্ব্বোক্ত একনিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ আদর্শহীন ছিলেন না। তাঁহাদের সকলেরই একটা আদর্শ ছিল। আর বঙ্গভাষার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় মূল সংস্কৃতভাষা। যেমন প্রাকৃত, পালি, হিন্দি ও মৈথিল্যাদি ভাষা সংস্কৃত জননীর গর্ভসম্ভূতা, আমাদের বঙ্গভাষাও সেইরূপ এক সংস্কৃত জননীর গর্ভজাতা। বরং জননীর সহিত বঙ্গভাষার সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে, একটু আধটু অনুস্বার বিসর্গরূপে আবৃত করিলে মা মেয়ে চেনা ভার হয়। এ

সৌসাদৃশ্য বঙ্গবাসীর কম গৌরবের ও আনন্দের বিষয় নহে। কেহ যেমন মাতৃহীন হইয়া তদনুরূপ জ্যেষ্ঠা ভগিনী দর্শনে স্বর্গীয়া জননীর বিচ্ছেদ-শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হন, আমরাও তদ্রূপ ভারত হইতে সংস্কৃত জননীর একরূপ অন্তর্ধানেও বঙ্গভাষার আলোচনায় অপার আনন্দানুভব করিতে পারিতেছি। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, সংস্কৃতপ্রভবা বঙ্গভাষার সহিত নানা দেশজ ও বিদেশজ ভাষার পরগাছা আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। অনেকে বলেন, এসব পরগাছা উচ্ছেদ করিতে হইবে। সুবৃক্ষে পরগাছা উৎপন্ন হইলে সেগুলিকে সময় মত কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কারণ তদ্বিষয়ে অপেক্ষা করিলে পরগাছাগুলি বর্দ্ধিত হইয়া আসল বৃক্ষের উচ্ছেদ বা ধ্বংস সাধন করিতে পারে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এ প্রথা অবলম্বনীয় হইলেও ভাষা সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য কিনা, বিবেচনার বিষয়। আমাদের চক্ষে কিন্তু এ পরগাছা গুলিকে তত অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাহাদের নানা বর্ণ বিচিত্র পত্রে পুষ্পে বৃক্ষের আরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যে সব বিদেশীয় শব্দ বঙ্গভাষার অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছে, সে সব থাকুক। যখন আশ্রিতকে আশ্রয় দান হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম, তখন আমরা হিন্দু হইয়া কিরূপে ঐগুলিকে পদাহত করিয়া সমুদ্রের অপর পাড়ে তাড়াইয়া দিব? আমরা ত আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নহি যে, বিদেশাগত কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি অত্যাচার করিব বা তথা হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইব? ভারতবাসীর প্রকৃতি তদ্বিপরীত। তাই ভারতে যে সকল বিজাতি প্রবেশ করিয়াছে, ভারতবাসী তাহাদিগকে সহাস্যবদনে আশ্রয় দান করিয়াছে, ও তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছে। এই আত্মোৎসর্গ-বৃত্তি হিন্দুজাতির নিজস্ব, এ শিক্ষা প্রকৃত হিন্দুসন্তানের অস্থিমজ্জায়। প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র জাতি বিচার রাখে না। তবে সামাজিক আচারগত বৈষম্যের জন্য উহাদিগকে সমাজক্ষেত্রের একপার্শ্বে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। মেওয়া-বাগানের একপার্শ্বে যেমন তেঁতুল গাছ রোপিত হয়, তদ্রূপাবস্থায় থাকিতে দিয়াছে। কাঁচা ও পাকা তেঁতুল যেমন আমাদের অনেক কাজে লাগে, আমাদের অরুচি নাশ করে, পরগাছারূপ বিদেশজ শব্দগুলিও আমাদের তদ্রূপ কাজে লাগিয়াছে। আমাদের আরও মনে হয়, ঐতিহাসিকের পক্ষ বিদেশজ ভাষার সংমিশ্রণ ব্যাপার ভারতেতিহাসে নূতনালোক দান করিতেছে। এখন হইতে আমরা যদি ঐ শব্দগুলিকে পরগাছা বলিয়া উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পাই, তাহা হইলে কালে অধঃস্তন ঐতিহাসিকবৃন্দের গবেষণার পথ রুদ্ধ করা হইবে। কাজেই আমাদের যে সব বঙ্গসাহিত্যিক ভ্রাতৃবৃন্দ বঙ্গবাসীর ক্রোড়স্থিত বিদেশী শব্দ গুলিকে বিতাড়িত করিতে চান, তাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াছেন, একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না! বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালার প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান, বহু শতাব্দীর একত্র বসবাস হেতু হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বদ্ধ,—আমরাও যেমন বঙ্গমাতার সন্তান, উহারাও তদ্রূপ—তবে আমরা না হয় গর্ভজাত, উহারা না হয় পালিত পুত্র, কিন্তু আমরা উভয়েই বাঙ্গালী নামান্তর্গত—এক বঙ্গমাতার স্তন্য-পুষ্ট। আমরা কিরূপে, উহাদের যে সকল পৈতৃক ভাষাজ শব্দ বঙ্গবাসীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে, তাহা

পরিত্যাগ করিব? সে প্রয়াস কি ভ্রাতৃবিচ্ছেদের পূর্ব্বলক্ষণ নহে? অবশ্য ভ্রাতৃবিচ্ছেদকর বিকারে ভারত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে ও ধ্বংস পাইতেছে! দেশ "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রূপ কুনীতিমন্ত্রমুগ্ধ। তথাপি যখন আমরা জাতীয় অধিবেশনে ও সভাসমিতিতে ভ্রাতৃস্নেহের দোহাই দেই, তখন কিরূপে আমরা বিদেশজ শব্দগুলিকে পরিত্যাগ করিব? সে প্রয়াসে কি ভাতৃবিচ্ছেদ-বহ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইবে না? তাই বলি, তাঁহাদের এ আয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। এবিকারের মূলকারণ মানসিকবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা, কাজেই স্বার্থপরতা। এ দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে কবিরাজী রসায়নের আবশ্যক। প্রেম-রসায়ন প্রয়োগ করিতে হইবে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জাতি নির্ব্বিশেষে প্রেমৌষধ প্রয়োগ করুন, ভারতের দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

৬। যাঁহারা বঙ্গভাষা সংস্কারে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা বলিতে পারেন, কেন প্রাচীন যুগেও ত দেবভাষা বা গীর্ব্বাণি সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সংস্কৃত নাম ধারণ করিয়াছে। অবশ্য পঞ্চনদ-তটাগত আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ আর্য্যঋষিগণ দেবভাষার সংস্কার সাধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সংস্কার অন্যবিধ। বিশুদ্ধ ব্যাকরণের অভাবে বৈদিকভাষা সুশৃঙ্খল ছিল না, তাই তার বিশৃঙ্খলতা অপনোদন করা হইয়াছিল মাত্র, ইমারতের উপর ক্ষার লেপন হইয়াছিল মাত্র (white-washed), কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর মহালোকের যুগে কি ব্যাকরণের অভাব আছে বা ব্যাকরণ সুশৃঙ্খলতাসাধন করিতে অপারগ? অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ বঙ্গভাষার উপর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাঙ্গীন কার্য্যকারী হইতে পারিবে, আমরা একথা বলিতে চাহিনা। তবে প্রাকৃত ও পালি প্রভৃতি সহোদরা ভাষার যেমন স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, বঙ্গভাষারও সেই-রূপ স্বতন্ত্র ব্যাকরণ থাকা উচিত। যদি না থাকে, তবে ইহারই সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করা উচিত। কারণ ভাষা অগ্রে, ব্যাকরণ তৎপরে। ভাষার উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধির সহিত ব্যাকরণেরও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করি। তবে পুরাতন জিনিসের দিকে নজর রাখিয়া একাজ করা উচিত। কথায় বলে "পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে"। আর যখন আমাদের আদি ভাষা সংস্কৃত, তখন আমাদের আদিভাষা বৃদ্ধ মাতামহী সংস্কৃতভাষার দিকে নজর রাখিলেই ভাল হয়।

৭। কয়েক বৎসর যাবৎ কতকগুলি বঙ্গ-সাহিত্যরথী বঙ্গভাষা সহজ করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। তাঁহাদের ঘোরতর চেষ্টার ফলে তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্র জম্‌কাইয়া বসিয়াছেন ও বেশ পশার বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের লিখিত বহু প্রবন্ধ বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে ও করিতেছে। হিন্দি-উর্দ্দু প্লাবিত এ সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিভৃতে বাস করিয়াও যাহা যাহা নজরে পড়িয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যরথী-গণের এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ভাষার সুখোচ্চারণ ও সরলতাসম্পাদন। উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনোগতভাবানুসারে উচ্চারণগত বানান হওয়া উচিত (Phonetic spelling) এবং ইহাও বোধ হয়, তাঁহাদের বাসনা, যদি একার্য্যে সফল-মনোরথ হইতে পারেন ত কালে বঙ্গভাষায় ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ন্যায় টাইপযন্ত্র (Typewriter) আবিষ্কার হইতে পারিবে। বঙ্গভাষার যুক্তাক্ষরাধিক্যই একার্য্যের অন্তরায়। কাজেই কোন

রূপে যদি যুক্তাক্ষরগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় ত উক্ত কার্য্য সুখসাধ্য হইবে। অবশ্য তাঁহাদের এ সাধু উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

৮। কিন্তু জগতে সর্ব্বকার্য্য আয়াসসাধ্য নহে। আমগাছে তেঁতুল ফলান যেমন একরূপ অসম্ভবপর ব্যাপার, ইহাও কতকটা তদ্রূপ, তবে ক্রমশঃ বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, ও অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইতেছে, কে বলিতে পারে যে, কালে ঐরূপ ঘটিবে না? এই আশা-প্রণোদিত হইয়াই বোধ হয়. উঁহারা পুরা-কালের "পণ্ডিত" শব্দকে আধুনিক পংডিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা এখন খোলস ছাড়িয়া সাদা বাংলা ও মাথার পাকড়ী বাঙলায় পরি-ণত হইয়াছে। এটা বোধ হয় বাঙ্গালীর যুদ্ধে পাগড়ী ধারণের পূর্ব্বলক্ষণ। হর-জটা-ভ্রষ্টা গঙ্গা এখন হরিদ্বার হইতে প্রবাহিতা গংগা খালে পরিণত হইয়াছে! ভবিষ্যতে ভাষার বিকারে ও নস্যের প্রভাবে তাহাকে না কালে গগ্‌গায় পরিণত করেন, তাই ভয় হয়! উত্তাল-তরঙ্গময়ী ভীষণ নর্ম্মদায় বোধ হয় আর তরঙ্গ খেলিবে না। রাবণের সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা এখন শুধু লংকায় পরিণত! কাজেই মনের দুঃখে "ঙ্গ" এখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেছে। এখন তৎপরিবর্ত্তে তীররূপী "তং" এবং মাথায় পাকড়ী "ঙ" স্থানাধিকার করিয়া বসিতেছে! আমাদের মনে হয়, কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটিতে পারে যথা "ব্যাঙ্গ (ভেক্) 'ব্যাঙ' "বাঙ্গালা" বাঙলা, কিন্তু বঙ্গদেশ 'বংদেশ' "বঙ্গভাষা" বংভাষা" ইত্যাদিরূপে চালাইতে একবারে অসমর্থ। যদি আমার বঙ্গভ্রাতৃগণ "ঙ্গ"কে একবারে সাগর পারে তাড়াইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা বোধ হয় লাঙ্গল স্থলে—লাংল, রাঙ্গা স্থলে রাংআ, কাঙ্গাল স্থলে কাংআল, আঙ্গুল স্থলে আংউল, রঙ্গমঞ্চ স্থলে রংমঞ্চ ইত্যাদি লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু বঙ্গভাষায় কি এরূপ স্থান পাইতে পারে? যাহারা কেবল "ঙ্গ" সহজ করিতে উদ্যুক্ত, তাঁহারা কেবল "ঙ্গ" সহজ করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, কারণ "ঙ্গ" ছাড়া বঙ্গভাষায় আরও অনেক যুক্তাক্ষর আছে। যথা "জ্ঞ" "ক্ষ" "ন্ধ" "দ্ধ" "ঞ্চ" ইত্যাদি। যাঁহারা এসব কথাগুলির উপর আড়াই পোঁচ দিতে প্রস্তুত, তাঁহারা না হয় কাল-মাহাত্ম্যে এ কার্য্যে সফলমনোরথ হইলেন, কিন্তু যুক্তাক্ষর ছাড়া আরও কতকগুলি ভীষণ দৈত্য আছে—যথা দুইটা ইকার, দুইটা উকার, দুইটা "জকার" তিনটা সকার! ইহাকে বলে গোদের উপর বিষফোড়া! ইহাদের জ্বালায় ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা অস্থির। সংস্কারকগণ ইহাদিগের কোনটাকে ভাষা হইতে মুক্তিদান করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন? উঁহাদের ঐ প্রয়াস দেখিয়া, ঐ দেখুন সন্ধি, কারক, সমাস কৃৎতদ্ধিতাদি দৈত্যকুল বিকট হাস্য করিয়া উঠিতেছে! উহাদের হাস্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ! বঙ্গভাষায় এরূপ দৈত্যকুলের ত অভাব নাই! যেন সব রক্ত-বীজের ঝাড়! যদি এগুলিকেও কোনরূপে নির্ব্বাসিত করা যায়, তবে কম্বলে কগাছা লোম থাকিবে? লোমহীন বস্তুটার নাম কি আর কম্বল থাকিবে? যাঁহারা বলেন, "একটা নূতন কিছু কর", "একটা নূতন কিছু কর", তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, সব নূতন করা চলে না। তাই কবির ভাষায় বলিতে চাই "দুনিয়া পুরাণ হেথা চল্‌বেনা নয়া ঢং।"

৯। প্রবাসে বসিয়া "প্রবাসীর" অনু-গ্রহে বঙ্গভাষার সহজকরণ বিষয়ে অনেক আহার জুটিতেছে, কিন্তু সে আহারে ক্রমশঃ

অরুচি আসিয়াছে! বঙ্গভাষার যেন এক অরাজকতার সময় আসিয়াছে! ঘরে বাহিরে, ভাবভঙ্গিতে, লিখনে পঠনে যথেচ্ছাচারিতার দর্শনে বড়ই দুঃখানুভব করি, তাই পাঠক পাঠিকাগণকে এতৎ সম্বন্ধে দুচার কথা বলিয়া মনের দুঃখভার লাঘব করিতে বসিয়াছি। যথেচ্ছাচারিতার দুচারিটা নমুনা আপনাদের নয়নগোচর না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দেশে যদি হিন্দুরাজা থাকিত ত বোধ হয়, সমাজ ও ভাষার এরূপ যথেচ্ছাচারিতা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। 'ক' মহাশয়ের ভৃত্যরূপী 'ই' তাহার হ্রস্বত্ব ঘুচাইয়া দীর্ঘত্ব পাইতেছেন, বোধ হয় কালমাহাত্ম্যে ইহা হইবে, তাই শূদ্রের শূদ্রত্ব ঘুচিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ত্বে পরিণতি হইতেছে, "শূদ্রঃ ব্রাহ্মণশ্চেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং" মনু বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে—সত্যযুগের পোরম্ভ নাকি? যাহা হউক, ইহার ফলে কীরই জয়ডঙ্কায় মেদিনী প্রকম্পিতা! কিন্তু "কি" যে "কী" হয়, ইহা এতাবৎ কুত্রাপি দেখি নাই, এ আমদানী বঙ্গভাষায় নূতন! স্থান ও প্রয়োগ ভেদে যে হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হয় ও দীর্ঘ হ্রস্ব হয়, তাহা অনেকেই জানেন—"দূরাহ্বানে গানে রোদনেচ প্লুতো-মতঃ",তা বলিয়া উক্ত হ্রস্ব স্বরগুলিকে আকার দীর্ঘ করিতে পারা যায় না, কি এত স্পর্দ্ধা?

"কি করে কলঙ্ক যদি সে আমারে ভালবাসে?"
"পিরিতি অন্তরে যার, কি করে কলঙ্ক তার?"

ইত্যাদি স্থলে 'কির উচ্চারণ দীর্ঘ হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও উহার আকার দীর্ঘ করিতে পারা যায় না, কারণ কি শব্দ বস্তুত "কি" নহে, পরন্তু উহা সংস্কৃতমূলক কিম্ শব্দের অপভ্রংশ, অনুস্বার বা মকার পরে থাকাতে কিম্‌এর ইকার গুরু হইয়াছে, উক্ত "ং" বা মকারের লোপে সেই গুরুত্বই থাকিবে।

১০। আবার কেহ কেহ লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া হাল ফ্যাসনে 'খাওয়া' 'খাওা' 'দাওয়া' 'দাওা' 'হওয়া' 'হওা' লিখিয়া স্বরবর্ণে আকার, ই-কার ী-কারাদি যোগ করিতেছেন, কেহ বা বিদেশীয় অ্যালোপাথিক অ্যালকোহল অ্যালম্যানাক্ প্রভৃতি শব্দের 'অকার' 'আকার' য-ফলা যোগ করিতে চান! তাই বলি হলো কি? এ ভাষাবিভ্রাটে যে প্রাণ ঝালাফালা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আরও কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা গ্রাম্য ভাষাগুলিকে বা কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষাকারে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। কথিত ও লিখিত ভাষা যে চিরকালই আলাহিদা আছে ও থাকিবে, তাহা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত। অবশ্য নাটক নভেলে স্থান বিশেষে গ্রাম্যভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সে আলাহিদা কথা। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, যেমন বামুন শূদ্র, জ্ঞানী বা ভক্তের চক্ষে এক হইলেও, লোকসমাজ পৃথক ভাবে, অথচ একত্রে বসবাস করে, ইহাও তদ্রূপ। উহাদের জানা উচিত, শূদ্রের স্কন্ধে ত্রিদণ্ডী দিলেও কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় কেবলমাত্র হাস্যাস্পদ করা হয় মাত্র। যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ পাইতে হইলে ব্রাহ্মণ জাতির আমূল সংস্কার আবশ্যক, শূদ্রের সংস্কারে ব্রাহ্মণ পাওয়া বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব, তাঁহাদের এ প্রয়াস অনেকটা তদ্রূপ। তাই বলি, যাহারা "একটা নূতন কিছু কর" এই প্রেরণায় অভাগিনী ভাষাজননীর মুণ্ডপাত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হন। পূজনীয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

অনেকেই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেছেন এবং এই ভাষা-সংস্কারে অনেক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যে পরস্পর অপ্রিয় কথা চলাচলি হইতেছে, কিন্তু যেমন "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী", তদ্রূপ, উহারা কোন প্রতিবাদেই কর্ণপাত করিতে রাজি নন। আপনাদের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য, আপনাদের পথে চলিতেছেন,উহাদের প্রেস্‌টিজ রাখা যেন চাই ই! ব্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ন্যায় তাঁহাদের ভাষা-ব্যবচ্ছেদ করা চাই-ই। তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও প্রতিভাবান লোক আছেন। তাই তাঁহারা কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না। আমাদের মনে হয়, পাশ্চাত্য পদকপ্রাপ্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উহাদের পৃষ্ঠপোষক। কাজেই তাঁহাদের পুস্তক কাট্‌তির দ্বার বাঙ্গালার বাজারে উন্মুক্ত। মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যেমন গর্ভধারিণীরা কুপুত্রের বা পুত্রবধূর অত্যাচারে লাঞ্ছিত, অপমানিতা, বারাণসী নির্ব্বাসিতা হইয়া মনের দুঃখে দিবারাত্র যাপন করিতেছেন, অথচ তাঁহারাই আবার সভা সমিতিতে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাক্যাবলিতে পশার জম্‌কাইয়া স্বদেশভক্ত সাজিয়া আছেন, তদ্রূপ বঙ্গবাসীর কুসন্তানের লেখনীর তাড়নায় আমার মায়ের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষতা। হায়! হায়! এ অত্যাচারে বঙ্গসমাজ না রসাতলে যায়!

১১। তাই বঙ্গবাসীর সুকৃতী সন্তানগিগের নিকট আমার আন্তরিক নিবেদন,যেন তাঁহারা এ ভাষা-সমস্যার একটা নিষ্পত্তি সাধন করেন। এ বৈষম্যের যদি সময়ে নিষ্পত্তি না হয়, কালে উহা সাহিত্যের উন্নতির অন্তরায় হইবে। বিশেষত ভাষাক্ষেত্রে যোধ্যমান সাহিত্যিক-রথীদিগের হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীগণের অযথা প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা আছে, তাই, এ সুদূর প্রবাসে আমাদের বড় আশঙ্কা হইয়াছে। এ আশঙ্কার নিঃশেষ করিতে হইলে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ্ সভাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। রাজা বিদেশী,কাজেই ভাষার যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ রাজকর্ম্মচারিদিগের কার্য্য নহে। ওদিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার নহে। তাই উক্ত পরিষদ সভারই নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, যেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী কমিটি সংগঠন পূর্ব্বক এ বিষয়ের সত্বর নিষ্পত্তি করিতে যত্নবান হয়েন। যদি তাঁহারা এ অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়েন,স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় যেন একার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এ যথেচ্ছাচারিতা-নিবারণে শিক্ষার্থীদিগের প্রাণনাশের আশঙ্কা তিরোহিত হইবে এবং এই সৎকার্য্যের ফল স্বরূপ তাঁহারা জগৎপিতার অনন্ত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্লাভাস্কির ধর্ম্মমত কি ?

ব্লাভাস্কির ধর্ম্ম মত কি ? যিনি পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহকে এক সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক, এক সত্য-সূত্রে সমস্ত ধর্ম্মকে গ্রথিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহার ধর্ম্ম-মত জানিবার জন্য কৌতুহল স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিরূপণ তত সহজ নহে। বস্তুতঃ মহাত্মাগণের ধর্ম্মমত কোন প্রচলিত ধর্ম্মের মাপ-কাটীতে মাপিতে গেলে অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতে হয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের নামে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মমত লইয়া, নানা সম্প্রদায়ে যথেষ্ট বিরোধ বিসম্বাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেকেই আপন আপন ভাবে তাঁহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করেন। পাঠক জানেন, ব্লাভাস্কি কাহা-রও কাহারও মতে নাস্তিক ছিলেন। আবার তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া-ছিলেন,—ইহাও পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কি, এ বিষয়ে কোন অবিসম্বাদিত মত প্রকাশ করা কঠিন। এই ধর্ম্মান্দোলনের দিনে আজও বৌদ্ধধর্ম্ম বা দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। মূল বৌদ্ধধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্মেরই প্রকার ভেদ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রায়ই একমত। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের কোন কোন অংশ ত্যাগ করিলেও বেদাতিরিক্ত কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা প্রচার করে নাই। তথাপি বহু শতাব্দী-সঞ্জাত বিভিন্ন মতবাদের স্তরভেদ করিয়া মূল তত্ত্ব নিষ্কাসন করা দুষ্কর। কাজেই এ সম্বন্ধে নানা কল্পনার যথেষ্ট অবসর আছে।

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই, এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের দুই শত বৎসরের মধ্যে কিছুই লিখিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাবলি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের দুইশত বৎসর পরে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে শিষ্যদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া আরও বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকিবে। এবং পুস্তক লিপিবদ্ধ হইবার সময় লেখকগণের পক্ষে বুদ্ধদেবের মত অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতের ছায়া যে তদুপরি পতিত হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বুদ্ধদেব ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি নিরুত্তর থাকিতেন। জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই। তিনি বলিয়াছেন, —"জগৎ অনাদি কি সাদি, অনন্ত কি সান্ত, তথাগত পরিনির্ব্বাণের পর থাকিবেন কিনা,—এসকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" অথচ এই সকল কথা লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অবশ্যই বুদ্ধদেবের সময়ে মহাযান, হীনযান, তন্ত্রযান,

মন্ত্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থের অস্তিত্ব ছিল না। একদা কাশম্বি বনে অবস্থান কালে শিংশপা বৃক্ষের কতকগুলি পত্র মুষ্টিতে ধারণ করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন,— "এই বনের পত্র সংখ্যা আমার হস্তস্থিত পত্র সংখ্যা হইতে যেমন অনেক বেশী, তেমনি যাহা আমি শিক্ষা দিয়াছি, তদপেক্ষা, যাহা আমি শিক্ষা দেই নাই, তাহার সংখ্যা অনেক বেশী জানিবে। কেন আমি ঐ সকল কথা প্রকাশ করি নাই ? কারণ উহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক, নিষ্ফল। উহাতে তোমাদের শান্তি, মঙ্গল, কামনা-নিবৃত্তি,জ্ঞান বা নির্ব্বাণ-লাভের কোন সাহায্য করিবে না।" কিন্তু বাইবেলোক্ত নিষিদ্ধ ফলের দিকে যেমন হভার (Eve) চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, বুদ্ধ-দেবের অপ্রকাশিত বিষয়ে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও কৌতুহলাক্রান্ত শিষ্যগণের দৃষ্টি সেইরূপ আকৃষ্ট হইল। এবং তৎফলে নানা প্রস্থানের সৃষ্টি হইল। তবে সকল শিষ্যের নিকটেই কি তিনি তত্ত্ব অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন ? এ প্রশ্ন পরে বিচার্য্য।

মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থে বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ চারি প্রকার দার্শনিক মত সুবিদিত। যথা, —মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে সকলই শূন্য। বস্তু সত্য হইলে স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যের বৈলক্ষণ্য বা অভাব বোধ হইত না। যোগাচার মতে বাহ্য বস্তু মাত্রই অলীক, কেবল "ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আত্মা"ই সত্য। এই জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অব-লম্বন করিয়া হইয়া থাকে। সকল বস্তুই ক্ষণিক,—অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞান-স্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ কহে। বৈভাষিক মতে বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আইত দর্শনে ক্ষণিকতা মত খণ্ডিত হইয়াছে। যুক্তি এই, —প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করিলে কৃষি বাণিজ্যাদি ঐহিক ফল সাধন কর্ম্মে কিছুতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আমি কর্ম্ম করিয়াছিলাম, আমিই—ফলভোগ করিতেছি,—এই জ্ঞান থাকাতে আত্মা অবশ্যই চিরস্থায়ী।

বলা বাহুল্য, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত বা শিক্ষা প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের মতামত আলোচিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবান যাহা বলেন নাই, উক্ত দার্শনিকগণ সেই সকল তত্ত্ব লইয়া অনেক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তদ্দ্বারা সেই পুরুষোত্তমের মহোচ্চ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তীরা বৌদ্ধমতের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা ও সমালোচনা করিয়াছেন।—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্য মানানাং স্বভাব নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দেশিতাঃ।

অর্থাৎ, বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিলে কোন বস্তুরই নির্ণয় হয় না, অতএব বস্তু অনির্ব্বচনীয় এবং উহার কোন সত্তা নাই (নিঃস্বভাব) ইহাই বৌদ্ধদিগের উপদেশ। যাহা সৎ (কোন কালেই যাহার বাধ, বৈলক্ষণ্য বা অভাব হয় না) নহে, অসৎ নহে, সদসদ্রূপও নহে, তাহার নাম অনির্ব্বচনীয়। বৌদ্ধমতে বস্তু মাত্রই এই অনির্ব্বচনীয় সঙ্গার অন্তর্ভুক্ত।

এবং যখন বিজ্ঞানতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, অর্থাৎ ঘট-পটাদি সমস্তই বিজ্ঞানমাত্র. তখন বিজ্ঞানও অনির্ব্বচনীয় হইল। বেদান্তীরা বিজ্ঞানকে অনির্ব্বচনীয় বলেন না, কারণ উহা স্বতঃপ্রকাশ, সংস্বরূপ এবং বিষয়ের সহিত অসম্পৃক্ত, নিত্য। যাহার প্রকাশ পরাধীন, তাহা অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে। অতএব বেদান্তমতে বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত সকল প্রপঞ্চ অনির্ব্বচনীয়। বেদান্তীরা জগৎকে ব্রহ্মে বা বিজ্ঞানে কল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় আন্তর-বাহ্য সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না।

ইহাতে বুঝা যায়, বৌদ্ধ ও বেদান্তী উভয়েই দৃশ্যজগৎ প্রপঞ্চের কোন প্রকৃত সত্ত্বা স্বীকার করে না। এস্থলে উভয় মতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। একজন উহাকে কল্পিত বা মিথ্যা বলে, অপরে উহাকে বিজ্ঞানাকার বলে—আর এই ক্ষণিক বিজ্ঞান সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসদ্রূপও নহে, অর্থাৎ বেদান্তীর মায়াবৎ অনির্ব্বচনীয়। অতএব বৈদান্তিকের মায়াবাদে ও বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদে অতি অল্পই প্রভেদ, বা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদই নাই। অপর পক্ষে বৈদান্তিক বৌদ্ধের সহিত তাহার ভেদ দেখাইয়া বলে যে, তাহার বিজ্ঞান বা জ্ঞান সৎ, নিত্য, বৌদ্ধের বিজ্ঞান ক্ষণিক। তাহার বিজ্ঞান বা জ্ঞান জড়াতিরিক্ত,বৌদ্ধের বিজ্ঞান জড়ীয় ধর্ম্মাক্রান্ত। তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ-মুক্ত-নির্লিপ্ত; বৌদ্ধের বিজ্ঞান সুখদুঃখ-সংস্পৃষ্ট, অশুদ্ধ। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধের বিজ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা, প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে। সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে। অতএব জগদাকারে প্রতীত যে বিজ্ঞানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধের প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। ইহা বৈদান্তিকের প্রাতিভাসিক জ্ঞানের কতকাংশে সমতুল। আলয় বিজ্ঞান অনেকাংশে বৈদান্তিকের পারমার্থিক জ্ঞানের সহিত তুলনীয়। দার্শনিকগণ অনেক স্থলে সুষুপ্তি, সমাধি ও ব্রহ্মরূপতা এক পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন।* যেমন পারমার্থিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়া ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আলয় জ্ঞানের উপর বাহ্যদৃশ্যাদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান নির্ভর করে। মাদাম ব্লাভাস্কি বলেন,—"আলয় অর্থে জগদাত্মা, Emersonএর over-soul সদৃশ।.....মহাযান সম্প্রদায়ের যোগাচার্য্য-দিগের মতে আলয় শূন্যের বোধক, কিন্তু সেই আলয়ই আবার যাবতীয় দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ-জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। আলয় তত্ত্বতঃ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু জলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় প্রত্যেক বস্তুতে প্রতিবিম্বিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে। পরমার্থ সম্বন্ধেও সেই কথা।"† বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য তাত্ত্বিক-গণের (Esoteric Budhists) মতে আলয় অর্থে জগদাত্মাও বুঝায় এবং সিদ্ধ বা মুক্তাবস্থাও বুঝায়। যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ ইচ্ছামাত্র

* "সুষুপ্তি সমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা"—সাংখ্যসূত্র।

† "Alaya is the soul of the world, or Anima Mundi—the over-soul of Emerson. Thus, while the Jogacharyas of the Mahayana school say that Alaya (Nyingpo or Tsang in Tibetan) is the personification of the voidness, yet alaya is the basis of every visible and unvisible thing, and that though it is eternal and immutable in its essence, it reflects itself in every

নিজের আলয়কে নিত্যসত্ত্বার সহিত মিলিত করিতে পারেন।* অতএব পারমার্থিক নিত্য সত্য (absolute truth) এবং প্রাতিভাসিক আপেক্ষিক সত্য (relative truth) সম্বন্ধে বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ প্রায় এক মতাবলম্বী। বৌদ্ধদেব শূন্য (Voidness) সেই পারমার্থিক নিত্য সত্যকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'নেতি-নেতি' করিয়া সমস্ত প্রাতিভাসিক জ্ঞান নিরস্ত হইলে যে সর্ব্বোপাধিশূন্য অবস্থা লাভ হয়, তাহা সেই নিত্য সত্য অবস্থারই নামান্তর। এই শূন্য অর্থে 'কিছুই নাই' এরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচিত হইবে।

বৌদ্ধদিগের হীনযান ও মহাযান নামক দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। হীনযানীরা মহাযানীদিগকে অবিশ্বাসী বলে। মহাযানীরা বলে হীনযানীরা এক-দেশদর্শী, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এবং ভগবান বুদ্ধোপদিষ্ট জ্ঞানের সম্যক্ মর্ম্ম আগত নহে। মহাযানীরা হীনযানী অপেক্ষা উদার ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। তাহারা যে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহা নহে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মকে এখন একটা একত্ব জ্ঞানের উপর স্থাপিত করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের নিকট যাবতীয় ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া অবধারিত। তাহাদের মতে বোধিসত্ত্বই নানা মূর্ত্তিতে, নানারূপে, নানা অবতারে যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর উপাস্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।† আবার হীনযানীরা মতস্থাপনে ঈশ্বর না মানিলেও ঐশ্বরিক ভাব

object of the universe like the moon in clear tranquil water, other schools dispute the statement. The same for Paramartha"—The Secret Doctrine, Vol. I, Page 79.

* "In the Jogacharya system of the contemplative mahayana school, alaya is both the universal soul, *anima mundi*, and the self of a progressed adept. He who is strong in Yoga can introduce at will his alaya by means of meditation into the true nature of existence, says Aryasanga, the rival of Nagarjuna."—Ibid. page 80.

† এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল,তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, পৃথিবী শুদ্ধই বৌদ্ধ। কারণ যিনি বোধিসত্ত্ব হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।......মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগতই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎ শুদ্ধইত বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন,—'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপাত, পৌত্তলিক, রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব।' কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কি, সে কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না, এইমাত্র বলেন,—'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব।' এ সম্বন্ধে কারন্তব্যূহে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুমি কি করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতেত নানা মুনির নানা মত, লোক তোমার কথা শুনিবে কেন?' তখন করুণামূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন,—'আমি বিষ্ণু-বিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিব-বিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়ক-বিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, ইত্যাদি।'.....এমতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন,—'তোমরা যে ধর্ম্মে থাক, যে দেবতার উপাসনা কর, ধর্ম্মে এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই তোমরা থিওজফিষ্ট. এবং যে কেহ থিওজফিষ্ট হইতে পারে;' এও কতকটা সেইরূপ।"—'নারায়ণ'পত্রিকা, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

এ মত কেবল মহাযানী বৌদ্ধের বা থিয়জফিষ্টের নহে। যাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান

সমুদয় ভগবান বুদ্ধদেবে আরোপিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। ইহা ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান হইতে দূরাবস্থিত হইলেও, সাধারণ মানব জাতির ঈশ্বরোপাসনা হইতে বড় বেশী দূরে নহে।

আমরা দেখিয়াছি, ব্লাভাস্কি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারেন, তিনি হীনযানী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি, তিনি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার "পঞ্চশীল" গ্রহণে জনৈক সিংহলী বৌদ্ধ পুরোহিত অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাদাতা, আজন্মপূজিত আধ্যাত্মিক গুরু তিব্বতবাসী জনৈক সাম্প্রদায়িক বন্ধনশূন্য মহাপুরুষ। তাঁহার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এই মহাপুরুষের উপদেশ-লব্ধ। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার জীবনের গতি এই মহাপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম যে অধুনাতন অধঃপতিত সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধসমাজের সীমা-বহির্ভূত, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভগবান গৌতম বুদ্ধের উচ্চ ধর্ম্ম উপনিষদ-প্রোক্ত ব্রহ্ম জ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ উভয়েই—'নেতি-নেতি' করিয়া এক মহাশূন্যে উপস্থিত। বৈদান্তিক এই মহাশূন্যকেই সৎস্বরূপের আবিষ্কার করিয়া আনন্দে মগ্ন, বৌদ্ধও এই মহাশূন্যকেই অমৃতধাম বলিয়া, চরম লক্ষ্য বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তদভিমুখে সকলকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। উভয়ে বস্তুগত পার্থক্য অতি অল্পই। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৈদান্তিকের সাধন যে সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শনরূপ অদ্বৈত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধের সর্ব্ব জীবকে আত্মতুল্যবোধে মহা-করুণা সাধনও সেই অদ্বৈত জ্ঞানেরই প্রকারান্তর। ইহার শেষ পরিণতি কি কেবলই শূন্যতা, বিনাশ, অভাব? ইহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। বাস্তবিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শূন্যবাদ, যাহা সাধারণতঃ নিরীশ্বরবাদ বলিয়া পরিচিত, তাহা উপনিষৎ হইতে "নির্গুণ ব্রহ্মবাদ" নামে যে প্রস্থান নির্গত হইয়াছে, তাহার একান্ত সমীপবর্ত্তী। ইহাকে নাস্তিকবাদ বলিয়া ধার্য্য করিলে হিন্দুর চির-পূজ্য অনেক আচার্য্যকে নাস্তিক বলিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে, সম্প্রদায় বিশেষে তাঁহারা ঐ আখ্যাই পাইয়াছেন। বিরুদ্ধ সাম্প্রদায়িক-দিগের পরস্পর পরস্পরকে নাস্তিক বলিয়া প্রচার করা নূতন নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনৈক্যের কথা ছাড়িয়া দিউন, অবান্তর বিষয়ে মতভেদস্থলেও একে অন্যকে নাস্তিক বলিতে পশ্চাৎপদ নহে। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায় মধ্যাহ্নের পর আহার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া থাকে, অন্য সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করে না।

অদ্বৈত তত্ত্বের উপর, বা সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন। শাস্ত্রীমহাশয় নিম্নলিখিত ভগবৎ প্রার্থনাবাক্য উক্ত মতের সহিত তুলনা করিবেন।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ বর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্য-নাথো হরিঃ॥

ইহা কি হিন্দুমতের বিরোধী?

এক সম্প্রদায়ে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সহিত দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃত বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য নহে। অন্য সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করে। ঈদৃশ বহিরঙ্গ কর্ম্ম-কাণ্ড লইয়া বিবাদবশতঃ একে অন্যকে নাস্তিক বলিয়া থাকে। সুতরাং বিরুদ্ধ-পন্থী-প্রদত্ত নাস্তিক আখ্যা সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। বলা বাহুল্য, ব্লাভাস্কি এই সকল বিবদমান সম্প্রদায়ের কোন পক্ষভুক্ত ছিলেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম "দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড বা আচার ব্যবহারের উপর নহে।"

আত্মার অস্তিত্ব, অবিনশ্বরত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্ম-ফল, পরলোক, প্রভৃতি বিষয়ে ব্লাভাস্কির দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলির প্রতি পংক্তিতে জাজ্জ্বল্যমান। প্রকৃত পক্ষে যাহারা এই সকল বিশ্বাস করে না, তাহারাই আর্য্য-শাস্ত্রে নাস্তিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কেননা তাহাদের মতে ভোগায়তন দেহই সর্ব্বস্ব, এবং এই জীবনই মানবের আদি, মধ্য ও অন্ত্য। কিন্তু পরকাল ইত্যাদি স্বীকার করিয়াও যাহারা কোন জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান নহে, তাহাদিগকে নাস্তিক না বলিয়া নিরীশ্বরবাদী বলা হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যদর্শন কোন জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু তজ্জন্য উহাকে নাস্তিক দর্শন বলা হয় না। সাংখ্য চিদাত্মবাদী, কিন্তু জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করে না বলিয়া নিরীশ্বরআস্তিক দর্শন মধ্যে গণ্য। নাস্তিক বলে আত্মা জড় পদার্থ, অথবা কতকগুলি ভৌতিক শক্তির সমবায়ে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়াজাত। পূর্ব্বোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানাত্মবাদীদিগের মতে আত্মচৈতন্য জল-প্রবাহের সহিত তুলনীয়। জল-প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে নিয়ত স্থায়ী, অথচ নিয়ত-পরিণামী, প্রতি মুহূর্ত্তেই উহার আবয়বিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞানরূপী আত্মচৈতন্যও তদ্রূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অথচ প্রবাহরূপে নিয়তস্থায়ী। সাংখ্য এই সকল মত খণ্ডন করিয়া আত্মার অপরিণামিত্ব, অবিকারিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংখ্যের আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, চিৎস্বরূপ, স্বতন্ত্র, অনুৎপন্ন, অব্যয়, নির্ব্বিকার, অনন্ত। কিন্তু অনন্ত হইলেও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' নহে,—এক অদ্বিতীয় নহে। সাংখ্য মতে আত্মা অসংখ্য,—প্রত্যেক শরীরে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত এক একটী আত্মা বিদ্যমান। এক গৃহে পরস্পর সংলগ্ন প্রদীপ স্থাপিত ও জ্বালিত হইলেও জ্যোতিরূপে প্রত্যেক প্রদীপ গৃহ-ব্যাপক। এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাংখ্য বলেন, আত্মা অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে। আত্মা সম্বন্ধে এই অংশে বেদান্তাদি আস্তিক দর্শনের সহিত সাংখ্যের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই আত্মা প্রকৃতি সংযোগবশতঃ বিকার বা সুখ দুঃখযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। আবার প্রকৃতি এই আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ জড় হইয়া চেতনবৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ইত্যাদি কার্য্য করিতেছে,—যেমন অয়সকান্ত নিষ্ক্রিয় হইলেও উহার সান্নিধ্য-বশতঃ লৌহ ক্রিয়াশীল হয়। পুরুষ প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে বিযুক্ত হইতে পারিলেই সাংখ্য মতে মুক্তিলাভ হয়। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য কর্ম্মানুসারেই সাধিত হয়,—জীব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে। কর্ম্মের নিজের ফলদাতৃত্ব শক্তি আছে,—তৎপক্ষে কোন জগন্নিয়ন্তা,বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই,এবং অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ নহে।

সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, ঈশ্বরের অপলাপ সাংখ্যের উদ্দেশ্য নহে,—অর্থাৎ ঈশ্বর নাই, সাংখ্য এরূপ বলেন না, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না এবং জীবের মুক্তি কর্ম্মসাধ্য বিধায় ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বের কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই সাংখ্যের বক্তব্য। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইতে চাহেন যে, ব্রহ্ম মীমাংসায় যেমন ঈশ্বর প্রতিপাদনই মুখ্যবিষয়, সাংখ্যের সেইরূপ উহা মুখ্য বিষয় নহে। সাংখ্যের মুখ্য বিষয় প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-পথে মুক্তি উপদেশ। অতএব ঈশ্বর প্রতিষেধ থাকিলেও সাংখ্য অপ্রামাণ্য নহে। যাহাতে জীবের ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহাই সাংখ্যের উদ্দেশ্য, কিন্তু একজন পূর্ণ নিত্য ঈশ্বরের স্থাপনা করিলে পাছে জীবের চিত্ত একটা পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাবে আসক্ত হইয়া বিবেক অভ্যাসে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এইজন্য সাংখ্যাচার্য্য-গণ 'লোকায়তিক'দিগের ন্যায় ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। নতুবা ঈশ্বর প্রতিষেধে কপিলরূপী ভগবানের অন্য কোন উদ্দেশ নাই। * যাহা হউক, সাংখ্য নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও 'জন্য' ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মুক্তাত্মা বা সাধনসিদ্ধ হইয়া ঈশ্বর পদবিতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারা জন্য ঈশ্বর, কারণ তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব সাধনবলজাত। এই সকল মুক্তাত্মাই ঈশ্বর, বলিয়া প্রশংসিত, এবং ঈদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ। †

মাদাম ব্লাভাস্কি আত্মা সম্বন্ধে, সাংখ্যের সহিত বেদান্তের যেখানে প্রভেদ, সে স্থলে বেদান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে আত্মা এক চিৎস্বরূপ অনাদি অনন্ত অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্ত্বা। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি সাংখ্য মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ঈশ্বর সেই যোগ ও ধ্যানসিদ্ধ পুরুষগণ, যাঁহারা যুগে যুগে, মন্বন্তরে, মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে নানা অধিকার গ্রহণ করিয়া জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যেমন আমাদের পুরাণোক্ত ইন্দ্র, মনু, ব্রহ্মা ইত্যাদি। পুরাণ পাঠে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, ইন্দ্র, মনু, ব্রহ্মা ইত্যাদি কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতা বা ঈশ্বরের নাম নহে,—কিন্তু ঐ সকল এক একটী পদের নাম মাত্র। মন্বন্তরে মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে মনু ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হয়, একের স্থান অপর সাধন-সিদ্ধ পুরুষ অধিকার করিয়া থাকেন। ব্লাভাস্কিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যাহাকে personal God ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর বলে, তাঁহাকে তিনি পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার সেই সৎস্বরূপ পরতত্ত্ব জীবের সুখ দুঃখের সহিত, বিকারশীল জগৎপ্রপঞ্চের সহিত অসংস্পৃষ্ট, স্তব স্তুতি পূজাপাঠে অবিচলিত। তাই বলিয়া পূজাপাঠ যে নিষ্ফল, ইহা তিনি বলেন না। মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও যদি নিষ্কাম হয়, তবে চিত্ত-শুদ্ধি পক্ষে উহার উপকারিতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীবের মুক্তি তাহার নিজের কর্ম্ম ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে,—এই সমগ্র জগৎ অলঙ্ঘনীয় কর্ম্মের অধীন। বলা বাহুল্য, জৈমিনী প্রভৃতি কর্ম্ম-মীমাংসকদিগেরও এই মত। ইহা ছাড়া আর একটী কথা আছে। উহা এই যে, সাংখ্যাচার্য্যগণের নিত্য ঈশ্বর প্রতিষেধের মূলে যেমন একটা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, ব্লাভাস্কিরও সেইরূপ একটা উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মযাজকগণ ঈশ্বরকে যেরূপ মনুষ্যোচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ব্লাভাস্কি উহা নিতান্তই প্রতিবাদযোগ্য মনে করিতেন,—ইহা তাঁহার লিখিত পুস্তকাদির স্থানে স্থানে তীব্র মন্তব্য হইতেই প্রতীয়মান হয়। এই মনুষ্যভাবাপন্ন ঈশ্বর (anthropomorphic God) যে পরতত্ত্ব নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্যগণের সম্মুখে নির্গুণ সৎস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বটী পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ যে বেদান্তবেদ্য সর্ব্বতোমুখী সত্যের একটা দিক, এবং এই বিষয়ে যে তিনি অনেক মহান্ আচার্য্য ও প্রস্থানকর্ত্তার সমধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্লাভাস্কির বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রত্যেক প্রস্থানকেই সেই মহা সত্যে পহুঁছিবার এক একটী পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, —তিনি সকল ধর্ম্মই সেই মহাসত্যের উপর স্থাপিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রার্থ লইয়া কর্ণবিদারী খণ্ডন-মণ্ডনের কোলাহল মধ্যে কোন কোন পূর্ব্বতন আচার্য্যও সমন্বয়ের শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা যেন "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম"—তপ্ত বালুমাঝে বারিবিন্দুর ন্যায়। এযুগে এই সমন্বয়বাদের একজন প্রধান কাণ্ডারী মাদাম ব্লাভাস্কি যেরূপ নির্ভীকতার সহিত, যেরূপ তেজস্বিতার সহিত, যেরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত, অথচ যেরূপ যুক্তিযুক্ততা ও জ্ঞান গভীরতার সহিত এই সমন্বয়বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা দুর্ল্লভ। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত এক মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই এক মহাসত্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। মানবজাতিকে ইহা তাঁহার এক মহাদান।

যাহা হউক, ব্লাভাস্কির ধর্ম্ম ও মত বুঝিবার জন্য আমাদিগকে অধিক অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তৎকৃত "সিক্রেট ডক্‌ট্রিন"(The Secret Doctrine) গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস বহুল পরিমাণে জানিতে পারি, এবং এতৎ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। উক্তগ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কয়েকটী মূলতত্ত্ব তিনি উপস্থাপন, করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—

(১) এক সর্ব্বব্যাপী অসীম অনন্ত তত্ত্ব, যাহাকে পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, সেই পরমতত্ত্ব বাক্য মনের অগোচর, ইহাই উপ-নিষদে 'চিন্তাতীত-বাক্যাতীত' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অব্যক্ত অনাদি কারণ হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি, কিন্তু উহা তত্ত্বতঃ জগতের সহিত অসম্পৃক্ত, কারণ উহা গুণলেশশূন্য। ইহাকে সৎস্বরূপ বলা যায়।

এই সৎস্বরূপের দ্বিবিধ প্রকাশ,—সূক্ষ্ম চিদাকাশ (abstract space, representing bare subjectivity), এবং অব্যক্ত মহা-প্রাণ (abstract motion representing unconditioned consciousness,—the Great Breath)

সেই সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সমস্ত চিৎজগৎ সেই জ্ঞানস্বরূপের নির্দ্দেশক, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সেই নিত্য

* "অসিদ্ধেব শাস্ত্রে ব্যবহারিকস্যৈবেশ্বর প্রতিষেধস্যৈশ্বর্য্য বৈরাগ্যাদ্যর্থমনুবাদস্যৌচিত্যং-যদি হি লোকায়তিক মতানুসারেন নিত্যৈশ্বর্য্যাং ন প্রতিষিধ্যেত তদা পরিপূর্ণ নির্দ্দোষৈশ্বর্য্য দর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাস প্রতি-বন্ধঃ স্যাৎ ইতি সাংখ্যাচার্য্যানামাশয়ঃ সাংখ্য-শাস্ত্রস্তু পুরুষার্থ তৎসাধন প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকাবেব মুখ্যো মুখ্যো বিষয় ইতীশ্বর প্রতিষেধাংশ বাধেঽপি নাপ্রামাণ্যং।"

বিজ্ঞানভিক্ষু।

† "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।" সাংখ্যসূত্র। "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" ঐ

শুদ্ধ জ্ঞানসত্ত্বার কোন বিকার উৎপাদন করিতে পারে না। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বাক্য মনের অতীত, কিন্তু আবার ব্যক্তজগতে তিনি পুরুষ (spirit) ও প্রকৃতি (matter) রূপে প্রকাশিত। পুরুষ (consciousness) জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, অনুমন্তা। প্রকৃতি (subject and object) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়—জগৎ প্রপঞ্চ। অতএব এই পুরুষ প্রকৃতি হইতেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন। এই পুরুষ প্রকৃতি, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, অদ্বয় চরম তত্ত্ব সচ্চিৎস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু তাহারই প্রকাশ। পুরুষ যেমন প্রত্যেক জীবে জ্ঞানের মূল কারণ (Pre-cosmic ideation), প্রকৃতি তেমনি উহার নিরন্তর পরিণামের মূল কারণ রূপে বর্ত্তমান (Pre-cosmic substance)। অতএব সমস্ত ব্যক্ত জগতের প্রতীতি-মূলে এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, পুরুষ-প্রকৃতির বর্ত্তমানতা আবশ্যক। পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পর নিত্যজড়িত, অভিন্ন, অন্যোন্যাশ্রয়ীরূপে বর্ত্তমান। জ্ঞেয় প্রকৃতির অভাবে জ্ঞাতা পুরুষের অস্তিত্ব অনাবশ্যক, জ্ঞাতা পুরুষের অভাবে প্রকৃতি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত, কারণ উহার কোন প্রতীতি অসম্ভব। প্রকৃতি পুরুষাত্মক এই জগতে, উহাদের মিলনজাত ঐশ্বরিক তত্ত্ব হইতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি প্রকাশিত হইতেছে। এই তত্ত্বেরই প্রকাশ মূর্ত্তি দেবগণ—নানা অধিকারে অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতির নির্দ্দেশানুযায়ী জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ-কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। এই অধিকারী দেবগণই বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যান-চোহান, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে আর্ক-এঞ্জেল (Arch-angel, Seraphs etc.) প্রভৃতি নামে অভিহিত।

(২) সৃষ্টি ও প্রলয়, আবার সৃষ্টি আবার প্রলয়,—এই প্রবাহ রূপে জগতের নিত্যত্ব তত্ত্ববিদ্যায় স্বীকৃত হইয়াছে। এই সৃষ্টি অর্থে বিকাশ (Evolution) এবং প্রলয় অর্থে সঙ্কোচ (Involution) বুঝিতে হইবে। দিবা-রাত্র, জন্ম-মৃত্যু, জাগরণ সুষুপ্তির সহিত এই জগৎ-প্রবাহ তুলনীয়। বলা বাহুল্য, ইহা পারমার্থিক রূপে নিত্য নহে। এই সৃষ্টি ও লয়ের নির্দ্দিষ্ট গতি, বিধি ও কাল আছে। হিন্দুদের পুরাণে যে যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর, কল্প, খণ্ড ও মহা-প্রলয়ের কথা লিখিত আছে, উহা সৃষ্টির গতি ও স্থায়িত্বাদির অনুমাপক। *

(৩) জগদাত্মার সমস্ত জীবের একাত্মতা, এবং কর্ম্মানুসারে যোনি-ভ্রমণ

---

* যে সকল শিক্ষিত হিন্দু সন্তান পৌরাণিক কথাকে সমস্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্লাভাস্কি বলিতেছেন ঃ—

"Truly the young Brahmin who graduates in the Universities and colleges of India with the highest honours, who starts in life as an M. A, and an L. L. B., with a tail initialed from Alpha to Omega after his name, and contempt for his national Gods proportioned to the honours received in his education in Physical Science; truly he has but to read in the light of the latter, and with an open eye to the correlation of physical force, certain passages in his Purans, if he would learn how much more ancestors knew than he will ever know, unless he becomes an occultist."—Secret Doctrine, Vol I, Page 569.

তত্ত্ববিদ্যায় স্বীকৃত। কর্ম্মবিধি অনুযায়ী জীব অতি নিকৃষ্ট ধাতব, উদ্ভিজ্জাদি জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চাবচ সমস্ত স্তর অতিক্রম করতঃ উচ্চতম দেব পদে উন্নীত হইবে। এই উন্নয়নে ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম, পুরুষকার এবং কর্ম্ম কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের কোন দ্বেষ্যাদ্বেষ্য প্রিয়াপ্রিয় নাই। প্রত্যেককেই স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেককেই মুক্তির জন্য নিজ কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মত নির্ব্বিশেষাদ্বৈত বেদান্তের প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিতেছেন,—যাহাকে উপনিষদে 'নিগুর্ণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং', 'অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ব-বস্থিতম্' বলা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মের সমধিক প্রকাশস্বরূপ দেবগণের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহাঁদের পারমার্থিক নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অর্থাৎ,—তাঁহার মতে "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলের অস্তিত্বই মায়িক, এক নিত্য সত্য পরব্রহ্ম। এই নিগুর্ণ নিরবয়ব ব্রহ্মে মানবীয় গুণারোগ করিয়া যে সকল মূর্ত্তির সৃজন হইয়াছে, তাহাদের সত্যত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ইহাতে নাস্তিক হইতে হয়, তাহা হইলে তত্ত্ববিদ্ মাত্রেই নাস্তিক। * কিন্তু উপাসনাঙ্গে প্রতীক বা প্রতিমার কোন কার্য্যকারিতা নাই—ইহা বোধ হয় তিনি কোথাও বলেন নাই। তবে যে প্রার্থনায় জীবকে সকামভাবাপন্ন করে, সেই 'দেহি দেহি' রূপ প্রার্থনা, যাহাতে তাহাকে পুরুষকার বিমুখ করে এবং তাহার আত্মনির্ভরশীলতায় বাধা দেয়, তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় সেরূপ প্রার্থনা-মার্গের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম সত্ত্বার সহিত আত্মযোগের জন্য যে নিরন্তর ইচ্ছা শক্তি

অর্থাৎ,—যে উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া, এবং তাঁহার নামের পশ্চাতে সমগ্র বর্ণমালার পুচ্ছ সংলগ্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক বিদ্যার অহঙ্কারে তাঁহার জাতীয় দেবদেবীর প্রতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাকে আমি বিজ্ঞানের আলোকেই পুরাণ পাঠ করিতে বলি। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার বিদ্যার তুলনায় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের জ্ঞান কত অধিক ছিল,—এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, তত্ত্ব জ্ঞানের অনুশীলন না করিলে কদাপি তিনি পূর্ব্ব পুরুষদের জ্ঞান-মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইবেন না।

* "The secret Doctrine teaches no atheism except in the sense underlying the *Sanskrit* word *Nastika*,—a rejection of idols, including every anthropomorphic God. In this sense every occultist is a *Nastika*." The secret Doctrine, Vol, Page 300.

"The followers of one of the greatest minds that ever appeared on earth, the *advaita vedantists* are called atheists, because they regard all save *Parabrahman*, the secondless, or the absolute Reality, as illusion. Yet the wisest initiates came from their ranks, as also the greatest yogis."—Ibid, Page *569*.

প্রয়োগ, তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। * তিনি বলিতে চাহেন,—

বালক্রীড়নবৎ। সর্ব্বং নাম রূপাদি কল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠঃ যঃ সমুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

নামরূপের অতীত না হইলে মুক্তি নাই,-অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানই মুক্তির অসাধারণ ও অব্যবহিত কারণ। পরন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা ঈশ্বরকে মানবীয় গুণ-বিশিষ্ট করিয়া, মানব ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া, জীবজগৎ হইতে পৃথকরূপে স্বর্গ নামক রাজ-ধানীতে বাস করতঃ কেবল দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া কল্পনা করে, এবং তদতিরিক্ত আর কিছু স্বীকার করে না, ব্লাভাস্কি তাহাদের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহারাই প্রকৃত জড়-বাদী, কারণ উহাদের ঈশ্বর জড়ীয় গুণ-সমষ্টিতে আবদ্ধ, চিন্ময়স্বরূপ নহে।

মুক্তি সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মতে নির্ব্বাণই শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বাণ কথাটীর অর্থ লইয়া বহু তর্ক **বিচার** ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদের মতে **নির্ব্বাণ** অর্থে একেবারে বিনাশ বা শূন্যতা-প্রাপ্তি—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অনেক বৌদ্ধ জ্ঞান-গ্রন্থে ইহাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় না। আবার বৈদান্তিক-দিগের মতে নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মে লয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, বৈদান্তিকের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয় আর বিনাশ একই কথা। অর্থাৎ, তুইয়েই আমার অস্তিত্ব,আমার ব্যক্তিত্ব, আমার স্বাতন্ত্র্যের লোপ;—অতএব আমার পক্ষে তুই তুল্য। বৈদান্তিক বলেন. আমার যাহা প্রকৃত স্বরূপ,তাহাতে অবস্থিতিই মুক্তি, তুমি যাহা তোমার অস্তিত্ব. ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য বলিতেছে,উহা কেবল মায়া-বিজৃম্ভিত কল্পনা মাত্র। আমার স্বরূপে অবস্থিতিই আমার প্রকৃত অস্তিত্ব, প্রকৃত সত্ত্বা, আর তাহাই আমার লভ্য। যাঁহারা নির্ব্বাণ অর্থে সম্পূর্ণ বিনাশ বলিয়াছেন, ব্লাভাস্কি তাঁহাদের সহিত এক-মত নহেন। তিনি বলেন, ঐরূপ উক্তি ভ্রান্তিমুলক, নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ না বুঝিবার ফল। † এ সম্বন্ধে তাঁহার মত বৈদান্তিক মতের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মে অবস্থিত লইলে যে অবস্থা, তাহাই তাঁহার মতে নির্ব্বাণ। ইহা গীতোক্ত ব্রহ্ম নির্ব্বাণের সহিত তুলনীয়া—যথা

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি
নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কার স শান্তি মধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য
বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্ত কালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥
(দ্বিতীয় অধ্যায়, ৭১, ৭২)।
যোহন্তঃ সুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেবযঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি॥
(৫ম অধ্যায়, ২৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, অহংজ্ঞান-শূন্য, মমতাশূন্য, স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ

* Vide "The key to Theosophy"—By H. P. Blavatsky.

† "The mystery that shrouded its chief dogma and aspiration,—Nirvana—has so tried and irritated the curiosity of those schools who have studied it that, unable to solve it logically and satisfactorily by untying its gordian knot, they have cut it through by declaring that Nirvana means total annihilation."—The Secret Doctrine.

করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থাকে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলে। তিনি এই অবস্থায় থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। যিনি আত্মারাম, আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ নামক মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি।*

বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই অহংজ্ঞানের বিনাশ না—হইলে নির্ব্বাণলাভ অসম্ভব মনে করেন। এই পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে যে শূন্যতা-পত্তি দেখা যায়, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যাঁহারা জীবাত্মার শূন্যতা প্রাপ্তিকেই বৌদ্ধদের বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, ব্লাভাস্কির মতে তাঁহারা, বৌদ্ধ হউন বা হিন্দু হউন, ভ্রান্ত। বৌদ্ধদের মধ্যে এই ভ্রান্তির কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভগবান বুদ্ধ বহিরঙ্গ লোকের নিকট এসকল তত্ত্ব একেবারে অপ্রকাশিত রাখিয়া গিয়াছেন, কেবল অন্তরঙ্গ তাত্ত্বিকগণের নিকট রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বৌদ্ধ-রহস্য-তাত্ত্বিক-গণের সহিত বৈদান্তিকগণের কোন মত-বিরোধ নাই। † এই রহস্য তাত্ত্বিকেরাই 'অর্হৎ' নামে প্রসিদ্ধ এবং মহাযান পন্থার

* "Thus the reader is asked to bear in mind the very important difference between orthodox Budhism, i. e., the public teachings of Gautama, the Budha, and his esoteric Budhism. His secret doctrine, however, differed in no wise from that of the initiated Brahmins of his days. The Budha was a child of aryan soil, a born Hindu, a *Kshatriya* and a desciple of the twice-born (the initiated Brahmins) or *Dwijas*.........unable owing to his pledges to teach all that had been imparted to him; though the Budha taught a philosophy built upon the grand work of the true esoteric knowledge, he gave to the world only its outword material body and kept its soul for his Elect. The Secret Doctrine.—Vol. 1, P 5.

অর্থাৎ,—বুদ্ধ হিন্দুকুলজাত আর্য্যসন্তান, ক্ষত্রিয় এবং তত্ত্বজ্ঞানী দ্বিজ ব্রাহ্মণগণের শিষ্য। সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের সহিত কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু তাঁহার সকল কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার নিষেধ ছিল। ধর্ম্মের বহিরংশমাত্র তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, অন্তর্ভাগ কেবল তাঁহার মনোনীত শিষ্যদের নিকটই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের শিক্ষার গুপ্তরহস্য বলিয়া কিছু ছিলনা, তিনি সাধারণের নিকট সবই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এইরূপ বলেন, ব্লাভাস্কি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"They may as well deny that Nature has any secrets for the men of science. His esotoric teachings were simply the *Gupta Vidya* (secret knowledge) of the ancient Brahmins,the key to which their modern successors have, with few exceptions, completely lost. And this *vidya* has passed into what is now known as the *inner* teachings of the *Mahayana* school of Northern Budhism. Those who deny this are simply ignorant pretenders to Orientalism. I advise you to read the Rev. ur. Edkin's *Chinese Buddhism*—especially the chapters on the Exoteric and Esoteric schools etc etc."

"The key to Theosophy"

† এই ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ মুক্তির সহিত ব্লাভাস্কির নিম্নলিখিত বাক্যগুলি তুলনীয়—

প্রতিষ্ঠাতা। হীনযানীরা বুদ্ধের উপদেশের বাহ্যাংশমাত্র গ্রহণ করিল, সেইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম হইতেই অনভিজ্ঞ লোকের এই ধারণা জন্মিল যে, বুদ্ধদেব ব্রহ্মতত্ত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গভেদে শিক্ষাদান কেবল যে উপনিষদিক ঋষি বা পৌরাণিক অবতারগণের চরিত্রেই দৃষ্ট হয়, তাহা নহে, পরবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-জীবনের একটী কথা এই ঃ—

বহিরঙ্গ নিয়া কর নামসঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ নিয়া কর রস-আস্বাদন॥

যিশু অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিতেছেন—

"To you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven; but into them that are without, all these things are done in parables" (Mark IV. II — অর্থাৎ, তোমাদের নিকট স্বর্গরাজ্যের 'রহস্য' ব্যক্ত হইল, আর যাহারা বহিরঙ্গি লোক, তাহাদিগকে নানাবিধ গল্পসূত্রে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যিশু-কথিত উপাখ্যান গুলিও যে দ্ব্যর্থবোধক, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়।

বুদ্ধদেবও যে অধিকারী ভেদে উপদেশ দান করিতেন, ইহা নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ পায়। তিনি বলিতেছেন ঃ—

"হে কাশ্যপ! তথাগত সেই বিষয় জানেন, যাহার সার বস্তু মুক্তি এবং যাহার লক্ষ্য নির্ব্বাণ রূপ শান্তি। তথাপি তিনি প্রত্যেক জীবের নিকট তুল্যরূপে আত্ম প্রকাশ করেন না। কারণ প্রত্যেক জীবের অভাব কি, তাহা তিনি জানেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ অভাবানুযায়ী তিনি শিক্ষা দান করেন।"

যাহা হউক, নির্ব্বাণের অর্থ যে বিনাশ নহে, ভগবান বুদ্ধের নিজের উক্তি বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার সাধন-প্রতিজ্ঞায় বলিতেছেনঃ— "যে পর্য্যন্ত দুর্লভ অমৃত ধন না পাইব, যে পর্য্যন্ত দুঃখ বর্জ্জন করিয়া জন্মমৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত না হইব, তাবৎ পর্যান্ত সেই অভয়-পুর শমনের যে সুপথ, তাহারই অনুসরণ করিব।" (ললিতবিস্তর, বুদ্ধবাণী)

বুদ্ধদেব যে অমৃত ধনপ্রাপ্তির ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহার অর্থ কি বিনাশ? দ্বিতীয়তঃ তিনি শিষ্য ও জিজ্ঞাসুগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও নির্ব্বাণ অর্থে বুঝিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেছেন ঃ—"মানব! তুমি সমগ্র জগতের শুভ কামনা কর। ঊর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে, সকলের উপর তোমার নিরবচ্ছিন্ন শুভ ইচ্ছা বর্ষিত হউক। চলিতে, বসিতে, শুইতে, দণ্ডায়মান থাকিতে সর্ব্বদা তুমি এই অবস্থায় স্থির থাক;—ইহাই সর্ব্বোত্তম অবস্থা, ইহাই নির্ব্বাণ।" (রাজগৃহে প্রদত্ত উপদেশ)

পরিনির্ব্বাণ সময়ে আনন্দকে সম্বোধন করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব বলিতেছেন ঃ— "আনন্দ! তোমাদের কেহ কেহ এরূপ মনে

"I repeat that we believe in "communion" and simultaneous action in unison with our Father in secret; and in rare moments of ecstatic bliss, in the minglings of our soul with the universal essence, attracted as it is towards its origin and centre, a state, called during life *Samadhi* and after death, *Nirvana*." 'The key to Theosophy."

করিতে পার যে, আমার কথা শেষ হইল, অতএব তোমাদের আর কোন উপদেশক নাই। কিন্তু আনন্দ! এরূপ মনে করা ভুল। ইহা সত্য যে আর আমি কোন শরীর ধারণ করিব না, কারণ আমি এখন সমস্ত দুঃখের অতীত। কিন্তু এই শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া গেলেও, তথাগত থাকিবেন।" ইহা হইতে বোধ হয় তথাগত থাকিবেন কি না, এ প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি কেবল বহিরঙ্গলোকের নিকটই নিরুত্তর থাকিতেন, এবং যে সকল বৌদ্ধ দর্শন আত্মার অনশ্বরত্বে বিশ্বাসহীন, তাহা বুদ্ধের অন্তরঙ্গ শিক্ষার বহির্ভূত। বুদ্ধ বলিতেছেন, "সূর্য্য অস্তগত হইলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। আমরা যেখানে বিনাশ দেখি, সেখানে অসীম আলোক ও অনন্তজীবন বর্ত্তমান।"

অন্যত্র.—"আমি তোমাদিগকে মৃত্যু উপদেশ করিতে আসি নাই, কিন্তু কিসে জীবন লাভ হয়, তাহাই শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।" তিনি শত শত স্থানে মুমুক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলিতেছেন.— "তোমরা যদি অমরত্ব লাভ করিতে চাও, তবে সত্যধর্ম্ম পালন কর।" অমরত্ব ও বিনাশ, এই দুইটী কথা যদি একার্থবোধক না হয়, তবে বুদ্ধের নির্ব্বাণকে কেহই বিনাশ বলিতে সাহসী হইবেন না। নির্ব্বাণের অর্থ যদি বিনাশ হয়, তবে উহা জীবের অহং জ্ঞানরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ববানের বিনাশকেই বুঝিতে হইবে,—যাহা না হইলে বেদান্ত মতে পরামুক্তি অসম্ভব। যেখানে দীপ নির্ব্বাণের সহিত নির্ব্বাণের উপমা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নির্ব্বাপিত অগ্নিশিখা কোথায় গেল, ইহা যেমন বুঝা যায় না, যিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ বাক্যাতীত, কিন্তু তজ্জন্য উহা ধ্বংস নহে। বুদ্ধের সদ্ধর্ম্ম, সর্ব্বজীবে করুণা, মৈত্রী, প্রেম, সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ফল বলিয়াই গণ্য। বস্তুতঃ ইহাই আত্মদর্শনের অত্যুত্তম ঐহিক ফল বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ভগবান বুদ্ধ একস্থানে বলিয়াছেন,—"কেবল অজ্ঞান ও ভ্রমবশতঃই লোকেরা মনে করে, তাহাদের আত্মা পরস্পর পৃথক ও স্বতন্ত্র।" তাঁহার ঈদৃশ আত্মদর্শন কেবল একটী দার্শনিক তত্ত্ব (Theory) নহে, কিন্তু উহা জ্বলন্ত জীবন্ত কর্ম্মাত্মক সত্য (Practical truth) উহা জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এক অপূর্ব্ব বন্ধন, মস্তিষ্কের সহিত অনন্তপ্রসারী হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব মিলন, যাহার তুলনা জগতে দুর্লভ।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কি যেমন ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বুঝিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যান্য প্রধান মতগুলিও তেমনি তিনি বেদানুকূল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি, নীতি ও সাধন মার্গ কোন অংশেই হিন্দুর শ্রুতিমূলক আস্তিক দর্শনের বহির্ভূত নহে। বৌদ্ধমতে সমস্ত দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যু ইত্যাদির মূলীভূত কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে সংজ্ঞা, সংজ্ঞা হইতে নামরূপ, নাম-রূপ হইতে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় (ষড়ায়তন), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতেই শোক দুঃখ ইত্যাদি। বেদান্তেও অবিদ্যা সকল দুঃখের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনমতেও দেখিতে পাই,—

"অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।" ২।২

"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং.........২।৩

অর্থাৎ,—অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মকে আত্মবোধ করাকে অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যা হইতেই ক্রমে মিথ্যা, অহংজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের উৎপত্তি।

অবিদ্যার নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির আশা নাই। এক্ষণে অবিদ্যা পরিহারের উপায় কি? বৌদ্ধ বলেন, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত (সদাচরণ), সম্যক আজীব (সৎপথে জীবিকার্জ্জন), সম্যক্ক ব্যায়াম (সংযমদ্বারা আত্মোন্নতি), সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি (ধারণা, ধ্যান, নিদিধ্যাসন) এই অষ্ট মহামার্গ অবলম্বন করিলে অবিদ্যার নাশ দুঃখের নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণলাভ হয়। এই অষ্ট মহামার্গের সহিত পাতঞ্জল যোগদর্শনোক্ত সাধন পথের বিশেষ কোন বিভিন্নতা আছে কিনা, ইহা নিম্নোদ্ধৃত সূত্র কয়েকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে;—

"বিবেক খ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।"২।২৬

"তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমি।" ২।২৭

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি
রাবিবেকখ্যাতেঃ।"২।২৮

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার ধারণাধ্যান
সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"২।২৯

অর্থাৎ,—সত্যজ্ঞানজননী বিবেকোদ্ভূত প্রজ্ঞাই অবিদ্যা নাশের উপায়। সেই প্রজ্ঞার পর পর সাতরূপ অবস্থা হয়। যোগাঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা অবিশুদ্ধির ক্ষয় হয় এবং তৎফলে জ্ঞানদীপ্তিময়ী প্রভার আবির্ভাব হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—ইহাই অষ্টাঙ্গিক যোগ। বোধ হয়, এই অষ্টাঙ্গিক যোগের সহিত বৌদ্ধসম্মত অষ্টাঙ্গিক পথে বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই।

বুদ্ধ-উপদিষ্ট অহিংসা, বৈরাগ্য, মৈত্রী, করুণা, আত্মসংযম প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত সাধন পূর্ব্বোক্ত যম নিয়মাদির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বৌদ্ধের সাধনপথের বিঘ্নকারী কামক্রোধাদি ষড়রিপু ব্যতীত আরও দুইটী মহাশত্রু আছে। ইহাদের নাম রূপরাগ ও অরূপরাগ,—অর্থাৎ বিষয় কামনা ও স্বর্গকামনা। এই দুইটীর বিনাশের সহিত বেদান্তের 'ইহা মুত্রফলভোগ বিরাগ'এর কোন প্রভেদ নাই। আর বৌদ্ধের পঞ্চশীল যথা,—'বধ করিও না, চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না, মিথ্যা কহিও না, সুরাপান করিও না' ইহাত সার্ব্বভৌমিক নীতি এবং সকলের পালনীয়।

বস্তুতঃ এই নীতিমার্গই ভগবান বুদ্ধের সর্ব্ববাদিসম্মত শিক্ষা। বৌদ্ধধর্ম্মের বর্ত্তমান প্রচলিত "অভিধর্ম্ম"ভাগ বা দর্শন অংশ বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সেইজন্য ইহা নানাবাদ প্রতিবাদ ও তর্ক বিচারেব বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাঁহার উপদিষ্ট নীতিমার্গঘটিত শিক্ষা সম্পূর্ণ বেদানুকূল। তাঁহার সময়ে এই বিশুদ্ধ বৈদিক নীতিমার্গ অতিরিক্ত বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডের ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই ক্রিয়াকাণ্ডের নিরর্থকতা ও মুক্তিদানে অসমর্থতা দেখাইয়া নীতিমার্গের উৎকর্ষ প্রদর্শন জন্য তাঁহার অভ্যুদয়। বৈধহিংসার নামে তদানীন্তন অবাধ পশুঘাতদুষ্ট যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহার প্রতিবাদের অভিপ্রায়। ইহা ভিন্ন তিনি বৈদিকধর্ম্ম বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তৎকর্ত্তৃক এই চিরন্তন বৈদিক লুপ্তপ্রায় নীতিমার্গের পুনঃ স্থাপন এবং হিংসামূলক কর্ম্মের পরিবর্ত্তে প্রেম-মৈত্রীমূলক কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা

হইল বলিয়া আর্য্যহিন্দুজাতি তাঁহাকে করুণার মূর্ত্তিরূপে দশ অবতারের মধ্যে স্থাপিত করিয়া সাদরে পূজা করিতেছেন। কালক্রমে যখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষকর্ত্তৃক ঈশ্বর-নাস্তিবাদ অন্যায়রূপে তাঁহার উপর আরোপিত হইল, এবং অবনত বৌদ্ধগণ একদিকে ঈশ্বর-বিমুখ, অন্যদিকে ভগবৎপ্রদর্শিত বিশুদ্ধ নীতিমার্গভ্রষ্ট হইতে লাগিল, এবং নানা বীভৎস দুর্নীতি-পরম্পরায় সমগ্র সমাজকে দূষিত করিতে লাগিল, সেই অধঃপতনের সময় উহা আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি যে, ব্লাভাস্কির ধর্ম্মমত যখন বেদান্তানুগামী, তখন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য কি? আমরা উপরে বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলে এ প্রশ্নের মীমাংসায় অধিক আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। জানা উচিত, তিনি একটী য়ুরোপিয় খ্রীষ্টান-গৃহজাতা মহিলা। তাঁহার পক্ষে বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্ম হৃদয়ের অনুকূল হইলে ইহার যে কোন একটী গ্রহণীয় হইতে পারে। তথাপি তিনি বৌদ্ধ নাম গ্রহণ করিলেন কেন? প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, তিনি আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্মকে শাক্যমুনি-প্রচারিত ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বাংশে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, উপনিষদিক ধর্ম্ম হইতে শাক্যমুনির উন্নত ধর্ম্ম বিভিন্ন নহে। অতএব উপনিষদিক ধর্ম্মতত্ত্ব অটুট রাখিয়াও শাক্যমুনির অনুগামী হওয়া চলে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা ইহাও দেখিয়াছি, তিনি যে পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্ব্বজনীন নীতিবিশেষ, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আরও যে কয়েকটী নীতি আছে, তাহা সর্ব্বজন-প্রশংসিত। কিন্তু একটী কথা এই যে, এই নীতিগুলি সর্ব্বমান্য হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের ইহা অস্থি, মজ্জা, প্রাণ। অন্যান্য ধর্ম্মের বহিরংশে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডই মুখ্য ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এবং উচ্চ নীতি অংশ যেন গৌণভাবে থাকে। বুদ্ধদেব ক্রিয়া কাণ্ডকে একপাশে রাখিয়া নীতিমার্গের অনুসরণকেই, ব্রহ্মসদ্ভাবই বল, আর নির্ব্বাণ মুক্তিই বল,—জীবের বাঞ্ছিত লাভের সর্ব্ব প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহোচ্চ নীতি অংশই তাঁহার ধর্ম্মের বহিরংশেরও উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে এই অংশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা। ব্লাভাস্কি ইহা বুঝিয়া শাক্যমুনির অনুগমন পূর্ব্বক ঐ সকল নীতির সার্ব্বজনীন শ্রেষ্ঠতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। * উদ্দেশ্য বোধ হয় নিজে তাঁহার অনুগামী

* "Enquirer,—But are not the ethics of Theosophy identical with those taught by Buddha?

"Theosophist.—Certainly, because these ethics are the soul of the Wisdom Religion, and were once the common property of the initiates of all nations. But Buddha was the first to embody these lofty ethics in his public teachings, and to make them the foundation and the very essence of his public system. It is herein that lies the immense difference between exoteric Buddhism and every other religion. For while in other religions ritualism and dogma hold the first and most important place, in Buddhism it is the ethics which have always been the most insisted

হইয়া তাঁহার অত্যুচ্চ আদর্শকে জাগ্রত জীবন্তরূপে জগতের সম্মুখে স্থাপন করা। তাঁহার চরিত্রের আদর্শ, তাহার কর্ম্মের আদর্শ, তাঁহার সেবার আদর্শ, তাঁহার পতিতোদ্ধারের আদর্শ, জগৎ জীবের সম্মুখে স্থাপন করা ব্লাভাস্কির উদ্দেশ্য। তিনি একাধারে কর্ম্ম ও জ্ঞানের নীতি ও সহানুভূতির, ত্যাগ ও করুণার, আত্মোৎসর্গ ও আত্মনির্ভরের, স্বাধীনতা ও বশ্যতার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া যে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, সর্ব্ব-অবিরোধী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গেলেন, ব্লাভাস্কি বোধ হয় তাহারই আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া সেই পুরুষোত্তমের পদে নতশির হইয়াছিলেন। শ্রীবিবেকানন্দ কর্ম্মযোগের আদর্শ বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন :—

"আমরা অন্য অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া যে কোন সৎকার্য্য করি, তাহা আমাদের পদে একটী নূতন শৃঙ্খলস্বরূপ না হইয়া বরং যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাঁহারই একটী গাঁট ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। আমরা প্রতিদানের চিন্তাশূন্য হইয়া যে কোন সৎচিন্তা প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে,—আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটী গাঁট ভাঙ্গিয়া দিবে এবং আমাদিগকে ক্রমশঃই পবিত্রতর করিতে থাকিবে, যতদিন না আমরা পবিত্রতম মনুষ্য রূপে পরিণত হই। কিন্তু ইহা লোকের নিকট যেন কেমন অস্বাভাবিক ও অদার্শনিক রকমের বোধ হয়, উহা যেন কোন কার্য্যকর নহে। আমি গীতার বিরুদ্ধে অনেক তর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই তর্ক তুলিয়াছেন,—অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। ইহাঁরা গোড়ামি দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন রূপ কার্য্য দেখেন নাই, এই জন্য তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আমি কথায় আপনাদের নিকট এমন এক লোকের অল্প কথা বলিব, যিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবই এই কর্ম্মযোগী, একমাত্র তিনিই ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেরই কার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ ছিল,—বাহিরের অভিসন্ধি। তিনি ব্যতীত জগতের সমুদয় মহাপুরুষকে তুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল বলেন, আমরা ঈশ্বর, জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর দল বলেন, আমরা ঈশ্বর-প্রেরিত। উভয়েরই কার্য্যের প্রেরণাশক্তি বাহির হইতে আইসে। আর তাঁহারা যতদুর আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জ্জগৎ হইতেই তাঁহাদের পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে বুদ্ধই একমাত্র বলিয়াছেন,—'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতামত বিচার করিবার আবশ্যক কি? সৎ হও ও সৎকার্য্য কর। ইহাই তোমাকে, যাহাই সত্য হউক না,—তাহাতে লইয়া যাইবে।' তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ব প্রকার অভিসন্ধি-বর্জ্জিত ছিলেন। আর কোন্ মানুষ তাহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটী চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূর

upon. This accounts for the resemblance, amounting almost to identity between the ethics of Theosophy and those of the religion of Buddha."—The key to Theosophy.

গিয়াছেন। সমুদায় মনুষ্য জাতি কেবল এইরূপ একটী মাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে। এতদূর উন্নত দর্শন! এমন সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিযাছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্য্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবী দাওয়া নাই। তিনি আদর্শ কর্ম্মযোগী, তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্য জাতির ইতিহাস দেখাইতেছে, যত লোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না, তিনিই হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ভাবের উদাহরণ, আত্ম শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, জগতে যত সংস্কারক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথম সাহস পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—কোন প্রাচীন হস্তলিপি পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া, তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া, অথবা তোমার বাল্যাবস্থা হইতেই তুমি বিশেষ কোন বিশ্বাসে গঠিত হইয়াছ বলিয়া, কোন বিষয় বিশ্বাস করিও না; কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, তারপর বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ, সকলের পক্ষে উহা উপকারী, তবে উহাতে বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশানুসারে জীবন যাপন করিতে সাহায্য কর।"

ব্লাভাস্কি বোধ হয় স্থির কবিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান স্বাধীন চিন্তার যুগে, সেই অপূর্ব্ব স্বাধীনতা, মনস্বিতা ও বৈজ্ঞানিক কর্ম্মতত্ত্বের আদর্শ জগতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তাঁহার পরাবিদ্যা-সমিতিও এই নীতির উপর স্থাপিত। আমাদের শাস্ত্রনীতিও ইহার বিরুদ্ধ নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই স্বাধীন চিন্তারূপ আদর্শের যথেষ্ট স্ফূরণ দৃষ্টিগোচর হয়। যে দেশে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে দেশে যে অসাধারণ বেদবশ্যতার সহিত অসাধারণ স্বাধীন চিন্তাশীলতার যথেষ্ট স্থান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। পরাবিদ্যা সমিতি মানবকে এইরূপ স্বাধীন চিন্তাশীলতায়, মৌলিক গবেষণায়, স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণে উৎসাহিত করিয়া থাকে। 'অলকট অভ্রান্তবাদ' (Infallibility) শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"পরাবিদ্যা কোন বিশিষ্ট ভাবাপন্ন গুরু বা গুরু সম্প্রদায়ের অধীন নহে, কোন সম্প্রদায়গত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, কোন জাতীয় বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে।" * ইহা ব্লাভাস্কির মতেরই প্রতিধ্বনি। অলকট জনৈক মহাত্মার

* "There never was any adept or Mahatma in the world who could have developed himself up to that degree, if he had recognised any other principle. Gautama Buddha is held to have been one of the greatest in this august Fraternity, and in his *Kalama Sutta*, he enforced at great length this rule that one should accept nothing......unless it reconciled itself with one's own reason and common sense. This is the ground upon which we stand; and it is our earnest hope that when the founders of the T. S. are dead and gone, it may be remembered as their 'profession of faith."

Old Diary Leaves.

নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; উহার একস্থানে একটী মহৎ সত্য নিবদ্ধ ছিল। মহাত্মা বলিতেছেন ঃ—

"One of the most valuable effects of Upashika's (H. P. B's) mission is that it drives men to self study, and destroys in them blind servility to persons." (O. D. L. vol. III, Page 92) অর্থাৎ উপাসিকার (মহাত্মারা ব্লাভাস্কিকে 'উপাসিকা' বলিয়া ডাকিতেন) জীবন ব্রত হইতে যে সকল শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে, মানবকে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করা, এবং তাহার মন হইতে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট অন্ধ আত্মবিক্রয়ের ভাবকে সমূলে উৎপাটন করা, তাহাদের অন্যতম ফল।"

গৌতম বুদ্ধে এই আদর্শ তিনি শরীরবদ্ধরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন, ব্লাভাস্কি নাস্তিক ছিলেন বলিয়া বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছিলেন, অথবা তিনি বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়া নাস্তিক, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা বোধ হয় পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্লাভাস্কির নিজের উক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি বৌদ্ধ 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিয়া আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিলেন, তিনিই আবার হিন্দুর সর্ব্বমান্য শ্রুতির প্রতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, ইহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় ঃ—

"প্রাচীনতম আর্য্যগণের বেদ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আট্‌লান্টিস ও লেমুরিয়া (Atlantis and Lemuria.এই দুই মহাদ্বীপের অস্তিত্ব এক্ষণ বিলুপ্ত, কোন খণ্ড প্রলয়-গর্ভে নিমজ্জিত। থিওসফিকাল সাহিত্যমতে এই দুই মহাদ্বীপই আমাদের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কুশদ্বীপ ও শাল্মলিদ্বীপ) মহাদ্বীপদ্বয়ে প্রচারিত হয়. এবং বর্ত্তমান সমস্ত প্রাচীন বীজ পত্তন করে। এই বেদরূপ অব্যয় জ্ঞানমহীরুহের শাখা প্রশাখা বিগলিত শুষ্ক পত্র গুলি জুড়িয়া ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।... ..উপনিষৎ আকারে শ্রুতির শাশ্বত জ্ঞান চিরদিন আছে ও থাকিবে।" *

ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম কোন প্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং উহা কিরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ উহা বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গের দিক দিয়াই বুঝা উচিত বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু পুনর্ব্বার বলি, মহাপুরুষদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস কোন এক মতের ভিতর নিক্ষিপ্ত করিতে গেলে ভ্রমে

* The vedas of the earliest Aryans, before it was written, went forth into every nation of the Atlanto-Lemuriaus, and sowed the first seeds of all the now-existing old religions. The off-shoots of the never dying tree of wisdom have scattered their dead leaves even on Judæo Christianity. And at the end of the Kali, our Present age, Vishnu, or the Ever-lasting king will appear as Kalki and re-establish righteousness upon earth. The minds of those who live at that time shall be awakened, and become as pellucid as crystal."
"The Vedas are and will remain for ever in the esotericism of the Vedanta and the Upanishads the mirror of the Eternal wisdom."
The Secret Doctrine, Vol: II, P. P.507 and 508.

পড়িবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের চরিত্র যেরূপ দুরবগাহ, ধর্ম্মমতও সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য। তাঁহারা স্বাত্মানুভূতিই তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহারা কাহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবে স্বাত্মানুভূতিরই অনুসরণ করেন। সেই জন্য উহা কেবলই কতকগুলি প্রচলিত বা অপ্রচলিত মতবাদের সমষ্টি নহে বলিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

গার্হস্থ্যজীবনে মোটামুটী অভিজ্ঞান। *

(১)

পতি-পত্নী—১। কোন গৃহস্থাশ্রমী, ধনী কি দরিদ্র হউন, স্বীয় পুত্রগণকে ২৫ পঁচিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কখনও বিবাহিত করিবেন না। কন্যাগণকে ১৫ পনের বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পূর্ব্বে কখনও বিবাহিতা করিবেন না। উভয়কে বিহিত শিক্ষা দিবেন।

২। উল্লিখিত বা ততোধিক বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক স্বীয় ভাবী পত্নী নির্ব্বাচন করিতে তাহার গুণাগুণের বিষয় পরের মুখে শুনিয়া কখনও সন্তুষ্ট হইবেন না। যতদূর সম্ভব, হয় নিজে কিম্বা একান্তরূপে বিশ্বস্ত বন্ধু বা আত্মীয়ের দ্বারা জ্ঞাত হইবেন।

(ক) কোন শিক্ষিত যুবক যেন নিরক্ষর মূর্খ কুমারীকে স্বীয় গৃহিণী রূপে গ্রহণ না করেন।

(খ) বিবাহে পাত্রী মনোনয়ন কালে সর্ব্বাগ্রে পাত্রীর জননীর চরিত্রজীবন, পরে পাত্রীর সহোদর সহোদরাগণের শিক্ষা, স্বভাব ও চরিত্রের গুণাগুণের প্রতি সতর্কতা সহ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। "নরাণাং মাতুল ক্রম" বলিয়া যে কথা আছে, ইহা প্রায়শঃ "অব্যর্থ সত্য"রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। পাত্র কিম্বা পাত্রী সম্বন্ধে রূপ হইতে স্বভাবের মিষ্টতা, চরিত্রের বিশুদ্ধতার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিবেন। এতদ্ভিন্ন অজ্ঞাতা, শিক্ষাহীনা কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে যাবজ্জীবন নিশ্চয় অতি মনোকষ্টে এবং অপ্রসন্ন চিত্তে যাপন করিয়া যাইতে হইবে। একমাত্র কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য তাঁহার, যিনি অশিক্ষিতা স্ত্রীকে যত্নপূর্ব্বক যথাবিহিত শিক্ষাদান করিয়া লইতে পারেন।

৪। প্রত্যেকের গৃহিণীর একান্তরূপে মিতব্যয়িনী হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে পতি অপেক্ষা পত্নীর অধিক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। অমিতব্যয়ী গৃহে পরিণামে দুঃখ দরিদ্রতাভোগ অনিবার্য্য।

৫। ধর্ম্মবিশ্বাসে স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন হইলে প্রকৃতরূপে আন্তরিক বন্ধুতা সম্ভব নহে। ধর্ম্মেতে স্ত্রীকে অভিন্না করিতে না পারিলে, কখনও একাত্মা-যোগে দেবভোগ বা ধর্ম্মভোগ সম্ভব নহে। ব্রাহ্মসন্তানের হিন্দু স্ত্রী অবাঞ্ছনীয়, যদি তাহাকে শিক্ষাদ্বারা পতির সঙ্গে সমবিশ্বাসের পথে আনিতে পারা না যায়। তদ্রূপ কোন হিন্দুযুবক ব্রাহ্মগৃহের কন্যাকে (একমাত্র শিক্ষিতা ও সুচরিত্রা বলিয়া) পত্নীরূপে গ্রহণও অবাঞ্ছনীয়।

৬। কখনও স্ত্রীবশীভূত হইবে না। স্ত্রীবশীভূততাতে সংসার-গৃহে স্নেহ, প্রেম, দয়া

* পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'আত্ম-জীবন-কথা' নামক অপ্রকাশিত পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।—জীবেন্দ্রকুমার।

ও ভক্তি হ্রাস হয়, সহোদর সহোদরা, আত্মীয় স্বজন পর হইয়া যান, গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। কথায় বলিয়া থাকে ঃ—

আত্মবুদ্ধি শুভকরী, গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ
পরবুদ্ধ বিনাশায়, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

৭। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি (গৃহ, ধর্ম্ম এবং সন্তানের শিক্ষা বিবাহাদি বিষয়ে অভিন্ন হইয়া ও সমাধান করিয়া) সদা সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ। শাস্ত্র বলিতেছেন ঃ—

"সন্তুষ্টোভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিনেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥

৮। যে স্বল্পজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রী স্বীয় সুশিক্ষিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ স্বামীকে ধর্ম্মে, কর্ম্মে, কি গৃহ, কি সন্তানদের শিক্ষাদি বিষয়ে সদা প্রতিবাদ পূর্ব্বক বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তি প্রকাশ করে, সে পরিবারে অশান্তি এবং সন্তানদের অমঙ্গল অনিবার্য্য।

৯। যে সৎপতি জীবনকালে স্বীয় পত্নীকে তাঁহার ধর্ম্মাচরণের ভাগিনীও দেবভোগে সম-ভোগিনী করিতে পারিলেন না, তিনি অতিশয় দুর্ভাগ্য।

১০। যে পত্নী জীবনকালে স্বীয় সুপতির সকল সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়া পতির ধর্ম্ম পালনের সহায় এবং তাঁহার পুণ্যভাগ গ্রহণ করিয়া পতিসহ এক হইতে পারিলেন না, তিনিও অতিশয় দুর্ভাগ্যবতী।

১১। বৈধ-পত্নী একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমে আবদ্ধ হইয়া অভিন্ন আত্মাতে জীবন ধারণ করা তো স্বাভাবিক। বৈধ বিবাহিত নরনারী একের লোকান্তরে পতি বা পত্নীর অভাব বোধে দ্বিতীয় পতি বা পত্নী গ্রহণ অবৈধ ব্যবহার। ইহাতে ধর্ম্মপতিত্ব এবং ধর্ম্মপত্নীত্ব স্খলন হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত বিপত্নীক পতি বা পতিহীনা পত্নী, নবপত্নী বা পত্যন্তর গ্রহণে দাম্পত্য ধর্ম্মচ্যুত অপরাধে পতিত, অপরাধী ও অপ-রাধিনী হন। (কেবল মাত্র বালবিধবারা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারেন।)

১২। নারী কন্যারূপে অত্যধিক স্নেহ-পাত্রী, স্ত্রীরূপে শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্রী, এবং মাতৃরূপে পরম পূজনীয়া ও বিশ্বমাতার প্রতিমা রূপে প্রকাশিতা হন। এই ত্রিবিধরূপে নারী "পৃথিবী হইতেও উচ্চতরা" এবং "যথা নারী পূজিতা হন, তথা দেবতারা প্রসন্ন থাকেন।"

১৩। "পরস্ত্রী" এবং "আপন স্ত্রী" এই উভয়ের প্রতি বিশেষ সতর্কতা সহকারে আন্তরিক অনুরাগের সম্পূর্ণ পার্থক্য-সীমা রক্ষা করিয়া চলিবে।

১৪। এ সংসারে বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়া সকল বয়সের বিধবা নারীর প্রতি তাঁহাদের সুখদুঃখে বা পতির অভাব-বোধ-বিষাদে গৃহবাসী গৃহবাসিনী অপর নরনারীগণ আন্তরিক সহানুভূতি দ্বারা তাঁহাদের প্রতি একান্তরূপে (পাত্রী অনুসারে) স্নেহশীল, শ্রদ্ধা ও ভক্তিমান থাকিয়া সসম্মানে ব্যবহার করিবেন। কোন প্রকারে তাঁহাদের অন্তরে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়।

১৫। পতি ও পত্নী এই দুই অর্দ্ধ আত্মা একাত্মা হইয়া লোক-লোকান্তরে যেন অভিন্ন থাকিয়া পরমাত্মার পূর্ণতার দিকে গতি হয়, ইহলোকে সশরীরে সেইরূপ ধর্ম্মাচরণে প্রাণপণে প্রবৃত্ত থাকিবেন, ইহাই প্রজাপতি বিধাতার ইচ্ছা বলিয়া জানিলাম।

(২)

সংসার-গৃহে অভিজ্ঞান।—১। কপট-কুটীল-

অন্তর আত্মীয় অতিশয় ভয়ঙ্কর। সতর্কতা সহকারে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিবে।

২। সংসারবাসী বিষয়-সম্পন্ন হইলে প্রায়শঃ মামলামোকর্দ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়া মনের স্থৈর্য্য ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হন। যথা-সম্ভব ইহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

৩। দুষ্কার্য্য ত্যাগ করা বরং সহজ, দুশ্চিন্তা ত্যাগ করা অতীব দুষ্কর।

৪। সংসারে বহুলোক "তেলীর মাথায় তেল ঢালিয়া থাকেন"—এইটী বড়ই আশ্চর্য্য। এইরূপ ব্যবহার অতিশয় ঘৃণিত। যাহার প্রচুর আছে, তাহাকে দাও, আর যাহার 'নাই' বলিতে কিছুই নাই, তাহার প্রতি দৃষ্টিও পড়িল না,—সংসারে অর্থশালী হইয়া কত তথাকথিত বড় মানুষ এইরূপই দেখিলাম।

৫। বহুলোক দরিদ্র অক্ষম আত্মীয় স্বজন, এমন কি, সহোদরগণেরও প্রতি উদাসীন থাকিয়া স্বীয় অর্জ্জিত ধন যথেচ্ছ অপরিমিত অথবা খামখেয়ালীতে ব্যয় করিয়া তৃপ্ত হন, কিম্বা অপর অসম্পর্কিত জনকেও দান করিয়া তাঁহাদের ভালবাসার বা প্রশংসার পাত্র হইয়া পরিতৃপ্ত হন, অথচ গৃহে অনাথ দীন ভাই ভগিনী বা অপর কোন আত্মীয় তাঁহার দয়ার পাত্র হয় না।—"তাহাদের স্বীয় অদৃষ্ট নিয়তিতে চলে যাবে"—এই ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহা-দের আত্ম-দৃষ্টির কোন ভ্রম বা স্খলন দেখা যায় না। ঈদৃশ লোক শিক্ষিত বা অশিক্ষিত উভয়ের চিত্ত অতি হীনতাতে ও স্বার্থে বিজ-ড়িত জানিবে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বা পাতোবিষস্বোদঃ স্বধর্ম্ম প্রতিরূপক ॥"

ইহার অর্থ এই,—"যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রীপুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দান ক্রিয়াধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে, তাহা আপাততঃ মধু সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল সমান আস্বাদ হইয়া থাকে।"

৬। পারিতপক্ষে আত্মীয় জনের নিকটে ধার গ্রহণ করিবে না। অভাবে পতিত কোন দরিদ্র বন্ধু বা কোন নারীকে (পরিচিতা) টাকা ধার দিতে হইলে, যথা-সম্ভব দিয়া উহা পুনঃ প্রাপ্তির আশা বা আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না।

৭। সংসারে তোষামোদকারী বা চাটুকার এইরূপ শ্রেণীর লোককে আত্মসম্মানহীন ও নীচ প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। তাঁহাদের বাক্য যদি প্রিয়ও বোধ হয়, তথাপি তাহাতে ভুলিবে না, কেননা তদ্রূপ কথায় একবিন্দুও সরলতা নাই, তাহাদের নিজের কোন কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে বা সন্তোষভাজন হইবার জন্য এরূপ বাক্য ব্যবহার করা হয়।

৮। একান্তরূপে বিশ্বস্ত বন্ধুজন ব্যতীত আর কাহারও উপর সহজে কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।

৯। এ সংসারে মাতুল যতটুকুনি ভাগিনাগণের হিতকামী হইয়া থাকেন, খুল্লতাতগণ তেমন হন না। বরং অনেক স্থলে ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি অহিত আচরণ করিতে দেখা যায়।

১০। যাঁহার বহু উপকার করিয়াছ, এমন কি, জীবনোপায়ও করিয়া দিয়াছ, অথবা যিনি তোমার দ্বারা বহুরূপে অনেক উপকৃত হইয়াছেন, জানিবে, এইকালে প্রায়শঃ তাঁহার দ্বারাই তোমার বিশেষ অপকার সম্ভাবনা হইবে।

১১। এ সংসারে সহোদর ভাই-ভাই অপেক্ষা সহোদর ভাইভগ্নীতে অধিকতর স্নেহপাশে বাঁধা থাকেন। সক্ষম ভাই অক্ষম ভাইকে কোনরূপ আর্থিক বা অন্য সাহায্য দানে তেমন ইচ্ছুক হন না, যেমন অক্ষম ভাইকে সক্ষমা ভগ্নী নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহায্যদানে প্রস্তুত দেখিতে পাওয়া যায়।

১২। এ সংসারে "ঋণ" জিনিসটা অতি ভয়ঙ্কর,—উপবাসী থাকিবে, তথাপি ঋণশোধের অক্ষমজন ঋণ করিবে না। প্রত্যেক পিতা অভাব ও অস্বচ্ছলতা হেতু সন্তানদের জন্য সঞ্চিত অর্থ রাখিতে না পারিলেও সন্তানদের উপরে ঋণভার দিয়া পরলোকস্থ হইবে না।

১৩। সংসারে একপ্রকার দু-মুখো মানুষ আছেন, তাঁহাদের প্রথম-প্রথম চেনাও শক্ত, তাঁহারা অতি ভয়ঙ্কর! তাঁহারা তোমার সঙ্গে অতি সৎভাব রাখিয়া অতি ভালমানুষের মত কথা বলিবেন—কিন্তু ঠিক বিপরীত ভাবে অন্যের নিকটে তোমার সম্বন্ধে নিন্দাসূচক অথবা যাহাতে 'সেই অন্যের' সঙ্গে বিচ্ছেদ বা মনোমালিন্য ঘটিত পারে, তেমনি কথা বলিবেন; এ জাতীয় লোক সর্প সদৃশ। সতর্কতা সহকারে এইরূপ লোকের সঙ্গে অতি অল্পভাষী হইবে—বন্ধুভাবে কোন কথাই বলিবে না। ইহারা অতিশয় অনিষ্টকারী।

১৪। ভালরূপে জ্ঞাত না হইয়া কখনও পরের কার্য্যে আপনার ভাবে কোনরূপ "মতলব" আরোপ করা উচিত নহে। ইহাতে অনেক সময় ভুল হইয়া থাকে, নির্দ্দোষীকে দোষযুক্ত চক্ষে দেখা হয়।

১৫। সাংসারিক লোক—শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, প্রায়শঃ আপনাপন চরিত্রজীবন-আদর্শে পরকে বিচার করিয়া থাকেন। তাই, কথা আছে—"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।" সাধুসজ্জনের যেমন সাধু অসাধু সর্ব্বজনকে সমানভাবে দেখিবার প্রবৃত্তি হয়, ঠিক তেমনি অসাধু কপট ও ধূর্ত্তপ্রকৃতির লোকেরও তাহার স্বীয় প্রকৃতিতে সাধু অসাধু অবিচারে সকলকে দেখিতে প্রবৃত্তি হয়।

সুখ ও দুঃখ।

শেষ কথা বলি, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"

অর্থ, যাহা কিছু পরাধীন, তাহা দুঃখের কারণ; আত্মবশ সকলই সুখের কারণ। সংক্ষেপতঃ সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে।

(৩)

ধর্ম্মপথে অভিজ্ঞান।—

১। সরলতা ধর্ম্মের আরম্ভ, বিনয় ও ব্যাকুলতা ইহা লাভের উপায়।

২। ধর্ম্মপথে অহঙ্কার অভিমান পরম শত্রু।

৩। বাসনা, কামনা, এবং ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছাহীন ও রিপুকুলের সম্পূর্ণ সংযতাবস্থা ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দোদয়ের কোন আশা নাই।

৪। ধর্ম্মরাজ্যে "ঈশ্বর অনুমান বা কল্পনার বস্তু হইলে" সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মপালন, ধর্ম্মাচারণ অথবা ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যর্থ হয়। পুতুলকে দেবতা আরোপে পূজা করা যেমন পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরকে অনুমানে পূজাবন্দনা করাও তেমনি পৌত্তলিকতা; এ উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। স্বীয় অস্তিত্ব যেমন জীবন্ত সত্য, ঈশ্বর-অস্তিত্ব জানিবে, তদপেক্ষাও জীবন্ত জাগ্রত সত্য; তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভব

অতঃপর উপলব্ধি ভিন্ন জীবনে সার সত্য ধারণ অসম্ভব।

৫। ধর্ম্ম কি?—সত্যই ধর্ম্ম অন্ধকারে আলোকস্বরূপ, পতনকালে করাবলম্বন স্বরূপ, প্রার্থনার কল্পতরু স্বরূপ, ধর্ম্মই জগৎ-বিজয়ের রথস্বরূপ। ধর্ম্ম দুঃখরূপ ব্যাধির মহৌষধ, ভবভয়ে ধর্ম্মই একমাত্র আশ্বাস-স্থল, তাপে চন্দন-কানন, ধর্ম্মই স্থায়ী সুহৃদ্ এবং ধর্ম্মই সজ্জনের বান্ধব।

৬। ঈশ্বরোপাসনা কি?—একান্ত অনুরাগে ও প্রেমের সহিত আত্মা পরমাত্মার প্রতি ধীরে ধীরে প্রসারণের (Stretchting out) অবস্থায় যে আরাধনা—বন্দনা ও প্রার্থনাদি নিষ্পন্ন হয়, তাহাই উপাসনা।

৭। কার্য্যতঃ উপাসনা কি?—তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব।"

৮। পশু ও মানুষে প্রভেদ কি?—শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা। শরীর জয় এবং আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব বিকাশের অবস্থা।

৯। ধর্ম্মপথে জীবনকালে এই শাস্ত্রীয় বচন প্রতিনিয়ত মনে রাখিবে:—

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানাং যত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষপুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"

অর্থঃ—হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্য-পাপ-দর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

১০। ধর্ম্মরক্ষার্থ অথবা নৈতিক জীবন নিষ্কলঙ্ক রক্ষার্থে চক্ষুর দৃষ্টি সতর্কতা সহ একান্তরূপে নির্ম্মল রাখিবে। সুচক্ষে এবং পবিত্র অন্তরে নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিহীনতায় অন্তর অজ্ঞাতসারে কলুষিত হয়। ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। নারীজাতির পক্ষেও তাই।

১১। ধর্ম্মরাজ্যে মোহ-অন্ধকারাচ্ছন্ন অবিদ্যার পথে সাধুসজ্জনেরা ঠিক কোন বৃহৎ নগরের পথপার্শ্বে স্থাপিত মিউনিসিপ্যাল আলোকের মত জানিবে। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে সে আলোক যেমন পথিককে পথ-ভ্রান্ত হইতে না দিয়া তাহার বাঞ্ছিত গন্তব্য স্থানে যাইতে সাহায্য করে, ঠিক সেইরূপ, সাধুসজ্জনেরা, যথা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানের আলোরূপে, ঈশা, প্রহ্লাদ, শুকদেব, মোহাম্মদ, নানকাদি বিশ্বাসের আলোরূপে এবং শ্রীচৈতন্য, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তির আলোরূপে ধর্ম্মপথের পথিক জীবকে একমাত্র তাহার অন্তিম-লক্ষ্য আনন্দস্বরূপ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা সকলে গুরুজনোচিত ভক্তির পাত্র মাত্র, কেহই ঈশ্বরের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর নহেন।

১২। সংসারে আসিয়া বিবিধ প্রকার সম্ভোগের মধ্য দেখিলাম, বিবিধ সুস্বাদু আহার লাভে ও মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কার পরিধানে শরীরের সুখসম্ভোগ, অতঃপর ইন্দ্রিয় ও ধনৈশ্বর্য্য ভোগে মনের সুখসম্ভোগ, সর্ব্বশেষে জীবনদাতা পরমেশ্বরের শরণ-মনন-বন্দনা-দিতে আত্মার সুখসম্ভোগ হয়, এই ত্রিবিধ সুখসম্ভোগের মধ্যে প্রথম দুইটী সম্ভোগে পর্য্যায়-ক্রমে সুখ ও দুঃখ পূর্ণ এবং ক্ষণ স্থায়ী; পরন্তু তৃতীয়টী আত্মার অধ্যাত্ম-ভোগ বা দেবভোগ—ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আনন্দ. যাহার আর শেষ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু হায়! মানুষ কি মোহে পড়িয়া এই অফুরন্ত আনন্দ উপেক্ষা করিয়া শরীর ও মনের ক্ষণস্থায়ী ভোগের

জন্য কেমন লালায়িত! শরীরের অত্যধিক ভোগে শরীর বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত এবং অকাল মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। মন অযথা ইন্দ্রিয়ভোগে বিকারগ্রস্ত, কলুষিত এবং নৈরাশ্য-পূর্ণ হয়; কিন্তু আত্মার পরমাত্মাস্পর্শে দেবানন্দ ভোগ —এ সম্ভোগের আর অতৃপ্তি নাই, ইহাতে রোগের পরিবর্ত্তে আরাম ও শান্তি, নিরাশার পরিবর্ত্তে অনন্ত আশা ও আনন্দ জানিবে।

১৩। বৃদ্ধ জীবনে "ধ্যান" উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিকরূপে স্বাভাবিক এবং দেবভোগের সহজ ও সরল পথ মনে হইয়াছে। যত বয়স বৃদ্ধি পাইয়া শরীর অবসন্ন ও কাতর হইয়া আসিবে, তত নির্জ্জনে ধ্যান-যোগে অন্তিম ও লোকান্তরের পরমাশ্রয় ভগবানের শরণ-মনন ও সহবাস অন্বেষণ করিবে।

১৪। এসংসারে "ধর্ম্মবস্তু" প্রকৃতরূপে পরিবার-বন্ধনের একমাত্র উপায়। যে কোন ধর্ম্মবিশ্বাস হউক, (হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান) তাহাতে পরিবারের সকলে একান্তরূপে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক নরনারী অতি নিষ্ঠার সহিত নেই "ধর্ম্ম" আচরণ করিবে। সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা বন্দনা, ধ্যান-উপাসনা, নমাজ prayer দ্বারা দেবস্বরূপ সকল আত্মস্থ করার একমাত্র উপায়। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহারে যেমন শরীর পরিপুষ্ট হয়, সৎচিন্তা এবং সঙ্গীতাদি চর্চ্চাতে যেমন মন পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ, আত্মার উপাসনাই একমাত্র খাদ্য—প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, ইত্যাদি শ্রীভগবানের স্বরূপাংশ আত্মাকে পুষ্ট করিয়া অনন্ত জীবনে তাঁহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

মনুষ্যজীবনের ইহাই সার্থকতা, ইহাই সফলতা।

১৫। "ধর্ম্ম প্রত্যেক পরিবারের মধ্যবিন্দু (pivot) রূপে মানিয়া লইতে হইবে। ইহা হইতে স্খলিত হইলে পরিবারের সকল বাঁধনী ছিন্ন হইয়া উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা হয়, গৃহে সন্তান, বধূদের স্নেহ, প্রেম, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি কোমল ধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত বা শুষ্ক হয়। সন্তানদের জীবন-চরিত্র কলুষিত হয়। ঈশ্বর বা ধর্ম্মহীন গৃহ শ্মশান বা মরুভূমি সমান। প্রধানতঃ গৃহপরিবারে জননীরাই ধর্ম্মরক্ষিণী, প্রত্যেক নারী-হৃদয়-প্রস্রবণ হইতে ধর্ম্মপ্রবাহিত হইয়া সমগ্র গৃহকে শ্রী সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে, অতএব ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিবে না, সত্য সত্য তাহা হইলে পরম অকল্যাণ হইবে।

শ্রীঅনঙ্গচন্দ্র দত্ত।

আমাদের নানা কথা।

যাঁহারা ধর্ম্ম জগতের কোথায় কি হইতেছে, তাহার খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, যে, আর, জে, ক্যাম্বেল (Rev. R. J. Campbell) বিলাতের খ্রীষ্টীয় সমাজের একজন চিন্তাশীল ধর্ম্মোপদেষ্টা। তিনি যখন লণ্ডনের সিটি-টেম্পেলে (City Templeএ) উপাসনা করিতেন, তখন ভজনালয় লোকে পরিপূর্ণ হইত। সেই সময়েই তিনি তাঁর "নূতন ঈশ্বর-তত্ত্ব" (New Theology) প্রচার করেন। ইহা বেদান্তের মতের মত। সম্প্রতি তিনি রাজকীয় খ্রীষ্টীয় সমাজে (Established Churchএ) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও বিশপ

হইয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধ নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার আবশ্যকতা নাই; যুদ্ধ যে তাঁহার অনুমতিতেই ("sanction"-য়েই) হইয়াছে; তিনি যে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড বিধান ("Ordain"); করিয়াছেন; আবার তাঁহার সংকল্পিত নিয়মানুসারেই যুদ্ধ শেষ হইবে, তাঁহাকে যুদ্ধ নিবারণ করিতে বলা মিছে। একজন বিশপের মুখে এরূপ কথা কমই শোনা যায়। বিশপ হইয়া ইংলণ্ডে এরূপ কথা বলায় আর কিছু হউক আর না হউক, পাঠক নিশ্চয়ই বলিবেন, ক্যাম্বেল সাহেব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

এই সূত্রে একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে British Association for the Advancement of Scienceএর কতকগুলি সভ্যদের নিকট রিপণের বিশপ এক সার্ম্মণ (Sermon) দিয়াছিলেন। তাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জড় শক্তিও (physical forcesও) ঈশ্বরই। সুবিজ্ঞ পাঠক ইহা হইতে অনুমান করিতে পারিবেন, অন্ততঃ দুই একজন পণ্ডিত খ্রীষ্টীয়ানের মনে ধর্ম্মচিন্তার হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে!

চৌরিঙ্গীয় ভবিষ্যৎ-বক্তার মতে কেইসার (Kaiser অর্থাৎ বর্ত্তমান জর্ম্মাণ-সম্রাট) নরদেহধারী রাক্ষস হইলেও, বিলাতের সর্ব্ব-প্রধান সংবাদ পত্রে—Timesএ—তাঁহার সম্বন্ধে সম্প্রতি একটী সুন্দর কথা বাহির হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উনি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলাণ্ডে গিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াও স্বদেশকে ভোলেন নাই। সঙ্গে জার্ম্মাণির নবাবিষ্কৃত কতকগুলি রন্ধনের সরঞ্জম (cooking apparatus) লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে উক্ত জার্ম্মাণ পণ্যগুলির ইংলাণ্ডে খুব বিক্রয় হয়। সেইজন্য ইংলাণ্ডের কতকগুলি লোককে ঐ সকল জিনিস প্রদর্শন (demonstrate) করিয়াছিলেন;—একজন দালালের মত। একেই বলে স্বদেশ-প্রেম!! এত বড় সম্রাট হইয়াও নিজের দেশের জিনিসের জন্য, সময় নাই, অসময় নাই, সামান্য দালালী পর্য্যন্ত করিতেও ছাড়েন নাই!! এর পরেও কি পাঠক আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, জার্ম্মাণি জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পে কেন এত শীঘ্র এত উন্নত হইয়াছিল,—কেন জার্ম্মাণ-পণ্য (German goods) জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছিল?

ইংলণ্ডে National Council of Public Morals নামে একটী সভা আছে। তার উদ্দেশ্য অবশ্য ঐ দেশের লোকের নৈতিক জীবন উন্নত করা। সম্প্রতি তাঁহারা ঐ দেশের জন্ম-হার (Birth-rate) অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন্ (Commission) বসাইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও অনুমতি ছিল। কমিশনে ইংলাণ্ডের কতকগুলি গণ্যমান্য লোক ছিলেন। যাঁহারা সাক্ষ্য দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক গণ্যমান্য লোক ছিলেন। এরূপ কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য। কমিশনের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ইংলণ্ডের জন্মহার খুব কমিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-হার এক হাজারে ৩৬ ছিল; ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক হাজারে ২৩টীতে দাঁড়াইয়াছে। এটা যে ইংলাণ্ডের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর ব্যাপার, তাহা সে দেশের অনেক বিজ্ঞলোকই

মনে করেন। মনে করিবারই কথা। ফ্রান্সের অবস্থা ভাবুন !! কমিশনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে,জন্ম-হার "বড় লোক" ও মধ্য-বিদ্‌দিগের মধ্যেই বেশী কমিয়াছে। তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ইংলণ্ডের জন্ম-হার কমিবার প্রধান কারণ হইতেছে, জন্ম-বাধক ঔষধ ও সরঞ্জমাদির (Anticonceptivesএর) বহুল ব্যবহার। চতুর্থ সিদ্ধান্ত এই যে "ছোটলোক" অর্থাৎ কারিকর প্রভৃতির মধ্যে ভ্রূণ হত্যার প্রচলন। (এই তথ্যগুলি বিলাতের *Nature* নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিলাম।) আমাদের দেশের "বড়" লোকদিগের মধ্যে Anticonceptivesএর ব্যবহার যে একেবারে প্রবেশ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। দিন থাকতে সাবধান হওয়া ভাল।

হিন্দুসমাজে জন্ম-হার কমা যে বিশেষ শোচনীয় ব্যাপার হইবে, তার আর সন্দেহ নাই। এদিকে দুর্ভিক্ষ, তার উপর ম্যালেরিয়া, তার উপর ওলাউঠা ও যক্ষা, তার উপর অনেকের ভাগ্যে দৈনিক অর্দ্ধাশন, তার উপর জনসাধারণ বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্যদের মধ্যে যমের অতিরিক্ত অত্যাচার, তার উপর বিধবা বিবাহের অপ্রচলন, তার উপর তথাকথিত "ছোট লোক"দিগের ও সাঁওতাল, কোল, ভীলদিগের ক্রিষ্টিয়ান্ হওন (এই শেষোক্ত লোকেরা না মরিলেও হিন্দুসমাজসম্বন্ধে মরে বই কি), এইরূপ সব কারণে লোক মরিতেছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। এর উপর আমাদের দেশের লোক যদি ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে * জন্ম-হার কমান, তাহা হইলে অনেকেই কাতরস্বরে বলিবেন, "ভগবান্ এ দেশকে রক্ষা করুন !"

নিদাঘের অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপর সুনীল তারকিত নভোমণ্ডল, নিম্নে বেলের সুমিষ্ট সৌরভ প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে, অদূরে এক কামিনী বৃক্ষের উপর অনেকগুলি খদ্যোত (জোনাক) তালে তালে, ছন্দেবন্দে অপূর্ব্ব আলোক দান করিতেছে ! এ সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিলে অকবি কবি হয়, মানুষ দেবতা হয়, ভাবুকের মস্তক প্রণত হয়। পাঠক, ভয় নাই। এ কবিগ্রস্ত দেশে আমরা আবার নূতন কবি হইয়া আপনার প্রপীড়িত মস্তিষ্ককে আরও পীড়িত করিতে যাইতেছি না। আমাদের এখানের বক্তব্য ভূতলের, মর্ত্ত্যধামের এক সামান্য কথা। পাঠক কি কখনও ভাবিয়াছেন,জোনাক আলো দেয় কেন ? ডার্‌উইনের একটী সুন্দর উক্তি (dictum) আছে ; কোন জন্তু বা বৃক্ষলতার প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, আকার, প্রকার, বর্ণ, গঠন, ভাব ও ভঙ্গি ইত্যাদি প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ তার নিজের উপকারের জন্য বা তার বংশবৃদ্ধির সহায়তার জন্য। হাঁ, আমরা জানি, এ উক্তির উপর সন্দেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেকস্থলে উক্তিটী যে সত্য, তাহা একটী ঘোর পাগল ভিন্ন আর কেহ অস্বীকার করিবেন না। ঐ উক্তি অনুসারে পাঠক হয়ত বলিবেন, "তাহা

* পাঠক এখানে এক ঘোরে পড়িবেন না। বলা বাহুল্য যে, জিতেন্দ্রিয় হওয়া সকলেরই মহা কর্ত্তব্য। সব দেশের সব ধর্ম্ম, সব শাস্ত্র ঐ অমূল্য উপদেশ দিতেছেন। কি ব্যক্তি-গত মহত্ত্ব কি জাতীয় মহত্ত্ব, ইহাদের একটী সর্ব্ব-প্রধান কারণ সংযম। যাহা হউক, আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। আমাদের আজকার বক্তব্য জন্ম-বাধকাদির ব্যবহার দ্বারা জন্ম-হার কমান সম্বন্ধে।

হইলে ত সম্ভবতঃ জোনাকের আলো দিবার আবশ্যকতা (utility)আছে ; ইহা হয় কোন-রূপে তার নিজের উপকার করে, নয় তার বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে।" হাঁ,এই অনুমানই ঠিক ; বৈজ্ঞানিকেরা তাহাই ঠিক করিয়াছেন। জোনাক আলো দেয়, তাদের বংশ-বৃদ্ধির সহায়তার জন্য, স্ত্রী ও পুরুষ দুইই আলো দেয়, পরস্পরের সঙ্গলাভ (mating) আনয়নের সুবিধার জন্য। একটী জোনাক তার নিজের লণ্ঠন (এ লণ্ঠন অবশ্য মানুষের লণ্ঠনের মত নয়। ইহা জোনাকের শরীরের একটী জীবন্ত অঙ্গ ও অংশ। তার নাক, চোক যেমন, তার এ লণ্ঠনটীও তেমনি। তার এ লণ্ঠনটীর ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং তার পেটের নীচে, পশ্চাদ্ভাগে পেটের সহিত জীবন্ত সংযোগে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত)— জ্বালায় সেই লণ্ঠনের আলোক দ্বারা তার নিজের পথ দেখিবার বা অন্য কোন জিনিস দেখিবার জন্য নয়। মানুষ সচরাচর তা করে বটে। পুরুষ-জোনাক ও স্ত্রী-জোনাক তাদের লণ্ঠন জ্বালায় পরস্পরকে অন্ধকার রাত্রে সঙ্কেত করিবার জন্য। (যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও কোথাও মানুষও আলোক দ্বারা এরূপ সঙ্কেত করে বটে।) জোনাক-নায়ক তার আলো জ্বালিয়া তার ভাবী নায়িকাকে ইঙ্গিত করিল "সখি, আমি যে তোমাকে খুঁজিতেছি, তুমি কোথায় ?" নায়িকা অমনি তাড়াতাড়ি, দূর হইতে নায়ককে দেখিতে না পাইয়াও নায়কের আলোক-ইঙ্গিত মাত্র দেখিয়া, দপ্ করিয়া তাঁর নিজের লণ্ঠন জ্বালিয়া উত্তর দিলেন :— "সখে, আমি যে এখানে ঝোপের মধ্যে বসিয়া আছি, তুমি আমার লণ্ঠন লক্ষ্য করিয়া আমার কাছে এস।" নায়ক অমনি দূর হইতে নায়িকাকে দেখিতে না পাইয়াও, নায়িকার লণ্ঠনের আলোক মাত্র লক্ষ্য করিয়া নায়িকার অভিমুখে উড়িয়া গিয়া তাঁর সঙ্গ লাভ করিলেন। ব্যাপারটা মোটামুটী সাধারণতঃ এইরূপ ! পাঠক, বিশ্বরঙ্গ-মঞ্চে অলক্ষিত ভাবে কত রকম নাটকেরই অভিনয় না হইতেছে !!

পৃথিবীতে নানা জাতির জোনাক আছে। গ্রীন্ সাহেব সিংহল দ্বীপের এক জাতীয় জোনাক সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার ছাপাইয়াছেন। জোনাক-নায়কের লণ্ঠন স্বভাবতঃ খুব উজ্জ্বল আলোক দেয়। তিনি কিন্তু যখন দূরে নায়িকার লণ্ঠনের আলোক দেখিতে পান, তখন তিনি তাঁর (অর্থাৎ নায়কের) নিজের লণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে নিবাইয়া (যেন আর আলোকের প্রয়োজন নাই) নায়িকার অভিমুখে ছোটেন। তিনি যখন নায়িকার কাছে পৌঁছিলেন, নায়িকা তখন তাঁর (অর্থাৎ নায়িকার) নিজের লণ্ঠন কতকটা নিবাইয়া দিলেন, সম্পূর্ণরূপে নয় !

আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতির জোনাকের সঙ্কেতও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এসম্বন্ধে আমেরিকায় ম্যাক্‌ডারমট নামক একজন সাহেব এক সুন্দর উপায়ে কতকগুলি সুন্দর আবিষ্কার করিয়া তাহা জগৎকে দান করিয়াছেন। তিনি একটী ক্ষুদ্র electric light জ্বালিয়া জোনাক জোনাকীর আলোকের অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁর পরীক্ষার ধরণ দেখাইবার জন্য পাঠককে এখানে তাঁর একটী আবিষ্কার উপহার দিতেছি। আমেরিকাতে এক জাতির জোনাক আছে, যাদের মধ্যে সঙ্কেতের এই নিয়মঃ—নায়কের

লণ্ঠনের ক্ষণ-দীপনের (flashএর) পাঁচ সেকেণ্ড পরে তবে নায়িকা তাঁর লণ্ঠনের ক্ষণ-দীপন দ্বারা উত্তর দিবেন,—বলিবেন "সখে, আমি যে এখানে, এস।" পাঁচ সেকেণ্ডের আগে উত্তর দিলে চলিবে না। ম্যাক্‌ডারমট্ দেখিয়াছেন, তাঁর electric light যখন কোন নায়কের ক্ষণ-দীপনের পাঁচ সেকেণ্ড পরে জ্বালাইয়াছেন, তখন সেই নায়ক উক্ত electric lightকে নায়িকা মনে করিয়া তার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সাহেব যদি তাঁর electric light কোন নায়কের ক্ষণ-দীপনের অব্যবহিত পরেই (অর্থাৎ পাঁচ সেকেণ্ড ব্যবধান না দিয়াই) জ্বালান, তাহা হইলে সেই নায়ক আর সেই দিকে (অর্থাৎ electric light এর দিকে) অগ্রসর হইবেন না। জোনাকের প্রেমের আইন-কানন্ দেখ্‌ছে মানুষের তৎসম্বন্ধীয় আইন কানন্ হইতেও কড়া!

পরিশেষে প্রিয় পাঠক অতি বিশ্বস্তসূত্রে চুপোচুপি আপনাকে একটী কথা বলিব। কথাটী আর কাহাকেও—আপনার প্রিয়তমাকেও বলিবেন না; সমালোচক মহাশয়কে ত নয়ই। কথাটী এই—আমরা ভাবিতাম, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মহিলারাই ফুল পরিয়া কবরী সুশোভিত করিতে ভালবাসেন, তাঁরা জোনাক পরিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন না কেন? যাহাহউক, এরূপ ভাবিবার আর দরকার নাই। শুনিলাম, মধ্য আমেরিকায় কোন কোন সুন্দরী জোনাক পরিয়া তাঁদের নিজেদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। এ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি। মধ্য আমেরিকার সুন্দরীদের উক্ত রীতিটী নিষ্ঠুর রীতি কি না, সে বিচারের ভার হাইকোর্টের জজেদের উপর দিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধি সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে নিতান্তই অপারক। বিজ্ঞানও অপারক।

"যাকে না দেখতে পারি, তার চলন বাঁকা।" কথাটী খুব সত্য। কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি মাসিক পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব অজ্ঞেয়বাদীদিগের উপর চাপাইয়াছেন, অন্ততঃ কতক পরিমাণে। কাজটা ঠিক উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপানের মত হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞেয়বাদীদিগের উপরেও উক্ত দায়িত্ব অন্ততঃ সমভাবে চাপাইতেন, তাহা হইলে অনুযোগের কিছু থকিত না। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। এই খানেই গলদ। বাস্তবিক দেখিতে গেলে যদি কোন ভাবে কোন পরিমাণে অজ্ঞেয়বাদী দায়ী হন, তাহা-হইলে ঠিক সেই ভাবে ও সেই পরিমাণে জ্ঞেয়বাদীও দায়ী হইবেন না কেন? এই দেখুন, যত লোকের লেখনী এই বর্ত্তমান যুদ্ধ আনয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, Treitselike-এর লেখনী তার মধ্যে একটী প্রধান। ইহা সকলেই জানেন। জার্ম্মানির ইনি একজন খুব বড় "লিখিয়ে।" বার্লিন ইউনিভার্সিটীর ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। খুব ঈশ্বরভক্ত খুব "ধার্ম্মিক"। তিনি ঈশ্বরের মনোবিজ্ঞান এতদূর পাঠ করিয়াছিলেন যে, তাঁর একটী পুস্তকে (এ পুস্তক সম্প্রতি ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে, ও Balfour তার এক ভূমিকাও লিখিয়াছেন) তিনি বলিতেছেন, "ঈশ্বর চেষ্টা করিবেন যুদ্ধ বিগ্রহ যাহাতে পৃথিবী হইতে তিরোহিত না হয়!" ইনি অবশ্য একজন জ্ঞেয়বাদী ছিলেন। Treitsehke-এর মত আরও

দুই চারজন আছেন। Naubaum একজন। ইনিও জার্ম্মানির এক ঈশ্বরভক্ত বিখ্যাত সন্তান। কিন্তু "যুদ্ধং দেহি" দলের একজন প্রধান পাণ্ডা। আরও দেখুন যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে যখন জার্ম্মানির হাজার বেদী (pulpit) হইতে ধর্ম্মযাজকগণ তার স্বরে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া জন সাধারণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই জ্ঞেয়বাদী ছিলেন। আরও দেখুন, জার্ম্মানির একটী জ্ঞেয়বাদী পত্রিকা কি বলিতেছেন। বলিতেছেন :—"What is militarism on which so many insults are cast, but the sword of the Lord suspended over the heads of the evil-doers?" এইদিকের এইরূপ ছবি আরও ঢের দেখাতে পারা যায়। আর অপর দিকের ছবিও দেখুন। (পাঠক এখানে মনে করিবেন না যে, আমরা অজ্ঞেয়বাদীদিগের ওকালত নামা পাইয়াছি। তবে অবশ্য কোন প্রশ্নের দুই দিকই দেখিতে চাই বটে) অজ্ঞেয়বাদীদিগের প্রধান পুরোহিত হার্বার্ট স্পেন্সার বর্ত্তমান কালের সমরপ্রিয়তাকে মনুষ্যজাতির অসভ্য অবস্থার পুনরাবির্ভাব (Recrudescence বলিয়া অভিহিত করিতেন। আর আজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধী ছিলেন; চিরজীবন বর্ত্তমান কালের সমরপ্রিয়তার জন্য আক্ষেপ করিতেন। পাঠক মনে করিবেন না যে এ ছবি জ্ঞেয়বাদীদিগের মধ্যেও নাই। তা নয়। তবে কিনা অজ্ঞেয়বাদীদিগের প্রধান পুরোহিতের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে চাই যে, অজ্ঞেয়বাদীদিগের মধ্যেও এ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এসব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্র বাবু দায়ীত্বের বোঝাটী অজ্ঞেয়বাদীদিগের ঘাড়ে চড়াইয়া জ্ঞেয়বাদীদিগকে অব্যাহতি দিলেন কিরূপে, তাহা তিনিই জানেন। আসল কথা হইতেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অজ্ঞেয়বাদ বা জ্ঞেয়বাদ কেহই দায়ী নয়; আর যদি দায়ী হয় ত দুইই দায়ী। বর্ত্তমান যুদ্ধের মূল কারণ মানব-স্বভাব-নিহিত স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি। কবির (Tennyson-এর) ভাষায় বলিতে গেলে বলিব, এযুদ্ধের মূল কারণ হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে এখনও যে "the beast" আছে, তাকে "work out" করিতে পারে না বলিয়া;—যে "the ape and tiger" আছে, তারা এখনও মৃত হয় নাই বলিয়া। কেম্ব্রিজের সুবিখ্যাত দার্শনিক Russell-এর মতও কতকটা এইরূপ।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা।

রাজর্ষি রামমোহনের সাধনা একে একে দেশের প্রায় সকল বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। রাজার পরবর্ত্তী পতাকাবাহিগণের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষের আপ্রাণ চেষ্টায় ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই এখন পরলোক-প্রস্থিত। যাঁহারা ইহলোকে জীবিত আছেন, তাঁহারাও বিধাতার শেষ

আহ্বানের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। ভারতে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারিত হইয়াছে। যতই সুশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, ততই লোকের মন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিসিদ্ধ ধর্ম্মলাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে আবার একদল লোক নবীন সভ্যতাকে প্রাচীনের কুক্ষিগত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; এখন জাতীয় সাহিত্যে সবেগে তাহার লীলাখেলা চলিতেছে। দারিদ্র্য-সঙ্কটে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য এখন দেশের লোক খুবই উৎসাহিত। কিন্তু দেশের প্রকৃত সম্পত্তি আধ্যাত্মিকতাকে ভুলিয়া তাহারা জড়বাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় পূর্ব্বে যে সকল যুক্তিবলে আত্মরক্ষা করিতেছিল, এখন তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন যুক্তি লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক কোলাহলে ও নানাবিধ হট্টগোলে পড়িয়া দেশের লোক দিশাহারা হইয়া গিয়াছে। তাই এখন আবার নূতন ভাবে, নূতন বলে, নূতন উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময় আসিয়াছে। দেশের জন্য এই নূতন আদর্শ ও নূতন বার্ত্তা যে পরিমাণে প্রচারের প্রয়োজন, সেই পরিমাণে প্রচারকের সংখ্যা বড়ই কম। যে কয়জন আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ কেহই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণের মত যোগ্য ব্যক্তি নহেন। অবশ্য একথা সত্য যে, বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মসমাজে কতিপয় নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ও একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চ্চাপরায়ণ লোক বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজ যদি কিছু দেশের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, তবে তাহা ইঁহাদেরই গুণে। কিন্তু অনন্যকর্ম্মা প্রচারকের দিক দিয়া সমাজ এই বিষয়ে বড়ই অভাবগ্রস্ত। এখন যেরূপ প্রচারের প্রয়োজন, সেরূপ প্রচার হইতেছে না, সেরূপ প্রচারকও আমরা দেখিতেছি না। এখন যাঁহারা ব্রাহ্মপ্রচারক বলিয়া স্ফীত, তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার লোক কয়জন আছেন, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। প্রচারক-জীবনের যে আদর্শ, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সেবা, ঈশ্বরচিন্তা, আত্মপরীক্ষা, একান্তমনে নিষ্ঠার সহিত বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা ইত্যাদি ইহাদের জীবনে কিছু নাই বলিলেই চলে। এখনকার প্রচারক অলস, অকর্ম্মণ্য, অশিক্ষিত, আত্মসুখ-পরায়ণ। কিছুদিন হইল ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক নামধারী লোক নানা স্থান ঘুরিয়া সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক সমৃদ্ধ নগরীতে আসিয়া সংস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, ইহসর্ব্বস্ব ও ক্রোধপরায়ণ লোক বিরল। তাঁহার জীবনে প্রেমের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ, ত্যাগের পরিবর্ত্তে ভোগ, বিনয়ের পরিবর্ত্তে দম্ভ, নম্রতার পরিবর্ত্তে উগ্রতা, মিতাচারের পরিবর্ত্তে বিলাসিতা, সরলতার পরিবর্ত্তে ধূর্ত্ততা, শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে অশিষ্টাচার, ধর্ম্মপ্রচারের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রচার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্। যদি কখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আসামে যান, তার পরেই অন্যস্থানে গিয়া নিজের প্রচার কার্য্যের বাহাদুরি বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন। অভ্যাগত লোকজন সমক্ষে বলিতে থাকেন, "আসামে এবার আমার প্রচার-কার্য্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, তথাকার বন্ধুগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'He is the only man coming after Pandit Sivanath Sastri'; আমাকে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত ও উৎসাহিত"। আবার কুমিল্লায়

প্রচারে গেলে বরিশালের প্রচারকের নিন্দা করেন, বরিশালে গেলে চট্টগ্রামের প্রচারকের নিন্দা করেন। কোন স্থানে বক্তৃতা বা উপাসনা করিতে না দিলে অমনি রাগে অধীর। কোনও সম্মিলনে অন্যান্য স্থান হইতে আগত বিশিষ্ট আচার্য্যগণের উপর উপাসনার ভার অর্পিত হওয়ার দরুণ তাঁহাকে উপাসনা করিতে না দেওয়াতে অভিমানে তিনি অমনি পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। অপরকে খাট করিয়া পারিপার্শ্বিক যোগ্যতর ব্যক্তিগণকে নানা কৌশলে চাপিয়া রাখিয়া, আপনাকে শত প্রকারে বাড়াইয়া তোলা ইঁহার একান্ত চেষ্টা। যদি তাঁর অপেক্ষা অধিক গুণবান্ ও শক্তিশালী কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন, অমনি যে কোন উপায়ে তাঁহাকে চাঁপা দিয়া অথবা অপসারিত করিয়া আপনার শূন্য গৌরবরক্ষা করেন। বিষয় কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রায় শতমুদ্রা মাসহারার লোভে প্রচার কার্য্যে প্রবেশ করেন, অথচ লোকের কাছে বলিয়া বেড়ান "এবার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলাম"। হায়রে ভিক্ষুক! এমন ভিক্ষুক হ'তে কে না চায়! যদি এ প্রকার ভিক্ষুকদলে এদেশ পরিপূর্ণ হইত, তবে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর ও রামকৃষ্ণ-মিশনের Relief work-কে বিদায় দিয়া এত দিনে এ দেশের লোক বৈকুণ্ঠের আরাম-কেদারায় বসিয়া দিন কাটাইত। যেমন যাত্রার বালক অধিকারীর কাণমলা খাইয়া অনিচ্ছায় করুণ কল্যাণ রাগিণীতে গান ধরে, তেমনি, ইনিও অনিচ্ছা আন্তরিক প্রেরণায় প্রেরিত না হইয়া, ঐহিকের তাড়নায় আপনাকে প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। বক্তৃতা ও উপাসনা কর্ত্তব্যের দায়ে বাঁধাবাঁধি রকম চলিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রিয় ও বক্তৃতাবাগীশ। যদি প্রচারক গলা সাধিয়া হারমোনিয়ম টানিতে পারে, আর কাওয়ালী বা লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে গান ধরিতে পারেন, তবে গুণের সীমা কি; আর যদি সঙ্গে সঙ্গে গৎবাঁধা কয়েকটী কথা বক্তৃতার সুরে বিকট অঙ্গভঙ্গিতে জলদ গর্জ্জনে বলিতে পারেন, তাহ'লে ত আর কথাই নাই। হায়রে, গানই যদি কেবল প্রচার কার্য্যের যোগ্যতা হইত, তবে ফনোগ্রাফ্ কিম্বা গ্রামোফোনেই কার্য্যসিদ্ধি হইত; বক্তৃতাই যদি কেবল প্রচারকার্য্যের যোগ্যতা হইত, তাহ'লে থিয়েটার বা যাত্রাব্যবসায়ী বাচালদিগকে ধরিয়া কাজে লাগাইলেই বা ক্ষতি ছিল কি? এইত ধর্ম্মপ্রচার। প্রচারক মহাশয় উপাসনাতে বসিয়া উপদেশের সময়ে অপরের প্রতি তাঁহার মনের আক্রোশ ঝাড়িবার চেষ্টা করেন; এইরূপ প্রায়ই হয়। একবার একটী বড় রকমের উৎসবের সময় একদিন তিনি উপাসনা করিলেন, উপদেশ দেওয়ার কালে এরূপ অত্যুক্তি ও কটূক্তিপূর্ণ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যে, উপাসকমণ্ডলী চমকিত হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ প্রস্থানেরও উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য মহাশয় ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না, অবশেষে উপাসকগণকে লক্ষ্য করিয়া একেবারে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমরা বুঝ কি কচু?"। হায় ব্রাহ্ম! এই কি তোমার ব্রহ্মোপাসনা, না ব্রহ্মের অবমাননা। গ্রামে বৈষ্ণবদিগের মহোৎসবে দেখিয়াছি, কীর্ত্তনের সময়ে কোন কোন ভক্তের দশা (মোহ) হয়। যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে ভক্ত-বিশেষের শত্রুতা থাকে, তবে কীর্ত্তনের সময়ে ঐ ভক্ত-বিশেষ ব্যক্তি-বিশেষের পাশ ঘেষিয়া বসেন,

যখন প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তখনই ভক্তের দশম দশা, এবং ঐ দশম দশার ভিতর দিয়া ভক্ত বিশেষ ব্যক্তি-বিশেষের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটাইতে থাকেন। কীল, কণুই, গুতা, লাথি, আঁচড়, কামড় প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতে থাকে, বিরক্ত হইবার যো নাই বা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য নাই, কারণ ভক্ত এখন দশায়; ভক্ত মহাশয়ের কিন্তু এই সুযোগেই কার্য্যসিদ্ধি। এই প্রচারক মহাশয়ও উপাসনার উপদেশের ভিতর দিয়া ধ্যান-মগ্ন উপাসকবৃন্দকে, আরক্ত নেত্রে ভীষণ অহঙ্কারে—(মনে হয় যেন বেদী ভাঙ্গিয়া যায়, বা মন্দির ধসিয়া পড়ে) বজ্রমুষ্টির ভয় দেখাইয়া তাঁহার মনের বিষ ঝাড়িতে থাকেন। প্রচারক মহাশয়ের জীবনে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তিনি মোটেই ধরিতে পারিতেছেন না, তাঁহার আত্মগর্ব্ব ও আত্ম-প্রচারের ব্যাকুলতাই তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গর্ব্ব বা অহঙ্কার কোন স্থলেই ভাল নয়, বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে ইহার মত মারাত্মক ব্যাধি আর নাই। কোন কোন ব্যক্তিতে অহঙ্কারের পরিমাণে গুণের পরিমাণও যথেষ্ট আছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ জনসন্, বঙ্গের অমর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, বীরগণের মধ্যে মিবারের মহারাণা প্রতাপসিংহ, শাসনকর্ত্তাগণের মধ্যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন। কিন্তু এই প্রচারক মহাশয়ের অহঙ্কারের পরিমাণে গুণের পরিমাণ শতাংশের একাংশও নহে। অহো অহঙ্কার! চৈতন্যের "তৃণাদপিসুনীচেন" কথাটীর তৃণগাছি পুড়িয়া গিয়াছে, খ্রীষ্টের দীনতা দীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সেকেন্দরের watch-word; ইহাই এখন সাধন। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিয়াছেন, "আমার মাথা নত ক'রে দেও হে তোমার চরণ-ধূলাতলে, সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চখের জলে"। এই প্রচারক মহাশয় পাল্টা সুরে প্রার্থনা করিতেছেন, "সবার মাথা নত ক'রে দাও হে আমার চরণধূলার তলে, এবিশ্ব সংসার হবে চূরমার মম অহঙ্কার বলে"। প্রচারক মহাশয় যদি বক্তৃতা বা উপাসনা ইত্যাদি সামান্য কিছু কার্য্য করিয়া থাকেন, আর অমনি তাহাকে বিস্তারিত ও বহুলীকৃত করিয়া সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়া থাকেন; আত্মপ্রচারের কি প্রকৃষ্ট পন্থা! এখন এই প্রচারকের প্রচারকের প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ordained missionary হওয়ার পূর্ব্বেই যে আপনাকে শিবনাথ শাস্ত্রীর স্থলবর্ত্তী বলিয়া দাবী করিতেছে, এবং আপনার নামের পূর্ব্বে একটী উপসর্গ Reverend শব্দটী লাগাইবার জন্য এত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে, এখন লোকই এখনকার ব্রাহ্ম-প্রচারক। ধনী লোকের প্রসাদ প্রত্যাশী, তোষামোদ-পটু, আত্মসুখ-পরায়ণ, বাচাল যে পুরুষ, সে-ই এখনকার ব্রাহ্ম-প্রচারক। সচরাচর দেখা যায়, লোকের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিরোধ ঘটিলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তখন ধৈর্য্যাবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ জগৎটা একা আমার জন্য নহে। কিন্তু এই প্রচারক মহাশয়ের যথেচ্ছভাবে চলিবার পথে কিঞ্চিন্মাত্র বাধা ঘটিলেই সময়ে সময়ে এমনি রাগিয়া উঠেন যে, তাঁহার সেই রুদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া জীব জন্তু সকল ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে। যাজক মহাশয় বেদীতে বসিয়া যজমানদিগকে নানারকম উপদেশ দেন, কিন্তু নিজে কার্য্যগত জীবনে ব্যবহার করেন ঠিক তার উল্টা। এরূপ

'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'-যাজকের জীবনে আমরা দ্বিরূপ দর্শন করিতেছি। একদিন এক বিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হইল, তাঁহাকে গল্পচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ডাক্তারদের অসুখ হয় কেন? পুস্তকে স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্ত নিয়মপ্রণালী পাঠ করিয়াছেন, দেশ শুদ্ধ লোককে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিয়া বেড়ান, আপনাদের অসুখ হয় কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমরা যে সকল স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিয়া থাকি, তাহা আমাদের জন্য নহে, পরের জন্য।" এখানে এই যাজক মহাশয় সম্পর্কেও আমাদের এই কথাটী স্মরণ হইল। ইঁহার পূতিগন্ধময় চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া এখনি কতিপয় লোক ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় দেশের লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজের আর এমন ক্ষমতা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-আদর্শ বিশ্বোজ্জ্বলকারী সূর্য্যের ন্যায় চিরকালই জ্বলিতেছে, কিন্তু সমাজের হালের প্রচারকগণ মধ্যে অনেকেই তদনুরূপ নহেন। যত কলেজের ছাত্র, যত উচ্চশিক্ষিত বন্ধু, যত লোকের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত মিশিয়াছি, সকলেই সমান ভাবে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্ম-সমাজের উজ্জ্বল আদর্শ দেখিয়া যাহারা সমাজের দিকে অগ্রসর হয়, নিকটবর্ত্তী হইয়াই তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়, কারণ বক্তৃতাবাগীশ প্রচারক-জীবনে ঐ ধর্ম্ম-ভাব ও ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার দেখিতে পায় না। এখন আর খ্রীষ্টান পাদ্রিগণের ন্যায়, হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার লইয়া তর্ক করিলে ধর্ম্মপ্রচার হইবে না, এখন সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক। হে ব্রাহ্মসমাজ! হে ব্রাহ্মসমাজের আশার প্রদীপ যুবকগণ! তোমারা নীরবে ধীরভাবে দেশের লোকের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের এই কলঙ্ক দূর কর। আমরা প্রচারক-জীবনে যাহা দেখিয়াছি, বিশেষতঃ এই তথা-কথিত প্রচারকগণের দ্বারা, ধীরে ধীরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইতে দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া মনের দুঃখে সরলভাবে আজ দুই চারিটী কথা নিবেদন করিলাম, প্রয়োজন বুঝিলে ভবিষ্যতে আরও করার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরোহিণীকুমার নাথ।

নব্য ভারতের নেতা দাদাভাই নৌরজি।

জন্ম—২৪শে সেপটেম্বর, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যু—৩০শে জুন, শনিবার, ১৯১৭ „

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বিংশ শতাব্দীর ১৯১৭ পর্য্যন্ত—সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শতাব্দী—পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান এবং স্বাধীনতার শতাব্দী।* তাঁহার মন্ত্রপূত বিধানে ধরা ক্রমেই উন্নতির পথে চলিতেছে। যদিও তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার বংশধর সম্রাট এডোয়ার্ড এবং জর্জ্জ তাঁহার গুণ-গৌরব-ভূষিত হইয়াই পৃথিবীর সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এখনও প্রকারান্তরে ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব চলিতেছে।

* ভিক্টরিয়ার জন্ম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুকুট ধারণ, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ। ওয়াটালু যুদ্ধ ১৮১৫, নেপোলিয়নের মৃত্যু ১৮২১, ১৮০৫—ট্রাফালগারের যুদ্ধ ও নেলসনের মৃত্যু, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তম-আশা-অন্তরীপ ব্রিটিশ গ্রহণ করেন, ১৮০৭ লণ্ডনে গ্যাসের আলো ও ইংলণ্ডে দাস ব্যবসাসের

তিনিই রুল ব্রিটেনিয়ার নেত্রী,—তাঁহার সময়েই জ্ঞানে গৌরবে ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন, তাঁহার প্রভাব আত্মীয়তার সূত্রে জর্ম্মানি ও রুষিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছে ও লিঙ্গোয়া-ফ্রাঙ্কা ইংরাজি-ভাষাকে রাজত্ব দিয়াছে। তাঁহার সময়েই ইংলণ্ডের অধিকৃত স্থানে সূর্য্যাস্ত হয় না। তিনিই যেন জগতের নিয়তির নেত্রী। এই শতাব্দীতে যে সকল পুণ্যশ্লোক লোকের অভ্যুদয়ে পৃথিবী ধন্য হইয়াছে, তন্মধ্যে গারফিল্ড, বুথ, টলষ্টয়, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, গ্লাডোষ্টোন, বিষমার্ক, ইয়ঙ-সি-কাই, টোগো, নগী এবং কাইসার প্রভৃতিই প্রধান। যদিও প্রজাতন্ত্রশাসন দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় নাই, তবু ইটালী এই শতাব্দীতে স্বাধীন হয়। ফরাসীতে, চীনে, রুষে, তুর্কীতে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী এই শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ড এবং জাপানেও প্রজাতন্ত্র শাসন প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত। এই শতাব্দীতে ভারত সর্ব্ববিধ উন্নতিতে ভূষিত। ভারতবর্ষে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সলার জঙ্গ, স্যর টি মাধব রাও, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ, তিলক প্রভৃতি এই শতাব্দীতেই উদ্ভূত। এই শতাব্দীতেই দাদাভাই নৌরজি অভ্যুদিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। রামমোহন রায় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,—দ্বিতীয় ব্যক্তি কেশবচন্দ্র, তৃতীয় ব্যক্তি বিবেকানন্দ, চতুর্থ ব্যক্তি দাদাভাই নৌরজি। আর সকল মহাত্মা তার পরে বিখ্যাত। নৌরজি ভারতের একালের একমাত্র মন্ত্রদাতা ঋষি, যিনি "স্বরাজ" ঘোষণা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিগত ৩০শে জুন, ৯২ বৎসর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনির অন্ত্যেষ্টিতে ৮০ সহস্র লোক যোগ দান করিয়াছিল। নৌরজির অন্ত্যেষ্টিতে ৭৫ সহস্র লোক যোগ দান করিয়াছিল। এইরূপ দৃশ্য ভারতে আর দেখা যায় নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, নৌরজি এই সময়ের অদ্বিতীয় লোক। এই অদ্বিতীয় লোকের তিরোধানে ভারতে হাহাকার উঠিয়াছে !!

ভিক্টোরিয়ার নীরব সাধনা-পূত হৃদয়দর্পণ-খানি যেন নৌরজি-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে

উচ্ছেদ। ১৮২৮, রামমোহন রায়ের উপাসনা-সভা প্রতিষ্ঠা। ১৮২৯, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৩, ব্রিটিশ কলোনির দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদ ও রামমোহন রায়ের মৃত্যু। ১৮৬২—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদ। ১৮১০, বোরবোঁ, মরিসস, ও জাভা অধিকার। ১৮১২ মিসেস্ ফ্রাই কারাগার সংশোধন করেন। বাইরণের মৃত্যু ১৮২৪। ১৮৩৬—বেলুন প্রথম। ১৮৩৮—কেশবচন্দ্রের জন্ম। ১৮৩৯, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৩, আদি-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৮৪৬, করণ-ল উচ্ছেদ। ১৮৪৮—ফ্রান্সের তৃতীয় বিদ্রোহ। ১৮.৯—১লা জুলাই, রোমের প্রজাতন্ত্র। ১৮৫১ লণ্ডন মেলা, ১৮৫৪ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৫৫—সিবাসটুপোল। ১৮৫৭—রিফরম বিল ও ক্যানেডা অধিকার ও সিপাহী বিদ্রোহ। ১৮৫৮ সোমপ্রকাশ ও মহারাণীর ঘোষণাপত্র। ১৮৬৬ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৭০ শ্রী সুলভসমাচার। ১৮৭২ বঙ্গদর্শন প্রকাশ। ১৮৬৪ এবেসিনিয়ান যুদ্ধ। ১৮৬৯—সুয়েজ ক্যানেল। ১৮৭০---এডুকেশন আইন ও সিদান সমর ও ফরাসীতে প্রজাতন্ত্র শাসন। ১৮৭২খ্রীঃ ম্যাট-সিনির মৃত্যু। ১৮৮০ জুলু যুদ্ধ। ১৮৮১—গ্যার-ফিল্ডের মৃত্যু। ১৮৮২—গ্যারিবল্ডির মৃত্যু। ১৮৭০—কলিকাতা জলের কল. ১৮৪০-৪২-চীন যুদ্ধ। ১৮৫৭--কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সিপাহি বিদ্রোহ। ১৮৩৫---কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও ঢাকা কলেজ। ১৮৩০ জেনেরেল এসেমব্লি কলেজ, ১৮৮১ প্রথম সেন্সস ইত্যাদি ইত্যাদি।

নৌরজির জীবন একীভূত—দেশোন্নতির এমন কোন মহৎ কার্য্য নাই, যাহাতে তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল না। লর্ড স্যালিসবরি এই মহাত্মাকে "কালা আদমী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্বেতকায়দিগের মধ্যেও তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি বড় অধিক খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষকে উন্নতির মঞ্চে তুলিতে তিনি আজীবন কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বিশ্লেষ করিতে পারে, এখন মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে নাই। নৌরজি-হৃদয়-বল, চরিত্র-বল, কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। চরিত্রে ছিল ন্যায়-স্পৃহা, হৃদয়ে ছিল ধর্ম্মানুরাগ, কর্ম্মে ছিল অদম্য উৎসাহ, প্রতিভায় ছিল ভারতের উদ্ধার। তিনি আদর্শ বীর-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। মতে অপরিবর্ত্তিত, সঙ্কল্পে অটল, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, ভয়-ভ্রুকুটীতে অবিচলিত। পতিত ভারতকে উদ্ধার করিতে তিনি না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই। তিনি যৌবনে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই,—সেই যে সঙ্কল্প, তাহা আজীবন অটুট। কোন উপাধির লালসা, ধনের আকাঙ্ক্ষা, তোষামোদের আকর্ষণ তাঁহাকে কখনও কর্ত্তব্য-বিচ্যুত করিতে পারে নাই। অটল ত অটল, প্রতিজ্ঞা ত প্রতিজ্ঞা, যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মহাত্মা হিউম তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, গোখলে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অনুপ্রাণনেই বুঝি বা গান্ধি ও তিলকের অভ্যুদয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের কথা এবং কাজে ঐক্য নাই;—এদেশে অনেক নেতা আছেন, স্বার্থ এবং উপাধি-লালসা যাঁহাদের নিয়ামক। এদেশে অনেক নেতা আছেন, চরিত্রে যাঁহারা স্খলিত,—প্রতিজ্ঞায় যাঁহারা অন-অটল; বাক্যে যাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু কাজে যাঁহারা অনগ্রসর। অনেক লোক আছেন, ভ্রুকুটী ও ভয়ে যাঁহারা জড়সড়, খোসামোদে যাঁহারা আত্মহারা, রজ্জুতে সর্পভ্রমে যাঁহারা লক্ষ্যহারা। তাঁহাদের দ্বারা দেশের কোন উপকার হইতে পারে, আমরা সে বিশ্বাস রাখি না। তবে মধ্যে মধ্যে যে সব মহাপ্রাণ ব্যক্তি ভূভারতের ভার গ্রহণে অগ্রসর হন, তাঁহাদের চরিত্রাভাসই আমাদিগের সকল আশার আশা—তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহাদের চরণ-স্পর্শেই এই দেশ ধন্য হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের পূজ্য, আমরা তাঁহাদের চরণে আবদ্ধ। অথবা নব্যভারতের তাঁহারাই নেতা এবং তাঁহাদেরই নব্যভারত। তাঁহারা ছিলেন, তাই বুঝি বা ভারত শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। চরম উন্নতি কতদূর, আমরা জানি না। কিন্তু ইহা জানি, মহাত্মা নৌরজি যে আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইবার নয়। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, এজগতের কোন সৎবাক্য এবং সৎকার্য্য ব্যর্থ হয় নাই, কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। তাঁহাদের সহিত মিলিয়া এক বাক্যে বলি, নৌরজির সৎবাক্য এবং সৎকার্য্যও ব্যর্থ হইবার নয়। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর তাহা এই পতিত ভারতের প্রাণে প্রাণে উদ্বোধন ও জাগরণ আনয়ন করিবে। শুধু তাহাই নয়, আমরা বিশ্বাস করি, এক নৌরজির নিঃস্বার্থ জীবনাদর্শে শত সহস্র নৌরজির অভ্যুদয় হইবে এবং দেশাত্মবোধের চরম সীমায় এই ভারতকে অগ্রসর করিবে। পুণ্যশ্লোক আদর্শ-নেতা নৌরজি-জীবন ব্যর্থ হইবার নয়,—তাহা কোটী জীবনে অনুপ্রাণিত

ও অনুস্যূত হইবে। বিধাতা মলিন ভারতবর্ষে ইহাই যেন করেন।

শুনিয়াছি, কাহারও কাহারও লক্ষ্য বিশ্বপ্রেম এবং বিশ্বমানব। সীমা হইতে প্রেম-সাধন আরম্ভ না করিলে কেহ বিশ্বপ্রেমের পথে অগ্রসর হইতে পারেন বলিয়া আমরা মনে করি না। তাঁহাদের পরিবার উচ্ছৃঙ্খল, দেশ অরাজক, লোক সকল চরিত্রহীন ঃ—তাহাদিগকে যাঁহারা উদ্ধার করিলেন না, তাঁহারা নাকি জগৎকে উদ্ধার করিবেন! বালকের কুস্বপ্ন আর কি হইতে পারে? যদি প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাক, তবে পরিবার, সমাজ ও দেশ হইতে আরম্ভ কর। পরিবার, সমাজ ও দেশ ডুবিয়া গেলে, কে তোমাকে রক্ষা করিবে? জাগাও দেশকে, জাগাও সমাজকে--দেশের লোককে রক্ষা কর,—উন্নত কর, পরিবারকে চরিত্র-ধর্ম্মে উন্নত কর। তবে ত বুঝি, তোমার সাধনা সার্থক। নচেৎ বৃথা জীবন ধারণ, বৃথাই তোমার স্বপ্ন দর্শন। নিজত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবত্ব অসার কথা। কাজের লোক ছিলেন বিবেকানন্দ,—জগৎ মাতাইয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া দেশকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কাজের লোক ছিলেন ম্যাট্‌সিন, তিনি ইটালীর নরনারীর উদ্ধারের জন্য জীবন বলি দিলেন। আর কাজের লোক ছিলেন, জেনেরেল বুথ, তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া ইংলণ্ডের দারিদ্র্য-সমস্যার পূরণের জন্য দেশেই জীবন বলি দিলেন!! আর কাজের লোক ছিলেন টলষ্টয়,—তিনি রুষিয়ায় জন্মিয়া, রুষিয়ার মজিয়া দেশোদ্ধারের জন্যই প্রাণ ঢালিলেন। তোমরা বিশ্বমানব, বিশ্বমানব কর, কিন্তু কিছুই কাজ করিতে চাও না! হায়রে হায়, কিরূপে দেশোদ্ধার হইবে! নৌরজি এশ্রেণীর কল্পক, জল্পক, বাচক বা আদেষ্টা ছিলেন না, তিনি খাটিতে আসিয়াছিলেন, দেশের জন্য খাটিয়া খাটিয়া দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তোমরা কর কি না কর, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আজীবন শুধু খাটিয়া গিয়াছেন। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, ভ্রমণে উপবেশনে, তিনি শুধু দেশের জন্য খাটিয়া গিয়াছেন। এহেন আদর্শ জীবনকে বাকসর্ব্বস্ব আমরা সম্যক ধারণা করিতে বা সম্যক চিত্র করিতে নিতান্তই অনুপযুক্ত। যিনি দেশোন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বাকসর্ব্বস্ব আমরা কি ব্যক্তি বলিব? তিনি আপনার কাজে আপনি নিত্য-সঞ্জীবিত, তিনি আপনার গুণে নিত্য-সম্পূজিত, তিনি আপনার চরিত্রে চির-অমর। নৌরজি-জীবন অকথিত, অব্যক্ত অলিখিত, অপ্রকাশিত, অনায়ত্ত নীরব জীবন ঃ—গভীরে গভীর, অতলে অতল। তিনি তাঁহাদের যোগ্য, যাঁহারা তাঁহাতে অনুপ্রাণিত। তাঁহার আবির্ভাবে ভারত ধন্য হইয়াছে, পার্সি জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে—সম্রাজ্ঞি ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব সার্থক হইয়াছে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী এই ভারতে অক্ষয় উন্নতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনায়ত্ব নৌরজি জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে সঙ্কলিত হইল ;—

দাদাভাই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ও এলফিনষ্টোন কলেজে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। মেধাবী ছাত্র বলিয়া তিনি প্রশংসাভাজন হন। অতঃপর তিনি এলফিনষ্টোন কলেজে গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে ঐ

পদে কোন ভারতবাসী নিযুক্ত হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি নানাদিকে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতেছিলেন। ছাত্রদের নিমিত্ত সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সভা প্রভৃতি স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি খুব চেষ্টা করিতেন। বোম্বাই-সমিতি, ফ্রামজি ইনষ্টিটিউট, ইরানিফাণ্ড, বিধবা-বিবাহ সমিতি, ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রী তিনি গুজরাটী ভাষায় "রাষ্ট গফ্‌টার" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়া তিনি কামা এণ্ড কোম্পানীর পক্ষ হইতে পার্সিদের প্রতিষ্ঠিত একটী নূতন ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন।

কামা কোম্পানীর অংশীদাররূপে ইংলণ্ডে গমন করিবার অল্পকাল পরেই তিনি তথায় ভারতবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। এই উদ্দেশ্যে পরলোকগত মিঃ ডবলিউ, সি. বোনার্জ্জির সহিত একযোগে প্রথমে "লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী" পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন" প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দ্বিতীয় সভায় ভারতবাসী ও ইউরোপীয় উভয়েরই সভ্য হইবার অধিকার আছে। দাদা ভাই নৌরজি ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা জনসাধারণের গোচর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডের অনেক সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গুজরাটী ভাষার অধ্যাপক ও সিনিটের সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের লণ্ডন-নগরস্থ ব্যবসায় উঠিয়া যায়। কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তিনি অর্থসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন।

বোম্বাই নগরের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ৩০ সহস্র মুদ্রাসহ একখানি অভিনন্দন-পত্র তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। ঐ অর্থের কিয়দংশ একখানি চিত্রের জন্য রাখা হয়। ঐ চিত্র ফ্রামজি কাউয়াসজি ইনষ্টিটিউটে রক্ষিত

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে গমন করিয়া পার্লামেণ্ট-কমিটির সমক্ষে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করেন। ইহার এক বৎসর পরে বরদার গাইকোয়াড় তাঁহাকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান পদ প্রদান করেন। তখন ঐ রাজ্যের সকল বিভাগের কার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ছিল ; তিনি তথায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর লর্ড রে তাঁহাকে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। ১৮৮৫—১৮৮৭ পর্য্যন্ত লাট সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ তিনি কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বৃত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভার সভ্য পদে বৃত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া তিনি বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন এবং তিনি সেণ্ট্রাল ফিন্সবেরি হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী পার্লামেণ্টের সভ্য নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। উক্ত মহাসভায় ভারতবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত তিনি স্যার উইলিয়ম ওয়েডরবরণের সহিত একযোগে ভারতীয় পার্লামেণ্ট-কমিটি গঠন করেন।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর বহু বৎসর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারি কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৮৯৫—ভারত আয়-ব্যয় কমিসন, ১৮৯৭ খ্রীঃ উইলবি কমিসনে সাক্ষ্য দেন। ১৮৮৯ হইতে ব্রিটিস কমিটীর সভ্য। ১৮৯৬ খ্রীঃ তিনি জাতীয়-মহাসমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার জাতীয় মহাসমিতির কলিকাতার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ; কিন্তু অচিরেই চিকিৎসকগণের উপদেশক্রমে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন।

তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম—

নৌরাজি-প্রয়াণ।

(দাদাভাই নৌরজির শোক সভায় পঠিত।)

"স্বরাজের মন্ত্র-ঋষি   কীর্ত্তি সূর্য্য শতাব্দীর
করিলা প্রয়াণ ;—
ভারতের পুণ্যাকাশ   তমাচ্ছন্ন সুনিবিড়
বাষ্পাকুল প্রাণ !
জননীর ম্লান-মুখে   কে আর ফুটাতে হাসি
সুদীর্ঘ জীবন
সুদূর প্রবাসে রহি   প্রকাশিবে ব্যথারাশি
সখেদে এমন !
ভারতে না চিনে যারা   করে স্বার্থে কোলাকুলি
দূর সিন্ধু-পারে,
কর্ম্মবীর কেবা আর   বিজয়ের ধ্বজা তুলি
তা'দের মাঝারে
দাঁড়াবে অটল স্থির   শৃঙ্গ যথা হিমাদ্রির
মুক্ত নভঃতলে !
তুচ্ছ করি আপনার   দুঃখ শোক সুগভীর
বিশ্বজয়ী বলে
সন্তপ্ত জনের আঁখি   কে আর মুছায়ে দিবে
হৃদয় পাতিয়া ?
কর্ত্তব্যে দেবত্বে হেন   কার প্রাণ গড়া ভবে
না পাই ভাবিয়া !
প্রধান ঋত্বিক বেশে   কে দিবে দর্শন আর
মাতৃ-পূজাস্থলে,—
বার্দ্ধক্যে নবীন সম   উৎসাহ উত্তম কার
জাগাবে সকলে ?
গভীর জীমূত-মন্দ্রে   এ দাসত্ব-খিন্ন দেশে
কে আর নির্ভয়ে
"স্বরাজের" মহামন্ত্র   উচ্চারিবে পূজা শেষে
প্রশান্ত হৃদয়ে !
সকলি সমাপ্ত হল !   উঠে তীব্র হাহাকার
জননীর বুকে,—
উৎসবের পীঠভূমি   শ্মশানের পারাবার
নেহরিয়া দুখে !
মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি ওগো !   বরেণ্য দেবতা ওগো !
ওগো মহাপ্রাণ !
ত্রিংশ কোটি বক্ষ-মাঝে   তুমি এসে আজ জাগো
কর দীক্ষা দান।
তোমার মহান্ মন্ত্রে   তোমার মহান্ ব্রতে
তব আকাঙ্ক্ষায়—
আবার প্রাচ্যের রবি   উঠুক্ তমিস্রা-গতে
প্রদীপ্ত প্রভায়।
হে মোর স্বদেশবাসী !   রুদ্ধ কর আঁখি-নীর
এ নহে সময়.
বাক্যের ছটায় শুধু   করিবারে অগভীর
শোক-অভিনয় !
পূত বেদ-মন্ত্র সম   লহ তাঁর মহামন্ত্র
কর তা' সফল,—
যথার্থ সৈনিক সম   রক্ষা কর নেতৃপদ
গৌরব-উজ্জ্বল !
নাহি দ্বিধা শঙ্কা তথা   নাহি তুচ্ছ মৃত্যু-জরা,
শাশ্বত অক্ষয়,
সমুচ্চ "মাভৈ"রবে   কাঁপাইয়ে বসুন্ধরা
গাহে শুধু জয়।
তারপর দেবাশীষে   যখন প্রতিষ্ঠা হবে
"স্বরাজ স্বদেশে।
শোকার্ত্ত সোদর-বৃন্দ !   তখনিগো সুনীরবে
ম্লান দীন বেশে
জাতীয়-পতাকা-মূলে   সকলে দাঁড়াও আসি
ভক্তি-নম্র-শিরে।
পূত অশ্রু-পুষ্পদলে   সুনির্ম্মল অর্ঘ্যরাশি
রচি ধীরে ধীরে,
মহর্ষির উদ্দেশেতে   দিও সবে উপহার
এক মনোপ্রাণে !
কহিও মিলিত-কণ্ঠে   সুযোগ্য সন্তান মার !
তব মন্ত্র-ধ্যানে,
জননীর ম্লান-মুখে   ফিরায়ে এনেছি হাসি
লক্ষ ভাই মিলে—
লহ সৌম ! লহ আজি   সুসার্থক পূজারাশি
শ্রেষ্ঠ যা' অখিলে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সঙ্গণিকা।

(১৩)

ক্রমে ক্রমে শক্ত মাথায় বজ্রপাত হইয়াছে। এরূপ যে হইবে, পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলাম। সকলে পূর্ব্বে সতর্ক হইলে এরূপ হইত কিনা, সন্দেহ। উদাসীনতাই ক্রমে ক্রমে ক্রমে শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিতেছে। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের সময়ে সতর্ক হইলে একটু সংযত-আদেশ বিজ্ঞাপিত হইত। যাহা হউক, এনিবেসেণ্ট প্রভৃতির শিক্ষায় এ দেশের বায়ু শোধিত হইলে পরম আনন্দের কারণ হইবে।

(১৪)

বাঙ্গালী সৈনিকদিগের গৌরবে দেশ আজ পূর্ণ। অধিকার-লাভে বাঙ্গালী আজ আনন্দে মাতোয়ারা। কিন্তু ইহার পরিণাম কি, আমরা জানি না। পরিণামে সি-আই-ডির কার্য্য আরও বাড়িবে নাকি ? একটী কথা—করাচি গমনকালে বাঙ্গালী সৈনিকগণ মদ্যপানে আত্মহারা হইয়া যে ষ্টেসনে-ষ্টেসনে ভূতপ্রেতের অভিনয় করিয়াছে, তাহা সকলে জানেন কি ? সংযম এবং নীতির জাগরণ ভিন্ন এ দেশ জাগিবে কি? এ সম্বন্ধে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির প্রণিধান আহ্বান করিতেছি।

(১৫)

দেশের ছোট ছোট ছেলেরা থিয়েটার করে, রস-রঙ্গ করে, ইহাতে সকলেই আনন্দিত। কিন্তু "রসবতী কউটি যাউসি" প্রভৃতি অশ্লীল গান বালক-মুখে শুনিয়াও যাঁহারা ভ্রূকুঞ্চিত করেন না,তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না ! অশ্লীল গল্পে মেয়েরা ডুবিয়াছে, এখন অশ্লীল গানে ছেলেরা ডুবিলেই দেশ স্বর্গে উঠিবে ! তাঁহারা বলেন, সতর্কতার এখনও সময় আইসে নাই। হায় রে বুদ্ধি !

(১৬)

গবর্ণমেণ্ট সিগারেটের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করিয়া ছেলেদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের দেশের বৃদ্ধদের দৃষ্টান্তে ছেলেদের ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে। তবুও তাঁহারা সতর্ক হন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে কচি কচি ছেলেরাও ধূমপান করে। রেলওয়ে ভ্রমণ এখন, এজন্য, বড়ই অপ্রিয়কর হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মা-বাপের কার্য্য করিলে আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ হইব। গবর্ণমেণ্ট ছেলেদের অন্যান্য দুর্নীতি-পরায়ণতা দূর করিতে অগ্রসর হইবেন কি ?

(১৭)

নীতির চাষ ভিন্ন স্বায়ত্ব-শাসন বল, হোম-রুল-লিগ বল, কিছুতেই দেশের মঙ্গল হইবে না। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডসমূহে এবং মিউনিসিপালিটীসমূহে স্বায়ত্বশাসনে কিরূপ সুফল ফলিতেছে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আর আনন্দিত হইতে পারেন না। নীতিহীনতায় প্রভুপরায়ণতা, ব্যক্তিত্ব, স্বার্থ এবং অহঙ্কার চতুর্দ্দিকে জাগিতেছে ;—নূতন ভাবে নূতন অত্যাচার,অবিচার ও ঘুষ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া দেশকে ছাইয়া ফেলিতেছে। দৃষ্টান্ত দিলে সকলেরই চক্ষু স্থির হইবে। নানা কারণে আজ তাহা হইতে বিরত রহিলাম, প্রয়োজন হইলে পরে তাহা প্রকাশ করিব। নীতিহীনতাই এদেশের সর্ব্বদিকে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল-সাধন করিতেছে। দেশ নীতিহীনতায় ক্রমে ক্রমে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। কে উদ্ধার করিবে ?

(৮)

যাঁহারা সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা ভাল কাজ করিতেছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এ অধিকার দেশের লোকেরা চিরকালের জন্য পাইলে সুখের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন অস্ত্র-আইন এবং প্রেস-আইন উঠিয়া না যাইবে, ততদিন বেশী আশা করা সমীচীন হইবে কিনা, চিন্তার বিষয়। উদ্বুদ্ধ করিবার সময় যাঁহারা অকথ্য ভাষায় সাধারণকে গালাগালি দেন, "তোরা কুকুরের বাচ্চা" ইত্যাদি জঘন্য কথা বলেন, তাঁহারা কিরূপ নেতা, বুঝি না। উপাধির পিপাসা নেতাদের মধ্য হইতে কবে বিদূরিত হইবে? আমরা সকলকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে দেখিলেই সুখী হইব।

(১৯)

এনিবেসেণ্ট প্রভৃতির ঘটনায় "উণ্টা বুঝিলি রাম"—এই কথাটী স্মরণে জাগিতেছে। আইনের পথে চলিলেও লোককে বিপাকে পড়িতে হয়, এ দৃষ্টান্ত এ দেশের সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। অন্ধতা যেন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

(২০)

এ দেশে কে জাগিতেছে? বোধ হয় যেন শুধু অন্ধ-স্তাবকগণই গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন। এটা তাঁহাদেরই সময়। সমাজ এবং দেশকে রসাতলে পাঠাইতে তাঁহারা যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন;—তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু স্তাবকতাই কালে এ দেশে জাগিয়া রহিবে ও তাহারই জয় ঘোষিত হইবে!

(২১)

এবার কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে বেসেণ্টের গোল উঠায় মহাসমিতির অধিবেশন সম্বন্ধে একটু একটু সন্দেহ-মেঘ উঠিতেছে। উপাধি-পিপাসুগণ এবার কি করিবেন, দেখার জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। দেখা যাক্, কি চিত্রের অভিনয় হয়।

(২২)

দুস্থ সাহিত্যসেবিগণের উপকারার্থ কত প্রস্তাব গৃহীতে হইল, কিন্তু কাজ হইল কি? ব্যোমকেশের পরিবারের রক্ষার কি উপায় হইল, জানার জন্য আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি। কত কত মহারথী আছেন, কেহই কি অগ্রসর হইবেন না? হায় ব্যোমকেশ, হায় চণ্ডীচরণ, এদেশ তোমাদের আবির্ভাবের নিতান্তই অযোগ্য ছিল।

অবহেলা।

ওরে মূঢ়! হাত ধরে কে করিবে পার?
দিগন্ত ব্যাপিয়া ওই অনন্ত উদার
ঊর্দ্ধে রাজে সুনীল গগন; নিম্নে তার
বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে কি দিব্য মহান
জলধি খেলেছে খেলা। তুমি চক্ষুষ্মান
তার মাঝে চারি দিকে রুদ্ধ করি দ্বার
রয়েছ দাঁড়ায়ে আজ লয়ে আপনার
সঙ্কীর্ণতা; নিশাপতি উঠিয়া গগনে

কি ক্ষুদ্র মহান কিবা সর্ব্বজীবগণে
সমভাবে আলো তার করে বিতরণ,
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিবা করেনা গণন।
বায়ুবহে, প্রেমভরে করে আলিঙ্গন
পাপী পুণ্যবান কিবা চণ্ডাল ব্রাহ্মণ;
আর তুমি দাঁড়াইয়া সংস্কার-অর্গলে
—দুষিত যে কত যুগ যুগান্তের মলে—
বদ্ধ করি আপনার মুক্ত পথগুলি
ছিদ্র পথে দেখিতেছ চাহি শিরতুলি
আপনার চারিদিকে কলের কম্পনে
বিশ্বের উদার ক্রীড়া; মুগ্ধ ক্ষুব্ধ মনে
চাহ খুলে যাক পথ, ভেঙ্গে যাক দ্বার,
চূর্ণ হোক যুগান্তের কঠিন সংস্কার
নিমেষের মাঝে, লয়ে শুভ্র সরলতা
অনাবিল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুরতা
ছুটে যাক এ বিশ্বের প্রতি ক্ষুদ্র কোণে
প্রেমের প্রবাহ তব, কত সঙ্গোপনে
হৃদয় নিভৃতে যাহা আছে লুকাইয়া
ছড়ায়ে পড়ুক তাহা দিগন্ত ব্যাপিয়া।
ঘুচিয়া গিয়াছে তব ভ্রমের আঁধার,
শৃঙ্খল পড়ুক খসি করিছ চীৎকার,
তব নাহি ভাঙ্গে লাজ ভয়ের বন্ধন
জড়তার ভার যেন চলেনা চরণ।
উদার অন্তর তব বাহু অনুদার
প্রয়োগ কর না তাই শক্তি আপনার
ভেঙ্গেচূরে মনোমত করিতে গঠন
আপন দেশের নব সমাজ বন্ধন।
জাগিয়া রয়েছ শুয়ে অলস শয্যায়
তন্দ্রাতুর, ভ্রান্ত-মতি, স্বপ্নাবিষ্ট প্রায়।
জড়তার ধূলা ঝাড়ি তেয়াগি শয়ন
উঠ তবে, মুক্ত কর মানস আপন
লোক-লজ্জা ভয় হ'তে, যে আকাঙ্ক্ষা জাগি
উঠিয়াছে হৃদে তব আজি তার লাগি
বিদ্যুৎ প্রেরণা তব শিরায় শিরায়
বহে যাক, নৈরাশ্যের শৈবাল মালায়
মথি আজি, তুলে দিয়ে উৎসাহের পাল
নিয়ে যাক যেথা তুমি ঘুচাবে জঞ্জাল
— সমাজের পুঞ্জীকৃত—কলঙ্কের রাশি—
গোপন আশার তব তরীখানি হাসি।
যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, আর যাহা ন্যায়,
বিশ্বের হিতের লাগি মুক্ত প্রাণে তায়
বরণ করিয়া লও। দৌর্ব্বল্য তোমার
বিপুল সাহসভরে ঘুচাও এবার।
তোমরা মানুষ, যদি চাহ আপনার
সম্মান, সম্ভ্রম, শক্তি ন্যায্য অধিকার,
তবে যে মানুষ অই রয়েছে পড়িয়া
তব পদতলে, তারে লহগো টানিয়া
বক্ষে আজি, ধূলি তার দেহগো মুছিয়া
বস্ত্রাঞ্চলে, হীন বলি ফেলনা ঠেলিয়া।
দীক্ষা দেও তারে, দেও শিক্ষা ভালবাসা,
জাগিয়া উঠুক তা'র (ও) প্রাণে নব আশা—
বিশ্বের উন্নতি, শ্রেষ্ঠ সমাজ গঠন,
মনুষ্যত্ব লাভ কিংবা দেবত্ব অর্জ্জণ।
নতুবা তোমার হৃদে শত কল্পনার
অই যে ছুটেছে উৎস, কি সাধ্য তাহার
এ জীবনে করে তব পূর্ণ মনস্কাম
দেখায় মর্ত্ত্যের মাঝে পুণ্য স্বর্গধাম।
ক্ষুদ্র কি মহান সবে হাতে হাতে ধরি
এক সাথে এক প্রাণে সত্য লক্ষ্য করি
তাহারি আলোকে কর জ্ঞান অন্বেষণ,
দেশের মঙ্গল যদি করিবে সাধন।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

নকলে কেরামতী।

কালকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্ত্তি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। উহার কীর্ত্তিমান্ কাণ্ডারীদিগের কীর্ত্তির কথা লিখিতে লিখিতে দেশীয় সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালের বাহুল্যে জনসাধারণের যথেষ্ট অনিষ্ট হয় বলিয়া, উহার কার্য্যকলাপের আলোচনা অরণ্যে রোদন জানিয়াও, একেবারে নিরস্ত থাকা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা বিভাগে যে পুস্তক বিক্রয়ের কারবার চলিতেছে, তথা হইতে সময়ে সময়ে কিরূপ অদ্ভুত পুস্তক বাহির হয়, তৎসম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

গত ১৯১৬ খ্রীঃ-অব্দের শেষ ভাগে Sanskrit Prose Selections অথবা আই-এ-পরীক্ষার্থীদের জন্য নবনির্ব্বাচিত 'সংস্কৃত গদ্য-পাঠ্য" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরে এই নামীয় যে পুস্তকখানি পাঠ্যরূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সঙ্কলন কর্ত্তা কিরূপ ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ঐ পুস্তকের পঠন পাঠনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সম্যক অবগত আছেন। এই জন্য নব-কলেবর প্রাপ্ত এই পুস্তকখানি এবার "Revised edition" "পরিশোধিত সংস্করণ" নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুস্তকখানি পরিশোধিত হইয়াছে, কি সঙ্কলন-কর্ত্তার বিদ্যাবুদ্ধি ইহার সঙ্কলনে পরিশোধিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। আমি পুরাতন পুস্তকখানির সারবত্তার বিষয় সবিশেষ বিদিত থাকায়, এই নূতন পুস্তকখানি হাতে পাইয়া কৌতূহল বশতঃ দশকুমার-চরিত নামক সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থের "কুমারোৎপত্তি" শীর্ষক যে উপাখ্যানটী সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই অংশটী একবার মোটামুটী পড়িয়া দেখিলাম। এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটীর সঙ্কলনে সঙ্কলন-কর্ত্তা কিরূপ মারাত্মক ভ্রম প্রমাদ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবেশ করুন।

(১) ঐ পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "রত্নাকর বেলা মেখলায়িত ধরণী রমণী সৌভাগ্য ভোগ ভাগ্যবান্" এইরূপ পাঠ সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু মূল পুস্তকে এস্থলে "—বেলা মেখলাবলয়িত ধরণী রমণী—" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন "মেখলা বলয়িতধরণী" স্থলে "মেখলায়িত ধরণী" করিলে ব্যাকরণসঙ্গতি, পদসংস্থান, সামঞ্জস্য ও অর্থ-বৈশদ্যের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

(২) ৬২ পৃষ্ঠের ৪র্থ পংক্তিতে "ধীরধীষণাবধীরিত—"এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এস্থলে "ধিষণা" শব্দের "ধ" কারে দীর্ঘ ঈকার আসিল কোথা হইতে? অমরকোষ অভিধানে স্বর্গবর্গের বুদ্ধিপর্য্যায়ে "ধিষণা" ও বৃহস্পতিপর্য্যায়ে "ধিষণ" এই দুইটী শব্দের উল্লেখ আছে। তথাপি গ্রন্থকার এখানে ভীষণাপ্রজ্ঞাপ্রভাবে "ধীষণা" পাঠ করিয়াছেন। সেই ভীষণাপ্রজ্ঞাটী কি, আমরা তাহার একটু সন্ধান পাইতেছি। কলিকাতার কোন পুস্তক প্রকাশকের (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর) পুস্তকে ধীষণা" শব্দটী এইরূপ দীর্ঘ ঈকারযুক্ত মুদ্রিত দেখা যায়। তাহা দেখিয়া

বোধ হয় নকলকারী পণ্ডিত মহাশয় আর বুদ্ধি খরচ করিতে রাজী হন নাই। তিনি কোনরূপে পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে পারিলেই সত্বরে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গের দ্বিতীয়বর্গ অর্থ বা দক্ষিণালাভ করিতে পারেন, তাই তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইয়াছেন।

(৩) ৬৩ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে "—ক্ষোণী সমুদ্ভূতে—" এই "ক্ষৌণী" শব্দের স্থলে "ক্ষোণী" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "ক্ষু—বাহুলকাৎ নিঃবৃদ্ধিশ্চ—" এইরূপ ব্যাকরণের স্পষ্ট অনুশাসন ও "ক্ষো ৗজ্যাকাশ্যপীক্ষিতিঃ" এই প্রত্যক্ষ অভিধান প্রমাণ থাকিতে ঔকার "ও"কার হইল কোন্ নিয়মের বলেঁ? বোধ হয়, বিশ্ববিদ্যায়ের নগদ দুই টাকা মূল্যে সুলভে প্রচারিত—"Anglo Sanskrit Grammar"—জার্ম্মাণ ও শাস্ত্রীপণ্ডিতের সঙ্কীর্ণ বিদ্যাসম্ভূত নবীন ব্যাকরণের প্রভাবে!

(৪) ৬৪ পৃষ্ঠের ৮ম পংক্তিতে "নন্বতাপস!" স্থলে "তনুতাপস!" হইল কিরূপে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রুফরিডারদিগের কর্ম্মবাহুল্য-জনিত দৃষ্টির দোষে না তপস্যা-খিন্ন তাপসের সম্বোধন বলিয়া "ননু "তনু" হইয়া গিয়াছে?

(৫) ৬৫ পৃষ্ঠার ১৮শ পংক্তিতে "—শরনিকর শবলীকৃতাপি—" পাঠ কোন্ দেশীয়? শরাঘাতে গদা খণ্ড খণ্ড না হইয়া রং বদলাইয়াছে নাকি? মূলের "শকল" শব্দ বর্জ্জন করিয়া "শবল" বসিল কোন্ যুক্তিতে?

(৬) ৬৯ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে "বালকেলীঃ" এইরূপ পাঠ আছে। প্রামাণিক অমরকোষে "দ্রবকেলি পরিহাসাঃ" "কেলি" শব্দ পুংলিঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন শব্দ শাস্ত্রে "কেলি" শব্দ দ্বিলিঙ্গ (পুং, স্ত্রীং) বলিয়া উক্ত হইলেও উহা প্রায়শঃ পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত দেখা যায়। যেমন "গোপালবশাৎ কেলীন্"—মুগ্ধবোধ। এইরূপ স্থলে মূল প্রাচীন পুস্তকের "কেলিং" পাঠ বিপর্য্যস্ত করিয়া অপ্রচলিত স্ত্রীলিঙ্গ "কেলি" শব্দের প্রয়োগে এত আগ্রহাতিশর্য্য কেন? বোধ হয় সঙ্কলয়িতা সাংখ্যকার কপিলদেবের ভক্ত, তাই প্রকৃতির এত পক্ষপাতী।

(৭) ৭৮ পৃষ্ঠের ৮ম পংক্তিতে "মন্না শোচ্যতে" পাঠ দৃষ্ট হয়। শুচ্ ধাতু ভাববাচ্যে "শুচ্যতে" পদই হয়। "শোচ্যতে" এই অদ্ভুত পদ হইবার কোন উপযুক্ত হেতু দেখা যায় না। রূপকথায় মৃত পণ্ডিত পুরোহিতের মূর্খ পুত্র নূতন পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া পৈতৃক জীর্ণ পুথির "সূত্র" স্থানে "মূত্র" পাঠ করিয়া যজমানের পিতার শ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপার মহিমায় আজ এতাদৃশ প্রবাদও বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। কবি গুরু বাল্মীকি যথার্থই লিখিয়াছেন "জীবদ্ভিঃ কিংন দৃশ্যতে" ইতি।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বৈরাগ্য শতকম্।

যাঁহার প্রকাশ শুধু অনুভবে হয়,
দিক্‌কালে নাহি হয় বিভাগ যাঁহার,
অনন্ত, চিন্ময় যিনি শুদ্ধ তেজোময়,
শান্তমূর্ত্তি ব্রহ্মে সেই করি নমস্কার। ১।
মাৎসর্য্যে আচ্ছন্ন হায় সুপণ্ডিতগণ,

গরব-পূরিত সদা ধনাঢ্যনিকর,
অবোধে নিমগ্ন রহে যত মূঢ় জন,
সুকাব্যের তাই দেখি না হয় আদর। ২।
সংসারের গতি আমি না দেখি মঙ্গল,
সুকর্ম্মেরও পরিণাম দেখি' হয় ভস্ম,
পুণ্যবলে সমর্দ্ধিত বিষয় সকল
অবশেষে দুঃখরূপে পরিণত হয়।
চিরদিন তরে রহি' বিষয়-মোহিত
হায়রে মানব হয় ব্যসন-পীড়িত। ৩।
করেছি ভ্রমণ হু হু দুরগম স্থানে,
লভি নাই আজিও তো কিছুমাত্র ফল,—
সেবিনু ধনিরে, ত্যজি' জাতি কুলমানে
হায়রে সে সব মোর হয়েছে বিফল!
ভোজন করেছি, মান করি পরিহার,
পরগৃহে, আশঙ্কিত বায়সের প্রায়,—
—ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ লালসে আমার,
আজিও সন্তুষ্ট নহ, বাড়' পুনরায়? ৪।
নিধিলোভে ক্ষিতিতল করেছি খনন,
অনলে করিনু দগ্ধ গিরিধাতু চয়ে,
নদীপতি উত্তরিয়া করেছি গমন,
যতনে তুষিনু আমি নৃপ সমুদয়ে।
কত নিশা শ্মশানেতে করেছি যাপন
হইয়া তৎপর আমি মন্ত্র-আরাধনে;—
কাণা কড়ি মাত্র লাভ না হল কখন—
হে লালসে, মোরে ত্যাগ করহ এক্ষণে।৫।
হৃদি হতে উঠে বাষ্প;—চাপিয়া তা'সবে
কত হাসি হাসিয়াছি হায় শূন্যমনে,
কুবাক্য খলের কত সহেছি নীরবে
যোড়করে তা'সবায় ভুলায়েছি মনে।
মিছা আশা, আশা তব, বলিগো তোমায়
আর কেন বৃথা তুমি নাচাও আমায়? ৬।
ভোগ নাহি ভুঞ্জিলাম কখন জীবনে
মোসবারে ভোগ দেখ করিলা সকলে,—
তপ নাহি অন্ত হল কখন যতনে
মোরা শুধু অন্ত হ'নু সংসার-অনলে।—
আমরাই যাই দেখ কাল নাহি যায়
তৃষ্ণা জীর্ণ নহে, জীর্ণ মোরা শুধু হায়।৭।
অঙ্কিত পলিতে এবে শির মম হায়,
বলিতে আক্রান্ত হল বদনমণ্ডল,
শিথিল হয়েছে দেখ অঙ্গসমুদায়
তরুণ হতেছে মম লালসা কেবল। ৮।
ভিক্ষাতে অর্জ্জন করি নীরস আহার
দিনান্তে বারেকমাত্র করি তা' ভোজন,
নিজ দেহ মাত্র এবে মম পরিবার,
নিদ্রাগমে করি আমি ভূতলে শয়ন।
জীর্ণ শত খণ্ডে ম্লান কন্থা নিরমিয়া
কোনরূপে করি আমি লজ্জা নিবারণ,—
হায়রে এমন দশা-মাঝারে থাকিয়া
নারিনু বাসনাকুল করিতে নিধন। ৯।
দাহপীড়া না জানিয়া,—দীপ্তহুতাশন
দেখি' ধায় তার মাঝে পতঙ্গ মোহিত;
না জানিয়া মীন হায় করয়ে ভক্ষণ
সুতীক্ষ্ণ বড়িশে—মাংস-খণ্ড-আচ্ছাদিত।
মোহের মহিমা কিবা! বিপদ-জড়িত
জানিয়াও রহি' মোরা কামেতে মোহিত।১০
অট্টালিকা, উপবন কিম্বা মহীধর,
তরঙ্গিণী সমুদায় কিম্বা সে সাগর!—
অণুমাত্র অবশিষ্ট রহিবে সবার
জীবন-বুদ্বুদ-কথা কি জানাব আর?

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

জননী।

১

স্বর্গের অমৃত খনি করিয়া নিঃশেষ,
সব সুধা বুকে পুরে, কে তুমি দেবতা
প্রতিপদ সঞ্চালনে ছড়াইয়ে স্নেহে,
শান্তি প্রীতি সুখ তৃপ্তি লয়ে এলে হেথা?

২

তোমার জ্যোতিতে দীপ্ত অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি,
বিষাদ তমসাচ্ছন্ন সন্তানের প্রাণ।
বল দেবি কোথা পেলে সুধাতে মাথানো
পরাণ জুড়ানো হেন মধুর মা-নাম?

৩

সুষমা লাবণ্যে গড়া তোমার প্রতিমা.
অমিয়া উছলে পড়ে প্রতি বর্ণে বর্ণে;
এ নহে শোণিত, হের সুধার ঝরণা
প্রবাহিত ধমনীতে বাঁচাতে সন্তানে।

৪

বিশ্বজননীর ছায়া তব মূরতিতে
অবাক্ হইয়া তাই ভাবি আচম্বিতে
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কে তুমি জননী?
মহান্ আদর্শ হয়ে এসেছ জগতে?

৫

জীবন বিপন্ন করি দিয়েছ জনম্,
ভুলিয়া স্বাচ্ছন্দ্য সুখ পালিছ সন্তানে;
নিদ্রাহার দূরে যায় রোগ হলে তার,
সাধিছ কঠোর ব্রত কল্যাণ-সাধনে।

৬

সন্তান আযোগ্য দীন যতই না হোক্
মাতৃস্নেহ সদা রাখ ঘিরিয়া তাহায়।
অনন্ত প্রসার ওই উদার হৃদয়ে
মধু, স্নেহ, গুণগ্রাম অনন্ত অক্ষয়।

৭

এত শ্রেষ্ঠ, সুমধুর পবিত্র এমন
তব স্নেহ-বিনিময়ে চরণে রাখিতে
কি ছার জাহ্নবী-বারি, মন্দার কুসুম
কি আছে কহগো দেবী এ মর জগতে?

৮

জননীর ভালবাসা—তার প্রতিদান
কে কবে পেরেছে দিতে? বৃথাই সাধনা।
তবু যেন যুগে যুগে জননী তোমারে
ভক্তি-পুষ্প-অর্ঘ্যদানে করিগো অর্চ্চনা।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

মেঘের প্রতি।

১

মেঘ, তুই নিত্যি কোথায় যাস্!
তুই নিত্যি কোথায় যাস?
আমরা শুনি লোকের কাছে,
যে দেশেতে পাহাড় আছে
সে দেশে চন্দনের গাছে
চন্দনের রস খাস্!
মেঘ, তুই নিত্যি কোথায় যাস্?

২

ভর করি ধীর পবনে
চন্দনের বনে বনে
সুধা রস অন্বেষণে—
আনন্দে বেড়াস!
মেঘ তুই নিত্যি কোথায় যাস!

৩

আমরা নিতি আকুল প্রাণে
চেয়ে থাকি আকাশ পানে,
নিত্যি ভাবি সলিল দানে
বাড়াবি উল্লাস!
মেঘ তুই নিত্যি কোথায় যাস্?

৪

আমরা ক্ষেতি, আমরা চাষি,
আমরা কৃষি, আমরা ঘাসি,
লাঙ্গল ছেড়ে বসে আছি
বাড়ছে হা হুতাশ।
মেঘ তুই নিত্যি কোথায় যাস?

৫

ধরায় উঠেছে আগুন লেগে,
পাই না যে জল আমরা মেঘে,
ভেবে মরি রাত্রি জেগে
শুষ্ক মাটী ঘাস!
মেঘ তুই নিত্যি কোথায় যাস্?

৬

পরের দুঃখে কাঁদে না প্রাণ.
হায়রে তুই এমনি পাষাণ.
হেসে হেসে চলিস ভেসে
কত যে উল্লাস !
মেঘ, তুই নিত্যি কোথায় যাস্ !

৭

নিত্যি বিকাল সন্ধ্যা-বেলা
(করিস্) চন্দ্রনেতে প্রেমের খেলা,
বারেক কিরে ? চাস্‌না ফিরে
বিশ্ব হলো নাশ !
মেঘ তুই নিত্যি কোথায় যাস্ ?

৮

দেনা সলিল বিন্দু বিন্দু,
মিল্‌লে বিন্দু হবে সিন্ধু,
চেয়ে আছি আমরা কিন্তু
তোরেই করি আশ !
মেঘ, তুই নিত্যি কোথায় যাস্ ?

৯

মেঘ, তুই নিত্যি কোথায় যাস্ ?
পেলে তোর বিমল ধারা,
ভরবে রসে বসুন্ধরা,
লাঙ্গল ধরে নাম্‌বো ক্ষেতে
করবো সুখে চাস।
শ্যামল শস্য উঠ্‌বে হাসি,
আমরা ক্ষেতি আমরা চাষি,
থাকবো মহানন্দে ভাসি
সবাই বারমাস।
মেঘ, তুই নিত্যি কোথায় যাস্ ?

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

ভালবাসার বন্ধন।

সুমধুর ভালবাসা বেদনা বন্ধনে
বদ্ধ মম হিয়াখানি চিত্ত-রাণী কাছে।
যাতনা-জড়িত এ যে কি অপূর্ব্ব সুখ
ভাগ্যবানে এ বন্ধনে সদা বাঁধা আছে।
কত সুখ দুঃখ এতে যাতনা সান্ত্বনা
দিনে রেতে শতবার মরণ বাঁচন,
কি যে শান্তি এর মাঝে কত যে বেদনা,
এযে হাসি রাশী মাখা প্রাণের কাঁদন।
এ বন্ধন কত সুখ কত প্রীতিভরা—
এরি লাগি ঘুরে মরে চন্দ্র-সূর্য্য-তারা।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুবা ও বৃদ্ধ।

যুবা গর্ব্বে কহে বৃদ্ধে ধরাপানে চাহি.
"মানবই বিধাতা বিশ্বে আর কেহ নাহি।
যাহা কিছু হেরি মোরা দুই চক্ষু দিয়া,
মানব সকলি শাসে বীর্য্য প্রকাশিয়া।"
হসিত আননে বৃদ্ধ শূন্যে চাহি কহে.
"ও রাজ্য কে শাসে ? যুবা নতশির রহে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

ব্যর্থ অনুতাপ।

প্রার্থনা বিলাপ অনুতাপ আর
অভ্যাস নিমিত্ত আসে বার বার ;
জীবন উঠে না ফুটিয়া সুন্দর,
আঘ্রাণ ছুটে না দিগ্‌দিগন্তর,
বৈরাগ্য মাঝারে আসে বিলাসিতা,
দেবতা পূজিতে পূজি যে কবিতা ,
তোমারে ভাবিতে ভাবি আপনারে,
নির্গুণে সগুণ চাহি ধরিবারে ;
অপ্রতিমে দেই প্রতিমা অশেষ,
অব্যক্তেরে ব্যক্ত করিছি বিশেষ,
মনোগম্য নহ, মনোগত ভাবি,
নানাছন্দে আমি করি কত দাবি ;
তুমি যবে চাহ স্নেহ কৃপা ভরে,
আনন্দ তখনি উপজে অন্তরে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শ্রীরাধাতত্ত্ব।

স্ত্রী পুরুষ লইয়া সংসার। প্রকৃতি পুরুষ লইয়া বিশ্ব-চরাচর। প্রকৃতি জগতের প্রসূতি। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" মায়াই প্রকৃতি। আমি বহু হইব, ব্রহ্মের এই ইচ্ছার নামই মায়া। এই সৃজনেচ্ছা শুদ্ধ-সত্বাত্মিকা মায়া। প্রকৃতি সত্বরজস্তমোময়ী ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতি ব্রহ্মাশ্রিতা ব্রহ্ম-চৈতন্যে চৈতন্যময়ী, পরমাত্ম-শক্তিতে শক্তিময়ী। ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কিন্তু ভিন্নবৎ প্রতীতা। ব্রহ্মই কারণ, শক্তি—কারণ ও কার্য্যের মধ্যবর্ত্তিনী সূক্ষ্ম কার্য্য। জগৎ কার্য্য। অগ্নি ও যে, দাহিকাশক্তিও সে। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নির কল্পনা করা যায় না। অগ্নি ছাড়িয়া দাহিকা শক্তির অস্তিত্বই নাই। শক্তিমানেরই শক্তি, তথাপি শক্তির বিকাশ ভিন্ন, রূপ ভিন্ন, কার্য্য ভিন্ন।

শুদ্ধ সত্বাত্মিকা প্রকৃতি "অব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা" আমাদের উপাস্যা মহাদেবী। ব্যষ্টিরূপে অবশ্য উপাস্যা নন, মহাদেবী আখ্যাই তখন হয় নাই। "বিদ্যাসি যা ভগবতী"। পুরুষ পিতৃস্থানীয়, প্রকৃতি মাতৃস্থানীয়া। ভগবানই বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং"

এই অব্যাকৃতা নামরূপে অপ্রকাশিতা প্রকৃতিই মহামায়া, ব্রহ্মশক্তি পরমাবিদ্যা। চিন্ময়ী অথচ সাকারা, অশরীরিণী অথচ মূর্ত্তিমতী, বিশ্বাত্মিকা অথচ বিশ্বাশ্রয়া। চিত্তের আখ্যা হইয়াও ইনি হৃদয়ের বস্তু, সাধনার লভ্য। "হরি হরাদিভিরপি অপারা" হইয়া ইনি আবার ভক্তানুকম্পিনী।

একই আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব। উপাধির ভেদ মাত্র। একই সিসৃক্ষা মহামায়া, মায়া, অবিদ্যা। ঈশ্বর ও জীব, মহামায়া ও মায়া পরমার্থতঃ এক, কিন্তু ব্যবহারতঃ ভিন্ন। আমাদের আরাধ্যা যে ঠিক প্রকৃতি বা মায়া, তাহা নহে। জড় প্রকৃতির আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিমতী মায়ার উপাসনাই যে আমরা করি, তাহা নহে।

মায়া বা ব্রহ্মশক্তিকে সাধকেরাই যে কেবল মূর্ত্তি দিয়া সাকারা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা চৈতন্যময়ী করিয়াছেন, ইহা বলিলে সেই মহাশক্তি বা সেই মহামায়ার অবমাননা করা হয়। তিনি আপনার ইচ্ছায় সাকারা, লীলার্থ অবতীর্ণা, ভক্তজন-উদ্ধারার্থ মূর্ত্তিমতী।

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভামনাযুমাং হৈমবতীং" কেনোপনিষদে ব্রহ্মশক্তি বহু শোভমানা হৈমবতী উমারূপে ইন্দ্র সকাশে আবির্ভূতা হন। ইন্দ্রের উপচীয়মান আসুরভাবকে বিনষ্ট করিয়া বিলীন-প্রায় দেবভাব ফুটাইয়া দিয়া গেলেন। কৈবল্যে শ্রুতি ও ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে এই সাকারা প্রকৃতির এই মূর্ত্তিমতী মাতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আমাদের আরাধ্যা ঐ সাকারা মূর্ত্তি প্রকৃতি। সসীম পরিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির আয়ত্তে আইসে না বলিয়া যেমন আমরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করি না; তদ্রূপ আমরা নিরাকারা ব্রহ্মশক্তিকে ছাড়িয়া মূর্ত্ত প্রকৃতির আরাধনা করিয়া থাকি। সগুণ সাকার পরমেশ্বর যখন অধর্ম্মের বিনাশ, ধর্ম্মের রক্ষা, জগজ্জনের কল্যাণ বিধান, ভক্ত-

গণের অভিলাষ পূরণের জন্য অবতাররূপে ধরায় আসেন, তখন তিনি আমাদের নিকট অধিক অন্তরঙ্গ হন। তখন তিনি যেন আপনার ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করিয়া মানবত্বের সাজে আমাদের মধ্যে ধরা দেন।

অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী বৈদান্তিক মতে মায়াই মহামায়া দুর্গাকালী লক্ষ্মী রাধা ইত্যাদিরূপে উপাস্যা। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এরূপভাবে বুঝেন নাই। তাঁহারা মায়াই দুর্গাকালী, মায়াই লক্ষ্মী শ্রীরাধা, ইহা শ্রবণ করাই অপরাধ বলিয়া মনে করেন। যাউক —তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

বৈষ্ণব দার্শনিক মত।

ব্রহ্ম সগুণ, সাকার ও সচ্চিদানন্দময়। এই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানই আরাধ্য। সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাই তিনি সৎ; জ্ঞানাশ্রয়, অনন্তমঙ্গলের আকর, তাই তিনি চিৎ; তিনি আনন্দময়, তাই তিনি আনন্দ।

যে শক্তি তাঁরই স্বরূপ, তাহারই নাম স্বরূপশক্তি। স্বরূপ শক্তিতে তিনি সদ্রূপ, চিদ্রূপ ও আনন্দরূপ। সন্ধিনীশক্তিতে তিনি সদ্রূপ, সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তিতে তিনি চিদ্রূপ, হ্লাদিনী শক্তিতে তিনি আনন্দরূপ। অগ্নির দাহিকাশক্তিই অগ্নির স্বরূপ শক্তি। দাহিকা-শক্তি অগ্নি ছাড়িয়া থাকে না, অগ্নিও দাহিকা শক্তি ছাড়া থাকিতে পারে না, তাই দাহিকা স্বরূপশক্তি। যাহা যাহা ছাড়িয়া থাকে না, যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে বর্ত্তমান রহে, তাহাই তাহার স্বরূপ। স্বরূপশক্তি ব্যতীত দুইটী শক্তি, যথা তটস্থশক্তি ও বহিরঙ্গ শক্তি।

মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গশক্তি। ত্রিগুণাত্মিকা স্বভাবতঃ জড় প্রকৃতিও ঐ বহিরঙ্গশক্তি। ইহা সতী হউক, অসতী হউক, সদসদ্বর্জ্জিতাই হউক,বা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিমতীই হউক, কোন আপত্তি নাই। এই বহিরঙ্গশক্তি মায়ার উপাসনা আমরা করি না, এ ত্রিগুণা জড় প্রকৃতির পূজাও আমরা করি না। আমাদের দুর্গাকালী লক্ষ্মী শ্রীরাধা এ মায়া নহে বা প্রকৃতি নহে।

যে মায়া সংসার-বন্ধনের কারণ, প্রকৃত জ্ঞানের আবরক, জীব জগতের ভ্রান্তির নিদান—তাহা আমাদের জগজ্জননী নয়। যাহার উচ্ছেদেই মুক্তি, যাহার জন্য আমরা বদ্ধ, শ্রীভগবান্ হইতে দূরে থাকি, তাহা মুক্তিবিধাত্রী হইতে পারে না। স্বভাবতঃ জড়া "গুণাম্বোতী" গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু অনিত্যা, আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিময়ী মায়া কখন ভক্ত-মনোদ্ধার কারিণী দয়াবতী ভক্তবৎসলা মাতৃমূর্ত্তি নন।

এই মায়া বা বহিরঙ্গশক্তি শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু তাহা ভগবান্ হইতে দূরে দূরে থাকে। মায়া ছায়ার সহিত উপমিতা। শ্রীভগবান্ আলোক স্থানীয়। সূর্য্যদেব যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দেন, তখন ছায়া কত দীর্ঘ থাকে। আবার সূর্য্যদেব যখন নিকটে মাথার উপর আসেন, তখন ছায়া পায়ের তলে লুকাইবার চেষ্টা করে। সূর্য্যদেবের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও, ছায়া পশ্চাতে সরিয়া যাইবে, সূর্য্যদেবকে পশ্চাতে রাখিয়া মুখ ফিরাও, ছায়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। মায়াও ছায়ার মতই ঠিক এইরূপ। শ্রীভগবান্ যতদূরে থাকেন, মায়া ততই আত্মবিস্তার করে, শ্রীভগবান্ যত নিকটে আসেন, মায়াও ততই বশীভূত হইয়া পড়ে, ততই দমিত হইয়া পদতলে

আশ্রয় লাভ করে। শ্রীভগবানকে পশ্চাতে রাখ, অমনই মায়া সম্মুখে আসিবে। শ্রীভগবানকে সম্মুখে আন, মায়া পশ্চাতে লুকাইবে। মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গশক্তি, বাহিরে বাহিরে দূরে দূরেই থাকে, অথচ শ্রীভগবানকে আশ্রয় না করিয়া ইহা প্রকাশ পায় না।

বৈষ্ণব দার্শনিকদের কথা গুলি ভাল। তবে আমরা "একই মায়া মহামায়া আবার অবিদ্যা "এই মতটী শুনিলে অপরাধ মনে করি না। দুইটী পথে দুইজনার গতি। আচার্য্য শঙ্করের মতই শ্রুতির মত, উপনিষদের সিদ্ধান্তও পুরাণাদি দ্বারা স্বীকৃত, এ বিশ্বাস আমরা করি। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী সংসার-বন্ধন-হেতুভূতা মায়াই আবার আমাদের উপাস্যা মহাদেবী—ইহাতে পরস্পর বিরুদ্ধতা কিছু নাই। একই আত্মা যদি পরমেশ্বর আবার বদ্ধ জীব হইতে পারে, একই জীব যদি দেবতা আবার অসুর হইতে পারে, একই ভগবান্ যদি সৃষ্টির কর্ত্তা আবার ধ্বংসেরও কর্ত্তা হইতে পারেন, তবে একই মায়া, মহামায়া ও অবিদ্যা হইবেন, আশ্চর্য্য কি? যে ভগবান্ কাহাকে কোলে টানেন, আবার কাহাকে দণ্ড দেন, এ যদি হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত কথাটীতে সংশয়ের কি আছে? উপাধিভেদে আত্মা ঈশ্বর, জীব, উপাধিভেদে জীব বদ্ধ, মুক্ত; আকারভেদে ঈশ্বর সৃষ্টি ও ধ্বংসের কর্ত্তা। শুদ্ধ সত্বাত্মিকা মায়া মহামায়া, অব্যাকৃতা পরমা প্রকৃতি মহাদেবী —ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে স্পষ্টীকৃত। একই মায়া সংসার-বন্ধন-হেতুভূতা, আবার মুক্তি-বিধাত্রী।

কোথাও "অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিঃ" কোথাও মুক্তিহেতু, বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বাত্মিকা বলিয়া স্তুত হইয়াছেন,কোথাও বা সংসারবন্ধন-হেতুভূতা মহামোহামহাসুরী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কোথাও শ্রী, কোথাও অলক্ষ্মী, কোথাও বিদ্যা, কোথাও অবিদ্যা।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা॥
সেষা প্রসন্না বরদা নৃণা. ভবতি মুক্তয়ে॥

আবার

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।

৪র্থ অধ্যায়, ৫৮ শ্লোক।

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥

ত্রিগুণা প্রকৃতিই যে মহামায়া, তাহাও শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে। (৪র্থ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক।

ইহাই এই বৈষ্ণবীশক্তি, এই অনন্তবীর্য্যা, বিশ্বের বীজ ও উপাদান কারণ। ইহার প্রসন্নতাই মুক্তি, ইহাঁর ভ্রুকুটিই বিনাশ। পরমামায়া ইনিই।

যা বৈষ্ণবীশক্তিরনন্ত বীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
বিদ্যাসুশাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
স্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতি মোহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বং॥

কৃষ্ণ অপেক্ষা বুঝি শ্রীরাধা বড়। কৃষ্ণকে রাধার ভাবেই পাওয়া যায়। উপাসক হইতে না পারিলে উপাস্য মিলে না, কাজেই বড় রকমের উপাসক বলিয়া রাধা বড়। "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া কৃষ্ণই নিজে শ্রীরাধার মান বাড়াইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাধা নহে। কেন? সন্তান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? সন্তানের কাছে পিতা অপেক্ষা মাতাই বড়। পিতামাতার মধ্যে মাতাই অগ্রে প্রণম্যা। রাধার মত উপাসিকা লাভ করাও শ্রীভগবানের বড় সাধ।

রাধাকৃষ্ণেতি গৌরীশেত্যেচ শব্দঃ শ্রুতৌশ্রুতঃ।
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ॥

"বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা ব্রহ্মবিদ্যা" "শশি-

মৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা গৌরী," "কৈটভারি হৃদয়ৈককাধিবাসা শ্রী" একই মহাশক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র।

আমাদের হৃদয়সিংহাসনে রাজা কৃষ্ণই স্বর্গেরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত চিরানন্দময় গোলোকের অধীশ্বর। শ্রীরাধা গোলোকবিহারী কৃষ্ণের বামে সর্ব্বদা আসীনা। বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাত্রীরূপা সকলৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীরাধা তথায় সখীগণ সহ রাজ্ঞীর মত অবস্থিতা।

মায়াতীত নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যের দুইটী অংশ, কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। পুরুষ দক্ষিণাঙ্গ, রমণী বামাঙ্গ, দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ, বামাঙ্গ রাধা।

সাধুগণের রক্ষা, দুষ্কৃতগণের বিনাশ, ধর্ম্মের সংস্থাপন আর ভক্তজনের যুগযুগান্তরব্যাপিনী আকাঙ্ক্ষার পূরণ উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব। শ্রীভগবান জীবমঙ্গলার্থ লীলাদেহ ধারণ করিলেন, বেশ, শ্রীরাধা কেন মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইলেন?

উত্তরে আমরা বলি যে, শ্রীরাধা না জন্মিলে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের বড় রকমের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। রাধাই উপাসিকার আদর্শ, শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদের যথার্থ অধিকারিণী। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাই শ্রীরাধার ইচ্ছা। কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিকা শ্রীরাধার মত আর কে আছে? ব্রহ্মশক্তি যেভাবে ব্রহ্মাশ্রিতা, অন্য কিছুই সেভাবে ব্রহ্মাশ্রিতা হইতে পারে কি? পরমেশ্বরীর মত পরমেশ্বর-নিষ্ঠা আর কে হইবে? শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদে যে কি সুখ, কৃষ্ণপ্রেমে যে কি আনন্দরস, বিরহে যে কি তন্ময়ভাব, তাহা রাধা ব্যতীত আর অনুভব করে কে? কিরূপ ভাবে শ্রীভগবানে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে, কত বড় বাধাবিপত্তি ঠেলিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ছুটিতে হইবে, আপনার স্বাতন্ত্র্য, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার সর্ব্বস্ব কি ভাবে কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিতে হইবে, লজ্জাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপ সর্ব্বত্যাগিনী হইতে হইবে, তাহার আদর্শ থাকা চাইই। রাত্রিদিন "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া অতৃপ্ত আত্মার আকুলতা ব্যতীত গোলোকের ঠাকুর ধরা দেন না। ভগবানের জন্য কেমন করিয়া কাঁদিতে হয়, তাহা মর্ত্ত্যের বিষয়মুগ্ধ মানব কি বুঝিবে? "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম" সেই কামের সেবক নরনারী কৃষ্ণপ্রেম কি বোঝে? শ্রীরাধার ভাব, শ্রীরাধার প্রেম, কিঞ্চিৎমাত্র যদি উপলব্ধি হয়, তাহাতেই নরনারীর কল্যাণ। বিরহে কি তন্ময়তা, মিলনে কি নিবিড় রসানুভূতি, তাহা কৃষ্ণহৃদিস্থলবিহারিণী শ্রীরাধাই জানেন। সর্ব্বভাববিলোপকর অলৌকিক আকর্ষণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছারূপ অহেতুক প্রেম, রসভাবের স্ফুরণ ও পরিণতি কাহাতে দেখা যাইবে? কৃষ্ণকে বাহু-আলিঙ্গনে বাঁধিয়াও "মধুসূদন (ভ্রমর) চলিয়া গিয়াছে" এই শব্দ মাত্র শুনিয়া যাঁহার কোথা কৃষ্ণ বলিয়া মূর্চ্ছা সম্ভব, তমাল-পত্রচ্ছবি ও আকাশে মেঘমালা দেখিয়া "এই যে আমার কৃষ্ণ" বলিয়া আত্মহারা ভাব যাঁহার স্বাভাবিক—সে-ই শ্রীরাধার মিলন, বিরহ, রসভাব, ভক্তিপ্রেম, সবই অলৌকিক।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে শ্রীরাধাকে অবতীর্ণ হইতে হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে—

(উত্তর) শ্রীভগবৎলীলার আস্বাদের শ্রীরাধাই যোগ্য পাত্রী। কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিবেন শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণ কেবল আস্বাদিত হইবেন। যিনি এই লীলারসের আস্বা-

দন করিবেন, আস্বাদনোপযোগী উপাদানের পূর্ণতা তাহার হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোক যুবতী না হইলে প্রেম কি পদার্থ, তাহা বোঝে না; মিলনে কি সুখ, বিরহে কি তন্ময়তা, আর তজ্জন্যই বা কি আনন্দ, তাহা অনুভবেই আইসে না। শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদিত হইবেন, আস্বাদনোপযোগী উপাদানের পূর্ণতার কৃষ্ণের পক্ষে কোন প্রয়োজন নাই; মিলনে সুখী, বিরহে তন্ময়তা না বুঝিলেও কোন ক্ষতি নাই। কৃষ্ণের পলায়নের মধ্যে শ্রীরাধা দেখিতেন—যেন কতকটা শৈশবসুলভ কৌতূহল, রসিকতা, দুষ্টামী ও চপলতা। বাস্তবিক বয়স অল্প বলিয়া কৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে পলায়ন মানাইতও বেশ। নহিলে শ্রীরাধাও পলায়নের মধ্যে নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পাইতেন। ফলে অভিমানের ও ক্রোধের আঘাতে তাহার হৃদয় কালুষ্যে পূর্ণ, ব্যর্থতায়, অবমাননায় ভাঙ্গিয়া পড়িত। যুবকযুবতীর এই রাসলীলা, এই দোলঝুলন প্রভৃতি ক্রীড়া লোকচক্ষুতে কামুককামুকীর মিলনের নামান্তর বলিয়াই লোকে বুঝিত, কুশিক্ষাও পাইত। ছয় কি আট বৎসরের বালক কৈশোররূপ কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা ও গোপিকাগণের মিলনে দৈহিক ভোগাকাঙ্ক্ষা বা মলিন কামস্পৃহা ছিল না। যিনি অভক্ত, নিম্নের পদবীতে দণ্ডায়মান, তিনি এই মিলনের মধ্যে কামের গন্ধ দেখিতে পান দেখুন, তাহাতে ভক্তের রসসম্ভোগের বাধা নাই। রাধা ও গোপীদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই ছিল না, তবে এই সকল ব্যাপারকে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বলিয়া ধারণা করা সমীচীন নহে।

শ্রীরাধার ভাব বড় মধুর। উপাস্য আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে, সেই উপাস্যকে সমীপে আনিতে হইবে, হৃদয়ে বসাইতে হইবে, উপাস্যের ভাবে অন্তরটীকে ভাবময় করিয়া তুলিতে হইবে। উপাসক অগ্রে হওয়া চাই, তবে ত উপাস্যলাভ হইবে। উপাসক ভক্ত মহাজনগণ এইজন্য সাধারণের কাছে দেবতার পূজা প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান আপনার ভক্ত অপেক্ষা আপনার ভক্তের ভক্তকে অধিক ভালবাসেন। ভক্তের ভক্তই ভক্ততম। কান্তাভাবে আর দাস্যভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা প্রধানতঃ প্রচলিত। শ্রীরাধা কান্তাভাবের, গরুড় দাস্যভাবের আদর্শ। এই প্রকার রামচন্দ্রের সীতা কান্তাভাবের, হনুমান দাস্যভাবের, মহাদেবের গৌরী কান্তাভাবের, নন্দী দাস্যভাবের আদর্শ।

দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও কান্তাভাব প্রভৃতির মধ্যে কান্তাভাবই অধিক মধুর। দাস্যভাবে প্রভু পরমেশ্বর—কাজেই একটু সঙ্কোচ ভয়, লজ্জাপ্রভৃতিও থাকে। সখ্যভাবে সমান সমানভাব বটে, কিন্তু কান্তাভাবের মত এমন মেলামেশা, এমন অন্তরঙ্গ ভাব, এমন আকর্ষণের টান সখ্যভাবে থাকে না।

শাক্তগণের মাতৃভাবের সহিত কান্তাভাবের তুলনা, উভয়ের শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতার বিচার বড় দেখিতে পাই না। শাক্তগণের পক্ষে মাতৃভাবই বড়। বৈষ্ণবের পক্ষে কান্তাভাবই বড়, শৈবগণের পক্ষে দাস্যভাবই বড়, আমরা এইরূপই বুঝিয়াছি। তবে কৃষ্ণের উপাসনায় যতগুলি ভাব বর্ত্তমান, তন্মধ্যে কান্তাভাবই বড়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও রামানন্দরায়ের মুখ দিয়া এই কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠতা উদ্‌ঘোষণা করিয়াছেন, নিজের জীবনেও ইহার সজীব আদর্শ ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

কান্তাভাব প্রেম। দাস্যভাব ভক্তি।

দাস্যভাবে প্রভু-ভৃত্যভাব থাকে বলিয়া ভগবানের প্রতি একটী ভয়ও থাকে। তিনি যে শিষ্টের বন্ধু, দুষ্টের যম, তিনি যে ধর্ম্মের রক্ষক, অধর্ম্মের নাশক, তিনি যে সৃষ্টির মালিক, ধ্বংসের কর্ত্তা, কাজেই তাহার উপর ভয়ের ভাব থাকিবেই। ভয়ের ভাব পাপীর পাপনিবারণের পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয়, উপাসনার পক্ষে ততটা প্রয়োজনীয় নহে, উপাসনায় যত আপনার আপনার ভাব হয় যত হৃদয়ের জিনিষ বলিয়া বোধ জন্মে, ভয়সঙ্কোচ যতটা না থাকে, ততই ভাল। ভক্তি অপেক্ষা ভক্তিমিশ্র প্রেম অপেক্ষা খাঁটি প্রেমই বড়। কান্তাভাব আবার ঘরীয় ও পরকীয়। পরকীয় ভাবই অধিক মিষ্ট। পরকীয়ভাবে প্রবল আকর্ষণ জন্মে, আর সে প্রবল আকর্ষণে নানা বাধাবিপত্তি ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়, এইরূপ কয়েকটী কারণে পরকীয়ভাবই অধিক মধুর। রাধার কান্তাভাব পরকীয় ভাব। এ পরকীয়প্রেম, কাম নহে।

পরপুরুষরূপে কল্পিত পরমব্রহ্মের অহেতুক আকর্ষণে সর্ব্বত্যাগিনী রাধা কি কলঙ্কিনী? সমাজের নিন্দা ও গুরুজনের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও শ্রীরাধা কৃষ্ণের অনুরাগিনী। শ্রীরাধার এ প্রেম, এ মিলন ও বিরহ সবই অপূর্ব্ব। শ্রীরাধার এ ভোগ স্থূলদেহে মানসভোগ। শত গোপীগণসহ শ্রীরাধার রাসলীলা, হোলিখেলা ও ঝুলনক্রীড়া প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক ভোগ ও পঙ্কিল কামের গন্ধও ছিল না। জীবের সহিত পরমাত্মার এই যোগ, আত্মার সহিত অতৃপ্ত মনপ্রাণের এই একত্ব, ভক্ত উপাসিকার সহিত আরাধ্য দেবতার এই মিলন বস্তুতই বিশ্বের সাহিত্যে, ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণে অতুল।

রাধার হৃদয় প্রেম-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। সে হৃদয়ে যমুনার কলকল সঙ্গীত নিরন্তরই ফুটিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের তমালবর্ণচ্ছবি সর্ব্বদাই ভাবের তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়। সে হৃদয়ে লজ্জা, ধর্ম্ম, ভয় ও সঙ্কোচের স্থান ছিল না। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখকষ্ট, বাধাবিপত্তি, নিন্দা, প্রহার ত অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। এত দুঃখকষ্টে, এত বাধাবিপত্তিতে, এত লাঞ্ছনাগঞ্জনায় তথাপি রাধা অবিচল। তখন তাহার সঙ্কল্প পর্ব্বতের মত অটল, চিত্তবেগ নদীস্রোতের মত প্রখর, আকর্ষণ লৌহশৃঙ্খল মত দৃঢ়। রাধার হৃদয় মহাসাগরের মত অতলস্পর্শ, সে হৃদয়ে কল্লোলমালা উদ্দামবেগে ছুটে, ফেনাবুদ্বুদ নীরবে ধীরে ফুটিয়া উঠে।

প্রথম পূর্ব্বরাগ। তখন "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া সে নাম মর্ম্মে গিয়া পৌঁছিল। সে অমিয়া ছানিয়া অক্ষর দুটী শ্রীরাধাকে পাগল করিয়া তুলিল। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা তখন বলবতী, সঙ্গ-স্পৃহা তখন প্রবলা। তখন অন্তর, কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "বাঁশরী বাজিতে বাজিতে বাঁশরী বাজিল কৈ"? তারপর বাঁশরী বাজিল, রাধার সব প্রাণ ভাসাইয়া, দেহ ইন্দ্রিয় আকুল করিয়া বাঁশরী বাজিল। শ্রীরাধা আপনাকে ভুলিল, কুলের কুলবধূ, অপরের পত্নী, নিজে যুবতী রমণী—আর এদিকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা রজনী কিম্বা অন্ধকারময়ী ধরণী—এ সকল আর মনে পড়িল না। একাকিনী যুবতী রমণী সেই শব্দ লক্ষ্যে পাগলিনী আলুথালুবেশে ছুটিল। বাতাসের মৃদু সঞ্চালনে কম্পবান পত্রে শ্যামের বর্ণচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল—এমনই রাধার সূক্ষ্ম দর্শন। আর ওদিকে হয়ত অন্ধকারে ধরার অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, মেঘমালা আকাশ ছাইয়া দিয়াছে, বজ্র কড়কড় শব্দ

করিতেছে, কণ্টকে পদকমল ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তথাপি সে দিকে লক্ষ্য নাই—এমনই আত্মহারা ভাব। রমণী যখন অভিসারে পরপুরুষ উদ্দেশ্যে যায়, কুলধর্ম্ম, লজ্জা, ধর্ম্মভয় জলাঞ্জলি দিয়া নরকের দিকে ছুটে, তখন তাহার পদক্ষেপ যেরূপ হয়, হৃদয় যে রকম ভাব ধারণ করে, দেহ ইন্দ্রিয় যে প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত রাধার কৃষ্ণউদ্দেশে গমনের কোন সাদৃশ্যই নাই।

তারপর শ্যামনটবর রূপের দর্শন লাভ ঘটিল। হৃদয়াকাশে কৃষ্ণচন্দ্র ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিল। দেহযষ্টি শ্যামলতার মত কম্পিত হইল। সেই দেহযষ্টি ভরিয়া রোমাঞ্চয়া উদ্ভিন্ন হইল। ইন্দ্রিয় আকুল, চিত্ত বিভ্রান্ত, প্রাণ মাতোয়ারা হইল। স্বপ্ন কি জাগরণ, মায়া কি মোহ, সুখ কি দুঃখ, সে জ্ঞান আর রহিল না। অধৈর্য্য, কম্পন, ভ্রম, ক্রমে সবই অপগত হইল। শ্যামনটবরের প্রেমে শ্রীরাধার আপাদমস্তক রঞ্জিত হইয়া গেল। তখন মনপ্রাণ মহাপ্রাণে মিশিয়াছে। সে এক আনন্দের রাজ্য, সে এক অনুভূতির খেলা, সে এক অনির্ব্বচনীয় রস বিকাশ। প্রেমরসান্দ্র অন্তর লীলা-রসাস্বাদে ভরপূর। তখন দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত, ভেদের মধ্যে অভেদ ধরা দিল। তখন তাহা দ্বৈত কি অদ্বৈত, ভেদ কি অভেদ, বুঝিবার মত অবস্থা নহে। যে অহঙ্কার অহং ভাবকে ফুটাইয়া তুলে, তাহা তখন নাই। অহঙ্কার থাকিতে কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব অর্পণ হয় না, অহেতুকী ভক্তির উদয় হয় না। যে প্রেমে প্রেমময় আকৃষ্ট হয়, যে ভাবে মহাভাব মিলিয়া যায়—সেই রসে শ্রীরাধার তখন আপাদমস্তক সিক্ত, সেইভাবে সমস্ত দেহমনপ্রাণ সমাচ্ছন্ন। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সেই ভাবের কাছে ধরা দিলেন, রসস্বরূপ শ্রীভগবান্ সেই রসে গলিয়া গেলেন। সে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অহেতুক আনন্দের অবস্থা।

তারপর বিরহ। যে বিরহে বাহ্যভাবের বিকৃতি, বাহ্য জগতের বিলোপ, সংসার ভাবের উচ্ছেদ—এ সেই বিরহ। এ বিরহে যে তন্ময়তা, সে তন্ময়তায় আবার যে কি সুখ, সে সবই অনির্ব্বচনীয়। "সর্ব্বং তন্ময়ং বিরহে" বিরহে সবই কৃষ্ণময়। এই তন্ময়তার সর্ব্বভাব বিলোপে আরম্ভ, আত্মবিস্মৃতিতে পরিণতি। এই তন্ময়তায় প্রিয়জন সর্ব্বদাই ভিতরে বাহিরে, সশরীরে, অশরীরে, সকল সময়েই বর্ত্তমান। ইহার বিচ্ছেদই কষ্টকর, প্রাণান্তক। এই বিচ্ছেদে প্রিয় দূরে পলায়, প্রিয়ের অবস্থিতি আর উপলব্ধ হয় না, সে মধুময়ী স্মৃতি অনুভবে আইসে না। মিলনে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব থাকে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিলোপ মিলনে সম্ভব হয় না। প্রকৃত বিরহে বাহ্য জগতের বড় অস্তিত্ব অনুভূত হয় না; বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিলোপই দৃষ্ট হয়। বাহ্যভাব বিলুপ্ত না হইলে প্রকৃত আন্তর ভাব ফুটে না। আন্তর ভাব না ফুটিলে প্রকৃত অপার্থিব সুখ লাভ ঘটে না। বাহ্যজগতে বাহ্যভাবই স্বাভাবিক। প্রকৃত বিরহে এই স্বাভাবিকতা উপলব্ধিগম্য হয় না।

মিলনে সাত্ত্বিক বিকার, বিরহে তাহাও নাই। মিলনে সৌন্দর্য্য-স্পৃহা, দেহেন্দ্রিয়ের কথঞ্চিৎ তৃপ্তির ইচ্ছা থাকিতে পারে, বিরহে তাহা সম্ভব নহে। বিরহে খাঁটী মানস-ভোগ, স্থূল-দেহে মানস-ভোগ। বিরহে অন্তর্জ্জগতের ক্রীড়া। বিরহে মিলনকে দৃঢ় ও স্থায়ী করে, আবার প্রকৃত বিরহে আপনাকে পরিণত করিবার চেষ্টাও করে। বিরহ মিলনের জন্য, আবার বিরহের জন্যও বটে। বিরহ প্রেমকে

প্রগাঢ় করে, তাহার মালিন্য কাটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া তোলে।

বিরহই প্রেমের পরিপুষ্টি লাভের উপায়। এই প্রেমই সাধনার জিনিষ, ইহাই অমৃত, ইহাই ফল, ইহাই ব্রহ্মানন্দ। প্রেমই একাধারে আস্বাদ্য ও ফল। এই প্রেমেরই মূলবল্লী শ্রীরাধা। প্রেম ভগবানের বড় আদরের জিনিষ। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি প্রেম। প্রেমের সহিত প্রেমময় আকৃষ্ট হইবে বলিয়া শ্রীরাধা মানিনী। এ প্রেম সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে ঠিক ধরা দেয় না। তথাপি আমাদিগকে সাধারণ জ্ঞানের মধ্য দিয়াই বুঝিয়া যাইতে হয়।

রাধার এই প্রগাঢ় প্রেমের অভিব্যক্তি, তন্ময়তার এই আত্মস্মৃতি, সুখ কি দুঃখের মাপকাটিতে ঠিক ওজন করা চলে না—এমন মিলন বিরহ জগতের অতুলনীয় কবিত্ব, বিশ্বের অপূর্ব্ব সঙ্গীত। এই প্রেম-বিরহ, তন্ময়তা, এই বিস্মৃতিই বৈষ্ণবসাহিত্যে গীতি কবিতার সৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্য কবিত্বের বিকাশ করিয়া দিয়াছে, আনন্দের, রসের, কবিত্বের অমুদ্ঘাটিতদ্বারে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। বৈষ্ণবের ইহাই উপজীব্য। জয়দেবের পদাবলীতে ইহা উচ্ছ্বসিত, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গীতি-কবিতায় ইহা বিস্তারিত।

শ্রীরাধার প্রেমাভিব্যক্তির এই একটী অংশমাত্র জয়দেব পদ্মাবতীতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি লছিমা দেবীতে কল্পনা করিয়াছিলেন; চণ্ডীদাস রামমণিতে উপভোগে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই ভাবেরই সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল বলিয়া তিনি অবতার রূপে পূজ্য। শ্রীরাধার ভাবেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব।

গোলোকপতি শ্রীভগবান যদুবংশে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহালক্ষ্মী সুরেশ্বরী রাধা গোপীকুলে বৃষভানুর দুহিতারূপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীধাম গোলোকে একদিন শ্রীভগবানের পার্ষদ পরম ভক্ত সখা শ্রীদামের সহিত শ্রীরাধার কলহ ঘটে। তাহাতে শ্রীরাধা নারীসুলভ প্রচণ্ড ক্রোধের বলে শ্রীদামকে অভিশাপ দেন; শ্রীদামও প্রতিশাপ দিতে ছাড়িলেন না। ফলে শ্রীদাম ও শ্রীরাধা উভয়েরই গোলোক হইতে প্রচ্যুতি ও গোকুলে জন্ম। ইহাই পৌরাণিকী বার্ত্তা।

রাধা বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গোলোকে বৃন্দাবন, মাধবীকুঞ্জ, রাসমণ্ডল, রত্নসিংহাসন, হৈমদোলা সমস্তই বর্ত্তমান।

বেদান্তে পরমব্রহ্মের সিসৃক্ষা—সৃজনেচ্ছার নাম মায়া। গোলোকে ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের লীলা করিবার ইচ্ছা হইল, সেই ইচ্ছাই তখনই সুরেশ্বরীরূপে প্রকটা হইয়া পড়িল। আপনার ইচ্ছাকে পত্নীরূপে শ্রীভগবান গ্রহণ করিলেন - ইহাও শ্রীভগবানেরই অঘটন-পটীয়সী ইচ্ছা। সেই সুরেশ্বরী শ্রীভগবানের বড় আদরের বস্তু, কামনার সামগ্রী। তখন অমূল্যরত্নাভরণা, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র-পরিধানা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, যৌবন-শ্রীমণ্ডিতা, অপরূপ-লাবণ্যময়ী সুরেশ্বরী সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শ্রীভগবান সুরেশ্বরীকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, বিস্তারিত ভুজযুগল বাড়াইয়া সেই যক্ষলাকে বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন রমণি-সুলভ লজ্জাবশে সুরেশ্বরী পলায়নপরা হইলে ভগবান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাধা নামে অভিহিত হইলেন। শ্রীভগবানের আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া আমাদের আরাধনার সামগ্রী।

গোলোক—গোকুল হইল। তত্রস্থ

বৃন্দাবন—বৃন্দাবন হইল। তথাকার পার্ষদগণ শ্রীদাম সুদাম সুবল হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। কংসভয়ে বসুদেব গভীর দুর্য্যোগে মধ্য-রাত্রির আবরণে বস্ত্রাবৃত করিয়া বালক কৃষ্ণকে নন্দগৃহে রাখিয়া আসিলেন। ভগবানের জন্ম মথুরার কেহ জানিল না, প্রসব-গৃহের দ্বারে বসিয়া প্রহরীরাও জানিল না। আশ্চর্য্য এ ব্যাপার! আমরা কত সহস্র বৎসর পরে জন্মাষ্টমীর একটী স্থূল ধারণা করিতেও পারি, কিন্তু অতীতের সেই পুণ্য দিনে মথুরার নর-নারী কেহ এ সংবাদ জানিল না। কি মায়া-নিদ্রায় সবাই সুপ্ত, কি মোহমন্ত্রে সবাই মুগ্ধ ছিল। কংসের রাজত্বে, কংসের অধিকারে থাকিয়া কাহারও জানিবার অধিকার নাই। এ কংস কে—এসম্বন্ধে সুন্দর রূপকটী আর না-ই বলিলাম।

গোলোকে গোলোকেশ্বরী রাধার সহচরীগণও তাঁহার সহিত ধরায় জন্ম লইলেন। রাধার অংশরূপা, রাধার ভাবে অল্প বিস্তর ভাবুকা, রাধার সহিত ওতঃপ্রোতোভাবে মিলিতা সখীগণ বৃন্দাবনের গোপী হইলেন। দেব-যোষিৎগণের গোকুলে মনুষ্যরূপে লীলাময়ের লীলারসাস্বাদ করিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল, তাহা আজ পূর্ণ হইল। অভিশাপ ব্যাপার একটী কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র।

এই বৃন্দাবনই গোলোকের বৃন্দাবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র। বৈষ্ণব মহাজনেরা গোলোকের বৃন্দাবন অপেক্ষাও ভৌম বৃন্দাবনকে যেন বেশী বড় করিয়াছেন। স্থূল দেহে এই জীবনেই পাপীতাপী সকলেই বৃন্দাবনে যাইয়া সেই বৃন্দাবনবিহারীর চরণাশ্রয় লাভ করিতে পারে। কিন্তু গোলোকের বৃন্দাবনে তাহা পারে না! তবেই এই ভৌম বৃন্দাবনেরই মাহাত্ম্য অধিক হইল না কি?—এ বিষয়ে ভক্ত তুলসীদাসের একটী দোঁহা আছে, তাহা বড়ই সুন্দর। গোলোকের বৃন্দাবন ও এই ভৌম বৃন্দাবনের মধ্যে কে বড়, ইহার মীমংসার আবশ্যক হইল, তখন উভয় বৃন্দাবনকে তুলাদণ্ডে চাপান হইল। যাহা ভারী হইল, তাহা নিম্নে নামিয়া আসিল, যাহা লঘু হইল, তাহাই উপরে উঠিয়া গেল। অর্থাৎ—গোলোকের বৃন্দাবন ঊর্দ্ধে; নিম্নে ভৌমবৃন্দাবন; অতএব ভৌম অর্থাৎ যমুনাতীরবর্ত্তী আমাদের এই বৃন্দাবনই বড়।

পরমাত্মার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-বিহারিণী কৃষ্ণপত্নী শ্রীরাধাই বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী। রাজসম্পৎদায়িনী রাজলক্ষ্মী গৃহাধিষ্ঠাত্রী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী এ লক্ষ্মীরই অংশরূপ। শস্যাধিষ্ঠাত্রী গৃহদেবতা ইনিই।

একাধারে বৃন্দাবন মর্ত্ত্যের নন্দন কানন, শান্তি-আশ্রম। রূপে সৌন্দর্য্যে, ভোগে ত্যাগে, বিলাসে শান্তিতে এ অপূর্ব্ব স্থান। বস্তুতঃ এ বৃন্দাবন গোলোকের বৃন্দাবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই রাধাকৃষ্ণের মিলনে যে ঘনামৃত ধারা উৎপন্ন হইয়াছিল, কত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভক্তগণ তাহা পান করিতেছে, তবু সে ধারার ক্ষয় নাই। সে অনন্ত অপরিমিত অনির্ব্বচনীয় ধারা।

রাধাকৃষ্ণ মিলনে যোগতত্ত্ব।

প্রকৃতি-পুরুষের যোগের নামই রাধাকৃষ্ণের মিলন। প্রকৃতি পুরুষের আসক্তির ফলেই জীবজগতের উদ্ভব। এই আসক্তির রজস্তমোভাব সাংসারিক মোহ। সত্বভাব সাত্বিক বিকার। অনর্থকরী অবিদ্যা হইতে আত্মা যখন পরিব্রাজিত—নির্মুক্ত হন, তখনই প্রকৃত ব্রজভাব। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী।

ভক্তি-বিহগকাকলীমুখর অশ্রুবারি-প্রবাহ-ধৌত দৈন্যমমতা-কোমল ঘনরসামৃতসিক্ত অন্তরই বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবনেই যোগী সাধক ভক্তগণ বৃন্দাবনবিহারী কালিন্দী, বিপিনচারী মধুর মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, উপভোগ করেন, সে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-রসের আস্বাদ পাইয়া, সে পরকীয় ভাবের উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন।

আত্মার সংসারবীজ, কামকর্ম্মকারণ যতদিন না নষ্ট হয়, ততদিন আত্মা বদ্ধ, ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এই সাংসারিকতা, এই বদ্ধভাব নির্ব্বাণার্থই কৃষ্ণ বিরহ। এ বিরহে অন্তর খাঁটী, বিশুদ্ধ হয়, বাহ্য মালিন্য, বাহ্য ভোগস্পৃহা ছুটিয়া যায়, এক অপূর্ব্ব আকুলতার উদয় দেখা দেয়। তখন অনির্ব্বচনীয় রসসম্ভোগ। সে বিরহের যে কি দুঃখ, আর সেই দুঃখে যে কি শান্তি, সেই আকুলতায় যে কি অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তিতে যে কি বিহ্বলতা, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহা উপভোগের, যাহা মাত্র অনুভূতির, তাহার অর্থ বুঝান যায় না।

বলিয়াছি, প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে জগৎসংসার। বিচ্ছেদেই মুক্তি, জগদ্বাসীর সাংসারিকতা নির্ব্বাণ। রাধার বহুবৎসরব্যাপী কৃষ্ণবিরহ আর আত্মার বহুকালের অনাসক্তি, উভয়ই তুল্য। সাধারণ ভাবে ইহা অনাসক্তি। সূক্ষ্মভাবে এ অনাসক্তি পরমাসক্তি,জীবাত্মা ও পরমাত্ম-স্তরের সকল তত্ত্বই কৃষ্ণলীলায় পরিদৃষ্ট হয়।

পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া যাবতীয় বিষয় ভোগ করেন। কৃষ্ণও বৃন্দাবনে থাকিয়া নানারূপ লীলা করেন। বৃন্দাবনের ভাব বড় মধুর, প্রেমরসে এই মধুরভাব বড় কোমল। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ-প্রকৃতিতে অনাসক্ত। কবি "তদ্দর্শনমুদাসীনং স্বামেব পুরুষং বিদুঃ" বলিয়া এই ঔদাসীন্য পরমেশ্বরে আরোপ করিয়াছেন। মথুরায় বাস্তবিকই কৃষ্ণ অনাসক্ত —গীতার নিষ্কাম পুরুষ। তখন তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা। বাহ্যদৃষ্টিতে কর্ত্তা, ভোক্তা, নিয়ন্তা ও কৌশলী। "উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ"। কৃষ্ণ মথুরায় যাইয়া কংসকে বিনাশ করিয়া দেশের কণ্টক দূর করিলেন, দেশবাসী আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিজে রাজসিংহাসনে বসিলেন না, উগ্রসেনকে বসাইলেন। পরম শত্রু শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিলেন! কৃষ্ণ নিষ্কাম, উদাসীন না হইলে রাজা হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না; প্রাণপ্রিয় অভিমন্যুকে অকালে মৃত্যুমুখে যাইতে দিতেন না, শেষে চক্ষের উপর যদুবংশের ধ্বংস দেখিতেন না।

কৃষ্ণ প্রজাপালনরূপে গোপালনে সংসার গোষ্ঠে বিহার করিয়া মথুরায় প্রজাপালনেই মন দিলেন। জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন।

যোগীর ঈশ্বরানুরাগ অপেক্ষাও রাধার অনুরাগ অধিক প্রগাঢ়, অধিক মধুর। সে অনুরাগ অহেতুকী ভক্তি, প্রেম, মোক্ষ, কৈবল্য, সবই। শ্রীভগবান গীতায় বারম্বার উপদেশ করিয়াছেন "ময়্যেব মন অধিৎস্ব ময়ি বুদ্ধি নিবেশয়" কিন্তু বাস্তবিক যথার্থ মন, বুদ্ধি ভগবানে কে দান করিয়াছেন? লজ্জা,ধর্ম্ম, মান, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া কে ভগবানকে যথার্থ ভালবাসিতে পারিয়াছে? প্রকৃত সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া কে শ্রীভগবানে মিলিয়াছে? সে এক শ্রীরাধা। শ্রীরাধার মত সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে

কেহ পারে নাই, পারা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

রোধ না পাইলে স্রোতস্বিনীর কত বেগ, বোঝা যায় না, বিপদ ব্যতীত সাধুতা ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। প্রেম যথার্থ খাঁটী প্রেম কিনা, সর্ব্বস্ব অর্পণ যথার্থ সর্ব্বস্বেরই অর্পণ কিনা—ইহা বুঝিতে হইলে প্রবল বাধা, দারুণ বেদনা, অস্থায়ী ও স্থায়ী বিরহের মধ্য দিয়াই দেখিতে হইবে। বাধা না পাইলে বিকাশ দৃঢ় ও স্থায়িত্বে অবিচল কিনা, স্থির হয় না। অপরের পত্নীত্ব, ধর্ম্মের অনুশাসন, কুলের মর্য্যাদা গুরুজনের শাসন, প্রতিবেশীর নিন্দা, আর প্রিয়জনের সাময়িক ও নিরবধি দুই প্রকার বিরহ—এই গুলিই বাধা। রমণী সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, কিন্তু সহজে স্ত্রী-ধর্ম্ম ত্যাগ করে না, লজ্জা পরিহার করিতে পারে না। অথচ যদি স্ত্রী-ধর্ম্ম রহিল, লজ্জা, ধর্ম্ম, সতীত্ব প্রভৃতি রহিল, ভয় ঔদাস্য থাকিল, ব্যক্তিত্ব, স্বরূপ অহঙ্কারও রহিল, তবে সর্ব্বস্ব অর্পণ করা হইল কৈ? রূপ যৌবন, পতিপত্নী, পুরুষ নারী, কি কুমারী যুবতী প্রভৃতি সকল ভাবই যদি পূর্ণভাবে প্রকট রহিল, তাহা হইলে শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ যথার্থ হয় না। ব্যক্তিত্ব বা অভিমান থাকিতে যথার্থ ভগবানে নির্ভরতা জন্মিতে পারে না। রাধার ভালবাসা, আকুলতা ও আত্মনির্ভরতা যথার্থই ছিল, তাই শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে মিশিতে পারিয়াছিলেন। তটিনী যখন সাগরে মেশে, তখন সে কি বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করে?

আপত্তিকারী দার্শনিক বলিতে পারেন যে, "মানবী দেহ যত দিন বর্ত্তমান, ততদিন স্ত্রীত্ব জ্ঞান থাকিবেই। অতএব লজ্জা, ধর্ম্ম প্রভৃতিও ঐ স্ত্রীত্বজ্ঞানের সহিত থাকিয়া যাইবেই। কারণ লজ্জা ধর্ম্ম স্ত্রীত্বের সহিতই এক সূত্রে গ্রথিত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও যেমন অবিদ্যার সূক্ষ্ম ভাবে অবচ্ছিন্নতা কাটে না, তদ্রূপই লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতিরও সূক্ষ্মরূপে অস্তিত্বই কাটিতে পারে না। কারণ জীবন্মুক্ত স্থলে বা শ্রীভগবানে যথার্থ আত্ম-সমর্পণ ব্যাপারে অবিদ্যা কার্য্যশরীর যখন বর্ত্তমান, তখন শারীর ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও প্রাণধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভব নহে। অথবা যদি সূক্ষ্মভাবে স্ত্রীত্ব, লজ্জা-ধর্ম্মের অবস্থিতি মানিতে হয়, তবে প্রকৃত সর্ব্বস্ব অর্পণই হইতে পারে না।"

উত্তরে আমরা বলি, ইহাতে ক্ষতি নাই। সমাধি অবস্থায় সাধকের দেহাত্ম-বোধ থাকে না, পরে ফিরিয়া আইসে। সুষুপ্তিকালে প্রবোধ অনুভবে আইসে না, পরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অবিদ্যা কাব্য দেহের জন্য মানবশরীরের অপরিহার্য্য ধর্ম্মের জন্য যদি কোন ভাব কোন সময়ে আসে বা সূক্ষ্মভাবে থাকে,তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কথা মন লইয়া, দেহ, প্রকৃতি লইয়া নহে। মন যদি ঠিক থাকে,তবে শারীর-ধর্ম্ম, প্রকৃতি-ধর্ম্ম থাকুক, কি করিবে? শরীরের কার্য্য,ইন্দ্রিয়ের কার্য্য,মধ্যে মধ্যে দেহ-ইন্দ্রিয়েরা করুক না, কি ক্ষতি? রাসলীলার সময়ে স্ত্রীত্ব লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতির অনুভবই হয় না, আদৌ উপলব্ধি থাকে না। সময়ে সূক্ষ্ম-ভাবে ছিল কি না, দেখিবার আবশ্যক কি? মিলনে বিরহে যে প্রগাঢ় তন্ময়তা—তাহাকে দার্শনিক তর্কের মধ্যে ধরা যায় না। ভক্তের প্রকৃত ভাব-বিহ্বলতা যে কি, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। ভাব-বিহ্বলতা, সেই তন্ময়তা যাঁহার হয়, তাঁহারই প্রকৃত সর্ব্বস্ব-অর্পণ সার্থক। সে

সময়ে যে অহঙ্কারের জন্য স্ত্রীত্ব লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সেই অহঙ্কারই যে থাকে না, ঐ স্ত্রীত্ব লজ্জা ধর্ম্ম প্রভৃতি থাকিবে কিরূপে? আর জীবের নিকট যাহার উপলব্ধি হইল না, তাহা থাকিলেই বা ক্ষতি কি? আর তাহা ছিলই, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি?

"গোলোকে যাঁহার নিত্য বিহার বিরজানদীর পার।
পরম করুণ অবতীর্ণ হৈয়া প্রচারিলা সুধাসার॥
ঐশ্বর্য্যবিহীন মধুর সে রস জানাতে জগতজনে।
দুই দেহ ধরি রাধা শ্যামরূপে প্রকট এ ব্রজভূমে॥
বাজাও শঙ্খ,দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে
বিহরে আজি॥"

শ্রীরাধার প্রেম সম্যক ধারণা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। আমরা সংস্কার-বশে, বিশ্বাস বলে, কতকটা বা আদর্শবোধে যুক্তি দিতে যাই, এইমাত্র। রাধাকৃষ্ণ লীলার নিন্দা সুখ্যাতি দুই-ই আমাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। নদীর জল পান করিয়া তাহার ভাল-মন্দ বলা চলে না। কংসের রাজ্যে আমাদের বাস, কংসের ভাবে আমরা ভাবুক, কংসের দৃষ্টিতে আমরা দ্রষ্টা, কংসের অধিকারে আমরা বদ্ধ, রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব আমরা সম্যক বুঝিব কিরূপে? যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝেন না, ইহার আদর্শ হিতকর মনে করেন না, কিম্বা ইহার মধ্যে লালসার বিকাশ দেখেন; তাঁহাদের উপর আমাদের রাগ করিবার কারণও নাই, অধিকারও নাই। যাহা স্থূল, সাধারণ, তাহাই লোকে অগ্রে ধারণা করে, যাহা সূক্ষ্ম,অসাধারণ, তাহা কয়-জন ধারণা করিতে পারে? তবে সূক্ষ্ম অসাধারণ বিশেষত্ব যাঁহারা ধরিতে না পারেন, তাঁহাদের দোষ কি? তাহা দুর্ভাগ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা নিন্দার পাত্র নহে। রাধা-কৃষ্ণ লীলা যিনি ভাল না বাসেন, এমন কি, অবতারবাদ যিনি পছন্দ করেননা, তাঁহার পক্ষেও সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের দ্বার রুদ্ধ নহে! ভাল লাগে গ্রহণ কর, না লাগে অন্যভাবে উপাসনা কর। নিন্দা ও গাল দেওয়ার আবশ্যক কি? রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-লীলা সাধনার লভ্য? যুক্তির আয়ত্তে বুদ্ধি বলে ইহার সম্যক মীমাংসা হয় না। পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা—প্রণব স্বরূপিনী শ্রীরাধা আমা-দিগকে ভক্তি দান করুন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের মত ও সাধনা।

আনন্দরূপমমৃতং—সাধক কালী-নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের 'ভাব-সঙ্গীত' ও 'ভাব-কথা' বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ধর্ম্ম-মতে তিনি অচিন্তনীয় ভেদাভেদবাদী এবং উপাসনা-রাজ্যে তিনি আনন্দময়ের সাধক ছিলেন। উপনিষদের দুইটী শ্লোকে এই দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব এবং তাঁহার সাধনার ভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়;—

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

অর্থাৎ এই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদা একত্র

থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা। এই বেদ মন্ত্ররূপ গোমুখী হইতে দ্বৈতাদ্বৈত গঙ্গা-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পিতার সহিত পুত্রের একত্ব এবং পিতা-পুত্রের দ্বৈত ভাবের মধ্যে উপনিষদের ভেদাভেদ ভাব বিরাজিত। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিপথাবলম্বিগণ এই তত্ত্ব নানাভাবে স্বীকার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুপ্তমহাশয় ইংরাজি কিম্বা সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইয়াও, দর্শন-তত্ত্ব আলোচনা না করিয়াও, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মসত্তার অমৃতবাণী প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত তত্ত্বের ভূমিতে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়া ছিলেন। "দ্বা সুপর্ণা" শ্লোকটী যেমন তাঁহার মত-প্রকাশক; তেমনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার সাধনা-প্রকাশক।

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দোনস্যাৎ।
এষহ্যেবানন্দঃ যাতি।"

কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভারতীয় এক শ্রেণীর ঋষি আনন্দবাদী ছিলেন। "আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই মহামন্ত্র পরমেশ্বরের নিগূঢ় নিত্য লীলাপ্রকাশক। ব্রহ্মের প্রকাশ আনন্দরূপে—অমৃতরূপে। বিশ্বজগতে, বিশ্বমানবে এবং আত্মার অভ্যন্তরে তাঁহারই আনন্দ মূর্ত্তি। আনন্দের মধ্যে কেবল আনন্দ নহে—প্রেম ও সৌন্দর্য্য বিকশিত। প্রেম ও সৌন্দর্য্য মিলিত হইয়া আনন্দের মূর্ত্তি রচিত হয়। যেখানে প্রেম নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে আনন্দের সম্ভাবনা কোথায়? ঋষিগণ একটী কথায় এই প্রেম,সৌন্দর্য্য,আনন্দকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অমৃত বাক্য এই:—"রসোবৈসঃ" তিনি রসস্বরূপ, তৃপ্তিহেতু। ঋষিগণের সাধনা এই;—সাধকচিত্ত যতই ব্রহ্মরসের মধ্যে ডুবিবে, ততই পাপ, তাপ, আসক্তি, প্রলোভন, স্বার্থপরতা চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত ডোবা যায় না; ডুবিবার পূর্ব্বে কি করিতে হইবে? শ্রবণ, মনন, নিদি-ধ্যাসন, ধারণা, ধ্যান দ্বারাই আনন্দস্বরূপে নিমগ্ন হওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ যতই লাভ হইবে, ততই পাপ, মোহ, অজ্ঞানতা দূরীভূত হইবে। এই সাধনায় পাপ-দমনের জন্য ব্রত, উপবাস, যাগযজ্ঞ, তপস্যাদি কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার করুণা ধারায়—আনন্দ-ধারায়—সৌন্দর্য্যধারায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলেই সকল মলিনতা ধুইয়া যায়।

"ব্রহ্মনাম সুধা-রসে ডুব দিয়ে মন থাক্ রে"।*—খ্রীষ্টীয় সাধনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা—অনুতাপ দ্বারা আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট বলিলেন, "তোমরা অনুতপ্ত হও, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী।" অর্থাৎ অনু-তাপের ভিতর দিয়াই পবিত্রতা লাভ হয় এবং সেই পবিত্রতাই মানবকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায়। এই অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মসমাজের দুইজন মহাপুরুষের জীবনে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দ্বিবিধ সাধনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বাঞ্চলীয় ব্রাহ্মসাধকের মূর্ত্তি এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান সাধকের মূর্ত্তিবিশেষ। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম সময় হইতে আনন্দময় বিধাতার এমন একটু সংসর্গ করিয়াছিলেন যে, তিনি পাপের

* এই প্রবন্ধের সকলগুলি কবিতাই গুপ্ত মহাশয়ের রচিত ভাব-সঙ্গীত নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

WATER DAMAGED.

দিকে—সংসারের প্রলোভনের দিকে তাকাইবার সময় পান নাই। সাপের খোলসের মত তাঁহার মন হইতে পাপ বাসনা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রহ্ম-রসে মজিয়া তিনি পাপকে ভুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অবস্থা অন্যরূপ, তিনি পাপের ভীষণ চিত্র দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেন। পাপের জন্য ক্রন্দন করিতেন এবং পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নিয়ত পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। দুইজনেই ব্রহ্মসম্ভোগের রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। একজন গিয়াছিলেন, অনন্তের ভিতর দিয়া—আনন্দের ভিতর দিয়া, আর একজন গিয়াছিলেন, অনুতাপের ভিতর দিয়া দুইজনের গম্যস্থান এক , পথ ভিন্ন।

গুপ্তমহাশয়ের সাধনার পথ—আনন্দের পথ। তাঁহার সাধনার মর্ম্ম এই ;—যদি এক বিন্দু ব্রহ্মানন্দ পাই, তবে কোটি কোটি পাপ দূরীভূত হইবে।

"স্মরণে হয় আনন্দ,
ঘুচে দ্বন্দ্ব, ঘুচে ধন্দ,
উপজে মকরন্দ, প্রেমানন্দ অনিবার।"

ভক্ত চৈতন্যদেব, কবীর, নানক প্রভৃতি ভক্তি-পথাবলম্বী ভারতীয় সাধকগণের জীবনে দেখা যায়, তাঁহারা আনন্দের সুধা পান করিয়াই পাপবাসনা দূর করিয়াছিলেন। ভগবানের আনন্দে মজিয়া জগতের অসার আনন্দ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টান সাধিকা মাদাম গেঁয়োর জীবনেও দেখা যায়, তিনি ব্রহ্মানন্দরস পান করিয়া সংসারের নিদারুণ যন্ত্রণা এবং পাপবাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তমহাশয় এই আনন্দের স্বাদ পাইয়া গাহিলেন ;—

"ভ্রমর যেমন পাইলে ফুল,
ফুলে মিলে দুলে আনন্দে আকুল,
সুন্দর ফুলেরে, কি সুন্দর হেরে,
উড়ে উড়ে ঘুরে সেই খানে ;
অলি যবে মধুপানে রত,
কোথা আছে সে কিছুই জানেনাত ;
ফুলে মধু খায়, ফুলেই গড়ায়,
ফুলে ভুলে যায় আপনে।"

যখন সাধক পরমানন্দের ভিতর দিয়া নব জীবন লাভ করেন, তখনই ধর্ম্মের সহিত সংসারের মিলন হয় ; সংসার ও ধর্ম্ম এক হইয়া যায়। মধ্য যুগের খ্রীষ্ট-সাধকগণ, প্রাচীনকালের, বৌদ্ধ যুগের এবং তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ভারতীয় সাধকগণ সংসারকে ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় ভাবিয়া সন্ন্যাসের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যে বিদ্রোহ দর্শন করিয়াছিলেন ; সংসার ও ধর্ম্মের মিলন-ভূমি তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। বাস্তবিক যাঁহারা আনন্দস্বরূপের সাধক, তাঁহারাই সংসার ও ধর্ম্মের মিলনভূমি দেখাইতে পারেন।

ভারতীয় এক শ্রেণীর প্রাচীন ঋষি অমৃত কণ্ঠে এই মর্ম্মে গাহিয়াছিলেন, এই যে সৃষ্টি, ইহা পরব্রহ্মের আনন্দ-লীলা। গুপ্ত মহাশয় ঋষিগণের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিলেন ;—

"করো মর্ত্ত্য স্বরূপ ধাম।"

কথায় নহে, কার্য্যে তাহাই করিলেন। গরীব শ্রমজীবিগণের সন্তান-কোলে তাঁহার আনন্দ-মূর্ত্তি দেখিয়াছি ; ভাব-সঙ্গীতে প্রমত্ত-মণ্ডলী-মধ্যস্থিত গুপ্ত মহাশয়ের প্রসন্ন উদার মূর্ত্তি স্মৃতিরাজ্যে জাগ্রত রহিয়াছে ; প্রজাদিগের গৃহে গৃহে গমন, নরনারীর সঙ্গে হাসি গল্প আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তাঁহার আনন্দ-মূর্ত্তি কেনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? মানব সমাজে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী ভাবেই আনন্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেখানে আভি-

জাত্যের ভাব, বড় ছোট ভাব, যেখানে উপবেশনে, ভোজনে, ভ্রমণে বিষম পার্থক্য বাহির হইয়া পড়ে, সেখানে ব্রহ্মানন্দের স্থান কোথায়?

কাওরাদি গুপ্ত মহাশয়ের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, সাধন-ক্ষেত্র এবং প্রচার-ক্ষেত্র। এই স্থানে তাঁহার মণ্ডলীর মধ্যে ভগবান আনন্দলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাতে যেমন বাণ ডাকে, তাঁহার হৃদয়ে তেমনি ভাবের বাণ ডাকিত। তিনি ভাব-রসে বিভোর হইয়া যখন গাহিতেন, "ব্রহ্ম-নামের রসের ধারা শিরায় শিরায় বয়রে", তখন সত্য সত্যই মনে হইত, ধারা শিরায় শিরায়ই প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার উন্মাদ-কারী ভাব-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া স্বর্গের আনন্দ-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইত।

প্রশ্ন হইতে পারে, আনন্দবাদের মধ্যে কি দুঃখ, অনুতাপের স্থান নাই ; ভাটা-স্রোতে নৌকা বাহিবার নামই কি আনন্দবাদ? তাহা নহে। যাঁহারা ভাবের সাধক, রসের সাধক, তাঁহাদের প্রাণেও ক্লেশ আছে। সে দুঃখ, সে অনুতাপের অবস্থা ভীষণ। ভক্ত যখন অন্যায় কাজ করেন, ভক্ত যখন পাপে পড়িয়া ভগবানকে হারান, তখন তাঁহার অন্তরে আগুন জ্বলিতে থাকে। "হায়, কেন আমি এই অপরাধ করিলাম? এই অপরাধে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন?" এই অবস্থায় পতিত হইয়া কত সাধু ভক্ত পাগলের মত ছুটাছুটি করেন, মাটীতে মুখ ঘষেণ। ভক্ত যখন ভগবানকে উপলব্ধি করিতে না পারেন, তখন "আমারই অপরাধের জন্য, তিনি আমার কাছ থেকে লুকাইয়াছেন", ইহা ভাবিয়া তিনি অনুতপ্ত হন। সুতরাং একথা ঠিক নহে যে, যাঁহারা আনন্দ-স্বরূপের সাধন করেন, তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন আদরে ছেলের ন্যায় কেবল আনন্দই লাভ করিতে থাকেন। ভগবানকে লাভ করিয়া সাধক কি আপন দোষে তাঁহাকে হারান না? সেই পরমধনকে যখন সাধক হারাইয়া ফেলেন, তখন তিনি কি গভীর যাতনাই ভোগ করিতে থাকেন। পরব্রহ্মকে হারাইয়া গুপ্ত মহাশয় যে যাতনা উপভোগ করিতেন, তাঁহার মুখে সেই মর্ম্মবাণী এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ;—

"বাঁচিনা আর তোমা-বিহনে।
জ্বলে তুষের আগুন দিবানিশি,"
"যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সেই দিকে শূন্য গো দেখি,
ব'য়ে ব'য়ে ঝরে গো আঁখি
দেখে কিছু দেখিনে।"

যখন সাধক আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আপনার অলসতা, দুর্ব্বলতা, অপরাধ সকল দর্শন করেন, তখনই তিনি অনুতপ্ত হন ; যখন ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ; ভগবানের চির-আশ্রয়ে আশ্রিতরূপে আপনাকে দেখিতে পান, তখনই তাঁহার আনন্দ।

"যত পাপ তাপ ভার
রহিবে না আর, এই মলিন জীবন
গিয়ে হবে নব কলেবর।"

* * *

"জানিতাম না সাধনভজন,
মানিতাম ভক্তিভাজন,
তথাচ সুজনের মতন সাজালে গো।
সাজালে ওগো সাজালে ওগো।"

* * *

"পাপের অনলে দগ্ধ যে হৃদয়
সে হৃদয়ে তুমি হইয়ে উদয়
প্রেমবারি দানে নিভাও সে আগুন।"

যাঁহারা ভাবের দিক দিয়া, আনন্দের দিক দিয়া, প্রেমের দিক দিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের আনন্দের ভিত্তি কোথায়? সংসারের আনন্দ, সংসারের ক্ষণিক আনন্দ—ইন্দ্রিয় জনিত আনন্দ নহে—প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আনন্দ নহে; বিশুদ্ধ নৈতিক আনন্দ, ধর্ম্মের আনন্দ,ব্রহ্মানন্দই তাঁহাদের ভোজ্য ও পানীয়। তাঁহাদের আনন্দ ত্যাগের আনন্দ, ভোগের আনন্দ নহে। তাঁহারা আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া অপরের দুঃখমোচন করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে বড় ভুল করিয়া থাকে, তাঁহারা ভোগের পথকেই আনন্দের পথ মনে করে; ভোগের পথ দুঃখময় পথ—অশান্তির পথ, বিকারের পথ; যেখানে ত্যাগ, সেখানেই আনন্দ ও শান্তি; যেখানে ত্যাগ, সেখানেই ব্রহ্মানন্দ; যেখানে ত্যাগ, সেখানেই স্বর্গ। গুপ্তমহাশয় এই সনাতন ত্যাগের পথেই অগ্রসর করিয়াছিলেন।

সত্যং শিবং সুন্দরং।—গুপ্ত মহাশয় শিব সুন্দরের উপাসক ছিলেন; সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাণের প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি নিজে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। ধনী হইয়াও দামী পোষাক পরিধান করিতেন না; কিন্তু মলিন বস্ত্র ব্যবহার করা তাঁহার অভ্যাস ছিলনা। যেখানে থাকিতেন, বাড়ী ঘর সুন্দর পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। কাওরাদি স্থানটী সুন্দর। ব্রহ্ম-মন্দিরটী অতি সুন্দর। এমন সুগঠিত, সুদৃঢ় মন্দির আর একটীও হয় নাই। মন্দিরটী ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তায় আদর্শ স্থানীয়। কাছারী ঘরখানিও তিনি অতি পরিপাটি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চারিদিকের কৃষক ও শ্রমজীবী নরনারীগণ আসিয়া তাহা সতৃষ্ণ নয়নে দেখিত। কাছারী বাড়ী ও মন্দিরের নিম্ন দিয়া একটী খাল প্রবাহিত হইতেছে। বারো মাস খাল দিয়া নৌকা যাতায়াত করে। এই সুরম্য স্থানে কত বার গমন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ভগবানকে যাঁহারা সুন্দররূপে দর্শন করেন, যাঁহারা শিবসুন্দরের অপরূপ ভাতি অবলোকন করেন, তাঁহারা আপনাকে কুরূপ করিয়া রাখিতে পারেন না। আমি কুৎসিত হইয়া থাকিলে ভগবানের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যে বাধা পড়িবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা পাপ তাপকে দূর করিয়া হৃদয় মনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। পাপেই মানুষকে কুৎসিত করিয়া রাখে। পাপ আর কিছুই নহে, যাহা মানবের শরীর ও মনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে হরণ করে, তাহাই পাপ। অতএব সৌন্দর্য্যের উপাসনায় শিবসুন্দরের সাধনায় পাপ দমন অপরিহার্য্য। যেমন উচ্চতর আনন্দে পাপ দূরীভূত হয়, তেমনি সৌন্দর্য্য-বোধদ্বারাও পাপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম ও সৌন্দর্য্য আনন্দের যুগল মূর্ত্তি। এ দুটী বস্তু লাভ করিয়াই মানব উন্নত হয়, শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জগতের নমস্য হয়।

গুপ্ত মহাশয় প্রাণমুগ্ধকারী সঙ্গীত গাহিলেন,—"ওকি সুন্দর তব দরশন।" পরমেশ্বরের দৃষ্টি সৌন্দর্য্যপূর্ণ। অনন্ত আকাশে তাঁর দৃষ্টি, তাই শ্যাম আকাশ তারকার হীরার মালা পরিয়া কি অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে। তটিনীর বক্ষে, ফুল-দলে, শস্য-ক্ষেত্রে, আগর-পর্ব্বতে সর্ব্বত্র সেই প্রিয় দর্শনের শুভ-দৃষ্টি। যে দিকে চাই, সে দিকেই তিনি চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়াই জগতের অতুল শোভা হিমালয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কি সুন্দর তোমার হিমালয়,
খেলা পুতুল হে;
নব ঘন সাজে, নগগণ রাজে,
নব সাজে কত অতুল হে।
কাঞ্চন গিরি কিরীট তাঁর
কুঞ্চিত গাঢ়, হিম তুষার,
চূড়ে চূড়ে ঝরে গলিছে হে।"

চমৎকার কবিত্ব। এই কবিত্বের ভিতর দিয়া ভক্ত কবি কেবল যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; ইহার মধ্যে ভাদ্র-গঙ্গার ন্যায় একটী আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে। উচ্ছ্বাসই গুপ্ত মহাশয়ের জীবন-ধারা। ভাব-সঙ্গীতের আলোচনায় এই উচ্ছ্বাসের কথা বলা যাইবে।

বিশ্ব-জগতে কাহার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে? অসীম নীল আকাশ, বিস্তৃত-বক্ষ সুনীল সিন্ধু, উন্নত পর্ব্বতমালা, নদ নদী, বন উপবন, শ্যাম শস্যক্ষেত্র, কুসুমিত কুঞ্জকানন কাহার রূপ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিতেছে? সেই সত্য-স্বরূপের অমৃত কিরণই নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়া উজ্জ্বলিত হইতেছে।

"রূপ সত্যে বিশ্বরূপ
আবার আনন্দস্বরূপ।"

যাহা অসার, অনিত্য, প্রবাহশীল, তাহার ভিতর দিয়া তিনি পরম সত্যের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন। এই ভাবটীকে তিনি চেষ্টা করিয়া, জোর করিয়া আনেন নাই। অতি সহজে দৃষ্টিমাত্র তাঁহার হৃদয়ে অরূপের রূপ-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত। তিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া বহু অধ্যয়ন, আলোচনা, চিন্তা করিয়া রূপের পথে গমন করেন নাই; তাঁহার হৃদয়ের অহেতুকী আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে রূপের সাগরে ডুবাইয়াছিল। এইরূপ আর কিছুই নহে, পরব্রহ্মেরই মধুর স্বরূপ।

"সে রূপ অতি অপরূপ,
যাঁর রূপে সকল রূপ।"

* * *

কেবল রূপের মেলা
রূপের খেলা।"

তিনি দিব্য চক্ষে দর্শন করিলেন, রূপের জোয়ার বহিয়াছে। সকল সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। জল স্থল আকাশ—সকল শোভার মধ্যে সেই প্রিয়দর্শন মানবাত্মাকে দর্শন করিতেছেন। সেই সৌন্দর্য্যলাভ করিয়াই মানব-চিত্ত পবিত্র হয়, নির্ম্মল হয়, সুন্দর হয়। সেই সৌন্দর্য্য-রসে স্নাত হইয়াই মানব-চিত্ত পাপের কালিমা পরিত্যাগ করিয়া নব ভূষণে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

"তুমি সুন্দর অতি সুন্দর,
তুমি সুন্দরের খনি।
পরশে তোমার হইবে সুন্দর
পরশি পরশ মণি।"

গুপ্ত মহাশয় দেখিলেন, সাগরের সহিত নদী নালা খাল বিল একাকার হইয়া গিয়াছে। বাহিরে শিবসুন্দর, ভিতরেও শিব সুন্দর। আজ মরুভূমিতে প্রেমের বন্যা আসিয়াছে। আপনি মজিয়া ভাবে বিভোর হইয়া তিনি জগদ্বাসীকে বলিলেন, কেহ নিরাশ হইয়া থাকিবেনা, কেহ ব্যথিত হইবে না, কাহারও দুঃখ থাকিবে না;—

'হৃদয়-কাননে ফুটিবে ফুল,
চারিদিক্ হবে সৌরভে আকুল।"

সেই সুন্দর প্রেম-চন্দ্রের আগমনে হৃদয়-কুঞ্জ বনে ভক্তির কুসুম ফুটিয়া উঠে। তাঁহাকে কেহ ডাকিয়া আনিতে পারে না; তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে আপনি করুণাবশে উদিত হইয়া থাকেন। তাঁর আকাশ, তাঁর বাতাস,

তাঁর জল যেমন সকলের পক্ষে সহজ, তিনি তেমনি সকলের সহজ প্রাপ্য। কেবল সহজ-প্রাপ্য নহেন, সহজ হইয়াই আছেন। তোমরা তাঁহাকে দেখিবে, তাঁহাকে আস্বাদন করিবে ;—

"দুনয়নে প্রেম-নীর
বহিবে ধারায় রে ;
বিমল সত্যের শোভা
দেখিবে ধরায় রে।
আনন্দ-লহরী, পরশন করি'
প্রেমে গলি হবে পরশমণি।"

শোক যায়, পাপ যায়, তাঁহার স্পর্শে ; তাঁহাকে দর্শন কর। তাঁহার সঙ্গ করিয়া ধন্য হও।

"প্রেম-সুধা খে'য়ে খে'য়ে,
ব্রহ্মনাম গে'য়ে গে'য়ে,
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নৃত্য কর।"

* * *

যত পাপ ভার, রহিবে না আর,
এই মলিন জীবন গিয়ে
হবে নব কলেবর।"

এক শ্রেণীর সাধক সংসারের অনিত্যতা, দেহের নশ্বরতা, পরকালের নরক-যাতনা প্রভৃতির ভীষণতা শুনাইয়া মানুষকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতে চাহেন। এ সংসার মোহময়, স্ত্রী পুত্র মায়ার খেলা, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময়, এই বিচিত্র শোভাময়ী বসুন্ধরা মানুষকে প্রলোভনের দিকে আকর্ষণ করে ; সুতরাং এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া পরম সত্যের দিকে গমন করাই শ্রেয় গুপ্ত মহাশয় কি বাণী প্রকাশ করিলেন ? সংসার মধুময়, আনন্দময় ; কেননা আনন্দময় পরব্রহ্ম সকলের ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছেন। হে ভ্রান্ত জীব, বিশ্বাস নয়নে দর্শন কর। এই স্থানই স্বর্গ—প্রেম-নিকেতন। জন্মিয়াছ স্বর্গে—বাস করিতেছ স্বর্গে, চলিয়া যাইবে স্বর্গে!

"জগৎ মঙ্গলে গড়া,
জগৎ মঙ্গলে ভরা,
অমঙ্গল নাই কিছুর মাঝে,
মৃত্যু কি জরা ;
সদা চরাচরে, ঘরে ঘরে
মঙ্গলে মঙ্গল বিলায়।"

অনন্ত দেবতাকে সান্তের মধ্যে দর্শনই প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন। যাহা আছে, তার চেয়ে বেশী দেখাই সৌন্দর্য্যানুভূতি। এ দর্শনে চক্ষু জুড়ায়, প্রাণ নবীন ভাবে পুলকিত হয়। যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে শিব সুন্দরকে দেখা যায় না, তাহা বৃথা, অসারের অসার। তাঁহাকে না দেখিয়া জগৎ দর্শন. অসার দর্শন ;—

"আঁখি যত কিছু দেখে,
দেখে যেন নাহি, দেখে
আলোতে বসিয়া থাকে
দেখে অন্ধকার।"

আবার যখন বিশ্বমধ্যে বিশ্বরূপীকে দর্শন করিয়া আত্মা তৃপ্ত হয়, যখন চিত্ত সকলের মধ্যে তাঁর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। তখন বিস্তৃত উন্নত হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে যেরূপ, এক বিঘা জমির মধ্যেও সেইরূপ।

"কেবল রূপের মেলা,
রূপের খেলা, অনুরূপ
নাই এমন আর।"

* * *

"রূপ উপরে তলে
সদা উজলি জলে।"

বর্ত্তমান যুগে শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-রাজ্যে নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে। লোকে

প্রাচীন লইয়া সন্তুষ্ট নহে। প্রাচীন নগর ভাঙ্গিয়া নূতন নগর নির্ম্মিত হইতেছে। পর্ব্বত কাটিয়া দুই সমুদ্রের মিলন সাধিত হইতেছে। জগতে নূতনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ সময়ে যে জাতি প্রাচীনকে বুকে করিয়া রহিয়াছে, সে জাতি অবনত। যে জাতি নূতনকে আলিঙ্গন করিতেছে, সে জাতি উন্নত। কর্ম্ম-কাজ্যে যেমন মানব প্রাণ নূতনের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, ধর্ম্মরাজ্যে কি তেমনি ব্যাপার দেখা যায় ? কর্ম্মরাজ্যে যেমন নূতন সৃষ্টি হইতেছে, ধর্ম্ম-রাজ্যে কি তেমনি নূতনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতেছে ? গুপ্ত মহাশয় আপনার সাধনা ও জীবনদ্বারা এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নূতনকে কোথায় পাওয়া যায় ? আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যেই নব নব ভাব, নব নব পুলক-সঞ্চার হয়।

"নবীন নবীন কতই নবীন,
নবীন শিশুর নবীন প্রাণ ;
নবীন ফুলের নবীন দলে,
নবীন অলির গুণ্ গুণ্ গান।"

নবীনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নবীন রস আস্বাদন করিয়া গুপ্ত মহাশয় নবীন-বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। মধুর অমর সঙ্গীত গাহিলেন ;—

"দেখেছ না যাহা,
দেখিবে এবার
হইবে বিহ্বলং।"

যুগ-যুগান্তর, লোক লোকান্তর ধরিয়া মানব-প্রাণ নিয়ত এই কথাই বলিবে ;— "দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার, হইবে বিহ্বলম।" দেখা কখনও শেষ হইবে না। তাঁহাকে যতই দেখা যায়, ততই দেখিবার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, যতই জানা যায়, ততই জানিবার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায় ; যতই বুঝা যায়, ততই বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যের এখানেই চির নবীনতা। অন্তহীন সৌন্দর্য্য, অন্তহীন মাধুর্য্য, অন্তহীন আনন্দ। গুপ্ত মহাশয় তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের বিশ্বরূপের মধ্যে তিনি ডুবিয়া-ছিলেন ;—

"যত রূপ গুণ, কর নিরীক্ষণ
ব্রহ্ম-রূপ গুণে ভাসিছে ভুবন।"

"টানই প্রাণ"—গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভাব-কথার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের অতি নিগূঢ় নব বাণী প্রকাশ করিয়াছেন,—"টানই প্রাণ।" অর্থাৎ ব্রহ্মের আকর্ষণই মানবের জীবন-ধারা। "কেন জগতে আসিলাম ?"—ধর্ম্ম জগতের একটী চির প্রচলিত প্রশ্ন। কেহ ত প্রার্থনা করে নাই! সুকর্ম্মের ফলে কি জন্ম-গ্রহণ ? সেই সুকর্ম্ম বা কে করাইয়া থাকেন ? পরমেশ্বর ? যদি এমনই হয়, তাহা হইলেও তো তিনিই রচনাকারী ; তিনিই মানবকে জগতে আনিতেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, মানব তাঁহার মানস-পুত্র। তিনি চাহিতে-ছেন, তাই নূতন নূতন আত্মা আবির্ভূত হইতেছে। যোগযুক্ত অন্তরে সকলের মূলে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পরম পুরুষ পরব্রহ্ম অনন্ত কাল ধরিয়া সংখ্যাহীন আত্ম সৃষ্টি করিয়া তাঁহার ভুবনকে পূর্ণ করিতেছেন। গুপ্ত মহাশয় ব্রহ্মলীলার এই ভাবটী 'টানই প্রাণ,' এই কথাদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান চাহেন, এজন্যই মানব-সন্তান বিকশিত হইতেছে। পরব্রহ্মের প্রকাশ, মানবের বিকাশ, সৃষ্টি-লীলার ইহাই উদ্দেশ্য। প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, "তিনি চাহেন কেন ?" একথার প্রত্যুত্তরে

ভারতীয় ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তেমন গভীর কথা জগতের অন্য ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋষিগণ বলিয়াছেন ;—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি
জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি
(তৈত্তরীয় উপনিষদ)

অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিগমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

যিনি আনন্দ, নিত্য প্রকাশিত হওয়াই তাঁহার স্বরূপ। তিনি আনন্দময় বলিয়াই আপনার মধ্যে নিখিল বিশ্ব এবং বিশ্ব মানবকে প্রকাশ করিতেছেন। মানবাত্মা ভিন্ন আর সকলই পরিবর্ত্তনশীল, ধ্বংসশীল। মানবাত্মার মধ্যেই তাঁহার আনন্দরূপের পূর্ণ বিকাশ। সেই আনন্দময় জীবন-দেবতা মানবাত্মাকে ছাড়িয়া অসঙ্গ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও বাস করেন না। অতএব কেহ ইচ্ছা করিয়া এখানে আসে নাই, ইচ্ছা করিয়াও এখান হইতে পরলোকে গমন করিবেনা ; পরব্রহ্মের আনন্দ-ইচ্ছাতেই সমুদয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। তিনি চিরদিন আমাদিগকে তাঁহারই দিকে টানিতে-ছেন ;—

"গার্ড তার আপ্‌নি ভগবান্,
সদা সঙ্গে সঙ্গে যান ;
বাঁকা তেড়ি ঘুর ফির নাই,
সিধাসিধি টান্।
মানেনা সে ঝড় কি বাদল্
সাগর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যায়।"

গার্ড যেমন রেলগাড়ী চালায়, তেমনি বিধাতা মানব-জীবন রূপ রেলগাড়ী চালাইতেছেন। তিনি আপনি গার্ড, আপনারই দিকে লইয়া যাইতেছেন। কাষ্ঠ খণ্ড যেমন নদীর স্রোতে পড়িয়া সাগরের দিকে গমন করিতে থাকে, মানব-চিত্ত কি সেই প্রকার অজানিতভাবে পরমেশ্বরের দিকে ছুটিতেছে? এখানেই সাধক অসাধক, ভক্ত ও অভক্তে প্রভেদ ; বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, নাস্তিক আস্তিকে প্রভেদ। সাধক স্বীয় অন্তরে ভগবানের প্রেমের আকর্ষণ, প্রেমের আহ্বান অনুভব করিয়া থাকেন। অবিশ্বাসীর সেই অনুভব-শক্তি নাই। বিশ্বাসী, ভক্ত পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর প্রেমের ভিতর দিয়া, দাম্পত্য প্রেমের ভিতর দিয়া, ব্রহ্ম-প্রেমের আকর্ষণই অনুভব করিয়া থাকেন। গুপ্ত মহাশয় স্বীয় হৃদয়ে ব্রহ্মমুখীন গতি উপলব্ধি করিয়া অমৃতস্বরে গাহিয়াছিলেন ;—

"দরদি আমার মন কেন
উদাসী হতে চায়?
যেন ডাক নাহি হাক গো নাহি
আপ্‌নে আপ্‌নে চলে যায়।
ওগো ধৈরজ না ধরে অন্তরে,
সদা কেঁদে উঠে মন শিহরি
নয়ন ঝরে ;
যেন নীরবে স্বরবে গো সদা,
ডাকিতেছে আয় গো আয়।"

মানুষ যখন স্বীয় প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়, যখন তাহার চিত্তে পবিত্রতা, সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন সে দেখিতে পায়, তাহার প্রাণ যেন কাহার জন্য লালায়িত হইতেছে ; কাহার সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণ ; কাহার পদ-শব্দ শুনিয়া যেন সে সচকিত। এই যে নব চেতনার সঞ্চার, ইহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় বলা হয়। চারিদিকে ধন

জন, সহায় সম্পদ, কিছুতেই মন উঠে না। "পাখী উড়ে যায় বিমানের পথে," তাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? তার ডানা হইয়াছে। আর সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। অনন্ত আকাশে বিহার করিবার জন্য সে ছুটিতে চায়। দূরশ্রুত সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিয়া পথিক যেমন বিহ্বল হৃদয়ে সে দিকে চলিতে থাকে, অন্ধকার রজনীতে দূরে আলোক দর্শন করিয়া পথ-ভ্রান্ত পথিক যেমন সে দিকে গমন করিতে থাকে, তেমনি মানব-প্রাণ সেই অনন্তের টানে, অনন্তের পানে ছুটিয়া যায়। যেমন "টান্‌ই প্রাণ," তেমনি এই "যাওয়াই পাওয়া।"

অনন্তের সহিত মানবের আদান প্রদান সম্বন্ধ। অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম মানবকে চাহিলেন, মানব আসিল ; মানব তাঁহাকে চাহিল, তিনি মানব-প্রাণে প্রকাশিত হইলেন। ব্রহ্মের সহিত মানবের সম্বন্ধ-নির্ণয়ই তত্ত্ব-বিদ্যার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গুপ্ত মহাশয় দার্শনিক ছিলেন না ; ইংরাজি, সংস্কৃত জানিতেননা ; সাধারণ বাঙ্গালা জানিতেন ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান অতি উজ্জ্বল ছিল। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ তিনি সূক্ষ্ম ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'তুমি বৃক্ষ আমি ফল,
তোমাতে আমার সকল
তোমার যত ডাল পাতা রস
সরসে আমার জীবন।"

সর্ব্বশক্তিমান মহান পরমেশ্বর মানবের কাছে প্রেমে ধরা দেন, ইহাই তাঁহার লীলা। শক্তি-রাজ্যে মানুষ অধীন, প্রেমরাজ্যে সে স্বাধীন। স্বাধীনতা ভিন্ন প্রেম মূল্যহীন বস্তু। মানুষ ভগবানকে স্বাধীনভাবেই ভালবাসিয়া থাকে ; ভগবানও তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া মানুষকে ভালবাসিয়া থাকেন। তিনি আপনাকে বিলাইবার জন্য, মানুষের কাছে কিছু পাইবারই জন্য উপস্থিত হন ;—

"(যত) আমির কাছে বিলাইলে
তোমার এই অমৃত ভাণ্ডার,
তুমি জগৎজয়ী হয়ে ভগবান,
আমির কাছে মান্‌লে হার।"

এই হারমানাই তাঁহার লীলার চরম সীমা। হার না মানিলে কি প্রেম হয়? যেখানে জয়ী হইবার আশা থাকে, সেখানে প্রেম হয় না। প্রেমরাজ্যে যিনি যত হারেন, তিনি তত প্রেমিক। জননী ক্ষুদ্র শিশুর কাছে হারমানেন, এই হারাতেই মাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব প্রকাশ। জ্ঞানরাজ্যে যেমন একত্ব-বোধ, প্রেমরাজ্যে তেমনি দুয়ের মিলন ;— যুগল মিলন। এই একত্ববোধ ও দুয়ের মিলনের মধ্যে জগতের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বেদান্তের জ্ঞান, বৈষ্ণবের লীলা ; ইহার মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের পিতা-পুত্রের একত্ব এবং পিতার সহিত পুত্রের অনন্ত মিলন। গুপ্ত মহাশয় অদ্বৈতের মধ্যে এই দ্বৈতভাব সাধন দ্বারা পরম তত্ত্বে উপনীত হইয়া আপন ভাষায় প্রকাশ করিলেন ;—

"অদৈন্য সংসার দিয়ে
তবু মন উঠ্‌লনা তোমার
তাই তুমি হয়ে আমার—
"আমি" হইলে আমার।"

ব্রহ্ম আমার 'আমি।' কি গভীর তত্ত্ব-কথা। তিনি মানব-সন্তানের 'পরম আমি' পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আমার মধ্যে দুইটী 'আমি' আছে ; একটী কাচা আমি, আর একটী পাকা আমি। গুপ্ত মহাশয়ের

কথার মর্ম্ম আরও গভীর নহে কি? যাহাকে সাধারণ ভাবে 'আমি' বলা হয়, সেই আমিই তিনি অর্থাৎ তিনিই মানব-অন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি' রূপে অবতীর্ণ। এই তত্ত্বের মধ্যে একদিকে অদ্বৈত, আর একদিকে দ্বৈত; একদিকে অভেদ, আর একদিকে ভেদ। গুপ্ত মহাশয় স্বীয় জ্ঞানালোকে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। ডুবরী যেমন গভীর সমুদ্র জলে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করিয়া থাকেন, তিনি তেমনি সাধন-সমুদ্রে ডুবিয়া বাঞ্ছিত ধন পাইয়াছিলেন।

"ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই"

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উপাস্য দেবতা—পরব্রহ্ম, তিনি ধর্ম্মের নাম রাখিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মধর্ম্ম, এবং সমাজের নাম রাখিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মসমাজ।" পাছে মূর্ত্তি-পূজা, অবতারবাদ আসিয়া মানব প্রাণকে অধিকার করে, সেই আশঙ্কায় তিনি পৌরাণিক দেবতার নামে উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করেন নাই। ব্রহ্মনামের মধ্যে কোন আকার কিম্বা জড় ভাব নাই; ইহা খাঁটি চিন্ময় সত্তাবাচক নাম। নাম সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় রাজা রামমোহনের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনিই ব্রহ্মনামের সাধনা বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি ওঁ ব্রহ্মনাম এমন ভাবের সহিত উচ্চারণ করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তিনি ব্রহ্মনামের ধ্বনি করিয়া গমন করিতেন, আহার করিতেন, কার্য্য করিতেন। অন্তঃ সলিলা ফলগু নদীর ন্যায় তাঁহার অন্তরে নামের ধারা প্রবাহিত হইত। একবার প্রচার উপলক্ষে আমরা শিলচর নগরে গমন করিয়াছিলাম। প্রেমাস্পদ ভ্রাতা অমৃতলাল গুপ্ত এবং কাওরাদির উপাসকদল সঙ্গে ছিল। ষ্টিমার শিলচর-ঘাটে উপস্থিত হইলে গুপ্ত মহাশয় ডাঙ্গায় উঠিয়া আমাদের সকলকে লইয়া পাঁচ বার ব্রহ্মনাম-ধ্বনি করিলেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার জীবনে ব্রহ্মনামের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। শোকে, দুঃখে, ব্যাধি-যাতনায় ব্রহ্মনাম করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিতেন। ব্রহ্মনামের বলে পুত্র-শোকের তরঙ্গাঘাতেও তিনি কম্পিত হন নাই। তাঁহার রচিত অমর সঙ্গীত "ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই," কত শোকার্ত্ত, ব্যাধি-পীড়িত, মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত নরনারীকে শান্তি দান করিতেছে। ব্রহ্মনাম তাঁহার প্রাণে নবরসের সঞ্চার করিত।

"(নামে) পরাণ জুড়াইবে,
দুখ তাপ ফুরাইবে"

ইহা কথার কথা নহে। সত্য সত্যই এই নামে তাঁহার পরাণ জুড়াইত, দুঃখ তাপ দূরীভূত হইত। কেবল তাঁহার নহে; যাঁহারা তাঁহার মুখে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিতেন, তাঁহারাও ক্ষণকালের জন্য শান্তি লাভ করিতেন। তিনি ব্রহ্মনামের জীবন্ত সাধক ছিলেন। এ নাম তিনি স্মরণ করিতেন, মনন করিতেন, উচ্চারণ করিতেন এবং প্রচার করিতেন। নাম-রসে তিনি ডুবিতেন, মজিতেন, মাতোয়ারা হইতেন। ঐ নাম আস্বাদন করিয়া তিনি বিতরণ করিতেন;—

"ব্রহ্মনাম-সুধা
সদা দান কর আর
পান কর রে।"

ভারতবর্ষ নাম সাধনার দেশ। এখানে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানাবিধ নাম সাধন করিতেছেন। কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, রামজি, সীতামায়ী,

হনুমানজি প্রভৃতি কত দেবদেবীর নাম হিন্দুর দেশে অহরহ উচ্চারিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণও দয়াময়, শ্রীহরি প্রভৃতি নাম করিয়া থাকেন। জগতের আদি গ্রন্থ বেদের মধ্যেও নাম সাধনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিগণ কোন্ নাম সাধন করিতেন? কোন্ নাম সাধনার জন্য তাঁহারা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন? "ওঁ ব্রহ্ম" এই নামই ঋষিগণ যোগবলে লাভ করিয়াছিলেন। ওঁ একটী অক্ষর নহে; উহা স্বর। ঠাকুর কবি রবীন্দ্র নাথ শান্তি-নিকেতন নামক তাঁহার উপদেশে বলিতেছেন;—"ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল, এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্য্য আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ" কে পায়, সেখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁ-কে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত কর্লেন। বল্লেন চোকে দেখার মধ্যে এই হাঁ-কে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখ্‌লেন, চোকে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালও দেখে, মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে, খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কাণ, নাক, বাক্য, মন সর্ব্বত্রই সন্ধান করে দেখ্‌লেন, সর্ব্বত্রই খণ্ডতা আছে, সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌঁছলেন, তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই চোকও দেখ্‌চে, কাণও শুন্‌চে, নাসিকাও ঘ্রাণ কর্‌চে। এর মধ্যে যে কেবল একটা 'হাঁ" এবং অন্যটা 'না' হয়ে আছে, তা নয়, এর মধ্যে শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক যায়গায় হাঁ হয়ে আছে, অতএব শরীরের মধ্যে এই খানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস্, অঞ্জলি ভরে উঠ্‌ল।

ছান্দোগ্য বল্‌চেন, মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে, সেখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে স্বর, একদিকে সত্য, একদিকে ঐক্য লাভ করেছে, সেখানেই এই পরিপূর্ণতার সঙ্গীত ওঁ।" *

ওঁ শব্দের নানাপ্রকার আভিধানিক অর্থ প্রচলিত অর্থ থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার মৌলিক অর্থ এই যে, পরমেশ্বর স্বয়ং মানব অন্তরে বলিতেছেন—"হাঁ" আমি আছি;—'ব্রহ্মাস্মি' 'শিবোহং', 'অহং ব্রহ্ম।' এব্রাহিমের অন্তরে বলিয়াছিলেন, 'I am', আমি আছি। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষি-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, 'ওঁ', হাঁ' আমি আছি। মানব-অন্তরের গতি অনন্তমুখীন; মানব-হৃদয় তাঁহাকে চায়, আর তিনি বলেন,—"হাঁ"—"এসো সন্তান।" এই "হাঁ" লইয়া ধর্ম্ম। এই হাঁয়ের মধ্যে আশার বাণী শুনিয়া মানব প্রাণ তাঁহার দিকে ছুটিয়াছে।

ব্রহ্ম অর্থ বৃহৎ—অনন্ত, ভূমা। অনন্ত পরম দেবতা যিনি, তিনি সত্যরূপে জ্ঞান-আনন্দ-প্রেমরূপে, সৌন্দর্য্যরূপে প্রকাশিত।

* "শান্তি-নিকেতন" অষ্টম খণ্ড।

অতএব ওঁ ব্রহ্মনাম বিচিত্রস্বরূপ সমন্বিত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশক নাম।

এখন দেখা যাক্, ঋষিগণ এই নামের মহিমা কিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যম ও নচিকেতা-উপাখ্যানে এই মর্ম্মে লিখিত আছে যে,—ওঁ শব্দটী সাক্ষাৎরূপে ব্রহ্মের বাচক। এ শব্দটী দ্বারা কেবল ব্রহ্ম পদার্থই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং এ শব্দটীকে অবলম্বন করিলে এতদ্বারা ব্রহ্ম পদার্থের অনুভব সহজ হয়। একাগ্রচিতে, বিষয় চিন্তা না করিয়া অন্তরে এই ওঁ শব্দের উচ্চারণে, ব্রহ্মচৈতন্ত স্ফুরিত হইয়া উঠে—ব্রহ্মভাব, জাগরিত হইয়া উঠে।

শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদে এই মর্ম্মে বিবৃত আছে,—শব্দ স্পর্শাদির প্রকাশক বাক্য (শব্দ) পরিত্যাগ করিয়া কেবল, ওঁকার উচ্চারণ করিয়া সমাহিতচিত্তে—একাগ্রমনে—ব্রহ্ম-ভাবনা করিতে থাকিলে, সেই ওঁকার দ্বারা ব্রহ্ম-চৈতন্য অভিব্যক্ত হন। সেই অভিব্যক্ত চৈতন্যকে হৃদয়ে আত্মা বলিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। * * ওঁকার অভ্যাসে চিত্ত সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইলে, অতি সহজে বিনা বাধায় আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-চৈতন্য ফুটিয়া উঠিবেন।

কঠোপনিষদ বলিতেছে, সমস্ত বেদ যে পদ মনন করে, সমস্ত তপ যাহাকে নির্ব্বাচন করে, যাঁহাকে বাঞ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য চয়ন করে, সংক্ষেপে তোমার নিকট সেই পদ নির্দ্দেশ করি। তিনি ওঁ।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সমন্বয়কারী গীতাকার কৃষ্ণরূপী ভগবানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

"মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্মেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।
(১০ম অধ্যায়—২৫ শ্লোক)

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁকার, যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়।

গীতাকার কৃষ্ণের উক্তিতে অতি সরল ও স্পষ্টভাবে সাধনার এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওঁকার জপ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। ওঁকার জপের মহিমা গীতাকার সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যাঁহারা নাম সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একটী সাধারণ কথা এই, "নাম ও নামী এক।" অর্থাৎ যেই নাম সেই নামী। বালক যখন মাকে ডাকে, তখন 'মা' এই শব্দের প্রতি তার মন যায় না; মন যায়, মায়ের প্রতি। বালক মা নামের মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে পায়। মা ও মা নাম তার এক হইয়া গিয়াছে। সাধকের পক্ষেও তাহাই। তিনি নামের মধ্যে আরাধ্য দেবতার অনুভূতি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। গুপ্ত মহাশয় অতি সুস্পষ্টরূপে নাম ও নামীর অভেদ ভাব বর্ণন করিয়াছেন।* নাম-রূপ-সাগরে ডুবিলে কত

* ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র ভক্তি-শিক্ষার্থীর নিকটে এইরূপে নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন;—"হে ভক্তিশিক্ষার্থী, নাম অমূল্য ধন, যদি বস্তুতে প্রেম হয়, বস্তুর নামে প্রেম হয়। বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্তু নহে। যে কথা বলিলে সেই বস্তু বুঝায়, সেই কথা বস্তুর সঙ্গে থাকাতে সেই কথাতেই মত্ততা হয়। যদি বস্তু সুন্দর হয়, যদি বস্তু প্রিয় হয়, তাহার নামও প্রিয় হয়, যদি বস্তু তিক্ত হয়, তাহার নামও তিক্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে, তাঁহার সম্বন্ধীয় সমুদয় বস্তু এবং জীবের প্রতিও প্রেম হয়। তবে তাঁহার নামের প্রতি যে প্রীতি হইবে, আশ্চর্য্য কি? নামেতে তাঁহাতে প্রভেদ নাই। নামকে

রত্ন পাওয়া যায়, তাহা বলিয়াছেন। নামের মধ্যে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম; নামের মধ্যে প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন; নামের মধ্যে সর্ব্বরত্ন।

"নাম আমাদের লক্ষ্য পথরে,
এই নাম আমাদের সার,
নাম রূপেতে পরাণ ব্রহ্মরে,
জীবে জীবে অধিষ্ঠান রে।"

কিরূপে নাম স্মরণ করিতে হয়, উচ্চারণ করিতে হয়? তিনি বলিয়াছেন;—

"ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ হে।"

যে ভারতের তপোবনে, নৈমিষারণ্যে, শান্তিকুঞ্জে, আশ্রমে ওঁ শব্দ উচ্চাচরণদ্বারা মন্ত্র পঠিত হইত, প্রণবমন্ত্রসহ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে সাম-গীত হইত, সেই দেশে এখন ওঁ শব্দ ব্যবহার কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিবার ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণ-পত্নীগণেরও ওঁ বলিবার অধিকার নাই। গুপ্ত মহাশয় যেমন ওঁ ব্রহ্মনাম সাধন করিতেন, তেমনি ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও ঐ নাম প্রচার করিতেন। এ বিষয়েও তিনি জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একাকী অথবা সদলে পথে, ঘাটে, বাজারে গমন করিবার সময় সর্ব্বদা ওঁ ব্রহ্ম নামের ধ্বনি করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন, তাঁহার পদার্পণ মাত্র লোকে বুঝিতে পারিত, ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী। এমন ভাবে ওঁ ব্রহ্মনাম সাধনও প্রচার ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই। তিনি যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রহ্ম নামের গান গুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রহ্মনামে তাঁহার প্রাণে ভাবের জোয়ার আসিত। প্রাণ ছাপিয়া জোয়ার বহিত। তাতে তিনি ভাসিয়া যাইতেন, অপরকেও ভাসাইতেন।

'সিংহনাদ তুলি বলিয়ে ওঁকার,
প্রেম রাগে রাগি ছাড় হুহুঙ্কার,
সত্যের রণে সাজি ভয় কর কার,
থাকিতে অভয় নাম।"

সমাদর করা আর বস্তুকে সমাদর করা এক যে নামেতে মত্ত হয় নাই, সে প্রেমে মত্ত হয় নাই। কিন্তু এই নাম সম্বন্ধে একটি কথা তুমি বিবেচনা করিবে। নামে মত্ততা আগে না পরে? কেহ কেহ বলে, নিকৃষ্ট সাধকের জন্য নাম সাধন আবশ্যক। মুখে একবার নাম উচ্চারণ করিলে মূঢ়তম ব্যক্তির পরিত্রাণ হয়। এই কথায় সায় দিব কিনা? বস্তুর আগে নাম না পরে নাম? সাধারণ চলিত মত এই, যিনি বস্তু ধরিতে পারেন না, তাঁহারই পক্ষে নাম সাধন বিধেয়; কিন্তু ইহা যথার্থ মত নহে। বাস্তবিক তিনিই নামের মহিমা বুঝিতে পারেন, যিনি বস্তুর মহিমা বুঝিয়াছেন। বস্তু দেখিয়া মুগ্ধ হইলে অর্থাৎ আগে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম অনুরাগ হইলে পরে সেই বস্তুর নামেও প্রেম হয়। ইহা যথার্থ ভক্তি শাস্ত্রের সত্য। অনেক সময় এমন হয় যে, ঈশ্বর দর্শন হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, সে সকল সময় কেবল নাম করিলেই কার্য্য সমাধা হইল। সুতরাং তাহাদের মতে নিকৃষ্ট ব্যাপার হইল। কিন্তু ভক্তের পক্ষে নাম সাধন ঈশ্বর দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নহে। বরং উৎকৃষ্টতর ব্যাপার। কেননা বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে তাঁহার নামে যথার্থ মত্ততা হয় না। তিনি যদি বারম্বার আমার কাছে না আসিয়া থাকেন, তবে তাহার নাম আমার কাছে অপরিচিত ব্যক্তির নামের ন্যায় আসিবে। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে প্রগাঢ় মত্ততা হয়, তখনই তাঁহার নামে মত্ততা হয়। তবে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না হইলে প্রথম অবস্থায় নাম করিবে না? বারংবার নামোচ্চারণ করিলে পরিত্রাণ পাইব, এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করা বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক।" (ব্রহ্মগীতোপনিষৎ—দ্বিতীয়ার্দ্ধ)।

তিনি পরলোকে বাস করিতেছেন, সেখান হইতে যেন তাঁহার মধুর ব্রহ্মনাম-গানের ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে ;—"ব্রহ্মনাম সুধারসে

ডুব্ দিয়ে মন থাক্‌রে !
তোর দুখেতে সুখ উপজিবে,
ঘুচিবে বিপাক্‌রে।"

অপূর্ব্ব পারমার্থিক সঙ্গীত। যেমন ভাষা, তেমনি ভাব, অতুল্য অমূল্য নাম গান।

"নামে প্রেম উথলে, যখন মনে,
বুড় নাচে ছেলের সনে,
সমান ভাবে গ'ণে আনে,
এক পয়সা আর লাখ্‌রে।"

যখন প্রাণে নামানন্দের উদয় হয়, তখন বৃদ্ধগণ বালকদিগের সঙ্গে নৃত্য করে এবং নামানন্দের উদয় হইলেই লক্ষ টাকা এক পয়সার সমান হইয়া যায়। সাধক রামকৃষ্ণ "মাটি টাকা, টাকা মাটি" সাধন করিতেন। নাম-সাধকগণ নামানন্দের ভিতর দিয়া এক পয়সা এবং লক্ষ টাকাকে সমান জ্ঞান করেন।

"ব্রহ্মনাম রসে মজিলেরে মন,
ঘুচে যাবে সকল বেদন ;
যেই রসে হয় সকল সরস
এমন মধুর চাক্‌রে।"

রস না পাইলে ধর্ম্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা, জীবন বৃথা। ব্রহ্ম-রসে সঞ্জীবিত আত্মা সকল অবস্থায় উৎসাহিত, পুলকিত থাকেন। তাঁহার এক বিন্দু রস স্পর্শে সকল নীরসতা দূরে যায়, প্রাণে নব বসন্তের সমাগম হয়। ব্রহ্মনাম যে মধুর চাক্ ;—

"(হৃদে) পরশ ন'লে হাজার ক'লে,
কেবল ত্যক্ত হবে ব'লে ব'লে
এই রসে না রসিক হলে
মানব জনম ফাক্‌রে !"

পাখীর মুখের শেখা বুলির মত এ নাম জিহ্বাগ্রের নাম নহে হৃদয়ের নাম।

গুপ্ত মহাশয় যেমন সাধক ছিলেন, তেমনি প্রচারক ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রচার করিতেন না। তাঁহার জীবনে সাধনা ও প্রচার একীভূত হইয়াছিল। অথবা ইহা বলিলেই ঠিক হয়, তাঁহার এমনি সরস জীবন্ত সাধনা ছিল যে, সেই সাধনাই তাঁহাকে প্রচারে প্রমত্ত করিয়া তুলিত। তাঁহার গানগুলি যেমন সাধনাময়, তেমনি প্রচার-ভাবোদ্দীপক ;—

"ব্রহ্মনামামৃত পান কর !
(এ নাম) ঘরে ঘরে নারীনরে দান কর।
প্রেম-সুধা খেয়ে খেয়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে, গেয়ে
ঘরে ঘরে নারী নরে নৃত্য কর ;
পরাণ জুড়াইবে, দুখ তাপ ফুরাইবে,
হৃদাকাশে প্রকাশিবে দিবাকর।
(এনাম) শুনিতে বলিতে সুখ,
স্মরণে জুড়ায় বুক,
পাষাণ হৃদয় ভেদি গঙ্গা ঝরে ;
শিহরে শরীর মন,
প্রেমে ঝরে দুনয়ন,
ছুটে করে পলায়ন পাপ ভার।"

রাত্রি দিবার ন্যায়, যুক্তাক্ষরের ন্যায় সাধনা ও প্রচারের দ্বিবিধ ভাব একীভূত হইয়াছে, এই সঙ্গীতে। এটী একটী অপূর্ব্ব সঙ্গীত। যিনি নাম-সুধা পান করেন না, তিনি কি করিয়া তাহা বিতরণ করিবেন? আগে পান কর, তার পর দান কর। "প্রেম-সুধা খেয়ে খেয়ে, ব্রহ্ম নাম গেয়ে গেয়ে, ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নৃত্য কর।" কি চমৎকার কথা। কি সুন্দর উপদেশ। আপনি খেয়ে, পরকে বিলাও। ইহাকেই বলে সাধনা ও প্রচার।

"ব্রহ্মনাম কি মধুররে ভাই ;
নামের বালাই নিয়ে মরে যাই।
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে
মরলে নবীন জীবন পাই।"

এ কয়টী কথায় কি আশার বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মনাম মধুময়। এ নামে দুঃখ যায়, পাপ যায়, হৃদয়ে নব আনন্দের উদয় হয়। এ নাম প্রাণ জুড়ানো ধন। এ নাম পরশরতন। এ নামে অসম্ভব সম্ভব হয়। পাষাণ সমান কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়। মৃত্যুর পর অমৃত জীবন লাভ হয়। ব্রহ্ম নামেই মুক্তি, ব্রহ্ম নামেই স্বর্গ ;—

"ব্রহ্ম ব'লে যখন জীব
আনন্দে উথলে,
(তখন) সশরীরে স্বর্গে যাওয়া
আর কাহাকে বলে ?"

ব্রহ্মনাম সাধনার অপূর্ব্ব ফল গুপ্তমহাশয়ের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ব্রহ্মনামে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি ব্রহ্মনামে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ভাবসঙ্গীত—ভাবসঙ্গীত গুপ্তমহাশয়ের অতুল সম্পত্তি। এই সম্পত্তি তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতা পরব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা যে কেবল তাঁহার সম্পত্তি, তাহা নহে ; বঙ্গসাহিত্য এই সম্পত্তি পাইয়া লাভবান হইয়াছে। গুপ্তমহাশয় সুজলা, শস্য-শ্যামলা পূর্ব্ববঙ্গের প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাটিয়াল-গান পূর্ব্ব বাঙ্গালার নিজস্ব ধন। ভাটিয়ালগানকে জলময় নিম্নবঙ্গই সৃষ্টি করিয়াছে, পরলোকগত সঙ্গীত-অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মর্ম্মে বলেন যে, "যুগযুগান্তর ধরিয়া এক এক স্থানে এক একটী সুর জনসমাজের দ্বারা ধ্বনিত বা গীত হইয়া থাকে। সেই সুরের সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষ নহে ; স্থানীয় জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জনসমাজের হৃদয়।" কৃষ্ণধন বাবুর এই কথা সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও ইহার মধ্যে আংশিক সত্য আছে। অনেক রাগিণী এই ভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূলতানপ্রদেশে বহুকাল ধরিয়া যে সুর-লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইত, যে সুরে গান গাহিয়া মূলতানীগণ আনন্দ পাইত, সেই সুরই পরিশেষে মূলতান রাগিণী নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপেই কর্ণাটী, গুর্জ্জরী, বাঙ্গালী, সুরট, মহিশুরী প্রভৃতি রাগিণীর নামকরণ হইয়াছে। নাগপুরী কুলীরা তাহাদের স্থানীয় সুরে গান করে, সেই সুর অপর দেশে শোনা যায় না। সে সুর তাহাদেরই দেশে, তাহাদের জলবায়ুতে সৃষ্ট হইয়াছে।

ভাটিয়াল সুরের সৃষ্টি কোথায় ? বরষা-প্লাবিত পূর্ব্ববঙ্গের হাউরে, (মাঠে) সুনীল আকাশ-আচ্ছাদিত বিরাট শ্যামক্ষেত্রে, কুল-প্লাবনী নদী-বক্ষে। কৃষকগণ দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া যখন নৌকা বাহিয়া গৃহাভিমুখে গমন করে, তখন উৎসাহের সহিত তালে তালে বৈঠা বাহিয়া ভাটিয়াল গান করিতে থাকে। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতেছে ; তাহার ম্লান কিরণ জলমগ্নপ্রায় শস্য-শীর্ষে পতিত হইয়া স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে ; উপরে সচল মেঘভরা বর্ষার আকাশ, নীচে নীলবসনে আবৃতা বসুন্ধরা। এ সময়ে ভাটিয়াল স্বীয় মোহনমূর্ত্তিতে কৃষক মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই নৌকা-বাহী কৃষকগণের মুখে যাঁহারা ভাটিয়াল গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্বর, সেই গ্রাম্য-ভাষার পদ, গায়কগণের সেই উচ্ছ্বাস কখনও

ভুলিতে পারিবেন না। সেই দূরশ্রুত গ্রাম্য-সঙ্গীত শ্রোতার মনকে ভাবাবেশে মুগ্ধ করিয়া থাকে। গুপ্তমহাশয় যে সকল অমর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ভাটিয়াল সুর।

"দরদি! আমার মন কেন উদাসী হতে চায়," এ গান সুর, ভাব. এবং কথায় একটী অতুল্য, অমূল্য ভাটিয়াল গান; সুর, ভাব, কথার অপূর্ব্ব সমাবেশ। গুপ্তমহাশয় গ্রাম্য সুরে, গ্রাম্যভাষায় ভাবসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গান সম্পূর্ণ দেশজ। এইজন্যই ভাবসঙ্গীত সর্ব্বসাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

তিনি তাঁহার সঙ্গীতের নাম দিয়াছেন, "ভাবসঙ্গীত।" তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কয়টী কথা লিখিয়াছেন, তাহার শিরোনাম দিয়াছেন,—"ভাব কথা।" এই ভাবের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরকে প্রেমের মধ্যে জ্ঞান-চক্ষে দর্শন কর, 'নেতি নেতির' পথে নহে;—

"অভাবে পায় কে তাঁরে,
ভবে ভাব বিনা কি লাভ আছেরে।
সেই ভাবের ব্রহ্ম, তার কি মর্ম্ম,
পায় নাই—'নাই' করে করে।"

* * *

"ভাবুক হলে ডুবে জলে
সত্য মিথ্যা জান্‌তে পারে;
অভাবে যার হা হতোস্মি
সে জান্‌বে তা কেমন করে।"

এখানে গুপ্ত মহাশয় স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, "ভাবুক হলে, ডুবে জলে, সত্য মিথ্যা জান্‌তে পারে", অর্থাৎ যিনি প্রেমিক নহেন, তিনি কেবল জ্ঞানের কস্‌রত্ করিয়া সত্য কি মিথ্যা কি, ব্রহ্মের সহিত জড়জগতের ও মানবের সম্বন্ধ কি, তাহা জানিতে পারেন না। ভাবুক ব্যক্তিরই জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আছে, বিচারদ্বারা সত্য মিথ্যা নিরূপণের অধিকার আছে। যিনি ভাবুক নহেন, তাঁহার প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া অসম্ভব।

"নেতি নেতির" দিক,—পুরুষকারের পথ। "ব্রহ্ম ইহা নয়, উহা নয়","ব্রহ্ম এখানে নাই, ওখানে নাই," "আমি ব্রহ্মকে খুঁজিয়া বাহির করিব" ইহাই হইল পুরুষকায়ের কথা। ব্রহ্মকে এরূপে খুঁজিয়া কেহ বাহির করিতে পারে না; পুরুষকার ব্যর্থ হইয়া যায়। বহু-শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না; ব্রহ্ম যাহাকে বরণ করেন, কেবল সে-ই জানিতে পারে। প্রত্যেক মানবের নিকটেই পরব্রহ্ম যথোপযুক্তরূপে আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছেন। আমি ত তাঁহারে চাহি না; তিনিই আমাকে চাহিয়াছেন; তিনি আমাকে জগতে আনিয়াছেন, নানা বেশভূষায় সাজাইতেছেন, তিনি আমাকে নানা রসে ডুবাইতেছেন;—

"কত রসে কাছে বসে প্রাণ-ব্রহ্ম গো!
আমায় মজালে গো আমায় মজালেগো।
মজাইলে জাতি মান,
ভুলাইলে কুল জ্ঞান,
কি দিয়ে যে কি আমারে করিল
করিল গো।"

জীবনে পরমেশ্বরের করুণা দর্শন না করিলে ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয় না। সুখে দুঃখে জীবনে মরণে তাঁহারই করুণা।

'যথায় প্রেমোদয়,
তথায় সকলি সদয়,
(তথায় দ্বিধা আসে সিধা হয়ে,
দিতে প্রেমের পরিচয়।"

সাগর যেমন নদীকে তাহার দিকে

আকর্ষণ করে, সাগর-টানে—সাগরের পানে সে ছুটিয়া যায়; কত বাধা বিঘ্ন, কত শৈল-শেখর লঙ্ঘন করিয়া—ভেদ করিয়া ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী সাগরের দিকে মহা বেগে ছুটিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্ম-টানে—ব্রহ্ম-পানে মানবাত্মা ছুটিয়াছে। এই ব্রহ্মটান যিনি নিজ হৃদয়ে অনুভব করিলেন, তিনিই ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সকল দেশেই অধিকাংশ সাধক জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া কেবল দেশগত, সমাজগত সাম্প্রদায়িক ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে করেন, ইহাই প্রকৃত ভাব। কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া সাধকের এই ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া দেয়। বিচারমূলক জ্ঞানের সহিত সে ভাবের ঐক্য নাই, তাহা প্রকৃত পক্ষে ভাব নহে—তাহা ভাবুকতা, উন্মত্ততা, এক প্রকার মাদকতা।

কেন জগতে আসিলাম? কে আমাকে আনিলেন? জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কোথায়? এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে কত গোলমাল চলিতেছে, কত দার্শনিক, কত চিন্তাশীল লেখক, কত সাধক এ বিষয়ে কত প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে গুপ্ত মহাশয় স্বীয় জ্ঞানালোকে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা অতি সোজা কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম আমাকে ভালবাসিবেন বলিয়াই জগতে আনিয়াছেন, আমি কর্ম্মফলের দোষ বা গুণের জন্য জগতে আসি নাই। তাঁহার প্রেম পাইতে এবং তাঁহাকে ভক্তি অর্পণ করিবার জন্যই আমার জগতে আগমন।

"তুমি করিয়ে মনন,
করিলে মোরে সৃজন,
আমি কি তা তুমি জান,
কে জানে তোমার মতন।"

* *

"আমাকে তোষিতে
তোমার জগৎ-ভাণ্ডার।"

তত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন দ্বিবিধ ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সাধন রাজ্যেও তেমনি দ্বিবিধ সাধনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দল সাধক বলেন, তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ যেমন জলান্বেষণের জন্য ছুটে, তেমনি, আমার প্রাণ তোমার জন্য ছুটিয়াছে; তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না; তুমি আমাকে দেখা দিয়ে রক্ষা কর, ইত্যাদি। আর এক শ্রেণীর সাধক বলেন, হে দেব! তুমি আমার অপেক্ষা রাখ না, আমি না ডাকিতে আপনি আসিয়া হৃদয়ে বসিয়াছ। তোমার অহেতুকী প্রেমে তোমাকে লাভ করিয়া চিত্ত ধন্য হইতেছে। তুমিই মানবের জন্য ব্যস্ত; মানব কি তোমার জন্য ব্যস্ত? তুমি মানুষকে চাও, মানুষের হৃদয় চাও বলিয়াই মানুষ তোমাকে চায়। তুমি ত স্বর্গে বাস কর না; বাস কর—মানবের প্রাণে। মানব-প্রাণই স্বর্গধাম। মানব-হৃদয় ভিন্ন স্বর্গধাম আর কোথাও নাই। এইরূপ দর্শন করাই লীলা-দর্শন। এই লীলাই ভাবের চরম সীমা। এই লীলা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া—এই ভাব-সাগরে ডুবিয়া গুপ্তমহাশয় গাহিলেন;—

"তুমি যোগী যোগেরি আকার
আত্মা রূপে যোগ-সাধনা কর নিরন্তর।"
অনন্ত জীবনে আছ,
যোগ ভাঙ্গে হেন সাধ্যকার।"

সেই পরমপুরুষ পরব্রহ্ম সাধকরূপে—পুত্ররূপে যোগ সাধনা করিতেছেন। ভাবের কি উচ্চতম অভিব্যক্তি, রসের কি গভীরতম

প্রকাশ। কিন্তু একথা পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য যে, এই ভাবের মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত, ব্রহ্ম-জীব, পিতা-পুত্র-সম্বন্ধবিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব। যখন সাধক ব্রহ্ম হইতে আপনাকে দূরে অনুভব করিয়া—আপনাকে অসহায়, অনাশ্রিত ভাবিয়া পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হন, তখন তাঁহার প্রথম অবস্থা। যখন নিজের মধ্যে পিতা-পুত্র-রূপে, সখা-সাথী-রূপে ব্রহ্মদর্শন হয়, যুগল মিলন প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখনই প্রকৃত যোগের অবস্থা। এই যোগের গোমুখী হইতেই ভক্তি-গঙ্গা-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। ভাবরাজ্যের ইহা নিগূঢ় তত্ত্ব। উপনিষদের ভক্তি-ধারার অমৃত ফল—"দ্বাসুপর্ণা।" একের মধ্যে দুয়ের মিলন।

"ব্রহ্ম পরমাত্মা সার
আমরা সবে দেহ তাঁর,
তার কাজেই নড়ি চড়ি এই ত সমাচার।
যেমন আমার কাজে
আমার দেহরে,
চলে ফিরে বহে ভার।"

ধর্ম্মমণ্ডলী—ধর্ম্মভাব এবং সাধনা অনেকের আছে, কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না; ইচ্ছা থাকিলেও সকলে মণ্ডলী গঠন করিতে সমর্থ হয় না, ইহার কারণ কি? আমাদের সমাজে কত নমস্য, ভক্তিভাজন ব্রাহ্ম কলিকাতায় ও মফঃস্বলে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সাধুতা, ধর্ম্মপরায়ণতার কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মসাথী—ধর্ম্মপুত্র একজনও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কেন এমন হয়? ইহা একটী গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত কথা গুলি স্মরণ হইতেছে। জগতের ধর্ম্মের ইতিহাস এবং স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ মণ্ডলী হউক, মণ্ডলী গঠনে নিম্নলিখিত মাল মসলার প্রয়োজন;—

প্রথম,—ধর্ম্মতে সুদৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস অন্যের পক্ষে কুসংস্কার, অজ্ঞানতামূলকও হইতে পারে; কিন্তু মণ্ডলীর কর্ত্তার সেই বিশ্বাসে সুদৃঢ় থাকা চাই।

দ্বিতীয়—সাধনার একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী (Definite system) থাকা চাই এবং তাহা প্রাণপণে অবলম্বন করা চাই।

তৃতীয়—প্রাণভরা প্রেম চাই। প্রেমেতেই মানবচিত্ত আকৃষ্ট হয়; প্রেমেতেই স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তির উদয় হয়, মণ্ডলী গঠিত হয়।

চতুর্থ—প্রচারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। যাঁহার সাধনা আছে, অথচ প্রচারের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার দ্বারা মণ্ডলী গঠিত হয় না।

পঞ্চম—ঐশীশক্তি বা ব্রহ্ম-কৃপায় প্রবল বিশ্বাস থাকা চাই। নিশিদিন প্রাণে এই ভরসা জাগ্রত রাখা চাই যে, "হবেই হবে।"

গুপ্তমহাশয়ের জীবনে উপরিউক্ত সকল গুলি গুণ ছিল। তিনি জ্বলন্ত ভাবে বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মনামেই জীবের কল্যাণ হয়, মুক্তি হয় এবং ভাবের পথই সাধনার পথ, অভাবের পথ সাধনার পথ নহে। জীবনের সকল ঘটনায় আপনাকে না দেখিয়া ব্রহ্মকে দেখাই যোগ। যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, তাহা সত্য ভাবে দেখা, শোনা, ভোগ করাই যোগ। এ সকল সত্যে তিনি এমনই সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, কেহ যদি বলিত "আমি পাপী, আমাকে ত্রাণ কর," তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি

যাহা বলিতেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"হে মানব! তুমি "আমি পাপী, আমি পাপী" না বলিয়া—আপনার কুৎসিত পাপগুলিকে না দেখিয়া পরমেশ্বরের স্বরূপ-চিন্তা কর, তাহা হইলে পাপের বীজ নষ্ট হইবে, তুমি বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিবে। পাপীতাপী বলিয়া কেবল নিজের দিকে তাকাইয়া থাকিলে পরমেশ্বরের দিকে মন যাইবে না, তোমার পাপও দূর হইবে না। সর্ব্বদা পরব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তা ও মনন কর।" তিনি ব্রহ্মনাম সাধনার এমন একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন যে, একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নগর-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে একটীও ব্রহ্মনাম নাই দেখিয়া "কি নগর কীর্ত্তন? একটীও ব্রহ্মনাম নাই" বলিয়া কাগজখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়—তাঁহার সাধনার একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—ঈশ্বরের মহিমাসূচক কথা শ্রবণ। তাঁহার দয়া, আনন্দ, সৌন্দর্য্য এবং লীলার কথা নিয়ত শ্রবণ করা—অভাবের কথা নহে। তিনি আছেন, অনন্ত জ্ঞান প্রেম আনন্দ পুণ্য সুন্দর রূপে আছেন, এই বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা। ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তন, ব্রহ্মনাম স্মরণ এবং পরব্রহ্মকে আত্মার আত্মারূপে ধ্যান করাই তাঁহার সাধনা ছিল।

তৃতীয়—তিনি প্রেমিক সাধক ছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি, পত্নী-প্রীতি, সন্তান-বাৎসল্য, আশ্রিত জনের প্রতি করুণা বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। তাঁহার এই প্রেমেতেই কাওরাদির মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। কাওরাদিতে তাঁহার জমিদারী। কেহ মনে করিতে পারেন, তিনি যে স্থানে জমিদার, সেখানে নানাপ্রকার স্বার্থে আকৃষ্ট হইয়া দু চার জন লোক যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এ কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেছি, যাঁহারা গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রজা নহেন। আর্থিক অভাবে পতিত হইয়াও তাঁহারা ব্রাহ্ম হন নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান উপবীত পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ভ্রাতার সহিত আহার করা সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। গুপ্ত মহাশয়ের প্রেমিক হৃদয় এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। তিনি মণ্ডলীর নরনারীর সঙ্গে এমনভাবে মিশিতেন যে, তাঁহাকে সকলে আপনার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিত। গুপ্ত মহাশয়ের হৃদয়ের টানে তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছিলেন।

চতুর্থ—গুপ্ত মহাশয় যেমন সাধক ছিলেন, তেমনি প্রচারক ছিলেন। সাধনা ও প্রচার দুই একীভূত হইয়াছিল, তাঁহার ধর্ম্মজীবনে। বাস্তবিক ভক্তির ধর্ম্মে সাধনা ও প্রচার একই বস্তু। সাধন করিতে গেলেই প্রচার হয়। ভক্তির ধর্ম্মে কেবল একাকী সাধন হয় না; সকলকে লইয়া পরমেশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে হয়, এখানেই প্রচার। কাওরাদির উৎসবে গুপ্ত মহাশয়ের মধ্যে সাধনা ও প্রচারের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়াছি।

পঞ্চম—ব্রহ্ম-কৃপায় তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকলই ব্রহ্মের করুণা। তাঁহার করুণা নানা ভাবে—নানা মূর্ত্তিতে—বিচিত্ররূপে উপস্থিত হয়। এই করুণা দর্শনেই পুরুষকারের অবসান, অহংভাবের অবসান এবং ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। স্থূলভাবে এই বলা যায়, গুপ্ত মহাশয় সাধারণ ভাবে ছিলেন জ্ঞানী সাধক, বিশেষ ভাবে ছিলেন, ভাববাদী, কৃপাবাদী।

বাস্তবিক যে সকল গুণ থাকিলে, সাধকগণ মণ্ডলী গঠন করিতে সক্ষম হন, গুপ্ত মহাশয়ের

মধ্যে সে সকল গুণ ছিল। এজন্য তিনি কাওরাদিতে ব্রহ্মনাম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। যদিচ তাঁহার মণ্ডলী অতি ক্ষুদ্র, যদিচ অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার নিকটে সেই মণ্ডলী সুপরিচিত নহে; কিন্তু উক্ত মণ্ডলী যে আমাদের নিকটে আশার বাণী আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি করিয়া মণ্ডলী গঠন করিতে হয়, গুপ্ত মহাশয়ের জীবন এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্ম-কৃপাবাদ গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্ব কথা। ব্রহ্মকৃপাতে তিনি অটল বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনে ব্রহ্মকৃপার লীলা দর্শন করিতেন। তাঁহার করুণা দর্শনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেন না। বাস্তবিক স্বীয় জীবনক্ষেত্র ভিন্ন প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মকৃপা দর্শনের আর স্থান কোথায়? গীতাকার জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কৃপাবাদী ভক্ত বলেন, এক ব্রহ্ম-করুণার স্রোতেই জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম প্রভৃতি শত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের মূলে ব্রহ্ম কৃপা ভিন্ন আর কি আছে? বুদ্ধের জ্ঞান, যীশুর বিশ্বাস, শঙ্করাচার্য্যের বিচারের মূলে ব্রহ্মকৃপা ছাড়া আর কি আছে? মানব প্রতিদিন ব্রহ্মকৃপায় জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে, পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছে। শয়ন ভোজন ভ্রমণ যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলের মূলে ব্রহ্ম-কৃপা। জ্ঞানীর অহং ভাব দূরীভূত হইলে দেখেন—ব্রহ্মকৃপা, কর্ম্মীর অহং ভাব দূরীভূত হইলে দেখেন—ব্রহ্মকৃপা, ভক্তি সাধকের অহং ভাব দূরীভূত হইলেই তিনি ব্রহ্মকৃপা দর্শন করিয়া বিমলা ভক্তি লাভ করেন।

জ্ঞানী যতদিন অহঙ্কারের রাজ্যে বাস করেন, ততদিন ভাবেন,—"আমি জ্ঞানী। কর্ম্মী। যতদিন অহঙ্কারের রাজ্যে বাস করেন, ততদিন ভাবেন "আমি কর্ম্মী।" এমন কি যতদিন ভক্তি-সাধক অহঙ্কারের রাজ্যে বাস করেন, ততদিন ভাবেন, "আমি ভক্তিসাধন করিতেছি," কিন্তু অহঙ্কারের রাজ্য পার হইয়া গেলে সকলেই দেখিতে পান, সকলই ব্রহ্মের করুণা। গুপ্তমহাশয় ব্রহ্মকৃপাকে বলিয়াছেন, সাগর এবং জীবনকে বলিয়াছেন ভেলা।

"সাগর জলে জাহাজ চলেরে,
জাহাজ ঝড় তুফানে ডুবে;
সেই তরঙ্গে কে দেখেছে রে,
কলার ভেলা ডুবে কবে রে
সাগরের তরঙ্গ পেলে রে
ভেলায় আনন্দ উথলে;
সেই তরঙ্গের চূড়ায় বসেরে
ভেলা ব্রহ্ম-দোলায় দোলেরে।
তুল্‌তে তুল্‌তে যখন ভেলারে,
পাটে পাটে খ'সে যায়,
কতই রঙ্গে তখন ভেলা রে,
সাগর-সঙ্গ লাগায় গায়রে।"

গুপ্তমহাশয়ের কোন কীর্ত্তনটী উৎসবাদিতে যুবকবৃদ্ধ-নরনারী প্রমত্তভাবে গাহিয়া থাকেন? উৎসবাদির আদি, মধ্য, অন্তে বারবার গাহিয়াও উপাসকগণ নিরস্ত হন না, সেটী কোন্ কীর্ত্তন? সেটী ব্রহ্মকৃপার দেবসঙ্গীত—ভাবসঙ্গীতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যতদিন ব্রাহ্মের রসনা সচল আছে, এই গান গাহিবে। গুপ্ত মহাশয় পরলোকে, আমরা ইহলোকে; এই শুভ মুহূর্ত্তে ইহ-পরলোকের ভেদ ঘুচিয়া যাক্, আমরা তাঁহার সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গাহি;—

"বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

পাইলে ব্রহ্ম কৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয়-কাননে ফুটিবে ফুল
চারিদিক হবে সৌরভে আকুল,
ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং।
জীবনের যত পাপ তাপ ভার,
ব্রহ্মকৃপাগুণে হবে ছারখার,
মরণ ঘুচিবে, জীবন বাঁচিবে হইবে নির্ম্মলং।
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার
উথলিবে প্রেমসিন্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম-কৃপাগুণে
কি করিবে শোকতাপের আগুনে,
ব্রহ্মবলে বল কর সেইগুণে হওনা বিকলং।

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। (৩)

"বিগত ৩০শে জুন, শুক্রবার, উষাকালে উৎকলের কটক নগরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, "ষ্টার-অফ-উৎকলে"র সম্পাদক ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

ইনি বড়িশার সাবর্ণচৌধুরী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।—পরিণতবয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনিই বাঙ্গালীকে প্রথমে ডারুইনের 'থিয়োরী' বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহার "মানব-প্রকৃতি" দুই ভাগ তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মাসিকপত্র সমূহে তাঁহার বহু সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিবৃতিতেই তাঁহার আনন্দ ছিল—সে ক্ষেত্রে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার পরিচয় থাকিবে।

অধ্যাপনায় তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কটক কলেজেই তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হয়। কটকেই তিনি বাস করিয়াছিলেন, উৎকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি উড়িয়া জাতির কল্যাণেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। "ষ্টার-অফ্ উৎকলে"র প্রচার করিয়া ক্ষীরোদ বাবু উড়িয়াদিগকে নব জীবনে অনুপ্রাণিত করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট "ষ্টারের" জামীন চাহেন। ক্ষীরোদ বাবু জামীন দিলেন না, কাগজ তুলিয়া দিলেন।

ক্ষীরোগ বাবু তাঁহার প্রিয় উপনিবেশ উৎকলে যে আদর্শ লইয়া গিয়াছিলেন, উৎকলবাসীর জীবন যদি তাহার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে উৎকল "ষ্টারের" ঋণ, ক্ষীরোদ বাবুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।

বাঙ্গালার বাহিরে বৃহত্তম বঙ্গের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, ক্ষীরোদ বাবু তাঁহাদের অন্যতম। ইহারা বাঙ্গালার কর্ম্মশক্তির আধার, দেশাত্মবোধের অগ্রদূত।—ইহারা অন্ধকার দেশে আলো লইয়া যান। প্রভাতী মঙ্গলালাপে আত্মবিস্মৃত জাতির ঘুম ভাঙ্গাইয়া জাগাইয়া দেন। নিদ্রিত স্বদেশ ও স্বজাতির মায়া কাটাইয়া, বাঙ্গালার ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর বঙ্গে—অখণ্ড ভারতের সার্ব্বজনীন জাতীয় ক্ষেত্রে আপনাকে ছড়াইয়া বিলাইয়া দেন। ইহারা বাঙ্গালীর গৌরব,

জাতীয়তার মন্ত্র-দ্রষ্টা। ভেদের রেখা মুছিয়া দিবার জন্য ইহারা জগতে আসেন। আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য প্রণিপাত করেন। ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁহাদের একজন। তিনি কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শেষ কয় দিন উৎকলের সেবায় উৎসর্গ করিয়া, উৎকল বাসীকে মাতৃমন্ত্র দান করিয়া, জীবন ধন্য ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।—ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণবিধান ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।" বাঙ্গালী —১০ই জুলাই, ১৯১৬।

"A special Divine Service will be offered at "Hermitage" Cuttack, on the 12th July next on the death of Babu Khirodchandra Roy, the reputed editor of the "Star of Utkal" which melancholy event took place at 5-30 a m. on the 30th June last." Bengalee -12th July, 1916.

"Another death we have the melancholy duty of chronicling this week. It is that of Babu Kshirod Chandra Rai Chaudhuri of Cuttack, a retiied officer of the Education Department and a writer of some note. In early life he had been a Brahmo and we believe he married a widow. Latterly, he had very closely identified himself with Orissa and had practically made it the land of his adoption. The Uriyas indeed have every reason to cherish the memory of the departed Bengalee, lovingly and gratefully."
Hindoo Patriot—8—7—16

"গত ৩০এ জুন, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ, ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল। শিক্ষা বিভাগ তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে রাভেন্সা কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কটকেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং উড়িষ্যার হিতার্থে শক্তিসামর্থ্য নিয়োগ করেন। উড়িষ্যায় নবজীবন সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে "ষ্টার-অব-উড়িষ্যা" নামক একখানি ইংরেজী পত্র প্রবর্ত্তন করেন। বহুদিন অতি যোগ্যতার সহিত এই পত্র চালাইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বাদী হওয়াতে গত বৎসর উহা উঠিয়া যায়। স্বদেশবাসীর প্রাণে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি বাল্যকাল হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যেই বহু টাকা ব্যয় করিয়া সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেই কটক নগরে এক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজে তাহার শিক্ষকতা করিতেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তারা তাঁহার স্কুল মঞ্জুর করিতে নানাপ্রকার আপত্তি করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি একখানি উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিবাদ পত্র লেখার পরই তাঁহার সন্ন্যাসরোগ হয়। এই রোগেই তাঁহার ইহজীবন শেষ হইয়াছে। তিনি বড়িশার রায়চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাঠ্যাবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন ও দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়া-ছিলেন, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে

প্রস্তুত ছিলেন। স্বদেশবাসীর জন্য এই মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।" সঞ্জীবনী, ইং ১৩-৮-১৬।

"গত ১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, প্রাতে ৬টার সময় মানবপ্রকৃতি-প্রণেতা ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী কটকে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক সময়ে ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য-জগতে একজন শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি যে সময়ে মানবপ্রকৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে মানব-প্রকৃতি ব্যতীত দ্বিতীয় পুস্তক ছিল না। সে সময়ে এবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করাই তাঁহার প্রতিভা ও মানসিক সাহসের পরিচয়। "বঙ্গ-বাসী" সংবাদপত্র স্থাপনকালে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বঙ্গবাসী দাঁড়াইত কি না, বলা বড়ই কঠিন। তিনি শিক্ষাবিভাগে বহুকাল চাকরীর পর অবসর গ্রহণ করিয়া কটকের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেখানেও তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া উড়িষ্যার মুখপত্রস্বরূপ Star of Utkal নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরে তাহা গভর্ণমেণ্টের আদেশে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতেই তিনি গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী ও সন্তানদিগের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিন এবং এই দুর্ব্বহ শোকভার বহনের সামর্থ্য প্রদান করুন।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৮৩৮ শক।

"Another of Orissa's devoted servants has passed away—Khirode Chandra Roy is no more amongst us. The late Khirode Chandra Roy for nearly half a century made Orissa the field of his work and his name is as familiar to-day in every educated Oriya house-hold as that of any Oriya great man. He came to Orissa as a teacher and to the last of his days he remained as such. A distin-guished member of the Fducation Department he attained for some-time to the post of the Principal of the Ravenshaw College at Cuttack. After retirement from Government service at an age when the average run of men would seek relaxation in undisturbed inactivity, Khirode Chandra plunged with an enthu-siasm which was the outstanding feature of his character into the public life of the Province. He started the "Star of Utkal" the only newspaper in English hitherto published from this part of the country. Under his parental care the "Star" which was started as a weekly paper, within a short few years came to be published thrice in a week and it was confidently expected that it would be soon raised to the status of a daily paper when the bolt from the blue came in the shape of a demand of security by the Government. The sturdy patriotism of Khirode Chandra rebelled against this humiliation and he preferred to abandon the love of his last days. It would be fruitless to enter into the merits of the Star's case today,

but it must be said that Khirode Chandra was a victim to the machinations of some unscrupulous people, and that he was very little responsible for the indiscretion to which he was led to and apparently for which the measure against the "Star" was taken. It is indeed one of those inexplicable ironies of Fate that while the late Khirode Chandra Roy received the shock of his life on this account, the men behind the scenes are still apparently in the full enjoyment of the patronage of the Government. Undaunted by this stroke of misfortune, Khirode Chandra Ray established an educational institution —the Hindu College—at Cuttack. He intended to devote all his energies for its development to the last day of his life and in this he was successful. In a way he died in harness as the end came suddenly on the 30th June last at the ripe old age of eighty. May the soul of this noble son of Bengal rest in peace! We offer our sincere condolence to his sons who are all in responsible positions in life and to the other members of his family on the great loss sustained by them. We think it will lighten their sorrow a little to learn that a wide circle of friends and admirers mourns with them the loss of this unassuming patriot who for long held high ideals of service before his countrymen." Ratnakar, 13-7-16.

"বৌদ্ধগণ একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলেন। চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিনসিপাল ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। তিনি নিজে ভগবান বুদ্ধের একজন ভক্ত ছিলেন। ভগবানের উপদেশ সাধারণ্যে প্রচার করিতে এবং বৌদ্ধগণের উন্নতি সাধন করিতে তিনি বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যথেষ্ট সফলতাও লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় চট্টগ্রাম কলেজে পালি ভাষার অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। চট্টগ্রামে অনেক বৌদ্ধ আছেন, অথচ তাঁহাদের শাস্ত্রের ভাষা পালি বৌদ্ধছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এবং অনেক চেষ্টা করিয়া চট্টগ্রাম কলেজে পালি-অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়া শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবংশ স্থবিরকে সে পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময় চট্টগ্রাম কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল এক সঙ্গে ছিল। কলেজ গৃহের নিকটে হিন্দু ছাত্রদের জন্য এক বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধছাত্রদের বাসের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধ ছাত্রদের জন্য এক ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি প্রবেশের মূলেও তিনি ছিলেন বলিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি চট্টগ্রামে যে পালি শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা আজ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া সমস্ত চট্টগ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে ইহা সমস্ত বঙ্গে বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। গতবৎসর মার্চ্চ মাসে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বৌদ্ধবন্ধুর পুনঃ প্রচারের সংবাদ শুনিয়া আমাদিগকে খুব ধন্যবাদ প্রদান ও উৎসাহিত করেন। তাঁহার কয়েক জন বন্ধুর সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াও তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। আরও নানা প্রকারে তিনি আমাদের সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার The Star of Utkal (উৎকলের নক্ষত্র) নামক পত্র উড়িষ্যা দেশে অতিশয় ক্ষমতাশালী পত্র ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলের পত্রে তিনি লিখিয়াছেন।

"We regret to notice a split in the revised Buddhist church of Calcutta. Kripasharan Bhikkhu, has parted with Purnananda Swami. Jagajyoti has been taken up by the former while Purnananda, under the auspices of the Mahabodhi Society under Anagarika Dharmapal, is editing the Majjhimanikaya in the Debnagari character. From what we have seen of the new edition, we can confidently assert that if followed with Sanskrit notes and Bengali translation it will prove a valuable aquisition"

তাঁহার মৃণ্ময়ী নামক মাসিক পত্রিকা সুদক্ষতার সহিত কয়েক বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

তাঁহার উৎসাহ পাইয়া বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তিনি বৌদ্ধছাত্রদের অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার গৃহদ্বার তাহাদের জন্য অবারিত ছিল। বৌদ্ধগণের আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাদের খুব সম্মান করিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য তিনি কোন কোন ঈর্ষাপরায়ণ হিন্দুর অসন্তোষভাজনও হইয়াছিলেন। গত ২৪শে আষাঢ় শনিবারের "বঙ্গবাসী" পত্রে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"ক্ষীরোদ-বিয়োগ।—বঙ্গীয় সাহিত্যমণ্ডপ আর একটী শক্তিশালী সাধক হারাইল। গত সপ্তাহের শুক্রবার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সন্ন্যাসরোগে তাঁহার কটকের বাড়ীতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসা শুশ্রূষার কোন ক্রটী হয় নাই; কিন্তু আয়ু দিতে ত কেহ পারে না! ক্ষীরোদচন্দ্র আধুনিক ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়ে কর্ম্মক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরী বংশীয়। বাল্যকালে তিনি প্রত্যহ বড়িষা হইতে কলিকাতার স্কুলে পড়িতে আসিতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সুযশের সহিত উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বহুদিন প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া কিছু দিনের জন্য হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। পরে তিনি কটকের রাভেন্‌সা কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। আজ প্রায় বার বৎসর হইল, তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে অবসর লয়েন। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়াও তিনি যেরূপ একনিষ্ঠ ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা ও সেবা করিয়াছেন, সেরূপ সাধনা ও সেবা কয় জন লোকের দেখা যায়? "বঙ্গবাসী"র সূত্রপাতে ক্ষীরোদচন্দ্র স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সখ্যসূত্রে "বঙ্গবাসী"র শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ঐকান্তিক ভাবে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নহে। তাঁহার রচিত "মানব-প্রকৃতি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সাহিত্য-কৃতিত্ব পদে পদে প্রতিভাত। তিনি যে

অবসর পাইয়াও নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না, তাহা তাঁহার পরিচালিত ও সম্পাদিত 'ষ্টার অব উৎকল' নামক ইংরেজি পত্রে প্রমাণিত। এ পত্র প্রথমে সপ্তাহে একবার, তাহার পর সপ্তাহে দুই বার, শেষে সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট শেষ কালে এই পত্র প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। কেবল ইহাই নহে, মাসিক পত্র সম্পাদনেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কমবেশী বারটী ছাত্র লইয়া তিনি কটকে একটী স্কুল স্থাপন করেন। ক্রমে স্কুলে দুই শত ছাত্র হয়। ইহাকে উচ্চাঙ্গের কলেজে পরিণত করিবার সাধ তাঁহার ছিল। আজ ক্ষীরোদচন্দ্রের বিয়োগে সত্য সত্যই বাঙ্গালা সাহিত্য একটী অসাধারণ সাধক হারাইল। ক্ষীরোদচন্দ্র যখন যেখানেই থাকিতেন, সময় পাইলেই "বঙ্গবাসী"র শুভকামনায় স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রের কয়েকখানি বহু পুরাতন পত্র "নব্যভারতে" প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মিষ্টালাপে ও রসভাসে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। তাঁহার বক্তৃতায় রস উথলিয়া উঠিত, কথাবার্ত্তায়ও রসের ফোয়ারা ছুটিত। ক্ষীরোদচন্দ্র সদা হাস্যময় নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। আজ তাঁহার লোকান্তরে বঙ্গবাসীর সহিত বিজড়িত তাঁহার সখ্য-সম্বন্ধের কত স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। তিনি বিধবা পত্নী, আটটী পুত্র এবং পাঁচটী কন্যা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এমন কি ভাষা আছে যে, যাহাতে তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিই এবং আমরা সান্ত্বনা পাই! তাঁহার সখ্যস্মৃতি তাঁহার গুণ-স্মৃতিকেই উন্মেষিত করিয়া রাখিবে।"

বৌদ্ধবন্ধু, আষাঢ়,—১৩২৩।

"We are exceedingly sorry to announce the death from apoplexy of Babu Khirode Chandra Rai Chowdhury at his Cuttack residence early in the morning of Friday last. Thanks to Major Murray, the Civil surgeon, and Asst. Surgeons Nirode Chandra Mukherjee, Devendra Nath Mukerjee and Jayanta Rao, everything was done to save the patient but in vain. Ladies and gentlemen and College students nursed the patient till the last moment.

A member of the well known Sabarna Chowdhury family of Barisa, Khirode Chandra was not born with a silver spoon in his mouth. While a little boy, he attended the school in Calcutta and in rain and sunshine walked the distance from Barisa to Calcutta and back. Though he had to struggle hard against adverse circumstances he passed all his University examinations very creditably. After obtaining the M., A. degree he entered the educational service on Rs. 75 a month He was one of the ablest head-masters and his pupils who can be counted by thousands are adorning different walks of life in Bengal, Behar and Orissa. He was for sometime officiating Principal of the Hugli College, and before retirement was officiating Principal of the Ravenshaw College, Cuttack. About twelve years ago he retired from Government service and was enjoying a pension of Rs. 150 a

month. He was a fine and humorous Bengali speaker, and a famous Bengali writer as the readers of his "Manab-Prakriti" know. He was a B. A. examiner in Bengali.

After retirement he started a monthy in Bengali and a weekly newspaper in English--the "Star of Utkal," which was first converted into a bi-weekly and then into a tri-weekly. He conducted the paper and the press almost single-handed in his old age. He took an active part in all public movements in Orissa and found time to carry on long conversation with everybody who called on him.

Less than a year ago he started at Cuttack a high school with less than a dozen students but the number has already exceeded 200. His own ambition was to raise the school to the status of a college and thereby pave the way for a University at Cuttack. He was an embodiment of energy and he literally died in harness. He has left an example to his countrymen by working earnestly till the last moment of his life. Our country is the poorer by his death. He leaves behind him a widow, 8 sons and 5 daughters. His eldest son is a barrister-at-law, his second son is a professor in the P E S., his third son is in the I. M. S, and his eldest daughter is a graduate and is in the S E S. We offer our sincerest condolence to the bereaved family. May his soul rest in peace." Amrita Bazar Patrika, July 4 (Daily)—1916.

"On the 30th June at "The Hermitage, Cuttack, of apoplexy, Mr. Khirode Chandra Roy, M.A., late of the Bengal Educational Service, aged 65 years and 9 months." Statesman, July. 5—16 (Daily).

"Babu Khirode Chandra Roy Chowdhury was born on the 17th September 1850 and died on the 30th June, 1916. He belonged to the reputed clan of the Swavarna Chowdhuris of Bengal. This class established the image of the goddess Kali to the South of Calcutta and Kalighat has long been a celebrated place of Hindu pilgrimage. The Swavarna Chowdhuris owned that portion of Bengal which is now called Calcutta. It was sold to the East Indian Company a century any a half ago. The Calcutta census report and other documents in the possession of the Government give a history of this clan, its struggles and final achievements in the Court of the Emperor Akbar.

The late Khirod Chandra Roy was the eldest son of Kali Mohan Roy, a small landed proprietor in the village of Barisa close to the shrine of Kali. At the age of 14 he lost his father and had to face the world at that age, and at the same time to support a large family. He showed great inclination for education and from the Primary School in his village to

the final stage of the Calcutta University always had a brilliant career and always carried away scholarships. His mother who had the greatest influence over his life and for whom the son retained the tenderest memory and before whom he behaved like a child till the mother's death about 8 years ago—was an illiterate woman, but a very intelligent and pious Hindu woman. She was austere in her religious observances and could commit to memory in her old age Sanskrit 'mantras.' The mother gave the two sons and the two daughters education. Education of girls half a century ago under considerable difficulties was an admirable thing. Khirod Chandra was a self-made man. He was an old landmark in Bengali Society. In the University he always stood amongst the first ten boys and in the M.A. Examination he stood at the top and inspite of his wish to join the legal professsion he had to take service at once in the Bengal Education department with a view to support his relations who got his help to the end of his life. He met most of the greatest men of Bengal, Behar and Orissa and wherever he went made his mark. Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, Kesab Chandra Sen, poet Nobin Chandra Sen, author Bankim Chandra Chatterji, Jogendra Nath Bose, biographer of Michael Madhusudan Dutta, Pandit Sivanath Sastri, the late Babu Shisir Kumar Ghose, the Hon'ble Mr. Banerji, the late Maharaja of Mourbhanj are some of the greatest men of the country with whom he came in close touch.

He spread education in Bengal, Behar and Orissa. One's heart gladdens to see the progress Behar has made during the last quarter of a century. He was the Dy. Inspector of Schools in the Santhal Pergannas, at the head of the Government School at Bhagalpur and held a similar post at Chupra At the last mentionnd place the number of students on the roll increased so rapidly that the building had to be extended. The school boasted of about 300 students when he took charge, but the number increased to over 500 during his time inspite of the efforts of two rival schools. He was appointed the president of the conference of teachers of Behar to prescribe books for all the schools of Behar in the lower forms. He encouraged the composition of books for the little children and also the compilation of folktales of the country. He served in Orissa twice and his students are doing manly work all over the province They hold almost every important post of trust under the Government. His students have progressed so far as to occupy the High Court Bench, the chair of the Vice-Chancellor of the Calcutta University; some of them have become District Judges, professors, and teachers Many of them lead the bar in various places. Some of them are disinguished literary men and poets, administrators and councillors. Some of his children are carrying on his mission of spreading education in the country.

Khirode Chandra was a famous English and Bengali writer. His history of India in the Bengali language was a text book at one time. His history of the evolution of man has been translated in other languages.

He wrote voluminously in Buddhism. The Bengali magazines of Calcutta used to clamour for his articles. He was considered an authority on the ethnology of India. The late Dr. Rajendra Lal Mitter expressed his indebtedness to Khirod Chandra Ray in the pages of his celebrated book titled—"The Antiquities of Orissa". Executive Engineer Mr. Bishan Swarup, who was appointed by the Bengal Government to carry on the excavations of the black marble pagoda of Konarak near Puri and wrote the history of the work and on the spread of Budhism in Orissa, has also thanked Khirod Chandra in his book called "Konarak." Many of his other fellow students have also distinguished themselves in the service of the Government. After retiring from service in 1904 from the Principalship of the Chittagong College he was serving his country in two different capacities—firstly by establishing a paper called the "Star of Utkal." The paper lived for about eleven years and always won golden opinions both from the public as well as from the Government till the last year when the Government took exception to certain unnamed passages.

It is believed by some people that the passages though not named are those which refer to the work of some of the local officials. The attention of higher officials was drawn to the work of the local officials and Khirod Chandra had the satisfaction of getting the approval of higher authoritses like the High Court on some of the Judgments of the Cuttack Sessions Judge and the University Inspectors' opinion on the staff of the Cuttack College. His opinion on the union of Orissa and Bengal was based on the different addresses and speeches of the people of Orissa. He fully believed he was exercising the constitutional rights of a newspaper editor and when he found that the authorities were not pleased he closed the paper. It is true that the Magistrate of Cuttack took exception to some of these articles but nothing from the Behar Government was communicated to him before the order of security inspite of the repeated requests of the Editor to let him know Governments' desire. There is ample evidence in the paper itself of his sentiment for the Government and it is borne out by the Governments'

annual reports. In his correspondence the Magistrate never gave him to understand that he was writting on behalf of the Government. It should also be mentioned that the highest officials of the Behar Government all subscribed to the paper and many of them had direct correspondence with the late Khirod Chandra Ray and there was never a word of disapproval.

Nothing was written that other papers are not writing every day and Council members are not uttering on every occasion. He held a strong opinion against the constitution of a circuit court for Orissa under the Bankipur High Court and the people of Orissa are not yet sure that the present arrangement will last permanently.

After stopping the paper Khirod Chandra founded a Matriculation School inspite of the repeated warnings of medical advisers and spared neither himself nor money to make the school a success. This work was too much for his failing health and he was seized with apoplexy on the 27th June in the afternoon and expired in the early morning of the 30th June, leaving a large family in addition to the country to mourn his death." *Amrita Bazar Patrika. 12th July,* 1916.

"অত্যন্ত দুঃখর সহিত জণাউঅছুঁ যে বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী আউ ইহসংসাররে নাহান্তি। গত জুন মাস তা ২৯রিখ গুরুবার রাত্ররে ইহলীলা সম্বরণ কলে। পূর্ব্ব দুই দিনরু হঠাৎ পক্ষ্যাঘাত রোগরে আক্রান্ত হোইথিলে দুই দিন অচেতন অবস্থারে রহিআউ চেতনা হেলা নাহিঁ। ক্ষীরোদ বাবু জনে কৃতবিদ্যা লোক থিলে। বহুকাল শিক্ষা বিভাগরে থাই, বঙ্গ, ওড়িশা, বেহাররে কার্য্য করি প্রশংসা ও সুখ্যাতি সহিতরে শেষরে পেনসন নেই ওড়িশারে শেষ জীবন কটাইবা পাই বাস করুথিলে, ফলরে তাহা হিঁ হেলা। তাঙ্কর ওড়িষা সহিতরে বহুকাল ব্যপি সম্বন্ধ থিলা। এঠারে সে হেডমাষ্টার পুণি কেতেকদিন প্রিন্সিপাল হোই থিলে। শিক্ষকঙ্ক মধ্যরে জণে আদর্শ শিক্ষক থিলে। তাঙ্কর বঙ্গ ভাষারে লিখিত অনেক পুস্তক Standard work মধ্যরে গণিত। কি ইংরাজি কি বঙ্গলা, কি সংস্কৃত, সবু বিষয়রে বঙ্গদেশরে উচ্চস্থান পাই থিলে। অল্পরে কহিলে হেব লে ক্ষীরোদ বাবু সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন থিলে। কথারে, ব্যবহাররে, পঢ়ারে ও কলম লাইবারে যেমন্ত থিলে, সেহিপরি স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা থিলে। পেনসন নেই স্থির অথর্ব ভাবরে দিন যাপন করু ন থিলে। "ষ্টার" সংবাদ পত্র বাহার করি থিলে, প্রায় তিন বর্ষকাল বিনা কাহারি সাহার্য্যরে কেবল আত্মবল উপরে নির্ভর করি চলাই থিলে, তাহা উৎকলবাসী মাত্রকে জাণন্তি। ভাগ্যদোষ ও ঘটনাচক্ররে ষ্টার বন্দ হোই গলা। পরে গোটিএ স্কুল আরম্ভ করি একাকী চলাউ থিলে। তাহার নাম "হিন্দুকলেজ"। স্কুলটি বর্ত্তমান রহি পারিলে হুয়ে। তাঙ্কর পুত্র কন্যা অনেকগুড়িএ মাত্র জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠমানে উপযুক্ত শিক্ষা পাই নিজ নিজ সংসার চলাউ অছন্তি। একপুত্র বারিষ্টর, একজন সিভিল সর্জন, একজন প্রোফেসর, জ্যেষ্ঠ কন্যা এক

বিদ্যালয়রে হেডমিষ্ট্রেস। অন্যান্য মানে কেহি বি-এ কেহি কেহি তন্নিম্ন শ্রেণীরে অধ্যয়ণ করু অছন্তি। এতে বড় সংসারর নেতা হোই দেশ বিদেশরে সুখ্যাতি লাভ করি গত গুরুবার দিন তাঙ্কর সংসারলীলা সাঙ্গ হেলা। পরমপিতা পরমেশ্বর তাঙ্কু শান্তিধামরে নিজক্রোড়রে আশ্রয় দেওন্তু এবং আত্মীয় স্বজনঙ্কর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল বিধান করন্তু আন্তমানন্তর এতিকি প্রার্থনা।" Utkal Dipika,—July, 1916.

তাঁহার বাল্য-বন্ধু, শিবসাগরের উকীল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"Your father, myself and the late Dr. Bhagabat Chandra Rudra M. A. M. D. took our admission into the Hindu School on the same day in 1862. Since that day, till we left College we were constant companions. Dr. Rudra left us when he was scarcely forty. Of the three I see that I am left to prepare to join them as early as possible".

তিনি গল্প করিতে করিতে অনেক সময় বড় বড় লোকের কথা বলিতেন। তাহার কতকগুলি তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্রীমান প্রদোষ সংগ্রহ করিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, সমস্ত লিখা হয় নাই। ইহাতে হয়ত এমন সকল কথা থাকিতে পারে, যাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। ইহা অনেকাংশে "পুরাতন-প্রসঙ্গ" পুস্তকের ন্যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত :—চারুপাঠ ৩য় ভাগ প্রকাশ করিয়া অক্ষয়কুমার বালীতে বাস করিতে লাগিলেন। তখন আমি উত্তরপাড়ায় দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম। সেখানে অক্ষয়কুমার নিজের হাতে একটী অতি সুন্দর বাগান করিয়াছিলেন। বাগানটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে, সকলে বলিত "উহা চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ।" সেখানে আমি ও অক্ষয়কুমার প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বেড়াইতাম। সে সময় তাঁহার মাথার অসুখ ছিল। কাহারও সহিত তিনি আলাপ বা কথোপকথন করিতেন না। কিন্তু আমার সহিত অতি হৃদ্যতা ছিল, তাই আমিই একেলা তাঁহার সহিত ভ্রমণ ও কথোপকথন করিতে পারিতাম। তাঁহার শেষ পুস্তক "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়," বাহির হইবার কিছুদিন পর গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি, রজনীগুপ্ত (কালা), ইত্যাদি কয়জন আমায় আসিয়া বলেন যে, যদি অক্ষয়কুমারকে কোন একটী কাগজের সম্পাদক করা যায়, তবে প্রচুর লাভ হইবে। তাঁহাকে কিছুই করিতে হইবে না, কেবল মাত্র নাম থাকিবে। আমাকে তাহার একজন অংশীদার করিবেন। আমি একদিন সেই বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে অক্ষয়কুমারকে সব বলিলাম। তিনি তাহাতে বলেন যে, যদি আমরা খাটি, তবে তিনি শুধু নাম দিতে পারেন। আমি গুরুদাস প্রভৃতিকে গিয়া তাহাই বলিলাম। তাঁহারা তখন সংবাদ পত্রে এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া অক্ষয়কুমার গুরুদাসকে এক পত্র লিখেন যে, তিনি তাঁহাদের কাগজের সম্পাদক হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। সেই পত্রিকার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে গুরুদাস প্রভৃতি সকলে আমার বাসায় আসিয়া সেই পত্র দেখান। আমি বলিলাম, "আমি কি করিব। তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাই তোমাদের বলি। তখন কিছু লেখাপড়া হয়নি। এখন তিনি অস্বীকার করেন তো কাগজ বন্ধ কর।"

তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিরষ্কার করেন। কাগজ আর বাহির হইল না। ইহার কারণ তাঁহার মাথার অসুখ। তিনি যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর কবিরাজ—বহরমপুর। আমি যখন বহরমপুরে ছিলাম,তখন সেখানে গঙ্গাধর কবিরাজ নামে এক অসাধারণ কবিরাজ থাকিতেন। কবিরাজী শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। লোকের নাড়ী টিপিয়া তাহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বলিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পুত্রেরা সে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে নাই।

কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একবার আমার ভাই ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার নাম ছিল গোপাল। সেই দুরন্ত রোগে তাঁহার lungs পড়িয়া গিয়াছিল। কেহ ভাবে নাই যে সে বাঁচিবে। প্রথমে আমি তাহার এই অসুখের কথা ভাবিতায় না। রোগের যখন শেষ অবস্থা, সেই সময় গোপাল আমার কাছে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল। আমি আশ্বাস দিয়া, পাঁচটী টাকা সঙ্গে দিয়া, অন্য একটী লোকের সঙ্গে গোপালকে কবিরাজ মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়াছিলাম কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গিয়া গোপাল সকল কথা বলিল। তিনি ত টাকা দেখিয়াই চটিয়া আগুন। বলিলেন, "বটে, ক্ষীরোদের এত টাকা হইয়াছে। বাপু, টাকা উঠাইতে হয় উঠাও, নচেৎ এইক্ষণে চলিয়া যাও।" যাহা হউক. টাকা উঠান হইলে, তিনি গোপালের হাত দেখিতে চাহিলেন। হাত দেখিয়াই রাগে বলিলেন, "তুমি ক্ষীরোদের ভাই; এত খারাপ।" গোপালের স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। যাহা হউক, অবশেষে কবিরাজ মহাশয় দুইটী পাঁচনের ব্যবস্থা করিলেন; একটী খাইতে হইবে ও অপরটীতে স্নান করিতে হইবে। যখন গোপাল ঔষধ লইয়া আসিবেন, তখন তাঁহার পুত্র ধরণী বলিয়া উঠিল,"বাবা, ওষুধের বন্দোবস্ত করিলে কই? উহা ত অনুপান।" বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, ওটা তুমি কর," পুত্র অনেক পুঁথি ঘাঁটিয়া একটী ঔষধের বন্দোবস্ত করিলেন। তাহার মূল্য সাপ্তাহিক ৮০৲ টাকা। গোপাল ঐ ঔষধের ব্যবস্থা পত্র ও পাচন লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল ও বলিল, "দাদা, আমার আমার আর বাঁচা হইল না।" আমি বলিলাম,"কেন, কি হইয়াছে?" তখন গোপাল সকল কথা আমায় খুলিয়া বলিল। আমি তখন অতি অল্প বেতন পাইতাম। বোধ হয় দেড় শত টাকা। কিন্তু ঔষধের মূল্যই ৩২০৲ টাকা। যাহা হউক, সব শুনিয়া আমি বলিলাম, "তুমি পাচন দুইটাই ব্যবহার কর। ঔষধের প্রয়োজন নাই।" কাজেও তাহাই হইল। সেই পাচন দুইদিন ব্যবহার করিবার পর গোপাল সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়।

তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য দখল ছিল। অত্যন্ত কঠিন কঠিন শ্লোকের without preparation মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন। তিনি কয়েকটী সংস্কৃত কাব্যের টীকা লেখেন। তাহা ছাপান নাই। তিনি বলিতেন, "এদেশে এ টীকা কেহ বুঝিবে, এখনও সেদিন আসে নাই।" আমাকে তিনি একদিন বলিলেন, "বাবা, এদেশে আমার বইর মর্ম্ম কেহ বুঝিবে না; তুমি যে বল বিলাতে বড় বড় পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের এক একখানা বহি পাঠাইয়া দাও।" নিজের হাতে বৃদ্ধ কয়েকখানি কপি করিয়াছিলেন। আমি সেইগুলি লইয়া Max Muller প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। পণ্ডিত

মহাশয় আমাকে একখানি বই স্নেহোপহার দিয়াছিলেন; তাহা আমার লাইব্রেরীতে আজও আছে।

আমার বহরমপুরের বাড়ীতে তখন রোজ মজলিস বসিত। পাড়ার অনেক লোক আসিত ও পাশা খেলিত। তন্মধ্যে একব্যক্তি খেলিবার সময় নিজের ডাহিন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুলকাইত। কয়েক দিবস ইহা লক্ষ্য করিয়া আমি কারণ-জিজ্ঞাসু হইলাম। সে বলিল যে, বহুকাল পূর্ব্বে একদিন যখন বাগানে মলত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, তখন একটী শৃগাল তাহাকে কামড়াইতে আসে। লোকটী তখন ডাইন হাতে গাড়ুটী দিয়া শৃগালকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু পলায়নের সময় তাহার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কামড়ায়। তৎপরে ভদ্র লোকটী কলিকাতার মেডিকেল কলেজে যান; তথায় ডাক্তারেরা নানা ঔষধ দিয়া অঙ্গুলিটী পোড়াইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল। এখন হাত ভালই আছে। তবে মাঝে মাঝে চুলকায়। আমি বলিলাম, "না, সে হইবে না; আপনি একবার কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যান। লোকটী কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গমন করিলে তিনি আকৃবরী মোহর তুল্য একটী কাল প্রস্তর দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে বাঁ পায়ের কড়ি আঙ্গুলে একটু থুতু দিয়া পাথরটী লাগাইয়া দিতে হইবে। লোকটী গৃহে আসিয়া কথিত স্থানে পাথরটী লাগাইয়া দিল। যেই লাগান, অমনি তাহা তথায় শক্ত হইয়া বসিল। কাহার সাধ্য নাই যে, তাহা তুলিয়া ফেলিবে। কিন্তু কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। তিন দিনের দিন সেই পাথরের পাশে একটী ছোট গর্ত্ত হইল ও ক্রমাগত কাল ঝুলের মত রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ৩।৪ সের রক্ত বাহির হইয়া গেলে পাথরটী আপনি খসিয়া পড়িল। তখন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পাথরটীকে যত্নের সহিত লইয়া স্নান করাইয়া আনিলেন ও দুই সের খাঁটি দুধের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত দুধ পাথরটী শুষিয়া লইল।

এই পাথরই বিষ-পাথর;- এরই জন্য জগতে কত তোলপাড় হইতেছে। এখন তাহা কোথায় আছে, কে জানে? গঙ্গাধরের বংশধর তাহার মর্ম্ম জানে না; তাহাদের কাহারও নিকট ইহা কি আছে?

সংগ্রাহক ও প্রকাশক,
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৮। স্মৃতিকণা। স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু প্রণীত, মূল্য ৵০। মিণ্টো প্রেস, চট্টগ্রাম।

১৩০৮ সালে ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভূমিকাসহ প্রথম এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রচয়িত্রী ১৭ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। ১৩ বৎসর বয়স হইতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। 'প্রার্থনা' প্রথম, এবং 'কোথায় মরণ' তাঁহার শেষ রচনা। "কোথায় মরণ" কবিতাটীর এক স্থানে আছে—"সবে দেয় শাপ, গালি,
ভ্রূক্ষেপ কর না তায়,
নিষ্কাম, নিস্পৃহ হয়ে
আছ মগ্ন তপস্যায়।
বুলায়ে ও কমকর
রোগীর যাতনা হর,
শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভ্রান্তজীবে
অতি স্নেহে কোলে কর।
অধম, তাইতো ডাকি—
এস কাছে দয়াময়,
সংসার কুলিশাঘাতে
বিচূর্ণিত এ হৃদয়।"

মৃত্যু-আহ্বান তাঁহার কর্ণে যে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া গেল, তাহাতে তন্ময় হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এ বঙ্গের কথা কি একবারও ভাবিলেন না? ভাবের খেলা অনেকে খেলেন, আর্টের দোহাই অনেকে দেন; কিন্তু হৃদয় ঢালিয়া কয়জন এদেশে

সন্দর্ভ লিখিয়াছেন? যাঁহারা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে পঙ্কজিনী অন্যতম। কবিতাগুলি যেন হৃদয়ের ফোয়ারা—ভাবগুলি যেন অনন্তের অব্যক্ত আভা—একটী স্থান দেখাইতেছি।

"জনম অজ্ঞানে ঢাকা, মরণ আঁধারে রয়
মাঝে দুটি দিন তরে ধরা-সাথে পরিচয়।
সকলে যেতেছে চলে, তবুও বারেক মোরা,
ভুলেও ভাবিনা কভু যাইব ছাড়িয়া ধরা!
কতই অসীম-আশা হৃদয়ে পোষিত হয়,
অসীম জীবন হেথা ধীরে ধীরে হয় লয়।"

রচয়িত্রী যেন পরলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই এ ধরায় আসিয়াছিলেন। তিনি এখানে থাকিবেন কেন? কিন্তু ভাবিলেন না কি, এ বঙ্গে তাঁহার ন্যায় লেখিকার অভাব আছে।

"এ অসীম বিশ্বমাঝে আপনারে হারাইয়ে,
এ মহান বিশ্বখেলা দেখিব মোহিত হয়ে।"

কি সুন্দর কথা তিনি বলিয়া গেলেন।

"কিন্তু বড় দুঃখ এই,
হৃদয়ের দ্বার নেই,
হৃদয় না খোলা যায় বড় যাতনায়।"

কি মর্ম্মভেদী বাণী!

শুনিয়াছি, লেখিকার লেখায় মুগ্ধ হইয়া ৺হরিনাথ দে মহাশয় তাঁহার সমস্ত কবিতাগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দ্বিতীয় লোক কি এদেশে নাই? কবিতাগুলি যিনি পড়িবেন, তিনিই মোহিত হইবেন। পঙ্কজিনীর অভাবে বঙ্গ আঁধারময় হইয়াছে।

৯। অশোক-অনুশাসন। শ্রীচারুচন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর-সম্পাদিত। মূল্য ১৷৷০। মূল, পাঠ, অনুবাদ, বিবিধ টীকা সহ। এই পুস্তকখানি অমূল্য গ্রন্থ;—বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। গল্প-প্লাবিত দেশে যাঁহারা এরূপ উপদেশপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, খুজিয়া পাই না। তাঁহাদের যোগ্য কেবল তাঁহারাই। আমরা জানি, তাঁহারা ধন্যবাদ প্রয়াসী নন্। তাঁহাদের পুণ্য-স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়া যাক্। এ গ্রন্থ পড়িয়া যথেষ্ট তৃপ্তি পাইলাম।

১০। The Twenty-fifth Annual Report of the Calcutta Orphanage, for the year 1916। পূর্ব্বে ২৪৯ জন সভ্য ছিল, এখন ২৫৪ জন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর আশ্রমে ১০৮ জন বালকবালিকা ছিল, এখন ১৩৩ জন হইয়াছে, বালক ৮৭, বালিকা ৪৬। গত বৎসর ৫টী মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। গত বৎসর ২০৬৮৲ আয় হয়, গচ্ছিত সহ ২৬৩৫৪৲; তন্মধ্যে ১৩২৪০৲ খরচ হয়। আনা পাই ধরা হইল না। ১১৪৪৯৲ স্থিত আছে। এই আশ্রমটী ৺প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এখন শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ অশেষ যত্নে আশ্রমের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধন করিতেছেন। যাঁহারা আশ্রমটী দেখিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ই পুণ্যাদর্শে পূর্ণ হইবে। সহৃদয়গণের সাহায্য এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদে বর্ধিত হউক।

১২। The Twenty-second Annual Report of the Rajkumari Leper Asylum at Bidanath-Deoghar for the year 1916। গত বৎসর ৫০ পুরুষ এবং ১৪ মহিলা মোট ৬৪ জন আশ্রমে স্থান পায়। পূর্ব্ব বৎসরের রোগীসহ মোট ১২৯ জন ছিল। গত বৎসর ৬৭৬৬৲ আয় হয়। আহারাদিতে ২৩৩৯৲ ব্যয় হয়। নূতন গৃহ-

নির্ম্মাণের জন্য বেহার-গবর্ণমেণ্ট ৩১১৮৲ প্রদান করেন। আশ্রমের আয় হ্রাস হইয়াছে বলিয়া সম্পাদক মহাশয় বড়ই আক্ষেপ করিয়াছেন। এই আশ্রমটী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন মহাশয় বর্ত্তমান সম্পাদক। গত বৎসর ৩৭ জন আরোগ্য হইয়া চলিয়া যায়, ৭ জনের মৃত্যু হয়, ৩৭ জন পুরুষ সুস্থ হইয়া চলিয়া যায়। ৪৮ জন আশ্রমে আছে। সর্ব্ব-সাধারণের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। সহৃদয় ব্যক্তিগণ হরিচরণ বাবুর নিকট সাহায্য প্রেরণ করিবেন।

১৩। রাকা। শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৲। ভুজঙ্গ বাবু একজন বিখ্যাত কবি, মঞ্জীর, গোধূলি, শিশির, ছায়াপথ প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া তিনি যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখা বড় সুমিষ্ট। ভাষা মার্জ্জিত এবং লেখা সুরুচিপূর্ণ। "জ্ঞান ও ভক্তি" কবিতাটী তুলিয়া দিলাম, পাঠকগণ গ্রন্থকারের সমুচিত পরিচয় পাইবেন।

"জ্ঞান বলে, এই দেহ নিতান্ত নশ্বর,
ভক্তি বলে, ভগবান দেহের ভিতর।
জ্ঞান বলে, মিথ্যা মায়া পুত্র পরিবার,
ভক্তি বলে, এ সংসার নিত্য লীলা তাঁর।
জ্ঞান বলে, বন্ধ-মূল কর্ম্মকার নাশ,
ভক্তি বলে, কৃষ্ণার্পিত কর্ম্ম নহে পাশ।
জ্ঞান বলে, ধ্যান-যোগে শূন্য কর মন,
ভক্তি বলে, প্রেম-রসে কর নিমজ্জন।
জ্ঞান বলে, আমি সেই ব্রহ্ম অবিনাশ,
ভক্তি বলে, আমি তাঁর দাসের সে দাস।
জ্ঞান বলে, আত্ম-রতি সাধ আত্মা সনে।
ভক্তি বলে, কৃষ্ণপতি জীবনে মরণে।
জ্ঞান বলে, ভক্তিহীন আমি বলি নাথ।
ভক্তি বলে, নিয়ে চল ধরি দুটী হাত।"

১৪। কবির-কথা। প্রথম খণ্ড, কালিদাস ও ভবভূতি। শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ২৲। এই গ্রন্থে এই সকল গ্রন্থের গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে।—(১)অভিজ্ঞান-শকুন্তল, (২) বিক্রমোর্ব্বশী, (৩) মালবিকাগ্নিমিত্র, (৪) মহাবীর-চরিত, (৫) উত্তররাম-চরিত, (৫) মালতী-মাধব। সংক্ষেপে এবং অতি মধুর ভাষায়, ততোধিক বিশুদ্ধ সারল্যে এই গ্রন্থোল্লিখিত বিষয় বিবৃত হইয়াছে; পরন্তু ইহা অনুবাদ হইতে কিছু বিভিন্ন রকমের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অসামান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, বাঙ্গালা ভাষা যেন তাঁহার হাতের সুযন্ত্র, তিনি অপূর্ব্ব সাজে গ্রন্থখানিকে সাজাইয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থরাশি ছাঁকিলে যে মধুর রস পাওয়া যায়, ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা ধন্য যে, এই কৃতী লেখক তাহার সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব স্বরূপ। ইহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত হইতে পারে। গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি এই উপাদেয় গ্রন্থ উপহার দিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিলেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

১৫। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩৲।

বাঙ্গালীর গৌরব করিবার যে সকল উপকরণ আছে, তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রধান, একথা বলিলে, বোধ হয়, কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙ্গালা ভাষার গুণকীর্ত্তনের যদি কিছু থাকে, তবে তন্মধ্যে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। অক্ষয়চন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ হিংসার কণ্ডূয়নবশতঃ যাহাই বলুন, বঙ্কিম এবং মাইকেল এ দেশে অমরত্ব লাভ করিয়া-

ছেন,চিরকাল ভক্তগণের পূজা অর্ঘ্য পাইবেন। মাইকেলের জীবনী লিখিয়া শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, বঙ্কিম-জীবনী লিখিয়া শচীশচন্দ্র, অমরত্ব না হউক, সর্ব্বজনের পূজার যোগ্য হইয়াছেন। শচীশচন্দ্রের সংগ্রহের পর আর যে ভালসংগ্রহ হইবে না, তাহা বলিতেছি না,কিন্তু ইহা যে সে সকল সংগ্রহের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। শচীশচন্দ্র যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উপাদেয়। কিন্তু যথেষ্ট নহে। তাহার সংগ্রহ ভালরূপ সজ্জিত নয়, অসংলগ্ন এবং খাপছাড়া বলিয়া স্থানে স্থানে অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু তবুও আমরা বলিব,ইহা অমূল্য গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষার চমৎকারিত্ব-গুণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ ও সরস বাঙ্গালা ভাষার কিছু কিছু ত্রুটী এগ্রন্থে আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিব, এ গ্রন্থের তুলনা নাই। কেন না, ইহাপেক্ষা ভাল বঙ্কিম-জীবনী আজও আমাদের হাতে পড়ে নাই।

আমরা বঙ্কিম-ভক্তশ্রেণী-ভুক্ত। বঙ্কিম-প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ, বিশ্লেষণ, অনুশীলন এবং অনুকৃতি দেখিবার জন্য আমরা জীবন-ধারণ করিতেছি। এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ-জীবন-চরিত এখনও কালের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বঙ্কিম-জীবনী লিখিবার উপযুক্ত লোক ছিলেন, ৺চন্দ্রনাথ বসু; তিনি বন্ধুর শেষ-কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। আর যোগ্য ব্যক্তি আছেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; তাঁহারা বন্ধুর প্রতি কিরূপ কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, সকলেই জানেন। এখনকার মধ্যে আর একজন লোক আছেন, যিনি এ কার্য্যের উপযুক্ত, তিনি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি শোকে জর্জ্জরিত, তাঁহার নিকট এখন আর কিছু প্রত্যাশা করিতে পারিতেছি না! যাহা হউক, যতদিন ইহাপেক্ষা 'বঙ্কিম-প্রতিভার' উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ না পাইব, ততদিন ইহাকেই বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব। এই গ্রন্থখানি বঙ্কিম-নিগ্রহ-মরু-ভূমির মধ্যে একমাত্র ওয়েসিস্। এই গ্রন্থাশ্রয় করিয়া বঙ্কিম-প্রতিভা-তৃষ্ণা নিবারিত হউক।

১৬। তীর্থভ্রমণ। পরিষৎ-গ্রন্থাবলী,নং৫৩। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত, মূল্য ১॥০।

উনবিংশতাব্দীর বাঙ্গালার অদ্বিতীয় পর্য্যটক ৺যদুনাথ (বসু) সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।

সর্ব্বাধিকারী-বংশ এদেশের সর্ব্বজন পূজ্য অতি প্রাচীন বংশ; কায়স্থ সমাজে এরূপ কুল-গৌরবে ভূষিত বংশ অধিক নাই। গুণগ্রামে এই বংশের লোকেরা পূর্ব্বাপর বঙ্গে অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত দেব-প্রসাদ এদেশের গৌরব। ইঁহাদের পিতামহ ৺যদুনাথ। ইঁহাদের পিতা সূর্য্যকুমার ও জ্যেষ্ঠ তাত প্রসন্নকুমার বঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। এই গ্রন্থখানি একখানি সুবৃহৎ পঞ্জিকা বিশেষ, সমগ্র ভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত বর্ণনার বাহুল্য নাই, ভাষার জঞ্জালে সত্য ঢাকা নাই, বিবৃতির মাধুর্য্য এবং সরলতায় গ্রন্থখানি পরিশোভিত। সাহিত্য-পরিষৎ এ গ্রন্থখানিকে পুনঃ মুদ্রিত করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের যোগ্য হইলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথের গুণপনার আর অধিক পরিচয় কি দিব, যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন।

কলিকাতা।

গ্রীক-দর্শন।

নব্য-আদর্শবাদ (Neo-Platonism.

পরফিরি (Porphyry)।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্লোটিনাস রোমনগরে যে একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,সেই সম্প্রদায়ভুক্ত তদীয় শিষ্যবর্গের মধ্যে জেন্টিলিয়ানাস এমিলিয়াসের (Gentilianus Amelius) সামান্যমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ধারণাশক্তি তত সূক্ষ্ম ছিল না এবং মোটের উপর, তিনি নুমিনিয়াসেরই অনুকরণ করিতেন। উক্ত সম্প্রদায়ের আর এক ব্যক্তি টায়ার নগরের পরফিরি এমিলিয়াসাপেক্ষা অধিক পরিচিত। ইহাঁর আর এক নাম ম্যলেকাস্ (Malchus)। পরফিরি ২৩২-৩৩ খ্রীঃ অব্দে রোমনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০১ খ্রীঃ অব্দে রোম-নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি প্রথমতঃ লঙ্গিনাসের এবং পরে প্লোটিনাসের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্লেটো সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি আরিষ্টটল-কৃত বহু গ্রন্থের, বিশেষতঃ তদীয় ন্যায়শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। আরিষ্টটলের গ্রন্থপাঠের ফলে এবং লঙ্গিনাসের সংসর্গগুণে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরফিরি 'ইনিড' নাম দিয়া প্লোটিনাস-দর্শনের যে এক সংস্করণ প্রচার করেন, তাহাতে উক্ত দর্শন-মতের বিশেষ কিছু উন্নতি সাধিত হয় নাই, তবে ঐ মত বুঝাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পরফিরি বুদ্ধি-জগৎকে স্থূল-জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করিতেন। তাঁহার মতে সত্তা, ধারণা ও জীবন, বুদ্ধিতে এই তিনের পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হয়। মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মানবের অশেষবিধ কর্ম্মপটুতার সহিত মান-বাত্মার ঐক্য সম্পাদনের চেষ্টা ছিল। যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া মানব-জীবন গঠিত, তাহাতে এবং মানবের আত্মায় প্রভেদ নাই, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানগুলির সমষ্টিই আত্মা। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, দ্রব্য জাতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আত্মায় নিহিত থাকে, এজন্য যে দ্রব্যের প্রতি যখন আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, আত্মা তখন সেই দ্রব্যেরই রূপ গ্রহণ করে। এই প্রকার কল্পনা হইতে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভাগ সূচিত হইতেছে, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি যে ব্যক্তিগত আত্মাসমূহের সমষ্টি বা সারাংশকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সমীচীন নহে। তাঁহার মতে পরমা-ত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; যেহেতু, পরমাত্মা স্বয়ং ব্যক্তিগত আত্মাসমূহে বিভক্ত নহেন। তিনি ইতর প্রাণীর প্রতি বুদ্ধির আরোপ করিয়াছেন, অথচ আত্মার জীবদেহ প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। ইতর প্রাণীর যদি আত্মাই না থাকে, তবে তাহাদের বুদ্ধি থাকাও অসম্ভব। মানবা-ত্মার ঊর্দ্ধগতিতে পরফিরির আস্থা ছিল না। মানবাত্মার যতই উন্নতি হউক, উহা মানব-প্রকৃতির অধীন থাকিতে বাধ্য। তবে কি আত্মার মুক্তি নাই? মুক্তি আছে। তবে সে অবস্থায় আত্মা, পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার সহিত একেবারে মিলিত হইতে পারে না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট যে, আত্মার যথোচিত বিশুদ্ধি ঘটিলে স্মৃতি লোপ পায়,

বিষয়-বাসনার নিবৃত্তি হয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ মানবগণ মোক্ষ লাভ করে। মোক্ষ লাভ (salvation) দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য; অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত মানব সাধ্যমত বিষয়-বাসনার পরিহার পূর্ব্বক দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

প্লোটিনাসাপেক্ষা পরফিরি নীতিশাস্ত্রের অধিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। নৈতিক উৎকর্ষ বা আত্মোন্নতির জন্য মানবের কতকগুলি নিয়মপালন আবশ্যক। মাংসাহার, স্ত্রীসংসর্গ, বিলাসিতা, কুৎসিত আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বিষয়-বাসনা পরিহারের নিমিত্ত কোন একটী ধর্ম্ম-বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পরফিরি যদিও তাৎকালিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতির সহিত সর্ব্বাংশে একমত ছিলেন না, তথাপি সাধুজীবন, সদালোচনা ও সচ্চিন্তাকেই উৎকৃষ্ট পূজাপদ্ধতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মানবাত্মার উন্নতি ক্রমসাধ্য। মানব হইতে প্রেতযোনি, প্রেতযোনি হইতে দেবতা, দেবতা হইতে আত্মা এবং আত্মা হইতে পরমাত্মা, এইরূপে স্তরে স্তরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে পরফিরি যে ১৫ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থগুলি তৎসাময়িক কুসংস্কার-সমূহে পূর্ণ। এই সকল পুস্তকের সাহায্যে তিনি খ্রীষ্টানদিগের বিপক্ষে, এমন কি, সময়ে সময়ে নিজের অভিমতের বিরুদ্ধেও স্বজাতীয়দিগের ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রেতাদির কল্পনা হইতে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পায়, এ কারণ ধর্ম্মের সংস্কার হওয়া আবশ্যক। তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের অধিকারী নহে, রূপক-চ্ছলে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই দেবতা-কল্পিত হইয়াছে। এইজন্যই পশু পক্ষী প্রভৃতি অনেক বস্তু দেবতা বলিয়া গণ্য এবং দেব সেবায় নিয়োজিত হয়। পরফিরি ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করিতেন। ভূতবিদ্যা এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, এই দুই বিদ্যার সাহায্যে জড়প্রকৃতি, প্রেত-যোনি এবং আত্মার উপরে কর্ত্তৃত্ব চলে। পশুবলি প্রভৃতি আরও কয়েকটী অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি স্বয়ং ঘৃণা প্রকাশ করিলেও ঐ সকল অনুষ্ঠান প্রেতযোনিদিগের তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

যাম্‌ব্লিকাস ও প্রোক্লাস।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে নব্য-আদর্শবাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার মূল তত্ত্বগুলি ঠিক ছিল। প্লোটিনাস ও পরফিরি সম্রাট কনষ্ট্যাণ্টাইনের (Constantine the Great) রাজত্বের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রচারিত হয় নাই।* জেনোফ্যানিসের সময় হইতে চিন্তাশীল গ্রীকমাত্রেই যেমন কুসংস্কারের পরম বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, প্লোটিনাসও সেইরূপ কুসংস্কারের পরম শত্রু ছিলেন। পরফিরি স্বয়ং কুসংস্কারের প্রশ্রয় না দিলেও অজ্ঞদিগকে বুঝাইবার জন্য ভূত প্রেতাদির কল্পনা করিয়াছেন। প্লোটিনাস ও পরফিরির শিষ্যবর্গের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল হওয়ায় তত্ত্বানুসন্ধান-স্পৃহা বলবতী হয় নাই। লোক-ধর্ম্মের সহিত দীর্ঘ দশ শতাব্দী যাবত বিরোধের পর দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। দর্শনালোচনার ফলে লোকের মন কোথায় সত্যের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহা না হইয়া তাহারা ধর্ম্মের জন্যই পাগল হইয়া উঠিল। কুসংস্কার দূর করার পরিবর্ত্তে দর্শনই এখন উহার অধীন হইয়া পড়িল। দার্শনিকগণের স্পষ্টই অনুভূত হইল যে, লৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত প্রতিযোগিতায় ধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। আর সেই ধর্ম্মের গতি গ্রীকদিগের জাতীয়ভাব ও শিক্ষার প্রতিকূল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, দার্শনিকগণ সামাজিক আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি, রোমীয় এবং গ্রীক পুরোহিতগণ যে পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাও পারিতেন না। অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করায় দর্শনে বহু দেবত্বের ভাব নূতন করিয়া দেখা দিয়াছিল। শুধু দেখা দেওয়া নয়, বহু দেবত্বের বিশ্বাস (Polytheism) যাহাতে প্রসার লাভ করে, তজ্জন্য লোকে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়াছিল। এখন হইতে দর্শনের নামে বহুবিধ কুসংস্কার স্থান পাইল এবং যাদুবিদ্যা, ভৌতিক-বিদ্যা, রোজাগিরি, ডাকিনী-সাধন প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রতন্ত্র সোৎসাহে প্রবর্ত্তিত হইল। এক কথায় গ্রীকচিন্তা যেন পুনরায় শিশুত্ব প্রাপ্ত হইল।

এবম্বিধ জাতীয় জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে গ্রীক চিন্তায় যে দুই একটী জ্ঞানশিক্ষা প্রদীপ্ত না হইয়াছিল, এমনও নয়। বহু দেবত্ববাদের অনুকূলে এই সময়ে যে কয়েক জন দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোল্‌সিরিয়াবাসী যাম্‌ব্লিকাস্ এবং বৈজান্তিয়াম্‌বাসী প্রোক্লাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যাম্‌ব্লিকাস সিরীয় নব্য-আদর্শবাদের গোঁড়া ছিলেন। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রাক্কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রোক্লাশ ৪১২ হইতে ৪৮৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং যাম্‌ব্লিকাস-প্রচারিত ও রোমীয় দর্শন মতের পোষকতা করিতেন।

যামব্লিকাস—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মভাব-পরিশূন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা, পিথাগোরাস এবং প্লেটোর দর্শনাধ্যয়ন, মিসর ও প্রাচ্য দেশজাত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সর্ব্বোপরি স্বীয় পবিত্র ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টিতত্ত্ব হইতেই ইহার জ্ঞানস্পৃহা বিকাশলাভ করিয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বশত: তিনি পুরাণের পুনর্গঠন ও তাহার মীমাংসায় কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতে, মূল চিচ্ছক্তির চতুষ্পার্শ্ব হইতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ত্রিগুণাত্মিকা জ্যোতিঃ-শিখা বিনির্গত হয়, তাহা হইতেই দেবগণের উৎপত্তি। তিনি একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় বিধানানুসারে মানব-ঈশ্বরের (God-man) কল্পনার খণ্ডন করিতেন, অন্যদিকে আবার পরমেশ্বরকে মানবাত্মার সহিত সম্বন্ধ-চ্যুত করিয়া প্লোটিনাস-বর্ণিত ধর্ম্মতত্ত্বের মাহাত্ম্য অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। পরমেশ্বরে যে কেবল বুদ্ধি স্থান পায় নাই, তাহা নহে, তাঁহাতে কোন গুণই বর্ত্তে না। অতএব, জীব সমূহের নিরপেক্ষ বা মূল একের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; তাহারা সেই মূল এক হইতে উদ্ভূত দ্বিতীয় সত্তা সমূহের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় সত্তাও অতীন্দ্রিয় (Transcendental), অথচ সংখ্যায় বহু। ইহাদের প্রত্যেকেই এক এক জন দেবতা এবং এই-সকল দেবতা তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম

* কনষ্ট্যানটাইনের সময়ে খ্রীষ্টীয় সমাজ এত প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি খ্রীষ্টীয-ধর্ম্মকে রাজ-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি কনষ্টাণ্টি-নোপল নগর স্থাপন করিয়া তাহার দ্বিতীয় 'রোম' আখ্যা দেন এবং তথায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীকদিগকে উচ্চ রাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত করায় ঐ ধর্ম্ম সহজেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

শ্রেণীর দেবগণ কেবল বুদ্ধিবিশিষ্ট, ২য় শ্রেণীর দেবতারা জড়জগতের বহির্ভূত এবং ৩য় শ্রেণীর দেবতাদের সহিত কেবলমাত্র জড় জগতেরই সম্বন্ধ বিদ্যমান। শেষোক্ত দেবগণ জগতের অন্তর্নিবিষ্ট এবং কেবল ইহাদের সহিতই মানবের সম্পর্ক ঘটিতে পারে। এইসকল দেবতাই প্লেটোর আদর্শ (The Ideas), পিথাগোরাসর সংখ্যা (The Numbers) এবং অ্যারিষ্টটলের সত্ত্বামূলক রূপ (The substantial Forms)। নিরপেক্ষ একের সহিত জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রোক্লাস—প্রোক্লাস তদীয় দর্শনমতের মূলতত্ত্ব গুলি যাম্‌ব্লিকাস ও প্লোটিনাসের মত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ;—১মতঃ নিরপেক্ষ অদ্বিতীয় একের কল্পনা করিতে হইবে। এই একের সহিত সৃষ্টির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। অদ্বিতীয় এক হইতে সত্তা, জীবন ও বুদ্ধি, এই তিনের উৎপত্তি হইয়াছে। ১মতঃ সত্তা। ইহা অনন্ত। এই অনন্ত সত্তা হইতে অন্ত বা রূপ এবং এতদুভয়ের (অনন্ত এবং রূপের) সম্মিলনে সান্ত বা সীমা-বিশিষ্টের উৎপত্তি। ২য়তঃ জীবন। জীবন-অর্থে-সম্ভাব্যতা (Potentiality) এবং বর্ত্তমানতা (Existence) বুঝায়। এই দুয়ের সম্মিলনে জীবের উৎপত্তি। ৩য়তঃ বুদ্ধি। বুদ্ধি আবার স্থির এবং গতিসম্পন্ন ভেদে দুই প্রকারের, এবং ইহাদের সম্মিলনে স্মৃতির (Reflective thought) উৎপত্তি। দর্শন শাস্ত্রে যাঁহাদের প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত ত্রিমূর্ত্তি ত্রয়ের প্রত্যেকেই জগতে সেই দুর্জ্ঞেয় আদিকারণের একটী করিয়া রূপ প্রকাশ করে। রূপগুলি কি? ১মতঃ তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্য বা ঐক্য। ২য়তঃ, তাঁহার অফুরন্ত উৎপাদনী শক্তি। ৩য়তঃ, তাঁহার অনন্ত পূর্ণতা। এই গুলিকে অদ্বিতীয় নিরপেক্ষ একের বিকাশ ধারা বলা যায়। কেবল কাজের নিয়ম যেমন কাজটীর নিকট মহৎ, কারণ যেমন কার্য্যের নিকট মহৎ, সত্তা এবং চিন্তার নিকটও নিরপেক্ষ একের মহত্ত্ব সেইরূপ। সেইজন্যই নিরপেক্ষ এক অজ্ঞেয়। যাহা কিছু অনৈসর্গিক, তাহা অনৈসর্গিক বা অলৌকিক উপায় ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। কেবল মাত্র দীক্ষিত-গণই ঐশী শক্তির (Divine power) বলে সেই গূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারেন। জ্ঞান সাধারণতঃ জ্ঞেয় জগতের বস্তু; দুর্জ্ঞেয়কে জানিতে হইলে জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিশ্বাস বা ভক্তির যোগ আবশ্যক।

নব্য-আদর্শবাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, প্রোক্লাসেই তাহার পরিসমাপ্তি হয়। তত্ত্বহিসাবে নব্য-আদর্শবাদ যদি আদর্শকে তদপেক্ষা কোন উচ্চতর শক্তির অধীন করিয়াই ক্ষান্ত হইত এবং সেই শক্তির অর্থে যদি সত্তা ও ধারণা উভয়ই প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে এই মত প্লেটোর আদর্শবাদাপেক্ষা অদ্বৈতের দিকে অধিক অগ্রসর হইয়াছে বলা যাইত। বস্তুতঃ নব্য-আদর্শবাদের মূলে এই লক্ষ্য থাকিলেও তাহা স্থায়ী হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সহিত বিবাদবশতঃ মূল চিচ্ছক্তির সহিত জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধ একেবারেই অপসারিত করা হইয়াছে। প্লেটোর আদর্শবাদেরও ত্রুটী এই। কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলে প্লেটোর মত নব্য-আদর্শবাদের তুলনায় কত উন্নত ও মহান! প্লেটোর নিকট ন্যায়ানুশীলনই ধর্ম্ম, আর প্রোক্লাস যাদুবিদ্যার অনুশীলনকে ধর্ম্ম বলিতেন। সবল, শিক্ষিত, পরিণতবুদ্ধি যুবা এবং রুগ্ন, স্থবির, কুসংস্কারাপন্ন বৃদ্ধের মধ্যে যে প্রভেদ, এই দুইটী মতের প্রভেদও তদ্রূপ।

নব্য-আদর্শবাদের শেষ আশ্রয় এথেন্সের যে চতুষ্পাঠীতে প্রোক্লাস শিক্ষা দিতেন, ৫২৯ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের আদেশে তাহাও উঠিয়া যায়। জনসাধারণ অতীত গৌরবের এই শেষ নিদর্শনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে, কেহ আর তাহার উপদেশে কর্ণপাত করিত না। দুই শত বৎসর পূর্ব্বেই খ্রীঃ-ধর্ম্ম সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় লোকের মনে উন্মাদনাময় ধর্ম্মভাব জাগ্রত হওয়ায় তাহাদের আর প্রশান্ত স্থির তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রতি আগ্রহ রহিল না।

সমাপ্ত।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

রাধা-পাগল।

বরিশাল জিলার লোকের কর্ম্মপ্রবণতা অধিক। তাহাদের যেমন ভয় কম, সাহস অধিক; তেমন সাধারণতঃ তীক্ষ্ণধীও অধিক। বরিশালের কৃষক বা কোন নিম্নশ্রেণীর লোক, সে হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, সাধারণতঃ অধিক জ্ঞানসম্পন্ন, নিরলস ও কার্য্যদক্ষ; তাহার সমধর্ম্মী অন্যান্য জেলার ব্যক্তিগণ মধ্যে পতিত হইলে সে কদাপি চালিত হইবে না, চালক হইবে। এজন্য বরিশালের লোক প্রায়শঃ স্বাধীন-প্রবৃত্তিশালী ও অপেক্ষাকৃত স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্যমেই বরিশালে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ উকীল ৺দুর্গামোহন দাসের সাহায্যে অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটী বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ইলুহারের কায়স্থগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তিনটী। তৎপরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য মধ্যেও কয়েকটী বিধবাবিবাহ হইয়াছিল। কোন এক ব্রাহ্মণ আপন ঔরসজাত ও বিধবার গর্ব্ভোৎপন্ন সন্তানকে পোষ্যপুত্র রাখিয়া, শাস্ত্রকে ফাঁকি দিয়া, সমাজে চলিয়াছেন; ইহাতে বিধবার ভ্রূণ-হত্যা-প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ কম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এ সাহসও বড় কম নয়।

উক্ত গ্রামে ৺নগেন্দ্রনারায়ণ সরকার কায়স্থান্দোলনের সূত্রপাতে সর্ব্বাদৌ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া বঙ্গে বহুসহস্র কায়স্থের অগ্রণী হইয়া গিয়াছেন। তত্রত্য ৺মদনমোহন সরকার ইত্যগ্রে সর্ব্ববিধ দেবার্চ্চন কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়া কায়স্থ-জীবনে বিশুদ্ধ ক্ষাত্রিয়ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। আমাদের আশা আছে, কায়স্থ-সমাজ তাঁহার দৃষ্টান্ত একদিন অনুসরণ করিবেন।

বরিশালের খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশীয় আন্দোলন অদ্যাপি সকলের মনে জাগ্রত আছে। এই আন্দোলন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ দ্বারাই প্রধানতঃ সমাহিত হইয়াছিল।

বরিশালের কায়স্থছাত্রেরা আবার আর একটী সংস্কারে ব্রতী হইয়াছে। তাহারা ঠিক কায়স্থ শব্দের প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিয়াছে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছে। কথাটী আমি খুলিয়া লিখিতেছি।

কদমতলা নামে বরিশালের একখানি বারুজীবী-প্রধান গ্রাম আছে। বলা বাহুল্য, বারুজীবী, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি আধুনিক ১৩টী জাতি, যাহাদিগকে তেরশাথ* বলে, তাহারা বিশ্ বা বৈশ্য। সকলেই জানেন, বিশ্‌ক্ষত্রব্রাহ্মণের যোনি.ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ বিশ্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই বৈশ্য গ্রামে মহাপ্রাজ্ঞ উকীল গোপালচন্দ্র বিশ্বাস বারুজীবী-মহাশয়ের যত্নে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে. প্রায় ২৭৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে যাহারা কায়স্থছাত্র, তাহাদের অনেকে বারুজীবিগণের গৃহে অন্নাহার করে এবং কোন কোন কায়স্থ-শিক্ষকও বারুজীবীর গৃহে পান-ভোজন করেন। ইহাতে বোধ হয়, অচিরকাল মধ্যে কায়স্থে ও বারুজীবীতে অর্থাৎ বৈশ্য-সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সংযোগ হইয়া পণপ্রথার কঠোরতার পেটেণ্ট ঔষধের আবিষ্কার হইবে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বহুবিধ জাতীয় কার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছেন। তিনি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাসের কার্য্যানুসরণ করিতেছেন না কেন? যাঁহার অর্থে বহু স্কুল চলিতেছে, তাঁহার অর্থে ক্ষত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর খাদ্য-স্পর্শ-দোষ-প্রথা কি উঠিয়া যাইতে পারে না? এইত দেখুন, কদমতলার কায়স্থ-ছাত্র-শিক্ষকেরা নীরবে যে সমাজ-সংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে কেহই আপত্তি করিতেছে না। আপত্তি করিলেও তাহা বেদ-বিরুদ্ধ, কেহ শুনিবে না। তবে এতাদৃশ কার্য্যের বিস্তার জন্য বরিশালবাসীর ন্যায় প্রকৃত সাহস চাই। পরের কথায় নৃত্য করিয়া কেহ প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারে না।

এত গেল বরিশালের ক্ষত্রবৈশ্যের কথা; নিম্নস্তরের মধ্যেও এইরূপ সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বরিশালের মিশনারী-সংবাদপত্র 'সেনাপতিতে' দৃষ্ট হয়, ১৯১৬ খ্রীঃ এক বরিশাল জিলায় ৭৫০ লোক 'অবগাহিত' অর্থাৎ baptized বা খ্রীষ্টধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে। ইহারা অনেকেই নমঃশূদ্রজাতীয় বলিয়া আমরা মনে করি। ব্রাহ্মণ-প্রপীড়িত হিন্দুধর্ম্মে কথনই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সম্ভব নহে দেখিয়া তাহারা সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্মস্বাধীন্যের লীলানিকেতন, খ্রীষ্টীয় দেবালয়ে প্রবেশ করিল। এখন আর তাহাদিগকে স্পর্শদোষ-প্রথার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না।

কিন্তু এতদপেক্ষাও বিস্ময়কর ও সাহসিক ব্যাপার যাহা বরিশালে ঘটিতেছে, তাহা হইতেছে রাধাপাগলের ধর্ম্ম-প্রচার। রাধা-পাগল নামে এক নমঃশূদ্র, বাড়ী তাঁহার খাজুরতলা। গ্রামটী পিরোজপুর উপবিভাগের অন্তর্গত। তাঁহার বিষয় আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

রাধাপাগল কোন এক মোকর্দ্দমায় বিব্রত হইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত ওড়াকান্দি গ্রামে গিয়াছিলেন। ওড়াকান্দি, সুযোগ্য মিশনারী ডাক্তার মিডের (Dr. Mead) প্রচার-কেন্দ্র। গ্রামে এক ফকির বাস করেন, তিনি লোকের অনেক বিষয়ে শুভাশুভ ফল বলিয়া দিয়া থাকেন। রাধার মোকর্দ্দমায় শুভ কি অশুভ ফল হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাক্য বড় সুস্পষ্ট নহে। কিন্তু রাধা সেই গ্রামে কয়েকদিন বাসের পর যখন ফিরিয়া আসিতে-

* নবশাখ বা নবশাখা এইক্ষণে আর নাই, তাহারা এক্ষণে তেরশাখা হইয়াছে; ইহাদের সকলেই আচরণীয় হিন্দু।

ছিলেন, তখন তিনি ও তাঁহার সঙ্গী কুটুম্ব কালীচরণ এক বৃক্ষতলে শুইয়াছিলেন। নৈশবায়ুস্পর্শে উভয়েরই নিদ্রা হইয়াছিল, তবে কালীচরণ নিদ্রায় অধিকতর অভিভূত হইয়াছিল। কিন্তু রাধা স্বল্পনিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কোন দিব্য জ্যোতি বৃক্ষোপরে প্রকাশ পাইতেছে। চক্ষু মেলিয়া দেখেন, বাস্তবিক তাহাই। সঙ্গীকে কিছু না বলিয়া তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। যে শাখার উপরে সেই জ্যোতি, শ্বেতবর্ণের জ্যোতি জ্বলিতেছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; অবিলম্বে সেই জ্যোতি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দৈববাণী হইল, "তুই এক্ষণ যাহা বলিবি, তাহাই হইবে"। এই প্রকারে রাধাপাগল সিদ্ধপুরুষ হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, সঙ্গীকে সমস্ত বলিলেন, কিন্তু সঙ্গী ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই।

অতঃপরে রাধা খাজুরতলা ফিরিয়া আসিলেন। পুলিষ তাঁহার মাল ক্রোক করিয়া ইত্যগ্রে যাহা যাহা নিয়াছিলেন, আসিয়া প্রত্যর্পণ করিয়া গেলেন। রাধার কোন দণ্ড হইল না। তদবধি রাধার ধর্ম্ম-প্রচারের সূত্রপাত হইল। রাধা যাহা বলেন, তাহা ফলে, লোকের এই বিশ্বাস হইতে লাগিল।

রাধার শিষ্যসংখ্যা এইক্ষণ ৬০০০ হাজারের ন্যূন নহে, তন্মধ্যে মুসলমান প্রায় ১০০০ হাজার। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ১০,০০০। তন্মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ শিষ্যও আছে। পিরোজপুরের অন্যতম ও ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গোকুলবাবু ও উকীল সতীশবাবু বিস্ময়পরবশ হইয়া রাধার আলয়ে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন।

রাধার জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে লিখিতে বাসনা আছে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অদ্যাবধি সুযোগ পাই নাই। তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা সম্প্রতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

(১) রাধার বিবাহিতা স্ত্রীর নাম ধনলক্ষ্মী। তৎভিন্ন তাঁহার আরও তিনটী বিধবাবিবাহ আছে। এই বিধবাদের মধ্যে একজনের নাম মণি। অপর দুইজনের নাম আমি জানিতাম, স্মরণ নাই। এই স্ত্রী চতুষ্টয় লইয়া রাধা নৃত্য করেন ও গান করেন; তাঁহার শিষ্যবর্গেরা সস্ত্রীক তাঁহার সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দেয়; এইরূপ নৃত্যগীত প্রকাশ্যেই হইয়া থাকে।

(২) রাধা একাধিক মেলা মিলাইয়াছেন। সেই সকল মেলায় যে সকল সঙ্গতিপন্ন শিষ্য (তাহারা অধিকাংশই নমঃশূদ্র) আইসে, তাহাদের প্রত্যেকের এককাঠি চাউল (৮০ তোলা ওজনের ২৫সের) আনিতে হয় ও তৎসঙ্গে /০ আনার পয়সাও আনিতে হয়। গরীবের পক্ষে /১ চাউল ও /০ আনা পয়সা মাত্র। রাধা মেলার সময়ে সকলকে খাওয়াইয়া দেন। কেহকে নিজের খাইতে হয় না।

৩। রাধার শিষ্যেরা কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করে না। একখানি জল-চৌকির উপরে চতুর্দ্দিকে পুষ্প বা পুষ্পমালা স্থাপিত করা হয়। তান্ত্রিক বীজানুরূপ কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারিত হয়। সকলে মিলিয়া নৃত্য গীত করে, ভাবে মুগ্ধ হইয়া গড়াগড়ি দেয়; কোন ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, স্ত্রীপুরুষে যে কেহ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করিয়া যায়।

(৪)। বিবাহেও ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। কুমারী ও বিধবা বিবাহে

কোন বিভিন্নতা নাই। বরকন্যা বা বর-বিধবা এক স্থানে উপবিষ্ট হইলে মাল্য বদল করে, পরে করে কর ধরিয়া একে অন্যের অনুগমন করে, অবোধ্য কতকগুলি তান্ত্রিক বীজমন্ত্র উচ্চারিত হয়। স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং সময়োচিত নানা রসের সঙ্গীত হইতে থাকে।

(৫) শ্রাদ্ধও তদ্রূপ। ইহাতেও ব্রাহ্মণ লাগে না, গো দান, জল দান, তিল দান কিছুই আবশ্যক হয় না। ষোড়শ, একাদশা বৃষোৎসর্গ কাহাকেও করিতে হয় না। কেবল সাধ্যানুসারে কতক লোক খাওইয়া দিতে হয়। নৃত্যগীত ও ভাবের গান এই শ্রাদ্ধ সময়ে হইয়া থাকে।

৬। তৎকর্ত্তৃক বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ব্যভিচারিণীর শাস্তি ভয়ানক। আমি শুনিয়াছি, কোন শিষ্যের স্ত্রী, সে নমঃশূদ্রা—ব্যভিচারিণী হইয়াছিল বলিয়া রাধার কাছে অভিযোগ হইল। সে দূরবর্ত্তী গ্রামবাসিনী, রাধা তাহাকে আনাইয়া তাহার স্বীকারোক্তি (cofessions) গ্রহণ করিয়া বলিলেন "তোর এক বৎসর কাল চট পরিয়া থাকিতে হইবে!" ব্যভিচারিণী এই শাস্তির আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল।

৭। আমি শুনিয়াছি, রাধার দলে যে সকল গান গীত হয়, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকে, কিন্তু গৌরাঙ্গের উল্লেখ থাকে না। অন্য কোন দেবদেবীর উল্লেখ থাকে না।

৮। যে সকল মুসলমান-শিষ্য রাধা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাও হিন্দুর সহ একত্র পানাহার করে, স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। জলস্পর্শ-দোষ, দেবস্পর্শ-দোষ বা খাদ্যস্পর্শ-দোষ প্রথার তাহারা কেহ কোন ধার ধারে না।

৯। রাধার প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে এক বৃহৎ নৌকা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছে, মলওয়ানা সাহেবের ন্যায় এইক্ষণ রাধা প্রচারার্থে বাহির হইবেন।

১০। রাধা ধীর, নম্রপ্রকৃতি ও চিন্তাশীল, স্থানীয় জমিদার বা ভূম্যধিকারীর প্রতি ভক্তিমান। শিষ্যদিগকেও মনিবের অনুরক্ত হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আমি শুনিয়াছি, রাধার আদেশক্রমে তাঁহার অনেক শিষ্য তাহার ভূম্যধিকারীর পদযুগল গন্ধ পুষ্পে রাধার সাক্ষাতেই পূজা করিয়াছিল।

রাধা-পাগলের ধর্ম্মপ্রচার বড়ই সময়োচিত হইয়াছে। এ দিকে কায়স্থ পুঙ্গবেরা সনাতন-ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি নানা সুললিত বাক্যচ্ছলে জাতিভেদের কঠোরতা, পরস্পর-ঘৃণা বিদ্বেষের বীজ সমুদায় দেশে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানই শূদ্রজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের প্রস্তাব। মনুর পাতাগুলি উণ্টাইলে তাহা যে সে বুঝিতে পারে। তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। এক জন কায়স্থ ধনুর্দ্ধর ব্রাহ্মণকাণ্ড, রাজন্যকাণ্ড ও বৈশ্যকাণ্ড লিখিয়া শূদ্রকাণ্ড লিখিবার কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্র হইতে যে পদাঘাতের ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইবে, নমঃশূদ্রজাতির মস্তকই তাহার আদ্য স্থান। বিধাতাও এই সব দুরভিসন্ধি-প্রধান উচ্চ-বর্ণের প্রতিকূলে কার্য্যকরী বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সমাজের দুরবেস্থা দূর করার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কি প্রয়োজন? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ সমাজে যে সকল

দোষ উৎপাদিত হইয়াছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রখরতায় তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইবে? উপনয়ন হইয়াছে বেদশিক্ষার্থীর সংস্কার, তাহার সঙ্গেই বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কি সংশ্রব আছে? এজন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একজন শক্তিমান্ পুরুষ সমাজের নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের গ্লানি দূর করিতে সাহস করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে বুঝাযায়, সমাজ হইতে তিনি জল-স্পর্শ-দোষ, খাদ্যস্পর্শ-দোষ, দেবস্পর্শদোষ উঠাইয়া দিয়াছেন, দেবালয় পরিষ্কার করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ প্রপীড়ন আর তথায় নাই। ধর্ম্ম-স্বাধীন্যের বীজ সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিতে পারেন নাই, রাধা তাহা কার্য্যতঃ সাধন করিতেছেন। বরপণ, কন্যাপণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় হ্রাস, সকলই তাঁহার শিষ্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। রাধাপাগল এ যুগের প্রধান সমাজ-সংস্কারক।

বরিশাল জিলার পশ্চিম প্রান্তে বলেশ্বর নদের তীরবর্ত্তী প্রায় সমুদায় নমঃশূদ্রগ্রামে, পর্য্যন্ত ভাটির অঞ্চল ও সুন্দরবনে, রাধা-পাগলের শিষ্য দেখা যায়।

পাঠান রাজত্বের শেষাংশে যেমন বড়খান গাজী "গাজির গানে" মাতাইয়া আঠারবেঁকী নদীর দুই ধারে বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, রাধাপাগলও বলেশ্বরের সমীপবর্ত্তী গ্রাম গুলিতে তদ্রূপ বহু শিষ্য করিয়া ফেলিয়াছেন।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

মধুস্মৃতি।

(কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা।)

যে বিধি গড়িলা দেব! যে বিধি গড়িলা
শৈবাল-জড়িত জলে বিকচ কমল;
যে বিধি গড়িলা দেব! যে বিধি গড়িলা,
নীরব নিঝুম বনে কোকিল-কাকলি;
যে বিধি গড়িলা দেব! যে বিধি গড়িলা,
খনির আঁধারে মণি, মুক্তা সিন্ধু-তলে;
সেই বিধি. সে ঘুমন্ত, সেই ভ্রান্ত বিধি
তোমারে, জগত-জ্যোতিঃ কবিকুল রবি,
তোমারে পাঠালে হায় এ আঁধার দেশে,
অমূল্য রতন যথা দুখিনী অঞ্চলে!
দেখেও দেখেনি কেহ বুঝেও বোঝেনি,
অনাদরে চলি গেলে আদরের ধন!
এমনি আষাঢ় মাসে সজল লোচনে,
প্রকৃতি চাহিলা বুঝি মরতের বুকে—
কি দেখিলা ধরাতলে? তপস্যার ফলে
জননী জাহ্নবী পিতা রাজনারায়ণ,
বিশ্বের উজল মণি নবশিশু রূপে,
লভিলা যাহারে মরি!—অবনী ত্যজিয়া
যায় সে স্বরগ বাসে দেবের আহ্বানে।
বসন্ত চলিয়া যায় নীরবে যেমতি!
রাখি গেলা কীর্ত্তি যশঃ অতুল ভূতলে
বাণী-বর-প্রাপ্ত সেই চির অমরতা!
সেদিন বুঝিল বিশ্ব কি যে হারাইল-
গরাসিল কাল-মেঘ কি সোণার শশী!
সে দিন বুঝিল বঙ্গ আঁধার সাগরে,
কি আলো ডুবিলা তার জলদের মত!
সবি ছিল তবু সব আঁধার আঁধার—

ছিল না যে দীপ্ত রবি শ্রীমধুসূদন!
আজি সেই দিন দেব! ভাসি আঁখি-জলে
করিছে তোমার পূজা ভক্তগণ তব।
তুমি যে গিয়েছ দিয়ে অসীম গৌরব,
প্রতিদান নাহি তার মানব-জীবনে;
তবু লহ দয়া করি দয়াময় তুমি,
অনুতাপ-অশ্রু-ধৌত-ভক্তি কৃতজ্ঞতা।
যেখানে যে লোকে এবে করহ বসতি,
ধর তাতঃ! দুহিতার সহস্র প্রণতি। *

শ্রীবীর-কুমার-বধ-রচয়িত্রী।

—⁕—

বঙ্গসাহিত্যে আর্ট।

আজকাল আর্ট লইয়া বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মধ্যে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে, এবং যাহার যাহা অভিরুচি, আর্টের দোহাই দিয়া বঙ্গের নিরঙ্কুশ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহাই চালাইয়া লইতেছেন। সকলেই 'হামবড়া', সকলেই পাণ্ডিত্যের ময়ূরপাখা ধারণ করিয়া আর্ট কথাটীর আদ্য শ্রাদ্ধ করিতেছেন। সকলেই originality দেখাইবার জন্য পাগল, একটা নূতন কিছু করিব, এই অন্বেষণেই ব্যস্ত, কিন্তু আর্টের যাহা প্রাণ, আমাদিগের ভিতর সেই sincerityর আজ কত অভাব! এক কথায় যদি কেহ আমার নিকট Artএর পরিচয় চাহে, তবে আমি বলিব, sincerity, সহৃদয়তা! উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তির সহিত সহৃদয়তার যদি যোগ না থাকে, তবে তাহার কোন মূল্যই নাই। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যতই আমাদিগের মস্তিষ্কে originalityর অতি-বৃদ্ধি গজাইয়া উঠিতেছে, ততই আমাদিগের হৃদয়ের sincerity কমিয়া আসিতেছে। আমরা কি সাহিত্যে, কি সমাজে, চারিদিকেই লক্ষ্য করিতেছি আন্তরিকতার অভাব, এবং নূতনত্বের প্রাবল্য।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য এই তথা-কথিত নূতনত্বের সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক। এই নূতনত্বকে ফরাসী ভাষায় বলা হয়, Fin-de-siccle অর্থাৎ যুগ-লক্ষ্যা। Dr. Nordan ইহার বিশদার্থ এইরূপ করিয়াছেন—"Fin-de-siccle means a practical emancipation from traditional discipline which theoretically is still in force". অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের গতানুগতিক ধারাকে একেবারে জীবনের ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করণ। ইহাই হইতেছে, এখনকার যুগ-লক্ষণ, কেমন করিয়া পুরাতন রীতি-পদ্ধতিকে পদদলিত করিয়া যথেচ্ছাচারিতায় জীবনকে চালিত করিতে পারা যায়—এই দূষিত আব্‌হাওয়ার সংক্রামক প্রভাব আজ জগতের সর্ব্বত্র এবং ফরাসী দেশ, ফরাসী সাহিত্য, ফরাসী সমাজ তাহার কেন্দ্র-স্থল। এই ফরাসী দেশ হইতেই আর্টে Realism কথাটার উৎপত্তি। মহামতি টলষ্টয়ই বলিয়াছেন—"Realism was a reaction for conventionality in art had never been pushed so far as in

* কবির চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪শ) সাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।

France." কলা ফরাসীদেশে যতটা আবরণ-হীনা, বিবসনা হইয়া পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও নহে, গোপন-প্রিয়তার বিরুদ্ধে ফরাসী সাহিত্যেই আয়োজন অধিক।

ফ্রান্সের দেখাদেখি, অন্যান্য দেশেও, এমন কি, আমাদের বঙ্গ দেশেও আজ কলাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলা এক্ষণে আর কুলবধূ নহে, কুল-ত্যাগিনীর ন্যায় জীবনের পণ্যশালা খুলিয়া দিয়াছে। অবশ্য এই বলিয়া আমরা কেবল Realismকেই দোষ দিতেছি না। উভয় পক্ষেই দোষ আছে। এক হাতে কখনও তালি বাজে না। যুগ যখন যুগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তখন বুঝিতে হইবে, উভয়েরই গ্লানি আছে। তাই বর্ত্তমান যুগে অতীত যুগের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, আবার এ যুগ যে গ্লানির সঞ্চয় করিতেছে, পরবর্ত্তী যুগও তাহার প্রতিবিধানের জন্য মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

এই যুগের বিশেষ কার্য্য এই যে, ইহা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। "বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে শ্যাম অবতার" ইহাই ছিল পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লক্ষণ। ইহার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুগ বলিতেছে—"Life does not work towards "curtains" through a series of conveniently arranged episodes. Art, if it is to represent life to any claim to fidelity, must abandon the sunday-school prize system, and face the real facts of failure and success." The New Realism. F. Review. ইহার ভাবার্থ এইরূপ—জীবনটা ত ঘোম্‌টার সামগ্রী নয় যে কতকগুলা সুবিধা মত সাজান উপকথার মধ্য দিয়া চলিবে। সত্যের দাবী রক্ষার জন্য আর্ট যদি জীবনেরই অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে গতানুগতিক পারিতোষিক বিতরণ পরিত্যাগ করিয়া উত্থান-পতনের প্রকৃত পরীক্ষা-ক্ষেত্রের সম্মুখীন হইতে হইবে।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এই সুরাসুরের সমুদ্র মন্থন,—ইহাতে সুধাই উঠুক আর বিষই উঠুক—ইহাকে সজীবতার একটী লক্ষণ বলিতে হইবে। অল্পে কেহই পরাভব মানিবার পাত্র নহে। উভয়ের ভিতরেই সত্যও রহিয়াছে, গ্লানিও রহিয়াছে।

ইমার্সন বলিয়াছেন, "প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতাও আসিয়া পড়ে।" বর্ত্তমান যুগ অগ্রবর্ত্তী যুগের টিকি-মেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করিতে গিয়া হাল ফ্যাশানী টেরী কাটিতেও শিখিয়াছে, আবার টেরী-মেধ-যজ্ঞও পরবর্ত্তী যুগ করিবে। আমরা মাটীর পুতুল ভাঙ্গিয়াছি বটে, কিন্তু কাঁচের পুতুলে ভুলিয়াছি। তবে পৌত্তলিকতা গেল কোথায়? লাভের মধ্যে হইল কি, যে সাধ অল্পে মিটিত, তাহার পশ্চাতে আমার চতুর্গুণ অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে। আমরা ঘোড়ার গাড়ী ছাড়িয়া এক্ষণে মোটর ধরিয়াছি। তাহাতে হইয়াছে কি? আমরা জীবন্ত সামগ্রীকে ভুলিয়া কঠোর এবং নীরস যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতেছি। তাহাতে আমাদের গতির মাত্রা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের সাধ মিটিতেছে না। এত আরামের ভিতর থাকিয়াও হৃদয়ের ভিতর কি যেন একটা গভীর অভাব অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত অভাব অপেক্ষা কল্পিত অভাব (relative want) আমাদিগের এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহার আর

ইয়ত্তা নাই। জীবনটা আমাদিগের জটিলতায় ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃত সুখের পথ ভুলিয়া আমরা চাহিতেছি, আরাম এবং প্রতিযোগিতা! প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে আমরা চাহিতেছি, বিলাসের সাজ সরঞ্জাম। তাহাতে হইয়াছে কি? তাহাতে হইয়াছে এই যে, ধনীর বিলাস-ক্ষুধা মিটাইতে দরিদ্রের পেটের জ্বালা ও জীবনের অপব্যয় ক্রমশঃই নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই যে উৎকট আর্ট আসিয়া আমাদিগের সাহিত্যিকগণের মানসিক ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও বিষময় সাহিত্যের প্রভাবে পাঠকের স্বাস্থ্য ও মনকে বিকৃত ও চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, ইহাতে দরিদ্রের সঙ্গে আমাদিগের সমবেদনা কোথায়? অভাব অভিযোগের কোন সুর ত আমরা বাণীর বীণায় প্রকাশ করিতেছি না। রক্তমাংসের দুর্ব্বলতার সমর্থনই কেবল সাহিত্যের চরম আদর্শ নহে, সাহিত্য-জীবন এবং জীবনেরই সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি! কেবল ইচ্ছা পরিচালনা করিলেই সাহিত্যের সদ্গতি করা হইল না, সাহিত্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণতায়, শিক্ষার লক্ষ্যও সম্পূর্ণতায়—"To live completely" H. Spenser. আর্টের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্বাস্থ্যের দিকে এবং সম্পূর্ণতায়। যে আর্ট স্বাস্থ্যকে পদদলিত করিয়া কেবল আত্ম-তৃপ্তির অভিব্যঞ্জনা মাত্র হয়, সে আর্টের মূল্য ত নাইই, বরং তদ্দ্বারা সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়। আর্টের লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-রক্ষা নহে, সমাজের শৃঙ্খলা যাহাতে না বিগড়ায়, ইহাই আর্টের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। "Art has a double aim, subjective and objective, viz, the satisfaction of an organic want of the artist and the influencing of his fellow creatures." Dr. Nordan.

সর্ব্বোপরি সাহিত্যিকের কু-অভিপ্রায় যেন পাঠকের মনে গাঁথিয়া না যায়। সাহিত্যিক যে কোনরূপ চরিত্র লইয়া আর্টের সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু পাপচিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া, তিনি নিজে যেন উন্নত আদর্শ হইতে চ্যুত না হয়েন। সাহিত্যিক অসংযমী হইলে তাঁহার সাহিত্যও অসংযমের দৃষ্টান্ত স্থল হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। মনস্তাত্ত্বিক যাঁহারা, তাঁহারা সাহিত্যিকের মনস্তত্ত্বকেও বিশ্লেষণ করিতে ছাড়েন না। পাশ্চাত্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ মনস্তত্ত্ববেত্তার অভাব নাই। তাই তথায় সুর উঠিয়াছে "Degenerates are not almays criminals, prostitutes, anarchists and pronounced lunatics, they are often authors and artists". Dr. Nordan. লম্ব্রোজো, ক্রাফট এবিং, তুয়েক প্রভৃতি বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। টলষ্টয়ের জীবনী-কর্ত্তা সমালোচক-প্রবর Maude সাহিত্যিকগণকে সদুপদেশ দিয়াছেন—"What is important is not the subject treated of, but the feeling the author imparts when dealing with it." সাহিত্যিক মাত্রেরই এই উক্তিটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। যাঁহারা এই আদর্শের মর্য্যাদা রাখিয়া না চলেন, তাঁহারা মনস্তাত্ত্বিকগণের মতে criminal type মধ্যে গণ্য। তাঁহারাই দেশময় তাহাদের অসৎ চিন্তার প্রশ্রয় দিতেছেন। moral spirit যাঁহারা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে চাহেন, তাঁহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। সংযমহীনতা কোন কালেই কোন জাতির সাহিত্যকে উন্নত করিতে পারে নাই। ফরাসী জাতি এত hysterical কেন? তাহার কারণ, তাহাদিগের সাহিত্যে অবাধ সংযম-হীনতার প্রভাব! বিংশ শতাব্দীর ফরাসী জাতি তাহা বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে পূর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ও বিংশ শতাব্দীর ফরাসী এক নহে। আজ ফরাসী জাতি তাহার intellectualism ভুলিয়া যাহা সরল, মঙ্গল এবং ভবিষ্যতের উন্নতি-সাধক, এরূপ পথ ধরিতেছে। সম্প্রতি Jane Ellen Harrison তাঁহার Alpha and Omega গ্রন্থে লিখিতেছেন:—

"The movement is of course, anti-intellectualist. The watch-word are home and country. It is a complete volt-face, it is as M. Bergson has said a "renaissance morale, une vraic recreation de la—volonte." Young France refuses to roll in the mire, or to toss in a nightmare dream. She is up and awake and out for action. Cult of the family, cult of la patric (পিতৃধর্ম্ম) are the new inspirations and they are set indefinite opposition to the old ideals of the "Citizen of the World." ফরাসীর এই বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদিগের 'বাংলার' উদীয়মান সবুজপন্থী, বিশ্বমানব-বাবুরা কি বলেন? ভুক্তভোগী ফরাসী এখন তাহার উদারতা ভুলিয়া বলিতেছে, Retour aux croyance sucestrale অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষের বিশ্বাসের পথে ফির। সকলেই খুঁজিতেছে প্রত্যাবর্ত্তন, আর অবুঝ সবুজ-বাবুরা খুঁজিতেছে পরিবর্ত্তন! ও তদপেক্ষাও জঘন্য পন্থা—অনুকরণ!! ইহাকেই প্রচলিত কথায় বলে "কাঙ্গালের ছেলের রঙ্গাই নাচ!"

বাঙ্গালার শক্তিমান সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন;—

"It is on the past that the future has to be moulded, this past will become the future, the more therefore the Hindus study the past, the more glorious will be their future and who ever tries to bring the past to the door of everyone, is a great bene-factor to the nation". সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই একটী মাত্র উৎসাহপূর্ণ কথায় তোমাদিগের সহস্র বিলাসী কবি-সম্রাটের আর্ট, আড়ম্বর ও আস্ফালন কোথায় উড়িয়া, উপিয়া যায়। মহাজনগণের এই নীতি ধর্ম্মের প্রভাবে এখনও এই ত্রি-কালজ্ঞা, ত্রিনয়না দেশ-জননী জাগিয়া রহিয়াছেন, এখনও বাণীর বীণায় ভবিষ্যতের প্রতি অতীতের সেই সুমহান আদেশ উত্থিত হইতেছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

এই আশার কথা, এই উৎসাহের কথা, সনাতনী কথা এই সাহিত্যের দ্বারা আজ প্রতি হৃদয়েই জাগ্রত করিতে হইবে। তোমাদিগের আমদানী-করা আর্টে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। কারণ আর্ট যে তোমাদের উপভোগের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। আর্টের প্রথম এবং প্রধান উপাদান যে রুচি (taste), সেই রুচিই যে বিকৃত হইয়াছে। Art এবং

taste-র মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যেখানে রুচি-বিকার নাই, সেখানে কলাও অবিকৃত। বর্ত্তমান কলাকে স্বাস্থ্যকর ও উন্নত করিতে হইলে অগ্রে রুচির সংশোধন আবশ্যক। স্বাধীন জাতি বলিয়া বিলাসী ফরাসীরা ভীষণ জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনরূপে সামলাইয়া গেল, কিন্তু জগতের কীটাণুকীট অপদার্থ জীব তোমরা গলায় পরাধীনতার হার পরিয়া তথাকথিত আর্টের নাগপাশ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে কি? যে পাশ্চাত্য কলার তোমরা অনুকরণ করিতে ছুটিয়াছ, তাহার বিরুদ্ধে সমালোচক প্রবর Valdes কি বলিতেছেন, শুনিবে কি?

"I cast my eye over Europe and I see nothing in poetry and painting but lugubrious and prosaic scenes and in music I hear nothing but sounds of death. Art seems to me like an acute attack of nerves, the artists sometimes like madmen, sometimes like charlatans, who hide their want of power under monstrous affectations and cleverly profit by the general perversion of taste, whilst the public, depraved by them and the prevailing utilitarianism, is without a criterion to distingush between the beautiful and wholesome, the ugly and absurd."—The decadence of Modern Literature.

এই ত গেল পাশ্চাত্য-পক্ষের অভিমত। আমাদিগের সাহিত্য-দর্পণকারের মতেও তোমরা বর্জ্জনীয়। সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন—"কাব্যের অপকর্ষ তিন প্রকার, যথা—রসাদির অনুভবের প্রতিবন্ধ, রসাদির [প্রকর্ষের অর্থাৎ চমৎকারাতিশয়ের অনুভবের প্রতিবন্ধ এবং রসাদির অনুভবে বিলম্ব।" এই তিনটা দোষই তোমাদের কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি চিত্রাঙ্কণে প্রায়শঃই দৃষ্ট হয়। আমরা রুমী, যামী প্রভৃতি সুফী কবিগণের হেয়ালীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারি, তথাপি তোমাদের খেয়ালের অন্ত খুঁজিয়া পাই না। সাহিত্য-দর্পণকার আরও বলিয়াছেন—"রস কাব্যের আত্মা।" যেমন কাণত্ব, খঞ্জত্ব, মূর্খত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল শরীর এবং অন্তঃকরণকে দূষিত করিয়া আত্মার অপকর্ষ সাধন করে, সেইরূপ, দুঃশ্রবত্ব, অশ্লীলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল কাব্যের শব্দার্থরূপ শরীরকে দূষিত করত তন্নিবন্ধন কাব্যের আত্মভূত রসের অপকর্ষ সাধন করে।" তোমাদের মতে হয় ত সাহিত্য-দর্পণকার নির্ব্বোধ, কারণ তোমরা যে দুর্ব্বোধ! এবং সর্ব্বপরি 'হাম বড়া'। তোমাদের মতের সঙ্গে অমিল হইলেই তোমরা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষকেও নির্ব্বোধ বলিতে লজ্জা বোধ কর না।

তোমাদিগের কর্ত্তা রবীন্দ্রনাথ আজ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্য যে সব আর্টের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কি নিজস্ব? তাঁহার অধিকাংশ রোমন্থনই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ! আজ যে বঙ্গ-সাহিত্যে তোমরা বিভীষিকার আন্দোলন তুলিয়াছ, তাহা বহু পূর্ব্বে য়ুরোপে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মাণীর নীফ্‌চে সর্ব্ব-প্রথম তাহার পথপ্রদর্শক। তোমরা 'সৃষ্টির আনন্দ' কথাটী তুলিয়াছ, তাহা কি নীফ্‌চের Dionysian Art নহে? যত রকমের পাগ্‌লামী নীফ্‌চে করিয়া গিয়াছে, একে একে তোমাদের সেই সব ভাবের ঘরে চুরি ধরা পড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্র-পন্থী কর্ত্তা-ভজা তোমরা, এখনও সাবধান হও, মেকী ও ভেজ্কী চিরকাল চলিবে না। সময় বলিয়া

একজন অখণ্ড সমালোচক আছে, তাহার চক্ষে কখনও ধূলি দিতে পারিবে না। নীফ্‌চে পাগল হইলেও তাহার পাগ্‌লামীতে একটা সারল্য ও স্বাতন্ত্র্য ছিল, একটা sincerity ছিল। কিন্তু তোমাদিগের জুয়াচুরিতে বাঙ্গালীর প্রতি মেকলের সেই অপবাদ আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

চুরির পথ, অনুকরণের শাখা-মৃগত্ব ছাড়িয়া দাও। এখন হইতে একবার নিজের দিকে, এবং নিজের অতীতের দিকে তাকাও দেখি! দেখিবে, কলা ছলা নহে; কলা যোগ,—যোগ কর্ম্মস্য কৌশলম্! কর্ম্মযোগ। কর্ম্মসাহিত্যের আজ কত অভাব! সৃষ্টির প্রারম্ভে আজ আবার কবিকে যোগে বসিতে হইবে। ব্রহ্মার মানস-সরোবরে আদিতে উঠিয়াছিল কি? ওই যোগ, ওই সৃষ্টির বৈখরী বাণী তপ! তপ!! তপ!!! কোন কর্ম্মই তপস্যা ও তন্ময়ত্ব ব্যতীত হইবার উপায় নাই। কোন মহাত্মা বলিতেছেন—"When we produce, when we create, we are in conquering vain. A nation, like an artist, when in a creative mood is at its maximum." কিন্তু সৃষ্টিধর হইতে হইলে অগ্রে আপনাকে প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন। আত্ম-সংযম ব্যতীত সৃষ্টির অনন্তত্ব জন্মে না! সংযমহীন সৃষ্টির ক্ষণভঙ্গুরত্ব আজ ত চারিদিকেই নয়ন-গোচর হইতেছে। মানুষ হইয়া কাচের পুতুলের অপেক্ষাও আমরা ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছি। বাঙ্গালীর এই যে ভঙ্গপ্রবণ অবস্থা, ইহার মূলে আমাদিগের বাবু-সাহিত্যিকদিগের অপরিণামদর্শিতা ও বিলাস-বিভ্রম কি কম সহায়তা করিয়াছে? বাস্তবিক, যাহারা চিন্তা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই সমাজ বা জাতির শুভাশুভের জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী। সাহিত্যিক মাত্রেরই সমাজের উপর যে একটা কর্ত্তব্য আছে, ইহা যাঁহারা না চাহেন, তাঁহারা যে কৃপার পাত্র, তাহা বলাই অপ্রয়োজনীয়। সমাজের মনের খাদ্য যোগায় কে? সাহিত্যিক! জাতির হৃদয়ে আগুন জ্বালায় কে? সাহিত্যিক! সাহিত্যিকের উপর একটা জাতির দায়িত্ব নির্ভর করে। সমাজের গতি, মতি সবই শক্তিধর সাহিত্যিকের ভাবানুযায়ী গঠিত বা বিকৃত হয়। সাহিত্যিক বিগড়াইলেই সমাজ বিগড়ায়; ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের সমাজ-শরীরে যে সাহিত্যিক-ব্যাধি ক্রমশঃই সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে, নমুনা স্বরূপ সমাজের নিম্ন স্তর হইতে তাহারি একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। একটী ভদ্র ঘরের সুশিক্ষিতা এবং ভাগ্যদোষে অধঃপতিতা নারীর আত্ম কাহিনী হইতে আমি নিম্নলিখিত সঠিক উক্তি গুলি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতে আমার দ্বারা কিছুই অতিরঞ্জিত হয় নাই।

"কি করি, মাষ্টারণী মাগী ভাল ভাল নভেল আনিয়া দিতে লাগিল, আমিও একপা একপা করিয়া অধোমুখে নীচুতে নামিতে লাগিলাম। ওগো বাংলার নভেল-লেখকগণ, তোমাদের গল্পগুলি সমাজের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট করছে, তা' বলে ওঠা যায় না। বিষ-বৃক্ষ না লিখে যদি বিষের শিশি বিক্রয় করিতে, তা হলে সমাজ এত অধঃপতিত হ'ত না। তোমাদেরই বই পড়ে 'ভালবাসা' যে একটা স্বর্গীয় জিনিষ, তা বুঝ্‌লেম। কর্ত্তব্য-টাই আগে বুঝতেম, আমার স্বামীই আমার সব, আমার সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি তাঁরই, কেবল তাঁরই জন্য আমি সৃজিত হয়েছি,

কখনও ভাবিনি, আমি একটা আলাদা বস্তু, তিনি ছাড়া আমার নিজের সুখের বিষয় আছে। স্বীকার করি, দোষ আমাদের, কিন্তু মস্তিষ্কের গঠন—সয়তানীর খাদ্য কে জোগায়? মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া কে তোলে? প্রথম বীজ রোপিত কোথা হইতে হয়? ছিঃ ছিঃ সামান্য তুচ্ছ নামের আশায় ইংরাজি সমাজের দৃষ্টান্তগুলি কেন অনুকরণ করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধিত করিতেছ? ছিঃ! তুমি যদি তোমার অপূর্ব্ব ভালবাসার দৃষ্টান্তস্থলের দৃশ্য নিজে ভোগ না করিতে চাও, তাহা হইলে তুমি উহা ওরূপ সুন্দর করিয়া প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছ কেন? মানুষের পক্ষে মন্দ হওয়াটা যতটা সহজ, ভাল হওয়াটা ততই কঠিন।''

হে বাঙ্গালার পাঠক ও লেখক-সমাজ, এই হতভাগিনীর সর্ব্বনাশের কাহিনী পাঠ করিয়া তোমরা এখন হইতে সাবধান হইবে কি? এই উচ্চবংশীয়া, উচ্চশিক্ষিতা, সংসর্গদোষে অধঃপতিতা বঙ্গনারীর কাতর মিনতিতেও যদি তোমাদের হৃদয় না গলে, কুম্ভকর্ণের বিলাস-নিদ্রা না ভাঙ্গে, তবে বৈজ্ঞানিকের কথায় কর্ণপাত কর। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ Dr. Max Nordan বলিতেছেন—

"The biological truth is, that constant self-restraint is a necessity of existence as much for the strongest as for the weakest. It is the activity of the highest human cerebral centres. If these are not exercised they waste away, i. e. man ceases to be man, the pretended over-man (ucher-mensch) becomes sub-human, in other words a beast." এই ত গেল স্থূল শারীরতত্ত্বের কথা, ইহার সঙ্গে সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের সবিশেষ যোগ রহিয়াছে।" সেইটা ভাল করিয়া প্রতিপন্ন করিতে উক্ত বৈজ্ঞানিক Nordan আবার বলিতেছেন,—

"In the success of an healthy tendencies in art and literature, no quality of their authors has so large and determining a share, as their 'sexual psychopathy.' All persons of unbalanced minds, have the keenest scent of perversions of a sexual kind, and perceive them under all disguises....works of a sexually psychopathic nature excite in abnormal subjects (পাঠক) the corresponding perversion and give them lively feelings of pleasure which they usually in good faith, regard as purely aesthetic or intellectual, whereas they are actually sexual. This confounding of aesthetic with sexual feelings is not surprising, for the spheres of these two feelings are not only contiguous but are for the most part even coincident."

সৌখীন বেশভূষার অন্তরালেও মানব চরিত্রের নানারূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয়। যথা, "At the base of all oddities of costume, especially that of women, there is hidden an unconscious speculation in something of a sexual psychopathy, which finds incitation and attraction in the temporary fashion in the dress." Nordan's degeneration.

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এইরূপ নানারূপ জটিল সমস্যা আজ আমাদিগের লেখক ও পাঠক সমাজের ভিতর প্রকৃতিগত, মজ্জাগত ও সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানকালে যে কলা-কৌশল আমরা প্রয়োগ করিতেছি,

তাহা যে সমাজব্যাপী এবং দেশব্যাপী একটা অকল্যাণের সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিবে, তাহা সবিশেষ প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ত্তমান আর্ট যে একটা ব্যাধি, ইহা এক প্রকার সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে।

কিন্তু প্রকৃত আর্ট কি? প্রকৃত আর্ট স্বাস্থ্য। মানসিক, দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উৎকর্ষ যাহা দ্বারা সাধিত হয়, তাহারই নাম আর্ট। প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে না দেখিলে কলা উন্নত-শালিনী হয় না। কলা কোনরূপ ইচ্ছা-পরিচালনা (suggestion) নহে, কলা সর্ব্বাঙ্গীনতা ও সম্পূর্ণতা,—completeness. কলাবিদ্ যিনি, তিনি পারুন আর না পারুন, পরিপূর্ণতার দিকে নজর না রাখিলে, আদর্শ-সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরিপূর্ণতাকে ধরিবার চেষ্টাই —Art। কবি, চিত্রকর, গায়ক, শিল্পী ও সাধক আজীবন ধরিয়া যুগেযুগে ওই পরিপূর্ণতার অন্বেষণেই ছুটিয়াছেন। পরিপূর্ণতাকে যিনি যত ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছেন, কলা-লক্ষ্মীর তিনিই তত প্রিয় পাত্র হইতেছেন। এই পরিপূর্ণতাকেই জার্ম্মাণীর বিখ্যাত দার্শনিক সোপেনহার completest objectivity বলিয়াছেন। এই কথাটিতে দার্শনিক চূড়ামণি অদ্বিতীয় শঙ্করের 'সম্যক্ দর্শন'কেই সোপেনহার লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন।

সোপেনহার বলিতেছেন—"Genius is simply the completest objectivity i.e., the objective tendency of the mind as opposed to the subjective, which is directed to one's own self—in other words to the selfish will."

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববেত্তা Turck ও এই মীমাংসার সমর্থন করিয়াছেন যে—"We may say that the degree of love in a man is the measure of the genius he possesses, and that the degree of his self-seeking is the measure of his narrow-mindedness."

The man of Genius.

কিন্তু বড়ই সন্তাপের বিষয়, আজকাল একমাত্র আত্মতৃপ্তিই (individualism) অনেকের মতে কলার অন্তরাত্মা হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য নীচমনা সাহিত্যিকগণের দেখা দেখি, আমাদিগের কতিপয় উচ্ছিষ্টভোজী বাবু সাহিত্যিকও আত্মতৃপ্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে কলার যত উন্নতি হউক আর না হউক, বাবুদিগের হনুকরণ-প্রিয়তাই অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

বাগিন্দ্রবাগীশ বাবুরা যে আর্টের পরিচয় দিতেছেন, তাহার অধিকাংশই Nietzche, Tolstoy ও ইব্‌সেনের স্বাধীন চিন্তাশীলতার নকল, তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। বলি, এরূপভাবে পর-পদলেহন করিয়া বঙ্গবাণীর পূত-প্রাঙ্গণে আর্টের ভেজাল সৃষ্টি (Parasitism) আর কত দিন চলিবে? এই চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের দেশে তোমাদের ভাবের ঘরে চুরি কি শোভা পায়! তোমাদের যদি বিন্দুমাত্রও আত্মমর্যাদা থাকিত, তাহা হইলে এমন ভাবের দেশে জন্মিয়া বিদেশীর দ্বারে আত্মবিক্রয় করিতে যাইতে না? ভবিষ্যতের বঙ্গ-সাহিত্য তোমাদিগকে তস্কর ব্যতীত অন্য উপাধিতে ভূষিত করিবে না। যদি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সাধ থাকে, এখনও অতীতের দিকে তাকাও। রসতত্ত্বের চর্চ্চা তোমাদিগের দেশে যতটা হইয়াছিল, এমন আর কোথায়? চণ্ডীদাস

হইতে আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু পর্য্যন্ত সুরসকগণের মধ্যে এই শ্যাম-শীতল বঙ্গের রঙ্গভূমে এককালে ভাবের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। আর আজ তোমরা সেই বিধিদত্ত ধনের জন্য লালয়িত ও পরপদানত! হায় ভাগ্য!

সরলতা ব্যতীত, সহৃদয়তা ব্যতীত রসতত্ত্বের (art) অভিব্যক্তি হয় না। তোমরা দেশের মহাজনগণকে ভুলিয়া Nietzcheএর অনুসরণ করিতে যাও, কিন্তু তাঁহাকেও যে তোমরা হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছ, এমন ত মনে লয় না। Nietzcheএর ব্রণের মধ্যে ডুবিয়া আছ, কিন্তু নীফ্‌চের গুণের অন্বেষণ করিয়াছ কি? Nietzche প্রকৃত Art সম্বন্ধে যে সরল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমার মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে এমন আর কেহই পারেন নাই। নীফচে বলিতেছেন—"He who wishes to set Art free and restore its purity and sacredness should himself be innocent, in order to discover innocence of Art."

এই সরলতা আমাদিগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে কতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, একবার তলাইয়া দেখিয়াছ কি? রায় রামানন্দ বলিতেছেন—

"তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শূরের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করাও, জিহ্বায় বহাও বাণী।
কি কহি যে ভাল মন্দ কিছুই নাহি জানি॥

আর এক স্থলে বলিতেছেন,—

"—আমি নট, তুমি সূত্রধর।
যেমতে নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি।

এমন করিয়া আত্মসমর্পণ না করিলে কি এ দেশের রসতত্ত্ব এতটা প্রাণপূর্ণ ও প্রগাঢ় হইতে পারিত? হৃদয়ে প্রেরণা না আসিলে মহাপুরুষ মহম্মদ আরবের মরু-ভূমিকে কখনও কোরাণের দ্বারা উর্ব্বরা করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য কোরাণ ধর্ম্মও বটে, আর্টও বটে। তেমনি চণ্ডীদাসের হৃদয়োত্থিত পদাবলী, চণ্ডীদাসের রস-সাধনা, হৃদয়ের প্রেরণারই (inspiration) নামান্তর। সে রস অবিরল অনর্গল অশ্রুজল, তাহা পরিণাম-বিরস নহে, তোমাদের লৌকিক, মৌখিক রস নহে। সে রসের কুলকিনারা নাই। প্রেরণার মাপ-কাঠিতেই রসের গভীরতা বোঝা যায় না। Art ছলনার বস্তু নহে, প্রেরণার বস্তু, আর্ট অনুকরণ নহে, আর্ট বশীকরণ। যিনি প্রকৃত কলাবিদ্, তাঁহার রচনায় মন্ত্রমুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু তোমরা যে সৃষ্টিছাড়া আর্টের পরিচয় দিতেছ, তাহা যুগপৎ বিরক্তিকর ও অনিষ্টকর। তাহাতে একমাত্র বর্ত্তমানের আত্মতৃপ্তি 'কামায়ন' প্রচার ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। কেমন করিয়া দেশব্যাপী একটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার সৃষ্টি করিব, ইহাই তোমাদের জীবনব্যাপী ব্রত। বলা বাহুল্য, 'সবুজপত্র' এবং 'নারায়ণ' আজ এই নিরন্ন দেশকে মজাইবার জন্য চারিদিক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কেবল কামের খাদ্যই যোগাইতেছে।

আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, আর্ট বর্ত্তমানের আত্মতৃপ্তি নহে, আর্ট ভবিষ্য-প্রসূতি! তাই কবিমাত্রেই বর্ত্তমানের নহে, ভবিষ্যতের! প্রকৃত কল্পকলা—cart de visit to posterity! সময়ের সমালোচনে যে সাহিত্যিক প্রকৃত টিকিয়া যান, তিনিই

প্রকৃত সাহিত্যিক, প্রকৃত সাধক। যিনি চুরি করিয়া সাহিত্য গঠন করেন, তিনি ভবিষ্যতের নিকট অপরাধী, তিনি বর্ত্তমানের অজ্ঞতাকে ঠকাইয়া যশস্বী হইতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার স্থান বিস্মৃতির গর্ভে।

আজ যে রুষ-সাহিত্য য়ুরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, রুষ সাহিত্যিকগণ য়ুরোপের নকলনবীশি ছাড়িয়াছে এবং আপনাদিগের স্বরূপকে চিনিয়াছে, রুষ-সাহিত্য যে য়ুরোপে আজ একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—তাহার কারণ রুষিয়ার জারের দর্পদন্তের ইতিকথা নহে, তাহার কারণ রুষিয়ার কৃষক-হৃদয়ের সহিত সাহিত্যিকগণের সকাতর সমবেদনা। সাধারণ জীবনকে উপেক্ষা করিয়া আমরা সকলেই অসাধারণ হইতে চাই, আমরা বড় বড় সমাজের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাই, কিন্তু গরীবের সুখ দুঃখের, অত্যাচার, অবিচারের দিকে তাকাইয়া দেখি কি? সাহিত্য কতিপয়ের জন্য নহে, সাহিত্য সাহচর্য্য! সাহিত্য সার্ব্বজনীন, সর্ব্বাঙ্গীন! কয়টা রোদনের ইতিহাসে আমরা আমাদিগের সাহিত্যকে সরল ও প্রাণপূর্ণ করিতে পারিয়াছি?

যে সাহিত্যে সমবেদনার পরিচয় পাই না, যে সাহিত্য জাতীয়-জীবনে কল্যাণের সাড়া দেয় না, যে সাহিত্য সমাজ-শরীরে স্বাস্থ্য আনয়ন করে না, সে সাহিত্য কুহক। রুষিয়া যে আজ জার্ম্মাণীর সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছে, তাহার পশ্চাতে রুশিয়ার সাহিত্যের নৈতিক দায়িত্বভারও বড় কম নহে। রুষ-সাহিত্যের গতিবিধি যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

অপর দেশের সভ্যতা ও সাহিত্যের দাসত্ব হইতে যতদিন না, আমরা বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিব, ততদিন আমাদের বাণীর বীণায় প্রকৃত প্রাণ আসিবে না। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ কাহার নিকট হইতে ধার করিতে গিয়াছিলেন, কয়খানা কাব্য গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন? অথচ তাঁহাদের অনাড়ম্বর গীতি কবিতার কি অনর্গল প্রেমের প্রবাহ ও প্রাণের উচ্ছ্বাস! আজকাল সাহিত্যিক সকলেই হইতে চায়, কিন্তু সাধক হইতে চায় কয় জন? সাধক না হইলে কি সাহিত্যিক হওয়া যায়? অন্যান্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এক সুমহান সাধনার ইতিহাস। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া দাশুরায় পর্য্যন্ত সকলেই সাধক, তাই তাঁহাদের সুমধুর পদাবলী এখনও সজীব হইয়া রহিয়াছে, এখনও ভিখারীর কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহারা অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরপদলেহন করিয়া তোমরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা আজিও দেশের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। জগতের প্রত্যেক সাহিত্যই একটা জাতীয় বিশিষ্টতাকে অবলম্বন করিয়া তবে দাঁড়াইতে পারিয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান নকল সাহিত্যে সে বিশিষ্টতা এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর সাহিত্য সেই দিনই ধন্য হইবে, যেইদিন এই আত্মবিস্মৃত জাতি আত্মমর্য্যাদায় জাগিয়া উঠিবে; নচেৎ যতই আমরা টলষ্টয়, ইব্‌সেন পড়িয়া বিদ্যার পরিচয় দিই না কেন, যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আমাদিগকে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। অতএব একবার নিজের দিকে তাকাও, যদি ভবিষ্যৎ গড়িতে চাও ত অতীতকে অবহেলা করিও না, অতীতের উত্তেজনা (stimulus)

ব্যতীত আমাদিগের মত অবসন্ন প্রাচীন জাতির পুনরভ্যুদয় হইতেই পারে না। তোমরা ত সবেমাত্র সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত, বর্ব্বরজাতি নও, তোমরা অনেক দিনের মানুষ, তোমাদের উঠিতে হইলে, তোমাদের পূর্ব্ব-গৌরবকে সম্বল করিয়া উঠিতে হইবে। রুশিয়ার স্লাভ-সাহিত্যিক-গণ এই অতি-আবশ্যকীয় বিষয়টা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই আবার জাগ্রত। ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য কি? তৎ-সম্বন্ধে রুশ-সমালোচক Prince Wolkousky বলিতেছেন,—"The duty of the future is to regulate not to suppress the continuation of the world's growth, therefore future ages will work at the extension and not at the extinction of that which has been acquired by preceding ages. For the past exists as well as the future, and can not be forced into non-existence."

অতীতকে নিয়মিত করিতে হইবে, অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়া কোন জাতিই বড় হয় নাই। অতীতের সংশোধন আবশ্যক, কিন্তু অতীতের উচ্ছেদ-সাধনে যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহারা কি ভ্রান্ত? প্রকৃত কলাবিদ্ অতীতকে সংশোধন করেন, অতীতকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন, অতীতকে জাগ্রত করিয়া জাতীয় চেতনায় নব প্রেরণা আনয়ন করেন, প্রকৃত কলাবিদ্ অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তন দেখিতে পান, কারণ জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, তাহার সকলি যে পুরাতন গুণে গুণবান। আমি অতীতের পদানত হইতে বলিতেছি না, অতীতকে পদদলিত করিতেও বলিতেছি না, কেবল অতীতের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতে বলিতেছি। প্রকৃত কলাবিদ্ আমাদিগের জাতীয় জীবনে সে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

পরিশেষে নিবেদন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় গত বৈশাখ সংখ্যা 'নব্যভারতে' পুনরপি মদীয় উপনাম শিরোনাম করিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা পুরঃসর গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত মল্লিখিত 'সবিনয় নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধের কোনও কোনও কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির উপরে আমার কোনরূপ সন্দেহ প্রক্ষেপ করা অনুচিত, তাই যাহা তিনি অস্বীকার করিতেছেন, তাহা মানিয়া লইতে আমি বাধ্য। বিশেষতঃ বাস্তবিকই প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বের কথা "যতদূর স্মরণ হয়" এইটুকু উপোদ্ঘাত পূর্ব্বক যাহা লিখা হইয়াছে, তাহাতে একে আর ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই ছিল বটে। শ্রীযুক্ত শশধর বাবু যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা "লর্ড কার-

মাইকেলের প্রতিকৃতি আবরণ উন্মোচন" কালীন বক্তৃতা যে নয়, তাহা ঠিক। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে এ বিষয়ে সম্প্রতি যেটুকু তথ্যসংগ্রহ করা গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে—

"শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ গত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশন কালে সম্মিলনের কার্য্য ব্যতীত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা-সংলগ্ন কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন ও বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও তৎপত্নী মহোদয়া চিত্রাবরণ উন্মোচন করেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, চিত্রাবরণোন্মোচন কালে তিনি একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা লাট সাহেব নিকট প্রেরণ মানসে ইংরেজীতে করেন। কিন্তু দ্বারোদ্ঘাটন সম্বন্ধে বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষায়ই করেন, উহা আমাদিগের ফাইলে আছে।"

শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় "দ্বারোদ্ঘাটনের' বক্তৃতাটীই লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমার ইহাই বক্তব্য ছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উভয় ব্যাপার প্রায় একই সময়ে একই স্থানে ঘটিয়াছিল। আমি জনতা ভেদ করিয়া তখন সেই স্থলে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই, তাই ঐরূপ নাম-বিভ্রাট্ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশেষ কিছু যায় আসে না।

প্রবন্ধের শেষে শ্রীযুক্ত শশধর বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "স্যর আশুতোষের 'মাতৃভাষায় তাদৃশ দখল না থাকা' প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অতিমাত্র আগ্রহ কেন?" এযে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠান্তে সীতার পরিচয়-জিজ্ঞাসা! যাহা হউক, তিনি, তথা 'নব্যভারতের পাঠকবর্গ, এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে অবধান সহকারে নব্যভারতের, গতবর্ষের চৈত্রসংখ্যায় প্রকাশিত সবিনয় নিবেদন এবং বিগত জ্যৈষ্ঠসংখ্যার "প্রবাসী"তে লিখিত 'কষ্টিপাথরে বাজে দাগ' শার্ষক প্রবন্ধের 'আলোচনা' পাঠ করিবেন, ইহাই আমার **পরিশেষে নিবেদন।**

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

[একটা অবান্তর কথার এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করিলাম। এই আলোচনা উপলক্ষে কতিপয় পত্র-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের নিরপেক্ষতার ত্রুটি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। "কষ্টিপাথরে বাজে দাগ" নাম দিয়া এক প্রবন্ধ ছাপাইয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহু পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে আমার উপরে এবং সর্ব্বজন-বরেণ্য কোন মহাত্মার উপরে বক্রোক্তি, ও কটূক্তিও ছিল। ইহা 'প্রবাসী'র প্রবন্ধ বিশেষের প্রতিবাদ, সেই পত্রে উহা প্রকাশিত হয় কিনা, দেখিয়া অন্যান্য পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়গণ এইরূপ প্রবন্ধের প্রকাশ করিলেই বোধ হয় শোভন হইত। তাহার অপেক্ষা না করিয়াই কোন দৈনিক পত্রে এবং একখানি মাসিক পত্রিকায় উহা যথাযথ মুদ্রিত হয়, অপর একখানি মাসিক পত্রে ইহার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হয়। আর কোথাও প্রকাশিত হইয়া থাকিলে আমি তাহা বিদিত হই নাই। যাহাহউক, ঐ সকল পত্রিকায় আমি যথোচিত উত্তর প্রেরণ করি। প্রেরণের মাসাধিক কাল পরে দৈনিক পত্রে অর্দ্ধেক আন্দাজ তাহা প্রকাশিত হয়, অপরার্দ্ধ যেটুকু "ইণ্টারেষ্টিং" ছিল, তাহা ছাপা হয় নাই। অপর যে মাসিক পত্রিকায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে মদীয় উত্তর স্থান লাভই করিতে পারে নাই। অপর যে মাসিকে

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথার সার-সংক্ষেপ ছিল, তাহাতেও উত্তরের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতার জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী এই সকল কথা অবগত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। ফলতঃ সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ সাহিত্য-সেবাপরায়ণ সম্পাদক মহাশয়গণ স্বার্থের বা ব্যক্তিবিশেষের খাতিরে (?) যদি এইরূপ ব্যবহার করেন, তবে "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"]

—লেখকস্য।

——(:*:)——

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা।

কয়েক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাকার্য্যে বাঙ্গালার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইদানীং বি-এ ও আই-এ পরীক্ষার্থী প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষায় পৃথক্ ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হয়, ও তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যগ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণ্ডী'র বাহিরে থাকায়, তৎকর্তৃক ঐ দুই পরীক্ষার জন্য কিরূপ পাঠ্যগ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা জানিবার সুযোগ আমাদিগের পক্ষে সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। সম্প্রতি শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়-প্রণীত হিমালয় নামক ভ্রমণ-কাহিনীর পঞ্চম সংস্করণ হস্তগত হওয়ায় জানিতে পারিলাম যে, উহা ঐরূপ গ্রন্থের অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ "পুস্তকখানিকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রূপে গ্রহণ করায়" উহার চতুর্থ সংস্করণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থের "তৃতীয় সংস্করণের কথায়" জানিতে পারা যায়, গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে উহা "বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার প্রয়াসী" হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন উহা "ছাত্রগণের অনুপযুক্ত" বলিয়া তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই। তিন বৎসরের মধ্যেই উহা কিরূপে উপযুক্ত হইয়া ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইল, 'চতুর্থ সংস্করণের কথা"য় তাহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। যে দুর্ব্বোধ্য রহস্য-সূত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৩ সালের নিষ্ফল প্রার্থনা দশ বৎসর পরে সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়াছিল, সেন মহাশয়ের ১৩১৭ সালের নিষ্ফল প্রার্থনা ১৩২০ সালে পূর্ণ হইবার মূলেও সেইরূপ কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকা সম্ভব। যাহা হউক, পঞ্চম সংস্করণের গ্রন্থে কোন 'কথা' না থাকিলেও, কেবল এইটু বিশেষত্ব দেখা যায় যে, দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার পরিব্রাজক অবস্থার যে একখানি হাফ্‌টোন" ছবি দিয়াছিলেন, এ সংস্করণে তাহা নাই। ছাত্রগণের পাঠোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে চতুর্থ সংস্করণ হইতেই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিতে পারে; নচেৎ তৃতীয় সংস্করণের "বইখানিতে (যেমন) অনেক ভুল ছাপা হইয়াছিল", এই পঞ্চম সংস্করণের গ্রন্থেও সেইরূপ 'ভুলছাপা' বিরল নহে, আর "সাহিত্যের দরবার হইতে তিরস্কার লাভ" করিলেও, ভূমিকা-লেখক বন্ধুবরের ইঙ্গিতমত গ্রন্থের 'চল্‌তি ভাষা'র কোনরূপ সংশোধন ত আবশ্যক বোধই হয় নাই।

মাত্র পুরমহিলাগণের, এমন কি, "সংসার-প্রবিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোকের" জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইলে, আমরাও দীনেন্দ্র বাবুর ন্যায় নিঃসঙ্কোচে "বই যেমন আছে তেমনই থাকুক্" বলিতে পারিতাম, অন্ততঃ তাঁহার কথায় গ্রন্থকারের ন্যায় 'তথাস্তু' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্তৃক উহা ছাত্রগণের পাঠ্যগ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন্ অঙ্গ আলোচনা ও শিক্ষার পক্ষে উহা অনুকূল, মনে স্বতঃই এরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়।

"দেশভ্রমণ শিক্ষার একটী অঙ্গ",—বঙ্গ সাহিত্যে ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থ নিতান্তই বিরল। যে কয়খানি আছে, তন্মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি যে অতি মনোজ্ঞ, আর উহাতে অঙ্কিত "হিমালয়ের দুর্গম বক্ষঃস্থিত শত শত গিরি-শৃঙ্গের মুক্ত শোভা, সহস্র নির্ঝরের অস্ফুট কলতান, (নিভৃত নিকুঞ্জে বিকশিত) বিচিত্র পুষ্পলতা", প্রভৃতি নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রস্ফুট চিত্র যে পাঠকের মনকে ক্ষণেকের জন্য ঐশী মহিমায় তন্ময় করিয়া তুলে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। এই শিক্ষার সহায়তা সাধন পক্ষে এ গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু প্রায় তিন শত পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থের মধ্যে এরূপ চিত্র অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়াছে অবান্তর কথায়, অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গে, অবশিষ্ট ভাগ পরিপূর্ণ। মুচির মেয়ের রূপমাধুরী, বৈষ্ণবীদ্বয়ের বীভৎস বিবাদকাহিনী, উদর-পরায়ণ বৈদান্তিকের প্রতি বিদ্রূপবর্ষণ, চটির চত্বরের চাক্‌চিক্য বর্ণন, তীর্থগুরুর কার্য্যের তীব্র সমালোচনা, পুলিসপ্রহরীর কার্য্যাকুশলতায় কঠোর কটাক্ষ, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সরলতায় সন্দেহ, জ্যোতিষী মহাশয়ের জীবন্ত আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি নানাকথা "সংসার-প্রবিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোকের", বা অর্দ্ধশিক্ষিতা পুর-মহিলাগণের, উপভোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা শিক্ষানবিশ ছাত্রগণের সুকুমার মস্তিষ্ক বিচলিত করা ভিন্ন তাহাদিগের কোনরূপ কল্যাণসাধক বলিয়া বোধ হয় না। অতএব গ্রন্থকারের প্রথম প্রার্থনায়, "ইহা ছাত্রগণের পাঠের অনুপযুক্ত" বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় লইয়া বিচার করিলে, তাহাই অনেকটা সমীচীন বোধ হয়।

ছাত্রগণকে বঙ্গভাষার রচনা-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচিত পাঠ্য-গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতে পারে। রচনা-প্রণালীর প্রসঙ্গ উঠিলে গ্রন্থকারের তথা-কথিত 'চল্‌তি ভাষা'র কথা স্বতই মনে উদিত হয়। এই 'চল্‌তি ভাষা'র তাৎপর্য্য নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ বিবেচনা-সাপেক্ষ। 'চল্‌তি ভাষা' অর্থে, বোধ হয়, প্রচলিত ভাষা বুঝায় না; কেননা, বিদ্যাসাগরী ভাষাই হউক,— বা বঙ্কিমী ভাষাই হউক, কোনটাই অপ্রচলিত ভাষা নহে; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা হইতেই স্বতন্ত্র। উহা 'হুতমী' বা 'মেয়েলী' ভাষা অর্থেও, বোধ হয়, গৃহীত হয় নাই; কেননা, "জোৎস্না-পুলকিত কুসুমসুরভি-প্লাবিত রাত্রে নৈশবায়ুহিল্লোলিত লতাকুঞ্জে নায়কনায়িকার হৃদয়াবেগ" বা "দুগ্ধফেননিভ বহুদূর বিস্তৃত তুষার রাশির উপর অস্তোন্মুখ তপনের লাল রশ্মি" তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে আমরা যে ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার ও তাঁহার গৃহিণীর ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলাম, * ইহা, বোধহয়, তদুভয়ের

* নব্যভারত—পৌষ, ১৩১৫।

মিশ্রণজনিত 'খিচড়ি',— অথবা ইহাই, বোধ হয়, বিদ্যানিধি রায়মহাশয়ের অভিপ্রেত "লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" দূর করিয়া 'সামঞ্জস্য সাধনের আদর্শ, আর বিদ্যার্থীর সমক্ষে সেই আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই, বোধ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথমে উহার উপাদেয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াও, পরে এই গ্রন্থ তাহাদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

যতদূর স্মরণ হয়, বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত ভট্টাচার্যঠাকুর ও তাঁহার গৃহিণী—উভয়ের ভাষারই ক্রিয়াপদগুলি প্রায় এক। আলোচ্য গ্রন্থের ক্রিয়াপদেই যত গোল; বস্তুতঃ ক্রিয়াপদগুলিতেই গৃহিণী-সুলভ গ্রাম্য গন্ধ পাওয়া যায়,—অন্যত্র, স্থানবিশেষে 'মোদ্দাটা' 'কার্দ্দানী' প্রভৃতি আর্বী ফার্সী কথার আবির্ভাব ভিন্ন, কর্ত্তার সাধুভাষা বিরল নহে। 'চল্‌তি ভাষা'র ইহাই, বোধহয়, বিশেষত্ব। যাহা হউক, লিখিত ভাষায়, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচিত ছাত্রবৃন্দের পাঠোপাযোগী আদর্শগ্রন্থে, ক্রিয়াপদের 'চল্‌তি' ভাব ব্যবহার কল্লে একটা নিয়মের বন্ধন আবশ্যক বোধ হয়; নচেৎ উক্ত 'চল্‌তি' ভাব বঙ্গদেশের সকল জেলার ছাত্রগণের রচনা-শিক্ষোপযোগী আদর্শস্বরূপ গৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, দুঃখের বিষ, আলোচ্য গ্রন্থে সেইরূপ কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই' একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের কথাটা সুস্পষ্ট হইতে পারে।—গ্রন্থারম্ভে আমরা 'পড়েছিলুম' ক্রিয়ার প্রথম সাক্ষাৎ পাই; এইরূপ গ্রন্থের সর্ব্বত্র 'গিয়েছিলুম, 'বেড়াচ্ছিলুম,' 'এলুম, 'গেলুম' 'পাল্লুম', 'কল্লুম', 'ডাক্‌তুম', 'শুনলুম,' প্রভৃতি উমের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—এরূপ স্থল উম্-ই অবিসংবাদিত ভাবে শিষ্ট প্রয়োগ কি না? সাধুভাষায় 'পাড়য়াছিলাম,' 'গিয়াছিলাম,' 'পারিলাম,' 'শুনিলাম', 'ডাকিতাম,' আসিলাম','যাইলাম' 'করিলাম,' প্রভৃতির প্রয়োগে পূর্ব্ববঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গে, বাঁকুড়ায় বা শ্রীহট্টে, কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু অপভ্রংশে, বা তথাকথিত 'চল্‌তি ভাষার,' ভাষা'য়,' অনেককে 'প'ড়েছিলাম,' 'গিয়েছিলাম', 'ডাকতাম,' 'শুনতাম',—অন্যত্র পড়েছিনু' 'গিয়েছিনু' এনু','গেনু'—বলিতে শুনা যায়। এরূপ অবস্থায় পরাক্ষার্থী কোন ছাত্র যদি "দেরাদূনের অধিবাসী হ'য়ে পড়েছিলাম", বা অন্যজন "যে পথে যোশীমঠে গেনু"লেখে, তাহাহইলে পরীক্ষক মহাশয়ের তাহা অশুদ্ধ বলিবার অধিকার আছে কিনা?

যাহা হউক, উম-ই উহাদিগের মধ্যে প্রকৃষ্ট এবং ছাত্রগণের রচনা শিক্ষার আদর্শ স্বরূপ হইলেও, এক—

'করিতে'র পরিবর্ত্তে'কর্ত্তে' 'কোর্ত্তে',করতে',
' 'কর্‌তে', 'কোরতে';
'করিয়া'র " 'করে,' 'করে', কোরে';
'করিব'র " 'করব','কোরবো','কোর্‌বো',
'করিতেছে'র " 'কচ্ছে','কোচ্চে', 'কোরছে',
'কোর্‌ছে';—

গ্রন্থমধ্যে এইরূপ এক কথার নানারূপ দেখিয়া দেখিয়া কোন্‌টা অনুকরণীয়,—বৃদ্ধ আমরাই বুঝিয়া উঠিতে পারি না—ছাত্রগণ কিরূপে সিদ্ধান্ত করিবে? আবার 'পারিতাম' স্থলে 'পার্ত্তুম', 'পারিলাম'স্থলে 'পার্‌লুম', 'পারিলে' স্থলে 'পারলে,'—কিন্তু 'করিতাম' স্থলে 'কোর্ত্তুম,' করিলাম' স্থলে 'কল্লুম' (কোথাও বা 'কোল্লুম') ও 'করিলে' স্থলে 'কোল্লে',

প্রভৃতিতে র-য়ের লোপ-রহস্যপূর্ণ। 'কচ্ছিলো' 'দাঁড়ালো', 'উঠ্‌লো'.'ফেল্‌তো', 'হোয়েছিলো' প্রভৃতির অন্তে ও-কারের উদ্দেশ্য বুঝিনা; 'হোলা'য় ও-কার বর্ত্তমান থাকিতে হোত'য় তাহার তিরোধান ততোধিক দুর্ব্বোধ্য। 'চল্‌তি ভাষা'র চলনে এইরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও, 'বের' অনেক স্থলে 'বাহির' হইয়াছে, আর 'করিবার,' 'দেখাইবার', 'আসিবামাত্র', 'করা গিয়াছিল', 'পৌছিব.' 'উঠে নাই, প্রভৃতি স্থলে 'সাধুভাষা' অলক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে; আবার কোথাও বা 'দৌড়িতে লাগ্‌লো', 'শুনা গিয়েছিল,' এইরূপ চল্‌তি--সাধুর (?) চমৎকার সংযোগ শ্রুতিকটু হইয়াছে; পরন্তু, 'পেঁাছেবার', 'পৌছিবার', 'পৌছুবে,' এরূপ ত্রিধারাও চলিয়াছে। পুনশ্চ, 'গিয়াছিল'র রূপান্তরে 'গিয়েছিল', মানিয়া লইলে, 'দৌড়িয়াছিল' স্থলে 'দৌড়েছিল'র পরিবর্ত্তে 'দৌড়িয়েছিল,' পৌঁছিয়াছে' স্থলে "পৌঁছেছে'র পরিবর্ত্তে 'পৌঁছিয়েছে'র ব্যবহার কিছু অপরূপ; পরন্তু 'হয় নাই' স্থলে 'হয়নি' চলিত হইলে, 'দেখি নাই' স্থলে 'দেখিনে' চলে না,—নাই' স্থলে 'নি' এবং 'না' স্থলে 'নে' হওয়াই সঙ্গত বোধ হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা নামের ইংরেজি বানানে বিভ্রাট ছিল; তাহার স্বেচ্ছাকৃত কিম্বা পরম্পরাগত জের এপর্য্যন্ত চলিলেও,transliteration-প্রণালী অবলম্বন করিল আর সেরূপ বিভ্রাটে পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। সেইরূপ, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতে পৌছিবার রীতি অনুসারে শুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে 'চল্‌তি ভাষা'র ক্রিয়াপদগুলি রূপান্তরিত করিবার একটা সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম নির্দ্ধারিত না হইলে উল্লিখিত বিড়ম্বনাভোগ অপরিহার্য্য।

কিন্তু কেবল ক্রিয়াপদেই নিস্তার নাই। 'পুরী' 'তরকারী', 'তৈয়ারী' হইতে 'গাড়ী', 'দাড়ী,' 'ঘুড়ী, 'বড়ী', 'জমী','চুরী' পর্য্যন্ত,—আবার 'ঘটী' 'ত্রুটী', 'আধুলী' হইতে 'রাজী' 'গররাজী', ইংরাজী,' 'বৃক্ষরাজী' পর্য্যন্ত,—পদের অন্তেস্থিত ঈ-কার মাত্রই দীর্ঘ, কেবল বাকি' ও 'শ্রেষ্ঠি'তে হ্রস্ব। অন্তেস্থিত না হইলেও, 'নকলনবীশ'-এর ঈ-কারও, বোধ হয়, এই নিয়মের অধীন। বিসর্গের ব্যবহারেও বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়; 'নিঃশেষ' হয় বলিয়া 'নিঃশ্বাস' ফেলা চলে না, আর গুঁড়ো হোয়ে যায়' বলিয়া 'পুঁথি' 'ছুঁড়ে' ফেলা যায় না। 'নিঃশ্বাস'-এর চলনও বরং সহা যায়, কিন্তু 'জগৎ নিস্তব্ধ' হওয়ার সঙ্গে'নিসুপ্ত' হওয়া, বা'নিষ্ক্রমণ'-এর অনুকরণে'পরিক্রমণ' একেবারেই অসহ্য। আর 'আবিষ্কার' বিদ্যমান থাকায় 'পরিষ্কার' চলে কেন, তাহাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। চন্দ্রবিন্দুও নিস্তার পায় নাই। "যারা সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করে, তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টাটা উপেক্ষার বস্তু নয়" বা "ভায়া তাঁদের উপর চোটে উঠেছিলেন, কিন্তু আজ তাঁরা মনিবের হুকুম পেয়েছে",—প্রভৃতি স্থলে চন্দ্রবিন্দুর দৌরাত্ম্যটা কিছু অসহ্য নহে কি?

সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থে ছাত্রগণের পক্ষে বোধ হয়, ব্যাকরণকে একেবারে নির্ব্বাসন দেওয়া চলে না। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে 'একত্রে,' 'আয়ত্তাধীন','আয়ত্তীভূত',সান্নিধ্যে' 'সবিস্তারে', 'মধ্যেকার','পথিপ্রদর্শক,' ব্যাখ্যা প্রস্তুতের দরকার," "চিরন্তনের বাসভূমি, বিলাসক্ষেত্র বা মঙ্গলেচ্ছা","ঝঞ্ঝাটের আবশ্যক কি?", "পাণ্ডার দল পুষ্টি হোতে লাগ্‌লো", "আন্দোলন নিবৃত্তি হোয়ে গেল", "তত্ত্ব আবিষ্কার হোতে পারে", প্রভৃতি পদ কতদূর ব্যাকরণসম্মত, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-

গণের বিবেচ্য। গ্রন্থে বানানবিভ্রাটও বিরল নহে—ফার্সী 'জায়' শব্দজাত 'যায়গা'য় অন্তঃস্থ য, বিলাস-অর্থবাচক আর্বী'আয়েস' শব্দে দন্ত্য স, অধিকরণবাচক 'কোথায়' শব্দে অতিরিক্ত য়'র সংযোগ, প্রভৃতি অনেকরূপ অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল এই য়'ই অনাবশ্যক, এমন নহে,—সকর্ম্মক 'জন্মা' ধাতু হইতে 'জন্মায়' হয় বলিয়া, "তাতে মোটেই কিছু জন্মায় না" স্থলে অকর্ম্মক 'জন্ম' ধাতুজাত 'জন্মে' পদই যোগ্য—'জন্মায়' অযোগ্য। পরন্ত—

"তাতে কোরে"ই স্থলে 'কোরে',

"যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষে"র দ্বিতীয় 'মঠ'

"হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মাদি"র শেষোক্ত 'ধর্ম্ম'

এবং "আমরা যে কয়জন একসঙ্গে যাচ্ছি, এক বৈদান্তিক বাদে, তাদের আর সকলেরই শরীর অসুস্থ" স্থলে 'তাদের আর' কথা' দুইটী, নিরর্থক।

গ্রন্থমধ্যে 'বাবু-সন্ন্যাসী', 'টানা সাঁকো'. 'মধুর গমন', প্রভৃতি পদার্থের টিপ্পনী ব্যতিরেকে অর্থবোধ হওয়া দুরূহ। পরন্ত "বর্ণনা দিতে অক্ষম", "ফলপুষ্পশোভিনী বসুন্ধরা", "জল * * * গ্রামখানির প্রাণস্বরূপিণী", প্রভৃতি বর্ণনার বৈচিত্র্য বাস্তবিকই বাঙ্গালা রচনার আদর্শ!—"মঠাধ্যক্ষ মহাশয় আম্মাদের আহ্লাদের সঙ্গে তা দেখাবেন"—এস্থলে আমাদিগকে'র পরিবর্ত্তে 'আমাদের' প্রয়োগ বিদ্যানিধি মহাশয়রচিত ব্যাকরণের অনুমোদিত কি না, এবং 'সহিত'এর পরিবর্ত্তে সঙ্গে সুরুচিসঙ্গত কি না, জানি না; কিন্তু "হিন্দুধর্ম্মের এই অধোগতির পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন ভেদ কোরে তার যে পুনরুত্থান হয় * * * তা হিন্দুসমাজে এক নবপ্রাণের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ-চতুষ্টয়ই তাঁহার স্থাপিত প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র"—এই স্থলে 'তা', 'তার', তাঁহার' প্রভৃতি সর্ব্বনামের পূর্ব্বস্থিত বিশেষ্যপদ নির্ণয় করিতে এবং "ধর্ম্মের পুনরুত্থান * * প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা" হওয়ার-প্রকরণ নিরূপণ করিতে গলদঘর্ম্ম হয়।

এইরূপে, কি বিষয়ের গুরুত্ব, কি ভাবের গভীরত্ব, কি রচনাপদ্ধতি, কি ব্যাকরণের সুসঙ্গতি, বর্ণবুদ্ধি, কি মুদ্রণশুদ্ধি,—যেদিক্ দিয়াই দেখা যায়, পরীক্ষার্থীর পাঠের পক্ষে এরূপ স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ গ্রন্থ কোনক্রমেই উপযুক্ত বোধ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ একদিন সেইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও, তিন বৎসর পরে তাহাই উপযুক্ত স্থির করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা"র মর্য্যাদার মাত্রা বুঝিতে পারা যায়, এবং এইরূপ মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা কল্পে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" যথেষ্ট যত্নপরায়ণ দেখিয়া নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিতে হয়।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

মনুসংহিতায় যজ্ঞের সহজ প্রকার ও অহিংসাভাব।

"যজ্ঞ" বলিতে সকলেই মহাড়ম্বরপূর্ণ পশুবলি-প্রধান হোম কার্য্য বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞের সরল, সহজ, দয়া-বহুল রূপও আছে। আমাদের প্রধান ধর্ম্মসংহিতা মনুসংহিতায়ই যজ্ঞের সেইরূপে বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে সেই রূপ সকলকে প্রদর্শন করিবারই জন্য এখানে প্রবৃত্ত হইব।

মনুসংহিতায় কেবল এক প্রকার যজ্ঞেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে পাঁচ প্রকারের যজ্ঞেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" নামে অভিহিত। মহর্ষি মনু নিম্নলিখিতরূপে সেই পঞ্চ মহা যজ্ঞের নাম প্রদান করিয়াছেন, যথা :—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽ-
তিথিপূজনম্॥" ৭০, ৩য় অধ্যায়।

অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃ-তর্পণের নাম পিতৃ-যজ্ঞ, হোমের নাম দেব যজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ বলা যায়।"

প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে এই "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" কিরূপ অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে—মনুর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়, যথা :—

"পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
সগৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে॥ ৭১
দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানমুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥ ৭২
৩য় অধ্যায়।

"যে গৃহস্থ প্রতিদিন শক্ত্যনুসারে এই পঞ্চ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে বিরত নহেন, তিনি গৃহে থাকিয়াও পঞ্চ সূনার্ব্ব পাপে লিপ্ত হন না।"

দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, এই পাঁচকে যে ব্যক্তি অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাসপ্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে। অর্থাৎ দেবতা পিতাদিকে অবশ্য অন্ন দিতে হইবে।"

এই পঞ্চ মহা যজ্ঞের কল্পনা যে কিরূপ অহিংসা ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, মনুর নিজ উক্তি হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়, যথা—

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥ ৬৮
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চকৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥
৬৯—৩য় অধ্যায়।

"চুল্লী, পেষণী (শীল নোড়া), সম্মার্জ্জনী, উদূখল, মূষল ও জল কলস; এই পাঁচটীর নাম সূনা, ইহারা আপন আপন কার্য্যে বিনিয়োজিত হইলে, তদ্দ্বারা যে জীবহিংসা হয়, গৃহস্থ সেই পাপে লিপ্ত হয়।

উক্ত চুল্লী প্রভৃতি দ্বারা পঞ্চ প্রকারের উৎপন্ন পাপের নাশ জন্য গৃহস্থগণ প্রতিদিন যথাক্রমে পঞ্চ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।"

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সামান্য ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও ঋষিগণ কিরূপ করুণাপ্রবণ হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞাত হিংসার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহাদের অন্তঃকরণ কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণ আমরা

প্রাপ্ত হই। জৈন ও বৌদ্ধদিগের ক্ষুদ্র প্রাণী-দিগের প্রতি অহিংসার জন্য ঐকান্তিক সাবধানতা, বোধ হয়, ইহা হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র জীবের প্রতি সকরুণভাব পঞ্চ মহা যজ্ঞের মূল হইলেও, ইহাদের শেষ লক্ষ্য ক্ষুদ্র জীব হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত সমস্তেরই উপকার। মনুসংহিতায় এই সর্ব্বোপচিকীর্ষার কথা এইরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছ ঃ—

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা ॥৮০
স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈ ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥”
৮১—৩য় অধ্যায়।

“কি ঋষিগণ, কি পিতৃলোক, কি দেবগণ, কি ভূতাদি, কি অতিথি সকল, ইহাঁরা সকলেই গৃহস্থ হইতে আপন আপন প্রার্থয়িতব্য প্রার্থনা করেন, অতএব শাস্ত্রজ্ঞ গৃহস্থেরা ইহাঁদিগের উপকার করিবেন।

“ব্রহ্ম যজ্ঞ দ্বারা ঋষিদিগকে, হোম দ্বারা দেবতাদিগকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃ লোককে, অন্ন দ্বারা মনুষ্যাদিগকে এবং বলি কর্ম্ম দ্বারা ভূতদিগকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবে ॥”

নিম্নে আমরা মনু-বর্ণিত ‘ভূত বলির’ কিঞ্চিৎ বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা পাঠ করিলে এক “ভূত যজ্ঞেরই” বিশ্বোপাচিকীর্ষায় ভাব বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম হইবে ঃ—

“বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ
উৎক্ষিপেৎ।
দিবাচরেভ্যোভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এবচ ॥৯০
পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্ব্বীত বলিং সর্ব্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতো হরেৎ ॥৯০
শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ স্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্বপেদ্ভুবি ॥ ৯২
এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমুর্ত্তি পথার্জুনা ॥
৯৩—৩য় অধ্যায়।

‘গৃহের আকাশ মধ্যে সকল দেবগণকে“বিশ্বে-ভ্যোনমঃ,” দিবাচর ভূত সকলকে “দিবা-চরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ” এবং রাত্রিচর ভূত সকলকে “নক্তঞ্চারিভ্যোভূতেভ্যো নমঃ” বলিয়া বলি প্রদান করিবে।” ৯১

“দ্বিতীয় তলক গৃহের নাম পৃষ্ঠবাস্তু। তাহাতে কিম্বা বলিদানের পশ্চাদ্ভাগে সকল জীবগণকে “সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ বলিয়া বলি প্রদান করিবে। এই সকল বলি দিয়া অবশিষ্ট সমুদয় অন্ন দক্ষিণ মুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া “স্বধা পিতৃভ্যঃ” এই কথা বলিয়া বলি প্রদান করিবে ॥”৯২

“অপর অন্ন, পাত্রে উদ্ধার করিয়া, ধূলি না লাগে এমন ভাবে ভূমিতে পতিত কুকুর, কুকুরোপ-জীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমি-দিগকে প্রদান করিবে।

“যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রতিদিন এই-রূপে সকল প্রাণীকে প্রদান করেন, তিনি অতি সরল, আলোকময় পথ দ্বারা ব্রহ্মধামে গমন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়েন।” ৯৩
৺ ভরত শিরেমেণির অনুবাদ।

মনুসংহিতায় যজ্ঞ যে প্রশস্তার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ অনুধাবনার যোগ্য। যজ্ঞের সহিত সাধারণতঃ হিংসাভাবের যে যোগ দেখা যায়, যজ্ঞের মূলার্থের সহিত তাহা দেখা যায় না। যজ্ঞ শব্দ যজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যজ্ ধাতু ‘অর্চ্চনা’ ‘দান’ এই উভয়ার্থই প্রকাশ করে। আমাদের উদ্ধৃত পঞ্চ মহা যজ্ঞের বর্ণনায় মনু ‘যজ্ঞ’ এই উভয়ার্থেই বুঝাইয়াছেন। যজ্ঞের দ্বারা সামান্য জীব মাত্রের ‘অর্চ্চনার’ কথা মনু

যেভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে ‘অর্চ্চনা’ যে উপকার ও সেবা অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে যজ্ঞের প্রশস্তার্থ মুলার্থেরই অনুগত হইয়া বিশ্বের সেবাই বুঝাইতেছে।

মনুসংহিতায় দেব যজ্ঞের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতেও দেব সেবার সহিত জগতের উপকার ভাবই সংমিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

“অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥
৭৬—৩য় অধ্যায়।

“অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সম্যক্ প্রকারে সূর্য্যের পূজা করিবে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রজা জন্মে।

মনুসংহিতায় উক্ত পঞ্চ মহা যজ্ঞের ‘দেব-যজ্ঞই’ যে অহিংসামূলক ও বিশ্ব-হিতার্থক, তাহাও আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি।

আদিত্য বা সূর্য্যই দেবযজ্ঞের উপাস্য-দেবতা, তাহা মনুসংহিতার বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। সূর্য্য হইতেই বিষ্ণুর বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য দেবযজ্ঞের উপাস্য হওয়ায় বিষ্ণুকেই উপাস্য বলা যায়, কারণ বিষ্ণুকে ‘সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী” বলিয়াই ধ্যান করিতে হয়। বেদে বিষ্ণুকে যে “যজ্ঞরূপ” বলা হইয়াছে, “যজ্ঞোবৈবিষ্ণু-রিতি,” তাহা এই দেবযজ্ঞের উপাস্যরূপেই বলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুর সহিত অহিংসাভাবের সম্বন্ধ সকলেরই সুবিদিত। সুতরাং দেবযজ্ঞ যে সম্পূর্ণ অহিংসাভাবেরই যজ্ঞ, তাহা আমরা পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ বিষ্ণু জগতের হিতকারী (‘জগদ্ধিত”) বলিয়াই স্তুত হইয়া থাকেন। বিষ্ণু, যজ্ঞরূপী বলিয়া বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে তদুদ্দেশ্যক দেবযজ্ঞও জগতের হিতকরই হইতেছে।

যজ্ঞ দেবোদ্দেশ্যক হইলেও যে বিশ্বের পরম মঙ্গলই ইহার চরম ফল, গীতার নিম্নো-দ্ধৃত শ্লোকেই তাহা প্রতিপন্ন হয় যথা ;—

“দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১,
৩য় অধ্যায়।

“তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর, দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে ॥”

মহর্ষি মনু দেবযজ্ঞের সঙ্গে অপর চারিটী সাধারণ অনুষ্ঠানকেও যে “মহাযজ্ঞ” সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ অনুষ্ঠান কয়টী যে দেবযজ্ঞেরই সম্পূর্ণ সমতুল্য, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। অপর অনুষ্ঠান কয়টীতে দানই মুখ্য কার্য্যরূপে অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মযজ্ঞে ‘বিদ্যাদান,’ পিতৃযজ্ঞে ‘জলদান’ ও ‘অন্নদান’, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞে ‘অন্নদান’।

এইপ্রকারে যজ্ঞ ‘দেবপূজার’ সঙ্গে ‘দানের’ অর্থও প্রাপ্ত হইয়াছে। দান যে যজ্ঞের অন্যতম প্রধান কার্য্য, যজ্ঞের বাচক ‘সত্র’শব্দের বিবিধার্থের মধ্যে আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শনই দেখিতে পাই, যথা—

“সত্রমাস্থাদনে যজ্ঞে সদাদানে বনেঽপিচ ॥”

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ‘সত্র’ যেমন যজ্ঞ বুঝায়, তেমনই সদাদান অর্থাৎ নিয়তদানরূপ সদাব্রতও বুঝায়। এইরূপে পূজার ঘটা না করিয়া কেবল নিয়ত-দানের দ্বারাই যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তাহাই

আমরা যজ্ঞবাচক সত্রশব্দ হইতে বুঝিতে পারি।

গৃহস্থ অন্নাদি দানরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই তবে স্বয়ং ভোজন করিবেন, ইহাই মনুসংহিতার বিধান। এইপ্রকারে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগরূপ নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হন। যজ্ঞে দানের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থত্যাগের ও আত্মত্যাগের এই যে শিক্ষা হয়, তাহাতে ইহার অর্থের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য ভাষায় যজ্ঞের বাচক শব্দ sacrifice। ইহার অর্থান্তর গ্রহণের ইতিহাস যজ্ঞশব্দের অর্থান্তর গ্রহণের ইতিহাসেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ। যজ্ঞের ন্যায় ইহাতেও প্রথমে বলিরূপ হিংসাভাবেরই অন্তর্ভাব ছিল। ক্রমে হিংসার্থ পরিহার করিয়া ইহা স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের অর্থই পরিগ্রহ করিয়াছে। self-sacrifice বলিতে "আত্মোৎসর্গই" বুঝায়। এখানে আমরা যজ্ঞের দানার্থই অনুসৃত দেখিতে পাই। 'উৎসর্গ' শব্দ দানপর্য্যায়েরই অন্তর্গত, যথা—"ত্যাগো বিহাপিতং দাতমুৎষর্জ্জন বিসর্জ্জনে।" সুতরাং 'আত্মোৎসর্গ' আত্মদানই বুঝায়, অর্থাৎ পরহিতের জন্য নিজেরই জীবন বিসর্জ্জন করা বুঝায়, self-sacrificeও পরার্থে নিজেকে বলিদান করার অর্থই প্রকাশ করে।

এইরূপে মহর্ষি মনু হিংসার পরিবর্ত্তে উপচিকীর্ষার অর্থই যজ্ঞে যোজনা করিয়াছেন। যজ্ঞ, প্রাণীহিংসামূলক না হইয়া যাহাতে বিশ্বহিতানুকল্পক হয়, তাহারই সুব্যবস্থা তিনি তদীয় সংহিতায় প্রণীত করিয়াছেন। তদীয় অত্যুদার ব্যবস্থার গুণে যজ্ঞ দুঃসাধ্য অনুষ্ঠান না হইয়া সুসধ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা বাহ্যক্রিয়াবহুল বিশেষ দেবকার্য্য মাত্র না হইয়া, আন্তরিকতাপূর্ণ বিশ্বোপকারেরই সাধারণ কার্য্য হইয়াছে। ইহা ব্যক্তিগত কল্যাণের নৈমিত্তিক ক্রিয়া না হইয়া বিশ্বমঙ্গলেরই নিত্যকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতেই "যজ্ঞ" বলিতে আমাদের মনে নিঃস্বার্থপরতার একটী উদার পবিত্রভাব জাগিয়া উঠে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—(:o:)—

বেদান্ত দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরমাণুকারণবাদ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কতকগুলি দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, একটী পরমাণু, অপর একটী স্বজাতীয় পরমাণুর সহিত মিলিয়া দ্ব্যণুকের উৎপত্তি করে। এই দ্ব্যণুক আবার অন্যজাতীয় পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়, এইরূপে ক্রমে এই স্থূলজগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, এই যে একটী পরমাণু, অপর একটী স্বজাতীয় পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়, এই ক্রিয়া উৎপন্ন হইবার কোন কারণ স্থির করিতে পারা যায় না। কারণ স্থির করা সম্ভব হয় না বলিয়া, পরমাণুতে এই যে প্রথম ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। অণুর সহিত অণুর সংযোগ সম্বন্ধে এই দোষটীর আমরা বিস্তৃত

আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছি। আজ এ সম্বন্ধে আর কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিব।

নৈয়ায়িকেরা কার্য্যকে উহার কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগবশতঃ; দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইল। ন্যায়-মতে, এই দ্ব্যণুক দ্রব্যটী, উহার কারণ—পরমাণু দ্রব্য হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্য। উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া, উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। নৈয়ায়িকেরা উভয়ের সম্বন্ধের জন্য, "সমবায়" নামে একটা সম্বন্ধের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সমবায় নামক সম্বন্ধই, কার্য্যকে কারণের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, পরমাণুবাদ গ্রহণ করিতে পারা অসম্ভব হইয়া উঠে। অত্যন্ত ভিন্ন দুই দ্রব্যের মধ্যে এই প্রকারে সমবায় সম্বন্ধ কল্পনা করিলে, কোথায় যাইয়া যে সম্বন্ধের বিভ্রান্তি ঘটিবে, তাহার আর শেষ বা ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। একটার সহিত অন্যটা সম্বন্ধের আর শেষ হইয়া উঠিবে না। এই এক মহৎ দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি। পরমাণুদ্বয় দ্ব্যণুকের 'কারণ', আর দ্ব্যণুক উহার 'কার্য্য'। কার্য্য ও কারণ—উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্য। উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। দ্ব্যণুক, উহার কারণের সঙ্গে 'সমবায়' সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে,—এই যে সমবায় সম্বন্ধের কথা বলিতেছ, এই সমবায়টাও ত, উহা যাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, তাহা হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তু। যদি স্বতন্ত্র বস্তুই হইল, তাহা হইলে উহাকেই বা কে আবার সেই সম্বন্ধিবস্তুটীর সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দিবে? ইহাকে সম্বদ্ধ করিয়া দিবার জন্য, আর একটী নূতন সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হইবে। আবার এই নূতন কল্পিত সম্বন্ধটীও ত, সমবায় হইতে নিতান্ত ভিন্ন বস্তু। সুতরাং, ইহারও সমবায়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য, আবার আর একটী নূতন সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হইবে। এই প্রকারে অনন্ত সম্বন্ধের কল্পনা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে! ইহাকে 'অনবস্থা' দোষ (regressus in finitum বলে। সুতরাং, সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, কারণ হইতে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি সম্ভব হয় না। সুতরাং পরমাণু হইতেও দ্ব্যণুকের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া উঠে!

এস্থলে অপর একটী দোষের উল্লেখ করিয়া, আমরা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তির কথাটা শেষ করিব।

পরমাণুতে এই যে প্রথম ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল, আমরা জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়া বা গতিশীলতাই কি পরমাণুর স্বভাব? অথবা পরমাণুগুলি অক্রিয়? অথবা, পরমাণুগুলি কি সক্রিয় ও অক্রিয়, উভয়ই? অথবা কি উহারা ক্রিয়াশীলও নহে, অক্রিয়ও নহে? প্রকৃতপক্ষে, পরমাণুগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহাদের প্রকৃতি বা স্বভাব কি প্রকার? যদি ক্রিয়াশীলতাই ইহাদের স্বভাব হয়, তাহা হইলে ক্রিয়া যখন নিত্যই বর্ত্তমান, তখন প্রলয় অসম্ভব হইয়া উঠে। একটীর সহিত অপরটীর মিলন বা সংযোগ হওয়াই যখন ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বা স্বরূপ, তখন এ স্বভাবের ত বিপর্য্যয় হইতে পারিবে না। তবে আর মিলনক্রিয়ার ধ্বংস হইয়া, জগতের প্রলয় হইবে কি প্রকারে? আর যদি ইহারা নিজে অক্রিয় হয়, তাহা হইলে, সৃষ্টি অসম্ভব

হইয়া পড়ে। আর যদি ক্রিয়া ও অক্রিয়া, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি,এই দুইটীই না স্বীকার যায়. তাহাতেও দোষ উপস্থিত হইবে। ক্রিয়া-শীলতাই বল, আর ক্রিয়ার নিবৃত্তিই বল, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই, 'কারণ' নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। বিনা কারণে, কার্য্যের উৎপত্তি বা বিনাশ কল্পনা করা যায় না। অদৃষ্ট প্রভৃতিকে যদি পরমাণুগত ক্রিয়ার কারণ বলা যায়, তাহা হইলে অদৃষ্টাদি ত নিত্যই পরমাণুর নিকটে বর্ত্তমান, তবে নিয়তই ক্রিয়া হইতে থাকিবে, ইহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। আর যদি বল যে, অদৃষ্টাদির আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে বিনা কারণে কখনই পরমাণুতে আদিম ক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে না; সুতরাং পরমাণুতে ক্রিয়াও উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, কোন প্রকারেই এই পরমাণুবাদ সঙ্গত হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষাও পরমাণুবাদে গুরুতর দোষ আছে। সেই সকল দোষের কথা আগামীবারে বলিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

(:০:)

স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী। (৪)

রামদাস সেন।—আমি যখন বহরমপুরে ছিলাম, তখন রামদাস বাবুর সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা হয়। রামদাস বাবুর প্রকাণ্ড মূল্যবান্ লাইব্রেরী ছিল—সেখানে আমার অবাধ গতি ছিল। 'মানবগণ প্রকৃতি' রচনা কালে আমি তাঁহার লাইব্রেরীর নানা বহি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়া-ছিলাম। সেই সময়, একবার বৈষ্ণব-গণের গলায় তুলসী মালা ধারণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সহিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণির তর্ক হইয়াছিল শিরোমণি মালা ধারণের পক্ষে ছিলেন না এবং বৈষ্ণবগণকে তাঁহার কথামত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তর্ক হইতে ক্রমে প্রকাশ্য সভা হয়। রাম-দাস বাবু বিদ্যারত্নের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যদিও অন্য সময় ডাক্তার তুলসীর মালা ধারণ করিতেন না, সেদিন একটী মালা গলায় দিয়া সভায় গিয়া বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া বৈষ্ণবের তুলসীর মালা ধারণ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

তারকনাথ বাচস্পতি।—তারকনাথ সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সম্পূর্ণ একেলা "শব্দস্তোমকল্পদ্রুমঃ" নামে একখানি সংস্কৃত কোষ প্রনয়ন করেন। তৎপরে 'বাচস্পতি' নামে এক পুস্তক লিখেন। তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সে ঐ পুস্তক প্রকাশ করেন। অনুমান হয়, তিনি ২০ বৎসর বয়স হইতে ঐ পুস্তক-খানি লিখিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত মহাশয় বড় সরল প্রকৃতির ছিলেন। তাহার দু একটী উদাহরণ দিই। এক সময় কলি-কাতায় উত্তরাধিকারী সম্পর্ক লইয়া একটী মকদ্দমা হয়। তাহাতে এক পক্ষে প্রসিদ্ধ

উড্রো সাহেব ছিলেন। সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বীয় মত বলিতে বলা হয়। তিনি নিজের মত ব্যক্ত করার পর উড্রো সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই মতের ground কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ রসি-কতার সহিত বলিলেন "ইহার ground আমি জানি না—তবে তারা খুড়া বলিতে পারেন।" তখন বাচস্পতি মহাশয়কে আহ্বান করা হয়। তিনিও একই মত দেন। তখন উড্রো সাহেব আবার ground কি, জানিতে চাহেন। আর যায় কোথায়! বাচস্পতি মহাশয় সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বেটা গোখাদক! তোকে আমি আমার মতের ground বলিব? তারকনাথ বাচস্পতির মতের ground বলিব? বলিব না!!" এই বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি উঠিয়া গেলেন!! বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহকে আক্রমণ করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বহু বিবাহের সপক্ষে লিখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উত্তর দিয়া নাম গোপন করিয়া লিখেন, 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য'। বিদ্যাসাগর বাচস্পতিকে খুড়া বলিতেন। সরল তারকনাথ ঠাট্টা না বুঝিয়া উহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। আমরা সকলে হাসিয়া অস্থির, কিন্তু কিছুতেই তিনি ঠাট্টা বুঝিলেন না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।—বঙ্কিম, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীন প্রভৃতি এক সময় সাহিত্যাকাশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। একে একে তাঁহারা সকলেই গিয়াছেন। বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র ঐ মণ্ডলীর শেষ চিহ্ন। অক্ষয় বাবু সর্ব্ব প্রথম তাঁহার 'সাধরণী'তে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকগণকে মুগ্ধ করেন। 'বঙ্গদর্শনে'ও তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সাবিত্রী লাই-ব্রেরীতে যেদিন অক্ষয়চন্দ্র বিধবা বিবাহের বিপক্ষে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দেন—সে দিনের চিত্র এখনও আমার চক্ষে ভাসিতেছে। বৃদ্ধ ও পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। বঙ্গদর্শনের তিরোধানের পর বঙ্কিমের 'প্রচার' বাহির হয়—সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার 'নবজীবন' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। যখন লর্ড ডাফ্‌রিণ, উমেশ-চন্দ্র বোনার্জ্জি ও আনন্দমোহন বসুকে গালাগালি দেন, তখম কাগজে বৃন্দা-কৃষ্ণ-সংবাদ নামে যে বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার লেখক অক্ষয়চন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্র বর্ত্তমান যুগের নহেন। তিনি যে ভাষা, যে style ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাহা বদলাইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার 'সনাতনী' একখানি উপহার পাইয়াছিলাম। পড়িয়া দেখিলাম, অক্ষয়চন্দ্র ধূতী, মোগলাই আচ্‌কান ও সোলার টুপী পরিয়া আসরে নামিয়াছেন!! অক্ষয়চন্দ্রকে Young Bengal আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। সেদিন রংপুর সাহিত্য-পরিষদের রিপোর্ট পড়িয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আজকাল লেখে সবাই—ভাষা-জ্ঞান থাকুক, আর না থাকুক। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্ অক্ষয়চন্দ্রকে শীঘ্র মরিতে আদেশ দিয়া লিখিয়াছেন "প্রাচীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক্ষণে কেবল অক্ষয়-কুমার সরকার মহাশয়ই অবশিষ্ট রহিলেন। বঙ্গের ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্য।" তিনি অক্ষয়কুমার কি অক্ষয়চন্দ্র, সে হিসাবও এই সকল লোকে রাখে না!! ইহাঁরাই পরিষদ্ করেন!!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের Metropolitan কলেজে যাদব বোস নামে এক অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ও আমার বাড়ী খুব কাছাকাছি ছিল। সেখানে বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট আসিয়া আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীটে পড়িয়াছে, সেই মোড়ে আমার বাড়ী ছিল। একদিন এক ভদ্র সন্তান, ১৭।১৮ বৎসর হইবে, যাদবের বাড়ীতে ঢুকিয়া একটী জুতা চুরি করে। পলাইবার সময় ধরা পড়ে, তখন যাদব আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়া দেখিলাম, পাড়ার ১৫।১৬জন ভদ্রলোক জুটিয়াছেন। ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, বাঁকুড়ার জমিদার "পঞ্জি" বংশের ছেলে সে, হঠাৎ বলিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে খুব চেনেন।" আমরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "কি রায়চৌধুরী, কি মনে করে এত দলবল নিয়ে?" আমরা তাঁহাকে সব কথা বলিলাম। তিনি ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, আমায় তুমি চেন?" সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "হ্যাঁ, আপনি বাঁকুড়ায় আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "হবে, মনে পড়্‌ছে না।" তারপর বলিলেন, "বাবা, তুমি কিছু খাবে?" সে বলিল, "হ্যাঁ, একটু তামাক খাব।" বিদ্যাসাগর তখন নিজের হাতে তাহাকে তামাক সাজিয়া দিলেন! আমরা ত সকলে অবাক্‌। ছেলেটা বেশ তামাক খাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর বলিলেন, "একে ছেড়ে দাও, তোমাদের জুতোতো পেয়েছ।" আমরা বাড়ী চলিয়া আসিলাম। তিনি কিছু উপদেশ দিয়া ছেলেটীকে বিদায় দিলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।—এই পুরুষসিংহের সৌম্য চেহারা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। ভূদেব বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ অনেক দিনের। আমি যখন পুরীতে, তখন তিনি পুরীতে স্কুল দেখিতে আসেন। এই সময় একজায়গায় একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়, ভূদেববাবু ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে পীড়াপীড়ি করেন, আমি কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "যে যাই বলুক্‌, আমি বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মণের এমন একটী inborn genius থাকে, যেটা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছিল এইজন্য। অধ্যাপনা কার্য্যে, আমার বিশ্বাস, অপর কেহ ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। exception অবশ্য আছে, যার যে কাজ, তাকে সেই কাজ দেওয়া উচিত।" এ কথার সারবত্তা অনেকেই স্বীকার করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।—ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের নাম অমর থাকিবে। তাঁহার Antiquities of Orissa গভীরগবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল। কিন্তু এমন বইয়ের এদেশে আদর হইল না! সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র নয়খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল! কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। আমি তখন পুরীতে। রাজেন্দ্রলালের অনুরোধে আমি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়া অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করি। রাজেন্দ্রলাল আমার সাহায্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমনই তাঁহার সরলতা, এমনই তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য। কৃষ্ণদাস পাল রাজনীতিতে রাজেন্দ্রলালের শিষ্য। যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া-সভা বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে, রাজেন্দ্রলাল তাহার প্রাণ ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ভয়ানক দর্পী ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার দর্পিত চেহারা

দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইত। অথচ তিনি বড় রহস্যপ্রিয় ছিলেন। কথায়বার্ত্তায় রস উছলিয়া উঠিত, তবে তাঁহার রহস্যে একটু অশ্লীলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পুরাতন বন্ধু ছিলেন, কিন্তু তিনিও রাজেন্দ্রলালের তীব্রবাক্য হইতে নিস্তার পান নাই। একবার ২৪ পরগণার ব্রডিন সাহেব সংস্কৃত বাঙ্গালা অক্ষর উঠাইয়া দিয়া ইংরাজী অক্ষরে সব বই ছাপাইবার আন্দোলন তুলেন—ন্যায়রত্ন তাহার সমর্থন করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে উপহাস করিয়া রাজেন্দ্রলাল হিন্দুপেট্রিয়টে প্রবন্ধ লিখেন। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও আমি একদিন রাজেন্দ্রলালের ওখানে বসিয়া আছি। রাজেন্দ্রলাল প্রুফসিট খুলিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পঠন-কৌশল, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও তীব্ররসাত্মক টীকা টিপ্পনী আমাদের বেদম হাসাইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালের অনুরোধে আমি মন্দিরে গিয়া সুভদ্রাদেবীর হস্ত দেখিয়া আসি। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, সুভদ্রাদেবীর হাত নাই, অথচ নীলাদ্রিমহোদয়ে সুভদ্রার হস্ত পরিমাণ উল্লিখিত আছে। ইহা দেখিবার জন্য আমি মন্দিরে যাই ও পাণ্ডাদের অর্থ দিয়া হাত দেখিয়া আসি। রাজেন্দ্রলালের অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহাতে যেমন দর্প দেখিয়াছি, তেমনই বিনয় দেখিয়াছি। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর শোক-সভা অনেক হইয়াছিল, রাজা মহারাজা রায় বাহাদুরদের কলরবে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তার পরেই সব নীরব, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ বঙ্গদেশ কি করিয়াছেন? এমন লোকের জীবনীও কেহ লেখা দরকার মনে করেন না!! আমি রাজেন্দ্রলালকে, Indo Aryans ছাপাইতে বলি, তিনি তাহাতে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'এ বইএর আদর হইবে কি?'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—রবীন্দ্রবাবুতে প্রথম থেকে আমরা একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছি। বাল্যে তিনি বঙ্কিম, মাইকেলকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি রবিবাবুর রচনা সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ 'নব্য-ভারতে' প্রকাশ করিয়াছিলাম। রবিবাবুর একটী প্রসিদ্ধ গানের গোড়ায় আছে, 'ওগো ভুবন-মনোমোহিনী মা'। মাকে সন্তানে 'ভুবন-মোহনী' বলিতে পারে? মাকে সকলের মোহিনী বলিয়া বর্ণনা করা গর্হিত কিনা, অন্যে বিচার করিবেন। তিনি মায়ের বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন, 'মা তুমি উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াও, আমরা তোমার রূপসৌন্দর্য্য দর্শন করি।' মাকে কোন ছেলে এমন অবস্থায় কল্পনা করিয়া কবিতা লিখিতে পারে, জানিতাম না। রবিবাবুর আর একটী গান 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রোজ কেন পাই না।' এইটী আজকাল ধর্ম্মসঙ্গীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে গীত হয়। একবার চুঁচুড়ায় দেখি, একজন প্রচারক ভাবের আবেশে গদ্‌গদ্‌ হইয়া এই গানই গাহিতেছেন, আমরা তখন উঠিয়া আসি। এই গান যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছিল, তাঁহাকে পর্য্যন্ত আমরা বিশেষভাবে জানি। এই সব নিকৃষ্ট গান কি করিয়া আজকাল যে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বলিতে পারি না। এ বিষয় আলোচনা করিয়া ষোড়শ খণ্ড 'নব্য-ভারতে' একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, 'সমাজ বিয়ে জরজর, ব্যভিচারে। flirtation কি ব্যভিচার নহে?

কোন মহিলাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলে, তিনি গান ধরেন,—

"এস মোর পরাণ পিয়া
চরণ তলে বিকাইব
যৌবন দিব নিছিয়া,
বিধাতার বুদ্ধিদোষে
পড়েছি এই বিষম ফাঁসে
তোমার পাশে বসে বঁধু
জুড়াব তাপিত হিয়া।"

রবিবাবুর গান এ সমাজে বড় মিষ্ট লাগে। কুমারী যুবতী পুরুষদলে স্বর ভাঁজিয়া গলা কাঁপাইয়া হাবে ভাবে মিলাইয়া গাহিতেছেন।

তুমি যেওনা এখনি
এখনও আছে রজনী।

কি ঘৃণাকর দৃশ্য! দরিদ্র চাষার সমাজ এই শিক্ষিত সমাজকে পদাঘাত করে।"

রবিবাবুর সহিত বাঁহু শব্দ হইতে বঁধুর উৎপত্তি কিনা—এ বিষয়ে আমার দীর্ঘ বাদানুবাদ 'সাধনা'য় চলিয়াছিল। তার অনেকদিন পর 'মৃণ্ময়ী'তে কথাটীকে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য আমি আমার বক্তব্য লিখি—রবিবাবু আর তাহার উপর জবাবদেন নাই।

শিশিরকুমার ঘোষ।—একদিন, সে অনেক দিনের কথা, দেওঘরের মাঠে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা অনেকে বেড়াইতেছিলাম, মুন্সেফ, উকিল, ডেপুটি, মোক্তার, শিক্ষক, অনেকেই। পূজ্যপাদ শিশিরকুমারও সেস্থলে ছিলেন। শিশিরবাবুর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। তথাপি তখনও তিনি আমার কাছে প্রহেলিকা মাত্র। ক্ষুরধার-বুদ্ধি, তাই অজেয়, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গের প্রকাশানন্দ স্বামী, ষাটি সহস্র শিষ্য, পরিবেষ্টিত, ভাব কালী যেন তাঁহার অযোগ্য ও ঘৃণিত। সময়ান্তরে সেই শিশিরকুমারকে দাঁতে কুটী লইয়া দৈন্য করিতে দেখিয়াছি। একটী পদ ধরিয়া—

কি কহবরে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

সারাটী রাত কাটাইতে দেখিয়াছি। পুলক, কম্প, স্বেদ ও মূর্চ্ছা—আতঙ্কে কাঁপাইয়াছে, ত্রাসে শুকাইয়াছে। বাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশা কিছুতেই তখনও মিল খাওয়াইতে পারিতেছিলাম না।

অনেকদিন পরে এই দেখা। দেখিবা মাত্র দাদা কাছে আসিয়া বলিলেন "তোর পায়ের ধুলা আমায় দে"। শুনিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। যাঁহাকে চিরদিন 'শ্রীচরণেষু' বলিয়া লিখিয়াছি, দেখিলেই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়াছি, তাঁর আজ এই কথা। অবাক্ হইয়া চম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দাদা বলিলেন, "দৌড়িতে পার্‌বি?" আমি বুঝিলাম না—একি খেলা। বলিলাম "হাঁ"। তখন তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন—বুড়ার দৌড় দেখে কে, আমিও হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িলাম। যাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, তাঁহারা চাহিয়া রহিলেন। দাদার খেয়াল তাঁহাদের জানা ছিল। তাঁহার পোষাক অদ্ভুত—ধুতির উপর কাল কোট, কমফরটার কোমরে জড়ান, মাথায় সাহেবী হ্যাট। এ পোষাকে দাদা আমার কখন অশ্ব-পৃষ্ঠে, কখন পাদচারণে, সকালে ভ্রমণ করিতেন।

রাজনারায়ণ বাবুর বাড়ীর কাছ থেকে দৌড়িতে দৌড়িতে একেবারে নদীর ধারে দুই জনে। হাঁপানি একটু থামিলে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগন্নাথবল্লভ নাটকের নান্দীমুখে রায় রামানন্দ কেন বলিলেন,

যাঁহার শিখীপুচ্ছ নৃত্য করে, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন। তাঁহার শক্তি, তাঁহার বিভব, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার দাতৃত্ব ও বিচার, চিরদিন নাটককারেরা নান্দীমুখে উল্লেখ করেন। শ্রোতা ও পাঠক ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় স্তব্ধ হয়, তাহাই সহজে অনুভবনীয়। রামানন্দের এ নূতনত্ব কেন?

রামানন্দ ও জগন্নাথবল্লভের নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দ মহা প্রভুর বড় আদরের জিনিষ ছিল, জানিতাম, কিন্তু জগন্নাথবল্লভ পড়ি নাই, পড়িলেও যে দাদার ব্যাসকূটের সমাধান করিতে পারিতাম, সে সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং দাদার প্রশ্নের উত্তর দাদাকেই দিতে হইল। গঙ্গাপূজা গঙ্গার জলেই সমাহিত হয়।

বৌদ্ধগণ জ্ঞান-মার্গে নির্ব্বাণ লাভের প্রয়াস করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-পন্থা বড় নীরস, কর্কশ ও কঠোর। কমনীয় বৃত্তির উৎকর্ষ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। মৈত্রী ও ক্ষমা পরিত্যক্ত না হইলেও প্রবৃত্তি বলিয়া এ দুটীও নিবৃত্তিপরায়ণ শ্রমণেরা কখন আদরে পোষণ করিতেন না, শুষ্ক কঠোর জ্ঞানে কোমলপ্রবৃত্তি ভারতবাসীর প্রাণ শুকাইয়া উঠিল। অজ্ঞানী অশিক্ষিত গৃহস্থ উপাসকেরা ক্রমেই বিচলিত হইলেন। শেষে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। উপেক্ষিত ও নির্ব্বাসিত প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে নষ্টরাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ক্রমে শিবশান্ত যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবে পরিণত হইলেন। তখনও তাঁহার প্রকৃতির অভাব ছিল। পুরুষ আকার প্রকার বিশিষ্ট শিব শান্ত নির্লিপ্ত যোগ-পরায়ণ মহাপুরুষে পরিণত হইলেও, কিন্তু তখনও নীলকণ্ঠের কলঙ্ক রেখার লাঞ্ছনা ব্যাবৃত্ত হয় নাই। প্রবৃত্তি না হইলে পুরুষ কর্ম্ম-রহিত। কর্ম্ম প্রকৃতিগত, কর্ম্ম না হইলে সংসার চলে না। যাঁহারা কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটাইয়া কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ম্মের অবশ্য সম্ভাবনা প্রচার করিয়া 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং'—সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎকর্ম্মের নিরসন সাব্যস্ত করিলেন। প্রজ্ঞালাভ করিয়া বুদ্ধ নির্ব্বাণ আহরণ করিয়াছিলেন। সহজে মহাপুরুষ বুদ্ধের পার্শ্বে নারীরূপিণী প্রজ্ঞা আসন লাভ করিলেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর মানিতেন না, আত্মা মানিতেন না, কোন কিছুর সত্ত্বা মানিতেন না—সকলই শূন্য, ভ্রম ও অচির। সেই বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষে প্রথম চৈত্য ও মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই মন্দিরে মৃণ্ময়ী, দয়াময়ী বা পাষাণময়ী প্রতিমা স্থাপন করিয়া যুক্ত করে অবনতমস্তকে মৃণ্ময়ীর বন্দনা করিলেন, ভারতমন্দিরে সর্ব্বপ্রথম প্রতিমা বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা, পরে হর ও পার্ব্বতী।

হরপার্ব্বতী হইতে রাধাকৃষ্ণ অনেক দূর, দ্বিতীয়টীতে প্রথম স্থান রাধার, প্রথমে দ্বিতীয় স্থান পার্ব্বতীর। শিব, গাণপত্য ও সৌরমণ্ডলের কমনীয় প্রবৃত্তির উৎকর্ষসাধনা সাধিত হইলেও সে হৃদয় পর্য্যন্ত। দাস্যভক্তি তাহার চরমা। বৈষ্ণবদিগের মধুর রস অমানুষী আবিষ্কার। সে মধুর রসের আধার মস্তিষ্ক। অন্তর্দ্দশা—প্রমাদ ও দিব্যোন্মাদ, মূর্চ্ছা ও তন্ময়তা, মস্তিষ্কসঞ্জাত। 'সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে' ও বাহ্য অন্তর্দ্দশা, নতুবা 'বুঝি' হইত না। "বস মাঝে, কি মন মাঝে" তখনও সংজ্ঞা হারায় নাই। বিরহিণী রাধিকার পূর্ণ অন্তর্দ্দশাতেই 'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।' মধুর রস মস্তিষ্কে। সেই রসের হিল্লোলে শিখীপুচ্ছ লহরে লহরে নৃত্য

করে। মধুর রসের সঙ্গে কোন ঐশ্বর্য্যের তুলনা হয় না। রসিক রূপ চাহে না, ধন বিভব শক্তি কৌশল উপেক্ষা করে—চাহে কেবল মধুরে মধুরে—অমিয়রস। তাই রসিকশেখর রামানন্দ রসময়ের মধুরতারই উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রিয়ছাত্র বরিশালের ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনের হেড্ মাষ্টার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বর্গীয় গুরুদেব একপ্রকার আমাকে পথে কুড়াইয়া পান এবং মানুষ করেন। সে তিনজন মহাপুরুষের শিক্ষা ও উপদেশে আমার কিঞ্চিৎমাত্র মনুষ্যত্বলাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইনি একজন। যেদিন যশোহর জেলা-স্কুলের পুস্তকাগারে এই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষকে প্রধান-শিক্ষকস্বরূপ প্রথম দর্শন করি, সেই মুহূর্ত্তেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। আমার ন্যায় তখনকার প্রথমশ্রেণীর অনেক ছাত্রই থিয়েটারে বেড়াইতেন, তামাক খাইতেন ও আসন্ন পরীক্ষা ভুলিয়া নানা গর্হিত আমোদ প্রমোদে কলঙ্ক অর্জ্জন করিতেন। তিনি আমাদিগের নৈতিক দুরবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে একেবারে স্নেহের জালে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তিনি স্কুল-বাড়ীর প্রাঙ্গণে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যশোহর স্কুলে এইরূপে ছাত্রাবাসের সূত্রপাত তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন। তিনি কখনই আমাদিগকে বেত্রাঘাত করেন নাই, কখনও একটীবার বড় বাক্য বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার সুমিষ্ট ভর্ৎসনা যে শুনিত, তাহারই প্রাণ তখনি তাঁহার চরণে আনত হইয়া পড়িত। হয়ত যৌবন-সুলভ চপলতাবশতঃ বৃথা সময় কাটাইতেছি, অমনি পিছনে চাহিয়া দেখি, প্রধান শিক্ষক মহাশয় ধীর গম্ভীরভাবে পাদচারণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন 'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্'; বুঝিতে বাকী থাকিত না যে, আমাদিগকেই উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কথাগুলি শুনাইতেছেন। আহা, কি সুন্দর শাসন-প্রণালী!

সে সময় ছাত্রমণ্ডলীতে অনেকে ব্রাহ্মদিগের নিন্দা করিতেন, আমিও তাঁহাদের মুখে শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মদিগকে কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ মনে করিতে শিখিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম, আমাদের প্রধান শিক্ষক ব্রাহ্ম, তখন অবাক্ হইয়া ভাবিতাম, যদি এইরূপ পূতচরিত্র ও সহৃদয়তা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের ফল হয়, তবে সে ধর্ম্ম ত সকলেরই নমস্য। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতেই শুনিতাম, শিক্ষক মহাশয়ের গৃহ হইতে ভগবানের গুণগান ও স্তোত্র ধ্বনিত হইতেছে। সেই ধ্বনি সহিত প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সমস্ত দিন একটী সুন্দর ভাবে কাটিয়া যাইত। তাঁহার বিশাল হৃদয়ে একটুকু স্থান পাইয়া আমি আহ্লাদে মাতিয়া উঠিতাম। উত্তরকালে যখন তিনি কলেজের অধ্যাপক ও ক্রমে ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হন, তখন আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া আমার সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিত। তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা পাইত, সেই ছাত্রদিগের মুখে শুনিতাম, আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ভাবিতাম, যদি সত্যই তাঁহার মনের মত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝি তাঁহার প্রতি আমার সমুচিত গুরুদক্ষিণা দান করা হইত। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী অভিনব ছিল

যাহাতে বিষয়টীর মধ্যে শিক্ষার্থীর প্রাণ নিবিষ্ট হইয়া যায়, ইহা স্মরণ রাখিয়া কত নূতন নূতন কথা প্রসঙ্গ ক্রমে জানাইয়া দিতেন ও কত নূতন ভাব প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ, প্রাচীন মহাজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য যত্ন লইতেন। মাত্র এক বৎসর কাল তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেই এক বৎসরের মধ্যে আমার জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শে অনেক পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার ঋণ আমার অপরিশোধ্য। ক্রমে তাঁহার সংস্রব হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু জানিতাম, তাঁহার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার "মৃণ্ময়ী"তে প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বভাবসুলভ অলসতা ও অক্ষমতাবশতঃ আমি তখন তাঁহার সে আদেশ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া, এখন অনুতপ্ত আছি।"

তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন—"ছাত্র হিসাবে ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার নিকট যাহা পাইয়াছি, তাহা অমূল্য, সে ঋণ শোধ দিবার নহে। কৃতজ্ঞতার দ্বারা, শুনিয়াছি, উপকারের ভার লাঘব করা যায়, কিন্তু তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, এমন ভাষা আমার নাই। তবে আজ অনেক দিন পরে, তাঁহার কথা তাঁহারই পুত্রের কাছে লিখিতে বড় আনন্দ হইতেছে। তিনি আজ স্বর্গে, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম করিতেছি. তিনি বড় ভালবাসিতেন, আজও তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৯০৩ খ্রীঃ আমি প্রথম তাঁহাকে দেখি। ইহার পূর্ব্বে শুধু নাম শুনিয়াছিলাম, তাঁহার রচিত পুস্তক পাঠ্যবই রূপে পাইয়াছিলাম, তখন জানিতাম না কলেজে তাঁহাকেই অধ্যক্ষ রূপে পাইব। প্রথম হইতেই তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায়ে পড়াইতেন। সে প্রণালী এমন সুন্দর যে আজও, এই ১৪ বৎসর পরে তাঁহার নিকট পঠিত পুস্তকগুলি খুলিলে, ছত্রে ছত্রে তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশল মনে পড়ে। এখন ছাত্রদিগকে পড়াইতে হয়—যখনই তাঁহার পদ্ধতি অবলম্বন করি, তখনই যশঃ লাভ করি—যখনই উহা ভুলিয়া নিজের উপায় অবলম্বন করি, তখনই ছাত্রদিগের তেমন মনযোগ পাই না। তাঁহার বহুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল, জীবনের অনেক অবস্থার অভিজ্ঞতা ছিল, অনেক বিষয়ে তিনি মৌলিক চিন্তা করিতেন, যখনই কোন কঠিন অংশ পড়াইতে হইত, তখন এমন সুন্দর গল্পের অবতারণা করিতেন এবং তাহা কখনও হাস্যরসে, কখনও করুণরসে এমন সিঞ্চিত করিয়া দিতেন যে, যখন গল্প শেষ হইত, তখন পাঠ্যপুস্তকের জটিল অংশ ত সরল হইতই, উপরন্তু হৃদয় মনের বৃত্তিগুলিও উত্তেজনা লাভ করিত। জীবনে অনেক বড় বড় অধ্যাপকের কাছে পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহার কাছে পড়িয়া যে সুখ পাইয়াছি, যে আনন্দ পাইয়াছি, তেমনটী আর কখনও পাই নাই। চট্টগ্রাম হইতে আমরা কয়জন প্রেসিডেন্সীতে পড়িতে যাই, সেখানে আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার অধ্যাপনা বিশেষের গর্ব্ব

করিতাম। কেমন মিষ্ট তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল—কেমন করিয়া সেই সোণার চশ্মা আস্তে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিতেন, "আচ্ছা, একটী গল্প বলি।' টেনিসন পড়াইতে পড়াইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে এমন মধুর আবৃত্তি করিতেন যে, আজও তাঁহার কণ্ঠস্বর কাণে বাজিতেছে। কিন্তু বাহিরের অনেক কথা বলিতেন বলিয়া তাঁর কাজ ঢলা ছিল না। এখন আমরা বই পড়াইয়া প্রায়ই শেষ করিতে পারি না, কিন্তু তিনি কি করিয়া তাঁহার সকল বইগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া দিতেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার অধ্যাপনার ফলে আমাদের একজন সমপাঠী বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কখনও দুর্বিনয়নের প্রশ্রয় দিতেন না—সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, তাই কলেজের কোন কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না।

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার কবি-প্রবৃত্তি বড় আরাম লাভ করিয়াছিল। একটী নির্জ্জন পাহাড়ের উপর অনেকদিন তিনি একেলা ছিলেন। সেই খানে অনন্ত আকাশের নীচে সেই মানোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের বেষ্টনে, তিনি তাঁহার অনেক কবিত্বপূর্ণ সাহিত্যিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—মধ্যে মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'নব্যভারতে' কিছু কিছু প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার চরিত্রে প্রাচীনের প্রতি একটী বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগের আদর্শ যেখানে পাইতেন, সেইখানে ছুটিয়া যাইতেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না—তাঁহার গোঁড়ামি ছিল না, তাঁহার ধর্ম্মমত বিশ্বজনীন ও উদার ছিল। তাঁহার নিকট হইতেই সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে শিখিয়াছিলাম।

চট্টগ্রামের জগৎপুর-আশ্রম দেখিয়া তাঁহার অপার আনন্দ হইয়াছিল, 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আনন্দে মূলেও সেই প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা। বালকবালিকাগণ সংস্কৃতে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেছে, তরুলতাগুলিতে জল সেচন করিতেছে, হরিণ, ময়ূর বেড়াইতেছে, পর্ণকুটিরবাসী সন্ন্যাসীগণ পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানের সহিত জীবিকার জন্য কৃষি কর্ম্ম করিতেছে, সন্ন্যাসিনীগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত পবিত্র সেবা-ধর্ম্ম শিখিতেছে—এই সকল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার কবি-হৃদয়ে এ দৃশ্য বড় ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহার দার্শনিক চিত্ত ইহাতে প্রশস্তি লাভ করিয়াছিল। এই প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধার ফলে তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রতি বড় অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়িতে ভালবাসিতেন বলিয়া শেষের কয়মাস বৌদ্ধদিগের সহিত এক বাড়ীতে ছিলেন। পালি পড়াইবার জন্য কলেজে কোন সংস্থান ছিল না—তিনিই দেখাদেখি করিয়া পালি পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া প্রোফেসর নিযুক্ত করেন।

আজ এইখানেই শেষ করিতে হইবে, বড় আশা ছিল, কলেজের পড়া শেষ হইলে তাঁহার সহিত কটকে গিয়া দেখা করিয়া আসিব, বিদায়ের রাত্রে তিনি চিঠি লিখিবার আদেশ দিয়াছিলেন—আশা পূর্ণ হয় নাই, আদেশও পালন করি নাই। জ্ঞানের দ্বারা, অর্থের দ্বারা তিনি যে উপকার করিয়াছেন, তাহার কৃতজ্ঞতাও জানাইতে পারি নাই, আজ শুধু তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।"

শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী।

অকপট নেতা আব্দুল রসুল।

জন্ম, গুনিয়াউক, ত্রিপুরা, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস।

মৃত্যু, কলিকাতা, ১৯১৭, ৩১শে জুলাই, মঙ্গলবার।

ভারতমাতার সবই গিয়াছে,—মা শ্মশানকে বুকে করিয়া, দুটী সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া, দুইয়ের উন্নতির কামনা হৃদয়ে পূরিয়া, সুদীর্ঘ দিবারজনী কালের অঙ্কে সমর্পণ করিয়া, অদৃষ্ট ভবিষ্যতের দিকে শুধু চাহিয়া আছেন। কি আছে, যাহার মায়ার মা আজও আছেন? কত কেশবচন্দ্র, কত বিবেকানন্দ, কত নৌরজি, কত লালমোহন, কত মনোমোহন, কত আনন্দমোহন, কত উমেশচন্দ্র, কত আব্দুল লতিক, কত বদরুদ্দিন তায়েরজি, কত কত সোণারচাঁদ চলিয়া গিয়াছেন! এই ভারতে শুধু যেন শ্মশানের চুল্লী জ্বলিতেছে! আমার মা শুধু কি চক্ষের জলে ভাসিতেই জীবন-ধারণ করিতেছেন? "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—কবি এই গান গাহিলেন বটে, কিন্তু মা যে আজ পুত্রে পুত্রে বিবাদ ও দলাদলি দেখিয়া শক্তিহীনা, মা যে আজ পর-পদ-লাঞ্ছিতা, মা যে আজ শুধু চক্ষের জল ফেলিতেছেন! কোটী কণ্ঠে মাতৃনাম ধ্বনিত হইলেও মায়ের স্পন্দন পাওয়া যায় না,—মা যেন দলাদলিতে অর্দ্ধমৃতবৎ, শব-সাধনে সিদ্ধিলাভের জন্য মহা তপস্যায় নিযুক্তা। মায়ের এ ভৈরবীবেশ আর দেখা যায় না।

"রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা।
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর।"

মা অনেক তপস্যায় যে সকল পূতচরিত্র সন্তানলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই অসময়ে চলিয়া গিয়াছেন এবং যাইতেছেন, মায়ের গলে শুধু সন্তানগণের মুণ্ডমালা যেন ঝুলিতেছে! মায়ের নিদারুণ শোক আর সহ্য করা যায় না।

মায়ের দুটী সন্তান, হিন্দু ও মুসলমান। দুটী যেন যমজ সন্তান, জ্ঞানে সম্মানে, শক্তিতে বুদ্ধিতে, দর্পে গর্ব্বে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, প্রতিভায় সাধনায়, একতায় মত্ততায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু দুটী ভাইয়ে চির-বিচ্ছেদ, চির-অমিলন, চির-পরপর-ভাব, এজন্য মায়ের কত দুঃখ, কে জানে? মা বলেন, তোরা দুটী ভাই অমিত তেজের গর্ব্বে ও দর্পে ভূষিত হইয়া বাহুতে বাহু মিলিত করিয়া একাঙ্গ হইয়া দাঁড়া, দাঁড়াইয়া মা বলিয়া ডাক্, হিমাদ্রিপাষাণ গলে যাক্, পৃথিবী কম্পিত হউক, অনন্ত নিখিলে সেই ধ্বনি সম্মোহন আনয়ন করুক। সেই আদেশে, বহু তপস্যার ফলে, সুদীর্ঘকাল পরে, মাকে একস্বরে মা বলিয়া ডাকিবার জন্য দুটী সন্তান যেন বদ্ধপরিকর হইতেছিলেন। হিন্দু মুসলমানে এই সদ্ভাব কে আনয়ন করিতেছিলেন? মহাত্মা আব্দুল রসুল প্রভৃতির জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় দুটী ভায়ে যেন সম্মিলন জাগিতেছিল। আজ হঠাৎ এ কি ধ্বনি উঠিল যে "আব্দুল রসুল নাই!" আজীবন কঠোরব্রতধারী, মহামিলনের মহা-সেতু, চরিত্রের অপ্রতিম সম্রাট হঠাৎ আজ কোথায় গেলেন? মায়ের চক্ষের জল মুছিতে না মুছিতে, মায়ের

আহ্বান জাগিতে না জাগিতে, মায়ের ঈঙ্গিত বুঝিতে না বুঝিতে, অকস্মাৎ একি নিদারুণ বাণী, ঘোষিত হইল ? হায়রে হায়, নৌরজি-প্রয়াণের শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে, আবার রস্থল-মহাগ্নি জ্বলিল ! হৃদয় প্রাণ আজ অবসন্ন, ভারতের ঘরে ঘরে আজ আর্ত্তনাদ !!

মেঘনার ওপারে নদী ও পাহাড়-বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দেশ, তাহার নাম ত্রিপুরা। ত্রিপুর —"ময়দানব নির্ম্মিত স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময় পুরত্রয়।" ত্রিপুরার পাহাড়শ্রেণী অনন্ত-বিস্তৃত, চন্দ্রনাথে যে অগ্নি অহরহঃ জ্বলিতেছে, তাহার মূল ত্রিপুরায়, অনন্ত পাহাড়শ্রেণী নিভৃতে জ্বলিতে জ্বলিতে, নিবিতে নিবিতে সাগরে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণের চরম-ক্ষেত্র চট্টল,--বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ চিহ্ন,কবির কাব্য-কানন, নবীন-শশাঙ্ক জীবেন্দ্রের লীলাভূমি ; আর ত্রিপুরা যেন জ্বলন্তময়ী প্রদীপ্ত-হিন্দু-মুসলমান-প্রতিভার লীলাস্থল। থরন্দীপে নির্ব্বাপিত বৌদ্ধপ্রতিভা, ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলমান-প্রতিভা, ভায়ে ভায়ে মিলনের মূল কেন্দ্র। কে বলিবে, সাধু কৈলাসচন্দ্র এবং বীরচন্দ্র মাণিক্যের মহা তপস্থার ফলে, আব্দুল রস্থল, সামস্থল হুদা এবং সেরাজুল ইসলামের উদ্ভব হয় নাই ? এক মাতৃমূর্ত্তি সাপ ধরিয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন,রূপে অরূপে, বুদ্ধি ও প্রতিভায়, সিদ্ধি ও যাদুমন্ত্রে পূর্ণ দীক্ষা-লাভ করিয়া দেবী আমার মৌলবী গুলাব রস্থলের মন আকর্ষণ করিলেন। গুলাব রস্থলের বংশ, চিরদিন হিন্দুভাবাপন্ন, হিন্দু-পরিবারে নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে সম্মিলিত হইতেন, এমন কি, মহিলারা ললাটে সিন্দূর ধারণ করিতেন। হিন্দু-বিদ্বেষ এই জমিদার-পরিবারের ত্রিসীমায়ও স্থান পাইত না। সর্প খেলা ছাড়িয়া মা আমার রস্থল গৃহে আসিয়া খল-খেলায় যেন প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল ইতিহাস বিবৃতির স্থান ইহা নয়। দিলীপ রাজার পুত্র যেমন সগরবংশকে উদ্ধার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমান' সদ্ভাবপূত মিলন গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য, হিন্দু-ভাবাপন্ন গুলাব রস্থলের বংশে এক গুণধর পুত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। মায়ের আশীর্ব্বাদ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পিতৃহীন আব্দুল রস্থল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ কিশোরগঞ্জে, তৎপরে ঢাকায়। ঢাকা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে জননী, পিতৃহীন পুত্রকে খল-খেলায় সিদ্ধিলাভ করাইবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ লিবারপুর নগরে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তৎপর লণ্ডন কিংস কলেজে প্রবেশ করেন। অতঃপর অকস্‌ফোর্ডে গমন করিয়া ১৮৯২ খ্রীঃ মেট্রি-কুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ খ্রীঃ তিনি সেণ্টজন কলেজ হইতে বি-এ উপাধিপ্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পর এম-এ উপাধিপ্রাপ্ত হন। মিডলটেম্পেল হইতে তিনি বি, সি, এল উপাধিপ্রাপ্ত হন, এবং ব্যারিষ্টার হন। ইংলণ্ডে থাকার সময়েই এক ইংরাজ-মহিলাকে পত্নীত্বে বৃত করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। যে মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন, তিনি সর্ব্বগুণে ভূষিতা। বিবাহের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে,রস্থল দীর্ঘজীবন পাইবেন না কিন্তু তাহাতেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। গুণে গুণ, শক্তিতে মহাশক্তি মিলিত হইল, আদর্শ পরিবার সৃজিত হইল। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথম বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু

গবর্ণমেণ্ট সে সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তৎপর বৎসর তিনি কুমিল্লা-নগরে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যা-লয়ের মেট্রিকিউলেসন পরীক্ষার ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষক হইয়াছিলেন।

রস্থলের মাতা পূর্ণ তিন বৎসর হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সন্তানের মধ্যে যে সাধুতার বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল। এরূপ জননীর এরূপ সন্তান বঙ্গের গৌরব।

১৮৯৯ হইতে ১৯১৭—এই অল্প সময় মাত্র তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য, তাঁহার নির্ভীকতা, তাহার ন্যায়-নিষ্ঠা, তাঁহার সততা, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার উদারতা, তাঁহার সত্যানুরাগ, তাঁহার কর্ম্ম-দক্ষতা, তাঁহার চিন্তাশীলতা তাঁহাকে অচ্যুত দেবপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি লাট-সভার সদস্য হইয়াছিলেন, তিনি হয় ত অচিরকাল মধ্যে হাইকোর্টের জজ হইতেন, তিনি হয় ত কালে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিত্বও পাইতেন, কিন্তু সে জন্য তিনি এদেশে সম্পূজিত নহেন। তিনি একমাত্র বিদুষী কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে-ছিলেন। শুক্রবার কন্যার বিবাহ হইবে, উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইতে না হইতে তিনি দুই দিন পূর্ব্বেই প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার কন্যা বলিলেন—"এই শুভকার্য্যে কে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে?" তাহার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন ! তিনি বলিতেন, "কখন জেলে যাইতে হয়, জানি না, কন্যার বিবাহ দিলেই জীবনের এক মহাকাজ শেষ হয়।" তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, তদীয় সাধ্বী পত্নী তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া-ছেন, কিন্তু তিনি যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বিষাদে সমাধা হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে—হাইকোর্টে এবং লাট-সভায় তাঁহার কৃতিত্ব সম্যকরূপে ঘোষিত হইতেছে, দেশে দেশে বহু সভা সমিতিতে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে সকলে আত্মহারা, সকলের চক্ষেই আজ জলধারা বহিতেছে, নীরবে সকলেই হা-হতোস্মি করি-তেছেন ! কি গুণে তিনি সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরা দিবারাত্রি শুধু তাহাই ভাবিতেছি। তাঁহার মহাকাজস ছিল—মহামিলন ; হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন, বঙ্গ বোম্বের একীকরণ, তাহা সুন্দর ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহম্মদ আলী বা নকেত আলী,ফজলল ও মজরুল হক বা হাসন ইমাম, যাঁহার কথাই বল না কেন, সকলেই যেন রস্থলের অনুপ্রাণনার ফল। হিন্দু-মুসলমানের মহামিলনের মহাকারণ আবদুল রস্থল। এজন্য তাঁহাকে অনেক অত্যাচার তিরস্কার, অনেক অপ্রিয় আচার ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনও ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, আজীবন পিতৃ-মাতৃ-প্রদত্ত হিন্দু-মুসলমান-মিলন-মন্ত্র সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবন-পথে ন্যায়ের নিশান হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বদা চলিতেন,স্বর্গ চূর্ণ হইয়া গেলেও ন্যায়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি-তেন না, খোসামুদী করাকে আজীবন ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এজন্য দ্বিভাষী,বহুরূপী অনেক নেতার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিত। তিনি উপাধি-লালসাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, তিনি অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কখনও চলিতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার বাল্যবন্ধু, তাঁহার

পার্শ্বগ্রামবাসী সামসুল-হুদা সাক্ষ্য দিয়াছেন, 'তাঁহার সহিত অটল রসুলের সহিত শেষ বয়সে মতান্তর ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অবিচলিত নেতা তিনি আর দেখেন নাই।' তিনি যে মত খাঁটী বলিয়া বুঝিতেন, তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। ভালবাসার মায়ায় বা খোসামুদীর আকর্ষণে, উপাধির লালসায় বা অর্থের প্রলোভনে কেহ কখনও তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি আজীবন অবিচলিত, অটল, স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতা ছিলেন। সততা এবং ন্যায়-নিষ্ঠা তাঁহাকে যে দেবত্বের অচ্যুতপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে তিনি দলাদলির উপরে উঠিয়া আপন চরিত্র-মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র ঘোষিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভালবাসে নাই, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এরূপ লোক আছে বলিয়া জানি না। তিনি হোমরুল-লিগের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। তিনি সর্ব্ব-শ্রেণীর পূজা অর্চ্চনা পাইয়া, অল্প বয়সে, অক্ষয় অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার স্থান যে শীঘ্র পূরণ হইবে, আমরা তাহা মনে করি না। এরূপ অকপট নিষ্ঠাবান ব্যক্তির তিরোধানে সকলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আজ ঘরে ঘরে, দেশে দেশে, আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে।

কিছুদিন যাবৎ ভাবিতেছিলাম, বঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ দেশ? শুধু স্বাস্থ্যে নয়, শুধু পাহাড় পর্ব্বতের সমাবেশে নয়, শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে নয়, হৃদয়-বলে ত্রিপুরা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দেশ। ত্রিপুরার আদর্শ ব্যক্তিগণ বঙ্গের আদর্শস্থানীয় হইয়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুন।

রসুল-প্রতিভা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ধীরে ধীরে মানুষকে কিরূপে জয় করিতে হয়, তাহা তিনি যেমন জানিতেন, এরূপ বুঝি বা আর কেহই একালে জানে না। তাঁহার দেশানুরাগের মতের সহিত এক সময়ে মুসলমান-সমাজ একমত হইতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহাকে একাকিত্বের বিজন-পথে বহু দিন চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি আদর্শ-চরিত্র, সততা, দৃঢ়তা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং নির্ভীক কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা সকলকে জয় করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র মুসল-মান সমাজ তাঁহার আদর্শে জীবন-গতি নিয়মিত করিতেছিলেন। খল-দমন করিতে রসুল-জননী পুত্রকে প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, কালে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। রসুল মুসল-মান-সমাজকে আপন রাজনীতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়া, আদর্শ জীবনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এজন্য তিনি এযুগের অদ্বিতীয় নেতৃত্ব পাইয়াছেন। তিনি চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন, দৃঢ়তা সহকারে মন্ত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে কালে সকলকেই জয় করা যায়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, সমগ্র দেশকে একতা-সূত্রে গ্রন্থিত করা তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ ছিল, তাহা আশ্চর্য্যরূপে সংসাধন করিয়া তিনি অক্ষয় অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

এদেশে একশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ আছেন, যাঁহাদের কথা ও কাজে মিল নাই, যাঁহাদের ভিতর বাহির বিভিন্ন রূপ, যাঁহারা উপাধি-পিপাসায় মাতোয়ারা, যাঁহারা সম্মানের ও স্বার্থের জন্য না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই, যাঁহারা উঠিতে বসিতে, শুইতে যাইতে শুধু কেবল দেশাত্ম-বোধ লইয়া চলিতেই ভালবাসেন। কষ্ট দুঃখ না পাইলে কোন মহৎ কাজ করা যায় না, একথা তাঁহাদের

জীবন সায় দিতে চায় না। দুগ্ধফেননিভ সুখ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া তাঁহারা দেশের উন্নতি করিতে চাহেন। রসুল এইশ্রেণীর রাজ-নীতিজ্ঞদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, তিনি যেন ম্যাট্‌সিনির পূতমন্ত্রে দীক্ষিত বীর ছিলেন,—দেহ মনের সমীকরণে সিদ্ধাত্মা ছিলেন, সদা দুঃখ কষ্ট সহিতে ও সদা জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। সুব্রহ্মণ্যের ন্যায় এরূপ নির্ভীক নেতা এদেশে বড় অধিক নাই। এক রসুলের আবির্ভাবে ত্রিপুরা বঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া সম্পূজিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। ধন্য ত্রিপুরা, ধন্য মুসলমান-সম্প্রদায়।

কত দিন পরে, কত সাধনার পর হিন্দু-মুসলমানের মহামিলন হইয়াছে—ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া আজ দুই ভাই ভারতে দাঁড়াইয়াছেন। আব্দুল রসুলের মহা তপ-স্যার মহাপুণ্যে আজ ভারত হিন্দু মুসলমানের মহামিলনের অপরূপ শোভায় শোভিত। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, মহাত্মা কালের হস্তে ভারতমাতাকে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, নীরবে, সকলের অজ্ঞাতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের মহাকার্য্য যখন সাধিত হইয়াছে, তখন তিনি আর থাকিবেন কেন? সোমবার রাত্রি ১১টার সময়ে শয়ন করিলেন, পার্শ্বে পত্নী, কিন্তু কেহই জানিলেন না, কখন তিনি প্রস্থান করিয়াছেন! প্রাতে পত্নী দেখিলেন, স্বামী নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া আছেন! ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, জীবন শেষ হইয়াছে! চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল, কিন্তু মহাত্মা তখন কোন্ অনন্ত লোকে, কে জানে? বঙ্গের সদ্ভাব-সিংহাসনে যশের মুকুট ধারণ করিয়া তিনি অমর হইয়া রহিলেন। রক্ত-বিনিময়ে ইংলণ্ড এবং ভারত, বঙ্গ এবং বোম্বের মহামিলন হইয়াছে, মন্ত্রদীক্ষায় হিন্দু ও মুসলমানের মহাসম্মিলন হইয়াছে। সকলে আজ আকাশ কাঁপাইয়া বল—"বন্দে মাতরম্"।

পত্রাবলী।

পত্র নং ২০।

41. Champatola 1st. Lane, 24-3-82.

My dear Khirod Babu,

It won't do to say in general terms that a particular issue is not good. You must tell us what articles are not liked and why. To me, the Journal seems to be steadily improving. But as I happen to be very closely connected with it, I may not be in a situation to be the best Judge. Where is your 'Nihilism'? I expect it to be staring and written with an eye to some practical effect. You will certainly remember that when you write in the 'Bangabasi' you address at least nine thousand readers. I don't say subscribers, for every copy that is sold is at least read by three men. Now, what a mighty engine is in our hands, if we but knew how to use it. If we had but the genius or talents to electrify thousands, what results might not be produced, what hopes

might not be realised !!! To influence the national character, to educate it into earnestness, truthfulness, self-reliance and self-sacrifice —that should certainly be our chief, if not sole aim. I know very well that vast study, deep thought, burning enthusiasm, lofty character and an unlimited command of language must be centered in the individual who would aspire to achieve such glorious results. I need hardly tell you how unequal I feel myself to the task I have undertaken, how over-whelmed I feel with the immensity of idea that is before us. But then, where one alone unaided would inevitably despair of success, might not be a number of men permitted tobe hopeful if they all—I mean of we few friends—worked together with the same noble object in view, and animated with the same noble spirit and the same sacred ambition. If I ask you to throw your whole strength into the work to which you were the first to attract me, it is not to assist me personally but to further the great cause on which we have launched ourselves. You cannot possibly think from the knowledge you have of my habits of thinking that I set too much by the petty pittance I draw from my present editorial work. I am not sure whether you will undertsand me when I say this. I hope however you will do me the justice to believe that the interest that I take in the life and growth of the journal is neither personal nor pecuniary. No more of this now.

Jogendra Babu desires me to ask you why you have not replied to his last letter. He shews me every attention and is an extremely good-natured man. You will be gratified to know the Indian Mirror says that our article on Female Education contains some important suggestion. We have been fortunate enough to secure Babu Chandra Sekhar, author of the "Udbhantra Prem" (উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম) as a contributor. I am anxious to attract first-rate writers to our columns. You must please give your opinion on every article which appears in the Bangabasi and also the grounds upon which it is based, and we should be contented if you would write one article every fortnight—trying of course to make it short as far as possible. I told Umanath Babu that he will be paid for his contributions and have asked him to confine himself to Law. Then what about Indra Prasanna Babu on the arrest of debts? I hope this will find you and family in good health.

Yours very sincerely
Gnanendra Lall Ray.

পত্র নং ২১।

41, Champatolla 1st. Lane, 27-3-82.
My dear Khirod Babu,

Thanks for your full and practical letter. But please write more legibly in future. I know that my own handwriting is not good but I hope it is legible enough. Jogendra Babu has gone home. He is likely to come back to-day.

(1) Would not your article on (Inspectors) be more effective if you could give the expenditure incurred by the present system of inspection and then shew how greater efficiency might be secured at the same cost by adopting our plan. I have not got the necessary books of reference. The suggestion of sending native youths to England and America for education and future service in the Education Department is an excellent one and will have the merit of originality.

(2) But here also, I should think, we ought to give rough outlines of our scheme and a rough estimate of the cost that it would involve, so as to shew that the plan is nat only financially feasible, but would be decidedly economical in the end.

(3) I myself have great doubts as to whether the Inspection system is at all of any use. I am incined to think that the money now expended on it might be much more usefully diverted to the salaries of the underpaid teachers. Visiting schools twice in a year or even four times, does not seem to me to be able to do much good, unless inspection be conducted in an altogether new way. Further discussion of this point is solicited.

(4) Then, I do not see any reason why the Director himself should not annually visit at at least the few colleges, we have —if not the high schools also.

(5) When you come to write on teachers, I hope you will have something to say on the necessity of making promotion to certain grades (illegible on passing certain examinations. You must have observed the tendency the teachers have to (illegible) by exclusively onfinnig themselves to their routine work. The proposed examination would not only keep up intellectual activity in them, but would most easily and effectively stamp out... and all the......that is incident to perpetual......and sychophancy.

(6) Would it not be deserving to amalgamate the two articles (on Inspectors and on teachers) into one. The same observations may be equally applicable to both.

The words which Nobin Babu object to were put in, after his article had gone through my hands. But do you think it practical to write to every contributor for every alteration that is made. I have often to add and expel whol paragraphs in the articles I receivee I added half a column to Dvarik Babu's article on 'Female Education,' i. e. last paragraph which I considerd to be very important suggestion and made some alterations; also in the body of the article without consulting the writer; for there was no time; and although he is known to be easily excitable he has not ever grumbled and

continues to write. 'Dost Mahammud' has been published most reluctantly in order to avoid mortal offence to its writer. Excuse this lengthy letter.

Yours V. sincerely
G. L. Roy.

Ps. Please give me the figures I want as soon as possible. Give the numbers of different grades of inspection, their total pay—the no.; of Gvt. schools they have to inspect. G. L. R.

(এই পত্রখানি, পাঠক মনে রাখিবেন, পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। ইহাতে Director ও Inspectorএর সম্বন্ধ যাহা লেখা আছে, তাহা এখন কার্য্যে হইতেছে। বিদেশে ছাত্র প্রেরণ উচিত, ইহা সর্ব্বপ্রথম "বঙ্গবাসী"তে ক্ষীরোদচন্দ্র লেখেন। এখন Directorগণ school visit করেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ইহাই লিখিয়াছেন। এই পত্রখানি বিশেষ মূল্যবান)। ন, স

পত্র নং ২২।

ক্ষীরোদ বাবু—

অদ্য দপ্তুরি পুস্তক দিয়াছে। কল্যকার ডাকে আপনার জন্য ১৯৫খানি পুস্তক পাঠাইয়া দিব। কল্য যোগেশকে একশত, গুরুদাসকে ৫০খানি, এবং সংস্কৃত ডিপজিটারীতে তিনশত পুস্তক পাঠাইয়া দিব। মূল্য চারি আনাই রাখিবেন। মূল্য কমের দিকে আমার বড় ঝোক। আর কোথায় একশত পাঠাইতে বলিয়াছিলেন—আবার লিখিবেন। আমি সব ভুলিয়া গিয়াছি। আপনার বিজ্ঞাপন সপ্লিমেণ্টে এবার গিয়াছে। আগামী বারে প্রথম স্তম্ভে দিব। প্রথম স্তম্ভে দিলে খরিদ্দার বেশী হয়। যাহাতে আপনার পুস্তকের কাটতি হয়, তাহার জন্য আমি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। পুস্তকের লাভে আপনার বিলাত যাইবার ও দুতিন বৎসর থাকিবার খরচ হইবে—নিশ্চয় হইবে। আপনি লাভের কিছুই খরচ করিবেন না। আমাদের বঙ্গবাসীর তখন বিলাতের correspondent হইবে। আমরা কি তখন মাসে মাসে আপনাকে আর ৫০৲ টাকা দিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। আমার একথা কাল্পনিক নয়—মনের কথা। আপনি এ পুস্তক দুই হাজার ছাপাইবেন। বিজ্ঞাপন Hindu Patriot, Bengalee, Amrita Bazar, Brahmo Public Opinion, East, নববিভাকর, এডুকেশন গেজেট, ঢাকা প্রকাশ, ভারতমিহির এবং চারুবার্ত্তা, এই কয়খানি কাগজে দিতে হইবে। আপনি অনুমতি দিবেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব। বিজ্ঞাপন দিতে ভয় করিবেন না—আমাদের ঘনরামের success কেবল বিজ্ঞাপনে। সকলে বলেন—'What electricity is to machine, advertisement is to sale'। এবারে চন্দ্রশেখরের প্রবন্ধ আছে, বাকী কথা পরে লিখিব, বড় ব্যস্ত। আপনার শুভ সংবাদ দিবেন। ইতি—শ্রীযোগেন্দ্র।

পত্র নং ২৩।

41 Champatola 1st Lane. Calcutta.
My dear Khirod Babu,

I cannot possibly go—I am so sorry for it, but, believe me, I have the noble cause as much at heart as any of you. It would be an unutterable shame of we, the people of Krishnaghar, ever to recede after having given in most, or rather the most emphatic

and public expression to our views in two successive and enthusiastic meetings. I cannot conceive that such a humiliation is reserved for us. You must see that all men of courage and independence of character attend the meeting. Most of the leading men have already committed themselves by moving or seconding resolutions at the two recent meetings. These gentlemen must be compelled anyhow to attend this meeting. You have acted most wisely in having made up your mind to act under Mr. P. Basu. If you can make him adopt the cause entirely as his own, his tact and energy will surely triumph in the face of all opposition. Then, again, your own enthusiastic and bold exertions will do a great-deal. If there is sincerity and earnestness —a real and un-affected love of our country, we cannot but succeed. Although I think my presence would not have at all materially strengthened the independent party and your desire to see me in the field is partly your excessive anxiety for the achievement of success and partly to your friendly partiality towards me—yet I should have been irrepressibly happy if I could take any part in the opening operations of an all-important campaign in which every man that can think and feel ought to join. Excuse this long sentence. I shall eagerly expect a report of the meeting. May God help you in the noble work.

Yours very sincerely
G. L. Ray.

Ps. I should like to have your opinion on every article in the ensuing number. We have been obliged to cut short Govinda Babu a great deal. His production in prose is not well-suited to our column. We expect better productions from him. You will certainly be glad to know that we have secured an accomplished writer as our contributor. He has asked not to give out his name. You must not think that we shall be contented with your newsscraps. We want thoughtful articles from you but not written in your Carlylestic style. Write in simple Bengalee. In haste, for the breakfast is getting cold.

G. L. R.

পত্র নং ২৪

ক্ষীরোদ বাবু,

জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে ত্যাগ করা হইয়াছে, সে সকলি ত আপনি জানেন। তিনি বিছানা পত্র লইয়া গিয়াছেন। আমাদের উপর রাগ ও ক্ষোভ। আজকাল কলিকাতায় আছেন, দুর্গাদাস বাবুর বাড়ীতে। প্রসন্নময়ী কল্য রাত্রে এটোয়া গিয়াছেন, শুনিতেছি, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইবার জন্য পশ্চিমে গমন।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু একটু হাঙ্গামা বাধাইতেছেন, আমার সহিত দেখা হয় নাই। আমি দেখা করিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু দীনুবাবুকে তিনি বলিয়াছেন, দেখা করাটা বড় unpleasant হইবে, সুতরাং দেখা করিতে ক্ষান্ত হইয়াছি। হাঙ্গামের কথা বলি,—জ্ঞানেন্দ্রবাবু লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতেছেন, "বঙ্গবাসীর সহিত আমার আর সম্বন্ধ নাই, আমি সম্পাদক নহি, আমি নিজে বঙ্গবাসীর মত কাগজ বাহির করিব।" এইরূপ ভাবের কথা তিনি

দ্বারিকবাবু,শিবনাথবাবু,নগেন্দ্রবাবু, সঞ্জীববাবু, দীনুবাবু প্রভৃতির কাছে বলিয়াছেন। দ্বারিক বাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমি কাগজ বাহির করিলে,আপনি contributor হইবেন কিনা ?" তাহাতে দ্বারিকবাবু বলিয়াছেন, "আমি এ বিষয় চিন্তা করিয়া বলিব"। কিন্তু অন্ত দীনুবাবু আমায় বলিলেন, জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহাকে. (দীনুবাবুকে) বলিয়াছেন,— "দ্বারিক বাবু, শিবনাথ বাবু প্রভৃতি তাঁহার সাহায্য করিবেন।"কিন্তু দ্বারিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে আমি কেবল বলিয়াছি যে, এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া বলিব।" কাগজ প্রকাশের জন্য তিনি খুব উঠে পড়ে লাগিয়াছেন। শ্রীনাথ দত্তকে Contributor করিতে আসামে পত্র লিখিবেন, তবে এখনও ঠিকানা জানিতে পারেন নাই। আরও সকলকে বলিয়াছেন, বঙ্গবাসী এবার মাটী হলো, দীনুবাবুর কাছে জ্ঞানেন্দ্রবাবু এরূপ গল্প করিয়াছেন,—"যখন শিবনাথবাবু শুনিলেন, আমি আর বঙ্গবাসীতে নাই, তখন অমনি শিবনাথ বাবু মাথায় হাত দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন,পরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বঙ্গবাসীর পরিণাম বড় ভাল দেখিতেছি না।" এখানে এক্ষণে এইরূপ হুজুগ বাঁধিয়াছে। আমার বিশ্বাস, কাগজ প্রকাশ করাটা কেবল বাহ্য আড়ম্বর, তাঁহার ইচ্ছা যে আবার আমি তাঁকে ডাকিয়া সম্পাদক করি। আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এই সকল কথাবার্ত্তার সঙ্গে তিনি আরও বলিতেছেন, বঙ্গবাসীর যাহাতে ক্ষতি হয়, এমন কার্য্য আমার দ্বারা কখনও হইবে না। এই ত ব্যাপার। উনি কেমন লোক, তাহা এইবারে বেশ বুঝা গেল। তাঁহার দ্বারা আমাদের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা মনে হয় না। যদি বা কাগজ বাহির করেন, সে কাগজের success হইবে না। জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে কেমন Editor, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সে যাহা হউক, আমাদের সাবধান হওয়া চাই। বঙ্গবাসী যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আপনাকে অধিক আর কি লিখিব, আপনার চেষ্টাতেই ব'বাসীর এত উন্নতি হইয়াছে, দ্বারিকবাবু, শিবনাথবাবু,কাহাকেও আমি চিনিতাম না। জ্ঞানেন্দ্র বাবুরও ঘটক আপনি। এখন জ্ঞানেন্দ্রবাবুকেও ত্যাগ করা গেল, আপনি রক্ষা করিবেন। আপনার সাহসে আমি জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বল বিক্রম তুচ্ছ করিয়াছি। দীনুবাবু প্রভৃতি তাঁহার কথায় কিছু কিছু ভয় খাইয়াছিলেন,কিন্তু আমি জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কথা পরিহাসের সহিত তুচ্ছ তাচ্ছল্য করায়, তাঁহারা একটু সাহস পাইয়াছেন; আমার দম্ভ কিছুমাত্র কমে নাই। আমি আপনার সাহসেই সাহসী হইয়াছি। জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে এখন যদি আমি যাইয়া ডাকিয়া আনি, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় এখনি আসিয়া আবার পূর্ব্বমত থাকেন। যাহাহউক, জ্ঞানেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে আপনি আপনার অভিপ্রায় লিখিবেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এখানে (কলিকাতায়) বাড়ী খুঁজিতেছেন ;— তাঁহার মা,ভগ্নী ও ভাই এখানে তিনমাস কাল থাকিবেন। বঙ্গবাসীর জন্য আপনাকে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে. আর না লিখিলে চলিবে না; আমি আর কি suggestion করিব, যাহা ভাল বোধ হয় লিখিবেন। শ্রীনাথবাবু আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন, পাঠাই। (নব্যভারত ফাল্গুন সংখ্যা দেখুন) তাঁহাকে উত্তর দিবেন ও বঙ্গবাসীতে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

এবারের কাগজ কেমন হইয়াছে ? প্যারা ও অপরাধীর বিচার আমার লেখা ; নেসফীল্ড প্রবন্ধ দুইটী দ্বারিকবাবুর। স্বাস্থ্যবিধি দীনুবাবুর। 'পাঠ্যপুস্তক'কাহার,জানি না, শিবনাথ বাবু পাঠাইয়াছেন। সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রবাবুর লেখা।

আপনার "প্রশ্নোত্তরের" copy কই ? ভরসা করি, আপনি ভাল আছেন। শ্রীমতী অলকা ও পুত্র দুইটীর সংবাদ দিবেন। আপনার শীতাবকাশ কবে হইবে ? ইতি।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র।'

সঙ্গণিকা।

(২৩)

আমরা ডাক্তার এস, বি, মিত্র দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই কথাগুলি লিখিতেছি। তাঁহার এরূপ অনুরোধের কারণ এই যে, বিজ্ঞান-জগতেও চুরি আছে। তিনি সম্প্রতি একটী জীব-বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন। এটী বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত Sir E. Ray Lankester এর মতের বিরুদ্ধ-তত্ত্ব। Lankester বিশ্বাস করেন, সমুদ্রের বা অন্য কোন জলাশয়ের কোন Mollusc (গেঁড়ী জাতীয় জীব) বাহির হইতে পায়ের ভিতর জল টানিয়া লইয়া পা ফোলাইয়া তবে চলে না। ডাক্তার মিত্র অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইবেন যে, এমন Mollusc আছে, যারা সমুদ্র থেকে বা অন্য জলাশয় থেকে জল টানিয়া লইয়া পা ফোলাইয়া তবে চলে। ডাক্তার মিত্র অবশ্য এ আবিষ্কারটী বিলাতের কোন বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতে ছাপাইবেন। কিন্তু তাঁহার এ আবিষ্কার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কাণাকাণি হইয়াছে, অন্য লোক কেহ কেহ শুনিয়াছেন। পাছে কেহ চুরি করিয়া বলেন, আমি এ তত্ত্ব আগে বাহির করিয়াছি, তাই ডাক্তার মিত্র আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া লেখাইয়া রাখিলেন।

(২৪)

সেদিন কোন সভায় "তর্জ্জার" অভিনয় হইয়াছিল। এদিকে নানা-পত্রিকায়ও তর্জ্জার অভিনয় চলিতেছে। তাহাতেও সকলে সন্তুষ্ট নহেন। শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সি, আর, দাসের কদর্য্য ছবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রাবণ সংখ্যা "ভারতবর্ষে"ও রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে মত্তপূর্ণ একটী গ্লাসও দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে অধিকাংশ পত্রেই রৈবেন্দ্রিক ভাষার ও রুচির দোষোদ্ঘাটন হইতেছে, তিনিও প্রকাশ্য বক্তৃতায় অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতেছেন! এলফ্রেড-থিয়াটারে বক্তৃতার দিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, সাহেব-প্রহরী দ্বারা বিতাড়িত করা হইয়াছিল! আনন্দের বিষয়, বিশ্ব-সাহিত্যের নামে, তাঁহার ঘোরতর বিরোধী ডি; এল রায়ের দলভুক্ত কোন প্রাচীন সাহিত্যিককেও তিনি আপন দলভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দলাদলি চলিতেছে ভাল। যখন

একতা আহ্বানের সময়, তখন বিষম দলাদলি চলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি।

(২৫)

সাহিত্য-পরিষদের নানা কলঙ্কের কথা শুনিয়া ও পাঠ করিয়া বড়ই ক্লেশ পাইতেছি। শ্রাবণ মাসের (১৩২৪) 'ধন্বন্তরি'তে উল্লিখিত হইয়াছে, "শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের "আদিশূর" প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করিতে দেওয়া হয় নাই।" শুনিলাম, গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও সভ্য-শ্রেণীতে গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা চতুর্ব্বিংশ-ভাগ, প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খুজিয়া তাঁহার নাম পাইলাম না। দলাদলিতে সাহিত্য-সভা হইতে সাহিত্য-পরিষদের পৃথকত্ব ঘটিয়াছিল, আবার কি অঘটন ঘটিবে? দলাদলিতে এদেশ উচ্ছন্ন যাইবে কি?

(২৬)

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার নাগের প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহার চাকরী গিয়াছে। কলিকাতার সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের আদেশে ঢাকার কমিটী তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন! এ সম্বন্ধে ২০শে শ্রাবণের (১৩২৪) 'নায়কে' নানা অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা রোহিণীকুমারের প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাইলে ছাপাইতাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা পাই নাই। অপিচ, দুইজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, "উঁহারা বুঝেন কচু"—ঐ প্রবন্ধোল্লিখিত এইরূপ কথা জনৈক তথা-কথিত প্রচারকের মুখে শুনিয়াছিলেন. সাক্ষ্য দিয়াছেন। রোহিণীকুমারের লিখিত কথার অনুসন্ধান হওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু কে অনুসন্ধান করিবে? ইহা যে খোসামুদীর রাজত্ব!! সত্যের অনুরোধে আমরা নানা অপ্রিয় কথা প্রকাশ করিয়া থাকি, এজন্য কত যে অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। বহুবার লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাড়িত, উপেক্ষিত হইয়াও আমরা ব্রত পরিত্যাগ করি নাই। সত্যের জন্য কত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মনে কষ্ট দিয়াছি, আরো কত যে দিতে বাকী, তাহা জানি না। বিধাতা সহায় হউন।

(২৭)

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়—আকাশে মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। পারিবারিক ও সামাজিক আকাশে মেঘ ঘনীভূত, দৈশিক ও রাজনৈতিক আকাশে ততোধিক ঘনীভূত। (১) বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়, ১৩ই শ্রাবণ, বামড়ার দেওয়ান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮ই শ্রাবণ ফরিদপুরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের অন্যতর নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় যোগ দেন নাই! (২) ৩৭ বৎসর ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, স্ত্রীশিক্ষার জন্য, ১৬ বৎসর পর মাসিক আট টাকা, এবং পরে বার টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিতেন, সম্প্রতি কোন দেশীয় সভ্যের তাড়নায় তাহা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে! (৩) ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট-উকীল ৺তারানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শব বিনা অনুমতিতে বাড়ীর পার্শ্বে দাহ হইতেছিল! কর্ত্তৃপক্ষ অর্দ্ধদগ্ধ শব বস্তায়ভরিয়া লইয়া অন্যত্র দাহ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন! সন্তানের অপরাধে মৃত পিতার শবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হইল! অন্যদেশে ইহা

সহ্য হইত না। কিন্তু এদেশে সব সম্ভব!! কেন না, ইহা যে স্বায়ত্ত-শাসনের যুগ! (৪) বর বড়, না কন্যা বড়—একথার মীমাংসা কি আজও হয় নাই? শিক্ষিত সমাজের অনেক স্থলে দেখিতেছি, পাশ্চাত্যানুকরণে. এদেশের শাস্ত্র ও বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া বর অপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ হইতেছে। (৫) আরো দেখিতেছি, শুধু পণের হাত এড়াইবার জন্য নয়, অনেক স্থলে অনেকে বরের পিতামাতাকে উপেক্ষা করিয়া বরকে হাত করিয়া অশান্তি আনয়নকরিতেছেন! (৬) অন্যদিকে শাসন-বজ্র মাথার উপর ঝুলিতেছে, এদিকে সাদর-আহ্বানও চলিতেছে। (৭ দেশে চুরি ডাকাতি বাড়িতেছে, দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে—সর্ব্বত্রই অর্থকষ্ট উপস্থিত, এদিকে দানের খাতা সর্ব্বত্রই ঘুরিতেছে। সুখ, শান্তি, আরাম প্রদেশ হইতে যেন চিরবিদায় লইতেছে। আত্মহত্যা মহাপাপ, সময়ে সময়ে তাহাও অনুষ্ঠিত হইতেছে! এই সমস্ত অবস্থায় বিপাকে পড়িয়া সকলেই "ত্রাহি মধুসূদনঃ" বলিতেছেন। হায়, পরিণাম কি এবং কোথায়? ঘোর অরাজকতা ও দুর্নীতির প্লাবনে দেশ ডুবিয়া যাইবে কি?

(২৮)

ভাবিতেছিলাম, "হোম-রুল-লিগের" কথা। এনি-বেসেণ্টের ন্যায় সদাশয়া মহিলা যাহার জন্য নিগৃহীতা হইতেছেন, তাহাকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে নাকি? শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, শ্রীযুক্ত তিলক ত জেলে পা দিয়াই আছেন। পরাঞ্জপের প্রতিও কঠোর অদেশ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে, সুজলা-সুজলা এই বঙ্গে এহেন কাজেও দলাদলি! দলাদলি শুধু কেন কর্ম্মের জন্য নয়, দলাদলি উপাধি এবং সম্মান-লালসায়! এক টুকরা রুটী ফেলিয়া দিলে যে জাতির নেতারা আত্মহারা এবং লক্ষ্যহারা হন, তাঁহাদিগের নিকট কি আশা করা যাইতে পারে! বড় বড় নেতারা টাকার জন্য কিনা করেন! শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নামেও টাকার জন্য হাইকোর্টে মকর্দ্দমা চলিতেছে! এদেশের লোক বড় নির্লজ্জ যে! সমীকরণ ও সামঞ্জস্য কি সর্ব্বত্র ঘটে? জলে তেলে মিশে কি? আগুনে ও জলে মিশ খায় কি? এই সকল কথাই ভাবিতেছিলাম।

(২৯)

আছি ত আছি, যাই ত যাই। অপিচ যাওয়ার জন্যই বুঝিবা আছি। এই সংসার পরিত্যাগ না করিলে, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সন্দর্শন লাভ ঘটিবার আর সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই কি নৌরজি ও রসুল-প্রয়াণ?

(৩০)

সম-সার্থক না হইলে, সম-ব্যবহার এ জগতে মিলে না। পরন্তু বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খে চিরকালই বুঝিবা অমিলন থাকিয়া যাইবে। মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন—"নিম্ন শ্রেণীর গতি ফিরিবে কি? তাহাদিগকে ত আমরা পশু মনে করি। পশুর উপকার মানুষের দ্বারা হয় কি?" অন্য দেশের কথা জানি না, এদেশে তাহা হয় নাই। যত দিন ঘৃণা ও অহঙ্কার, ততদিন সম্মিলন অসম্ভব।

(৩১)

শ্রাবণ (১৩২৪) মাসের প্রবাসীতে পতি-দেবতার একটী ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশে সতীরা পতিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন; এজন্য এক

মাতালের ছবি অঙ্কিত করিয়া তাহার পায়ের কাছে সতীকে বসাইয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে! প্রবাসী পতিভক্তি তুলিয়া দিয় তৎস্থানে কি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, সকলেরই জানিবার অধিকার আছে। সম্প্রদায়বিশেষকে এরূপে আক্রমণ করা রুচি-বিরুদ্ধ এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। প্রবাসী কি চাহেন? পতি নির্য্যাতন, না পতি বর্জ্জন!

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রেলের পথে—বর্ষার মাঠ।

বরষার শ্যামল প্রান্তর,
ধনধান্য পাটভরা কিবা মনোহর।
বাতাস খেলে ধানের খেতে ঢেউ খেলিয়া যায়,
পাটের গাছ কেমন নাচে সবুজ পাতা চয়।
কোন স্থানে খোলা প্রাণে ফুটল কমল কলি,
গোল পাতাটী পরিপাটি বাতাসে আন্দোলি।
সরলপ্রাণা কুমুদপানা ভেদি ডাকে চাঁদে।
হাসি মুখটী দেখতে কেমন পড়ে প্রেমের ফাঁদে।
ছোট তরী তাড়াতাড়ি নদীর জোরে চলে,
হাটুরিয়া জিনিস নিয়া বাছ্ দিচ্ছে জলে।
গরু চলে ভাঙ্গি জলে কল কল নাদে,
পিছে রাখাল লয়ে পাল গাল দিচ্ছে সাধে।
লাঙ্গল নিয়ে চসে জমিন্ কৃষকের দল,
তাদের হাতে ফল্‌লে ফসল সবার বুদ্ধিবল।
তাদের ফেলে পায়ের তলে দেশের ধনীগণ,
তাদের খেয়ে নেচে গেয়ে করে আস্ফালন।
হুড়াহুড়ি রেলের গাড়ী মাঠের হৃদয় চিরে;
ঠিক সময়ে দেশবিদেশে যাত্রী নিয়ে ফিরে।
বাজল বাঁশী ফুরাল হাসি নামতে হ'ল এবে.
টিকিট দিয়ে জিনিস নিয়ে বাড়ী চল সবে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

শ্রাবণে।

মেঘের পাছে মেঘ চলে'ছে,
বজ্র নিনাদ ছাড়ি
শূন্য পথে যায় যেন ঐ
ঐরাবতের সারি!
সৌদামিনী থেকে' থেকে'
অট্ট অট্ট হাসে,
সবুজ ধানে মাঠ ভরে'ছে,
বিল ভরে'ছে ঘাসে।
সাপলা, শালুক, সুঁদী এদের
সুখের দিন আজ এ'ল,
দেখতে দেখতে নদী গুলির
তলা ভরে' গেল।
কূলে কূলে জল উঠেছে
বে'য়ে যাচ্ছে তরী,
কত দেশে করছে যাত্রা
কত না 'নায়রী,'।
মাঝে মাঝে কালো কালো
হচ্ছে দিঙ্মণ্ডল,
দিগ্ বধূরা ঘোমটা খুলে'
খোপার ঝা-রছে জল।
নিদাঘ জ্বালায় জীব যখনই
ত্রাহি ত্রাহি করে,
স্বরগ হ'তে অমনি তাঁহার
উদার স্নেহ ঝরে!

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ।

জীবন ও যৌবন।

(ইংরেজী হইতে).

জীবন যৌবন দুই—
একসাথে ছিল জড়াইয়া,
ভেবেছিল ধীরে ধীরে
এক হয়ে যাবে মিলাইয়া।
যৌবন বিলাস মাখা,
অসতর্ক উন্মাদ উছল,
জীবন কর্ত্তব্য ঢাকা,
সতর্কিত তীব্র সুবিমল।
যৌবন নিদাঘ-ঊষা,
মণি মুক্তা প্রবালের ছটা;
জীবন শীতের হাওয়া,
অদম্য সে বাহিরের ঘটা।
যৌবন অকুতোভয়,
দীপ্ত যোদ্ধা দুর্ব্বার সমরে;
জীবন ভিক্ষুক মত
বস্ত্রহীন শীতের সফরে।
যৌবন তরল হাসি,
জীবনের মৃদুল নিশ্বাস;
যৌবন চপল গতি,
রেখে ঢেকে জীবনের আশ।
যৌবন কোমলে দৃঢ়,
চলে যায় অদম্য সাহসে;
জীবন সে স্নেহ-অঙ্ক,
নীরবে নীরবে ধীরে আসে।
যৌবন হিংস্রক অতি,
জীবন দীক্ষিত দয়া-ব্রতে.
মিলন হলোনা দোঁহে.
ছাড়াছাড়ি তাই অর্দ্ধ পথে।

দরবেশ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৭। জাতক—অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম সমূহের বৃত্তান্ত। ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালি গ্রন্থ হইতে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত, প্রথম খণ্ড।

বৌদ্ধদিগের মতে জাতকগুলি ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্ম-বৃত্তান্ত। জাতক সংখ্যা ৫১৭, তন্মধ্যে ১৫০ প্রথম খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। জাতকের ইতিহাস নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন কতকগুলি জাতকও নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে পাঠকগণ ঈশানবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার কতক পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরস। পুস্তকখানি ভাল কাগজে সুন্দররূপে ছাপা। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা-সাহিত্য জগতের গৌরব। গ্রন্থ প্রকাশে প্রভূত পরিশ্রম, অসামান্য গবেষণা এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আমরা আশা করি. এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

১৮। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান। শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম-এ, বি-টি প্রণীত; মূল্য তিন টাকা। পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত; কিন্তু টাইটেল ইংরাজিতে লিখিত। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য প্রকাশিত।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক ছিল না। মনোবিজ্ঞানের উপযোগিতা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন,তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালা ভাষায় মনোবিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা কতদূর কষ্টকর,কৃতী ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারেন। গ্রন্থকার অসামান্য ক্ষমতা বলে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়া সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ভাষার পারিপাট্যে পুস্তকখানি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। জটিল তত্ত্বসকল সরল হইতেও সরল হইয়াছে। গ্রন্থকার যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার জিনিষ নয়। এই এগখানি পুস্তক লিখিয়া তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য-রাজ্যে অমরত্ব লাভ করিবেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যারপর নাই উপকৃত হইলাম। ছাত্রমণ্ডলী ইহাদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

১৯। খাদ্য। শ্রীচুণীলাল বসু.আই,এস ও এম-বি এবং এফ, সি, এস প্রণীত।

আধুনিক সময় পর্য্যন্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল বিশুদ্ধ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্র ও চুণীলাল, এই বসু-যুগল বাঙ্গালার যে উপকার করিতেছেন তাহা

ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। উভয়ই পণ্ডিত, উভয়ই চরিত্রবান্, উভয়ই সহৃদয়, উভয়ই দেশের অভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এই দুই মহাত্মার দ্বারা বাঁঙ্গালাভাষা বিশেষ-রূপে উপকৃত। সেকালে ছিলেন যদুবাবু, একালে আছেন কার্ত্তিকচন্দ্র ও চুণীলাল। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহারা দেশকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিতেছেন। এই পুস্তকে খাদ্য সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, সে সকলই সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। কোন তত্ত্বই বাদ যায় নাই। পুস্তকখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় গৃহে গৃহে প্রচারিত হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য।

২০। ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা—প্রথম বৎসর, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ও শ্রীরাখালরাজ রায় বি-এ। মোরাদপুর, বাঁকিপুর।

এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া যোগীন্দ্রনাথ এবং রাখালরাজ বাঙ্গালা-ভাষার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। পুস্তক দোষশূন্য হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না, অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে, অনেক পত্রিকা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা জানি। সে সকল কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় না। যে মহৎ কার্য্যে প্রকাশকগণ ব্রতী, ভুলত্রুটী হওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু উভয়ই উদার, জ্ঞানী, নিরপেক্ষ, বিবেচক এবং কৃতী। বাঙ্গালা ভাষার উপকার করিতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করি, তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার মুখ উজ্জ্বল হইবে। এই পঞ্জিকা সহিত্য-সেবী মাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য।

২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পঞ্চমভাগ, তৃতীয় ষটক, প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গীতা-তত্ত্বের এরূপ বিস্তৃত বিবৃতি এদেশে আর হয় নাই। এই গ্রন্থখানি যদি দেবেন্দ্রবিজয় বাবু শেষ করিয়া যাইতে পারেন, চিরকাল তিনি পূজা অর্চ্চনা পাইবেন। গভীর গবেষণা, মৌলিক চিন্তা এবং ধর্ম্মানুরাগ ভিন্ন এরূপ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। নাটক, উপন্যাস বা কবিতা লেখা নহে, এরূপ কার্য্যে জীবন ক্ষয় হইয়া যায়। দেবেন্দ্রবিজয় বাবু গীতাতত্ত্ব-প্রকাশে জীবন ক্ষয় করিয়াছেন, চক্ষু গিয়াছে, স্বাস্থ্য গিয়াছে, অর্থ গিয়াছে—সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তবে কৃতিত্বে পৌছিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এরূপ গ্রন্থ এবং এরূপ গ্রন্থকারের এদেশে তেমন আদর নাই। কিন্তু এমন ভাবে লাগিয়াছেন যে, গ্রন্থ সমাপ্ত করিবেনই। এদেশে এরূপ সাধনার কি আদর হইবে না?

গীতাতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা, তুলনায় সমালোচন তিনি যেরূপভাবে করিয়াছেন, তাহা নব্য-ভারতের পাঠকগণ বিশেষরূপ অবগত আছেন। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না। অবস্থাপন্ন পাঠকগণ এই মহামূল্য গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিলে বিশেষ উপকার হইবে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারের ক্ষমতার পরিচয়ে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।

২২। কাব্যসুধা। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-গ্রন্থাবলি হইতে সংগৃহীত। বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসর শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্ত্তৃক প্রণীত; মূল্য ১৲। ননদ-ভাজ, বোনে বোনে, শ্বাশুড়ী বৌ ও একান্নবর্ত্তী পরিবার ইহাতে আছে।

এক সময়ে পূর্ণচন্দ্র বসু ও গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বঙ্কিম-প্রতিভা বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, এখন সে কাজে ব্রতী হইয়াছেন, ললিতকুমার। উপযুক্ত লোকই ভার গ্রহণ করিরাছেন।

ননদ-ভাজে—কপালকুণ্ডলার শ্যামাসুন্দরী ও মৃন্ময়ী, বিষবৃক্ষের কমলমণি ও সূর্য্যমুখী, চন্দ্রশেখরের সুন্দরী ও শৈবলিনী ও আনন্দমঠের নিমাই-শান্তি - এই চারিটী চিত্র আছে।

বোনে বোনে। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমার মাতা ও বিমলা, মৃণালিণীর নায়িকার মাতা ও অরুন্ধতী মাসি। রজনীর মাতার মৃত্যু হইলে তাহার মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলার নবকুমারের দুই ভগিনী, চন্দ্রশেখরের সুন্দরী ও রূপসী, দেবী চৌধুরাণীর ফুলমণি ও অলকমণি, সীতারামের ডাকিনী ও শ্রী।

ইহা বাদে **শ্বাশুড়ী বৌ** ও একান্তবর্ত্তী পরিবার আছে। গ্রন্থকারের ক্ষমতা প্রভৃত, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরাগী ব্যক্তি, তিনি ভাষাবিৎ, তিনি কলাবিৎ, তিনি বিজ্ঞানবিৎ। কিরূপভাবে কোন্ চিত্র ফুটিয়াছে, তাহা সম্যকরূপে বুঝিয়া লেখনী চালনা করিয়াছেন। চরিত্র-বিশ্লেষণে এদেশে তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি, একথা বলিবার সময় সঙ্কুচিত হইতে হয় না। গ্রন্থখানিতে লেখকের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থকার বঙ্কিম-

শৈবলিনী।

ভারতের মধ্যযুগ যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, বিশাল মুসলমান সাম্রাজ্য যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপনীত হইবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে শৈবলিনীর আবির্ভাব। কলবাহিনী জাহ্নবীর তীরে ধন জন-পূর্ণ কোন গণ্ডগ্রামে শৈবলিনীর জন্ম। যে রত্ন কুবের ভাণ্ডারে থাকিলে মানাইত, তাহা দরিদ্রের গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে স্থান পাইল। যে কুসুম ধনীর প্রমোদ-কাননে ফুটিলে সার্থক হইত, তাহা পল্লীর ঘনান্ধকার তলে ফুটিয়া উঠিল। বিলাসীর কণ্ঠহার, যৌবনের পুষ্পিতা লতা দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিল। শৈবলিনী জন্মদুঃখিনী; শৈশবেই নিরাশ্রয়া। সংসারে বিধবা মাতা ব্যতীত আপনার বলিতে তার কেহই ছিল না। দরিদ্রের আত্মীয় থাকিয়াও নাই। শৈবলিনী রূপসম্পদে রাজ্ঞীর মত সৌভাগ্যশালিনী, কিন্তু বড় দুরিদ্র, বড় দুঃখিনী বলিয়া আত্মীয় স্বজনের কোন পরিচয়ই সে কখন পায় নাই।

শৈবলিনীর নামটী ঠিক তাহার প্রকৃতিরই উপযোগিনী ছিল। শৈবলিনী অর্থে নদী। প্রথম শৈশবে আপনার মনে নদী বহিয়া যায়। শৈবলিনীর শৈশবও আমোদে চঞ্চল হইয়া বড় সুখেই কাটিয়াছিল। ক্রমে নদী শৈশব ছাড়িয়া কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে তরঙ্গশালিনী বেগবতী কথঞ্চিৎ আবিলা, চঞ্চলস্বভাবা হইয়া দেখা দিল। শৈবলিনীও প্রথম যৌবনে নদীর মতই বাড়িয়া উঠিল; রূপতরঙ্গ তাহার পরিপুষ্ট দেহের দুইকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। শৈবলিনীর গতি নদীব গতির মত আপনার ভাবে বিভোরা, স্বভাবতঃ বক্র, হইল। তাহার মনের বেগ নদী-স্রোতের মতই প্রখর বেগ ধারণ করিল। শৈবলিনী নদীর মতই রহস্যময়ী। কখন কোন্ পথে কোন্ ভাবে বহিবে, আপনই জানে না। আপনিই বোঝে না, তাহার দুর্দ্দমনীয় বাসনা-প্রবাহ কোথায় গিয়া শেষ হইবে। স্রোতের টানেই সে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।

শৈবলিনীর নামটীর অর্থ ছিল। গোলাপকে যে নামেই ডাকনা, তাহাতে ক্ষতি নাই—আমরা তাহা বলি না। গোলাপের নাম অঘোরঝিণ্টিকা মানাইত না। যে দেশে মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষীকৃত, জপের ফল অবশ্যম্ভাবী, যে দেশে নাম নিরর্থক নহে। শব্দের শক্তি আছেই। প্রত্যক্ষ হউক, পরোক্ষ হউক, নামের একটী অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। অক্ষর বিন্যাসের হেতু আছে।

শৈবলিনীকে যে-ই দেখিত, সে-ই শতমুখে তাহার সুখ্যাতি করিত। সে পল্লীর ছায়া-স্নিগ্ধ পথে শৈশবে ছুটাছুটী করিত, পথিকেরা সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিত। বিদ্যুৎ শিখা মূর্ত্তি ধরিয়া ধরায় নামিয়া অসিয়াছে বলিয়া বৃদ্ধেরা তাহাকে উপহাস করিত। সে যখন সদ্যস্নাতা হইয়া নদীতীরে দাঁড়াইত, লোকে ভাবিত, গৌরী যেন বালিকা মূর্ত্তিতে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শৈবলিনী একজনের সহিত খেলা করিত, বেড়াইত, নদীতীরে লহরীমালা লক্ষ্য করিত, তাহার নাম প্রতাপ। এক বৃন্তে দুটী ফুলের মত দুইজনে ফুটিয়াছিল। দুজনের বড় ভাব জন্মিল। বালকের বয়স ১৫।১৬ বৎসর।

বালিকার বয়স ৭।৮ বৎসর। মা যাইত কি না, জানি না। লোকে কিছু বলিত কি না, সে খবর আমরা পাই নাই। বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে সুকুমার বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিত, ভাবের লোকটীর গলায় কখন কখন পরাইয়া আমোদ পাইত। নবদূর্ব্বাদল-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত, কদাচিৎ উপবিষ্ট হইয়া দুজনে ভাগীরথীর সান্ধ্যকল্লোল শ্রবণ করিত। সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা গণিয়া সময় কাটাইত। কখন নির্ব্বাক কখন বা ক্রমশূন্য আলাপের মধ্য দিয়া সন্ধ্যা নীরবে চলিয়া যাইত। দুইজনের কেহই তাহা জানিতে পারিত না।

শৈবলিনী লেখাপড়া জানিত না। তখনকার পল্লীতে বালিকাদের লেখাপড়ার রেওয়াজই ছিল না। আর দরিদ্রের কন্যাকে কে লেখাপড়া শিখাইবে? সে সুযোগই বা তার কোথায়?

শৈবলিনীর যে প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহাকে শৈবলিনী করিয়াছিল, বাল্যেই তাহা ফুটিতে দেখা যায়। সে বিশিষ্টতায় কতকটা স্বার্থপরতা, কতকটা জেদ, কতকটা গর্ব্ব মিশ্রিত ছিল। গণিতে পারুক বা নাই পারুক, তবু সে গণবার ভুল স্বীকার করিত না। ইহাও বলিতে ছাড়িত না যে, সে প্রতাপের চেয়েও একখানি অধিক নৌকা গণিয়াছে। শৈবলিনী সহজে হটিত না, হার মানিয়া লওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না।

শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। জ্ঞাতির সহিত জ্ঞাতির বিবাহ হিন্দুধর্ম্মের রীতি নহে। প্রতাপ জানিত যে, শৈবলিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে না। তবু সে জানিয়া শুনিয়া কতকটা বালকত্ব, কতকটা অপরিণামদর্শিতা, কতকটা বা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ হেতু শৈবলিনীর সহিত মিলিত, শৈবলিনী ছেলেমানুষ, অতশত সে বুঝিত না। উভয়ের জীবনতরী যে প্রতিকূল বাতাসেই বহিয়া যাইবে, তাহার সূচনা এখন হইতেই দেখা দিল।

শৈবলিনী কৈশোরে পদার্পণ করিল। দেহের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রতাপের প্রতি ভালবাসাও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারুণ্যের খরস্রোতের বেগে শৈবলিনীর উদ্দাম বাসনা-ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিতে লাগিল। সেই রকম অবস্থায় একদিন সে শুনিল যে, প্রতাপের সহিত তার বিবাহ হইবার নহে। তখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল, প্রতাপ ব্যতীত তার সুখ নাই। এ জন্মে প্রতাপ তার হইবে না। যুবতীর বুভুক্ষিত কোমল বক্ষ সে আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। সচন্দ্রা রজনী মুহূর্ত্তে আঁধারময়ী হইয়া উঠিল।

তখন দুইজনে গোপনে অনেকদিন ধরিয়া পরামর্শ আঁটিল? কেহ জানিল না। দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। প্রতাপ সে সময়ে ২০ বৎসরের, শৈবলিনী ১৫ বৎসরের। এই বয়সে গোপনে অনেকদিন ধরিয়া পরামর্শ যেন কেমন কেমন! তখনকার দিনে পল্লীতে, অতীতের সেই হিন্দু সমাজের দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে যুবতী কন্যার সহিত যুবকের অনেকদিন ধরিয়া গোপন পরামর্শ আমাদের নিকট কেমন নূতন ও অসম্ভব ঠেকে। তারপর সহস্র নরনারীর সম্মুখে সাঁতার দেওয়া—থাক। দুজনে গভীর জলে সাঁতার দিতে লাগিল। ভাগীরথীর উজ্জ্বল জলরাশির সহিত নাচিয়া নাচিয়া দুলিয়া দুলিয়া দুইজনে অনেক দূরে চলিয়া গেল। তীরের লোকেরা দেখিল, দুইটী ফুল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রতাপ বলিল "শৈবলিনী, শৈ, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল "আর কেন, এই খানেই?" দুইজনে হতাশ অন্তরের গোপন ব্যথার এই ঔষধ-সেবনই ঠিক করিয়াছিল। তারপর প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না। শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল, "কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারি না। শৈবলিনী ডুবিল না, ফিরিল"।

প্রতাপ ও শৈবলিনী দুইজনে দুইজনকে ভালবাসিত বটে, কিন্তু উভয়ের ভালবাসার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা ছিল। সে বিশিষ্টতার জন্য প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না। প্রতাপের ভালবাসা আত্ম-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা, শৈবলিনীর ভালবাসা আত্মতৃপ্তির পরিপূরণ। প্রতাপের প্রেম নিঃস্বার্থ, শৈবলিনীর প্রেম স্বার্থপরতাদুষ্ট। প্রতাপের আকর্ষণ প্রেমের। শৈবলিনীর আকর্ষণ কামমিশ্র প্রেমের। প্রতাপের চিত্তবল অধিক, শৈবলিনীর অত্যল্প। তাই প্রতাপ চিত্ত বশে রাখিয়া চলিতে পারিল। আর শৈবলিনীকে চিত্তের বলে স্রোতোচালিত তৃণের মত ভাসিয়া চলিতে হইল। প্রতাপের প্রেম মর্ত্ত্যে অমৃত, আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহা পরিণামে তাহাকে স্বর্গের অধিকারী করিল। শৈবলিনীর প্রেম স্বার্থপরতা,মোহ ও কামের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহজীবনেই তাহাকে নরক ভোগ করাইল।

প্রতাপ মৃত্যুপর্য্যন্ত কঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা উদ্দাম ভালবাসার বহ্নি আবৃত রাখিয়াছিল সত্য, কিন্তু আজীবন সেই বহ্নির জ্বালায় তাহার মধ্যস্থল অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়িতেছিল। পরিশেষে সেই হৃদয়মধ্যস্থ ভালবাসার হোমাগ্নিতে সে আপনাকে আহুতি দিল। আর শৈবলিনী আকাঙ্ক্ষার প্রবল তাড়নে মদনের দুর্ব্বিসহ শরাঘাতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গৃহত্যাগ করিল। পরিশেষে স্থূলদেহেই তাহার নরক ভোগ হইয়া গেল। প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবন-নদীতে যে ভীষণ ঝটিকা উঠিবে, তাহার সূচনা হইল। উভয়ের প্রেমতরুতে অমৃত কি বিষফল ফলিবে, তাহারও বীজ দেখা দিল।

প্রতাপ কথাটীর অর্থ বীরত্ব ও বল। বাস্তবিক প্রতাপের মত বীর কে? প্রতাপের মত বল কাহার? অন্তঃশক্রর মত বড় শত্রু আর নাই। সেই শত্রুকে যে জয় করে, সে-ই যথার্থ বীর, বীরত্ব তারই সার্থক। চিত্তবলই সেরা বল, সেই চিত্তবলে বলী প্রতাপের সহিত অন্য বলীর তুলনাই হয় না।

প্রতাপ সংযমে দেবতা, ধৈর্য্যে হিমালয় ছিল। তথাপি ইহাও সত্য যে, মনের মত অপূর্ব্ব রূপ-সৌন্দর্য্যশালিনী প্রেমময়ী পত্নী পাইলেও, প্রতাপ ভালবাসার দৃঢ়বদ্ধ মূল উৎপাটিত করিতে সক্ষম হইত না। প্রতাপের পত্নী রূপসী, অসামান্য রূপসী, অসাধারণ গুণবতী ও অতীব প্রেমময়ী পত্নী ছিল কিনা, প্রতাপ তাহা দেখে নাই। প্রতাপ কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে পত্নীর সহিত সংসার করিত। সে বিবাহ করিয়াছে, শুনিলে শৈবলিনী যদি তাহাকে ভুলে, সে-ও যদি ভুলিতে পারে, এই আশায় গুরু-আজ্ঞা এড়াইতে না পারিয়াও প্রতাপ সংসারী হইল। অমর কবি রূপসী সম্বন্ধে কোন তথ্যই আমাদিগকে এক প্রকার দেন নাই। প্রতাপের কাছে রূপসী যখন বিবাহিতা পত্নী মাত্র, তাহার বিশেষত্ব যখন কিছু নাই, তখন রূপসী চরিত্রের অবতারণা মাত্র করিয়া চরিতসৃষ্টিকার ক্ষান্ত হইলেন। রূপসী যে ঠিক এই

হিসাবে উপেক্ষিতা, এমন নহে। রূপসী সুন্দরীকে বলে “দিদি, তুই বড় কুঁদুলে।” এই কথাটীতে রূপসীকে এক রকম বুঝা যায়। রূপসী সাদাসিদা ধরণের সাদাসিদে বুদ্ধির রমণী মাত্র ছিল, হৃদয়ের সূক্ষ্ম রহস্য, প্রেমের বিচিত্র গতি বড় একটা বুঝিত না; বুঝিবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহার ছিল না, এইরূপ পত্নীই প্রতাপের আবশ্যক ছিল। প্রতাপের মর্ম্মস্থল লক্ষ্য করিতে পারে, এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শালিনী পত্নীর সহিত প্রতাপের ঘর করা আদৌ চলিত না।

শৈবলিনী সংযমে একেবারেই অভ্যস্থা ছিল না। তাহার হৃদয় প্রেমে, উচ্ছ্বাসে, মোহে, কামে, আকাঙ্ক্ষায়, স্বার্থপরতায়, পরিপূর্ণ ছিল। মনের মত প্রণয়ী, রূপবান্ প্রেমময় যুবক স্বামী পাইলে সে প্রতাপকে ভুলিলেও ভুলিতে পারিত। শৈবলিনীর ভালবাসা খুব সুগভীর ছিল না, তবে বিস্তৃত ছিল; আর কূলে কূলে পরিপূর্ণ ছিল। উদ্দাম বেগশীল কল কল ছল ছল রবে সর্ব্বদাই মুখরিত ছিল। প্রতাপের প্রেম সুগভীর কিন্তু উপরে তাহার তরঙ্গ উঠিত না। মহাসমুদ্রের মত একপ্রকার অতলস্পর্শ ছিল বলা যায়। শৈবলিনীর প্রেমে মোহের ভাগ অধিক দেখা যাইত। তার পর শৈবলিনী দরিদ্র মধ্যবয়স্ক শাস্ত্রচিন্তা-নিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহিণী হইল। চন্দ্রশেখরের পত্নীত্ব তার কাছে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত। এ মিলন তার ভাল লাগিল না। এ বিবাহে তার কোন আশা, ভোগের কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইল না। একে যুবতীহৃদয় অন্যাসক্তা, তদুপরি স্বামীর উদাসীনতা, শৈবলিনীর হৃদয়ের আগুন নিভিবে কি, আরও জ্বলিয়া উঠিল। তখন অভাগিনী অন্তরের মধ্যে নরক পুষিয়া উপরে গৃহলক্ষ্মী হইয়া রহিল। যন্ত্রের মত সে সংসারের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল। সজীব পুত্তলির মত সাজিয়া গুজিয়া দিনগুলি একরূপে কাটাইতে লাগিল। এ বিবাহে যুবতীর প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না, যৌবনের মুকুলিত অনুরাগ নিরাশার অনলে ছাই হইয়া গেল। বিবাহের সজীব মন্ত্র অন্যাসক্তা শৈবলিনীর কর্ণে ভালরূপে পৌছিল না।

তারপর শৈবলিনী বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের সহিত স্বামীর ঘর করিতে গেল। শৈবলিনী সেখানে গিয়া, বলাই বাহুল্য, সুখী হইল না। অবশেষে কুলত্যাগিনী হইল। হিন্দুকুল-লক্ষ্মী রাক্ষসী পিশাচী হইয়া দেখা দিল। যে সংযমে আদৌ অনভ্যস্তা, অত বড় দুঃসাহসিক কার্য্যে যে অকুণ্ঠিতচিন্তা, সে পাপিষ্ঠা বৈ আর কি? তবু সত্য বলিতে কি, তার জন্য দুঃখ হয়, সহানুভূতি জাগে, তার ক্ষুব্ধ হতভাগ্য জীবনের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দৈনন্দিন অভিমানে, সোহাগে, আদরে যার দিনগুলি কাটিবার কথা, তাহা হইল না। অলক্তরঞ্জিত চরণের নূপুর শিঞ্জনে গৃহ-প্রাঙ্গণ স্পন্দিত হইল না; তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত সুখের অরুণাভায় নবোদ্ভিন্ন যৌবনশ্রীর তরলপ্রভায় তাহার কপোলখানি রাঙ্গাইয়া উঠিল না; দাম্পত্যের হাওয়ায় তার বিকশিত হৃদয়কুসুম একদিনও নাচিয়া নাচিয়া দুলিতে পাইল না—ওকি কম দুঃখের? কাহার জন্য এমন হইল? ইহার জন্য কে দায়ী? অদৃষ্ট, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রতাপ, না—চন্দ্রশেখর? শৈবলিনীর দোষ কি? ধর্ম্ম, সমাজ ও বিবেকের মুখ চাহিয়া কে কবে প্রাণের গোপন ব্যথা পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ করিয়া রাখে? দুঃখ, সহানুভূতি, প্রণয়, দয়া, এ সকল কখন ভাবিয়া চিন্তিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া জন্মে না।

শৈবলিনী যাঁর হাতে গড়া জিনিষ—তিনি, হতভাগিনী হইলেও, পাপিষ্ঠা হইলেও শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন। দোষ করিয়াছে বলিয়া সকলে ভালবাসার জিনিষকে মন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে না। যেখানে ভালবাসা প্রবল, সেখানে অভিমান যেমন বেশী, ক্ষমাও তেমনই বেশী। ভালবাসা ছিল, তাই পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইহলোকে নরক ভোগ করাইয়া আবার গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। কৃত-কর্ম্মফল নরক ভোগান্তে পর জন্মে দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে দেখা দেয়। পাপের অবশেষরূপে এক জন্মেই শৈবলিনীর উন্মাদরোগ হইল। ভালবাসার সামগ্রী অবস্থা-বৈগুণ্যে অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তাহার জীবনটী কি একেবারেই নষ্ট করিয়া দিতে হইবে? ক্ষমারূপ সোহাগা দ্বারা কি স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে না? আর কলিকালে মানস পাপের ততদূর গুরুত্বও নাই। আহা, জন্মদুঃখিনী অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিড়ম্বিতা, উৎকট যন্ত্রণায় প্রপীড়িতা শৈবলিনী দয়ার অযোগ্য? অভাগিনীর ক্ষুব্ধ মর্ম্মবীণায় কারুণ্যের যে সুর বাজিত, কবির হৃদয়ে কি তাহার ঝঙ্কারটুকু উত্থিত হওয়া অস্বাভাবিক? কবিকে বাধ্য হইয়া ন্যায়বান বিচারকের মত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল বলিয়া কি তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথা পায় নাই? সে দণ্ডের কিয়দংশ যন্ত্রণা কবিকে ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি।

আমরা অন্যায় কার্য্যমাত্রেরই নিন্দা করি। কিন্তু কি ঘটনাচক্রে পড়িয়া, কি সঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হইয়া, সেই অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার বিচার করি না।

জ্ঞানহীনা শৈবলিনী যখন প্রতাপকে পাইল না, তখনই তাহার যুবতী-হৃদয় নিরাশায় দমিয়া গেল, আমোদ-চঞ্চল হাসি জন্মের মত তাহার মুখ হইতে মুছিয়া গেল। কেহই সে দুঃখে সান্ত্বনা দিল না, তাহার চিত্তজয়ের কেহ কোন ব্যবস্থাই করিল না। যন্ত্রণায় যখন অভাগিনী শয্যায় শুইয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিত, তখন আহা বলিবার কেহ ছিল না, সৎপথে ফিরিবার মত সাধনার অনুকূলক্ষেত্র তাহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। মাধবীকঙ্কণের হেমলতা প্রেমময় স্বামী পাইয়াছিল, শৈলবালার মত সহানুভূতি-সম্পান্না ননদীর সাহায্য লাভ করিয়াছিল। তাই তাহার আদর্শে, শিক্ষার উপদেশে হেমলতার জীবন ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। প্রেমময় পতির ভালবাসা, আদর ও যত্ন পাইয়া ক্রমে ক্রমে সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, অবশেষে সংযম বলে দেবীর মত পবিত্রা হইয়া উঠিল। শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর চক্ষে প্রেমময় দূরে থাক্, বরং অপ্রেমিক, উদাসীন শাস্ত্রৈকচিত্ত অর্দ্ধ সন্ন্যাসীরূপে প্রতীত হইলেন। গৃহেও শৈলবালার মত সহানুভূতি করে, এমন কাহাকে পাইল না, কাজেই শৈবলিনীর চিত্ত স্ববশে রহিল না। চন্দ্রশেখর এত ঊর্দ্ধে অবস্থিত যে, শৈবলিনী তাঁহার নাগালই পাইত না। গ্রন্থই চন্দ্রশেখরের সর্ব্বস্ব, শৈবলিনীর স্থান সে হৃদয়ে নাই—ইহাই তাহার বিশ্বাস জন্মিল। যুবতী যাহা চায়, তাহা পাইল না। তাহার কোন সাধই চন্দ্রশেখরের দ্বারা পূর্ণ হইল না।

চন্দ্রশেখর জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। মোহশূন্য খাঁটী প্রেম তাঁহার চিত্তে ফল্গুর মত হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিত। তাহার বহির্বিকাশ দেখা যাইত না, উপরে কোন তরঙ্গ ফুটিত না, ফেনা বুদ্বুদ পর্য্যন্ত

ভাসিত না। শৈবলিনীর তৃষ্ণাতুর অধর পিপাসায় শুষ্ক হইয়া একবিন্দু জলের আশায় লালায়িত ছিল, আর চন্দ্রশেখর অগাধ জল-রাশি লইয়া উদাসীন, নির্ম্মমের মত সম্মুখে দণ্ডায়মান। এক ফোটা জল পিপাসার অধরে ঢালিয়া দিলেন না। জ্ঞানী চন্দ্রশেখর সব বুঝিয়া এমন আচরণ করিলেন, আর জ্ঞান-হীনা অন্যগতপ্রাণা দুর্দ্দমচিত্তা হতভাগিনী অবলা কি করিবে?

শৈবলিনীর সাময়িক সহচরী সুন্দরী ছিল সত্য, কিন্তু সে শৈলবালার মত ছিল না, ইহাও সত্য। আর শৈবলিনীর মনের কথাও সে জানিত না, কি কালসাপ তার বুকের মধ্যে পোষা ছিল, তাহা জানিবার সম্ভাবনা কাহারও ছিল না। শৈবনিলীর গৃহত্যাগের পর সুন্দরীকে যেমন ভাবে তার উপকারিণী দেখি, তাহাতে নিশ্চয় বলা যায় যে, সুন্দরী যদি গোড়া হইতে তার চিকিৎসার ভার লইত, তবে বুঝি এমনটী না ঘটিলেও পারিত।

যুবতী শৈবলিনী ভাদ্রের দুকূল-ভরা গঙ্গার আকুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস বুকে করিয়া কেন সরসীর মত স্থির থাকে নাই? আকাঙ্ক্ষাভরা দুঃখ-তাপ-জীর্ণ তার হৃদয়-তন্ত্রীতে কেন সুখ-সঙ্গীত বাজিয়া উঠে নাই? অগ্নিদগ্ধতার জীবন-মরুর দিগ্দাহী প্রান্তরে বাসন্তী শোভার কমনীয় বিকাশ, স্বপ্নালস সমীরণের মৃদুল-ক্রীড়া কেন দেখা যায় নাই? ইহার উত্তর কি দিব?

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে ছায়াপথের মত, জীবন মৃত্যুর-সন্ধিস্থলে মুমূর্ষুর মত শৈবলিনী দণ্ডায়মানা ছিল। তাহার গৃহত্যাগ, ধর্ম্ম, সমাজ, হৃদয়—সকল দিক্ দিয়াই ঘৃণিত। দুর্ব্বলপ্রকৃতি রমণীর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় আত্মহত্যার মত ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। দুদণ্ডের মেঘে ঢাকা প্রশান্ত পূর্ণ-চন্দ্রের শোভা উপেক্ষা করিয়া শৈবলিনী মূঢ় পথিকের মত আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিল। তার পর দুর্গন্ধ জলাভূমির ধারে আসিয়া আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল।

অন্ধ সূর্য্যের মহিমা বুঝে না। শৈবলিনীও চন্দ্রশেখরের যথার্থ পরিচয় পাইল না। এদিকে ফষ্টর সাহেব লোকজন শিবিকা পাঠাইয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেল। "প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল"। এইখানে প্রভাত বায়ুর বর্ণন। বড় মধুর ও প্রস্তুতোপযোগী। প্রতাপের উপর শৈবলিনীর প্রেম প্রথম প্রভাত-বায়ুরই মত মধুর ছিল। তখন বাল্যহৃদয়ে সে প্রেম একটী কোমলগন্ধ, মৃদুলস্পন্দন ঝঙ্কারময়ী কবিতার সৃষ্টি করিল। ক্রমে তাহা জোর বাতাসরূপে দেখা দিল। কৈশোর হৃদয় তাহাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহা ঝটিকার আকার ধারণ করিল। তখন তাহার কি গর্জ্জন! সে গর্জ্জনের সহিত হৃদয়-নদী গর্জ্জিয়া উঠিল। তরঙ্গশ্রেণী ফুটিয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ধৈর্য্যতরণী বুঝি আর রক্ষা হয় না।

সুন্দরী নাপিতানী বেশে শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য নৌকায় তার সহিত সাক্ষাৎ করিল। কালামুখী শৈবলিনী গৃহে ফিরিতে চাহিল না। গৃহে যখন সুখ নাই, তখন কলঙ্কের পশরা মাথায় করিয়া কোন্ মুখে সে ফিরিবে? কাশী গিয়া বাস করিবে, রাজ-ধানীতে মুঙ্গেরে গিয়া ভিক্ষা করিবে। আর না হয় জলে ডুবিয়া মরিবে! শৈবলিনীর ইহা মিথ্যা কথা। সে মরিতে চাহে না। প্রতাপকে চক্ষুর উপরে জলে ডুবিতে দেখিয়াও যে মরে

নাই, সে কখনই মরিতে পারিবে না। আর যে উচ্চাশা, যে পাপময়ী বাসনা, যে হৃদয়-কুসুমশোষী তৃষা শৈবলিনীয় অন্তরে এতদিন অস্ফুট ছিল, আজ তাহা নগ্ন হইয়া দেখা দিল। আত্মদমনে অনভ্যস্তা শৈবলিনীর পাপ-হৃদয় এক সুখের কল্পনায় নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। সে কি মরিতে পারে? আশা থাকিতে মানুষ মরে না; বিশেষ অত বড় অসম্ভব আশায় যার হৃদয় লালায়িত।

ফষ্টরের কবল হইতে প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল। ভৃত্য রামচরণ প্রতাপের গৃহেই তার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। প্রতাপ তাহা জানিত না। হঠাৎ ঘরে যাইয়া প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকলে স্থির শ্বেত বারিবিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত-পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরা-ইতেই পারিল না। * * * অনেক দিনের কথা মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

"এ কি এ" বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন সংজ্ঞা ফিরিল, তখন শৈবলিনীর হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল। তাহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপি-তেছিল, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছিল"।

পাঠক দেখুন, শৈবলিনীর হৃদয়ের অবস্থা সে সময়ে কিরূপ হইল। তার পর প্রতাপ যখন "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই" বলিয়া গালি দিলেন, তখন শৈবলিনীর গর্ব্বিত নারীহৃদয় কতখানি দমিয়া গেল, পাঠক তাহা বুঝুন। তখন সেই স্বার্থপর তেজস্বিনী নারী প্রায় বাষ্পগদগদ হইয়া বলিল * * * "আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন?"

"উত্তরে তোমার মরণই ভাল" শৈব-লিনীকে ইহাও শুনিতে হইল। সে আঘাত সহ্য করার মত শক্তিও তখন তাহার ছিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথসুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? কাহার জন্য দুঃখিনী হই-য়াছি? কাহার জন্য আমি গৃহ ধর্ম্মে মন রাখিতে পারিতাম না? তোমার জন্য! তুমি আমাকে গালি দিও না।

প্রতাপ তাহা শুনিল। অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কি সংযম! এত বড় সংযমের পার্শ্বে শৈবলিনীর অসংযম বড় বেশীরকম ফুটিয়াছে। অভাগিনী এতদিন যে আগুনে অহর্নিশি পুড়িতেছে, আজ তাহার শান্তি হউক, নতুবা হৃদয় পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া যাক্। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অন্তরের রুদ্ধ প্রবাহ খর বেগে ছুটিয়াছে। প্রতাপকে শেষ জানাইল যে "তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি তাহাকে পাইতে পারে—এই আশায় সে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে, নহিলে ফষ্টর তাহার কে?"

প্রতাপ সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তির মত পলা-ইয়া গেল। শৈবলিনীর এতদিনের আশার রামধনু চিরদিনের মত হৃদয়াকাশ হইতে মিলাইয়া গেল। আবাল্য-পোষিত বাসনার আজ উচ্ছেদ হইল। এইবার শৈবলিনীর মরিবার ইচ্ছা জন্মিল। তখন তার মনে পড়িল, সেই বেদগ্রাম, পতি-গৃহ, তথায় সেই স্বহস্ত-রোপিত করবী বৃক্ষ, সেই পরিষ্কৃত তুলসী-মঞ্চ। প্রতাপের চক্ষে সে পাপিষ্ঠা,—শৈবলিনীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। নীরবে সে

অনেক কান্না কাঁদিল। তার অন্তর-নদীতে তখন দুর্দ্দম উন্মত্ত বিকারের বন্যাস্রোত সরিয়া গিয়াছে, কতকগুলি অনুশোচনার প্রস্তরখণ্ড মাত্র তথায় পড়িয়া আছ।

শৈবলিনীর স্বামীর কথা মনে পড়িল। তাহার চলিয়া আসার জন্য তাহার স্বামী কি মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন? না—না—গ্রন্থই তাঁহার সব। তিনি দুঃখ পাইবেন কেন?

প্রত্যাখ্যাতা নারী পদাহতা সর্পীর মত প্রণয়াস্পদকে দংশন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। অথচ শৈবলিনীর কৈ তেমন রাগও ত হইল না। শৈবলিনী এ দিকে এত নীচ-হৃদয়া রমণী ছিল না। তার পর প্রতাপ তাহার উদ্ধারের জন্যই ইংরাজের হস্তে বন্দী। সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। না হইল শৈবলিনীর হৃদয়ে প্রত্যাখ্যানের কি ফল ফলিত, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। শৈবলিনী ঘটনাচক্রে কর্ম্মচারীদের ভুলে নবাব মীরকাশেমের মুঙ্গেরস্থ কেল্লায় আনীত হইল। প্রতাপের উদ্ধারের জন্য সে নবাবের নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিল। পাপিষ্ঠার পাপ-বাসনার এখনও সম্যক বিলীন হয় নাই; তাই সে অম্লানবদনে প্রতাপের পত্নীরূপে আপনাকে পরিচিতা করিল। এত দিনের আশা পূর্ণ হইল না, তাহার সব দর্প ভাসিয়া গেল. কাতর ক্রন্দনে, উচ্ছল অশ্রুতে কোন কাজই হইল না, তবু সে মনে মনে প্রতাপের প্রণয়িনী,প্রতাপের স্ত্রী ভাবিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তা হইল। এ পরিচয় দিয়া তবু তার অতৃপ্ত বাসনা-বহ্নি কতকটা শান্তিলাভ করিল।

শৈবলিনী যে প্রকৃত প্রণয়ের মূল স্বার্থ-ত্যাগের জন্য প্রতাপের উদ্ধারে ব্রতী হইল, ঠিক তাহা নহে। সে কেন গেল, সে-ই ঠিক তাহা জানিত না। যার চক্ষুতে সে পাপিষ্ঠা, যে তাহার হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া তাহা নিভাইবার চেষ্টা পাইল না, তার জন্য শৈবলিনী অসমসাহসিক কার্য্যে কৃতসংকল্প কেন? উপকারের প্রত্যুপকার আছে, কৃতজ্ঞতার ফল আছে, সে প্রচ্ছন্ন আশায় সে কি কার্য্য করিতেছে? না—তাহার জন্য বন্দী বিপদ্‌গ্রস্ত প্রণয়াস্পদের দুঃখে কাতর হইয়াই সে এই যত্ন লইতেছে?

তার পর বুদ্ধিমতী শৈবলিনীর কৌশলে প্রতাপ উদ্ধার পাইল। দুজনে তখন ভগীরথী বক্ষে সাঁতার দিয়া ইংরাজের নৌকা ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল। প্রতাপ যে দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছিল, তাহার কাছে ক্ষুদ্র নদীতে এ সাঁতার তুচ্ছ। শৈবলিনী ভাবিল, অতল জলে সে ভাসিতেছে, এ নদীর তল নাই। প্রতাপ শৈবলিনীর বিবাহের পর হইতে তার চিন্তা পাপ বলিয়া ভাবিত। একে পরস্ত্রী, তার উপর জীবনদাতা গুরুবৎ পূজ্য চন্দ্রশেখরের স্ত্রী। প্রতাপের মত তিতিক্ষা সাধু মহাত্মাদিগের মধ্যেও বিরল। তাই সে অন্তরের বালুস্তুপের মধ্যে বহমান অতল-স্পর্শ প্রণয়ের ফল্গু-প্রবাহ কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, শৈবলিনীর উপর তার কোন প্রীতি নাই, বরং সে সর্পের মত ভয়ে তার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাহে, এইরূপ ভাবই প্রতাপ দেখাইত। আজ কি ভাবিয়া প্রতাপ শৈবলিনীকে কতকদিন পরে "শৈবলিনী শৈ!" বলিয়া ডাকিল।

"সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল। প্রতাপ ডাকিল "শৈবলিনী শৈ"।

শৈবলিনীর হৃদয় চমকিয়া উঠিল। * * শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে চক্ষু

মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী মানিল"। শৈবলিনীর তখন আত্ম-বিস্মৃতির ভাব। তাহা স্বপ্ন কি জাগরণ, সে উদ্বোধই নাই। এ সুখ-স্রোতে সে ভাসিতেই চাহে, এ প্রেমের এ স্বপ্নে, আবেশের এ ঘুম-ঘোরে ডুবিয়া থাকিতেই চাহে। পাছে এ নূতন স্বর্গ-সুখের বিচ্ছেদ ঘটে, তাই শৈবলিনী চক্ষু চাহিল না। বহু দিনের স্মৃতি-সাগর মথিত করিয়া আরাধনার ধন অমৃত মিলিবার উপক্রম হইয়াছে; শৈবলিনী চক্ষু চাহিবে কি?

"সে চক্ষু বুজিয়া কহিল—এ মরা গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন?"

শৈবলিনীর দগ্ধহৃদয়-মরুভূমে মরুস্থান দেখা দিল, গঙ্গার জলে তখন যোলকলা চাঁদ হাসিতেছিল। শৈবলিনীর বোধ হইল, চির নিরাশার অন্ধকারে নিমগ্ন প্রাণের মধ্য হইতে অতীত সুখ-স্মৃতির বিজলীছটা খেলিয়া যাইতেছে।

চাঁদের না সূর্য্যের?—প্রতাপ কহিল। শৈবলিনী যাহা চন্দ্রকরের মত শীতল ভাবিল, প্রতাপ দেখিল, তাহা নিদাঘ সূর্য্য-রশ্মির মত তীব্র। চাঁদের কিরণ গঙ্গার জলে ছড়াইয়া আছে, প্রতাপের নিকট তাহা আর চাঁদের কিরণ নহে। প্রতাপ আজ যে কঠোর সংকল্প স্থির করিয়াছে, তাহা ঐ সূর্য্যকিরণের মতই ভাস্বর, সেই আলোকই আজ তাহার নূতন জীবন আনিয়া দিবে, যত কিছু পাপপুঞ্জ, আঁধার রাশির মত দূর করিবে। দুঃখ যাতনার পর সুখের দিন হাসিবে।

তারপর প্রতাপ তাহার মরণ বাঁচন শুভাশুভের জন্য শৈবলিনীকে দায়ী করিয়া অতি-ভয়ানক শপথের কথা উল্লেখ করিল। সে শপথ শৈবলিনীর নিকট অতি ভয়ানক। এ শপথ না করিলে প্রতাপ ডুবিবে। প্রতাপকে সে ভালরূপই জানে। শৈবলিনীর জীবন-নদীতে এই প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। শৈবলিনী ভাবিল "আমি মরি ক্ষতি নাই, তাহার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?"

শৈবলিনী আজ প্রতাপকে ভুলিবার প্রতিজ্ঞা করিল। প্রতাপের চিন্তা পর্য্যন্ত সে করিবে না—এই প্রতিশ্রুতি ছিল। শৈবলিনী আজ হইতে মরিয়া গেল।

শৈবলিনী দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীবের মত প্রতাপের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইল। এই যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া সে রণে ভঙ্গ দিল। ক্ষত-বিক্ষত চরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্তা, পিপাসাপীড়িতা শৈবলিনী উপল-ব্যথিত পদক্ষেপে পর্ব্বত পথে চলিতে লাগিল। লতা-গুল্ম শিলারাশির মধ্য দিয়া গভীর অন্ধকার-ময়ী রজনীতে একাকিনী রমণী অনিশ্চিত লক্ষ্যে ছুটিল। শৈবলিনীর মনের বেগ ভাল দিকেই হউক আর মন্দ দিকেই হউক, বরাবরই এমনই দুর্দ্দম, এমনই প্রখর। এক এক জাতীয় প্রকৃতিই আছে, নামিবার সময়েও যেমন খরগতি, উঠিবার সময়েও তেমনই ক্ষিপ্রগতি। শৈবলিনীর প্রকৃতিও এই জাতীয় ছিল।

তারপর শৈবলিনীর পুনর্জ্জন্ম আরম্ভ হইল। অভিনব জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখা দিল। পুরাতন জীবন জীর্ণ পরিচ্ছদের মত খসিয়া পড়িতে লাগিল। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের নাশ হইলে পুণ্যশ্রী ফুটিয়া উঠে। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের সূচনা হইল।

শৈবলিনীর এই জীবেনই নরক-ভোগ

হইতে লাগিল, অবশ্য এ ভোগ মানসিক। আমাদের শাস্ত্রেও বলে,স্বর্গ নরকভোগ সংকল্পমূলক। অপার্থিব মানস সুখ দুঃখের যে স্থানে ভোগ হয়, সেই স্থানই স্বর্গ নরক। মানস ব্যভিচারিণী শৈবলিনী অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। পাপিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে দেবীত্বে উপনীত হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশ মত কঠোর সাধনা করিল।

গুরুর কৃপায়, সাধনার বলে, প্রায়শ্চিত্তের ফলে শৈবলিনীর পাপ দূর হইল। নিষ্পাপ জীবনে ক্রমে ক্রমে দিব্যদৃষ্টি ফুটিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিল—

"* * * এই দীর্ঘ শালতরু-নিন্দিত, সুভুজ-বিশিষ্ট সুন্দর গঠন, বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট, প্রশস্ত, চন্দন-চর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন; ইহার কাছে প্রতাপ? ছিঃ ছিঃ সমুদ্রের কাছে গঙ্গা?"

তার পর শৈবলিনী নিজের সহিত তুলনা করিতে লাগিল "সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তার কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি,অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?"

শৈবলিনীর চিত্তে প্রতাপের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া চন্দ্রশেখরের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। "জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিনী নদী অন্যথাদে চালান যায়—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিরপ্রবাহিনী নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।"

কঠোর প্রায়শ্চিত্তে, সাধনার বলে, গুরুর কৃপায় ও যোগশক্তির মাহাত্ম্যে অসাধ্য সাধন হইয়া গেল। আমাদের শাস্ত্রেরই উক্তি, জীবের নরক ভোগের পর পাপাবশেষ স্বরূপ পরজন্মে কুষ্ঠাদিরোগ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে এক স্থূলদেহেই স্বর্গ নরক এবং পাপাবশেষের ফলস্বরূপ কুষ্ঠাদি রোগেরও ভোগ দুইই হইয়া গেল। যোগবলে উন্মাদ রোগ দূর হইল, শৈবলিনীর অন্তর ত প্রায়শ্চিত্তের পর বিশুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে জন্মান্তরীণ পাপাবশেষের ফলস্বরূপ উন্মাদ রোগ আরোগ্য হওয়ায় দেহ পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইল। যোগপ্রক্রিয়ার বলে শৈবলিনীর মুখ হইতে অতীতের সত্য প্রকাশিত হইল, সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ ঘটিল।

তৎপরে প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল--"যতদিন তুমি এপৃথিবীতে থাকিবে, আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার। কতদিন বশে রাখিব, জানি না।" এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

খটকা থাকিয়া গেল—"এ জন্মে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" তবে কি শৈবলিনী পরজন্মে লোকান্তরে প্রতাপের আশা রাখে? না—সে আশা শৈবলিনী রাখে না। এ জন্মে সাক্ষাৎ করিও না। নিষেধটী কেবল ইহজন্মের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। লোকান্তরে বা পরজন্মে বিধিও নাই, নিষেধও নাই। নিষেধ নাই বলিয়া যে "সাক্ষাৎ করিও" এই বিধি রহিল, তাহা বুঝিলে শৈবলিনীর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। শৈবলিনীর হৃদয়ে প্রতাপ, মূর্ত্তি বিসর্জ্জন হইয়া

গিয়াছে, চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লবঙ্গলতার মত যে পরজন্মে অন্যের আশা তার অন্তরে বলবতী ছিল না, শৈবলিনী সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে।

শৈবলিনী-চরিত্রে বিশেষত্ব ছিল,দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার ও শিখিবার কিছু ছিল, তাই অমর কবি এই চিত্র আঁকিয়াছেন। পাপ পুণ্যের সংসর্গে পুণ্যের আকার ধারণ করে, ইহা আমরা জানিনা, কারণ পাপ চিরদিনই পাপ। কিন্তু পাপ-পুণ্যময়ী মানব-প্রকৃতি যে পুণ্যের সংসর্গে, পুণ্যবানের মাহাত্ম্যে পুণ্যময়ী হইয়া উঠে, ইহা নিশ্চয়। সে সময়ে পাপ ফুটে না, সত্ত্ব প্রবল হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া দেখা দেয়।

প্রতাপ আপনার অন্তর্নিরুদ্ধ ভালবাসার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। মৃত্যুকালে রামানন্দস্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া আপনার হৃদয় হইতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর সেই মহাবীর সংযমের দেবতা স্বর্গে চলিয়া গেল। পাছে মৃত্যুকালে শৈবলিনীর ক্ষীণ আশাও পোষণ করিয়া রাখে, পাছে সে লালসার সূক্ষ্মাংশও সংস্কাররূপে লইয়া যায়—তাই প্রতাপকে রামানন্দস্বামী জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "শত শৈবলিনী সেখানে তোমার পদপ্রান্তে গড়াগড়ি দিবে।"

শৈবলিনী নিষ্পাপা, শুদ্ধচিত্তা হইয়া চন্দ্রশেখরের সেবায় মন দিল, সতী রমণীর গত স্বামীর গৃহ-সংসার আপনার পূজার মন্দির করিয়া লইল; পতি-দেবতার চরণ-পীঠে মন প্রাণ নিয়োজিত করিয়া সুখে দিন কাটাইত লাগিল।

শৈবলিনী-চরিত্রে ভাল-মন্দ-মিশান একটী সর্ব্বজন হইতে অতিরিক্ত বিশেষত্ব ছিল। যাহা পাপের পিছল পথে হু হু করিয়া নামাইয়াও দিয়াছিল, আবার পুণ্যের স্বর্গের উপর তর তর করিয়া উঠাইয়াও দিয়াছিল। সাধারণতঃ এই ধরণের চরিত্র, শৈবলিনীর অনুরূপ চিত্র বড় একটা দেখা যায় না। মোট কথা, এই চরিত্রে শিক্ষনীয় কিছু আছে, যেজন্য ইহার বিশ্লেষণ এতখানি যত্ন পাইলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

দীর্ঘ নিদ্রা।

দীর্ঘ নিদ্রা, মহানিদ্রা নহে। দেশভেদে শীতকালে অথবা গ্রীষ্মকালে বহু প্রাণী ঘুমাইয়া পড়ে এবং সমস্ত ঋতুটাই ঘুমে কাটাইয়া দেয়। তিন চারিমাস ঘুমে অচেতন থাকিতে হইলে কোথাও খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে যে হয়, * নতুবা অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত। সকল প্রাণী দীর্ঘ নিদ্রার অভিভূত হয়, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নিজ দেহের কোন স্থানে আহার্য্য বস্তুর সার সঞ্চয় করে, তৎপর দীর্ঘ নিদ্রাগত হয়; তখন ঐ সারবস্তু দ্বারা তাহার দেহ রক্ষা হইয়া থাকে। কোন কোন দীর্ঘ-নিদ্রাগ্রস্ত প্রাণী বাস-স্থানেও আহার্য্য বস্তু সঞ্চিত করিয়া রাখে; মাঝে মাঝে জাগ্রত হইয়া তদ্দারা জীবন রক্ষা করে। কোন কোন বানর লেজে এত অধিক চর্ব্বি সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত হয় যে, নিদ্রিত অবস্থায় ঐ চর্ব্বি দ্বারাই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়; যখন সে জাগ্রত হয়, তখন তাহার লেজ

* Migration.

আর মোটা থাকে না, ক্ষীণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে এতদ্দেশে কথায় বলিত, "ব্যাটার ভারি ন্যাজ মোটা হইয়াছে।" কেহ কাহারও সহিত গর্ব্ববশতঃ মন্দ ব্যবহার করিলে, কিম্বা কাহাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিলে ঐ বাক্য ব্যবহৃত হইত। ইহার অর্থ এই যে, সে ব্যক্তি এখন শীঘ্রই বিপদে পড়িবে; যেমন বানরের লেজ চর্ব্বি সংযোগে মোটা হইলেই সে দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

দেহে আহার্য্য বস্তুর সার সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘ নিদ্রিত হইলে ঐ সার গ্রহণ করিয়াই জীব মৃত্যু হইতে রক্ষিত হয়।

যে সকল প্রাণী দীর্ঘ নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ে, প্রকৃতপক্ষেও তাহাদিগের বাসস্থানে খাদ্যবস্তুর অভাব হইতে দেখা যায়। যাহারা যে দেশে শীত ঋতুতে ঘুমায়, সে দেশে ঐ ঋতুতে তাহাদিগের খাদ্যবস্তুর অভাব হয়; তদ্রূপ যে সকল প্রাণী গ্রীষ্মকালে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাদিগের খাদ্যের অভাব গ্রীষ্মকালেই হইয়া থাকে। যদি এই সকল প্রাণী আহার অন্বেষণ নিমিত্ত দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ * করিতে জানিত, তাহা হইলে সেই উপায়েই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু যে সকল প্রাণী দেশান্তর ভ্রমণ করে না, তাহারাই দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত হইয়া আত্ম রক্ষা করে।

যে সকল প্রাণী দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় প্রাণীর নাম নিম্নে উল্লেখ করিলাম। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অনেক অল্প সংখ্যক প্রাণী দীর্ঘ-নিদ্রাগত হয়।

১। বড় মাছি (Dragon fly)। ইহাদিগের ডিম্ব এক কিম্বা দেড় মাস কোনই খাদ্যগ্রহণ করে না; যেন স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

* Migration.

২। মশা। ৩। মাছি। শীতকালে দীর্ঘ নিদ্রিত হইয়া কোথায় পড়িয়া থাকে, ইহাদিগকে প্রায় দেখাই যায় না। ছোট মাছিই অধিক নিরুদ্দেশ হয়।

৪। মাকড়সা।

৫। কেন্‌লে (Centipedas) কোন কোন অঞ্চলে কেল্লে বলে, কোথাও কেন্দাই বলে।

৬। বিছে। ৭। বিষাক্ত বিছে। ইহাদিগকে কোন কোন অঞ্চলে চেল্লা বলে। ৪।৬নং কোন কোন দেশে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ-নিদ্রায় পতিত হয়।

৮। গোবরে পোকা। ৯। তদ্রূপ কঠিন পূর্ব্বাবরণযুক্ত কতিপয় পোকা।

১০। শম্বুক। ১১। গুগ্‌লি প্রভৃতি।

১২। টিকটিকি, গিরগিটি এবং এই শ্রেণীর কয়েকটী জীব।

১৩। ভেক, ছোট ও বড়। একবার আমি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত বিজয়-নগর গিয়াছিলাম। সেখানে কঠিন মাটীর প্রায় আধ হাত নীচে অতি স্বচ্ছ, এবং জলপূর্ণ Ranavulgaris জাতীয় একটী ভেক পাওয়া গিয়াছিল। উহার দেহমধ্যস্থ সমস্তই দেখা যাইতেছিল। কোদালির আঘাতে লাফাইয়া সমভূমিতে পতিত হইবা মাত্র উহার দেহের জল অনেক বাহির হইয়া গেল এবং তখনই ভেকটীও মরিয়া গেল। ঐ ভেক নিশ্চয়ই ৪।৫ মাস মাটীর নীচে জড়বৎ বাস করিতেছিল। যেন পাঞ্জাবের হরিদাস সাধু।

১৪। সর্প। শীতকালে দেখাই যায় না।

১৫। কাছিম।

১৬। মৎস্য। অনেক সময় পুকুরে মাছ ভাসিয়া উঠিয়া মৃতবৎ থাকে। আমি একবার দেখিয়াছি, উহারা মরে নাই;

স্তম্ভিত হইয়াছিল। কতিপয় শ্রেণী দীর্ঘ নিদ্রিত হয়, সকলে হয় না।

১৭। সজারু। ১৮। ইন্দুর।

১৯। বাছড়। কোন কোন শ্রেণীস্থ বাছড় গ্রীষ্মকালে, কেহ বা শীতকালে দীর্ঘ নিদ্রিত হয়। উহারা অনেক সময় গাছের ডালের সহিত দলে দলে ঝুলিতে থাকে, প্রায় অচেতন। ধরিতে গেলে উড়ে না। কোন কোন শ্রেণীর বাছড় দীর্ঘ নিদ্রাগত হয় না।

২০। মর্কট। ২১। বানর (কতিপয় শ্রেণীস্থ)।

২২। মানুষ। এই জীবের মধ্যে দীর্ঘ নিদ্রা প্রায় নাই। কেবল ইউরোপীয়, রুষিয়ার Pskov প্রদেশের কৃষকগণের সম্বন্ধে শুনা যায় যে, তাহারা আধ ঘুমে শীত ঋতুর প্রায় অর্দ্ধেক কাটাইয়া দেয়। ইহাদিগের সমাজে প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ রীতি আছে যে, প্রথম বরফ পড়িতে আরম্ভ হইলেই ইহারা গৃহের দ্বার বন্ধ করে, এবং শীত থাকা পর্য্যন্ত আর বাহিরে আসে না। দ্বার বন্ধ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এবং পালা করিয়া এক একজন জাগিয়া থাকিয়া অগ্নি জ্বালিয়া রাখে, অপরে নিদ্রা যায়। যাহারা ঘুমায়, তাহারা দিনে একবার মাত্র জাগে এবং একটু শুষ্ক রুটী খাইয়া তখনই আবার নিদ্রামগ্ন হয়। এইভাবে শীতকাল কাটাইয়া দেয়। *

লক্ষণ—প্রাণীগণ দীর্ঘ নিদ্রাগত হইলে তাহাদিগের যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। (১) দীর্ঘ নিদ্রাকালে উহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়; (২) রক্তের গতি কমিয়া যায়; (২) দেহের তাপ চতুপার্শ্বস্থ তাপের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঠিক সম-অনুপাতে নহে; (৪) স্নায়ুঃমণ্ডল সুতরাং মস্তিষ্ক কিছু দুর্ব্বল হয়; (৫) পেশী সকল (বিশেষতঃ ডানদিকের হৃৎপিণ্ডের পেশী) উত্তেজিত হয়; (৬) আহার ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়; (৭) ইন্দ্রিয়গণ স্তম্ভিত হয়, স্ব স্ব কর্ম্ম করে না; (৮) মনোবৃত্তি, বুদ্ধি-বৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। আত্ম রক্ষা বৃত্তি জীব-সমাজে এত প্রবল; কিন্তু তাহাও দীর্ঘ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে না। (৯) দীর্ঘ নিদ্রায় স্তম্ভিত, প্রায় অচৈতন্য (যেন ধ্যানমগ্ন) অবস্থা * কাটিয়া গেলে জীবগণ যখন পুনরায় চৈতন্যলাভ করে, তখন তাহাদিগের পূর্ব্ব-স্মৃতি ফিরিয়া আসে। এই সকল লক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক; পশ্চাৎ অন্যভাবে ইহাদিগকে করিতে হইবে।

কারণ—পূর্ব্বে বলিয়াছি, আহারের অভাব হইলে, যে সকল প্রাণী দেশান্তর ভ্রমণে অভ্যস্ত নহে, তাহারা দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া দেহ-সঞ্চিত চর্ব্বি ইত্যাদি সার বস্তু দ্বারা জীবন রক্ষা করে। এই উপায়ে জীবন রক্ষা না করিলে তাহারা মরিয়া যাইত, কারণ তাহারা অন্যত্র গিয়া আহার অন্বেষণ করে না। সুতরাং তাহারা দীর্ঘ নিদ্রিত হইয়া জীবন রক্ষা করে। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘ নিদ্রার আর একটী কারণ দেখা যায়। যে সকল প্রাণী দীর্ঘনিদ্রাগত হয়, তাহারা স্ব স্ব দেহের তাপ সকল ঋতুতে স্থির রাখিতে পারে না। সুতরাং শীতে দেহ-তাপ অত্যন্ত

*Ency : Brit : 11 Edition, vol XIII, Page 445.

* শীতকালীয় দীর্ঘনিদ্রা Hibernation; গ্রীষ্মকালীয় aestivation.

কমিয়া গেলে অথবা গ্রীষ্মে দেহ-তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহারা মারা যাইতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় থাকিলে আহারের অভাববশতঃ এবং দেহ তাপ স্থির রাখিতে না পারায় উহাদিগের মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দেহে খাদ্য বস্তুর সার সংগ্রহ করিয়া নিদ্রাগত হইলে লাভ এই হয় যে, এই উপায়ে সমস্ত ঋতুটা কাটাইয়া দিয়া সুসময় আগত হইলে পুনরায় জাগ্রত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। দেহ-তাপ বড়ই বিপজ্জনক পদার্থ, একটু বাড়িলেই জ্বর, একটু কমিলেই অবসাদ। সকলেই জানেন, মানবের দেহ-তাপ স্বভাবতঃ প্রচলিত-তাপ মানের (thermometer) ৯৮॥০ ডিগ্রী। একশত ডিগ্রী হইলেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল; ৯৬ ডিগ্রী হইলেও তাহাই। মানব চির-তুষারাবৃত দেশে দারুণ শীতের মধ্যেও বাস করিতেছে; এবং অত্যুষ্ণ মরু প্রদেশের নিকটেও বাস করিতেছে। এস্কুইমক্‌স্ জাতি গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের শীতে জমিয়া যায় না; নিগ্রো এবং টুরেগ জাতিও সাহারার মরুভূমিতে পুড়িয়া মরে না। উভয় স্থানেই মানবের দেহ তাপ স্বভাবতঃ (অর্থাৎ সুস্থ থাকিলে) ৯৮॥০ ডিগ্রী থাকে। মানবের দেহ তাপ সকল ঋতুতেই এবং সকল দেশেই সমান অথবা প্রায় সমান থাকে বলিয়াই মানব সর্ব্বত্র বাস করিতে পারে। নতুবা গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে তাহার রক্ত বরফের মত জমাট হইত, এবং সাহারা গরম জলের মত ফুটিতে থাকিত। হতভাগ্য মানব উভয় অবস্থাতেই মারা যাইত। * কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মানবের দেহ-তাপ স্থির থাকে; সুতরাং সে আহারান্বেষণের নিমিত্ত নানা স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস করিতে পারে। যাহারা আহারের অভাব হইলেও নানা স্থানে যায় না, তাহারা বাঙ্গালীর মত নানা পীড়ায় দুর্ব্বল হয় এবং দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমরা বলিয়াছি, যে সকল প্রাণী আহারের অভাব হইলে দেশান্তর ভ্রমণ † করে না, এবং শীত ঋতুতেও গ্রীষ্মকালে দেহ-তাপ-স্থির রাখিতে পারে না, তাহারাই দীর্ঘ নিদ্রাগত হইয়া জীবন রক্ষা করে। মানব দেশান্তরেও যায়, দেহ-তাপও স্থির রাখে। সুতরাং সে দীর্ঘ-নিদ্রাগত হয় না। তথাপি রুষিয়ার Pskov প্রদেশের কৃষকগণ কতক পরিমাণে দীর্ঘ নিদ্রার অনুকরণ করিয়া অর্দ্ধেক শীত ঋতু জড়বৎ পড়িয়া থাকে। সুতরাং দীর্ঘনিদ্রিত হইবার শক্তি এবং অভ্যাস মানব জাতি মধ্যেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এ নিমিত্ত চেষ্টা দ্বারা মানব এই অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

উপরে যে সকল দীর্ঘ-নিদ্রাগ্রস্ত প্রাণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে পক্ষী শ্রেণীর নাম নাই; ইহার কারণ কি? পক্ষীর দেহ-তাপ স্বভাবতঃই অধিক; সে দেহ-তাপ স্থির রাখিতেও পারে। সুতরাং মানবের ন্যায় তাহারও দীর্ঘ নিদ্রাগত হইবার প্রয়োজন হয় না। সরিসৃপ জাতি (ভেক, সর্প ইত্যাদি) দেহ-তাপ স্থির রাখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; সুতরাং ইহারা সর্ব্বত্রই দীর্ঘ-নিদ্রায় পতিত হইয়া দুই তিন মাস জড়বৎ পড়িয়া থাকে। উপরে নামের তালিকা মধ্যে ইন্দুরের নাম দেখা যাইতেছে, কিন্তু ছুঁচোর নাম নাই। ইহার কারণ কি?

* আমি এস্থলে বস্ত্র ব্যবহার, বহ্নি-সেবন, ব্যজন, বরফ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কৌশলের কথা বলিতেছি না।

† Migration.

ছুঁচো ইন্দুর অপেক্ষা মাটীতে অধিক গভীর ও অনেক বিস্তৃত গর্ত্ত করিতে পারে; সুতরাং তাহার আহার্য্য বস্তুর (পোকা ইত্যাদির) বেশী অভাব হয় না। এ নিমিত্ত দীর্ঘ নিদ্রারও বিশেষ আবশ্যক হয় না। সকল শ্রেণীর বাদুড়,সকল শ্রেণীর পোকা,সকল শ্রেণীর মৎস্য দীর্ঘনিদ্রাগত হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে এক শ্রেণীর জীব মধ্যেই কোন প্রকারের জীব দীর্ঘনিদ্রাগত হয়। অন্য প্রকারের জীব হয় না; এবং দেশভেদেও এক জীব অথবা শ্রেণীস্থ জীব মধ্যেই এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়; অর্থাৎ কেহ একদেশে দীর্ঘ নিদ্রাগত হয়; অন্য দেশে হয় না। কিন্তু যাহাদিগের দীর্ঘনিদ্রায় পতিত হইবার অভ্যাস আছে, তাহাদিগের লক্ষণ সকলদেশেই প্রায় সমান। শ্বাস-রোধ, দেহতাপ ক্ষয়, রক্তের গতির ন্যূনতা, মলমূত্র ত্যাগ ও আহারের অনাবশ্যকতা, প্রায় অচৈতন্য অবস্থা ইত্যাদি লক্ষণ ন্যূনাধিক সর্ব্বদেশে এবং সকল প্রকারের দীর্ঘনিদ্রাগ্রস্ত প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়।

নিদ্রা ও যোগ।—এক্ষণে এই সকল লক্ষণ অন্য কোন অবস্থায় দেখা যায় কি না, তাহাই বিবেচনা করিব। যদি দেখা যায়, তবে সেই অবস্থার সহিত দীর্ঘনিদ্রার তুলনা করিব। সকল প্রাণীই প্রত্যহ নিদ্রিত হইয়া থাকে। কেহ অল্পক্ষণ, কেহ অধিকক্ষণ, প্রত্যহ নিদ্রা যায়। ইহাকে দৈনিক নিদ্রা বলিব। ইহার লক্ষণ সকল দীর্ঘনিদ্রার লক্ষণের প্রায় অনুরূপ। দৈনিক গাঢ়নিদ্রার সময়ে আমাদিগের (এবং সকল প্রাণীরই) রক্তের বেগ কমিয়া যায়; দেহের তাপ কিছু কমে; স্নায়ুমণ্ডল সুতরাং মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়; পেশীসকল কিঞ্চিৎ সবল হয়, আহার ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়, ইন্দ্রিয়গণ স্তম্ভিত হয়, স্ব স্ব কর্ম্ম করে না; নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসে। এইসকল এবং অন্যান্য লক্ষণ, দীর্ঘনিদ্রার অনুরূপ; কেবল গুরুতর প্রভেদ এই যে, দৈনিক নিদ্রায় শ্বাসকার্য্য চলিতে থাকে; দীর্ঘনিদ্রিত অবস্থার ন্যায় শ্বাস কার্য্য সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয় না।

যোগীগণ যোগে মগ্ন থাকিবার সময় তাঁহাদিগের কিরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে? তাঁহাদিগেরও তৎকালে শ্বাসকার্য্য সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ থাকে; * দেহতাপ ও রক্তের গতি কিছু কমিয়া যায়; ইন্দ্রিয়গণ স্তম্ভিত হয়; মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ † হয়; আহার এবং মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ থাকে; এবং যোগভঙ্গ হইলে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসে। সুতরাং,আধ্যাত্মিক লক্ষণ বাদ দিলে, দৈহিক এবং কতিপয় মানসিক লক্ষণ সম্বন্ধে যোগের সহিত প্রাণীগণের দীর্ঘনিদ্রার সাদৃশ্য আছে, ইহা স্বীকার করা যায়।

যোগে যে স্তম্ভিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার। কোন যোগীর অল্প উত্তেজনায় ধ্যান ভঙ্গ হয়; কাহারও অধিক উত্তেজনা না হইলে ধ্যান ভঙ্গ হয় না; কাহারও বা কোন প্রকারেই ধ্যান ভঙ্গ হয় না। দৈনিক নিদ্রারও তদ্রূপই অবস্থা। কেহ অল্প কারণেই জাগিয়া উঠে, কেহ অধিক উত্তেজনায় জাগে।

পক্ষান্তরে, দীর্ঘনিদ্রায়ও এইরূপই হইয়া থাকে। দীর্ঘনিদ্রাও স্বল্প এবং গাঢ় আছে; অধিকক্ষণ এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী আছে; অচৈতন্য অবস্থারও মাত্রা ভেদ আছে; সকলে সমান

* পাঞ্জাবের হরিদাস সাধুর দেহে এ সকল লক্ষণ ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল, এমত শুনিয়াছি। এবং তাঁহা জীবনচরিতে লিখিত আছে। †

অচৈতন্য হয় না। কোন প্রাণীকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায়, অঙ্গ কাটিয়া লওয়া যায়, তথাপিও চৈতন্য লাভ করে না এবং কহাকেও বা উত্তেজনাতেই জাগান যাইতে পারে, কেহ বা শীতের অল্প তাড়নাতেই জাগে এবং ক্ষুধা অনুভব করে, তৎপরে কিঞ্চিৎ আহার করিয়াই পুনরায় নিদ্রিত হয়।

সুতরাং এদিক হইতে বিবেচনা করিলে, দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা এবং যোগাবস্থা পরস্পরের সহিত তুলনীয় বিবেচনা হয়। লক্ষণ সকল প্রায় একপ্রকার, মাত্রায় কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। কেবল দৈনিক নিদ্রায় শ্বাস চলে; কিন্তু দীর্ঘনিদ্রায় এবং যোগে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়; এতদুভয়ে এই গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যোগের খেচরী মুদ্রা নাকি ভেক ও সর্প হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।* এ বাক্যের অর্থ যাহাই হউক, ভেক ও সর্পের দীর্ঘনিদ্রিত অবস্থার সহিত যোগের আংশিক সাদৃশ্য অনুভূত না হইলে এরূপ বাক্যের উল্লেখ হইতে পারে না। সুতরাং দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা এবং যোগের অনেকগুলি লক্ষণে মিল আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে; দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা এবং যোগনিদ্রা * যেন একসূত্রেই গ্রথিত, ইহারা কি এক হইতে অন্যে ক্রমবিকশিত? লক্ষণ সকলের সমতা, মাত্রভেদের সমতা, এবং এক হইতে অন্যটীর ক্রমিক বৃদ্ধি, এই সকল দেখিয়া ক্রমবিকাশ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এ বিষয় এখনও নিশ্চত মত দেওয়া সম্ভব নহে।

সে যাহা হউক, দীর্ঘনিদ্রা এবং যোগাবস্থার মধ্যে শারীরিক লক্ষণ সকলের এত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও, আধ্যাত্মিক ফলের এত প্রভেদ হয় কেন? একের ফল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, এবং অপরের ফল অনাহার মৃত্যু হইতে দেহ রক্ষণ। পরিণাম ফলের এ প্রভেদ কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইহার যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব উত্তর পরে দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশধর রায়।

অনুন্নত জাতি ও শিক্ষিত সমাজ।

১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট পড়িতেছিলাম;—গবর্ণমেণ্টের দপ্তর হইতে এত বিরাট আয়োজন-প্রসূত পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদ স্থান পাইবে, কেহই আশা করে নাই। এই সেন্সাস্ রিপোর্টে অনুন্নত জাতি বিশেষকে অত্যধিক হেয়ে পর্য্যায়ে আনিবার চেষ্টা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি! Mr. O'Malley স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই বিরাট পুস্তক লেখেন নাই।—তাঁহার সহকারী দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ সংবাদ সরবরাহ করিয়াছেন,—ভূমিকায় তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সংগৃহীত সংবাদের সত্য মিথ্যার জন্য তিনি

* ধ্যানমগ্ন অবস্থা।

† ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বেচারামবাবু সাপের পেট কাটিয়া একটী ভেক বাহির করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার জিহ্বা উল্টাভাবে তালুলগ্ন রহিয়াছে।

দায়ী নহেন। * (১)—কিন্তু তাঁহার শিক্ষিত সহকারিবর্গ কিরূপে জাতিবিশেষ সম্বন্ধে এরূপে অপ্রকৃত উক্তির প্রশ্রয় দিতে পারিলেন,—তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। যে সমস্ত অতি সাধারণ তথ্য দেশের আপামর সাধারণ অনবগত নহেন;—তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে ভ্রম করা—ইচ্ছা বা ঈর্ষাকৃত নহে ত কি বলিব?

আমার আলোচ্য বিষয় পোদজাতি। সেন্সস্ রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় (Table XVI) কতকগুলি নির্ব্বাচিত জাতির (Occupation by selected castes) জীবিকা সম্বন্ধে উক্তি প্রসঙ্গে পোদজাতির পরম্পরাগত জীবিকা (Traditional occupation) ধীবরবৃত্তি (fishermen) বলিয়া লিখিত হইয়াছে! ঐ পুস্তকের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় অনুরূপ প্রসঙ্গে (Vide Sudsidiary Table VIII) পোদজাতির জনসংখ্যার প্রতি-সহস্রে ৮৭১ জন মৎস্যজীবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শুনিতে পাই, স্থানবিশেষে জালিক পোদের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তাহারা কৃষিজীবী পোদের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবিহীন ও সংখ্যায় নগণ্য। আর এই নগণ্য সংখ্যার নামসাদৃশ্যের জন্য হাজার করা ৮৭১জন অর্থাৎ প্রায় ৫৩৬০০০ লোকের মধ্যে ৪৬৭০০০ জন মৎস্যজীবীতে পরিণত হইবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। পট্টিকারেরা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু তা' বলিয়া এই নাম মাত্র সাদৃশ্যের জন্য তাহাদিগকে প্রকৃত কায়স্থের পর্য্যায়ে আনিতে যাওয়া কখনই সমীচীন হইবে না। পোদ জাতি যে মাছ বিক্রয় করে না, চাষব্যবসাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা সকলে এতই অবগত আছেন যে, এস্থলে তাহার নজীর অনাবশ্যক। Traditional occupation বলিলে যদি বংশপরম্পরাগত বৃত্তি হয়, এবং বর্ত্তমান সভ্যতালোকে সম্মানিত আসন লাভের জন্য সমগ্র পোদ-সমাজ মাছ বেচিবার ব্যবসা ত্যাগ করে, তাহা হইলেও সেন্সাসের উক্তির সমর্থন-যোগ্য কিছুই দেখিতেছি না। প্রাচীন পুস্তকাদি পাঠ করিলে পোদজাতি বিশুদ্ধ কৃষিজীবী জাতি বলিয়াই সপ্রমাণ হয়, উহাদের জালিক-বৃত্তির পরিচয় কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য-কৃত প্রাচীন পুঁথি 'শিবায়ণ' বা 'শিবসঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভগবতী দারিদ্র্য নিবারণের জন্য মহাদেবকে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে বলায়, মহাদেব বলিতেছেন,—

"বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষা দুঃখে সুখে অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষে' বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যার নাহি তার ডর॥"

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ণ' রচনা কাল ১৬৬৪ শকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) সুতরাং প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে পোদজাতির কৃষিই জীবিকা ছিল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। সে সময় পোদজাতি সম্মানিত আসন লাভের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া 'শিবায়ণ-কারকে তাহাদিগের সম্বন্ধে

[১] "—I was not in a position to judge of the correctness or incorrectness of the reports received and errors may have been made." Page 233, para 520, Vol. I.

[১] "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "শিবায়ণের" ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এরূপ লিখিতে প্ররোচিত করে নাই, ইহা বিনা তর্কে বুঝা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কুল-গ্রন্থ "কুলতন্ত্রে"ও পোদদিগের কৃষিজীবিকারই সমর্থন রহিয়াছে। (২) 'প্রবাসী'তে "আর্য্য পৌণ্ড্রক" নামক প্রবন্ধে ষোড়শ শতাব্দীতে পোদজাতি সম্মানিত আসন পাইত, তাহা ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল" পুস্তকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদিত হইতে দেখিয়াছি। (৩) মৎস্যজীবী সম্মানিত আসন পায় না।

তারপর বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সেন্সাস্ রিপোর্টের স্থলবিশেষ পড়িলে পোদজাতি যে বিশুদ্ধ কৃষিজীবী, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি ঃ—

৫২১ পৃষ্ঠায় 'Castes classified to their traditional occupation' শীর্ষক Subsidiary Table I যে পোদজাতির ৫৩৬০০০ লোক কৃষিজীবী (cultivators including growers of special products) বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সমগ্র পোদজাতির জনসংখ্যা ৫৩৬৫৯০; তাহা হইলে এই উক্তি অনুসারে সমুদায় পোদই কৃষিজীবী শ্রেণীতে আসিতেছে। (৪) এই টেবেলের fishermen বা ধীবরবৃত্তি-জীবীর তালিকায (group vi) পোদজাতির নাম নাই। ৫৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এ প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের সমুদায় মৎস্যজীবী জনসংখ্যার অর্দ্ধেক বাগ্দী, এক অষ্টমাংশ মালো এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিদল্প জালিক কৈবর্ত্ত। অন্যান্য জাতির মধ্যে তিয়র, রাজবংশী ও নমঃশূদ্রের সংখ্যা অল্প নহে। (১) জানি না, অন্য কোনও রূপ অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া এই সমস্ত বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কিনা! (২)

এই পুস্তকের ২৩২ পৃষ্ঠার ৫১৯ প্যারায় কতকগুলি জাতির সাধারণ সংজ্ঞা নির্দ্দেশের জন্য কয়েকটী পর্য্যায় স্থির করিয়া কোন্ জাতি কোন্ পর্য্যায়ে পড়িবে, তাহা দেখান হইয়াছে। পোদজাতি এই তালিকায়— ৫ম, ৭ম, ও ৮ম পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পর্য্যায়গুলি নিম্নে লিখিত হইতেছে,—

(৫) উত্তম ব্রাহ্মণ যাহাদিগের কুল পুরোহিত নহেন।

(৭) যাহাদিগের সাধারণ হিন্দু দেব মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(৮) যাহারা স্পর্শ করিলে বা কিয়দ্দূর ব্যবধানবর্ত্তী হইলে অশুচি হয়। (৩)

৫ম পর্য্যায়ের উত্তম ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝিব? বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় উৎকল শ্রেণীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই পোদজাতিকে যাজনা করেন, তবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত জাতির পৌরোহিত্য জন্য তাঁহারা অন্য ব্রাহ্মণের সহিত অসংস্পৃষ্ট, এই যা বলিতে পারা যায়। (১)

তারপর সপ্তম পর্য্যায়ের কথা। পোদ জাতি সজ্জাতি সমূহের ন্যায় দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না, ইহা আমরা সত্য বলিয়া বিবেচনা করি না। কোন দেবমন্দিরে পোদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইতে আমরা কখনও দেখি নাই। বর্ত্তমানকালে ত' নিষেধ নাই,—তা' ছাড়া শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল না, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে। ১৮০৯ সালের ৪র্থ রেগুলেশনের সপ্তম ধারায় (Section 7 of Regulation IV of 1809) নিম্নলিখিত জাতিগুলি পুরীধামের শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশাধিকারী নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?— (২)

"(১) লোলি বা কস্‌বি, (২) কলাল বা শুঁড়ি, (৩) মেছুয়া, (৪) নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল, (৫) ঘুস্‌কি, (৬) ঘাজুর (Ghazur) (৭) বাগ্দী (৮) যোগী বা নারবফ্ (Nurbuf) (৯) কাহার বাউরি ও ঢুলিয়া (১০) রাজবংশী (১১) পিরালী (১২) চামার (১৩) ডোম (১৪) পান (১৫ তিয়র (১৬) ভুঁইমালি ও (১৭) হাড়ি।"

উপরোক্ত ধারায় পোদ জাতির নামোল্লেখ নাই। এত বড় সংখ্যায় বহুল একটী জাতির নাম ভ্রমক্রমে উল্লিখিত হয় নাই, ইহা হইতে পারে না। পুনরায় ১৮১০ সালের ১১শ রেগুলেশনে যে সংশোধিত তালিকা আছে, তাহাতে কেবল মাত্র 'পিরালি' ব্যতীত অন্যসমূহ জাতিই বজায় আছে। ইহাতেও পোদ জাতির নামোল্লেখ

---

[২] "দাতাবলী হিতৈরতঃসুমনা দেবসেবকঃ। কৃষি কর্ম্মোপজীবী চ ষড় বিধং পৌণ্ড্র লক্ষণং॥" ইতি কুলতন্ত্র।

[৩] প্রবাসী, ১৩১৬, ভাদ্র। ("করিয়া আসন, গাড়িল নিশান, সম্মানে বসান পদ্য," ধর্ম্মমঙ্গল।)

[৪] আশ্চর্য্যের বিষয়,—৩৬২ পৃষ্ঠার Table XVI যে পোদদিগের ১৪৩৫ জন পুরুষ ও ৪৭ জন মাত্র স্ত্রীলোক "Cultivators of all kinds"এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। Subsidiary Table VIIIয়ে ৭৪ পৃষ্ঠায় এই মত সমর্থিত হইয়া প্রতি সহস্রে ৫৯জন পুরুষ Cultivators of all kinds লিখিত হইয়াছে।

[1] "Special statistic's of the castes engaged in fishing in the Presidency and Burdwan Division show that half are Bagdis, and one eighth are Malos, who only slightly outmumber the Jalia Kaibartas. Of other castes, the most strongly represented are the Tiyars, Rajbanshis and Namasudras." The Census Report P. 539, para 1065.

[2] ৫৩৯ পৃষ্ঠায় Fishing সম্বন্ধে আলোচনায় লিখিত আছে,—"As explained in 1901, the two occupations (i. e. catching and selling fish) should be amalgamated, as they cannot be kept distinct. A few sections of the fishing community catch fish, but do not retail them and a few others expose them for sale." বাঙ্গালার অধিকাংশ জাতিই মাছ ধরিয়া থাকেন, তা' বলিয়া তাঁহাদিগের জীবিকা fishing হইবে!

---

[3] "(5)—Are not served by good Brahmans as family priests.

[7] Are denied access to the interior of ordinary Hindu temples :

[8] Cause pollution, by touch or within a certain distance; Ibid—P. 232. para 519.

[১] "রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন।" বিশ্বকোষ।

[২] "—It is wellknown that certain low castes are not entitled to enter the temple of Jagarnath at Puri, but these castes are recognised as Hindus and are allowed to perform ceremonies outside the temple. * * * Briefly, the low castes are excluded from the temple simply because they are unclean castes and not because they are not Hindus—"

The Cansus Report for 1911, Vol. 1 Page 229, Para 511.

নাই। এই তালিকা দৃষ্টে জানা যাইবে,—বাঙ্গালার প্রায় সমুদায় অনুন্নত জাতিই ইহাতে স্থান পাইয়াছে, পোদ জাতির অনধিকার থাকিলে তাহা রেগুলেশনে প্রকাশ পাইত, সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এই বিধিনিষেধ উড়িষ্যার ৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির সম্বন্ধে হইলেও নিশ্চয়ই ভিন্ন প্রদেশ বাঙ্গালার সমাজ সমূহের তাৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

অষ্টম পর্য্যায় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে,—পোদ জাতীয় কোন লোককে স্পর্শ করিলে বা কিয়দ্দুর ব্যবধান থাকিলে অশুচিতা আইসে,—এরূপ আচার হিন্দু সমাজে কখনই প্রচলিত নাই। "বিদ্যোদয়"-সম্পাদক পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর ৺ হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অনুসন্ধানে ইহাও জানা যায় যে, গঙ্গাতীরবাসী বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গৃহে পোদ জাতীয় পুরুষ বা স্ত্রী দাসদাসীরূপে নিযুক্ত হয় এবং তাহারা অপরাপর সৎশূদ্রের ন্যায় সমস্ত গৃহ কর্ম্ম করিয়া থাকে।" (১) যাহাদিগকে স্পর্শ করিবা মাত্র অশুচিতা সংক্রমিত হয়,—তাহারা কখনও এতদূর করিতে পারে না।

যাহা হউক, এই পর্য্যায়-বিন্যাস সম্বন্ধে সেন্সস্ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে,—

"The list merely summarizes the reports received and must be accepted with reserve." Page 233 Para 520.

যদি এই উক্তি দ্বারা ইহার ভ্রমাত্মকতাই সমর্থিত হয়, তবে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। শ্রীযুক্ত ও'ম্যালে মহোদয় যেখানে কতকগুলি মতের ঐক্য দেখিয়াছেন,—সেই মতই ঠিক রাখিয়া ঈর্ষ্যাপ্রসূত উক্তি যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। (২) আমার মনে হয়, এই সামঞ্জস্যগুলিও ঈর্ষ্যা বা উপেক্ষা-বিবর্জ্জিত হয় নাই। সংবাদ-প্রদাতৃগণ এইরূপে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রদান দ্বারা শক্তিহীনকে কশাঘাত করিয়া একটী নিরীহ সমাজের বক্ষে নিগ্রহের ভার পুঞ্জীভূত করিয়া কি পৌরুষের পরিচয় দিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশেরই অনুন্নত জাতির প্রতি এরূপ অনবহিত ভাব! সেদিন মেদিনীপুর সেটেলমেণ্টের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী কথাপ্রসঙ্গে লেখককে বলিলেন যে, মেদিনীপুরের সেটেলমেণ্ট বিভাগের কোন অ্যাসিষ্টাণ্ট-সেটেলমেণ্ট অফিসার তাঁহার সার্কেল-নোটে লিখিয়াছেন যে, পোদ জাতি আদৌ জলদস্যু ছিল,—কালক্রমে দস্যুতা পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র সন্নিধিতে বসবাস করিয়াছে। নোট-লেখক মহাশয়ের মৌলিকতার বাহাদুরী থাকিলেও—পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সমস্ত অদ্ভুত উক্তির বলে পরিশেষে সেটেলমেণ্ট-রিপোর্ট সঙ্কলিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে!

সেন্সাস্ রিপোর্টাদির কথা ছাড়িয়া দি। কোন কোন সাহিত্যিক মহারথী তাঁহাদিগের অমর লেখনীর রেখা-পাতে এই

[১] * জাতি-বিবেক। (৺ কৈলাসচন্দ্র ভালদার-প্রণীত)।

[২] † "The utmost care has been taken to place the castes under the different categories only when there was a general consensus of opinion about them, and to reject views that were manifestly based on misconception,"—P. 233, Para 520.

জাতি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন অবমাননাকর উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া একটী জাতিকে চিরকাল নিগৃহীত ও পদদলিত রাখিবার নজীর সৃষ্টি করিতেছেন,—এ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুবিখ্যাত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে লিখিত আছে—

"—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অল্পদিন হইল একটী নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক ডোম, পোদ ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি এবং একপ্রকার রূপান্তর।" ৬০পৃষ্ঠা।

পোদ জাতির কেহই যে ধর্ম্মপূজক নহে, তাহা বর্ত্তমান লেখকের বেশ জানা ছিল। সন্দিগ্ধ হইয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়কে পত্র লেখায় তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

26, Pataldanga Street,
Cal. Novr. 12 1910.

My dear sir,

I have written nothing about the Pods except what you find in my school history. (১) I have investigated the question of Dharma Puja, but I do not remember ever having connected it with the Pods. I am sorry I couldn't reply to your kind letter of the 13th instant earlier. I shall be glad to receive any communication from you.

Yours truly
(Sd) Hara Prasad Shastri.

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। দীনেশ বাবুর ন্যায় শ্রদ্ধেয় প্রতিভাবান লেখক জাতিবিশেষকে অন্যায়রূপে তাঁহার কটাক্ষের বস্তু করিবেন, তাহা ধারণারও অতীত! 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বৈষ্ণব সাহিত্যালোচনায় জাতিভেদ-বর্জ্জিত সাম্যভাবের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া তিনি লেখনীমুখে যে আনন্দ উৎস ছুটাইয়াছেন,—'প্রসাসীর পৃষ্ঠায় অশিক্ষিত ও নীচ জাতীয় লোকের "গোরা জেতের বিচার করে নারে" সঙ্গীতের মোহে অধীর হইয়া তিনি প্রাণের যে সুর ঢালিয়াছেন;—পোদ জাতি সম্বন্ধে এরূপ ভিত্তিবিহীন উক্তি তাঁহার সে উদারভাবকে ম্লান করে নাই কি? তাঁহার অমরগ্রন্থে জাতিবিশেষ এরূপ অকারণ লক্ষ্যীভূত হওয়ায় আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

পণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "গৌড়ের ইতিহাস" নামক পুস্তকে পোদজাতি সম্বন্ধে কোন অমূলক মন্তব্য প্রকাশ করায়,আমি প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐরূপ লিখিবার ভিত্তি "দুর্ব্বল অনুমানমাত্র", তিনি "গৌড়ের ইতিহাস" নূতন করিয়া লিখিতেছিলেন,—পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ অংশবাদ দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। জানিনা, উক্তপুস্তকের কোন পরিশোধিত সংস্করণের ব্যবস্থা করিয়া পরলোকগামী হইয়াছেন কিনা।

(১) শাস্ত্রী মহাশয়ের History of India পুস্তকে পোদ জাতি 'পুলিন্দ' হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত হইয়াছে;—কিন্তু 'পোদ' শব্দ যে 'পৌণ্ড্র' শব্দেরই রূপান্তর, তাহা এত সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এক্ষণে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ইতিহাস সমাজবিশেষের গ্লানিকর একটা দুর্ব্বল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে,ইহা অপেক্ষা দুরদৃষ্ট কি হইতে পারে ?

সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিখ্যাত "সম্বন্ধ নির্ণয়" পুস্তকে পোদজাতি সম্বন্ধে একটী অমূলক উক্তি স্থান পাইতে দেখিয়া বর্ত্তমান লেখকের কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধু অনুসন্ধিৎসু হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন ; পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যুত্তরে জানান যে,—বটতলা হইতে প্রকাশিত জাতি-সম্বন্ধীয় পুস্তকবিশেষের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন। আমরা বটতলার উক্ত নগণ্য পুস্তকের গ্রন্থকারকে বহু চেষ্টা করিয়াও অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। যাহা হউক, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় মেদিনীপুর জেলার খেজুরী অঞ্চলে অত্রত্য স্কুল-সব ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় শুভাগমন করিলে তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎকারের সুবিধা ঘটে। প্রতিবেশী জাতিবিশেষ সম্বন্ধে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা পরিত্যাগ করিয়া একটা নগণ্য পুস্তকের মতকে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন ও "সম্বন্ধ-নির্ণয়ের" নূতন একখণ্ড ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্টে উক্ত উক্তির প্রত্যাহার করিবার আদেশ দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ খেজুরী হইতে প্রত্যাগমনের পর এত সত্বর তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন যে,—তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের অবসর ঘটে নাই। আশা করা যায়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ "সম্বন্ধ-নির্ণয়ে"র নূতন সংস্করণে উহা সংশোধন করিবেন।

কোন বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস পুস্তকে (১) পোদ জমিদারের যেরূপ জঘন্য ও অস্বাভাবিক ব্যঙ্গ চিত্র সৃজন করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে পুস্তকের ছত্রে ছত্রে ঈর্ষা ও উপেক্ষার আগুন জ্বলিয়া রহিয়াছে বোধ হয়। এইরূপ পুস্তকের প্রচার দ্বারা সামাজিক ব্যবধানগুলিকে অধিকতর দূরবর্ত্তী করিয়া তুলা, হৃদয়ের আকর্ষণগুলিকে অধিকতর শিথিল করিয়া দেওয়া যে কতদূর সমীচীন—তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ লেখক যে তাঁহাদিগের লেখনীর শরসন্ধান দ্বারা এই নিপীড়িত জাতির জন্য নিগ্রহের অভিনব পন্থা-সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন না, তাহা নহে। এই-রূপে সাহিত্যের আসরে,—সংবাদপত্রের স্তম্ভে,(২)রঙ্গমঞ্চের নাট্যামোদে(৩)এই জাতির আত্মসম্মান লইয়া অহরহ যে নির্দ্দয় রঙ্গ চলিতেছে,—এই মূক, প্রতিবাদে পরাঙ্মুখ, অক্ষম সমাজের অঙ্গে যে কলঙ্ক-কর্দ্দম লিপ্ত হইতেছে, —তাহা ভাবিলে একান্ত ক্ষুব্ধ হইতে হয়! শতাব্দীর পরে যখন ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্ত-লেখকগণ বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা প্রতিফলিত করিতে অগ্রসর হইবেন,—তখন তাঁহারা কি এই সেন্সাস্‌ রিপোর্ট প্রভৃতির বর্ণনার সহায়তায় পোদজাতির একটী কলঙ্কিত চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিবেন না ? তখন এই সব পুস্তকের প্রামাণিকতায় সন্দেহ করিয়া বিতর্ক করিবার,—তাঁহাদিগের লেখনীকে পরাহত করিবার কিছুই থাকিবে কি ? আজ পোদজাতির কয়জন ঐ সব লেখা পড়িবার সুযোগ পাইবে ? কয়জন আত্ম-সম্মানে ব্যথা পাইয়া এই উপেক্ষা-বিষভরা

(১) স্বর্ণবলয় (শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীকৃত)।

(২) বঙ্গবাসী, নীহার প্রভৃতি।

(৩) সংসার নাটক (শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী)কৃত

লেখনীগুলিকে নিবৃত্ত করিবে ? সমাজের এই অক্ষম, অধঃপতিত; অনগ্রসর ভ্রাতাকে ধূলা ঝাড়িয়া তুলিতে হইবে, আলোকপথবর্ত্তী করিতে হইবে!—দুর্ব্বলকে আক্রমণ নির্য্যাতন করিয়া পৌরুষ কি ? সহানুভূতির স্নিগ্ধ সলিল ধারায় নির্জ্জিতের অপমানের ছাপ ধৌত করিতে হইবে ;—অবজ্ঞাত, অবসাদগ্রস্ত ভাইকে মুক্তির আলোকে আনিতে হইবে ;— ইহাই শিক্ষিত মানবের স্বভাবধর্ম্ম। অসমর্থ ভ্রাতাকে আঘাতে আঘাতে পঙ্গু করিবার উদ্যম হিন্দু সমাজের পক্ষে আত্মক্ষতিকর হইবে মাত্র।

সহস্রবৎসরের তন্দ্রার পর আজ শিক্ষার তরুণ স্পন্দন আসিয়াছে। এই জ্যোতির্ম্ময়ী উষায় পোদ জাতিও নিদ্রিত, নিচেষ্ট নাই ; নব উদ্যমে তাহারা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে। (১) যদি শিক্ষিত ভ্রাতাগণ অনুন্নত জাতিকে অভিনব নির্য্যাতনে কবলিত করিবার জন্য নিত্য নব নব উপায়োদ্ভাবনে উদ্যোগী হন, —তাহাদিগকে অবমাননার চাপে নিষ্পেষিত করিবার জন্য সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিতেও দ্বিধাবোধ না করেন,—তবে বুঝিব, বাঙ্গালীর জাতিরূপে জগৎসভায় দাঁড়াইবার আশা এখনও সুদূরপরাহত! শিক্ষিত সমাজ হিন্দু সমাজের একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গকে এরূপে লেখনীর খোঁচায় অযথা অপমান-জর্জ্জরিত না করিয়া ভ্রাতৃস্নেহের উদার উৎস খুলিয়া নিপীড়িতকে অবমাননার কণ্টক শয্যা হইতে তুলিয়া ধরুন! তাহাদিগের মনুষ্যত্বের দাবির প্রতি অবহিত হউন!—হিন্দু জাতির 'ধ্বংসোন্মুখ' নাম ঘুচিবে,—সোণার দেশ সুখময় হইয়া উঠিবে। শ্রীমহেন্দ্র নাথ করণ।

আমাদের নানাকথা।

এবার দেখ্‌ছি মাতাল ভায়ারই পোয়াবার। আমেরিকায় Pearl নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক (Experimenter) আছেন। তাঁর একটী পরীক্ষার কথা আমেরিকায় ও বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বাহির হইতেছে। তিনি কিছুদিন হইতে কতকগুলি মুরগীকে মদ শোঁকাইয়া (inhale করাইয়া) দেখিতেছিলেন, তাদের সন্তান কিরূপ হয়। পরীক্ষাটী এইরূপ ঃ—তিনি দুই দল সমান রকমের মুরগী লইলেন ; একদলকে কিছুদিন ধরিয়া মদ শোঁকাইতে লাগিলেন, আর এক দলকে মদ শোঁকাইলেন না, (পাঠক এখানে মনে রাখিবেন, ঘ্রাণে অর্দ্ধেক (ভোজন) অন্যান্য বিষয়ে অর্থাৎ খাবার, বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে দুই দলকে সমান অবস্থায় রাখিলেন, কিছুদিন পরে দেখিলেন যে, যে সব মুরগীকে মদ শোঁকাইয়াছিলেন, তাদের সন্তান অন্য

* "—The endeavours of certain of the lower Hindu castes to raise their social status is reflected in their standard of literacy. Thus the Kabartas, Pods, Namasudras and Rajbanshis all show signs of improvement, and the Pods especially have made great strides."

Vide Govt. Resolution No. 3435 dated 14th. July, 1913 on the Bonsus Report of Bengal etc.

দলের মুরগীদের সন্তান অপেক্ষা সুস্থ ও সবল। Pearl ব্যাপারটীর এইরূপ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, মদ দুর্ব্বল বীজ (মাতৃ বীজ—ova এবং পিতৃবীজ—Spermatozoa) নষ্ট করিয়া ফেলে। কাজেই কেবল সবল বীজগুলিই বাঁচিয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল সবল বীজ হইতেই বাচ্চা হয়। তাই যে সকল মুরগীকে মদ শোঁকান হইয়াছিল, তাদের বাচ্চারা সবল হইয়াছিল। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, ফলটী ত যেন মাতাল ভায়ার দিকেই দাঁড়াইতেছে। যেন শুনিতে পাইতেছি, মাতাল ভায়া বলিতেছেন ;—"কতকগুল ভালমন্দ মিশান ছেলে নিয়ে কি হবে, তার চেয়ে দুটী একটী ভাল ছেলেই ভাল।"

রসুন, মাতাল-ভায়া। (মাতাল ভায়া এখানে বলিতেছেন :—"রাখুন আপনার 'রসুন' পেঁয়াজ এখন, experimental proof আমার দিকে, আপনি মিছে বক্‌লে কি হবে।") থামুন মাতাল ভায়া, থামুন। প্রথম কথা হইতেছে, Pearl নিজেই বলিতেছেন যে, যে সকল মুরগীদিগকে মদ শোঁকান হইয়াছিল, তাহাদের মদের মাত্রাটা আরও একটু চড়াইলে হয় ত তাদের সবল বীজও দুর্ব্বল হইত, আর দুর্ব্বল বীজ ত একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতই। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, পক্ষী (মুরগী) আর মানুষ এক নয়। মুরগী সম্বন্ধে যাহা সত্য, মানুষ সম্বন্ধেও যে তাহাই সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তারপর তৃতীয় কথা হইতেছে—Pearl যেমন মুরগী লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তেমনি আর দুই জন বিখ্যাত পরীক্ষক (Laitinen এবং Stockard) স্তন্যপায়ী জীব (Mammals) কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি—লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুকুর বিড়ালকে মদ খাওয়াইলে তাদের সন্তান, যে সকল কুকুর বিড়ালকে মদ খাওয়ান হয় না, তাদের সন্তান অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হয়। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীবদিগেরই সহিতই আমাদিগের (অর্থাৎ মানুষের) সাদৃশ্য নিকটতর,—কেননা আমরাও স্তন্যপায়ী। কাজেই মুরগীর উপর পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তার অপেক্ষা স্তন্যপায়ী জীবের উপর পরীক্ষালব্ধ ফলই মানুষের সম্বন্ধে বেশী খাটা সম্ভব। চতুর্থ কথা হইতেছে আমরা বোকা শোকা ডাক্তার মানুষ, আমরা অত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ধার ধারি না, আমরা প্রায়ই মানুষের উপর এক প্রকার পরীক্ষা দেখিতেছি। দেখিতেছি, যারা অপরিমিতভাবে (পাঠক এখানে মনে রাখিবেন, কার পক্ষে কোনটা পরিমিত আর কোন্‌টা অপরিমিত তা সহজে ঠিক করা যায় না, আর সচারাচর মাত্রা বৃদ্ধির দিকেই গতি) মদ কিছুদিন ধরিয়া খান, তাঁদের শরীরের সব যন্ত্রই শীঘ্র বা বিলম্বে কম বেশী বিগড়াইয়া যায়। এই দেখুন যকৃৎটী (liverটী) স্বভাবতঃ কোমল, সেটী কতকটী চামড়ার মত শক্ত হয়, আর অকেজোও হইয়া যায়। ফলঃ—পেটটী এক প্রকার জলে পূর্ণ হয়। গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত স্রাব হইতে থাকে। এদিকে মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে, এই রোগে (ইংরাজীতে যাহাকে Cirrhosis of the liver বলে,) মৃত্যু নিশ্চিত বলিলেও বড় অত্যুক্তি করা হইবে না। দৃশ্য :—চিরদিনের জন্য স্বামী ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছেন দেখিয়া স্ত্রী ডাক্তারের পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া "বাঁচান, বাঁচান" বলিয়া এমন ক্রন্দন ধ্বনি তুলিতেছেন, যাতে পাষাণও বিগলিত

হয়। প্রত্যেক ডাক্তার মাঝে মাঝে এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিতেছেন। এখানে কথার কথা কিছু মাত্র নাই, অত্যুক্তির লেশ মাত্র নাই। মাতাল ভায়াকে তাই বলিতেছিলাম—"রসুন"।

মদ ও গরমির ব্যারাম যে মানুষের কি সর্ব্বনাশ করে, তাহা হাতে হাতে ও সাক্ষাৎ ভাবে দেখাইবার জন্য জার্ম্মণিতে একটী মিউজিয়ম্ (Museum) আছে। সেখানে মাতালের যকৃৎ, পাকস্থলী, শিরা প্রভৃতি ; গন্ধ কাটা (গরমির ব্যারামে নাকটাক পচে গেছে এমন মুখ) ; পক্ষাঘাতে মৃত ব্যক্তির মগজ ; গরমির ব্যারামে বিকৃত ফুস্ ফুস্, গরমির ব্যারামে (অবশ্য রোগ বাপের কি মার নিকট হইতে পাইয়াছিল) মৃত শিশু এই রকমের সব দৃষ্টান্ত-দ্রব্য (Specimen) সুরাসারে (alcohol এ) বা অন্য কোন প্রকারে রক্ষিত হইয়াছে। মুখে শত উপদেশের অপেক্ষা এইরূপ বস্তু-উপদেশ (object lesson) অনেক গুণে বেশী কার্য্যকর। আমাদের দেশে এইরূপ একটী মিউজিয়ম হইলে ভাল হয়।

গতবারে "আমাদের নানা কথার" মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব অজ্ঞেয়বাদীদিগের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন অথচ জ্ঞেয়বাদীদিগকে পরোক্ষভাবে অব্যাহতি দিয়াছেন, তা তাঁহার এ কাজটী ঠিক হয় নাই বলিয়াছিলাম। একথাগুলি ছাপা হইবার পরে দেখিলাম "Makers of the Nineteenth Century" নামক কতগুলি পুস্তক (series) বিলাতে বাহির হইতেছে, তার মধ্যে Elliot নামক একজন সুলেখক "Herbert Spencer" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকটী বিলাতের Times প্রভৃতি নানা কাগজে সমালোচিত হইতেছে, সকলেই এক বাক্যে লেখকের নিরপেক্ষতার প্রশংসা করিতেছেন। লেখক বলেন ইউরোপ যদি Spencerএর কথা শুনিতেন ত এই বর্ত্তমান ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিত না। তিনি বলিতেছেন "The spirit of Treitschke has triumphed over the spirit of Spencer—the metaphysics of Germany over the common sense of England." পাঠক দেখিবেন আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে Spencer সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম Elliot সাহেবও সেই কথাই বলিয়াছেন।

"খিদে (ক্ষুধা) হয় কেন ?" ব্যাখ্যাঃ—"খিদে হয় তাই খিদে হয়।" বেশ ! "রাখাল গরু মাঠে লইয়া যাইতেছে।" ব্যাখ্যা :—"রাখাল গরু মাঠে লইয়া যাচ্চে।" বেশ ! বেশ ! দুই ব্যাখ্যাই সমান। অনেক স্থানে ব্যাখ্যাটা এইরূপই হয় বটে ! যাহা হউক শরীর-কার্য্যবিদ্ পণ্ডিতেরা (Physiologists) এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁরা আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহেন। সম্প্রতি চিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (Prof-Carlson) খিদে হয় কেন এই তত্ত্বটীর সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, ও পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐ সব অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও তাহাদের ফল পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের নানা কাগজে এ সম্বন্ধে লেখালিখিও হইতেছে। প্রিয় পাঠক, সংক্ষেপে উক্ত অধ্যাপকের মূল সিদ্ধান্তটী কি তাহা আপনাকে আজ উপহার দিব। কি যন্ত্রাদি তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন তার একটা বর্ণনা দিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব না। কেবল সিদ্ধান্তটীর কথাই বলিব। সিদ্ধান্তটী এইঃ—অনেকক্ষণ কিছু না খাইলে পাকস্থলীর (stomachএর) মাংসপেশীর

দলের মুরগীদের সন্তান অপেক্ষা সুস্থ ও সবল। Pearl ব্যাপারটীর এইরূপ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, মদ দুর্ব্বল বীজ (মাতৃ বীজ—ova এবং পিতৃবীজ—Spermatozoa) নষ্ট করিয়া ফেলে। কাজেই কেবল সবল বীজগুলিই বাঁচিয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল সবল বীজ হইতেই বাচ্চা হয়। তাই যে সকল মুরগীকে মদ শোঁকান হইয়াছিল, তাদের বাচ্চারা সবল হইয়াছিল। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, ফলটী ত যেন মাতাল ভায়ার দিকেই দাঁড়াইতেছে। যেন শুনিতে পাইতেছি, মাতাল ভায়া বলিতেছেন;—"কতকগুল ভালমন্দ মিশান ছেলে নিয়ে কি হবে, তার চেয়ে দুটী একটী ভাল ছেলেই ভাল।"

রসুন, মাতাল-ভায়া। (মাতাল ভায়া এখানে বলিতেছেন:—"রাখুন আপনার 'রসুন' পেঁয়াজ এখন, experimental proof আমার দিকে, আপনি মিছে বক্‌লে কি হবে।") থামুন মাতাল ভায়া, থামুন। প্রথম কথা হইতেছে, Pearl নিজেই বলিতেছেন যে, যে সকল মুরগীদিগকে মদ শোঁকান হইয়াছিল, তাহাদের মদের মাত্রাটা আরও একটু চড়াইলে হয় ত তাদের সবল বীজও দুর্ব্বল হইত, আর দুর্ব্বল বীজ ত একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতই। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, পক্ষী (মুরগী) আর মানুষ এক নয়। মুরগী সম্বন্ধে যাহা সত্য, মানুষ সম্বন্ধেও যে তাহাই সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তারপর তৃতীয় কথা হইতেছে—Pearl যেমন মুরগী লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তেমনি আর দুই জন বিখ্যাত পরীক্ষক (Laitinen এবং Stockard) স্তন্যপায়ী জীব (Mammals) কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি—লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুকুর বিড়ালকে মদ খাওয়াইলে তাদের সন্তান, যে সকল কুকুর বিড়ালকে মদ খাওয়ান হয় না, তাদের সন্তান অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হয়। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীবদিগেরই সহিতই আমাদিগের (অর্থাৎ মানুষের) সাদৃশ্য নিকটতর,—কেননা আমরাও স্তন্যপায়ী। কাজেই মুরগীর উপর পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তার অপেক্ষা স্তন্যপায়ী জীবের উপর পরীক্ষালব্ধ ফলই মানুষের সম্বন্ধে বেশী খাটা সম্ভব। চতুর্থ কথা হইতেছে আমরা বোকা শোকা ডাক্তার মানুষ; আমরা অত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ধার ধারি না, আমরা প্রায়ই মানুষের উপর এক প্রকার পরীক্ষা দেখিতেছি। দেখিতেছি, যারা অপরিমিতভাবে (পাঠক এখানে মনে রাখিবেন, কার পক্ষে কোনটা পরিমিত আর কোন্‌টা অপরিমিত তা সহজে ঠিক করা যায় না, আর সচারাচর মাত্রা বৃদ্ধির দিকেই গতি) মদ কিছুদিন ধরিয়া খান, তাঁদের শরীরের সব যন্ত্রই শীঘ্র বা বিলম্বে কম বেশী বিগড়াইয়া যায়। এই দেখুন যকৃৎটী (liverটী) স্বভাবতঃ কোমল, সেটী কতকটী চামড়ার মত শক্ত হয়, আর অকেজোও হইয়া যায়। ফলঃ—পেটটী এক প্রকার জলে পূর্ণ হয়। গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত স্রাব হইতে থাকে। এ-দিকে মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে, এই রোগে (ইংরাজীতে যাহাকে Cirrhosis of the liver বলে,) মৃত্যু নিশ্চিত বলিলেও বড় অত্যুক্তি করা হইবে না। দৃশ্য:—চিরদিনের জন্য স্বামী ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছেন দেখিয়া স্ত্রী ডাক্তারের পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া "বাঁচান, বাঁচান" বলিয়া এমন ক্রন্দন ধ্বনি তুলিতেছেন, যাতে পাষাণও বিগলিত

হয়। প্রত্যেক ডাক্তার মাঝে মাঝে এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিতেছেন। এখানে কথার কথা কিছু মাত্র নাই, অত্যুক্তির লেশ মাত্র নাই। মাতাল ভায়াকে তাই বলিতেছিলাম—"রসুন"।

মদ ও গরমির ব্যারাম যে মানুষের কি সর্ব্বনাশ করে, তাহা হাতে হাতে ও সাক্ষাৎ ভাবে দেখাইবার জন্য জার্ম্মণিতে একটী মিউজিয়ম্ (Museum) আছে। সেখানে মাতালের যকৃৎ, পাকস্থলী, শিরা প্রভৃতি; গন্ধকাটা (গরমির ব্যারামে নাকটাক পচে গেছে এমন মুখ); পক্ষাঘাতে মৃত ব্যক্তির মগজ; গরমির ব্যারামে বিকৃত ফুস্ ফুস্, গরমির ব্যারামে (অবশ্য রোগ বাপের কি মার নিকট হইতে পাইয়াছিল) মৃত শিশু এই রকমের সব দৃষ্টান্ত-দ্রব্য (Specimen) সুরাসারে (alcohol এ) বা অন্য কোন প্রকারে রক্ষিত হইয়াছে। মুখে শত উপদেশের অপেক্ষা এইরূপ বস্তু-উপদেশ (object lesson) অনেক গুণে বেশী কার্য্যকর। আমাদের দেশে এইরূপ একটী মিউজিয়ম হইলে ভাল হয়।

গতবারে "আমাদের নানা কথার" মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব অজ্ঞেয়বাদীদিগের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন অথচ জ্ঞেয়বাদীদিগকে পরোক্ষভাবে অব্যাহতি দিয়াছেন, তা তাঁহার এ কাজটী ঠিক হয় নাই বলিয়াছিলাম। একথাগুলি ছাপা হইবার পরে দেখিলাম "Makers of the Nineteenth Century" নামক কতগুলি পুস্তক (series) বিলাতে বাহির হইতেছে, তার মধ্যে Elliot নামক একজন সুলেখক "Herbert Spencer" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকটী বিলাতের Times প্রভৃতি নানা কাগজে সমালোচিত হইতেছে, সকলেই এক বাক্যে লেখকের নিরপেক্ষতার প্রশংসা করিতেছেন। লেথক বলেন ইউরোপ যদি Spencerএর কথা শুনিতেন ত এই বর্ত্তমান ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিত না। তিনি বলিতেছেন "The spirit of Treitschke has triumphed over the spirit of Spencer—the metaphysics of Germany over the common sense of England." পাঠক দেখিবেন আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে Spencer সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম Elliot সাহেবও সেই কথাই বলিয়াছেন।

"খিদে (ক্ষুধা) হয় কেন?" ব্যাখ্যাঃ—"খিদে হয় তাই খিদে হয়।" বেশ! "রাখাল গরু মাঠে লইয়া যাইতেছে।" ব্যাখ্যা:—"রাখাল গরু মাঠে লইয়া যাচ্চে।" বেশ! বেশ! দুই ব্যাখ্যাই সমান। অনেক স্থানে ব্যাখ্যাটা এইরূপই হয় বটে! যাহা হউক শরীর-কার্য্যবিদ্ পণ্ডিতেরা (Physiologists) এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁরা আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহেন। সম্প্রতি চিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (Prof-Carlson) খিদে হয় কেন এই তত্ত্বটীর সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান, ও পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐ সব অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও তাহাদের ফল পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের নানা কাগজে এ সম্বন্ধে লেখালিখিও হইতেছে। প্রিয় পাঠক, সংক্ষেপে উক্ত অধ্যাপকের মুল সিদ্ধান্তটী কি তাহা আপনাকে আজ উপহার দিব। কি যন্ত্রাদি তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন তার একটা বর্ণনা দিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব না। কেবল সিদ্ধান্তটীর কথাই বলিব। সিদ্ধান্তটী এইঃ—অনেকক্ষণ কিছু না খাইলে পাকস্থলীর (stomachএর) মাংসপেশীর

পাকস্থলী অবশ্য প্রধানতঃ মাংসপেশী দ্বারাই গঠিত) সঙ্কোচন (contraction) হইতে থাকে। মাংসপেশীর সঙ্কোচন কাহাকে বলে ? যে মাংসপেশীটী লম্বে ৬ ইঞ্চি ছিল সেটি কুঁচ্‌কে যখন ৫ ইঞ্চি বা এইরূপ ছোট হয় তখন তাহার দৈর্ঘ্যটীর এইরূপ কম হইয়া যাওয়াকে মাংসপেশীর সঙ্কোচন বলে। ভাল, অনেকক্ষণ কিছু না খাইলে পাকস্থলীর মাংসপেশীর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচন মিনিটে মিনিটে হইতে থাকে। এই সঙ্কোচন গুলির খবর মস্তিষ্কে (মাথার খুলির ভিতর ঘন, বসা ঘীর মত যে পদার্থ থাকে,—যাহাকে চলিত কথায় "মগজ" বলে সেখানে) নীত হয়। খবর যায় কিরূপে ? তার আছে। এ তার অবশ্য লোহার বা তাঁবার তার নয়। শাদা, মোটা স্নুতোর মত দুইটী স্নায়ু (nerve) পাকস্থলী হইতে মগজে গিয়াছে। (ইংরাজীতে তাহাদের প্রত্যেকের নাম Vagus।) ঐ স্নায়ু দুইটী দিয়া খবর যায়। খবর গেলেই মগজে একটা আণবিক (molecular ব্যাপার হয়,—যাহা চখেও দেখা যায় না, অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না। মগজে, একটা আণবিক ব্যাপার হইলেই ক্ষুধা নামক অনুভূতিটী (sensationটী) হয়। এখানে কোন "নাছোড়বান্দা" পাঠক—যিনি প্রকৃতির অন্তঃস্থলে যাইতে চান—হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে ছেন—মগজে আণবিক ব্যাপার হইলে অনুভূতি হয় কেন ? আণবিক ব্যাপার জড়ীয় ব্যাপার আর অনুভূতি চৈতন্যের ব্যাপার ; একটা আর একটা উৎপন্ন করে কিরূপে ? আ ! এই খানেই ত ঠক্‌ঠকি ! ইহা জীবন বিজ্ঞানের ও দর্শন শাস্ত্রের একটী অতি গভীর প্রশ্ন;—হাঁ, গভীরতম প্রশ্ন। এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সদুত্তর যদি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত সর্ব্বজ্ঞ হইতাম। এ সুগভীর প্রশ্ন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। আমরা মুনি নই, ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষ। তবুও আমাদেরও যে এ সম্বন্ধে একটা মত নাই, তা নয়। তবে এখানে সে আলোচনা আজ থাক। অন্য সময়ে করিব।

গীতা রচয়িতা যে কেবল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তা নয়, ব্যবহারিক জগতের জ্ঞানও তাঁর অসাধারণ মাত্রায় ছিল। যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে একটা কুফলের কথা অর্জ্জুনের মুখ দিয়া বলিতেছেন ঃ—"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যান্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।" (১ম অঃ ৪০) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ (লোক মারিলে অধর্ম্ম হয়) অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ নষ্ট হয়। বাস্তবিক পাঠক যুদ্ধ বিগ্রহের এ কুফলটার কথা কি একবার ভাবিয়াছেন ? এই বর্ত্তমান যুদ্ধে এত জার্ম্মাণ মহিলা ভ্রষ্টা হইয়াছে যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। Deustsche Tageszeitung (German Daily News) বলিতেছেন ঃ—"The Divorce Courts are busy, and nearly all the cases involve wives of soldiers. It is of quite common occurrence for a young soldier to return from the battle to find his wife carrying on a liaison with another man." আরও শুনুন Die Zukunft নামকএকটীজার্ম্মাণ সংবাদ পত্রের সত্ত্বাধিকারী Maxmilian Harden তাঁর কাগজে বলিয়াছিলেন"যুদ্ধারম্ভের পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে এক বার্লিন সহরে ৩০,০০০ যুবতী স্ত্রীকে তাহাদের স্বামীরা পরিত্যাগ (divorce) করিয়াছেন !!" পরিত্যাগের কারণ অবশ্য প্রধানতঃ ঐ সব স্ত্রীলোকের ভ্রষ্টা

হওয়া। একা বার্লিনে এই, সমস্ত জার্ম্মাণিতে তাহা হইলে ভ্রষ্টার সংখ্যা কত বেশী হইবে ! দুই বৎসরে এই,এখন আরও কত বেশী হইবে !

জার্ম্মাণি তাই বাধ্য হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এই আইনটী পাশ করিয়াছেন। আইনটী এই ঃ—যে সকল লোক যুদ্ধে মরিতেছে ইতিমধ্যে তাহাদের স্ত্রীরা যদি ভ্রষ্টা হইয়া জারজ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই সব সন্তান বৈধ (legitimate) সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে)

সকলেই জানেন Oliver Lodge এক জন বিলাতের বড় দরের বৈজ্ঞানিক। বিদ্যুতের ব্যাপারটী ভাল করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন। ইনি একটী ভক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চার খানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইনি প্রেতবাদে (Spiritualismএ) খুব বিশ্বাস করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁর Raymond নামক একটী পুত্র বর্ত্তমান যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। Lodge সম্প্রতি ঐ পুত্রের নাম দিয়া "Raymond" নামক একটী পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে Lodgeএর সহিত তাঁর ঐ মৃত পুত্রের প্রেত আত্মার যে ভাব বিনিময় হয় সেই সব কথা লিখিয়াছেন ! প্রেতবাদ সম্বন্ধে অন্যান্য কথাও লিখিয়াছেন। এদিকে Dr. Mercier "Spiritualism and Sir Oliver Lodge" নামক এক পুস্তক ছাপাইয়াছেন। তাহাতে Lodgeএর মতের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত ডাক্তার বিলাতের একজন বিখ্যাত ডাক্তার, মানসিক রোগের (mental diseasesএর) চিকিৎসক। ইনি শরীরতত্ত্বও যেমন জানেন, মনস্তত্ত্বও তেমনি জানেন। আবার ন্যায় শাস্ত্রেও তেমনি সুপণ্ডিত। এবার শক্তে শক্তে !! উক্ত ডাক্তার বলিতেছেন Lodge তাঁর "Raymond"এ যে সব মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভুল ; Lodgeএর যুক্তি প্রণালী অবিশুদ্ধ; তিনি কোন বিষয় প্রমাণ করিতে গেলে যে সব সতর্কতার দরকার এখানে সে সকলের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ; এবং এ সব বিষয় বিচার করিবার তাঁর তেমন অধিকারও নাই। উক্ত ডাক্তার বলিতেছেন Lodgeএর এ সম্বন্ধে বিশ্বাস ডাইনে (witchএ) বিশ্বাসের মত। Dr. Mercier শুধু বই লিখিয়া প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত নন। গত জুলাইয়ের Hibbert Journalএও এক সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা প্রেতবাদে বিশ্বাস করেন বা যাঁহাদিগের ওদিকে ঝোঁক আছে তাঁহাদিগকে Dr. Mercier এর লেখাগুলি পড়িতে অনুরোধ করি।

Col. Cookও "Reflections on Raymond" নামক পুস্তকে Lodgeএর প্রতিবাদ করিয়াছেন। Cookএর পুস্তকের এরি মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। শুনিয়া সুখী হইলাম Dr. Mercier telepathyতে (অর্থাৎ আমার মনের চিন্তা তোমার মনেও উদ্রিক্ত হইবে, ইহাতে) বিশ্বাস করেন না। আমরাও অনেক দিন থেকেই করি না। আমরা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; কোন প্রমাণ পাই নাই।

প্রিয় পাঠক, প্রেতবাদের তর্কাতর্কির সম্বন্ধে আমরা একটী আবিষ্কার করিয়াছি। সে বিষয়ে এখানে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ কাল আমাদের দেশের লেখা পড়া জানাওয়ালাদের মধ্যে

RECORD NO. 15.

VOLUME CONTINUED

IN NEXT REEL NO. BSP-33

পাকস্থলী অবশ্য প্রধানতঃ মাংসপেশী দ্বারাই গঠিত) সঙ্কোচন (contraction) হইতে থাকে। মাংসপেশীর সঙ্কোচন কাহাকে বলে? যে মাংসপেশীটী লম্বে ৬ ইঞ্চি ছিল সেটি কুঁচ্‌কে যখন ৫ ইঞ্চি বা এইরূপ ছোট হয় তখন তাহার দৈর্ঘ্যটার এইরূপ কম হইয়া যাওয়াকে মাংসপেশীর সঙ্কোচন বলে। ভাল, অনেকক্ষণ কিছু না খাইলে পাকস্থলীর মাংসপেশীর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচন মিনিটে মিনিটে হইতে থাকে। এই সঙ্কোচন গুলির খবর মস্তিষ্কে (মাথার খুলির ভিতর ঘন, বসা ঘীর মত যে পদার্থ থাকে,—যাহাকে চলিত কথায় "মগজ" বলে সেখানে) নীত হয়। খবর যায় কিরূপে? তার আছে। এ তার অবশ্য লোহার বা তাঁবার তার নয়। শাদা, মোটা সুতোর মত দুইটী স্নায়ু (nerve) পাকস্থলী হইতে মগজে গিয়াছে। (ইংরাজীতে তাহাদের প্রত্যেকের নাম Vagus।) ঐ স্নায়ু দুইটী দিয়া খবর যায়। খবর গেলেই মগজে একটা আণবিক (molecular ব্যাপার হয়,—যাহা চখেও দেখা যায় না, অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না। মগজে, একটা আণবিক ব্যাপার হইলেই ক্ষুধা নামক অনুভূতিটী (sensationটী) হয়। এখানে কোন "নাছোড়বান্দা" পাঠক—যিনি প্রকৃতির অন্তঃস্থলে যাইতে চান—হয়ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মগজে আণবিক ব্যাপার হইলে অনুভূতি হয় কেন? আণবিক ব্যাপার জড়ীয় ব্যাপার আর অনুভূতি চৈতন্যের ব্যাপার; একটা আর একটা উৎপন্ন করে কিরূপে? আ! এই খানেইত ঠক্‌ঠকি! ইহা জীবন বিজ্ঞানের ও দর্শন শাস্ত্রের একটী অতি গভীর প্রশ্ন;—হাঁ, গভীরতম প্রশ্ন। এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সদুত্তর যদি দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত সর্ব্বজ্ঞ হইতাম। এ সুগভীর প্রশ্ন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। আমরা মুনি নই, ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষ। তবুও আমাদেরও যে এ সম্বন্ধে একটা মত নাই, তা নয়। তবে এখানে সে আলোচনা আজ থাক। অন্য সময়ে করিব।

গীতা রচয়িতা যে কেবল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তা নয়, ব্যবহারিক জগতের জ্ঞানও তাঁর অসাধারণ মাত্রায় ছিল। যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে একটা কুফলের কথা অর্জ্জুনের মুখ দিয়া বলিতেছেন ঃ—"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।" (১ম অঃ ৪০) অর্থাৎ হে কৃষ্ণ (লোক মারিলে অধর্ম্ম হয়) অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ নষ্ট হয়। বাস্তবিক পাঠক যুদ্ধ বিগ্রহের এ কুফলটার কথা কি একবার ভাবিয়াছেন? এই বর্ত্তমান যুদ্ধে এত জার্ম্মাণ মহিলা ভ্রষ্টা হইয়াছে যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। Deustsche Tageszeitung (German Daily News) বলিতেছেন ঃ—"The Divorce Courts are busy, and nearly all the cases involve wives of soldiers. It is of quite common occurrence for a young soldier to return from the battle to find his wife carrying on a liaison with another man." আরও শুনুন Die Zukunft নামক একটী জার্ম্মাণ সংবাদ পত্রের সত্বাধিকারী Maxmilian Harden তাঁর কাগজে বলিয়াছিলেন "যুদ্ধারম্ভের পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে এক বার্লিন সহরে ৩০,০০০ যুবতী স্ত্রীকে তাহাদের স্বামীরা পরিত্যাগ (divorce) করিয়াছেন !!" পরিত্যাগের কারণ অবশ্য প্রধানতঃ ঐ সব স্ত্রীলোকের ভ্রষ্টা

হওয়া। একা বার্লিনে এই, সমস্ত জার্ম্মাণিতে তাহা হইলে ভ্রষ্টার সংখ্যা কত বেশী হইবে! দুই বৎসরে এই,এখন আরও কত বেশী হইবে!

জার্ম্মাণি তাই বাধ্য হইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এই আইনটা পাশ করিয়াছেন। আইনটী এই ঃ—যে সকল লোক যুদ্ধে মরিতেছে ইতিমধ্যে তাহাদের স্ত্রীরা যদি ভ্রষ্টা হইয়া জারজ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই সব সন্তান বৈধ (legitimate) সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে)

সকলেই জানেন Oliver Lodge এক জন বিলাতের বড় দরের বৈজ্ঞানিক। বিদ্যুতের ব্যাপারটী ভাল করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন। ইনি একটী ভক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চার খানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইনি প্রেতবাদে (Spiritualismএ) খুব বিশ্বাস করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁর Raymond নামক একটী পুত্র বর্ত্তমান যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। Lodge সম্প্রতি ঐ পুত্রের নাম দিয়া "Raymond" নামক একটী পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে Lodgeএর সহিত তাঁর ঐ মৃত পুত্রের প্রেত আত্মার যে ভাব বিনিময় হয় সেই সব কথা লিখিয়াছেন! প্রেতবাদ সম্বন্ধে অন্যান্য কথাও লিখিয়াছেন। এদিকে Dr. Mercier "Spiritualism and Sir Oliver Lodge" নামক এক পুস্তক ছাপাইয়াছেন। তাহাতে Lodgeএর মতের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত ডাক্তার বিলাতের একজন বিখ্যাত ডাক্তার, মানসিক রোগের (mental diseasesএর) চিকিৎসক। ইনি শরীরতত্ত্ব যেমন জানেন, মনস্তত্ত্বও তেমনি জানেন। আবার ন্যায় শাস্ত্রেও তেমনি সুপণ্ডিত। এবার শক্ততে শক্ততে!! উক্ত ডাক্তার বলিতেছেন Lodge তাঁর "Raymond"এ যে সব মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভুল; Lodgeএর যুক্তি প্রণালী অবিশুদ্ধ; তিনি কোন বিষয় প্রমাণ করিতে গেলে যে সব সতর্কতার দরকার এখানে সে সকলের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; এবং এ সব বিষয় বিচার করিবার তাঁর তেমন অধিকারও নাই। উক্ত ডাক্তার বলিতেছেন Lodgeএর এ সম্বন্ধে বিশ্বাস ডাইনে (witchএ) বিশ্বাসের মত। Dr. Mercier শুধু বই লিখিয়া প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত নন। গত জুলাইয়ের Hibbert Journalএও এক সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা প্রেতবাদে বিশ্বাস করেন বা যাঁহাদিগের ওদিকে ঝোঁক আছে তাঁহাদিগকে Dr. Mercier এর লেখাগুলি পড়িতে অনুরোধ করি।

Col. Cookও "Reflections on Raymond" নামক পুস্তকে Lodgeএর প্রতিবাদ করিয়াছেন। Cookএর পুস্তকের এরি মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। শুনিয়া সুখী হইলাম Dr. Mercier telepathyতে (অর্থাৎ আমার মনের চিন্তা তোমার মনেও উদ্রিক্ত হইবে, ইহাতে) বিশ্বাস করেন না। আমরাও অনেক দিন থেকেই করি না। আমরা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; কোন প্রমাণ পাই নাই।

প্রিয় পাঠক, প্রেতবাদের তর্কাতর্কির সম্বন্ধে আমরা একটী আবিষ্কার করিয়াছি। সে বিষয়ে এখানে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ কাল আমাদের দেশের লেখা পড়া জানাওয়ালাদের মধ্যে

WHOLE VOLUME. BLEED THROUGH.

প্রেতবাদে বিশ্বাস করেন এইরূপ দুই চারিটী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্যমান্য শিক্ষিত দুই একটী লোকের সহিত এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক তর্ক যুদ্ধও হইয়াছে। সে তর্কের মাথা নাই, মুণ্ডু নাই। একজন বলিলেন প্রেতবাদে বিশ্বাস না করিলে "আপনাদিগকে অবৈজ্ঞানিক বলিবে।" আমরা বলিলাম "আমরা বৈজ্ঞানিক হইতে চাই না; আমাদিগকে এখানে কেহ অবৈজ্ঞানিক বলিতে চাহেন বলুন; আমরাও তাঁহাদিগকে অবৈজ্ঞানিক বলিব।" তারপর বলিলেন "Lodgeএর মত অত বড় বৈজ্ঞানিক প্রেতবাদে বিশ্বাস করেন আর আপনারা করিবেন না?" আমরা বলিলাম:—"এটা ত একটা যুক্তিই নয়। প্রথমতঃ, আপনার ভূত, প্রেতে বিশ্বাস একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই যে এক এক জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক Virgin Maryর "immaculate conception"এ বিশ্বাস করেন—বিশ্বাস করেন Virgin Mary বিনা পুরুষ সহবাসে যীশুখ্রীষ্টকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া আমাদিগকেও তাই বিশ্বাস করিতে হইবে নাকি? তা ছাড়া আপনি যেমন Wallace, Crookes, Lodge দেখাইবেন—যাঁরা প্রেতবাদে বিশ্বাস করেন, আমরাও তেমনি Tyndall, Huxley, Ray Lankesterকে দেখাইতে পারি—যাঁরা সমানদরের বৈজ্ঞানিক অথচ প্রেতবাদে আদবেই বিশ্বাস করেন না। তার পর ইহাও মনে রাখিবেন যে যদি সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ লওয়া যায় তাহা হইলে দেখিবেন যে ইহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রেতবাদে বিশ্বাস করেন তাহাদের অপেক্ষা যাঁহারা প্রেতবাদের স্বপক্ষের তথাকথিত প্রমাণকে বিশ্বাসযোগ্য বা যথেষ্ট মনে করেন না, তাঁহাদের সংখ্যা ঢের—ঢের বেশী।" আবার প্রেতবাদীদিগের মধ্যে আর একজন বলিলেন:—প্রেতবাদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে বই কি;—প্রেতাত্মা কি তাঁর প্রিয় শিষ্য (medium) একটী কাষ্ঠের টেবিলকে শূন্যে তুলিতে পারেন, প্রেতাত্মা শব্দ করিতে পারেন, প্রেতাত্মা কি তাঁর প্রিয় শিষ্য একটী সোণার আংটীকে একটী গোলাপ ফুলে পরিণত করিতে পারেন।" এইরূপ ছাই ভস্ম তর্ক; এইরূপ সব কথা! ভাল রে ভাল, দেখিলাম এইরূপে সময়ের অপব্যয় করা উচিত নয়—দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, কাটান উচিত নয়। তখন আমরা একটী উপায় উদ্ভাবন করিলাম। ঐ উপায়টীই পূর্ব্বোক্ত 'আবিষ্কার'। এখন কোনও প্রেতবাদী আমাদের সহিত তর্ক করিতে আসিলে অগ্রেই তাঁকে বলি:—"আপনার প্রেতবাদে বিশ্বাস করিতে পারা যায় এমন প্রমাণ নাই; প্রমাণ দিন বিশ্বাস করিব। স্পষ্ট প্রমাণ দিন—যেখানে জুয়াচুরী নাই, যে প্রমাণ সকলে বুঝিতে পারে, এমন প্রমাণ দিন বিশ্বাস করিব। আপনি কি আপনার পরিচিত কোন লোক এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন কি? এখানে দাদার বোলে বোল দিতে পারি না,—তা সে দাদা Lodgeই হউন আর যিনিই হউন। প্রমাণটী অন্যায়-যুক্তি (fallacy) শূন্যও হওয়া চাই। এইরূপ একটা প্রমাণ, যেমন প্রেতআত্মার প্রিয়শিষ্য চারটী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের জীবনের নির্দ্দিষ্ট ঘটনাগুলি নির্দ্দিষ্ট সাল তারিখের সহিত বলিবেন; অথবা আমরা একটী শূন্য ঘরে চাবি দিব আর আপনার প্রেতাত্মা বা তাঁর কোন প্রিয় শিষ্য সেই ঘরে একটী ঘটী

বসাইয়া আসিবেন,—এইরূপ স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারেন ত আসুন আমরা তখনি পাঁচ হাজার টাকা দিব; আর আপনি বা আপনার কোন লোক যদি সেরূপ কোন প্রমাণ না দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি পাঁচ হাজার টাকা দিবেন। আসুন এইরূপ লেখা পড়া করুন। তা যদি না পারেন ত বৃথা তর্ক করিবেন না; আমাদের সে সময় নাই।" এইরূপ বলিলে ভায়া তখনি আম্‌তা, আম্‌তা করিয়া কথাটা ছাড়িয়া দেন; আমরাও বাঁচি। কি করি, আমাদের উপায়টী তেমন বিশুদ্ধ নয়, স্বীকার করি। কিছু কাঁচা ও চোয়াড়ে (crude) গোছের। কিন্তু আশু ফল প্রদায়ী বটে।

Vincent A Smith এর "Akbar The great Mogul" বাহির হইয়াছে। অনেকেই প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন আকবরের মৃগী রোগ (epilepsy) ছিল। দেখা যায় অনেক প্রতিভাশালী লোকেরই মৃগী রোগ ছিল। Nietzsche এর ছিল। Napoleon এর ছিল। রুসিয়ার একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক—যাঁর নাম D দিয়ে আরম্ভ হইয়াছে যাঁর পুস্তকের অনুবাদ আমাদের দেশের অনেক যুবক আজকাল গ্রাস করিতেছেন—তিনিও মৃগীরোগগ্রস্ত। এইরূপ একটী লম্বা তালিকা আছে; সব নাম মনে নাই। য়ুরোপে কাহার কাহার ধারণা প্রতিভাশালী (genius) হইলেই লোক মৃগীরোগাক্রান্ত হন। প্রিয় পাঠক, এখন আর আপনি genius হইতে চাহিবেন? যাক্, পূর্ব্বোক্ত ধারণায় কোন সত্য নাই;—অর্থাৎ প্রতিভা আর মৃগী রোগ ইহাদের মধ্যে কোন কার্য্যকরণ সম্বন্ধ নাই। অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন ও আছেন যাঁহারা মৃগীরোগী নহেন।

আকবরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে মহত্ত্বের কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি মুসলমান হইয়াও মুসলমান ছিলেন না,—প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্ম একরূপ ত্যাগই করিয়াছিলেন, সাধারণ মুসলমানদিগের প্রতি বরং অসহিষ্ণুতাই দেখাইতেন। তিনি হিন্দুর অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতেন, সুফিধর্ম্মেও (যা বেদান্তেরই মত, তাহাতেও) বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুরা তাঁকে ধর্ম্মে হিন্দু বলিয়া, পাশীরা পাশী বলিয়া, জৈনরা জৈন বলিয়া এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন তিনি একজন অবিশ্বাসী (sceptic) ছিলেন। আবার এদিকে তাঁর ধ্যান ধারণাও ছিল। ফল কথা, আকবরের ধর্ম্ম—মত ও বিশ্বাসকে নির্দ্দিষ্ট কোন সীমা বা গণ্ডীর মধ্যে ফেলা অসম্ভব। তাঁর ইচ্ছা ছিল সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, এবং সমস্ত ভারতকে সেই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি সেই ধর্ম্ম রাজ্যেরও এক অদ্বিতীয় রাজা হন,—ভারতের ব্যাবহারিক জগতের যেমন একমাত্র সম্রাট ছিলেন। আকবর বাস্তবিকই একজন মহৎ লোক ছিলেন, তাঁর নিকট হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই কিছু না কিছু শিখিবার আছে।

ইংলণ্ডের লোকেরা আজকাল ফ্রান্সে ও অন্যান্য বিদেশে যুদ্ধ ছাড়া নিজের দেশে আর একটী ও আর এক রকমের যুদ্ধ করিতেছেন। সকলে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন যাহাতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা কমে। রাজ্ঞী (the Queen) নিজে, বড় বড় Lords, বড় বড় Ladies,

বড় বড় কর্ম্মচারী, বড় বড় ধর্ম্ম-যাজক, দেশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রদর্শনী হইতেছে, সভা সমিতি হইতেছে, বক্তৃতা হইতেছে, গির্জ্জায় ও স্কুলে উপদেশ হইতেছে, বিল্ পাশ করাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, মিউনিসিপালিটী ও গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ অর্থ-সাহায্যের কথা হইতেছে। পাঠক এ সব আমাদের দেশের চেষ্টার মত নয়। ইংলাণ্ডবাসীরা যা ধরেন তাই করেন। ওঁদের দেশে প্রতি সপ্তাহে এক বৎসরের কম বয়সের শিশু ২,০০০ করিয়া মরিতেছে, আর পাঁচ বৎসরের কম বয়সের শিশু ৩,০০০ করিয়া মরিতেছে। এই মৃত্যু সংখ্যা অবশ্য কারিকর শ্রেণীর (working classএর) মধ্যেই বেশী। ঐ তিন হাজারের মধ্যে প্রায় ১০০০কে ভাল রকম চেষ্টা করিলে বাঁচান যাইতে পারে। বিলাতে এত শিশু মৃত্যুর কারণ কি? বিলাতের অভিজ্ঞ লোকেরা বলিতেছেন প্রধান কারণ এই সবঃ—(১) দারিদ্র্য। (২) অনেক স্থলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও প্রসবের পর স্ত্রীলোকের উপযুক্ত আহার বিশ্রাম ও চিকিৎসাদি না পাওয়া। (৩) অনেকস্থলে ঘর দ্বার অত্যন্ত নোংরা (এই শেষোক্ত কারণটী সম্বন্ধে সাক্ষ্য আমরা নিজে দিতে পারি। আমরা বিলাতে একদিন একটী ইংরাজ স্ত্রীলোকের প্রসব করাইতে যাই। তাঁর ঘর দ্বারে এমন দুর্গন্ধ পাইলাম যে আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিবার উপক্রম হইল। ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় দুই ঘণ্টা পাচালি করিলাম—সন্তান ভূমিষ্ঠ করাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।) (৪) প্রসবের পর সন্তানের উপযুক্ত আহার না পাওয়া। (৫) অনেক স্থলে একটী পরিবারের যতগুলি ঘর থাকা উচিত তা না থাকা। (এ কথারও সাক্ষ্য আমরা নিজে দিতে পারি। একবার দেখিলাম এক গরীব ইংরাজের একটী মাত্র ঘর। সেই একটী মাত্র ঘরই রাঁধিবার ঘর, খাবার ঘর, আঁতুড় ঘর, অন্যান্য ছেলেপিলে ও স্বামীর শোবার ঘর,—সবই।) (৬) স্বামীর গরমির ব্যারাম (syphilis)। (৭) ভাল দুগ্ধ না পাওয়া। (৮) অনেকস্থলে প্রসবের সময় ভাল চিকিৎসা না পাওয়া। (৯) অনেক সময় শিশু সন্তান কিরূপে পালন করিতে হয় তা না জানা। এই ত গেল বিলাতের কথা। আর আমাদের দেশের? বিলাতে প্রতি সপ্তাহে ৩,০০০ শিশু মরিতেছে, আমাদের দেশে তা অপেক্ষা কত বেশী মরিতেছে তার কি সংখ্যা আছে? কারণ পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি আমাদের দেশে সবই বর্ত্তমান,—শতগুণ বেশী রকমে বর্ত্তমান। আর এই অসংখ্য মৃত শিশুর মধ্যে কত শিশুকেই না বাঁচাইতে পারা যাইত ও যায়! ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, প্রাণ মন বিহ্বল হইয়া পড়ে। এ ভীষণ শিশু-হত্যার জন্য দায়ী কে? সুবিজ্ঞ পাঠক আপনিই তাহার উত্তর দিবেন। দেশ ও গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে একটু জাগিবেন না কি?

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

ভক্ত কান্তিচন্দ্র।

নববিধান প্রচারাশ্রমের দ্বিতল গৃহের বারান্দায় একখানি ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বসিয়া অশীতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যিনি মণ্ডলীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, যিনি ধর্ম্ম-জীবনের উষাকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার স্বীয় বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগীর ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে আত্মদান করিয়াছিলেন—যাঁহার বিস্তৃত হস্তের আলিঙ্গন ও বৈদ্যুতিক স্পর্শ ও যাঁহার দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যেও সদা সহাস্যমূর্ত্তি ও প্রফুল্ল, চিত্ততা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিল—যাঁহার স্বাভাবিক ভালবাসার গুণে আশ্রমের ভৃত্য পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কাছে পড়িয়াছিল, আজ আর সে মূর্ত্তি নাই! বিগত ২০শে আগষ্ট রজনী ১টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁর প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে! মণ্ডলীর কাকাবাবু ভক্ত কান্তিচন্দ্র আর এ পৃথিবীতে নাই! যে শ্মশান ঘাটে কেশব, প্রতাপ, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলীর দেহ-ভস্ম ভাসিয়া গিয়াছে, সেই মহা শ্মশানে ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে ভক্ত কান্তিচন্দ্রের চিতাভস্ম ভাসিয়া গেল! ব্রাহ্মসমাজের আংশিক সংশ্রবে আসিয়া যে ভালবাসার অবতার ও সহাস্য মূর্ত্তির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, সে মূর্ত্তি এই ভক্ত কান্তিচন্দ্র। যেদিন প্রথম তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইল, সেই দিন অনেক ক্ষণ মধুর আলাপের পর আমার হস্তে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রচিত Essays Ethical and Theological দুই খণ্ড গ্রন্থ স্নেহোপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল সাধক "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" এই মন্ত্র লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। নিঃস্ব, নিঃসম্বল, কপর্দ্দকশূন্য অথচ তাঁহার হাতে মণ্ডলীর সেবা ভার। কান্তিচন্দ্র প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্যমুখে ভাঙ্গা চেয়ারের উপর বসিয়া কাজ করিতেছেন ও তাঁহার সেই কার্য্য সমুদ্রের মধ্যেও সমাগত বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেছেন। একজন বন্ধু আসিলে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দিবার জন্য বর্ষীয়ান কান্তিচন্দ্র যখন ভাঙ্গা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেন সে মূর্ত্তি যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর তাহা ভুলিতে পারেন না। মৃণালের মত বসিয়া মণ্ডলীর সেবার জন্য যিনি তাঁহাকে উপরের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছেন তিনি আর তাহা ভুলিতে পারেন না। দামিয়ানের মত বসিয়া রোগীর পার্শ্বে তাঁহাকে যিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিতে দেখিয়াছেন তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না। কিঞ্চিদূন চারিশত মাইল ছুটিয়া গিয়া যিনি সমস্তিপুরে ইরিসিপ্লাস্ রোগাক্রান্ত ভক্ত গিরিশচন্দ্রের সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার সে সেবার চিত্র এখনও আমার ও আমার ক্ষুদ্র পরিবারের হৃদয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। ভক্ত কান্তিচন্দ্রের উদ্যম উৎসাহ কোন দিনই কমে নাই। বিগত বর্ষেও এই আগষ্ট মাসে প্রচারাশ্রমের ছাদে বসিয়া

তিনি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে উৎসাহী যুবক প্রচারকের মত আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আমার পরিবারে আরও দুইটী বিবাহে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগী আর কাহাকে বলে? যিনি অশীতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত নিঃস্ব ও নিঃসম্বল অবস্থায় কার্য্য সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়াছিলেন যিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অপরের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন যিনি যৌবনের প্রারম্ভেই বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দুঃখ ও দারিদ্রের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি বিবাহের অব্যবহিত পরে স্ত্রীবিয়োগান্তে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অকৃতদার অথবা হিন্দু বিধবার মত সাধন তপস্যায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তিনি যোগী ভিন্ন আর কোন শব্দে আখ্যাত হইবেন? ব্রাহ্ম-সমাজে ভক্তিভাজন অশীতি পর মহালানবিশ মহাশয়ের পর এই বর্ষীয়ান যোগী আমাদের মধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চরিত্র তাঁহার সেবাধর্ম্ম, তাঁহার ভালাবাসা, তাঁহার সমদর্শিতা ও তাঁহার যোগজীবন সত্যই মণ্ডলীর সমক্ষে আদর্শরূপে তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিতে থাকিবে। বিধাতা সহায় হউন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

কবিরঞ্জনের রচনার অনুক্রম।

কবিন্দ্র স্যার রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ অধুনাতন কাব্যরচয়িতাগণ কোন্ সময়ে কোন্ কাব্য রচনা করেন, মুদ্রাকরের কৃপায় তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়, পরন্তু তাঁহাদিগের রচিত খণ্ডকবিতা গুলিরও নিম্নে, অধিকাংশ স্থলে রচনাকাল লিপিবদ্ধ থাকায় সেই সকল রচনা পারম্পর্য্যনিরূপণে ও সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবোন্মেষের ক্রমোন্নতি অবধারণে যথেষ্ট সুবিধা হয়। এই সুযোগেই 'ভানুসিংহের পদাবলী' কিরূপে 'গীতালি' বা 'গীতাঞ্জলিতে' পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিম্বা 'আর্য্যগাথা' কিভাবে 'মন্দ্র'ধ্বনিতে বা মাতৃসঙ্গীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, রসজ্ঞ পাঠক তাহার ক্রমনির্ণয়ে সমর্থ হয়েন। প্রাচীন কাব্যসমূহে ঐরূপ তথ্য নির্ণয়ের জন্য, ক্বচিৎ ভণিতাপ্রসঙ্গে কাব্যকালের আভাস পাওয়া ভিন্ন, অধিকাংশ স্থলেই অনুমান বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

বড় বেশী দিনের কথা নহে, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী ও কবিতামালার রচনা পারম্পর্য্যনির্ণয়েও পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে, তাঁহার সাংসারিক অভাবক্লিষ্ট মুহুরিগিরির অবস্থাতে হিসাবের খাতায় তদ্রচিত অনুপম সঙ্গীত "আমায় দেও মা তবিলদারী" পাঠ করিয়া তাঁহার সহৃদয় গুণগ্রাহী অন্নদাতা পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রসাদের সাধনাকুল চিত্তকে অন্নচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবার উদ্দেশে "স্বীয় বদান্যতা ও উদারতাগুণে" তাঁহার জন্য "যাবজ্জীবন মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া" দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে শক্তিসাধনায় ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির ও সেই ভক্তিপ্রণোদিত সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সেই গুণের পুরস্কারস্বরূপ 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলে, রামপ্রসাদ নাকি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'বিদ্যাসুন্দর' প্রণয়ন করিয়া মহারাজাকে উপহার দেন! বিষয়বাসনা-পরিশূন্য শক্তিসাধনায় একনিষ্ঠ, রামপ্রসাদ এই অবস্থায়,

"এমন কল ক'রেছে কালী,—বেঁধে রাখে
মায়াপাশে"—

সংসারাসক্তির এবংবিধ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও, 'বিদ্যাসুন্দর' ভিন্ন মহারাজার উপহারযোগ্য* গ্রন্থরচনার অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, একথা বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। পরন্তু তাঁহার সমসাময়িক অন্যতর শ্রেষ্ঠ কবি 'গুণাকর' ভারতচন্দ্র রায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রায়ানুসারে স্বরচিত 'অন্নদামঙ্গলে'র মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দরে'র প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত করেন। এক্ষেত্রে 'বিদ্যাসুন্দরে'র প্রসঙ্গ মহারাজার এতাদৃশ অনুরাগের কারণ অবোধ্য; তবে, ঐ প্রসঙ্গ সত্যমূলক না হইলে, কবিরঞ্জনের কল্পনাই যে উহার মূল,—ও গুণাকরের হস্তে পড়িয়া উহা কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহারই পরীক্ষাচ্ছলে মহারাজা ভারতচন্দ্রকে ঐ প্রসঙ্গ পুনরায় গ্রথিত করিতে আদেশ করেন,—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। সে যাহা হউক, এই 'বিদ্যাসুন্দরে'র উপসংহার ভাগেই কবির বংশপরিচয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আর তন্মধ্যে

"শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা, কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে, মা গো, দেহ পদধূলি॥"

এইরূপ ভণিতা থাকায় ঐ গ্রন্থ যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক 'কবিরঞ্জন' উপাধিপ্রদানের পরে রচিত, তৎপক্ষে সন্দেহ থাকে না।

'বিদ্যাসুন্দর' ব্যতীত 'কালীকীর্ত্তন', 'কৃষ্ণকীর্ত্তন,' সীতাবিলাপ' প্রভৃতি প্রসাদ-রচিত আর কয়েকখানি খণ্ডকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ভণিতাযুক্ত নহে, 'সীতাবিলাপ'ই প্রায় তদ্রূপ ক্ষুদ্র, তবে তাহা ভণিতাযুক্ত বটে—

"রামপ্রসাদ কহিছে শুন, মা জানকি,
রামের মহিমা তুমি না জান কি?

এসকল খণ্ডকাব্যে তাঁহার 'কবিরঞ্জন' উপাধিলাভের পূর্ব্বেই রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'কালীকীর্ত্তন' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; ইহার মধ্যে কোন কোন পরিচ্ছদে মাত্র 'প্রসাদ', কোথাও 'শ্রীরামপ্রসাদ,' কোথাও 'কবি রামপ্রসাদ,' ইত্যাকার ভণিতা দেখা যায়,—আবার অনেক স্থলে "দাসপ্রসাদ বলে", "কবি রামপ্রসাদ দাসে", 'দীন প্রসাদ দাস," "শ্রীরামপ্রসাদ দাসে," "ভণে রামপ্রসাদ দাস," এইরূপ 'দাস' যুক্ত ভণিতা আছে। এই 'দাস' সর্ব্বত্র কেবল দীনতাজ্ঞাপক বলিয়া বোধ হয় না,—তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, দীন প্রসাদ দাস"। বৈদ্যবংশে 'দাস' উপাধি বর্ত্তমান বটে,* কিন্তু সেন (গুপ্ত) ও দাস (গুপ্ত) সম্পূর্ণ পৃথক্ পদবী—এঅবস্থায় কবি রামপ্রসাদ 'সেন' কেন 'দাস' বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, ইহাও বুঝা সুকঠিন। এক্ষেত্রে দাসোপাধারী অপর কোন রামপ্রসাদ 'কালীকীর্ত্তন'এর রচয়িতা বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে; কিন্তু উহার দুই পরিচ্ছেদে—'কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন" এবং

"শ্রীরাজকিশোরদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।

রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥"

এরূপ 'কবিরঞ্জন' ভণিতা দেখা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ উত্থাপনের কোন কারণ থাকে না, পরন্তু এই কাব্যও যে কবির স্বগৃহে অবস্থানকালে নবদ্বীপাধিপতির অনুগ্রহলাভের পরে রচিত, ইহাও প্রতীত হয়।

যাহাহউক, উপরিলিখিত কাব্য কয়েক খণ্ডের দ্বারা কবিরঞ্জনের কবিত্বের বিচার চলে না,—বস্তুতঃ প্রসাদের 'পদাবলী'ই তাঁহার পুণ্যস্মৃতি সজীব রাখিয়াছে, আর যতদিন বঙ্গভাষার জীবনশক্তি থাকিবে, ততদিন সেই স্মৃতি অটুট রহিবে। এই পদাবলী রচনায় ক্রমপরম্পরা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। সচরাচর সংগ্রহ গ্রন্থে রামপ্রসাদের রচিত বলিয়া যে সমস্ত পদ দেখা যায়, তন্মধ্যে অনেক গুলি ভণিতাশূন্য এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক নানাবিধ জঙ্গলা সুরে গ্রথিত। প্রসাদের পদাবলী যেমন অনুপম, প্রসাদী সুরও সেইরূপ স্বতন্ত্র; এজন্য এই মণিকাঞ্চন সংযোগের ব্যতিক্রম দেখিলে তাহা প্রসাদী-পদ বলিয়া গণ্য করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এইরূপ ভণিতাহীন বা জঙ্গলা সুরের গানের মধ্যে—

১। "(আমায়)ছুঁ'য়োনা, রে শমন, আমার
জাতি গিয়েছে।
যেদিন কৃপাময়ী মা আমায় কৃপা করেছে॥"

* * * * *

২। "তিলেক দাঁড়া, ওরে শমন, বদন ভ'রে
মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী আসেন, কি না
আসেন, দেখি॥"

* * * * *

৩। "(ওরে!) সুরাপান করিনে আমি,—সুধা
খাই 'জয় কালী' ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,—যত মদ'-মাতালে
মাতাল বলে॥"

* * * * *

৪। "মা! মা!' ব'লে আর ডাক্‌ব না।—
তুমি দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।"

* * * * *

৫। "এখন দিন কি হ'বে তারা—
যবে 'তারা'! তারা! তারা! বলে
'তারা' বেয়ে প'ড়বে ধারা?"

* * * * *

৬। "তারা! তোমার আর কি মনে আছে?
এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্নি সুখ কি
দিবে পাছে?
শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি, মা,
তোমায় সাধি,

* * *

ওমা! আমার দফা হ'ল রফা,—দক্ষিণা
হ'য়েছে।"—

প্রভৃতি গান অবিসংবাদে রামপ্রসাদের বলিয়া পরিচিত। অতএব স্বকীয় সুর ভিন্ন তিনি দেশপ্রচলিত অন্যান্য সুরেও যে গান রচনা করিতেন,এবং কচিৎ কোন কোন গানে যে ভণিতাসংযোগ করেন নাই, বা ভণিতাযুক্ত অংশ সংগৃহীত হয় নাই, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্যামাপূজার পরদিবস প্রতিমা বিসর্জ্জনকালে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, উপরি-উদ্ধৃত শেষ গানের শেষ চরণ—"আমার দফা হ'ল রফা, দক্ষিণা হয়েছ"—গগনভেদী তারস্বরে গাহিতে গাহিতে প্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অতএব ঐ গানই তাঁহার রচিত শেষ গান বলিয়া অনুমান করিতে হয়। সেইরূপ, কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার মুহুরিগিরীর অবস্থায় হিসাবের খাতায় লিখিত "আমায় দাও মা, তবিলদারী" গানটীই প্রথমে তাঁহার প্রভুপ্রমুখ সাবধানের দৃষ্টি অকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার অপর দুই গানে

১। "দীন্ রামপ্রসাদ বলে * * *
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর.—
আপন ঘরে যায় যে চুরি।"

২। "কার বা চাকুরি কর?—
ওরে! তুই বা কে তোর মনিব
কেরে!—হলি কা'র নফর?"—

পরের ঘরে চাকরি করার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আপন গৃহে স্বাধীন ভাবে শক্তিসাধনা ও সঙ্গীতরচনা-কালে প্রসাদের মনে উল্লিখিত ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব বোধ হয় না; প্রত্যুত, এগানও তাঁহার মুহুরিগিরির অবস্থায় হিসাবের খাতায় লিখিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপে আদি-অন্তের সিদ্ধান্ত করিলে মধ্যভাগে যাহা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা, আগমনী, বিজয়া, "পরন্তু আসব-আবেশে * * নবীনা নগনা লাজবিরহিতা * * বিপরীত ক্রীড়াতুরা * * এলোকেশী * * ভৈরবী * * রণরঙ্গিণী" মূর্ত্তির বর্ণনা ও অপর নানাবিষয়ক সঙ্গীত মিলে। এই সমস্ত গানের বিশেষত্ব এই, কচিৎ 'কবিরঞ্জন' ভণিতাযুক্ত হইলেও, ইহার কোনটাই প্রায় 'প্রসাদী সুরে' রচিত নহে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, সাধারণ শক্তিবাদিগণের ন্যায় দেশাচারসম্মত তান্ত্রিক বা পৌরাণিক ভাবের রচনাতে রামপ্রসাদ দেশপ্রচলিত নানাবিধ সুরের সাহায্য লইতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বাসিত ভাবতরঙ্গ আপন সুরেই প্রকাশ পাইত; আর সেই অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই প্রসাদপদাবলীর অবিনশ্বরত্ব! এই ভাবের ভরে তিনি 'ত'বিলদারী' হইতে সূত্রপাত করিয়া কখন 'কলুর বলদ'সাজিয়াছেন,—কখন 'কৃষি-কাজ' করিয়াছেন,—কখন 'ভূতের বেগার' খাটিয়াছেন,—কখন দাবা, কখন পাশা, কখন দাঁড়া গুলি,কখন বা কেবল ধূলা খেলিয়াছেন, কখন "জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়" ভাবিয়া ভয় পাইয়াছেন,—কখন (ভবসংসার-বাজার মাঝে) মা'র ঘুড়ি উড়ান দেখিয়াছেন,—কখন আসামী, কখন ফরিয়াদি হইয়া মার সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়াছেন;—কখন মন-পাখী'কে 'পড়া' শিখাইয়াছেন,—'কখন 'তারা তরি' অবলম্বনে ভবপারে যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন,—আবার কখন একাগ্রচিত্তে বলিয়াছেন—

মন রে! শ্যামা মাকে ডাক,—
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ।

* * *

রামপ্ররাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা, ত্যজ শঙ্কা, দুর-ছাই ক'রে হাঁক।"

যাহাহউক, সাধনতত্ত্ববর্ণনই তাঁহার পদাবলীর পরম লক্ষ্য। ষড়্‌বর্গদমন এই সাধনতত্ত্বের মূলসূত্র, আর ঐ ছয়টা রিপুর ভয়ে যে তিনি অনুক্ষণ চিন্তাকুল, উপরি-উদ্ধৃত গানে আভাস পাওয়া ভিন্ন, প্রসাদের অনেক পদেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বলদ' অবস্থায় তিনি অনুযোগ করিতেছেন—"(মাগো!) তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত?" "হৃদি-রত্নকরের অগাধ জলে, 'কালী' ব'লে, ডুব" দিবার সময়ে ভাবিতেছেন,সেই রত্নাকরে—"কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, (তা'রা) আহার লোভে সদাই চলে।" এজন্য মনকে উপদেশ দিতেছেন—

"তুমি বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তা'র গন্ধ পেলে।"

ভাঙ্গা ঘরে বসতি করায় বড়ই ভয়, পাছে—

"রাত্রে এসে ছয়টা চোরে মেটে দেওয়াল
ডিঙ্গিয়ে পড়ে।"

মজুরদারি প্রসঙ্গে চিন্তা করিতেছেন, "* * ছয়টা রিপু * * মহা লেঠে।" আবার মা'র কাছে মোকদ্দমা করিতে গিয়া কাতরভাবে বলিতেছেন—

"এক আসামী, ছয়টা প্যাদা,—বল্, মা,
কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে,—ঐ ছ'টাকে বিষ
খাইয়ে প্রাণে মারি ॥"

পুনশ্চ, মনের দান্তা-গুলি খেলা অকালে ভঙ্গ হওয়ায় আক্ষেপ জন্মিয়াছিল—

"ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল,
ভুলে গেলি,"

তাই নৃত্যকালীকে "মনোযন্ত্রে বাদ্য করি'হৃদি-পদ্মে নাচাইব" মানস করিয়া বলিতেছেন—

"আছে আর যে ছ'টা বড় ঠ্যাঁটা,—
সে ক'টাকে কেটে দিব।"

রিপুভয়ের ন্যায় যমের ভয়ও রামপ্রসাদের মনকে মাঝে মাঝে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। সেই ভয়ের আবেগে তিনি কখন ভাবিতেন—

"যমদূত আসি', শিয়রেতে বসি', ধ'রবে
যখন অগ্রকেশে!
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী-কাচা, বিদায়
দিবে দণ্ডী বেশে ॥"

কখন বলিতেন,—

"যখন আস্‌বে শমন, বাঁধ্‌বে ক'সে মন,
কোথা র'বে খুড়া জ্যেঠা।"
মরণ-সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসী,
ছেঁড়া চ্যাটা।"

কিন্তু নিরন্তর মা'র নাম জপে, মা'র মূর্ত্তি ধ্যানে, মা'র প্রতি অটল বিশ্বাসবলে, তিনি সহজেই সে ভয় দূর করিয়া ফেলিতেন, আর মনকে প্রবোধ দিতেন,—

১। "ভবে এসে, ভাব্‌ছ ব'সে, কালের ভয়ে
হ'য়ে ভীত;
ওরে! কালের কাল মহাকাল,—সে
কাল মায়ের পদানত ॥"

* * *

২। "হাতে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী
মাখিব;
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধ্‌বে ক'সে, সেই
কালী তা'র মুখে দিব ॥"

* * *

৩। "যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে
ঠেকে খা'ব।
আমার ভয় কি তাতে?—'কালী' ব'লে
কালেরে কলা দেখা'ব ॥"

* * *

৪। "অভয় পদে প্রাণ স'পেছি,—
আমি আর কি যমে ভয় রেখেছি"

○ ○ ○

৫। "যখন শমন ধ'রবে আসি, ডাক্‌ব 'কালী
কালী' ব'লে।"

পরন্তু, যমদূত বা স্বয়ং স্বয়ং যমকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেন,—

১। "আমার সনদ দেখে যা' রে!
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
ব'ল্ গে যা' তোর যমরাজারে।"

○ ○ ○

২। "দূর হ'য়ে যা', যমের ভটা,—
ওরে! আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।
ব'ল্ গে যা' তোর যমরাজারে,—
আমার মত নি'ছে ক'টা?—
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে
ব্রহ্মময়ীর ছটা।"

○ ○ ○

৩। "চেন না আমারে শমন! চিনলে
পরে হ'বে সোজা।
আমি শ্যামা মা'র দরবারে থাকি,—
অভয় পদের বই, রে! বোঝা ॥"

○ ○ ○

৪ যা', রে শমন! যা' রে! ফিরে,—
তোর যমের বাপের কি ধার ধারি?

○ ○ ○

রামপ্রসাদের মা শঙ্করী,— দেখ্ না
চেয়ে—ভয়ঙ্করী।"

○ ○ ○ ○

৫। "ওরে শমন! কি ভয় দেখাও মিছে?
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে
মোরে অভয় দেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মনকে সদাই সতর্ক করিয়া দিতেন—

"কেন, মন, এত ভুল?—
ওরে! 'কালী' নাম অন্তরে জপ,—বেলা
অবসান হ'ল।"

আর একমনে কাতর প্রাণে মা'র কাছে প্রার্থনা করিতেন,—

"যেন অন্তকালে তনু আমার টেনে ফেল
গঙ্গাজলে।"

○ ○ ○

"যেন অন্তিমকালে 'দুর্গা' ব'লে প্রাণ
ত্যজি জাহ্নবীর তটে।"

সম্প্রতি আমরা নবকুমার শর্ম্মার মুখে শুনিয়াছি,—"যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ-দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়া সেইরূপ হইতে পারে।" ইহার অনেক পূর্ব্বে রামপ্রসাদ শুনাইয়াছেন—

"নানা তীর্থপর্য্যটন শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পা'বে ঘরে ব'সে চারি ফল,—বুঝ না, রে দুখ-
চেটে!"

একদিন মাত্র তাঁহার মনের সাধ শুনি বটে,—

"আমি কবে কাশীবাসী হ'ব?—
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ
নিবারিব।"

আর একদিন তাঁহাকে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুনা যায়,—

"আমি ঐহিক সুখে মত্ত হ'য়ে হে'তে নার্‌লাম
বারাণসী।"

নচেৎ সকল সময়েই তাঁহার সেই এক কথা—

১। "প্রসাদ বলে, কি ফল হ'বে হই
যদি গো কাশীবাসী?"

○ ○ ○ ○

২। "কাজ কি রে মন! গিয়ে কাশী?—
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।"

○ ○ ○

৩। "কাজ কি তীর্থ গয়া কাশী,
যা'র হৃদে জাগে এলোকেশী?"

○ ○ ○

৪। "কেন গঙ্গাবাসী হ'ব?—
ঘরে ব'সে মা'র নাম গায়িব,—

○ ○ ○

কালীর চরণতলে কত শত গয়াগঙ্গা
দেখতে পা'ব।"

○ ○ ○

৫। "তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন ক'র না রে!"

○ ○ ○

৬। "আর কাজ কি আমার কাশী
ওরে! কালীর পদকোকনদে তীর্থ রাশি-রাশি।

○ ○ ○

গয়ায় ক'রে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে
পায় ত্রাণ;—
ওরে! যে করে কালীর ধ্যান,

তা'র গয়া শুনে হাসি।

কাশীতে ম'লেই মুক্তি,—এ বটে

শিবের উক্তি ;—

ওরে ! সকলের মূল ভক্তি,

মুক্তি তা'র দাসী।"

আর অন্তিমেও সেই একমাত্র উপায় স্থির—

"এ সংসারে আসি',

আমি না করিলাম গয়াকাশী,—

যখন শমন ধ'র্‌বে আসি'—

ডাক্‌ব 'কালী কালী' ব'লে।"

পারলৌকিক কল্যাণকামনায় তীর্থপর্য্যটন নিরর্থক ভাবিলেও, প্রসাদ স্বয়ং সাধনপ্রণালীর কোন নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করেন নাই, গুরুদত্ত তত্ত্বেই তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁহার মুখে সদাই শুনিতে পাওয়া যায়,—

১। "রামপ্রসাদ বলে,—

হৃদিস্থলে গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা।"

* * *

২। "ও মন ! গুরুদত্ত তত্ত্ব কর,—

কি করিবে রবিসুত ?"

* * *

৩। "মন রে ! তুমি শ্রীনাথদত্ত * কর তত্ত্ব,—

কালের কপাট খোল না।"

* * *

৪। "গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে,

আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটি,

পান করে মোর মন-মাতালে।"

* * *

৫। "গুরুদত্ত বত্নতোড়া বাঁধ রে !

যতনে ক'সে।"

* * *

৬। গুরুদত্ত রত্নভরে কেন ব্যাপার

না করিলি ?"

* * *

৭। "(আমি) জানাইব কেমন ছেলে,

মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।

যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ

গুজরাইব মিছিলকালে॥"

* * *

৮। "গুরুদত্ত বীজ রোপন ক'রে,

ভক্তি-বারি তায় সেচ না।"

* * *

৯। "আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পা'ব

রাশ রাশি।"

* * *

১০। "গুরু আমায় কৃপা ক'রে, মা,

বুঝ্‌বি, রে মন ঠারেঠোরে॥"

০ ০ ০

২। "(মা মোর) মায়াতীত নিজে মায়া,—

---

* প্রসাদের অনেক পদে 'শ্রীনাথ' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি উদ্ধৃত অংশের ন্যায় নিম্নলিখিত সকল স্থলেই উহা তাঁহার গুরুদেবের লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়।

১। "যদি পার হরি, মন, ভবার্ণবে,

শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী।"

* * *

২। "শুনি'ছি শ্রীনাথের কথা,

বট' চতুর্ব্বর্গদাতা।"

* *

৩। "শমনদমন শ্রীনাথচরণ সর্ব্বদাই

হৃদে ধরি।"

* * ০

৪। "শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,

দেখালেন কালীপাদপদ্ম কল্পগাছে।"

* *

৫। মন যদি মোর ওষুধ খা'বা,

আছে শ্রীনাথদত্ত পটলসত্ব,—

মধ্যে মধ্যে ঐটী চা'বা।"

যে ধন দিলেন কাণে কাণে।

এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র;—

তা'ও হারালাম সাধন বিনে॥"

সেই গুরুদত্ত মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রামপ্রসাদ নিরন্তর নাম জপে নিরত থাকিতেন,—
"মুখ গুরুদত্ত মন্ত্র করি', দিবানিশি জপ্ করে।"
আর মনকে উদ্বোধিত করিতেন,—

"মন রে ! কবে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পা'বি—

ডাক সদা কেলে মা'রে।

০ ০ ০

"প্রসাদ বলে—দুর্গানাম জপ, মন, অবিরাম।"

এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আনুষ্ঠানিক "সন্ধ্যা-পূজা বিড়ম্বনা",—তিনি সাধনকল্পে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন,—

"শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

নামরূপে সিদ্ধ হইয়া রামপ্রসাদ শক্তিস্বরূপিনী জগৎপ্রসবিনী মা'র সহিত এতই আত্মীয়তা সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে, সন্তানের ন্যায় সরল প্রাণে, সদাই তাঁহার কাছে আবদার ও অভিমান প্রকাশ করিতেন ;—

১। "বল্, মা তারা ! দাঁড়াই কোথা ?

০ ০ ০

তুমি না করিলে কৃপা, যা'ব কি বিমাতা যথা ?

০ ০ ০

ওমা, যেজন তোমার নাম করে,

তা'র হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা !"

০ ০ ০

২। "অভয় পদ সব লুটা'লে—

কিছু রাখ্‌লি না মা তনয় ব'লে।

০ ০ ০

জন্ম-জন্ম-জন্মান্তরে কতই দঃখ দিয়েছিলে।

রামপ্রসাদ বলে,—এবার ম'লে ডাক্‌ব

সর্ব্বনাশী ব'লে।"

০ ০ ০

৩। "আমি তাই অভিমান করি,—

আমায় ক'রেছ, গো মা, সংসারী।

০ ০ ০

প্রসাদে প্রসাদ দিতে, মা, কেন এত হ'লে

ভারি ?

যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ

সারি।"

৪। "যাও, গো জননি ! জানি তোরে,—

তা'রে দেও দ্বিগুণ সাজা, মা,

যে তোমায় খোসামুদি করে।

'মা ! মা !' ব'লে পাছু পাছু

যেজন স্তুতি-ভক্তি করে,

দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে,

দাখিল করিয়া যমের ঘরে

০ ০ ০

৫। "আমি নই পলাতক আসামী ;—

ওমা ! কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ?

০ ০ ০

যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু মাঝে,

ডুবেও পদে হ'ব হাসি।"

প্রসাদের মার কা'ছে এই আব্‌দারে, পরন্তু তাঁহার পদাবলী মাত্রে, ভক্তির ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ, মুক্তির পথে ভক্তিই তাঁহার সার ধর্ম্ম ; তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্মোপরি,"

কিন্তু "মন ! ভাব শক্তি, পা'বে মুক্তি,

বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া"।

০ ০ ০

"ওমা ! শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে

মুক্তি জলে টেনে ফেল।"

তবে, তিনি অন্ধ ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া কর্ম্মে বিমুখ নহেন ; প্রত্যুত, তাঁহার বিশ্বাস—

"কর্ম্মসূত্রে যা আছে, মন,

কেবা পাবে তা'র বাড়া।"

০ • ০

"যা'র যেম্নি কর্ম্ম, তেম্নি ফল,—
কর্ম্মফল ফল ফ'লে আছে।"

এজন্য তিনি মনকে নিয়তই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেন—

"প্রসাদের মন হও যদি, মন,
কর্ম্মে কেন হও রে! চাষা?—
ওরে! মনের মতন কর যতন,
রতন পা'বে অতি খাসা।"

ভক্তিতত্ত্বের অধীন রামপ্রসাদ স্বতই দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী,—'সোহহং' ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না,—'নির্ব্বাণ' অবস্থা তাঁহার আদৌ কামনীয় নহে—

"প্রসাদ বলে,—ভক্তের আশা—
পূরাইতে অধিক বাসনা;—
সাকারে সামীপ্য হবে—
নির্ব্বাণে কি ফল বল না?"

০ ০ ০

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল?—
জলেতে মিশায় জল।
ওরে! চিনি হওয়া ভাল নয়;—
চিনি খেতে ভালবাসি।"

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও, আধুনিক শাক্ত-বৈষ্ণবের ন্যায়, প্রসাদের মন শক্তি-বিষ্ণুর মধ্যে ভেদজ্ঞান বা পরস্পর কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাব ছিল না; প্রত্যুত, তিনি নির্ব্বিকল্প চিত্তে বলিতেন,—

১। "মন ক'র' না দ্বেষাদ্বেষি, ০ ০ ০
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—
সকল আমার এলোকেশী।

০ ০ ০

প্রসাদ বলে,—ব্রহ্মনিরূপণের কথা—
(সে কেবল) দোলার হাসি! আমার ব্রহ্মময়ী
সকল ঘটে,—পদে গঙ্গা গয়া কাশী।"

২। "উপাসনাভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক ক'রে ভাবে,
তা'র হাতে, মা, কোথা বাঁচ?"

০ ০ ০

৩। প্রসাদ ভণে, অভেদ জ্ঞানে
কালরূপে মেশামেশি।
ওরে! একে পাঁচ, পাঁচেই এক,—
মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষি॥"

মাতৃমন্ত্রে একদিন আমরা শুনিয়াছিলাম—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"
ত্বংশ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জাপুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তি ক্ষান্তিরেব চ॥

০ ০ ০

ত্বমেব সা ত্বাং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"

আর এখনও কাণে বাজিতেছে—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,'
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

রামপ্রসাদও সেই সুরে সুর মিশাইয়া শুনাইয়াছেন—

তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা! তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ
কলা গাছে॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি,—
শিব ব'লেছে'।
ওমা! তুমি দুঃখ, তুমি সুখ,—
চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥'

মাতৃভাবে রামপ্রসাদ কোন্ পরমতত্ত্বের অন্বেষী, তিনি তাহার ঈঙ্গিত করিয়াছেন,—

১। "প্রসাদ বলে,—মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব
করি যারে,
সেটা—চাতরে কি ভাঙ্গ্‌বে হাঁড়ি?—

উপাসনা হেতু কায়া।"

০ • ০

৩। "মায়ীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা,—
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা।"

• • ০

৪। "(তবে) এমন দিন কি হ'বে তারা!
(যবে) ঘুচে যা'বে ভেদাভেদ—
তারা আমার নিরাকারা।

ভাবের ভরে, এই অবস্থায়, তিনি যখন ভ্রান্ত মনকে বুঝাইতে থাকেন,—

"মন! তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন, তা চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে! ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,—
জেনেও কি তা' জান না?
জগৎকে সাজা'চ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন-সোণা.
ওরে! কোন্ লাজে সাজাতে চাস্
তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে! কোন্ লাজে খাওয়াতে চা'স্
তাঁয় আলো চা'ল আর বুট-ভিজানা?
জগৎকে পালি'ছেন যে মা
কত যত্নে—তাও জান না?
ওরে কেমনে বলি চা'স্ দিতে তাঁয়
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা?"

তখন আমাদিগের ন্যায় মোহান্ধেরও চক্ষু ক্ষণিকের জন্য উন্মীলিত হয়, আর তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বার বার নমস্কার করি

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

বংশ রক্ষা।

যাহার বহু সন্তান হইত, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত লোকেরা তাহাকে নিন্দা করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত মনে লাগিয়া রহিয়াছে। একজন ধার্ম্মিক লোকের বহু সন্তান জন্মিয়াছিল, একজন শিক্ষাগর্ব্বী বলিলেন যে, "শূয়রের মতন এতগুলি সন্তান যে উৎপন্ন করে, তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় না।" আজ কয়েক বৎসর হইতে জোয়ার ফিরিয়াছে। এখন এই "ধ্বংসোমুখ জাতির" লোক সংখ্যা কিরূপে বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এখন পুত্রোৎপাদন পাপ নহে, ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান মহা যুদ্ধে, ইংলণ্ডে অবিবাহিত-দিগেরই আগে ডাক পড়িয়াছিল, পরে বিবাহিতদিগের ডাক পড়িয়াছে। বিবাহিত-দিগের প্রতি এরূপ পক্ষপাত করার একমাত্র কারণ বংশ রক্ষার চেষ্টা। যুদ্ধের জন্য, রাজ্য রক্ষার জন্য. বল সঞ্চয়ের জন্য, লোকের প্রয়োজন, তাই আজি বিবাহিত নরনারীর এত আদর ও তাহাদের মূল্য এত অধিক।

ফরাসী জাতি, সভ্যতার ছল করিয়া শুধু স্ফুর্ত্তিবাজ হইয়া বেড়াইবার জন্য বিবাহ-প্রথাকে একরূপ অনাবশ্যক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। বেশী দিন সেপথে চলিলে, জাতিটী হয়ত ধ্বংসের মুখেই যাইত। কিন্তু ভুলটা ধরা পড়িতে বেশী বিলম্ব হয় নাই।

এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ ফরাসীর বিলাস-স্বপ্নকে একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এখন সকলেরই "জন" চাই।

হিন্দুরা, চিরকালই "বংশরক্ষা"কে গৃহস্থের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়াছেন এবং ইহাকে লৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সঙ্গে এমন করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, "নির্ব্বংশ" শব্দটা হিন্দুর নিকট একটা বিভীষিকা হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত কল্যাণকে ধর্ম্মের মধ্য দিয়া মর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে এরূপ আর কোন জাতি সক্ষম হইয়াছে বলিয়া জানি না। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারি না।

কিন্তু লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই যে দেশের অবস্থা উন্নত হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না। জন সংখ্যার হ্রাস যেমন উন্নতির অন্তরায়, জন সংখ্যার বৃদ্ধি সেইরূপ সর্ব্বত্রই উন্নতি-জনক নহে, ইহার সঙ্গে আরও কিছু চাই।

এদেশে হিন্দু মুসলমান প্রায় সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে। সন্ন্যাসী, ফকির কি বিবেকী না হইলে, অথবা গলিত কুষ্ঠাদি সু-কঠিন রোগ না জন্মিলে, এদেশের নরনারী কেহই অবিবাহিতা থাকে না। সন্তান, বিবাহের অনিবার্য্য ফল, সুতরাং অনাহার, অল্পাহার ও প্লেগ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির ভয় ভিন্ন এদেশে বংশ লোপের অন্য বিশেষ ভয় নাই। যে কারণে এই জাতি অধঃপাতে যাইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ অন্যরূপ।

পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশেই কোন না কোনরূপে দরিদ্র ও অনাথ শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত আছে। অনাথাশ্রম, দরিদ্রাশ্রম প্রভৃতিতে অনাথ ও অক্ষমগণ আশ্রয় পায়, অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায়, এদেশে সে সমস্ত নাই। পূর্ব্বে যেরূপ সমাজ-সংস্থান ছিল এবং যেরূপে নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সর্ব্ব শ্রেণীই সাহায্য প্রাপ্ত হইত, এখন আর সে সকল অনুষ্ঠান নাই। শ্রাদ্ধপ্রভৃতি দশবিধ অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ ও ব্রতাদি কার্য্যের সমারোহ উঠিয়া গিয়াছে, অথচ ঐসকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে সকল জনহিতকর কার্য্য মিশ্রিত ছিল, সে সকল রক্ষার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা হয় নাই।

যে সকল কার্য্য করিয়া লোকেরা জীবিকা অর্জ্জন করিত, সে সকল কার্য্য পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশের অধিবাসীরাই অল্লাধিক পরিমাণে আমাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। পৈতৃক ৪ বিঘা জমি ছিল, দুই ভাইয়ের একজন জমি চাষ করিত, অন্য জন ডিঙ্গি-নৌকা কিম্বা গরুর গাড়ী চালাইয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা দ্বারা জমির খাজানা ও ও মহাজনের ঋণ আদায় দিয়া সংসারের দৈনিক খরচ মৎস্য তরকারী কিনিত এবং কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত। জমির উৎপন্ন দ্রব্যে বৎসরের খোরাকী বাদে কিছু উদ্বৃত্ত হইত। তখন শ্রমজীবীদিগের অবস্থা সচ্ছল ও সুনিশ্চিত ছিল। এখন ট্রেণে ও ষ্টিমারে জল ও স্থল পথের সমস্ত পয়সা, বেড়জালে যেমন পুকুরের সমস্ত মাছ ছাঁকিয়া নেয়, সেইরূপ ছাঁকিয়া নিতেছে। স্বদেশী শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে দুচারিটী পরিত্যক্ত চুণা পুঁটী যাহা পড়িতেছে,তাহাতে পেটভরার সম্ভাবনা নাই। যে সকল ডিঙ্গি-নৌকার মাঝিরা, খোরাকী বাদে প্রত্যেকে রোজ অন্ততঃ বারো আনা উপার্জ্জন করিত,যাহাদের বিরামের সময় থাকিত না,তাহারা আজি দুই আনার জন্য জাহাজ ঘাটে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। যদি

কোন কোমল-কায় বাবু জাহাজ-ঘাট হইতে হাঁটিয়া বাড়ী না গিয়া নৌকায় যান, তবেই সেই দুই আনা জুটিবে।

এরূপ দুঃখ অনিবার্য্য। গরীবের অন্ন সংস্থানের দোহাই দিয়া রেল ও ষ্টিমার গুলি তুলিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা বা অনুরোধ করা পাগলামী ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে এখন উপায় কি? বংশ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক, অথচ যাহারা বংশরক্ষা করিবে তাহারা এবং তাহাদের বংশধরগণ কি খাইয়া বাঁচিবে তাহার সংস্থান নাই। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক জমাজমি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;বাহির হইতে উপার্জ্জনের পথ একান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এ সঙ্কটে উপায় কি?

"যাহার সন্তান পালনের সামর্থ্য নাই, সে বিবাহ করিবে কেন?" এরূপ প্রশ্ন পাশ্চাত্য শিক্ষার একটী ব্যর্থ ধাপ্পা। যদি গরীব লোকেরা বিবাহ না করিতেন, তবে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে আমরা বহুসংখক সুযোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম না। শুধু আমাদের দেশে নয়, সকল দেশেরই এরূপ অবস্থা। বিশেষতঃ আজকালকার বংশরক্ষার প্রয়োজনের দিনে ঐরূপ উপদেশ কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এখন উপায় কি?

দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা শুধু বাঙ্গালা দেশ দেখিলে বুঝা যায় না। বেহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতির পল্লীগ্রামে বাস করিয়া আমরা যে সকল দৃশ্য দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশের কোন দরিদ্রের সেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি দেখা যায় না। এই সকল দেশে থাকিয়া আমরা যখন বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদে বিচলিত হই, চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই, বাঙ্গালাদেশের প্রতি আমাদের অধিকতর অনুরাগই উহার প্রধান কারণ। অন্যথা এই সকল দেশের অধিকাংশ গ্রাম্য অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় নহে।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিবের প্রদত্ত হিসাব অনুসারেই প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে আয় বাৎসরিক ২৭৲ সাতাস টাকা, তাহাতে মাথা প্রতি মাসিক গড়ে ২।০ দুইটাকা চারি আনা পড়ে। বড় লোকদিগের বড় মানুষী এবং মধ্যবিদ্‌দিগের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া বহু সংখ্যক গরীবের ভাগে সেই দুইটাকা চারি আনার অংশ ৷৷০ আট আনার অর্থাৎ দৈনিক একপয়সার অধিক পড়ে না। বাঙ্গালীরা চিন্তা করিতে পারে না যে, এক পয়সায় দুই বেলা মানুষ কি খাইয়া বাঁচে।

আমি যখন কার্য্যব্যপদেশে ছোটনাগপুর ও বেহারের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলাম, তখন দুঃখের ছবি দেখিয়া সে সকল স্থানে বাস করা অসম্ভব মনে হইয়াছিল।

একদিন প্রভাত কালে দেখিলাম, একটী বটগাছের তলায় বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, বালক বালিকা, জড় হইয়া হুড়োহুড়ি করিয়া বটফল কুড়াইতেছে। সকলেই হৈন্নে হইয়া গাছের দিকে তাকাইয়া আছে। একটী ফল পড়িলেই কাড়াকাড়ি। ফলটী যে পাইল, অমনি রসগোল্লার মতন মুখে ফেলিয়া দিল। ইহারা শিমূল তুলার বীচি পিসিয়া খায়, কোন কোন গাছের কচিপাতা খায়। যে সকল জংলী কুল অত্যন্ত কটু কসায়, পক্ষীরা যে গুলিকে বিস্বাদ জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল কুল, বীচির সহিত কুটিয়া ভাঁড়ে

জমা করিয়া রাখে এবং মহুয়ার সময় দুই চারিটী মহুয়ার সঙ্গে সে গুলি উদরস্থ করে। জিজ্ঞাসা করিলাম, “বীচিগুলির সহিত কুটিয়া রাখ কেন?” উত্তর পাইলাম, “নতুবা শীঘ্র শীঘ্র হজম হইয়া যায়”! এক গ্রামের জল কেমন জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলাম “বাবু তোদের তরে ভাল, আমাদের তরে ভালো নয়”। উত্তরের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, একথার অর্থ কি? উত্তর পাইলাম, “এইজলে বড়ই জল্‌দি জল্‌দি হজম করে”। এক পয়সায় লোকের কিরূপে দিন চলে, তাহা কতক পরিমাণে বুঝিলাম। এসকল বর্ণনা উপন্যাস নহে, নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা।

এই যে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সোণার চাঁদ সন্তানগুলি সহ কুকুর বিড়ালের অপেক্ষাও হীন ভাবে জীবন যাপন করে, মনুষ্য-শিশুকে দেখিলে মানুষের সন্তান বলিয়া বুঝা যায় না, এই যে খাদ্যাভাবে যুবতীর বক্ষে মাতৃ চিহ্ন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সেই শুষ্ক বক্ষ চুসিতে চুসিতে শিশু সন্তান ক্ষুধায় কাঁদিয়া আকুল হইতেছে; ঐ যে বলিষ্ঠ পুরুষগণ দুই বেলা আহার না পাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, ইহার উপায় কি?

বৃটিশরাজ, দুর্দ্দম শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া লোকাভাব অনুভব করিতেছেন। ভারতের এই অনাথ নিরাশ্রয়গুলিকে মানুষ করিয়া তুলিলে অনায়াসে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইতে পারিতেন।

লাইকর্গস এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন যে, স্পার্টা দেশের এই সমস্ত সন্তানই সরকারের, রাজপুরুষগণই রাজ্যের সন্তানগণের রক্ষার ও শিক্ষার অধিকারী, তাঁহারাই সে বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং তাঁহাদের বিবেচনায় যে সকল দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ কিম্বা কঠিন রোগগ্রস্ত বালক কখনও দেশের কাজে আসিবে না, তাহাদিগকে রাজপুরুষগণ অবাধে বধ করিবেন। লাইকর্গসের নিয়মের শেষ নিষ্ঠুরাংশ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সন্তান পালনে অক্ষম, এমন লোকদিগের সন্তানগণকে রাজশক্তি যদি অভিভাবক হইয়া পালন করেন, তবেই এ দেশের এবং এদেশের রাজ-শক্তির প্রকৃত ও প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। এই নিয়মকে বাধ্যতা-মূলক (compulsory) করিতে হইবে না। লোকেরা যেরূপ দরিদ্র, সন্তান পালনে অক্ষম, তাহাদের নিকট গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলে অনায়াসে বুঝিবে, বংশ রক্ষা যদি সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তবে সন্তানগণের লালন পালনের জন্য শুধু পিতা মাতাকে দায়ী করিলে চলিবে না। যেখানে পিতা মাতা সন্তান পালনে অক্ষম, সেখানে রাজশক্তি কিম্বা সমাজ শক্তিকে পালন ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পরাধীন দেশে রাজশক্তির সাহায্য ভিন্ন সমাজ-শক্তি এসকল কার্য্য করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, পরাধীন দেশের ধনিগণ অধিকাংশই একান্ত ভীরু এবং তোষামোদপরায়ণ, যে কার্য্যে স্পষ্টরূপে রাজপুরুষগণের সহানুভূতি নাই, সে কার্য্যে সাহায্য দান করিতে এবং উদ্যোগী হইতে তাঁহাদের সাহস হয় না। “আহা বাছা” বলিয়া মেয়েলী দয়া করিয়া কোন জাতিকে উন্নত করা যায় না। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন অসংখ্য দরিদ্র শিশু রক্ষা করিয়া কাজে লাগাইতে অন্যের শক্তি নাই।

এখন এদেশে কঠিন সমস্যার বিষয় কি? যে দেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, দুর্দ্দশা, দীনহীনতা বৰ্দ্ধিত হওয়া অনিবার্য্য, সে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, অথবা কয়েক কোটী লোকের যে কোন রূপে নির্ব্বংশ হওয়া কর্ত্তব্য? হায়, যে সোণার চাঁদদিগকে কোলে পাওয়ার জন্য সমস্ত জগৎ লালায়িত তাহাদের শুভাগমন আমাদের পক্ষে কতই বিষাদের হেতু হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

বাঁকিপুর সাহিত্য-সম্মিলন—প্রত্যুত্তর। *

“মানসীর” আষাঢ় মাসে প্রকাশিত সাহিত্যসম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা ভাদ্রের ‘ভারতবর্ষে’ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় করিয়াছেন। সাধারণতঃ, এরূপ সমালোচনার উত্তর দেওয়া হয় না; কিন্তু অমরেন্দ্রবাবু কেবল আমাকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন এবং সকল খবর না জানিয়া (অথবা জানিয়াও গোপন করিয়া) সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া এই প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। হয় ত ইহা আমার ধৃষ্টতা। কারণ অমরেন্দ্রবাবু আজকাল সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন সকল বিষয়েরই সমালোচনা করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিক্রমাদিত্যবরেণ্য কাশীমবাজারাধিপতিকে তাচ্ছিল্যসূচক ভাষা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং বর্ত্তমানে তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনেক দোষ (?) দেখাইতেছেন। সুতরাং এহেন ব্যক্তির সহিত মসী যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা বৈকি?

১। অমরেন্দ্রবাবু আমার আলোচনার প্রথম ত্রুটী ধরিয়াছেন নিমন্ত্রণ লইয়া। তিনি লিখিয়াছেন, বাঁকিপুর সম্মিলন উদ্যোক্তৃবর্গ “পরিষদের সকল সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য”। দেখিতেছি, অমরেন্দ্রবাবু “সবজান্তা” হইলেও খোঁজ খবর রাখেন খুব কম। বর্দ্ধমানে যে এরূপ “নারুদে” নিমন্ত্রণে আপত্তি হইয়াছিল, তিনি তাহার খোঁজ রাখেন না। তৎপরে তাঁহার দৃষ্টি ১৩২১র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৯৭ পৃষ্ঠার প্রতি সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে এরূপ ছাপা আছে “৫। (ক) সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই যোগ দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন—

(ক) প্রতিনিধিবর্গ—বিভিন্ন সাহিত্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(খ) নিমন্ত্রিত—অভ্যর্থনা সমিতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ।

(গ) সাহিত্যানুরাগী যে সকল ব্যক্তি

---

* ইহা ভারতবর্ষে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু না ছাপাইয়া ফেরত দিয়াছেন। লেখক।

স্বয়ং উপস্থিত হইবেন।

(ঘ) সাধারণ দর্শকবৃন্দ।"

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সম্মিলন পরিচালন সমিতির নিয়মে এরূপ কোন কথা নাই যে, সাহিত্য পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, নিয়মাবলী পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, সাহিত্য-সমিতিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সম্মিলনে প্রেরণ করিবেন এবং ইঁহাদিগকে কোন নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নাই। অভ্যর্থনা সমিতি যাঁহাদিগকে ইচ্ছা তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করিবেন। নিমন্ত্রিত বলিয়া একটী দফা দিবার উদ্দেশ্যই তাই।

শুধু যে আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের এইরূপ নিয়ম আছে, তাহা নহে। অন্যত্রও এইরূপ প্রথা দৃষ্ট হয়। জাতীয় সমিতির (Indian National Congress) এক অধিবেশনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাহাতে Distinguished Visitors (সম্মানীয় দর্শক) ব্যতীত এরূপ ব্যক্তিগত কাহাকেও নিমন্ত্রিত হইতে দেখি নাই। জাতীয় মাদক নিবারণী ও জাতীয় শিল্প-সম্মিতিতেও (All India temperane co ference এবং All India Industrial Conference) যে এরূপ ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ হয় না, সে সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতা আছে।

২। অমরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "Come one and all লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপিয়া দিলে কয় জন উপস্থিত হইতেন, তাহা অনুমান করা কি এতই কঠিন?" না, বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে যেখানে অমরেন্দ্রবাবুর ন্যায় ব্যক্তি dictator, সেখানে ইহা কঠিন নহে সত্য। কিন্তু, অন্য সম্মিলন মাত্রেই এইরূপ হয়। অমরেন্দ্রবাবু এই প্রসঙ্গে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

৩। অমরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "নিমন্ত্রিতগণ সকলেই পৃথক, তাঁহাদের একের কার্য্যের জন্য অপরে দায়ী হইতে পারেন না।" আমরাও সকলকে দায়ী করি নাই—আমরা কয়েকজনের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু অমরেন্দ্রবাবু একস্থলে নিমন্ত্রিতগণ পৃথক এবং তাঁহাদের একের কার্য্যের জন্য অপরে দায়ী হইতে পারেন না বলিলেও অন্যত্রে "আজ ছয় মাস পরে শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস-প্রমুখ নিমন্ত্রিতগণের দোষ এবং অপরাধ-কাহিনীর তালিকা দিয়াছেন।" সমালোচক মহাশয়কে এরূপ ন্যায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। দুইটী প্যারাগ্রাফে যিনি এইরূপ দুইটী মত প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই বঙ্গের উপযুক্ত সমালোচক বটে। এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র বাবুকে বর্দ্ধমানে যে দুইটী প্রতিনিধি স্বেচ্ছাসেবকদ্বয়কে জুতা খুলিয়া দিতে ও গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ তাৎকালীন "আনন্দবাজার পত্রিকায়" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অমরেন্দ্রবাবু এই অমার্জ্জনীয় অভদ্রতাকারী ভদ্র লোকগণের নাম ধাম চাহিয়াছেন—কারণ তাহা হইলে তিনি এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু, এ সকল ব্যক্তিগণের নাম ধাম প্রকাশ না করিয়াই যে আমরা ভাল করিয়াছি, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। অমরেন্দ্র বাবু দয়া করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছুক হইলেও আমরা তাঁহাকে বিচারক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

৪। প্রতিনিধির দেয় ফি সম্বন্ধে আমরা নিমন্ত্রণ পত্রে কেন লিখিয়া দেই নাই, তাহার কারণ অমরেন্দ্র বাবু চাহিয়াছেন। যিনি

পরের সমালোচনা করিতে যান, তিনি যে এইটুকুও খবরও রাখেন না, বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এ বিষয়ে অমরেন্দ্র বাবুকে পরিষদের ও সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিয়মাবলী সবিনয়ে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আর অমরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে,একজন প্রতিনিধি ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন—ইহার অর্থ এই যে, তাহা হইলে আর অন্য প্রতিনিধিকে প্রতিনিধির ফি দিতে হইবে না। কি সুন্দর অর্থ! সাধু মহাশয়, ধন্যবাদ। সম্মিলন-ক্ষেত্রে এরূপ দান নূতন নহে, তাহা কি অমরেন্দ্র বাবু জানেন না? যে কাশীমবাজারাধিপতিকে তিনি "নন্দী মহারাজ" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তিনিই বহু সম্মিলনে এরূপ দান করিয়াছেন।

৫। অমরেন্দ্রবাবু আমার ক্ষমা অসীম বলিয়াছেন। অমরেন্দ্রবাবু "নিজের কথা বলিতে চাহেন না"। অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে যে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, সে কথা বলিতে না চাহিয়াও বলিয়াছেন। ধন্যবাদ। কিন্তু তিনি অন্য যে কয়েকটীর কথা "নায়কে" পড়িয়াছেন,নায়কেই তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর পাঠ করেন নাই কি? অথবা convenient memory'র সাহায্য লইয়াছেন। কথাটী এই "ঢাকার ইতিহাস"-প্রণেতা যতীন্দ্রবাবু 'নায়কে' লেখেন যে "তাঁহার রাখালদাস বাবু ও রমেশবাবুর নিমন্ত্রণ হয় নাই এবং সে কথা জানিয়াও সম্পাদার মহাশয় কোন প্রতিকার করেন নাই।" নায়কে এই পত্র প্রকাশিত হওয়া মাত্র আমি উত্তর দেই। উত্তরে লিখি "পরিষদে যাইয়া আমি শুনি যে যতীন্দ্র বাবু ও রমেশবাবুর নিমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে নাই। যতীন্দ্রবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন—তৎক্ষণাৎ করজোড়ে আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করি। রাখালকেও সেই স্থানে নিমন্ত্রণ করি এবং রমেশকেও করজোড়ে নিমন্ত্রণ করিও ক্ষমা ভিক্ষা চাই। রমেশ উত্তর করেন,"বাচনিক নিমন্ত্রণের অভাবেই পত্রের নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা। আপনি সম্পাদকরূপে যখন বাচনিক নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন আর পত্রের নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নাই।" তথাপি আমি রামকমল বাবুকে কতকগুলি নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়া দেই এবং লিখি যে যাঁহারা নিমন্ত্রণ পত্র না পাইয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগকে যেন "পিয়ন বুক" দ্বারা নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ হয়। আমিও পুনরায় তিন জনকেই এখান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছি। রাখালকে স্বয়ং পূর্ণেন্দুবাবু নিমন্ত্রণ করেন। সবুজ পত্রের প্রমথবাবুকে প্রবন্ধের জন্য বিশেষ পত্র, সাধারণ পত্র, নিমন্ত্রণের বিশেষ পত্র পাঠান হয়—তিনি একখানিরও উত্তর দেন নাই। জোড় হাত করিয়া যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন নাই,একথা বলিলে কি করিব?"নায়কের এই উত্তর কি অমরেন্দ্রবাবু দেখেন নাই?

অমরেন্দ্রবাবু শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না যে, নায়কে আমি যে উত্তর পাঠাই, তাহার প্রতিলিপি রমেশবাবুকে পাঠাই এবং তিনি উত্তরে লেখেন যে "আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; আমার সম্বন্ধে যতীন্দ্রবাবুর ওরূপ লেখার কোন হেতু নাই।" যতীন্দ্রবাবুও আমার পত্রের প্রত্যুত্তর দেন নাই। যাহা হৌক অমরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণে যে ত্রুটী হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি যে আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অক্ষয় মহত্ত্ব প্রকটিত হইল।

অমরেন্দ্রবাবুর সমালোচনায় একটী নূতন কথা শিখিয়াছি। তাঁহার মতে "সাহিত্যিক

নমন্ত্রণেও নিমন্ত্রিতেরা নিমন্ত্রণকারীর আয়োজন, অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকারের নানা খুঁত ও ছল ধরিয়া নানা নিন্দা ও কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন।" নূতন কথা বটে। এইজন্যই বোধ হয় বর্দ্ধমানে অত মাছের মুড়ার ছড়া ছড়িতেও কেহ কেহ ক্রটী ধরিয়াছিলেন। সাধু সাবধান। ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গ অমরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পার্শ্বচরগণের জন্য অবহিত হউন—ক্রটী ধরিতেই হইবে এই "সনাতন নীতির" অনুসরণকারিগণের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করুন। তাঁহারা যখন ক্রটী ধরিবেনই, তখন এক সোজা পথ আছে—তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ না করা। ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই, কারণ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের এই সমালোচক মহাশয়ের ক্ষমার অন্ত নাই—তিনি নিজের কোন কথাই বলিবেন না। মাভৈঃ! মাভৈঃ॥

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মহাকর্ম্মীর মহাপ্রয়াণ।*

১

জননী অঞ্চলে আঁখি মুছিবার আগে
একি পুনঃ হল বজ্রাঘাত,—
আঁধার হৃদয়-কক্ষে স্বর্ণ-দেউটীর
নিভে গেল কিরণ-সম্পাত!
"স্বদেশীর" প্রতিমূর্ত্তি-কর্ম্মের বিগ্রহ—
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-প্রাণ,—
মহাকাল-সিন্ধুনীরে ওই অস্ত যায়—
ওই সব হল অবসান!

২

বেদনা-মূর্চ্ছিত হৃদি! ক্ষণ শান্ত হও,
অশ্রু শুধু রোধ ক্ষণ তরে,—
হের ওকি মহাদৃশ্য জাহ্নবীর তটে
নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শ্রদ্ধা ভরে!
শান্ত সমাহিত-চিত্তে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়
"স্বধর্ম্মের" ভক্ত উপাসক,
করিছেন গঙ্গালাভ-মৃত্যুকোলে যেন
সুখ-সুপ্ত স্বদেশ-নায়ক,।

৩

হে উদার! মহাকর্ম্মী! সারা ভারতের
ভাব-ভাষা-মিলন-প্রয়াসী!
ক্ষাত্রশক্তি-উদ্বোধক! ধর্ম্মমণ্ডলীর
কেন্দ্ররূপী কীর্ত্তি অবিনাশী!
"পরিষৎ"-শিরোমণি! "পানসেওলার"
দীপ্ত রবি, প্রফুল্ল পঙ্কজ!
সব ত্যজি কোথা যাও! কোন্ দিব্যলোক
মাগে তব পুণ্য পদ-রজঃ!

৪

হে অজ্ঞাত-বিশ্বপতি! শূন্য করি হেথা
যথার্থ-কর্ম্মীর সিংহাসন,
কোন্ সে অদৃশ্য-রাজ্যে কোন্ কর্ম্মদেশে
করিলে তাঁহারে আমন্ত্রণ!
হেথা অশ্রু-অন্ধকার ঘেরিল নিবিড়,
সেথা বুঝি ফুটে হাস্য-বিভা,
অচিন্ত্য তোমার লীলা! রহস্য নিগূঢ়
নাহি জানি লুক্কায়িত কিবা!

৫

হে সৌম্য! স্বাধীন চেতা! "উপাধি"-প্রসাদ
ভাগ্যে তব ঘটেনি কখন,—
তুমি স্বদেশের ছিলে! স্বদেশ তোমায়
শ্রদ্ধাভরে করিল গ্রহণ!
লহ স্বদেশের পূজা! প্রিয় করি তব,
তা'রি সাথে করেছি তর্পণ,—
মহান্! প্রসন্ন-দৃষ্টি! তব হৃদ্যতার
ভুলেনি সে স্নেহ-আলিঙ্গন!

৬

যুগ-যুগান্তের আর লোক-লোকান্তের
হে অনাদি-অনন্ত-ঈশ্বর!
শরতে "সারদা"-হীন মাতৃ-অঙ্ক করি
বহাইলে অশ্রুর নির্ঝর!
এ অশ্রু সার্থক করি অমর আত্মার
কর আজি শাশ্বত কল্যাণ;—
এ অশ্রু মন্থন করি স্বদেশ আমার
কর আজি মনুষ্যত্ব দান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

* বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের পরলোক গমনে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র।

একটী একটী করিয়া নববিধান-কমলের দলগুলি খসিয়া পড়িল। ফুল ঝরিয়া যায়, ফল পরিপক্ক হইলেই পড়িয়া যায়, ইহাই জগতের রীতি। কিন্তু যে ফল পরিপক্ক হইয়া জগতে সুরস ও সৌরভ বিতরণ করিয়া জগৎবাসীকে পরিতৃপ্ত করে, তাহার জন্মই সার্থক। আজি যাঁহার মৃত্যুর জন্য আমরা শোকার্ত্ত, তিনি নববিধানের একটী সুপক্ক ফল, ফজলি আম যেমন মিষ্ট, তেমনি প্রাণভরা রসপূর্ণ, নিকটে গেলেও, একটু আস্বাদ পাইবেই পাইবে। সেই সাদর-আলিঙ্গন, প্রেম-সম্ভাষণ, পিতৃবৎ স্নেহ, হায়, আজি তাহা বিহনে ওনং রমানাথ মজুমদারের লেনের প্রচার-আশ্রম শূন্য। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় ডাক্তার বলিতেন, কান্তিবাবুকে আমরা মা বলি। তিনি সকলের কাকাবাবু, তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে সেই বুড়া জ্যেষ্ঠতাতের গঙ্গাযাত্রার কথা বলিয়াছিলেন। আজি সত্য সত্যই গঙ্গা যাত্রার কথা সফল হইল। ব্রাহ্মসমাজের যুবা বৃদ্ধগণ আজি তাঁহাদের একজন পরম হিতৈষী মুরব্বী হারাইলেন, যাঁহার আকর্ষণে একবার একবার প্রচারাশ্রমে যাইতে সকলেই উৎসুক হইতেন। কেশব অতি উচ্চে, তাঁহার নিকট গমন করা কঠিন, প্রতাপচন্দ্র বড় লোক, সাধারণ লোকের প্রাপ্তব্য নহেন। আর আর সকলে উচ্চ কিম্বা দূর, কিন্তু কান্তিচন্দ্র সকলেরই আপনার লোক। তিনি বক্তৃতায় মোহিত করেন না। তিনি গানে প্রাণ আকর্ষণ করেন না, তিনি প্রেমে সকলকে আপনার করিতেন। তিনি নববিধানের নিত্যানন্দ। তিনি সকলের প্রতিপালক। শৈশবে পত্নীহারা, জগতের যথাসর্ব্বস্ব-চ্যুত হইয়া হাবড়া রেলওয়ের বড়বাবু কান্তিচন্দ্র কেশবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে হৃদয় সংসারের সর্ব্বস্বহারা, জগতের মরুক্ষেত্রে যাহার জন্য কেবল উত্তপ্ত বালুকা-

রাশি একমাত্র সম্বল, নূতন মহাজন কেশব যে প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তিনি সেখানে শান্তিবারি পান কি না দেখিতে গেলেন। সে উত্তপ্ত হৃদয়ে সে শান্তিবারি মিলিল, কেশবের প্রস্রবণের অমৃত পানে সে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল, আর অনাহারে,নির্য্যাতনে,অপমানে ও প্রতি-বাদে কেশব একজন সম্মানের সাথী, দুঃখের দুঃখী, প্রাণের আত্মীয় প্রাপ্ত হইলেন। জগতে এমন বন্ধু কোথায়? ধর্ম্মবন্ধু বলিতে অতি নিকট আত্মীয় মনে হয়, কিন্তু, প্রাণ হইতে প্রিয়,পুত্র হইতে প্রিয়,বিত্ত হইতে প্রিয়,সর্ব্বস্ব হইতে প্রিয় এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কোথা পাওয়া যায়? কেবল সেই ঈশ্বরেরই ধর্ম্ম-জগতে, জীবন-মৃত্যুতে, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যিনি হৃদয়-বন্ধু, জগতে তার মতন কে? যখন জগৎ সমেত সকলে কেশবের পতাকা মূল হইতে স্খলিত হইয়া প্রতিবাদের ঝঙ্কার উপস্থিত করিল, তখন যে কয়েকটী আত্মা তাঁহাকে বলিয়াছিল, আমরা তোমারই, তন্মধ্যে একজন কান্তিচন্দ্র। শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ কৃষ্ণ ভিন্ন জানিতেন না। চৈতন্যের সাঙ্গপাঙ্গগণ চৈতন্য ভিন্ন জানি-তেন না। দেখিলাম, কেশবের এই পার্শ্ব-চরগণ কেশব ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। সকলে অবাক্। শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অবাক্। এই লোকগুলি, যোগী, কর্ম্মী, পণ্ডিত, লেখক, বিষয়াদি ছাড়িয়া, উচ্চ বেতন পরিত্যাগ করিয়া, সংসার পরি-বার পরিত্যাগ করিয়া, একাশনে বা অর্দ্ধা-শনে, গেঁদা ফুলের পাতা, নদীর বালি খাইয়া অর্থাৎ কান্তিচন্দ্রের কথায় একপয়সার মুড়ি খাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া কি প্রকারে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাসী যুগে কেশবের গললগ্ন হইয়া থাকিতেন, ইহা সাধারণের বুদ্ধির অগোচর। লোকে বলিত, ইহারা বোকা, ইহারা ভক্তবিটেল, কিন্তু আমি জানি, কোথায় এমন প্রিয়জন, যাকে পাইলে পুত্র পরিবারের স্নেহ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? সৌভাগ্যক্রমে কান্তিচন্দ্রের তাহাই মিলিয়া-ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে কেশবের এইরূপ সহচরগণ মিলিয়াছিলেন, তাই নববিধান অক্ষয়। কান্তিচন্দ্র বলিলেন, আপনাকে কি বলিয়া ডাকিব? কেশব বলিলেন, দাদা বলিবে। এই প্রাণের ভাই কান্তিচন্দ্র সংসারের সকল আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় হইলেন। নব-বিধানের সকল লোকের অন্নসংস্থান তাঁহারই হস্তে, তিনিই সকলের ভাগ্য-বিধাতা। আমার পত্নীবিয়োগের পরে কান্তিচন্দ্রের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, আমার যখন অল্পবয়সে পত্নীবিয়োগ হয়, আমি মনে করি নাই যে, আর বিবাহ করিব না। কিন্তু দেখি যেন তিনি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। আর কোন অভাব বোধ করি না। সুতরাং, আর তাহার প্রয়োজন হইল না। উপাধ্যায় বলিলেন, বিবাহ ত লোকের একবার মাত্রই হইয়া থাকে। এই সকল অধ্যাত্ম যোগীর সহবাস বিয়োগ-বিধুর হৃদয়ের পক্ষে অতি মূল্যবান্ আশ্রয়। কান্তিবাবু কতবার জিজ্ঞাসা করিতেন, পৌত্র কয়টী হইল? এমন সকল বিষয়ে লোকের শুভকাঙ্ক্ষী জগতে আর কয়জন আছে? তাই যখনই তাঁহার নিকট যাইতাম, মনে হইত, যে সকল আত্মীয়হারা হইয়া সংসার অরণ্য বলিয়া বোধ হইত, সে শূন্যতা যেন ভুলিয়া যাইতাম।

কান্তিচন্দ্র দীর্ঘজীবন নববিধানের পতাকা হস্তে করিয়া অঙ্কুরিতমাত্র নববিধানকে বৃক্ষরূপে পরিণত দেখিয়া জীবন সার্থক

করিয়া গিয়াছেন। বিধানের অন্তর্ভূক্ত হইয়া আজীবন জীবন মরণে বিধানের কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যিনি বিধানের দেবতা, যাহার বিধি নববিধান, সেই পরম পিতা তাঁহার পবিত্র আত্মাকে পরলোকে কেশব-প্রতাপ-অঘোর-গৌর-বিজয়-ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বিধান-প্রবর্ত্তকগণের সহিত স্বর্গের সেই অদৃশ্যমণ্ডলী গঠন করিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগে সমর্থ করুন। যাঁহার জীবন অশান্তি ও শোকে আরম্ভ, তাহা অপার শান্তি সম্ভোগ করিয়া পবিত্র হউক, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

"পেয়ারী"র শেষ জীবন।*

হিয়া মোর ভাঙ্গি যায় শুনিয়া তোমার কথা,
বুকে লেখা আঁকা রয় বলিতে নারি যে ব্যথা।
কত বেলা নিরশনে কাটায়েছ নিশিদিন?
কত বেলা যাপিয়াছ অর্দ্ধাশনে দীনহীন?
কত দিন কত মাস কত ঋতু কত বর্ষ
চলে গেছে—পাওনিরে পূর আশ পূর হর্ষ?
অলস দিবস দীর্ঘ হাহুতাসে চলি যায়—
বিনিদ্র রজনী কত আঁখি জলে ভাসি যায়?
কর্ত্তা হয়ে পার নাই ঘরে দিতে বাতি ছা(উ)নি
ভর্ত্তা হয়ে পার নাই স্ত্রীরে দিতে ধন মানি;
পিতা হয়ে পার নাই পুত্রে দিতে সুখ অন্ন;
স্মশানে অবসানে তুমি জায়া সনে খিন্ন।
দয়া করে দেয় কেহ দুটি ভাত পিয়ারীরে—
চোখ-কোণে হাসি কথা ফুটে আহা উজলিরে।
পাতে করি নিতে ঘরে লবধ ঐ মুষ্টিভাত—
কর তুলি প্রাণ ভরে করি তারে আশীর্ব্বাদ।
যতনে সঞ্চিত ওই দুখ-বিগলিত দান
ক্ষুধাতুরে দিতে সুধা আহা শূন্য প্রাণে প্রাণ।
করুণার আগে হায়! পুন পাশে গেলে তার
অকরুণ গালি বিনে কিছু নাহি মিলে আর।
অবসাদ পরিতাপে ক্ষীণ তনু মন প্রাণ—
চরনে যে ঢাকেনারে পাঁজর হাড় ক'খান!
তনু দেহ জীর্ণ আহা কাঁথার 'পরে শয়ান—;
জরা জ্বরে জড়সড়—প্রাণ করে আনচান।
কিবা তার ধরফড়ি—পথ্য চিকিৎসা বিন!
ক্ষুধা তৃষা জ্বালা শেষ—রোগী শেষ তন্দ্রালীন।
এক কড়ি নাহি গেহে যবে দেহ গেলে ছাড়ি!
বাসি শব পড়ি রহে কেহ নাহি আসে বাড়ী।
পেয়ারীরে পোড়ায় কে—
পেয়ারীর অর্থ নাই?
পেয়ারী যে চলে গেছে—
যা আছে তা লোষ্ট্র ছাই।
বড় দাগা মনে আহা
আসিলে প্রবাস ঘরে—
বড় দাগা পেয়ে আহা ফিরিলে আপন ঘরে!
এক প্রাণ চলে গেলে,—প্রাণ চারি রহে পড়ি
বিভু করেছিল দান, বিভু করে রাখ প্যারী!
চাহিয়া অমৃত ফল চলিলে অমৃত ধাম—
অমৃত সন্ধান লভি সিদ্ধ বুঝি মনস্কাম॥

শ্রীযোগেশচন্দ্র লালা, এম্-এ, বি-এল্।

*পাড়াগাঁয়ে সকলে তাহাকে "পেয়ারী" ডাকিত।

WATER DAMAGED.

স্বামী।

১

যাঁর প্রেমে ভর করি, আপনার জন
পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন,
শৈশব-সঙ্গিনী, প্রিয় জন্মভূমি ছাড়ি
বিদেশ অচেনা জনে আপনার করি,
সারাটী জীবন নারী গৌরবে কাটায়;
নারীর মাথার মণি মণি সে জনায়।

২

প্রাণভরা ভালবাসা অতুল বৈভব,
সংসারের যত কিছু ঐশ্বর্য্য গৌরব,
সব দিয়ে যাহা ছিল, যাহা হ'তে পারে,
পালেন অসুখে সুখে সম স্নেহভরে;
ধর্ম্মে অর্থে ভোগে জানে চির সহচর
কে আছে তাঁহারি মত ভুবন ভিতর?

৩

তিনি যে পরশমণি, সে প্রেম পরশে
সতত্ব, স্নেহ, শক্তি হৃদয়ে বিকাশে।
ক্ষুদ্র গণ্ডী ছেড়ে নারী অসীমে মিশায়
দুটী প্রাণ মিলে মিশে যবে এক হয়,
মনে হয় সবি ভাল, সবি আপনার
সম্মুখে উন্মুক্ত হয় এ বিশ্ব সংসার।

৪

প্রাণেশ্বর অধিক, তিনি বন্ধু, সাথী, সখা,
সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন, উপাস্য দেবতা।
ভক্তি সাধনার সিদ্ধ সতীর হৃদয়ে
জাগ তুমি পরমেশ সুখ শান্তি নিয়ে:
এই ভিক্ষা তাই চাই, পতির ইচ্ছায়
মিশাইতে পারি যেন অস্তিত্ব, ইচ্ছায়।
তার পরে—এ ভবের খেলা শেষ হলে
(যেন) দুটী প্রাণ মিশে যায় অনন্তের কোলে।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

বিদায়।

হৃদি-নভঃ হতে কিগো উজল তারাটি
আজি হায়, দূরে যাবে সরে?
সুবিশাল হৃদি-রাজ্য এতদিন যেগো
আলোকিল সমুজ্জ্বল করে।
কি মধুর স্নিগ্ধতম! কিবা অচঞ্চল!
কি গভীর উদার "হৃদয়"!—
সহস্র অশনিঘাতে চির-অকম্পিত
লভিয়াছে "নির্ভরে" অভয়।
বুঝিয়াছে কিসে সুখ, তৃপ্তি কারে কয়,
সাধনার নির্ব্বাণ কোথায়?
আশ্রয়-সান্ত্বনা-প্রীতি কিসে লভে নর,
কিবা সার জগায় ধরায়!

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

বন্দনা।

(বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনোপলক্ষে রচিত)

মা,—
ঐ যেন শুনি মঙ্গল ধ্বনি উঠিছে সুগভীর
ঐ যেন তোমার ঘিরিয়ে দাঁড়া'য়ে যত ভক্ত বীর!
সাধা দিয়ে ভূমানন্দে
আজিকে তোমার চরণ দ্বন্দ্বে
ঐ যেন সবে 'মা গো মা' বলে লুটায় আপন শির,
ঐ যেন শুনি মঙ্গল ধ্বনি উঠিছে সুগভীর!

মা,—
সফল আমার জন্ম জীবন, সফল আমার সাধ
বল্ মা, কোথা চাপিয়া রাখি প্রাণের এ আহ্লাদ?
এই ত ছিল মনে আশা
জননী আমার বঙ্গভাষা
জাহ্নবীর মত উঠাবে কবে "কলু কলু কলু" নাদ,
সফল আমার জন্ম জীবন, সফল আমার সাধ!

মা,—
চলে'ছ তুমি সাগর-সঙ্গমে প্রসারি' শত মুখ,
বিস্ময়-বিহ্বল শুনি 'কল কল' আজি
সকল লোক,
সাধক যত স্থির চিত্তে
চিন্তিছে তোমারে স্তিমিত নেত্রে
প্রতিভা দীপিছে সবের মুখে, উল্লাসে
ছাইছে বুক,
চলে'ছ তুমি সাগর সঙ্গমে প্রসারি' শত মুখ!

মা,—
যদিও আমি অক্ষম দুর্ব্বল, যদিও আমি হীন
যদিও মগ্ন দীনতা পঙ্কে, যদিও ভগ্নবীণ,
যদিও বামন চাঁদের কাছে
তবু আমার পরাণ যাচে
তোমারি কল্যাণ, তোমারি শুভ মাগো,
রাত্রি দিন,
যদিও আমি অক্ষম দুর্ব্বল, যদিও আমি হীন।

মা,—
মায়ের বুকে হ'ল যেদিন প্রথম পরিচয়
সেইদিন তুমি করুণা করে করে'ছ মোরে ক্রয়,
পূরিয়ে কণ্ঠে অমিয় স্বরে
পাঠা'লে পুনঃ খেলা ঘরে
হায় মা, সেদিন স্মরণ করিতে চক্ষে জল
আজ বয়,
মায়ের বুকে হ'ল যেদিন প্রথম পরিচয়।

মা,—
কেমনে সে ঋণ শোধিতে পারি সেই
ভাবনাই করি।
তুমি আজ আর নও মা দীনা, তুমি রাজেশ্বরী,
মিলিয়ে যত তাপসবর্গ
ঢালিছে তোমার চরণে অর্ঘ্য,
ভূতলে যেন নেমে'ছে স্বর্গ, আহা মরি মরি!
তুমি আজ আর নওমা দীনা, তুমি রাজেশ্বরী।

আজ—
স্থাখ্‌রে চাহিয়া ভুবনবাসী আমার মায়ের রূপ,
দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস বিপুল চারিটীস্তূপ
খুলিয়া দেখ ভাঁজে ভাঁজে
সকলি র'য়েছে উহার মাঝে
গণিত, জ্যোতিষ, ছন্দ, আয়ুর্ব্বেদ কিছু না
হয়েছে লোপ,
স্থাখ্‌রে চাহিয়া ভুবনবাসী আমার মায়ের রূপ।

মা,—
ঐ যেন শুনি মঙ্গল শঙ্খ বাজিছে সুমধুর
ঐ সুরে আজ মিশিয়ে গেছে আমার
প্রাণের সুর।
ছানিয়ে মাখিয়ে ভকতি প্রীতি
রচিয়ে এ'নেছি বন্দনা-গীতি
নিকটে যাইতে জাগে মা, ভীতি,
তাই র'য়েছি দূর,
ঐ যেন শুনি মঙ্গল শঙ্খ বাজিছে সুমধুর!

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

বাঙ্গালী পল্টনের প্রতি।

আহতের সেবাব্রতে স্বেচ্ছা-সেবকের
নহে এ প্রয়াণ—
যুঝিতে সম্মুখ রণে এসে বীরেন্দ্রের
মহা আত্মদান!
কে বলে বাঙ্গালী হীন—জ্ঞানে ধর্ম্মে রণে
সমতুল্য তার—
একদিন ছিল না'ক হেথা, একদিন
রহিবে না আর;—
জগতের শীর্ষ জাতি জয় মাল্য তা'রে
দেও দয়াময়!
ভস্মাবৃত অগ্নিসম সামান্য ইন্ধনে
ঘটাক প্রলয়,
বৃটনের প্রজা আজ বৃটনের তরে
সঁপেছে পরাণ,—
দেখ গো জগতবাসী মেলিয়া নয়ন

উৎসর্গ মহান।
শতবীর পুত্র আজি ছুটেছে সমরে
হয়ে আত্মহারা—
শতবীর জননীর দূরে গেল চলি
নয়নের তারা।
ক্ষীণা বঙ্গবধূ ওই বীরজায়া আজি
সাজায়ে স্বকরে,
রাখিতে দেশের মান সরবস্বধনে
পাঠায় সমরে।
ফুল্ল পুষ্প হার গলে, অম্লান গৌরব
মহান সম্মান,
এ মূরতি নেহারিয়া সাজিতে এবেশে
দিতে আত্মদান—
সীতারাম প্রতাপের দেশের কুমার
বল একবার,
এ মহা আদর্শ লক্ষ্য কে যাবে আহবে
বীর পুত্র মা'র!
এস বীর! এস আজ বঙ্গ-বীর মাতা.
দিতেছে বিদায়?
জননীর স্নেহ-অঙ্ক হবে রণাঙ্গন
রবে স্নেহ ছায়।
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন
আসিবে আবার
আবার হাসিবে বঙ্গ, গলে দেবে তুমি
অম্লান মন্দার।

শ্রীসুধা দেবী।

পূজা।

আকাশ পানে চে'য়ে দেখি
মেঘ গিয়েছে স'রে,
দিগ্‌ বধূরা দাঁড়া'য়েছে
সুনীল বসন প'রে!
অনেক দিনে খুলছে রবি
স্বচ্ছ দুটী আখি,
মনের সাধে ডানা মেলে,
উড়তেছে সব পাখী।
মালার মতন হাঁস বলাকা
বসছে বাঁশের ঝাড়ে,
তুলার গাছে বুলবুলগুলি
বক্র পুচ্ছ নাড়ে!
থেমে' গেছে শিখীর কেকা,
চাতক পাখীর ডাক,
ডালে বসে' ডাকছে ঘুঘু
আস্তা কুড়ে কাক।
নদীগুলির কূলে কূলে
নাই এখন আর জল,
কাশ ফুলের ঐ শুভ্রবাসে
সাজছে ধরাতল!
কমল বনে ভৃঙ্গগণে
করছে গুঞ্জরণ,
পুঞ্জ শোভা কুঞ্জে ল'য়ে
জাগছে পুষ্পবন!
বিমল শোভা জমে' আছে
শ্যামল শাখার কোলে,
ঐ দেখা যায় 'থোবে থোবে'
রক্ত কাঞ্চন দুলে!
রাখালেরা কাটছে বসে'
খেতের 'আলে' ঘাস,
ধান্য লক্ষ্মীর গর্ভ চিহ্ন
হ'য়েছে প্রকাশ!
পাতায় পাতায় নীহার বিন্দু
করছে টলমল,
মনে হয় এ ধানের গাছে
ফলছে মুক্তা ফুল!
পল্লী পথে কাদা জল আর
নাই বেশী এখন.

শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে'
বইতেছে পবন!
সন্ধ্যাকালে কি সুন্দরই
দীপটী উঠে জ্বলে'
তারায় জ্যোতি ধারা, চাঁদে
সুধা পড়ে গলে'।
শারদ রাণীর আঁচলখানি.
তবক সোণায় মোড়া,
ঐ দেখা যায় আমার মায়ের
স্বর্ণ রথের চূড়া!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

প্রতিমা দর্শন।

কে বলে জননী তোরে, পাষাণ প্রতিমা তুই
পাষাণের অন্তরালে তুই চির স্নেহময়ী।
জড়, জীব, চরাচর সম স্নেহে ধরি বুকে
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী হয়ে পালন করিছ সুখে।
সৃষ্টির প্রথম দিনে জাগিয়া তরুণ রবি,
হেরিলে প্রথমে, দেবি! তোর স্নেহ মুখ ছবি।
প্রথম গগন মাঝে শিশু চাঁদিমার হাসি,
তোর মুখ পানে চেয়ে উঠেছিল পরকাশি,
প্রথম জাগিয়া সিন্ধু, চুম্বি' তোর তট-গাত্র,
আশীর্ব্বাদ বাণী লয়ে বসে ছিল অহোরাত্র।
প্রথম মানব-শিশু নেহারি ধরণী চক্ষে
পালিত হইয়াছিল তোর মাতৃ স্নেহ বক্ষে,
জননীর চির স্নেহ তোমারি অমূল্য দান,
তুমি না দিইলে, দেবি! কে জানিত সে সন্ধান?
মানবেরে শ্রেষ্ঠ দান তুমিত দিয়াছ সবি,
তবু তারা, মাতৃ মুখে, এঁকেছে হিংসার ছবি।
তোমারি চরণে ঢালি সন্তানের রক্ত ধারা,
তোমারে করাতে পান জীব বলি দেয় তারা।
সন্তানের রক্ত দিয়ে, মাতৃ পূজা করে হায়,
নির্ম্মমতা লুকাইয়া ভক্তিরূপ ছলনায়।
নিজেদের হৃদয়ের বাসনার অনুসারে
মাতৃ মূর্ত্তি, পূজিবারে চায় রাক্ষসী-আকারে।
সুধাশিক্ত মাতৃ স্নেহ আকণ্ঠ করিয়া পান
প্রণমি' হিংসার পদে করে মাতৃ অপমান।
পালিত হইয়া চির, তব স্নেহ নীড় মাঝে,
আঘাতে দয়ার বক্ষে, প্রাণে না কেনো বাজে।
হে বিশ্বজননি! তব স্বার্থহীন চির স্নেহে
বেঁধে রাখ মানবের মর্ম্ম, মমতার গেহে।
বুঝাইয়া দাও, দেবি! তোমার জননী-প্রাণ
সন্তানের রক্ত হেরি হয়ে যায় খান খান।
জগত-জননীরূপে যে জন করিবে পূজা
ভক্তি পুষ্পে পূজেন যেন বলিহীন দশভুজা।

শ্রীশৈলবালা বসু।

মূঢ়তা।

বিজয়-বিক্ষিপ্ত মানস মোর,
মনন ধেয়ানে নহে বিভোর;
আপ্ত বচন শ্রবণে প্রচুর
নাহিক যতন, এতই মূঢ়!!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

কাজ।

সাজরে তুই সাজ।
কর্ণ-কুহর বধির করে করুণ মধুর গভীর স্বরে
বিশ্ব-ভেরী বিপুল রবে ডাকছে তোরে আজ।
সাজরে তুই সাজ।
দেখনা চেয়ে মুক্ত নেত্রে নিয়ে যেতে কর্ম্মক্ষেত্রে
তোর ঘাটে যে আসছে ছুটে প্রেমের জাহাজ।
কাজ সেরে নে যা বাকী আছে
পড়ে থাকিস একলা পাছে
চায় যে তোরে সারা বিশ্ব চায় যে বিশ্বরাজ।
ধ্যান করি সেই প্রাণারামে
পীযূষমাখা মায়ের নামে

WATER DAMAGED.

টুটিয়ে দিয়ে মায়ার বন্ধন এক নিমেষে আজ,
জীবন মরণ করি পণ করগে গোতে আরোহণ,
কিসের বা তোর ভয় ভাবনা
কিসের বা তোর লাজ।
আঁধার মাঝে আছিস পড়ে
কত যুগ যুগান্তর ধরে
মাথায় কত পড়েছে ভেঙ্গে কলঙ্কেরি বাজ ;
আজকে মিলে লক্ষ প্রাণী
শল্য বিষম ফেল না টানি,
ধর না তুলে মরণ ভূমে গৌরবেরি তাজ।
কোথায় বা তোর আত্ম-শক্তি
কোথায় বা তোর দেশের ভক্তি,
আজ টেনে আন প্রাণের জোরে
আর সহে না ব্যাজ,
সবাই মত্ত কাজের ধূমে
আর চলেনা থাকলে ঘুমে,
তোর সময় যে যাচ্ছে বয়ে করতে হবে কাজ।
সাজরে তুই সাজ।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

খিচুড়ির কবির প্রতি।

১

একি হলগো "খিচুড়ি" দাদা
করল তোমায় কে আজ চুরি ?
অনেক কাল নাইক চিঠি !
শূন্য মোর হৃদয়-পুরি ?
বৌদি তোমায় আঁচল তলে,
রাখল কিগো প্রেমের ছলে,
ভুললে তুমি সারা ভুবন
ফুলের বনে হাঁকিয় জুড়ি !
হটাৎ একি "খিচুড়ি" দাদা !
করল তোমা কে আজ চুরি !

২

তোমায় আমি লিখলে চিঠি
দাওনা তুমি উত্তর আর,
বন্ধু যাঁরা চিঠি লেখেন
পান না তাঁরা জবাব তার !
বর্ষা গেল, শরৎ গেল, বসন্ত পিক ধেয়ে এল,
নিদাঘ ওই আসছে ফিরে
মাথায় নিয়ে অনলভার !
চাতক মোরা, পত্র-বারি
বিলাও তুমি একটী বার।

৩

বলেছিলে ভায়ের অভাব
ঘুচল ভবে আমায় পেয়ে,
আমারি তরে কেবল তুমি
"সম্মিলনে" যাওগে ধেয়ে !
বললে আরো "খিচুড়ি" রাশি,
বিলাবে দেশে "পোলাউ" রাশি,
সকল হল ওলট পালট
"নথ" নাড়া কি নিত্য খেয়ে !
ভুললে তুমি সে সব কথা
বৌদির রাঙা আনন চেয়ে !

৪

সত্যি দাদা কখন হতে
এমন তুমি কঠিন হলে,
আকাশ সম উদার হৃদি
কেমন ছেয়ে মেঘের দলে।
উষালোকের মধুর হাসি,
ওষ্ঠপুটে উঠত ভাসি,
বাজত বুকে স্নেহের বাঁশী
সুধার ধারা ছড়িয়ে পলে
সত্যি দাদা ; কেমন করে
এমন তুমি কঠিন হলে।

৫

পথের পানে তাকিয়ে শুধু
কাটল কত বরষ মাস,
কোথায় তুমি ! কোথায় চিঠি !
ব্যর্থ হল সকল আশ।
নাইক "হেম" একেলা আমি,
নিঠুর ভাবে দিবস-যামি।
গাঁথছি সদা অশ্রুজলে রক্তমাখা তপ্ত শ্বাস !
জেনেও তুমি নীরব তবু এমন করে বরষমাস

৬

সত্যি দাদা। দোষী তোমায় করছি নাক
বৌদি তোমায় "তুক্" করেছে [একটি চুল
নাইক এতে কিছুই ভুল !
নীরব তুমি থাকবে আর,
বলছি তবে হাজার বার,
বৌদির সাথে ঝগড়া হবে হইনা যত চক্ষুশূল।
বৌদি তোমায় "তুক্" করেছে
নাইক এতে কিছুই ভুল।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক-বিভ্রাট ও আমার কর্ম্মচ্যুতি। (১)

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের নব্যভারতে "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা" নামে আমি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরে, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক নায়ক ঢাকার পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। কিম্বদন্তী এই, তাহাতে নাকি লেখক মহাশয়ের অন্তরের প্রধূমিত বহ্নি উদ্গীরিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য কথার মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল যে, আমার প্রবন্ধ অমুক তথাকথিত ধুরন্ধর প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, অতএব আমার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা না জানা পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কলিকাতা হইতে তাঁহার কর্ম্মস্থানে আসিয়া তদীয় মসনদ পরিগ্রহ করিতে পারেন না। গতিকে এখন মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নব্যভারতের ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিগত ২৩শে জুলাই পূর্ব্বাহ্ন ১২ টার সময় আমাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

২৩ শে জুলাই, ১৯১৭।

বাবু রোহিণীকুমার নাথ,
লাইব্রেরিয়ান্ রামমোহন-রায়-লাইব্রেরি, ঢাকা।

মহাশয়,

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের নব্যভারতে "ব্রাহ্মসমাজের "বর্ত্তমান্ সমস্যা" শীর্ষক আপনার লিখিত এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। এইরূপ অন্যায় ও অবৈধরূপে আমাদের আচার্য্যকে নিন্দা করা এবং ব্রাহ্মসমাজের উপর গালিবর্ষণ করা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য হইয়াছে। আপনি কেন এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ত চাই। এই বিষয় অদ্যই সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় বিবেচিত হইবে। অতএব আপনার কৈফিয়ত অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার নিকট দিবেন। অন্যথা করিবেন না। নিবেদক.

স্বাক্ষর—শ্রীমথুরানাথ গুহ, সম্পাদক,
পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজ।

এই পত্র পাঠ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা এই:—

২৩শে জুলাই, ১৯১৭।

বহুমানাস্পদ
শ্রীযুক্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক মহাশয় সমীপে

মহাশয়, আপনার পত্র পাইলাম। আমি আমার প্রবন্ধে অন্যায় ও অবৈধরূপে কোথায় কি ভাবে এবং কোন্ কথায় আপনাদের আচার্য্যকে নিন্দা করিয়াছি, এবং ব্রাহ্মসমাজের উপর গালিবর্ষণ করিয়াছি, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন, তৎপর আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। ইতি। আজ্ঞাধীন

(স্বাক্ষর) শ্রীরোহিণীকুমার নাথ,
লাইব্রেরিয়ান্।

আমি আমার পত্রে সম্পাদককে যাহা

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার উত্তর দেন নাই। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি আমাকে একবার ডাকাইলেন মাত্র, এবং দুই মিনিটের মধ্যেই বিদায় দিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি বসিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত সেই কমিটি ছিল। তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্ণ নয়টার সময় সম্পাদক মহাশয়, সমাজের কেরাণী গৌরহরি নন্দীকে সঙ্গে লইয়া লাইব্রেরিতে আসিলেন, এবং শীঘ্রই লাইব্রেরির উপস্থিত পাঠকগণকে বিদায় দিয়া কিছুক্ষণ মধ্যে আমাকে পত্রখানি দিলেন। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

N.(64—3) — 24. 7.17

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার নাথ,

লাইব্রেরিয়ান্, রামমোহন-রায়-লাইব্রেরি।

মহাশয়,

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গত ২৩শে জুলাই তারিখের অধিবেশনের নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ আপনার অবগতির জন্য লিখা হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীমথুরানাথ গুহ, সম্পাদক,

পূর্ব্ববাঙ্গলা-ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা।

২৪।৭।১৭

"শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার নাথ গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের নব্যভারতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত ও বিবেচিত হইল। সর্ব্বসম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল যে, রোহিণীকুমার নাথকে শ্রাবণ মাসের বেতন দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্য হইতে অবসৃত করা হইবে।"

উক্ত নির্দ্ধারণানুসারে আপনি শ্রীযুক্ত গৌরহরি নন্দী মহাশয়ের নিকটে লাইব্রেরীর তহবিল ও যাবতীয় হিসাব বহি ও পুস্তকাদি বুঝাইয়া দিবেন।

২৪।৭।১৭ স্বাক্ষর শ্রীমথুরনাথ গুহ।

এই পত্র পাঠ করিয়া আমি তখনই সম্পাদকের নিকটে লাইব্রেরীর সমস্ত কর্ম্মভার (charge) বুঝাইয়া দিলাম। তৎপর সম্পাদক মহাশয় আমাকে দুই তিন দিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য মৌখিক আদেশ দিলেন। লোকে কথায় বলে,'মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্য্যন্ত'। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি ঐ বাড়ীতে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া বাস করিতাম। তৎপর আমি সেই দিনই ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছি। এইরূপে বৈর নির্য্যাতনের পর মানভঞ্জনের পালা শেষ হইল। মানভঞ্জন ত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মান বাড়িল কি? পাঠকবৃন্দ ইহার বিচার করিবেন।

এখানে আর একটী সূক্ষ্ম রহস্যের কথা বলিতে হইতেছে। কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিষ্কাসিত করার পর, নবনিযুক্ত লাইব্রেরিয়ান্ দুই দিবসের জন্য অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন, তখন আবার আমাকেই ঐ কার্য্য চালাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইল, বলা বাহুল্য,আমি সেই অনুরোধ রক্ষা করিলাম। বরখাস্ত হওয়ার পর অনুরোধ করিয়া কাজ করাইলে মানভঞ্জনের কোন বাধা হয় বলিয়া বোধ হয় শাস্ত্রে লেখে না। যাহা হউক, এখন অন্য কথা লিখিতেছি।

ঢাকার রামমোহন রায় লাইব্রেরী পাবলিক্ লাইব্রেরী,—'অব্রাহ্মের' অর্থে প্রতিষ্ঠিত। এখানকার 'অব্রাহ্ম' জনসাধারণের সঙ্গে ইহার যোগ রহিয়াছে। কি

কারণে আমি কর্ম্মচ্যুত হইলাম, তাহা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্থানীয় জনসাধারণকে জানান নাই। তাই তাঁহাদের পক্ষে কে জানি "নায়ক" পত্রিকায় এই সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। বিভীষিকাগ্রস্তগণ মনে করিতেছেন, উহাও আমারই লেখা। এইরূপ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া না জানি আরও কত জনকে সন্দেহ করা হইতেছে, তাহা উক্ত দেবতারাই জানেন।—guilty conscience চিরদিনই এইরূপ সন্দিগ্ধ হইয়া নরকভোগ করে। যাহা হউক, আমি সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আমি কর্ম্মচ্যুত হইলাম? তিনি নব্যভারতের প্রবন্ধের কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, "তাহাতে লাইব্রেরির কাজের ত কোন ক্ষতি করি নাই," তিনি উত্তর দিলেন, "লাইব্রেরিও সমাজেরই বটে, সমাজের কর্ম্মচারী থাকিয়া তুমি এই সব লিখিতে পার না, সুতরাং তোমাকে আর রাখা যায় না"। এই এক কথাতেই সম্পাদক মহাশয় সকল বিষয়ের ইতি দিলেন, বিচার যে কি হইল, তাহা বিংশ শতাব্দীর মানবকে আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, আজকাল ব্রাহ্মসমাজে অনেক স্থলে ধর্ম্ম প্রচার প্রায় প্রহসনে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ঢাকার পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, এই দুইয়ের ভবকর্ণধার সহসা রাগে অধীর হইয়া, আমাকে বিদায় দিয়া তাঁহাদের গায়ের ঝাল মিটাইলেন,—তাঁহাদের সকল প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইলেন। ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতে গিয়া আমি সাধারণভাবে প্রচারক-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কলিকাতার পত্র পাইয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের অস্থায়ী আচার্য্যের উদ্দেশে,—পণ্ডিত শাস্ত্রীর ভাগ্যেও যে পরিমাণ মাসহারা বরাদ্দ হয় নাই, তাহার প্রায় ডবল পরিমাণ বেতনাদি-ভোগী, তাঁহাদের সেই প্রিয় পোষ্যের উদ্দেশে, উহা লিখিত হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে কি কি সাধারণ বা বিশেষ সাদৃশ্য বা মিল দেখিয়া তাঁহারা এসিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ নব্যভারতের যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তাহা হাতে করিয়া একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, যে দেবতার উদ্দেশে উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার ষোল আনা অন্তরঙ্গ প্রতিনিধির নিকটে উপস্থিত হইলে, সেই প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন, "ক্ষমা করুন, নিশ্চয় অন্য লোক পেছনে আছে, একা রোহিনী নয়।" এখানেও guilty conscienceএর সেই সন্দেহ। জানি না, এইরূপ সন্দেহ করিয়া কাহাকে কাহাকে গোপনে দংশন করা হইতেছে! অসাধ্য কিছুই নাই। রে সন্দিগ্ধ চিত্ত! তুমি জানিয়া রাখিও, স্বয়ং ভগবানই ইহার পশ্চাতে রহিয়াছেন, কোনও মানব নহে, এবং তোমাদের পাপবুদ্ধি আমাকেই প্রবুদ্ধ ও আমার লেখনীকে সঞ্চালিত করিয়া তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখানে পাটোয়ারী বুদ্ধি বা বেণের বুদ্ধি চালাইয়া পাপ জ্ঞাপনের আশা করিওনা। ক্রমশঃ।

শ্রীরোহিনীকুমার নাথ।

সেবক কান্তিচন্দ্র মিত্র।

জন্ম—ভাদ্র, ১৭৬০ শক।

মৃত্যু—৪ঠা ভাদ্র, ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল।

সর্ব্বপ্রথম ভৃত্যের আত্মপরিচয় হইতে দুটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

"যাব কোথায় কিছুই স্থির ছিল না, দাদার জনৈক বন্ধু দয়াপরবশ হইয়া আমাদের তিন জনকে আশ্রয় দিলেন। কিছুদিন জরভোগ করিয়া আবার একটু শরীরে বলসঞ্চয় হইলে মধ্যম দাদা চাকুরীর চেষ্টায় গেলেন, আমরা দুইজন স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। রোগে ভগ্ন শরীর, শোকে ভগ্ন হৃদয়, পড়া শুনা ভাল হইল না; প্রায় দুই বৎসর এই ভাবে কাটার পর স্কুল ছাড়িয়া একটী জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের বাসায় আসিলাম। সেখানে তাঁহার বাসার রন্ধন করি, আর ঘরে বসে কিছু কিছু পড়ি ও কর্ম্মকার্য্যের চেষ্টা দেখি। অবশেষে সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের আফিসেই ১৫৲ টাকা বেতনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হই। জীবনের এই সময়ে একটী ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তখন আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর, পিতা মাতা শোক-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, বিধবা ভ্রাতৃবধূ অনাথিনী, অবগণ্ড অষ্টম বৎসরের ভ্রাতৃকন্যা পিতৃহীনা, রোগে শরীর ক্ষীণ, অর্থের অত্যন্ত অভাব, অন্যের বাটীতে রন্ধন করিয়া খাইতেছি, এমন শোক-দুঃখের সময়েও আমি প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া বিপথগামী হইলাম। কিরূপে যে বিপথগামী হইলাম, তাহা ভাবিয়া পাই না। যাঁহার সঙ্গে ছিলাম, তিনি সাধু-চরিত্র, কোন প্রকার কলঙ্ক তাঁহাতে ছিল না, কিন্তু পল্লিটা ভাল ছিল না। ভদ্রলোকের বসতি খুবই অল্প, যাঁহারা ভদ্রলোক, তাঁহাদেরও চরিত্র ভাল নয়, কতকগুলি কুসঙ্গী আসিয়া আমার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় লইল, কি যে হইয়া গেলাম, এখন স্মরণ করিতে হৃৎকম্প হয়। আমি সকলের কথা শুনি, অথবা যে যাহা বলে তা করি বলিয়াই হউক, আর আমার কেহ নাই বলিয়াই হউক আমাকে সকলেই ভালবাসিতেন। কিন্তু এ ভালবাসা আমাকে আরও পতনের দিকেই নিয়ে গেল, সত্যই আমি মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর মত বিচরণ করিতে লাগিলাম। সঙ্গ-দোষে আমি পুতুল পূজার বারোয়ারিতে মাতিয়া গেলাম, এখন তাহা ভাবিতেও লজ্জা হয়। এইরূপ অবস্থায় দিন রাত্র কাটাইতেছি, একদিন আমাকে ডাকিয়া আমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্র অতি শান্তভাবে আমার পতনের কথা বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহার বাক্যে আমার হৃদয় শেলবিদ্ধ হইয়া গেল, আমি তাঁহার সাক্ষাতে খুব খানিক চক্ষের জল ফেলিয়া বলিলাম, আমাকে আর বলো না, আমার ভ্রম, আমার পতন আমি বুঝি-য়াছি। তাঁহারই আফিসে লইয়া গিয়া কার্য্য দিলেন। এই কার্য্যই আমাকে নরক হইতে টানিয়া আনিল।

কি শুভক্ষণে আমি আফিসে গেলাম, কি শুভক্ষণে আমার ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য আমার হিতকারী আত্মীয় আমাকে ভর্ৎসনা করিলেন, বলিতে পারি না। এ সব ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই একজনের হাত ছিল, আমি এখন তাহা অনুভব করিতেছি। এই আফিসে

অল্প বেতনে কার্য্য আরম্ভ করি, ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক ৪৫৲ টাকা হইয়াছিল। আফিসের কার্য্যে যোগ দিবার কিছুদিন পরেই আমি ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত ক্রমেই পরিচিত হই। তাঁহাদের সঙ্গে আমি আচা-র্য্যকে প্রথম দর্শন করিতে যাই, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গতে ও সমাজে যাইতে আরম্ভ করি। ক্রমে আমার পাপ প্রবৃত্তি আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এই সময় মধ্যম দাদা এবং আমি বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি। নূতন সংসার গঠন, ভ্রাতৃবধূর পুনরাগমন, ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইল, অবশ্য এসব অনুষ্ঠান হিন্দুমতেই হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে তখন ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠান হয় নাই বলিলেই হয়।"

"আমি যখন স্বতন্ত্র স্থানে যাইব বলিয়া স্থির করিলাম, মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রীও আমার সঙ্গেই যাইবেন বলিলেন, সুতরাং আমি আর তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া পারিলাম না। তিনি এবং আমার স্ত্রী সমবয়সী ছিলেন। বাড়ী হইতে তো বাহির হইয়া আসিলাম, কোথায় যাইব স্থির ছিল না, সুতরাং যেখানে প্রচারক মহাশয়েরা থাকিতেন, সেইখানেই যাইয়া তিন জনে আশ্রয় লইলাম। দুই তিন দিন পরে বৌবাজারে মলঙ্গা নামক পল্লিতে একটী বাটী ভাড়া করিয়া আমি ও আমার আরও দুইটী ব্রাহ্মভ্রাতা সপরিবারে সেই বাড়ীতে যাইলাম। সেখানে যাওয়ার ২।৩ দিন পর আমার মধ্যম ভ্রাতৃবধূ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। বন্ধুরা পরিবারদের অন্য স্থানে রাখিলেন এবং আমার স্ত্রীকেও অন্য স্থানে যাইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছু-তেই দিদিকে ছাড়িয়া যাইবেন না বলায়, নিরুপায় হইয়া তিনি এবং আমার সব বন্ধুবর্গ সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করিতে লাগিলেন। ৪।৫ দিন পরেই আমার স্ত্রীও ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন আর তাঁহার দিদির সেবা করা হইল না, তাঁহাকে অন্য এক ঘরে রাখিয়া বন্ধুরা তাঁহারও সেবা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সাত দিন সাত রাত্রি রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মধ্যম ভ্রাতৃবধূ বৈধব্য ও অন্যান্য সমুদয় কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করি-লেন। আমার স্ত্রীর অবস্থা তখন খুবই খারাপ, জ্ঞানশূন্য, সুতরাং এ ঘটনার বিষয় তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। আমাকে রাত্রিতে রোগীর নিকট রাখিয়া বন্ধুরাই মধ্যম ভ্রাতৃবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া আসি-লেন। তাঁহারা যে সে সময় আমার কি উপ-কার করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিলে প্রাণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। মধ্যম ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর ৩।৪ দিন পরেই আমার স্ত্রীও দেহত্যাগ করিলেন। আচার্য্যদেব এই সংবাদ পাইয়াই আমাদের বাড়ীতে সদলে আসিয়া-ছিলেন এবং উপাসনা প্রার্থনা করিয়া আমার তাপিত প্রাণে শান্তি দিয়াছিলেন। সেই পরম উপকারী বন্ধুরাই এবারও আমার স্ত্রীর সৎকার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, এবার আমাকে তাঁহারা সঙ্গে করিয়া শ্মশান-ঘাটে গিয়াছিলেন। এই আমার সংসারের শেষ কার্য্য। বন্ধুগণের অক্লান্ত সেবা দেখিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকদ্বয় অবাক্ হইয়া বলিয়াছিলেন এমন বন্ধুতা তো কখনও দেখি নাই।"

"The Faith and Progress of the Brahmo Samaj" পুস্তকের ২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"But wherever the impulse has been real, in very instance it has ended in one way only. If men felt it was a

call from God, they gave up their employment, and took the vow of the missionary. From being Missionaries *almost* they become missionaries *altogether*. Thus they are called." এইরূপে কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, উমানাথ গুপ্ত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, অমৃতলাল বসু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, মহেন্দ্রনাথ বসু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, কান্তিচন্দ্র মিত্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, অঘোরনাথ গুপ্ত ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে,গিরীশচন্দ্র সেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, গৌরগোবিন্দ রায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, প্রসন্ন-কুমার সেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যোগ দান করেন। তৎপর অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ দান করেন। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই সমবয়স্ক এবং সকলেই দশ বৎসরের মধ্যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় ব্যাপার।

আমরা অনেক সময় নিভৃতে বসিয়া ভাবিয়াছি, উপরোক্ত মহাজনবর্গের মধ্যে কে বড়? সকল শক্তি কেশবচন্দ্রে কেন্দ্রী-ভূত ছিল,তাঁহার আকর্ষণে সকলের আগমন, এ সকল কথা ভাবিলে তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহাতে সংশয় থাকে না। কিন্তু তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব কে ছিল? আমাদের মনে হয়, এই সকল মহাপুরুষ মিলিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময়েই মহাজনবর্গের সাঙ্গোপাঙ্গের কথা শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সময় অর্জ্জুন প্রভৃতি, খ্রীষ্টের সময় ম্যাথু, ল্যুক, জন প্রভৃতি, বুদ্ধের সময় আনন্দ, গোপা প্রভৃতি,মহম্মদের সময় খাদিজা প্রভৃতি, শ্রীচৈতন্যের সময় অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি, এবং রামকৃষ্ণের সময় রামচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাজন-বর্গের অভ্যুদয়,অথবা সাঙ্গোপাঙ্গের অভ্যুদয়ের অর্থই মহাপুরুষের অভ্যুদয়; ইহা চিরন্তন সত্য।

গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, দুষ্কৃতি নিবা-রণের জন্যই সাধুগণের অভ্যুত্থান। কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না। প্রয়োজন বশতঃই জগতে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যথা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

নববিধানের নব যুগে বঙ্গে রামমোহন, এবং তৎপর মহর্ষি যে ধর্ম্ম বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ে তাহা প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অর্থ—প্রতাপ-অঘোর-গৌর-কান্তি প্রভৃতির অভ্যুদয়।

দেশে বিশুদ্ধ বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তখন তাহা কোন এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্গে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম অব-লম্বন করিবার জন্য দেশ যে মাতিয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানের জন্য,মানবের প্রার্থনানু-সারে যেন সদল কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়। বাল্যেই কেশব কাগজে প্রার্থনা লিখিয়া লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় লাগাইয়া দিতেন, ব্যাঙ্কে বসিয়া বসিয়া Epistle লিখিয়া লিখিয়া সকলকে চমকিত করিতেন। সকল ভাব সকল সাধু ইচ্ছা রূপ বায়ু জমিয়া—এক সদল-বেষ্টিত মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের কারণ হইল। ভারত-ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব বিশ্বাস-

ভক্তি-জ্ঞানকর্ম্ম-সেবা-পরিচর্য্যার অপরূপ প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ হইল।

দল বাদে কেশবচন্দ্রকে আমরা কোন দিন ভাবি নাই, ভাবিতে পারি নাই। দলের সকলের মুখেই কেশব-প্রশংসা শুনিয়াছি, তাঁহার তিরোধানের পর—প্রতাপ-গৌর-গোবিন্দ প্রভৃতি ঘটনা-বৈচিত্র্যে যখন পৃথক হইয়াছিলেন, তখনও প্রতাপচন্দ্র এবং গৌরগোবিন্দের মুখে এবং বিচ্ছিন্ন এবং মিলিত আর আর সকলের মুখেই কেশবচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছি, কাহারও মুখে কখনও কেশব-নিন্দা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র, ঢাকার দ্বিতল অট্টালিকার ছাদে যখন কুচবেহার-বিবাহের উপলক্ষে বলিয়া-ছিলেন যে,"humiliation was complete" তখনও তাঁহার মুখে কেশবচন্দ্রের অনিন্দিত চরিত্রের প্রশংসা শুনিয়াছি। কেশবের দলের কোন লোকের মুখে কখনও কেশব-চন্দ্রের নিন্দা শুনি নাই। কি গুণে তিনি সকলের প্রিয় হইয়া সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বহু দিন পরে, কেশব-বিরোধী-দলের সে কথাটা নির্জ্জনে একএকবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয় কি?

কেশব এবং তাঁহার দল একাত্মক ছিলেন। একে সকলে সম্মিলিত,অথবা সকলে একজনে জড়িত। এইরূপে ইতিহাসের এক মহা মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। শক্তি বল,ক্ষমতা বল,জ্ঞান বল, ভক্তি বল, প্রেম বল, সেবা বল, এইরূপে জমিয়া বঙ্গে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সে মূর্ত্তি নববিধান।

কান্তিচন্দ্রকে কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন— "আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিও।" তাহাই হইল। কেশবচন্দ্র শক্তিতে অগ্রজ, কান্তি-চন্দ্র ছায়ার ন্যায় সে শক্তির পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাঁহাতে মিলিল কে? পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অজেয় নব মহা সন্ন্যাসীর মিলন হইল। সেকালের জগাই মাধাইয়ের বিবরণ এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ঘরে ঘরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পাপীর নব-জীবন লাভের পর সে সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছিলেন,তিনিই মোহিত হইয়াছিলেন। যৌবনের মত্ততায় লোকেরা পাপ করে, কিন্তু এই যুবকদল পাপের অস্পৃশ্য। আমরা বলিতেছিলাম,দলের কোন লোকের নিকট কেশব-নিন্দা শুনি নাই। আজ নির্ভয়ে বলিতে পারি, দল এবং বে-দল,আপন এবং পর, অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ—কাহারও নিকট কান্তিচন্দ্রের নিন্দা কখনও শুনি নাই। কি অপরাজিত শক্তির প্রকটমূর্ত্তি।

একবার মহেন্দ্রনাথ Unity & the Minister পত্রিকায় কান্তিচন্দ্র সম্বন্ধে অভি-যোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা আমা-দের নিকট জুডাস ইসক্যারিয়টের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, কালে মহেন্দ্রনাথের সে ভাব সং-শোধিত হইয়াছিল। আর কাহারও নিকট, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ, কাহারও নিকট কান্তি-নিন্দা শুনি নাই। এ হিসাবে কান্তি-চন্দ্র বড়,না কেশবচন্দ্র বড়,সময়ে সময়ে নিভৃতে বসিয়া ভাবিয়াছি, মনে হইয়াছে, কান্তিচন্দ্র বড়। কান্তিচন্দ্র বড় কিসে? নিষ্কাম সেবাধর্ম্মে।

নিষ্কাম সেবাধর্ম্মের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। লোক আসিতেছে, কিন্তু খাওয়ায় কে? রক্ষা করে কে? মাতৃমূর্ত্তি কোথায়? নরদেহে কান্তিচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অর্থ মাতৃভাবের প্রকাশ। তিনি যখন আসিলেন —ঘর পূর্ণ হইল—মাতার স্নেহ পাইয়া সকলে

প্রকৃতিস্থ হইলেন। নিষ্কাম সেবাব্রতের যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আত্মীয়হারা নবসন্ন্যাসীর সর্ব্ব-হৃদয়েশ্বর রূপ যে দেখিল,সেও মোহিত হইল, যে শুনিল সেও ধন্য হইল। গেঁদাকুলের তরকারী খাওয়াইয়া মানুষকে বশ করা যায়, একথা পূর্ব্বে আর শুনিয়াছিলাম না। কান্তিচন্দ্রের প্রেমের অভ্যুদয়ে—গেঁদাকুল হইল তরকারী,মাটী হইল শয্যা,জল হইল ক্ষীর সরনবনী,সদানন্দ সন্ন্যাসীর দল প্রেমে বিভোর দিবারাত্র সাধনপ্রাঙ্গণের ভজন-প্রসঙ্গে কাটাইতেছেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কেহ রাগ করিবেন না, আমরা বলিয়াছি, কান্তিচন্দ্র বড়,—সেবাধর্ম্মে কেশব হইতেও বড়। সেবাধর্ম্ম না জাগিলে নববিধান জাগিত না। সেবাধর্ম্ম কান্তিচন্দ্রে মূর্ত্তিমান হইয়াছিল, তাই নির্ভয়ে বলিতেছি, কান্তিচন্দ্রই নববিধান প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ। এইরূপে যোগে বড় অঘোর, ভক্তিতে বড় বিজয় সাধনে বড় গিরীশ, নিষ্ঠায় বড় কেদার, জ্ঞানে বড় গৌর, বিশ্বাসে বড় প্রতাপ—সঙ্গীতে বড় ত্রৈলোক্য, আর কত বলিব, এক এক জন এক এক বিষয়ে বড়। কেশবচন্দ্রই এই সব বিশেষত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশেষত্ব ঘোষণা করিয়া, কেন্দ্রীভূত শক্তি সকলের ভিতরে বিশেষত্ব জাগাইয়া নবতেজে নবভাবে তিনি প্রমত্ত হইয়াছিলেন। সামঞ্জস্য যাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল—এদেশ সে দেশ, এ ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম, জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি সকল মিলিত করিয়া এ সকলের সকল বিশেষত্ব কেন্দ্রীভূত করিয়া, সামঞ্জস্যর চরম বিশেষত্ব ঘোষণা করিলেন, কেশবচন্দ্র। সুতরাং সম্মিলিত শক্তিতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পরিয়াছিলেন। ইহারই নামান্তর নববিধান। নববিধানে যে সামঞ্জস্য মূর্ত্তিমান. তাহার মহাশিক্ষা গৌর-প্রতাপ-অঘোর ত্রৈলোক্য কান্তিজীবনে পাইয়াছি। অপূর্ব্ব দেশের সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। তাহা এখনও সম্যক বিবৃত বা অনুশীলত হয় নাই—তাহা কালের প্রতীক্ষা করিতেছে।

কান্তিচন্দ্রের সেবা-ধর্ম্মের সহিত কাহার সহিত তুলনা করিব? বুদ্ধের গোপা আনন্দ, খ্রীষ্টের ম্যামুলুক, শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণ বিভীষণ ও গুহক শ্রীচৈতন্যের অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ, মহম্মদের খাদিজা, রামকৃষ্ণের রামচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ, এসকলের নিষ্কাম সেবার কথা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি,কিন্তু আপামর-সর্ব্ব-সাধারণ নিষ্ঠার সহিত কোল দিতে পারিয়াছেন বুঝিবা শুধু কান্তিচন্দ্র। সেবাধর্ম্মে বুথ, হওয়ার্ড,মুলার প্রভৃতিও যেন কান্তিচন্দ্রের নিষ্কাম প্রেমের নিকট পরিম্লান। কান্তিচন্দ্রের শত্রু নাই বা ছিল না, কান্তিচন্দ্রের পর নাই বা ছিল না; তিনি যেন সকল পরিবারকে আপন পরিবার করিয়া লইয়াছিলেন। এদেশ সে দেশ, এযুগ, সেযুগ, এধর্ম্ম সেধর্ম্ম, সকলে যেন তিনি বিসর্জ্জিত। সকলকে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি এ জগতের সকলের যেন মা হইয়াছিলেন। কান্তিচন্দ্রের তুলনা কোথাও মিলে নাই। তিনি তাঁহারই যোগ্য, তিনি পৃথিবীর মধ্যে বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি। কালে তাহা সকলে বুঝিবে—বুঝিবার হইলে বুঝিবে। আমরা কান্তিচন্দ্র বিয়োগে শোক-কাতর। আজ আর অধিক কথা বিবৃত করিতে পারিলাম না। অবসর পাইলে পরে আরো কথা লিখিব।

নীজ্‌শে-দর্শন।

নীজ্‌শে সম্বন্ধে এত অধিক বাদানুবাদ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার অত্যধিকতায় আসল মানুষটা অনেকাংশে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কেহ নীজ্‌শেকে দেবতার আসনে বসাইয়াছেন, আবার কেহ বা তাঁহাকে দানব করিয়া তুলিয়াছেন। নীজ্‌শে যাহাই হউন, তিনি যে বিংশ শতাব্দীর ভাব-জগতের একজন সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নীজ্‌শে সেদিনকার মানুষ! কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এত অধিক পুস্তকাবলী জগতের নানা ভাষায় রচিত হইয়াছে যে, তদনুপাতে বহু পুরাতন সেক্ষপীরও নীজশের নীচে পড়িয়া গিয়াছেন। কেবল বাইবেল ছাড়া নীজ্‌শের প্রসার প্রতিপত্তির সমকক্ষ কেহ নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিচিত য়ুরোপের কোন দার্শনিকই হইতে পারেন নাই, এত অধিক রচনাও কাহারও নাই। নীজ্‌শের রচনার অনর্গল প্রবাহের কথা মনে হইলে তিনি যে কেবল একজন অতি-মানুষ ছিলেন, ইহাই নহে, তাঁহার ভিতর এক অমানুষী প্রতিভাও বিদ্যমান ছিল, ইহাও স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নীজ্‌শের অপরিশ্রান্ত রচনায় আজকালকার দোকানদারীর কোন সম্পর্ক নাই। অনেকে তাঁহার রচনা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন বটে, তাঁহার supermanকে লইয়া ছিলিমিলি খেলা করিয়াছেন বটে, এমন কি, বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁহার অতি-মানব সন্দীপাকারে দেখা দিয়াছে, কিন্তু অপরের এ সব নকল ছেলেখেলায় তাঁহার প্রকৃত supermanএর কদর দেখা যায় নাই। তিনি যাহা, তাহাই আছেন, তাঁহার "জারথুস্ত্র" যাহা, তাহাই আছে। বর্ত্তমানের কুধারণা ভবিষ্যৎ সংশোধন করিবে।

নীজ্‌শের অতি-মানব যে রবীন্দ্রনাথের 'সন্দীপ-চরিত্র',এ উক্তিটী যদি "মানসীর" বক্ষে জনৈক রবি-ভক্ত কর্ত্তৃক সম্প্রতি স্বীকৃত না হইত, তবে আমি এত শীঘ্র এ প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিতাম না। রবীন্দ্রনাথের ভক্তলেখক সন্দীপকে বুঝিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু নীজ্‌শের অতি-মানবকে ঠিক ঠিক বুঝিয়াছেন কি? তিনি অধ্যাপক হইতে পারেন, রামমোহন লাইব্রেরীর অসাধারণ প্রবন্ধ-পাঠক বা বক্তা হইতে পারেন, কিন্তু তিনি নীজ্‌শের অতিমানব-চরিত্র কতটুকু অধ্যয়ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের সন্দীপ একটা লম্পট দানবীয় চরিত্র—তাহার সঙ্গে নীজ্‌শে অতিমানব "জরথুস্ত্রে"র তুলনা, মানসীর লেখকের পক্ষে পাগ্‌লামী ব্যতীত আর কি? ইহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাড়াইতে গিয়া, বড় করিতে গিয়া ছোটই করিয়া ফেলিয়াছেন। সন্দীপ যে অতিমানব, একথা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, বরং সন্দীপ যে একটা অতি-দানব, ইহাই আমাদের ধারণা হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, নীজ্‌শে যদি এই সন্দীপ-চরিত্র দেখিবার জন্য আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা তাঁহার ভক্তকে এই অদ্ভুত

উদ্ভাবনীশক্তির জন্য দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইজন্যই আমরা বলিয়া থাকি যে, রবির তাপ সহ্য হয়, কিন্তু বালির তাপ বাস্তবিকই অসহ্য!

এক্ষণে দেখা যাউক, স্বয়ং নীজ্‌শে তাঁহার অতি-মানব 'জরথুস্ত্র" সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কারণ অতি-মানবই (superman) তাঁহার দর্শনের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি।

নীজ্‌শে বলিতেছেন,—"In order to understand even a little of my Zarathustra, perhaps a man must be situated and constituted very much as I am myself with one foot beyond the realm of the living."

তাঁহার জরথুস্ত্র কিরূপ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে নীজ্‌শে বলিতেছেন,—"If all the spirit and goodness of every great soul were collected together, the whole could not create a single one of Zarathustra's discourses. The ladder upon which he rises and descends is of boundless length, he has seen further, he has willed further and gone further than any man. Until his coming no one knew what was height or depth and still-less what was truth."

আর এক স্থলে নিজ্‌সে বলিতেছেন :—
"The whole of my Zarathustra is a dithyramb in honour of solitude or if I have been understood, in honour of purity."

নির্জ্জনতা ব্যতীত জীবনে পবিত্রতা জন্মে না। আবার এই পবিত্রতা উন্নত স্বাস্থ্য হইতে জন্মে। নীজ্‌শের অতি-মানব এই উন্নত স্বাস্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"In order to understand superman, we must first realise its physiological pre-requisite : this is what I call *great health.*"

নীজ্‌শের মতবাদ আলোচনা করিয়া আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, যাহা পবিত্র, যাহা উন্নত, যাহা ভবিষ্যতের পক্ষে শুভপ্রদ, নীজ্‌শে তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। নীজ্‌শের অতিমানববাদ আমাদের নিকটে নূতন না হইলেও য়ুরোপের দর্শন-রাজ্যের যে একটা নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কেবল শক্তিবাদের উপর যাঁহারা নীজ্‌শেকে দোষী করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। দেখিতে হইবে, তাঁহার শক্তিবাদ কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? বর্ত্তমান যুগে নীজ্‌শের মত আত্ম-যুদ্ধ কেহই করে নাই। কথায় ও কাজে তাঁহার মত কয়জন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন? নীজ্‌শের মনুষ্যত্বই বল, আর মানবতাই বল, সবই আত্ম-যুদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। "My humanity is a perpetual process of self-mastery" একথা যাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে পারে, তিনি সাধারণ মানব নহেন।

যাঁহারা এই বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়ের জন্য নীজ্‌শেকে দোষী করিয়াছেন, তাঁহারা নীজ্‌শেকে কেবল উপর হইতেই বিচার করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। তিনি তাঁহার আত্ম-পরিচয় Ecce-Homo নামক রহস্যময় পুস্তকে লিখিয়াছেন।

"To be one's enemy's equal—

this is the first condition of an honourable duel. Where one despises one cannot wage war. I attack only things that are triumphant. Attacking is to me a proof of good will and of gratitude. By means of it, I do honour to a thing, I distinguish a thing. I attack only those things against which I find no allies, against which I stand alone—against which I compromise nobody but myself."—Ecce Homo.

এখন সহৃদয় পাঠক-সম্প্রদায় বুঝুন, নীজ্‌শে কেমন এই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সূচনা করিয়াছেন? জার্ম্মণরা যে নীজ্‌শের প্ররোচনায় নাচিয়া বর্ত্তমান সমরে মাতিয়াছে, এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নীজ্‌শে আজীবন জার্ম্মাণদিগকে কশাঘাত করা ছাড়া কোন দিনও আদর করিয়া গায়ে হাত বুলায় নাই। তিনি যত না Antichrist ছিলেন, ততোধিক Anti-german ছিলেন। জার্ম্মাণীতে নীজ্‌শের শত্রুর অভাব ছিল না, কারণ তিনি কাহারও খাতির রাখিতে কলম ধরেন নাই। সত্যের জন্য তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই, এমন কি, তাঁহার বন্ধু Waggner'ও তাহাতে বাদ পড়ে নাই। নীজ্‌শে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সমকক্ষগণের সঙ্গে, দুর্ব্বলের সঙ্গে নহে। জানি না, নীজ্‌শে বাঁচিয়া থাকিলে এই এই মহাযুদ্ধের উপর কিরূপ রায় প্রকাশ করিতেন! তবে সমগ্র য়ুরোপ যে ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার রুধির আপনি পান করিতে অগ্রসর, ইহা তাঁহার তৃতীয় চক্ষু বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই তিনি বল পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছিলেন—

"All the mighty realms of the ancient order of society are blown into space—for they are all based on falsehood : there will be wars, the like of which have never been seen on earth before."

পরলোকগত নীজ্‌শের বাণী আজ সত্য সত্যই সার্থক হইয়াছে। এসব কথা তিনি ভিতর হইতে প্রেরণার বশেই বলিয়াছিলেন। নীজ্‌শেই বলিয়া যান—"I am future!" নীজ্‌শেই সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—"I have a second sight as well as first. And perhaps I also have a third sight." এই ত্রিনয়নের ধারণা য়ুরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একমাত্র নীজ্‌শেই করিয়াছিলেন। তাই মনে হয়, শিবের ত্রিনয়নের কথা মিথ্যা নহে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভাবিনী হিন্দুর মহেশ্বরী যে ত্রিনয়না, নীজ্‌শের সমর্থনের পর আর কোন্ নাস্তিক তা অস্বীকার করিবে? "আমিই ভবিষ্যৎ!" এই সুমহতী প্রেরণা নীজ্‌শের মুখ হইতেই নির্গত হইয়াছিল! জানি না, শৈব নীজ্‌শে কোন্ মহাকালী কাল শক্তির সাধক ছিলেন। য়ুরোপে যে এমন শক্তিবাদী মহাপুরুষ জন্মাইতে পারিয়াছে, ইহা জড়-য়ুরোপের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

য়ুরোপকে সম্পূর্ণ নবকলেবরে গঠন করিবার জন্যই বুঝি নীজ্‌সের প্রকাশ। নীজ্‌সের বাণীর সাহস ও শক্তি দেখুন—"I know my destiny. I am not a man, I am a dynamite." প্রকৃত দার্শনিকের ব্যাখ্যাও তিনি এইভাবে করিয়াছেন।

"What is a philosopher. He is a man who is perhaps himself a thunder-storm ever pregnant with fresh lightnings." শুধু কি তাহাই! নীজ্‌সে আরও বলিতেছেন—I care for a philo-

sopher only as far as he is able to act as an example." নিজের জীবনে নীজ্‌সে অপরের দৃষ্টান্ত স্থলই ছিলেন। তিনি কোনরূপ মাদকদ্রব্যে আসক্ত ছিলেন না, তিনি আজীবনকাল অবিবাহিত থাকিয়াও নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন না। ইহা যাঁহারা বিশ্বাস না করেন এবং নীজ্‌সের নারীজাতির প্রধান শত্রু বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা তাঁহার ভগ্নী-লিখিত "The Lonely Nietsche" গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিবেন।

নীজ্‌শে বলিতেছেন—"The perfect woman is a higher type than the perfect man, and more over a far rarer type." ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, নারীজাতি সম্বন্ধে নীজ্‌শের ধারণা কত গভীর! যৌন-সম্বন্ধ ও দাম্পত্য প্রেমকেও তিনি কম গভীরতার সহিত দেখেন নাই। অতি-মানবের প্রজনন কল্পে নরনারীর যতটা তপস্যার প্রয়োজন, মনুর পর নীজ্‌শেই তাহা খুলিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার জরাথুস্ত্র পুস্তকে তিনি নারীজাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"May the light of the stars shine in your love! May it be your one hope to give birth to superman!

"Thou shalt not only multiply thy seed, but make it grow higher! And for this thou shalt use the garden of marriage."

"A nobler body shalt thou create, a first movement, a wheel that rolleth by its own impulse—a creator shalt thou create." এই জন্যই বংশের দুলালকে আমাদের ভাষায় আমরা "সৃষ্টিধর" বলিয়া থাকি। অতি-মানব যিনি হইবেন, সৃষ্টিধর তিনি হইবেন না, ইহা কি হইতে পারে? অবিবাহিত নীজ্‌শে বিবাহ ব্যাপারকে বড় গভীর ভাবেই ধরিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ না করিয়াই বিবাহসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য।

"Marriage : by that I mean the will of two to create one who is greater than they that created him. Reverence for each other I call marriage, and reverence for him that is inspired by such a will."

নীজ্‌শের এই উক্তির ভিতর তাঁহার সমগ্র দর্শন নিহিত রহিয়াছে। কেবল ইহাই সফল করিবার জন্য তিনি আজীবনকাল শক্তির সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। মানবকে অতি-মানব হইতে হইবে—জন্মগত সুকৃতির ফলে হউক, আজীবন কঠোর সাধনার বলে হউক, জর্ম্মাণীর বিশ্বামিত্র নীজ্‌শে মানবকে অতি-মানব হইতে বলিয়াছেন।

"Humanity must always act so as to evolve men of genius, it has no task."

অন্যত্র বলিতেছেন,—"We must fight against everything which stands in the way of the creation of great men." প্রকৃত বীরপুরুষ যিনি, প্রকৃত মহাপুরুষ যিনি, জগতের মঙ্গলকল্পে, মানবের মঙ্গলকল্পে ইহাপেক্ষা আর কি গভীর কথা বলিতে পারেন! "The goal of humanity lies in its noblest specimens." ইহাপেক্ষা জগতে আর কি সুন্দর ও সুমহান্ কথা হইতে পারে!

দার্শনিকপ্রবর Schopenhaurer বেদের "জিজীবিষেৎ" কথাটীর নকল করিয়া পাশ্চাত্য দর্শনরাজ্যে প্রচার করিলেন "Will to live" বড় ক্ষুদ্র কথা—কেবল বাঁচিয়া থাকাই

কি মনুষ্যজীবনের পরমার্থ! নীজ্‌শে দেখাইলেন—Will to power! এই শক্তিবাদকে তিনি master-morality নাম দিয়াছেন। Life itself is the will to power—ইহাই নীজ্‌শের অভিমত।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই যে শক্তিবাদ—ইহা কি কেবল দৈহিক বা জড়-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, না ইহার অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিই বিরাজ করিতেছেন! নীজ্‌সে মানুষের মনগড়া পুতুলের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেন না বটে, কারণ তিনি ideals (idols) ভাঙ্গিবার ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন;—কিন্তু অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তন, (eternal recurrence) এমন কি, eternityরও তিনি মহাপূজক ছিলেন। যিনি অনন্তে বিশ্বাসী-অনাগত ভবিতব্যে বিশ্বাসী—তাঁহাকে নাস্তিক বলি কিসে?

"I love the Eternity! O how could I fail to long and for eternity for the marriage-ring of rings, the ring of recurrence?"

নীজ্‌শের এই সব উক্তিগুলি তলাইয়া বুঝিতে হইবে, তবে তাঁহার অতিমানব বুঝা যাইবে।

কোটী কোটী জীবজগতের সমষ্টি আমি, অনন্ত কর্ম্মারণ্যের সমষ্টি আমি, স্মৃতিমান্ কর্ম্মফল আমি, আমি সকলের মধ্যে দিলাম, পর আমার নাই, পুরাতন গুণে গুণবান্ আমি, পুত্রদেহে, পৌত্রদেহে বিরাজিত আমি, অনন্তকাল অনন্তরূপে বিরাজিত আমি—আমি অতীতেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকিব!—এ বিশ্বাস নীজ্‌শেরও ছিল। ত্রিকালদর্শী নীজ্‌শে তাই বলিতে পারিয়াছিলেন—

"The great fault of all philosophers is that they begin their speculations by analysing man as he now is. But man has grown, man is a continuation, an effect not in himself responsible."

আর এক স্থলে মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন।—"All times and peoples" all customs and beliefs speak through your disguises."

তাই বহুরূপী ছদ্মবেশী চারিদিকের ইঙ্গিতের দাস।—নির্ব্বাচন শক্তি আমাদিগের কতটুকু? যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বহুরূপী আমি—অন্ধ আমি প্রবাহের ন্যায় চলিয়াছি।—তাই নীজ্‌সে অন্ধ Instinctএর ভক্ত ছিলেন, Reasonকে তিনি dangerous, lifeundermining force বলিয়া গিয়াছেন।

সৃষ্টির সময় বিচার আসে না—বিচার পরে আসে। সৃষ্টি একটা অন্ধ প্রক্রিয়া মাত্র! প্রবাহ মাত্র। বিবেক সেই সৃষ্টি-প্রবাহে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। বিবেক অগ্রসর হইতে দেয় না। বিবেক আমাদিগকে অনেক স্থলে ভীরু করিয়া তুলে। অনুশাসনময় খ্রীষ্টীয় বৌদ্ধধর্ম্মে পাপ ও সয়তানের ভয় বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্ট-নীতি-বিরোধী ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-পরিপোষক নীজ্‌শে ভাল-মন্দের পর-পার (Beyond good and evil) হইতে পাপকে অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন—"I have never known what it is to feel "sinful." A prick of conscience strikes me as a sort of "evil eye."

ইহাতে সন্দেহবাদী পাদ্রী মহাপ্রভুগণের গাত্রদাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী ভারতের আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। ভারতবর্ষের পূর্ব্বপুরুষগণ

জগৎকে মধুময় জ্ঞান করিতেন—পাপ বলিয়া তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না, সয়তান বা মানবের আক্রমণ-ভয় খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধগণই জগৎকে প্রথম দেখান। খাঁটী ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে জগৎকে ভয়ের চক্ষে দেখা হয় নাই, বৈদিক ঋষিগণ জগৎকে দেবতারূপে দেখিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বৈব দেবতাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা এই বিশ্বকে আনন্দময়, দ্যুতিময়, ও সুন্দররূপেই দেখিয়াছে, দুঃখের, অমঙ্গলের বা সয়তানের ভাবে দেখে নাই। আমরা দেখাইব, নীজ্‌শের যাহা কিছু ভাব সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ বেদান্ত ধর্ম্মের অনুকূল এবং খ্রীষ্টীয় নীতি যে খ্রীষ্টীয় জগৎকে কলুষিত করিয়াছে, ইহাই নীজ্‌সের ধারণা। নীজ্‌সে বলিতেছেন,—

"Christian morality is the most malignant form of all falsehood, the actual circe of humanity: that which has corrupted mankind."

কেন যে নীজ্‌শে খ্রীষ্টান নীতির উপর এত হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন, ইহার কি কোন গূঢ় রহস্য নাই? আছে। যাঁহারা খ্রীষ্টান নীতিধর্ম্মের গোড়ার কথা জানিতে চাহেন, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয়জগতের আসল তথ্য অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "বিচিত্র প্রসঙ্গ" * পাঠ করুন, তাহা হইলে নীজ্‌শের এই খ্রীষ্টান্‌-বিদ্বেষের মর্ম্ম অল্প-বিস্তর বুঝিতে পারিবেন।

নীজশে, এই জীবন এবং জগৎকে পাপের চক্ষে, দুঃখের চক্ষে বা ভয়ের চক্ষে দেখেন নাই। জীবনের যন্ত্রণায় তিনি নিরাশ না হইয়া সুখ বোধ করিতেন—দুঃখ কষ্টকে তিনি অদূর কল্যাণেরই বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেন। "Never have I rejoiced more over my conditfon than during the sickest and most painful moments of my life."

নিজের দুঃখে ও যন্ত্রণায় তিনি যেমন নিশ্চিন্ত, আনন্দিত ও ভ্রূক্ষেপহীন, পরের দুঃখ ও বেদনায় তিনি তেমনি অকাতর ও নির্ভয় ভাব ধারণ করিতেন—কারণ দুঃখকে তিনি জীবনের অনুশীলন (discipline) বলিয়াই জানিতেন। তাই তিনি মর্ম্মাহত, দুঃখ ভয়ে ভীত, কাতর মানব সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Know ye not that the discipline of suffering alone, acute suffering has carried man to great heights? ...your compassion goes to the creature in man, to that which ought to be moulded, broken, forged, torn, beated to a white heat and refined—that which must and ought to suffer."

আর এক স্থলে বলিতেছেন,—

"Profound suffering ennobles a man; it sets him apart" কি সুন্দর কথা—ভুক্তভোগীর প্রাণের কথা। অশ্রুজলেও কি আনন্দ নাই? জগতের এত সামগ্রী থাকিতে কুন্তী কেন দুঃখকেই চাহিয়াছিলেন? সমগ্র রামায়ণটা দুঃখের ইতিহাসেই পূর্ণ। তোমরা দুঃখ হইতে মুক্তি চাও—পলাইতে চাও, কিন্তু জানি না দুঃখহীন জগৎ কেমন হইত? নির্জ্জনপ্রিয় নীজশে এই দুঃখটাকেই বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন—আর বুঝিয়াছিলেন, এই বৈদান্তিক ভারতবর্ষ! বেদান্ত দুঃখকে মানিতেই চাহে না।

এই জীবন এবং জগতে যে অহরহ ঘাত

* শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত।

প্রতিঘাত চলিয়াছে; আজ যে নরকের কীট, প্রতিক্রিয়ার নিষ্পেষণে সে-ই আবার স্বর্গের সোপানে উঠিতে পারে!—এ বিশ্বাস নীজ্‌শের ভিতর অতি গভীর ভাবেই ছিল, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—

"The path to one's own heaven ever leads through the voluptuousness of one's own hell." তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"A man must have experienced both through his strength and through his weakness."

যদি এই দুইটী ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া রবীন্দ্রনাথ "ঘরে—বাহিরে"র সন্দীপ চরিত্রে superman চিত্রিত করিয়া থাকেন; তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য, তিনি শিব গড়িতে বানরই গড়িয়াছেন। কারণ সন্দীপ-চরিত্রের মূলেই ভুল। সন্দীপের ন্যায় লম্পট, পরদারকামী কি কখনও superman হইতে পারে? কেবল উপরের স্বাস্থ্য ও সবলতা থাকিলেই superman হওয়া যায় না—দেখিতে হইবে, সন্দীপের ভিতরের দৃঢ়তা—চরিত্র-বল, ও সংযম-বল কতটা? কারণ নীজ্‌শের মতে চরিত্রহীন, অসংযমী পুরুষের superman হওয়া সুদূর-পরাহত।

নীজ্‌শে বলিতেছেন—"Whoever shall not control himself shall obey." কিন্তু সন্দীপের কথাবার্ত্তার ভিতর আমরা অসংযমের ভাবই লক্ষ্য করি।

নীজ্‌শে আরও বলিয়াছেন—"An intrinsically morbid nature can not become healthy. On the other hand, to an intrinsically sound nature illness may even constitute a powerful stimulus to life, to a surplus of life."

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সন্দীপ একজন intrinsically morbid প্রকৃতির লোক—ভিতরের স্বাস্থ্য হইতে সে বঞ্চিত, সুতরাং তাহার মত নষ্টচরিত্রের superman হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যই --Greut health যে superman হইবার প্রধান ভিত্তি!—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

নীজ্‌শের অতিমানব জরথুস্ত্র সম্পূর্ণ আত্মজয়, ও আত্ম-শাসনের উপর দণ্ডায়মান—সন্দীপের পূতিগন্ধময় কামের লালসা তাহাতে নাই, সেই বীরহৃদয়ে কোনরূপ আসক্তিই আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। তাঁহার অতিমানব বলেন—"Every conquest,every step forward in knowledge is the outcome of hardness towards one's self, of cleanliness towards one's self." কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত superman সন্দীপ একজন দুর্ব্বল। অবলার প্রতি কিরূপমার্জ্জার-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই।

আমরা বলিতে বাধ্য, হটকারিতার বসে রবীন্দ্রনাথ নীজ্‌শের অতিমানবকে অযথা অতি দানবরূপে অঙ্কিত করিয়া বড় ভাল কাজ করেন নাই। অতিমানবের নকল করিতে গিয়া তিনি নিজেই "খেলো" হইয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার একজন বিশিষ্ট ভক্তই (flesh-fly) তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। হায় রে অনুকরণপ্রিয়তা! তুমি কবে বাঙ্গালীর ভিক্ষার ঝুলি হইতে দূরীভূত হইবে?

যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি যে, যতই আমরা নীজ্‌শের চিন্তারণ্যের সুগহন দেশে প্রবেশ করি, ততই দেখিতে পাই, আর্য্য-

সভ্যতারই শাসন-পদ্ধতি তাঁহার গ্রন্থের চারিদিক হইতে সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার দর্শনের সর্ব্ব প্রথম ভিত্তি Dionysian Art ও এই ভারতবর্ষ ছাড়া নহে। তাঁহার এই গ্রীসীয় জীবন-যজ্ঞে কেবল সৃষ্টির আনন্দ নাই, ধ্বংসেরও আনন্দ রহিয়াছে—তাহাতে Orphea's রূপী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, শিবের তাণ্ডব নৃত্য, ও উলঙ্গিনী কালীর করাল ভঙ্গী সবই নিহিত রহিয়াছে। যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, যাহা কিছু ঘোর, সবই এই ডাইওনীসিয় উৎসবে পাওয়া যায়। মানব জীবন এবং সমগ্র জগৎ-জীবন যেন এই উন্মত্ত আনন্দের দিকে ছুটিয়াছে। সৃষ্টিতেও আনন্দ, ধ্বংসেও আনন্দ। কারণ অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তনও যে রহিয়াছে। শোক করিব কাহাকে লইয়া? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে সৃষ্টি হইতেছে। "Everything goeth, everything returneth. For ever rolleth the wheel of existence. Everything dieth every thing blossometh. Forever runneth the year of existence." তাই জীবন মরণেও আনন্দে নীজ্‌শে উন্মত্ত, অধীর; এই আনন্দই ত সৃষ্টির মূলাধার!—তাই বলিতে হয়, নীজ্‌শে বৈদিক ঋষিরই ধ্বনি য়ুরোপে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন মাত্র।

নীজ্‌শে জীবনকে কখনও পাপ ভাবেন নাই—যত বড় কর্ত্তব্য হউক না কেন—তিনি তাহাতে ভার বোধ না করিয়া খেলার মত লঘু দেখিয়াছেন "I know of no other manner of dealing with great tasks, than as play; this, as a sign of greatness, is an essential prerequisite." শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই নটরাজ, শিবও নটরাজ। হিন্দুর ঈশ্বর এই জন্যই লীলাময়। হিন্দুর সূতিকাগার হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই লীলাখেলা চলিয়াছে। তাই হিন্দুর চক্ষে নীজ্‌শের ভাব আদৌ অভিনব নহে।

নীজ্‌শে এক মহা পিপাসা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের নব-স্বর্গ নির্ম্মাণের ব্রত লইয়া তিনি উদীয়মান হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রই যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ তাঁহার 'Ascetic Ideals" নামক গ্রন্থ মধ্যেই পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের আত্মতৃপ্তি বা অতীতের মোহে নীজ্‌সের দর্শন আবদ্ধ থাকে নাই—ভবিষ্যতের জগৎ কি আকারে গঠিত হওয়া উচিত, ইহাকেই তিনি একমাত্র "মুক্তি" বলিয়া স্বীকার করিতেন।

"I walk among men as among fragments of the future: of that future which I see. And all my creativeness and effort is but this, that I may be able to think and recast all these fragments and ridddles and dismal accidents into one piece. To redeem all the past, and to transform every "it was" into "thus would I have it"—that alone would be my salvation."

মানবতার হিত কল্পে সুমহান নীজ্‌শের এই মহা-পিপাসা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়! মানবের জীবনকে এবং উদ্দেশ্যকে তিনি সাধারণ চক্ষে দেখেন নাই, মানুষ কিসে প্রকৃত মানুষ হয়, ইহার জন্য তিনি আজীবন ধরিয়া যুদ্ধ অর্থাৎ তপস্যা করিয়া গিয়াছেন।

"Man is to Zarathustra a thing unshaped, raw material, an ugly stone that needs the sculptor's chisel." মানুষ যেন পাথরের মত অনকোরা

অবস্থায় অসংস্কৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, নীজ্‌শে ভাস্করের ন্যায় সেই বিকৃত পাথরকে দণ্ডের দ্বারা গড়িয়া পিটিয়া অবয়ব দিতে চাহেন—সেই বজ্র দণ্ডে যদি মানবরূপী পাথরের বেদনা বোধ হয়, তাহাতে নীজ্‌শে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহেন। তিনি মানুষকে মজবুত করিতে চাহেন, তাই তিনি দণ্ডকেই, শাস্তিকেই, যন্ত্রণাকেই মুক্তির প্রধান উপাদান ও সোপান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন!

"Alas, ye men, there sleepeth an image for me, the image of all my dreams! Alas, that it should have to sleep in the hardest and ugliest stone!" চারিদিকে পাথরের সুকঠিন কারাগার, কত অত্যাচার, কত নিপীড়ন! হায়, হতভাগ্য মানব তাহাতে কয়েদীর মত আবদ্ধ রহিয়াছে;—আলো নাই, বাতাস নাই, কেবলই অবসাদের অন্তহীন অন্ধকার! তাহারই ভিতর অসহায় আবদ্ধ মানব মুক্তির জন্য হাহাকার করিতেছে! নীজ্‌শে সেই পাথরের কারাগার ভাঙ্গাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তাহাতে যদি দুই একটা পাথরের টুক্‌রা আসিয়া কয়েদীর গায়ে পড়ে, তজ্জন্য নীজ্‌শে কাতর নহেন।

"Now rageth my hammer ruthlessly against its prison. From the stone the fragments fly: what's that to me?" যাহারা নীজ্‌শেকে তলাইয়া বুঝেনা, এই জন্যই তাহারা তাঁহাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বলিয়া থাকে, এই জন্যই অনুকম্পাময় খ্রীষ্টান নীতির সহিত তাঁহার সুকঠিন তপস্যাময় master moralityর মিশ খায় না।

মানবজীবন বিলাসের ফুলশয্যা বা আরাম-কেদারা নহে—ইহা যে সুকঠিন তপশ্চরণের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইহা যে এক সুগহন তপোবন বিশেষ। ইহা যে বহুমৃত্যুর পর অমরত্বলাভ করে—এই জীবনের সম্পূর্ণতার জন্য যে বহু অনুশীলনের প্রয়োজন—ইহা নীজ্‌শে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি মহম্মদের ন্যায় বলিতে পারিয়াছিলেন—"A man pays dearly for being immortal: to this end he must die many times over during his life." পাদ্রীর মৌখিক প্রচারে এ অমরত্বলাভ ঘটে না। তাই তিনি খ্রীষ্টীয় জগৎকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন—"Instead of health, we find "salvation of the soul." নির্জ্জন তপস্বী নীজ্‌শে মৌখিক প্রচারের বিরোধী ছিলেন। প্রচার অনেক পাপের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়—অনেক অজ্ঞানকে অনেক বিষয়ে সজ্ঞান করিয়া তুলে। উদাহরণ স্বরূপ নীজ্‌শে দেখাইতেছেন, —"Preaching of chastity is a public incitement to unnatural practices." নানা কারণে তিনি খ্রীষ্টীয় জগতের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় জগতের দলবদ্ধতাকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। দলবদ্ধতা বা Communal ভাবকে তিনি herd-instinct বলিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের ধর্ম্ম, কলা বা সঙ্গীত ব্যক্তিগত উৎকর্ষের উপর স্থাপিত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কোনরূপ সঙ্ঘ বা দলের সৃষ্টি করে নাই, বৌদ্ধেরাই প্রথম দলের সৃষ্টি করে। বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে খ্রীষ্টানেরা তাহা গ্রহণ করে। নির্জ্জনতাপ্রিয় নীজ্‌শে লোকারণ্যে বড় অশান্তিবোধ করিতেন—"The only thing I have always suffered

from is multitude." ঋষি ধর্ম্মের নির্জ্জন সাধনাকেই নীজ্‌শে সার ভাবিয়াছিলেন, ধর্ম্ম লৌকিকতা বা মৌখিকতার বস্তু নহে—ধর্ম্ম আন্তরিকতা ও গভীরতা হইতেই জন্মে—"The highest mountains spring from the sea. Out of the greatest depth must the highest rise unto their height." ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এই ঐকান্তিকতা ও স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতারই প্রতিধ্বনি নীজ্‌শে করিয়াছিলেন।

এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা হইতেই নিজ্‌শের মনে জাতিভেদের উদয় হয় ও সাম্যভাব তিরোহিত হইয়া যায়। নীজ্‌শে দেখিতে পাইলেন—

"Men are not equal. Neither shall they become so. Life is a struggle to rise and to surmount itself. Divinely will we strive against each other!" মানুষের জীবনে যুদ্ধ থাকিবেই, মানুষের মনে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা থাকিবেই, সব মানুষ কখনও এক হইতে পারে না, বিভিন্নতা, বৈষম্য থাকিবেই, তাই এই বিঘোষিত সাম্য-তন্ত্রের (Democracy) যুগে নীজ্‌শে আবার জাতিভেদের বারতা লইয়া য়ুরোপের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নীজ্‌শে জানিতেন যে—

"There is one phrase that has a disagreeble ring in an age of "equal rights for all," that phrase is "Caste-division." তিনি দেশ কাল পাত্র বিদিত হইয়াও জাতিভেদের ডঙ্কা নিনাদিত করিতে লাগিলেন। জাতিভেদ এই "happiness of the greatest number"এর দিনে কাণে ভাল না শুনাইলেও নীজ্‌শে কিন্তু শুনাইতে ছাড়িলেন না—

"My philosophy is based upon a caste-division not upon an individual morality. The sense of the herd prevail among the herd, but shall not invade any other sphere; the leaders of the herd need a fundamentally different valuation for their actions."

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা অসংযমী, তাহারা নীজ্‌শের মতে কোনরূপ আদেশ বা উপদেশ দিবে না, আদেশ বা উপদেশ পালন করিবে। যিনি superman, যিনি তেজপুঞ্জকলেবর, জিতেন্দ্রিয় ও প্রভূত নায়ক হইবার যোগ্য, তিনি এই সব অসংযতচিত্ত, কোলাহলকারী গড্ডালিকা-প্রবাহ হইতে দূরে থাকিবেন—পশুপতির আদেশ পশুরা কেবল পালন করিবে, ইহাই নীজ্‌শের জাতিভেদের প্রকৃত মর্ম্ম। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, নীজ্‌শে-তন্ত্র কতকগুলা বাছা বাছা অতিমানবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত;—সাধারণ মানবের সঙ্গে তাহার কোন যোগই নাই। একথা তাঁহার ভক্ত Peter Gastও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"Nietzche's doctrines apply only to exceptional men and to the forbears of future exceptional men. With the mass of humanity he has nothing to do."

এক্ষণে exceptional men বলিতে যেন আমরা কতকগুলা অপদার্থ ধনশালী বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীই না বুঝি, কারণ নীজ্‌শে জানিতেন—

"How far the slave has become master, without having the master virtues. Aristocracay, without the basis of race and purity. How men are monarchs without being the foremost of mankind."

তিনি ইহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন—"The general aspect of life is not one of poverty and hunger but of wealth, of luzuriance, nay of absurd prodigality." সমগ্র মানব সমাজ যে যথেচ্ছাচারিতার পথে চলিতেছে, বড় লোকের খামখেয়ালী ও বিলাসিতায় যে কত অর্থ ও জীবনের অপব্যয় হইতেছে, ইহা নীজ্‌শের অবিদিত ছিল না। এইসব যথেচ্ছাচারিদিগের দ্বারা তিনি তাহার superman গঠন করিবার কল্পনাও করেন নাই। তিনি অতিমানবের স্বপ্নই দেখিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার আদর্শের অতিমানব একটীও খুঁজিয়া পান নাই। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন—"There has never yet been a superman ..Verily, even the greatest men I found all too human." আর আমাদিগের রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভক্ত-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে superman সৃষ্টিই করিয়া ফেলিলেন!

সহৃদয় পাঠকবর্গ, আমি আপনাদিগকে নীজ্‌শে সম্বন্ধে অতি অল্প সংবাদই দিতে সক্ষম হইলাম। নিজ্‌শে কেবল দার্শনিক নহেন, নীজশে কবি ও মহা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শব্দ-শক্তিমান্ য়ুরোপে খুব অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার এক একটী বাণী বজ্রধ্বনির মত—তাহার চাহনিতেও কি যেন একটা ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত! তাঁহার ফটোগ্রাফ যে দেখিয়াছে, তাহারই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। কারণ তিনি সত্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন—সত্যকে আমরা সকলেই ভয় করি। সত্যের প্রহরী হইয়া মিথ্যাবাদী মানবকে তিনি যেন ধরিতে আসিয়াছিলেন-বীর পুরুষ তিনি, কাপুরুষদিগের যম স্বরূপই ছিলেন। তিনি কাপুরুষধর্ম্ম প্রতিহিংসা-পরায়ণতাকে দুর্ব্বল নারী স্বভাবেরই নামান্তর বলিয়া গিয়াছেন।

"Feminism" whether in mankind or in man, is likewise a barrier to my writings; with it, no one could ever enter into this labyrinth of fearless knowledge." তার পর প্রতিহিংসার উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন—

"A little woman pursuing her vengence, would force open even the iron gates of fate itself."

একমাত্র প্রতিহিংসাপরায়ণতাকেই নীজ্‌শে জগতের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ বলিয়া গিয়াছেন। এবং এই প্রতিহিংসাপরায়ণতা যে দুর্ব্বলতা হইতেই জন্মে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। হিংসা, শত্রুতা, এই সব বৃত্তিকে তিনি অশান্তির আকর বলিয়াই জানিতেন।

"And nothing on earth consumes a man more quickly than the passion of resentment. "Not through hostility is hostility put to flight; through friendship does hostility end" this stands at the beginning of Buddha's teaching—this is not a precept of morality but of physiology."

বড় খাঁটি কথা—ঈর্ষায় মানুষ শুকাইয়া যায়, ভাল করিয়া খাইতে পারে না, ভাল ঘুম হয় না। ঈর্ষা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, অবলার ধর্ম্ম! জগতে যাহারা প্রকৃত বলবান্, তাহারা বন্ধুর আলিঙ্গন অপেক্ষা শত্রুর দণ্ডকেই শিক্ষাদাতা জ্ঞান করে। এই জন্যই শত্রু-বীরহৃদয় নীজ্‌শের বড় আপনার বস্তু ছিল। তিনি বন্ধুর অপেক্ষাও শত্রুকে

অধিকতর মূল্যবান্ মনে করিতেন। নীজ্‌শে অনেক স্থলে নারী জাতিকে পুরুষ অপেক্ষাও উচ্চে স্থান দিয়াছেন, কি একমাত্র এই ঈর্ষা রূপ দুর্ব্বলতাই যে নারী জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছে, ইহাও তিনি বলিতে ছাড়েন নাই।

"Women have more insight than men but conspire with decadent types against the tyranny of the mighty and strong."

এই দাসসুলভ ষড়যন্ত্র নারীজাতির পক্ষে যেমনি গর্হিত, পুরুষের পক্ষেও তেমনি। এই জন্যই, এই দুর্ব্বলতার প্রতি নীজ্‌শে "Feminism" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকেই নিজ্‌শে দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "All that arises from strength is good, all that arises from weakness is bad." এই জন্যই তিনি দুর্ব্বলতা মাত্রকেই জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে বলিয়া গিয়াছেন।

"What does Life mean? It means the constant removing from us of something that will die—it means that we should be cruel and inexorable towards all that grows feeble and old both in ourselves and in others." বিশ্বামিত্রের উৎকট সাধনা এইরূপেই হইয়াছিল, কচ এই ভাবেই সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, বুদ্ধ এই ভাবেই মারকে দমন করিয়াছিলেন, মহাদেব এই ভাবেই মদনকে ভস্ম করেন। আত্মশাসনের উপরেই জীবন প্রতিষ্ঠিত। আত্মজয়ী যিনি, তিনিইত বীর। যযাতি পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়াও, স্বর্গাদি ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, শেষে এই উৎকট আত্ম-সাধনাতেই দেহপাত করিয়াছিলেন। বীর না হইলে অমরত্ব লাভ হয় না—এই জন্যই নীজ্‌শে বীর ধর্ম্মের এত অধিক পক্ষপাতী—এই জন্যই তিনি মানবকে অনুনয় করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"Cast not away the hero in thy soul!"

প্রতিহিংসা ও বীরত্ব এক নহে। প্রকৃত বীরের হৃদয়ে হিংসা কোথায়? সে শুধু আপনিই উঠিতে চাহে না, অপরকেও তুলিতে চাহে। এই জন্যই নিজ্‌শে এত নিষ্ঠুর, এত কঠিন প্রস্তরবৎ অসাড়, কুম্ভকর্ণ মানবের প্রতি hammer লইয়া অগ্রসর। সর্ব্বপ্রকার দাসসুলভ নীচত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। তাঁহার আদেশ ছিল 'কঠিন হও।' আপনার প্রতি কঠিন হও—অপরের প্রতিও কঠিন হও, তবে জগৎ নিয়মিত হইবে, তবে মানব স্বাস্থ্য লাভ করিবে। দ্বেষ, হিংসা—এ সব ত ক্ষুদ্রের খেলা, দাসত্ব ও দলবদ্ধতার ফল। যথার্থ বীর যিনি, তিনি গম্ভীর হইবেন, তিনি সুমহান হইবেন, তিনি এ সব দাস-সুলভ দল ছাড়িয়া বাস করিবেন, তবে ত তিনি অতি-মানবের আদর্শকে সফল করিতে পারিবেন। কেবল সমতল ভূমিতে অগ্রসর হইলেই হইবে না, উপরের দিকে উঠিতে হইবে, অনন্ত সোপান অতিক্রম করিয়া অতি-মানবের সুমহান শিখরে বাসা বাঁধিতে হইবে। এই আদর্শকেই নিজ্‌সে মানবের পরমার্থ ভাবিয়াছিলেন। এই যে একাকারের চেষ্টা, এই যে সমতল করিবার চেষ্টা, এই যে Democracyর চেষ্টা, aristocracyর জন্মদাতা নীজ্‌শে জগতের পক্ষে বড় সুবিধা-

জনক বুঝেন নাই। শুধু নীজ্‌শে কেন, আজকাল অনেক পরিণামদর্শী চিন্তাশীলও বুঝিতেছেন না। মানবতার খিচুড়ী এই সমীকরণ-নীতিকে নীজ্‌শে বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন—"Surpass the petty virtues, the paltry policies, the trivial regards, the ant-like swarming, the miserable ease, the happiness of the greatest number."

কেন, উন্নত হিমালয়ের কি প্রয়োজন নাই, গম্ভীর সাগরের কি প্রয়োজন নাই? জড় প্রকৃতি যখন সমতল হয় না, তখন বিধাতার প্রধান সৃষ্টি মানব প্রকৃতি কি কখনও সমতল হইতে পারে? এই জ্বালা ও দুঃখের জগতে এত অধিক সুখ আছে কি, যে সকলকে সুখী করিবে? জগৎকে আরাম দিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সুখী করিতে পারে না। আত্মসাধনা ব্যতীত সুখ কোথায়? মানবের সুখ সাগরের গম্ভীরতায়, মানবের সুখ পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায়। ইহারই বারতা লইয়া নীজ্‌সে আসিয়াছিলেন। সমতল, ক্ষুদ্রতার জনক, দুর্ব্বলতার জনক, প্রতিহিংসার জনক কলহ ও কোলাহলের জনক, তথায় অতি-মানবের তপস্যার ব্যাঘাত ঘটে, অতিমানব স্ফূর্ত্তি পায় না। তাঁহার দর্শন জগৎময়, নয়নময় হইয়া কেবল Genius-কেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সে Genius রাজার প্রাসাদ হইতেই আসুক, বা দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতেই আসুক, সেখানে নীজ্‌শের জাতি বিচার নাই, তাঁহার মত গোল বাঁধিয়াছে ওই গড্ডালিকা-প্রবাহ বা পিপীলিকার পালের সঙ্গে, যেখানে দল দেখিয়াছেন, সেখান হইতে তিনি দূরে সরিয়া পড়িতেছেন।

"The first thing I ask myself when I begin analysing a man, is whether he has a feeling for distance in him; whether he sees rank, gradation, and order everywhere between man and man; whether he makes distinctions; for this is what constitutes a gentleman."

সমীকরণে শৃঙ্খলার হানি হয়, ছুছুন্দরের বিষ্ঠা পর্ব্বত হইয়া পড়ে, নরনারী যথেচ্ছাচারী হয়, এবং সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানের আত্ম-তৃপ্তিতে মগ্ন মানব ভবিষ্যৎ-বিষয়ে অন্ধ হইয়া থাকে। নীজ্‌শের ভবিষ্যৎই যে সর্ব্বস্ব, পরিণামে কি হইবে, ইহাই যে তাঁহার ভাবনার বিষয়। তিনি কি এই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ একাকারকে প্রশ্রয় দিতে পারেন? মানব অনুশীলনের বস্তু—কত আঘাত সহ্য করিয়া তবে মানব মানব হয়, তাহাকে সাম্যের সুখ-শয্যায় জীবন অতিবাহিত করিবার সুবিধা দিতে নীজ্‌শে নারাজ। তাই তিনি মানব-শিশুকে প্রস্তরের বুকে লৌহের হস্তে মানুষ করিতে চাহিয়াছেন, দুগ্ধফেননিভ শয্যার দিক দিয়াও যান নাই। সর্ব্বাগ্রে তিনি নারীকে বাঁধিতে চাহিয়াছেন—ভবিষ্যৎকে রক্ষা করে কে? নারী। সৃষ্টিকে রক্ষা করে কে? ওই জগদ্ধাত্রী নারী। নীজ্‌শে বলিতেছেন।

"Everything in woman is a riddle, and everything in woman hath one solution: it is called child-bearing. Man shall be educated for war and women for the recreation of the warrier."

এই অদ্ভুত সমীকরণ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার দিনে নির্ভীক নীজ্‌শেই একাকী বলিতে পারিয়াছেন—"A profound man can only like the Orientals, consider

woman as property, as a being whose predestined misson is domesticity." নারী যে প্রলয়ঙ্করী হইয়াছে, জগৎ যে যায়, যায়;—ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে! ইহা নীজ্‌শে দিব্যনয়নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই সর্ব্বাগ্রে তিনি নারীকে স্থির রাখিতে ব্রতী হইয়াছেন, কারণ ভবিষ্য-প্রসূতি যে নারী। নারী নাচিলে ধরিত্রীও নাচিতে থাকে, শিব যে শব হইয়া পড়ে! মাতৃপূজক হিন্দু তুমি—ইহাও কি তোমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে! নীজ্‌শের Art বড় কেন?—কেবল এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির জন্য!—ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির জন্য!! "Let it not be your honour whence ye come, but whither ye go. Ye shall love the land of your children the undiscovered land, in the most distant seas." যে লেখক ভবিষ্যতের প্রতি অন্তঃদৃষ্টিহীন, সে কলার মর্ম্ম বুঝে নাই, সে কেবল বর্ত্তমানকে ঠকাইতেছে মাত্র, ভবিষ্যতে তাহার স্থান নাই। কিন্তু নীজ্‌শে রূপী পক্ষী ভবিষ্যতের সুমহান্ বটবৃক্ষেই আপনার নীড় বাঁধিয়াছিলেন।

"On tho tree called future do we build our nest: eagles shall bring food in their beaks unto us lonely ones!"

নীজ্‌শের স্বর্গও ক্ষুরধারের উপর ছিল—উৎকট সাধনার ভূমিতেই তিনি তাঁহার অতিমানবের বৈজয়ন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"My paradise is "in the shadow of my sword."

আমাদিগের দর্শনের আদর্শই নীজ্‌শে নূতন করিয়া য়ূরোপে প্রতিধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে এ যুগের বিশ্বামিত্র, তাহাতেও কোন ভুল নাই। তাঁহার ভিতর ভুল, এমন কি, প্রলাপও থাকিতে পারে, কিন্তু, তিনি যে মানবকে এক সুমহান শিখরদেশে টানিয়া তুলিবার জন্য আজীবন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অতিমহা শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে।

আক্রমণ তাঁহার ধর্ম্ম ছিল, এইজন্য শত্রু তাঁহার এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইয়াছে, "A "profound" man has need of friends, at least if he has no God. I have neither God nor friends."

একমাত্র তাঁহার ভগ্নী ছাড়া তাঁহাকে সুধাইবার আর কেহ ছিল না। আজীবন নির্জ্জনতাকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র তাঁহার ভগ্নী এলিজাবেথ নীজ্‌শের নিকট নির্জ্জনের সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জীবনের গুরুভারকে লাঘব করিয়া লইতেন। ভগ্নী-স্নেহের নমুনা স্বরূপ আমরা এখানে তাঁহার একটী কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম—

"The tie that sister binds to brother.
Is strongest of all ties, I hold:
They are rivetted to one another
More firmly than by lines of gold."

নারীজাতির প্রতি ইহাপেক্ষা উচ্চতর সম্মান আর কি হইতে পারে?—

শ্রীঅকিঞ্চন দাস, সেকেন্দ্রাবাদ।

নবযুগ।

১৩২৪ সালকে নবযুগের প্রারম্ভ বলা যাইতে পারে। এই সালে এই পৃথিবীব্যাপক মহাসমর স্থগিত হইবে। লর্ড কিচেনার আগামী আগষ্ট মাসেই এই শুভ সমাচার প্রচারিত হওয়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন। মহামন্ত্রী লয়েডজর্জও বলিয়াছিলেন যুদ্ধ ১৯১৮ সন স্পর্শ করিবে না, এক্ষণও বলিতেছেন, আগামী শীতে ইহার উপসংহার হইবে। যুদ্ধের লক্ষণগুলিও সেইরূপ বোধ হইতেছে। সুতরাং ১৩২৪ সালই যুদ্ধাবসান দর্শন করিতে পারিবে, আশা করিতেছি। এই যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন যুদ্ধের আরম্ভ, নব্যসভ্যতার উদয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি নূতন পথে পরিচালিত হইবে, তাহার কল্পনা এইক্ষণই আরম্ভ হইয়াছে; ভারতে তৎসঙ্গে যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাকে যুগান্তর বলিলেও বলা যায়।

আমাদের কায়স্থ-সমাজে কিরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভাবিত, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সমগ্র ভারত-ব্যাপী (All-India) কায়স্থ সভার সৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় কায়স্থের আশা আকাঙ্ক্ষা কেবল বঙ্গীয় সমাজনীতির সীমান্তর্গত নহে। বঙ্গের ১৩ লক্ষ লোকের, সমগ্র ভারতের কায়স্থের অভিপ্রায় ছেদ করিয়া চলিবার ক্ষমতা হইবে না। তবেই দেখিতেছি, আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে দুইটী জিনিষের প্রয়োজন, (১) উপনয়ন সংস্কার এবং তদনুসারে সর্ব্বাংশে বা পূর্ণমাত্রায় সুপ্রাচীন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মভাবের প্রবর্ত্তন (২) কৌলীন্যের পরিহার।

বঙ্গের উপনয়ন সংস্কার অনেকটা রাখিবন্ধন সদৃশ। এই সংস্কারের যে প্রকৃত মূল্য, তাহা বঙ্গীয় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। সমগ্র ভারতব্যাপক কায়স্থ সভার সভাপতি যেমন পূর্ণমাত্রায় ক্ষত্রিয়াচারের অনুরোধ করিয়াছেন, বঙ্গীয় কায়স্থ সভায় সেরূপ কথা দন্তস্ফুট করার উপায় নাই। তাঁহারা পরম পবিত্রকে শূদ্রত্বের সীমার বহির্গত করিতে চাহেন না। এই তেজস্কর পদার্থে পাছে ধর্ম্মস্বাধীন্যের ভাব আসিয়া না জোটে, এজন্য তাঁহারা প্রহরী রাখিয়াছেন।

এই নূতন যুগে আমরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কি আচরণ করিব? ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ ঠিক এক কথা নহে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় কায়স্থ নহে। কায়স্থ যেমন মন্ত্রদ্রষ্টা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তেমন মন্ত্রদ্রষ্টা নহে। তাঁহারা তাঁহাদের বিধর্ম্মী উত্তর পুরুষ। পুরুষ-সূক্তবর্ণিত কালের পূর্ব্ববর্ত্তী জন-সমাজ—কায়স্থ; অর্থাৎ অখণ্ড পশ্চিমাগত জেতৃজাতি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি শ্রেণীর (চারি বর্ণের নহে) বীজ ছিল। কায়স্থের কখন বৃত্তি-সঙ্কোচ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিধর্ম্মী সন্তানেরা বৃত্তি সংকোচ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাদের বিবাহ-বৃত্ত পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাঁহারা বৈদিক ঋষি, তাঁহারা কি কায়স্থধর্ম্মা নহেন? বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, ইঁহারা ত একাধারেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। ইঁহারা যজ্ঞ করিতেন, যুদ্ধও করিতেন।* সেইরূপ

* ঋগ্বেদ (৩৷৫৩৷২৪)।+বিষ্ণু (৪৷৩৷৫) বায়ু ও লিঙ্গপুরাণেও এ কথা আছে।

জমদগ্নি, ভার্গবেরা, কণ্বেরা, ভারদ্বাজেরা ও অঙ্গিরাগণ সকলেই কায়স্থধর্ম্মা, কখন ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা), কখন ব্রাহ্মণ (পুরোহিত)। বিষ্ণু, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণানুসারে হারীত বংশীয়গণও একাধারেই ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। আর কাহার কথা বলিব? বামদেব, সৃৎ সমদ প্রভৃতি ঋষি ও সর্ব্বসাধারণ জন সংখ্যা অর্থাৎ কায়স্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইঁহারা সকলেই পুরুষসূক্ত বর্ণিত কালের পূর্ব্ববর্ত্তী অখণ্ড জেতৃবংশোদ্ভব ব্যক্তি, একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। বিষ্ণু-পুরাণ, বায়ুপুরাণ, হরিবংশেও ইহার প্রমাণ আছে।

এইক্ষণে প্রশ্ন এই, এই নবযুগে যখন চতুর্দ্দিকে নূতন তরঙ্গের খেলা আরম্ভ হইবে, নবীনালোকে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত হইবে, সকল জাতি স্বস্ব জাতীয় স্বত্বের নিশান উড়াইয়া দিয়া জগতের নব সভ্যতার শোভাযাত্রায় বাহির হইবে, তখন কি জাতীয় ধর্ম্ম-বিচ্যুত, ধর্ম্মস্বাধীন্য-শূন্য, ক্ষত্র-ব্রহ্ম ধর্ম্মের বহিস্কৃত নামমাত্র ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বজা লইয়া বর্ণাশ্রমীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবনত মস্তকে বিজেতৃ কায়স্থ সন্তানেরা গমন করিবে? অথবা ধর্ম্ম-স্বাধীন্যের পূর্ণ লীলা ক্ষেত্র আমাদের ঐতিহাসিক বীজপুরুষ চিত্তচরিত্রের মহাপ্রভাবান্বিত কেতনতলে উন্নত মস্তকে অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইবে? ইহার কি হইবে? আমাদের বিশ্বাস, কায়স্থ জাতি তাহাদের ঐতিহাসিক বীজপুরুষকে ভুলিবে না। তাহারা মুহুরীর বংশ সাজিবে না। তাহারা বিজেতৃ বলদৃপ্ত চিত্রদেবের ভাব লইয়াই নবযুগকে আলিঙ্গন করিবে? এজন্য এই যুগারম্ভে আমি অবনত মস্তকে চিত্রদেবকে নমস্কার করিতেছি।

নমস্তে চিত্রদেবায় ক্ষত্রব্রহ্ম স্বরূপিনে।
পূজ্যায় সর্ব্বলোকশ্চ দেবদ্যুতি মহাত্মনে॥
ত্বমাদি পুরুষং শ্রেষ্ঠং কায়স্থ বীজমুচ্যতে।
আগত মুচ্চ দেবেভ্যঃ সশস্ত্রমিহভারতে॥
সত্যধর্ম্মশ্রতারার্থং সরস্বত্যামুপাগতঃ।
কৃতত্বয়া মহাযজ্ঞঃ সপ্তসিন্ধু সুবিশ্রুতঃ॥
ত্বং হি জেতা বেদজ্ঞস্তং মন্ত্রদ্রষ্টা মহামতে।
প্রকৃতার্থং ক্ষত্রং দেহি কায়স্থে সর্ব্বভারতে॥

চিত্র চরিত্রে সমাজের যে চিত্র অনুভব করা যায়, আগতপ্রায় নবযুগে বা সত্যযুগে তাহাই প্রদর্শিত হইবার সম্ভাবনা। সত্য বটে, কলিযুগের অন্ধকার এইক্ষণও সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই; এজন্য আমরা দেখিতে পাই, সত্যযুগের উষালোক দেখিয়া তিমিরান্ধ ব্যক্তিরা কতকটা হৈ চৈ করিতেছেন। এই হৈ চৈএর একটা স্রোতঃ সেদিন শোভাবাজার রাজবাটী দিয়া বহিয়া গেল।

ইন্দোরের রাজদরবার হইতে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, সেই রাজ্যে যে ব্যক্তি অন্ততঃ দুই সপ্তাহকাল বাস করিয়াছে, সে-ই ইচ্ছা করিলে যে কোন জাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য যদি কেহ তাহাকে সমাজে পীড়ন করিতে চাহে, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এই যে আন্তর-জাতিক বিবাহ সম্বন্ধে আইন হইল, ইহার প্রতিবাদ সভায়, যাঁহাদের কায়স্থতত্ত্বে জ্ঞান আছে, তাঁহাদের যোগ দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কায়স্থের যে প্রাচীন সমাজের কথা বলিলাম, তাহা ত এইরূপ সমাজই। বৃত্তি সঙ্কোচ স্বীকার করিয়া বিবাহ গণ্ডী পৃথক্ করিয়াই কায়স্থ দেহ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির উৎপত্তি। কায়স্থের জাতীয় ধর্ম্মে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ (Inter-marriage) নিষিদ্ধ নহে; কায়স্থ যেমন

ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে, তেমনি শূদ্রের কন্যাও বিবাহ করিতে পারে। এই প্রাচীন রীতির পুনরুত্থান দেখিয়া কোথায় শোভাবাজারের রাজগণ হর্ষিত হইবেন, আর কোথায় তাঁহারা পরের কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়াছেন। হায়! হায়! নিশ্চয়ই কায়স্থের ঘোরতর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে।

আবার সেই সভায়ই বরদারাজ্যের জাত্যাচার সম্বন্ধীয় বিধির প্রতিবাদ হইয়াছিল। সেখানে ব্যবস্থা আছে, কোন ব্যক্তি সমুদ্রপথে য়ুরোপ বা অন্যত্র গিয়া ফিরিলে যদি কেহ তাহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, সে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয়। সমুদ্র যাত্রা বেদবিহিত উদ্যম। বাণিজ্যার্থে কায়স্থেরা সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন। ঋগ্বেদ (৪।৫৫।৬) প্রভৃতি বহু ঋকে তাহার প্রমাণ আছে। তজ্জন্য পুরুষ সূক্ত-বর্ণিত কালের পূর্ব্বে কেহ তিরস্কৃত বা বহিস্কৃত হইত না। কি প্রয়োজন ছিল, আমাদের সেই প্রথার প্রবর্ত্তনের চেষ্টার প্রতিবাদে? সেইরূপ বিধবা-বিবাহও আমাদের মৌলিক সমাজের অনুমোদিত;—

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেত-
মুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমতি
সংবভূথ॥ ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই ঋকের শেষ ভাগের এইরূপ অর্থ করেন;—"যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পতি হইতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে তাহার পত্নী হইয়া পত্নীর কর্ত্তব্য সাধন কর। এই মন্ত্রে দিধিষু শব্দের অর্থ নারীর দ্বিতীয় পতি। এই মন্ত্র বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেছে।

ধর্ম্মমহামণ্ডলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এবং গোবর্দ্ধন মঠের নির্ব্বাচন তুচ্ছ করিয়া বরদা-রাজদরবার জনৈক তেজস্বী বিলাত-ফেরত, আর্য্যসমাজের ভাবাপন্ন ও বিধবার দিধিষু অর্থাৎ বিধবা বিবাহকারী ব্যক্তিকে দ্বারকার শঙ্করাচার্য্যের গদীতে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ বৈদিক রীত্যনুমোদিত। অথচ বৈদিক সাবিত্রীগ্রহণ করিয়াও শোভাবাজারের রাজবাড়ী হইতে বরদা দরবারের এতাদৃশ রাজকার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া পাঠান হইয়াছে। এই চপলতার যে কোন মূল্য হইবে না, তাহা নিশ্চয়। ইহাতে কেবল ইহাই দেখা যাইতেছে, শোভাবাজারের রাজবাটী—কেবল অন্যের হস্তে ক্রীড়াপুতুল মাত্র। যেখানে আর্য্য-সমাজের মহাত্মা বলদেব রাওকে সম্মান করা হইয়াছিল, সেই খানে তদপেক্ষা উচ্চতর একজন আর্য্যসামাজিকের পদোন্নতিতে বরদারাজের নিন্দা করা হইয়াছে। বরদা প্রভৃতি দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি ক্রমশঃ বৈদিক অর্থাৎ আমাদের প্রাচীনতম সামাজিক ভাবে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে। ইহাই এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। কোথায় ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিব, আর কোথায় আমরা ইহার বিরুদ্ধতা করিতেছি!!!

এই নবযুগে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত। কিন্তু ধর্ম্ম, প্রজার আয়ত্ত না হইলে, শাসন আয়ত্ত হইবে কি প্রকারে? যে সকল দেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই ধর্ম্মধাম, ধর্ম্মমন্দির ও ধর্ম্মাচরণ প্রজার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। জিরুসালেম ও মক্কায় যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মযাজক হইতে পারে। ভারতে তাহা ত দূরের কথা; ৩০ কোটি লোকের মধ্যে ১/৬ অংশ

অস্পৃশ্য ; তাহাদিগকে উচ্চ বর্ণের লোকেরা স্পর্শ করেন না। কিন্তু এই জন সংখ্যা (৫ কোটি লোক) জার্ম্মাণীর ও ইংলণ্ডাদি দ্বীপত্রয়ের জনসংখ্যার প্রায় সমতুল্য। বোধ হয় পাঠকেরা জানেন, জার্ম্মাণীর জনসংখ্যা ৬ কোটি, তাহার মধ্যে ৫ কোটির বেশী এখন আর নাই ; ইংলণ্ডাদি দ্বীপত্রয়ের জনসংখ্যাও তাহাই, তাহারও দশা প্রায় তদ্রূপ। এই দুই মহারাজ্যের সমতুল্য জনসংখ্যাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের উন্নতির কোন বিধান না করিয়া কি ইংরেজরাজ স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিতে পারেন? সেই কি বিধান? সেই বিধানই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উঠাইয়া দেওয়া। সেই বিধানই মন্বাদি সংহিতা-গুলিতে নিম্নজাতির প্রতি যে সকল বিধি ব্যবস্থা নিরূপিত আছে, তাহা তুলিয়া দেওয়া, স্পর্শ-দোষ ও দেব-স্পর্শ-দোষ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম স্বত্ব ও জাতীয় স্বত্ব তুল্য করিয়া দেওয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গন্ধ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে স্বায়ত্তশাসন চাওয়াও উচিত নহে, দেওয়াও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে না। অথচ আমাদের কায়স্থ কর্ত্তৃপক্ষ স্বায়ত্তশাসনও চাহেন ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থানও চাহেন। ইহা যে সম্ভাবিত নহে,ইহা বালকেও বুঝে। গবর্ণমেণ্টেরও মনন দেখা যাইতেছে যে, স্বায়ত্তশাসনের জন্য একটা না একটা কিছু করেন। না করিলে নয় ; বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারত হইতে যেরূপ অর্থ ও লোক সাহায্য করা হইয়াছে, তাহাতে কৃতজ্ঞ ইংরেজ জাতি কিছু প্রত্যর্পণ না করিয়া পারেন না। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যের যখন নূতন ব্যবস্থা হইতে চলিল ; ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে এক যোগে যখন (Commonwealth of nations) বলিয়া নূতন রাজবিধির প্রস্তাব চলিতেছে, তখন ঔপনিবেশিক রাজ্যের প্রজার সহ ভারতীয় প্রজার জন্মসত্ত্ব ও জাতীয় স্বত্ব অভিন্ন করিতে বাধ্য হইতে হইবে ; ইহারও ভিতরের কথা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলোৎপাটন। কেন না, ইংরেজ-শাসনের মূল নীতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতির উপর নির্ভর করিতেছে। চেষ্টা করিলে দেখান যায়, ইংরেজের Civil and criminal law গস্পেলের নীতি মূলে প্রাদুর্ভূত। নেপোলিয়ান বলিয়া গিয়াছেন, গস্পেলের নীতি democratic প্রজা-মুখী। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তদ্বিপরীত। একজন ব্রাহ্মণ একজন শূদ্রকে বধ করিলে তাহার দণ্ড কয়েক কাহন কড়ি। নেপালে এক্ষণও কোন ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড নাই। ইংরেজরাজ্যে যেখানে যীশুখ্রীষ্ট প্রজার জন্য স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেখানে কি প্রজার প্রতি এরূপ অবৈধ বিচার সম্ভাবিত হইবে? সুতরাং স্বায়ত্তশাসন ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যুগপৎ পুনরুত্থান প্রস্তাব বাতুলতা মাত্র। তবে যদি বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন, বুঝিতে হইবে, এই ধর্ম্ম ও সমাজনীতির আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। সম্ভবতঃ এই নবযুগে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক আবশ্যক মত ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপের ঘোষণা শুনিতে পাইব। যুদ্ধান্তর রাজনীতির ইহা একটী অত্যাবশ্যক অভিব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। স্বায়ত্তশাসন তাদৃশী নীতির সহ পরিণীতা হইয়াই ভারতে নব যুগে দেখা দিবেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

জন্য নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এই কথাগুলি ভাবিতে বলি।

আর ভাবিতে বলি, আমাদের দেশীয় রাজনৈতিকেরা কি করিতেছেন ও কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রবলতম জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সামাজিক তর্কের মীমাংসা হইবে। এই ক্ষেত্রে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অদ্বিতীয়। তিনি কি বলিতেছেন, শুনুন।

"We have always insisted in these columns on the establishment of social equality and the removal of artificial barriers between man and man which have so far weakened our body politic. With that view we have looked upon all revivalist movements, particularly the Sonatondharma and the Barnasram activities as standing in the way of our national pragress." Bengalee, 4th July, 17.

এই কথা বলিয়া তিনি জাপান মন্ত্রী কাউণ্ট অকুমার (Count Okumar) বাক্য হইতে খানিকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কি প্রকারে জাপানীরা ভাবতপ্রেরিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদের উন্নতির সহায় করিয়া লইয়াছেন, উক্ত উদ্ধৃতাংশে তাহার আভাষ আছে। আমরা নিম্নে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

"True, up to forty years ago our country like India had a caste system of its own, but scarcely had its weak points been discovered when it was dismissed and all the people came to be equalised in rank and right. This was the cause of our rising up. I question whether the Hindus will master up courage enough to do the same, upon this hinges the future destiny of India." Quoted in Bangalee of the same date.

সমস্ত ভারতে যে চারি সহস্রাধিক জাতি বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, বিবাহ ও আচার ব্যবহার একাকার করিয়া যদি চারিটী ভাগে পরিণত করা যায়, তবে চারিবর্ণকে একাকার করিয়া সেই সর্ব্বপ্রাচীন বর্ণ-ভেদ পূর্ব্ব সমাজে, যাহাকে আমরা ব্রহ্মকায়স্থ সমাজ বলিতেছি, তাহাতেই বা পরিণত করা যাইবে না কেন? দৃষ্টান্ত স্থলে আমাদের বঙ্গের নবশাখদিগের মধ্যে বিবাহ ও খাওয়া দাওয়া প্রচলিত করিয়া যদি বৈশ্য বর্ণের সৃষ্টি করা যায়,—এই নয়টীই যদি একটী হইতে পারে, তবে চারিটী বর্ণ মিশিয়া প্রাচীন কায়স্থ সমাজ কেন গঠিত হইতে পারিবে না? ইহার কোনটী সহজ? যাঁহারা চতুরাশ্রমের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের মনে কি এ স্বপ্নের উদয় হয় না?

সত্য বটে চারিদিকে কতকগুলি জাত্যান্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। লোক-গণনাই ইহার প্রধানতঃ কারণ। চণ্ডাল নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত মাহিষ্য, কায়স্থ ক্ষত্রিয়, শণ্ডিক বৈশ্য-সাহা প্রভৃতি নামধারণের চেষ্টায় এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; তাহাতে এই সকল জাতির বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। সেন্সাস কাগজে চণ্ডালকে এখনও নমঃশূদ্র শব্দের পাশে ব্রাকেটের মধ্যে chandai লেখা দেখা যায়। অন্যান্য জাতিও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারে নাই। কায়স্থের ন্যায় সুশিক্ষিত জাতিকেও হাইকোর্ট শূদ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই জাত্যান্দোলনগুলি অন্ধকারের মধ্যে

খদ্যোতিকাবৃন্দের ঝিকিমিকির ন্যায় দেখিতে সুন্দর হইলেও, নবযুগের বা সত্যযুগের দিবালোকে উহারা নিবিয়া যাইবে। তখন সকলে এক মহালোকে ও মহাজাতিতে পরিণত হইবে। তখন জাপানের ন্যায় ভারতও আপন প্রত্যেক সন্তানকে Equal in rank and right ঘোষণা করিয়া জননীর স্বাভাবিকী মমতা প্রকাশ করিবেন, তখন পরস্পরের রক্তের বিনিময় ও ধর্ম্মস্বাধীন্যের পথে কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না, তখন পূর্ণ কায়স্থধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে, সেই কায়স্থ ধর্ম্মই বিশুদ্ধ ক্ষত্র ধর্ম্ম, আদি ধর্ম্ম।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনার কথা বৃথা জল্পনা মাত্র। শোভাবাজার রাজ-বাটীতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুকূলে আরও একটী সভাধিবেশন হইয়াছিল; সেও বহু দিনের কথা নহে। তাহাতে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ত এমন কোন প্রস্তাব গ্রহীত হইল না যে, বাঙ্গালী পল্টন মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ যুবক প্রবেশ করিবে না; উক্ত পল্টন মধ্যে কেবল মাত্র কায়স্থ যুবকেরা প্রবেশ করিবে। আমরা যদি দেখিতাম, এতাদৃশ প্রস্তাব গ্রহণান্তর গবর্ণমেণ্টে তাহার প্রতিলিপি প্রেরিত হইয়াছে, আমরা যদি দেখিতাম, কায়স্থেরা পল্টনে প্রবেশের একচেটিয়া অধিকার চাহিতেছেন; তবে বুঝিতাম, বাস্তবিকই চতুরাশ্রমধর্ম্মের জন্য জাতির মধ্যে আন্তরিক চেষ্টার সুত্রপাত হইয়াছে। আমরা ত দেখিতেছি, কি রাজকার্য্যে, কি যুদ্ধ বিগ্রহে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যে, সর্ব্বত্রই সকলের তুল্য অধিকার। কেবল ধর্ম্মালয়ই দেবস্পর্শ দোষ প্রথা দ্বারা, ভোজনালয় খাদ্য স্পর্শ দোষ-প্রথা দ্বারা ও নিম্ন সমাজ জল স্পর্শ ও পাত্র স্পর্শ দোষ প্রথা বারিত আছে। দেশের মহামিলনের উদ্দেশ্য-পথে, ধর্ম্ম, সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তুল্য অধিকার পাওয়ার পক্ষে স্পর্শ-দোষ প্রথাই আপাততঃ প্রধান প্রতিবন্ধক। এই নবযুগে কায়স্থের ক্ষত্রধর্ম্মে পূর্ণাধিকার অর্জ্জনের সহযোগে এই ঘৃণনীয় স্পর্শ-দোষ-প্রথা উঠিয়া যাইবে। আমাদের শাস্ত্রের ভবিষ্যতবাণীও তাহাই। যাঁহারা জাতিভেদ উৎপন্ন করিবার জন্য দিবারাত্রি কলম চালাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানিতেন, এই কৃত্রিম প্রথা কালে থাকিবে না; শিক্ষার সহিত ইহা তিরোহিত হইবে। এজন্য সাধারণ শিক্ষা তাঁহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বত্রই বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা হইতেছে। বরদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে তাহা আরম্ভ হইয়াছে, বোম্বে মিউনিসিপাল্‌টীর মধ্যেও তদুদ্দেশে বিধি প্রচারিত হইয়াছে। যে দিক দিয়া দেখা যায়, বিশুদ্ধ কায়স্থ ধর্ম্ম বা ক্ষত্রধর্ম্মের পথ পরিষ্কার হইতেছে। ধর্ম্ম-স্বাধীন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। নমঃ চিত্রদেবায়। তোমার কার্য্য ও চরিত্র ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিবিম্বিত হউক।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

আয়ুর্ব্বেদ শারীর-তত্ত্ব।

জীব জগতে মানব জাতি যেমন শ্রেষ্ঠ, তাহার জন্ম প্রণালী ততোধিক শ্রেষ্ঠ। জীব কি ভাবে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং কি প্রকারে তাহার দেহ রচনা হয়, তাহার অভিজ্ঞান যেমন কৌতুকাবহ, তেমনি অভিনব। বৈদেশিক চিকিৎসা-শাস্ত্র (Anatomy) প্রভৃতি গ্রন্থে এতদ্ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা আছে; তাঁহাদের ঐ সকল গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই বলিবেন যে, এই শারীরতত্ত্ব প্রকৃতই অত্যদ্ভুত এবং এরূপ অভিনব আবিষ্কার পূর্ব্বে অপর কোন জাতির দ্বারা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এই ধারণা যে কতদুর ভ্রান্ত, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। আমাদের বিশ্বাস, বেদাদি গ্রন্থ নিচয়ে বর্ণিত এই শারীর বিজ্ঞান বা তত্ত্ব অতীব প্রাচীন, সূক্ষ্ম এবং পরিস্ফুট। ইহা যেমন সুন্দর ও অভিনব, তেমনি শ্রেষ্ঠ; প্রাচীন শাস্ত্র সমূহে এতদ্ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য অদ্য এই প্রবন্ধে অবতারণা করিলাম। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও ভরসা করি, ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের মনোজ্ঞ হইবে।

এক্ষণে জীব কি প্রকারে গর্ভাশয়ে আবির্ভূত হয় এবং দেহের উৎপত্তি ও রচনা প্রণালী বা কিরূপ, তাহার বর্ণনা আবশ্যক। স্ত্রী ও পুরুষের মৈথুন ধর্ম্ম প্রযুক্ত গর্ভযন্ত্রে নিষিক্ত শুক্র রমণীর আর্ত্তব রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া অন্তর্বায়ু প্রভাবে গর্ভাশয়গত হয় এবং তদ্দ্বারা স্থূল দেহের রচনা করে।

"শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা রজোধাতুর্ভবেন্মাতা।
শূণ্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে॥"

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সকল শুক্র বা সকল শোণিতে গর্ভরচনা কিম্বা শরীরোৎপত্তি হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। দুষ্ট শুক্র বা দুষ্ট আর্ত্তবে গর্ভ সঞ্চার হয় না; যে শুক্র চেতনাবিশিষ্ট, তাহা জীব রক্তের সংযোগে গর্ভোৎপাদনের উপযোগী। কিন্তু জীব কি উপায়ে গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং কি ভাবে তাহা সংরক্ষিত এবং সম্বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু দেখান কর্ত্তব্য।

মানবদেহ বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে দেহাধিষ্ঠিত জীবাত্মা স্থূলদেহ লইতে বহির্গতি হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে; কারণ জীবাত্মার বিনাশ নাই, ইহা;—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ"

সুতরাং "ন হন্যতে হন্যমান শরীরে"

শরীরের বিনাশে চৈতন্য বিম্বিত জীবাত্মা শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এবং পুনঃজন্মের অন্তরাল কাল পর্য্যন্ত (সূক্ষ্মদেহে) ভাবনাময় শরীরে * "আকাশস্থো নিরলম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" হইয়া থাকে। পরে, (শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করতঃ) পিতৃযান পথ অবলম্বন করিয়া মর্ত্যলোকে পুনঃ মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। বেদান্তাদি শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত যে;—

* জীব সমগ্র জীবনকালে যে সমস্ত কর্ম্ম ধ্যান ও অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কালকর্ত্তন করিয়াছে, প্রায়ণকালে তদনুরূপ এক নূতন ভাবনা তাহার চিত্তকে অধিকার করে। "প্রায়ণকালে যচ্চিত্ত স্তেনৈব প্রাণ আয়াতি।" ভাবস্ফূর্ত্তি প্রবল হইয়া জীবকে সেইরূপ দেহ বা গতি প্রদান করিয়া থাকে, শাস্ত্রে ইহাকেই ভাবনাময় শরীর বলে।

"ক্ষেত্রজ্ঞ স্থিত আকাশ আকাশাদ্বায়ুমাগতঃ।
বায়োর্ধূমং ততশ্চাভ্রমভ্রান্মেঘেহবতিষ্ঠতি ॥

* * * *

"যদা বর্ষতি বর্ষেন সহজীব স্তদাভুবি।
বনস্পত্যোষধীর্জাতাঃ সংক্রামত্য বিলক্ষিতঃ ॥
তাভ্যেহন্নং জাতমাত্রঞ্চ পুরুষে শুক্রতাংগতম্।
শুদ্ধার্ত্তবায়ং যোর্ষায়াং নিষিক্তং স্মর মন্দিরে ॥
সহার্ত্তবেন শুদ্ধঞ্চেৎ গর্ভাশয়গতং ভবেৎ।
জীবকর্ম্ম প্রেরিতং সৎ গর্ভমারভতে তদা ॥"

উক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা আকাশ বায়ু মেঘ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া, পার্থিব রসের সঙ্গে শস্যাদি মধ্যে, পরে খাদ্যের সহিত মানবাদি শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং যথাক্রমে রসাদি ষষ্ঠ ধাতু ভ্রমণ করতঃ অবশেষে সপ্তম—শুক্র (কাহার মতে রজো) ধাতুতে গিয়া অবস্থিতি করে। অনন্তর নবনারীর সঙ্গম উপলক্ষে শুক্র জীবরক্তের সহিত ক্ষীর-নীরবৎ মিশ্রিত হইয়া গর্ভাঙ্কুর ধারণ করে, পরন্তু তৎকালে তাহা ক্লেদের ন্যায় থাকে, ক্রমে সেই শুক্রার্ত্তর জাঠর বায়ু ও জাঠর উত্তাপ দ্বারা পচ্যমান হইলে তাহা হইতে চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়; এবং ক্রমশঃই তাহা ঘনীভূত হইতে থাকে ও একে একে তাহাতে সাতটী স্তর পড়ে, তাহা সপ্ত সন্তনিকা নামে অভিহিত। পরিণামে এই সপ্ত স্তর সপ্ত কোষরূপে পরিণত হয়।

"তস্য খল্বেবম্প্রবৃত্তস্য শুক্র শোণিতস্যাভি পচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকা সপ্তত্বচো ভবন্তি" যথা—

"শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদোমাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থিত্বক্‌চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥"

এক্ষণে উক্ত শুক্র ও শোণিত, চৈতন্য সংযোগ হেতু সজীব পদার্থের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পৃথিব্যাদি পঞ্চধাতু ভবিষ্যৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ অনুরূপ স্ব স্ব ক্রিয়া নিষ্পন্ন করতঃ স্থূল দেহের রচনা করিতে লাগিল। (১)

পূর্ব্বে যে সপ্ত সন্তানিকার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে, তাহাতে সপ্তপ্রকার কলা উৎপন্ন হয়। কলা সকল দেহস্থ মাংসাদি ও আশয় (২) সমূহের সীমা সদৃশ এবং কাষ্ঠসারের অনুরূপ; উহা স্নায়বিক পদার্থে বিজড়িত, জরায়ু ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মায় সমাচ্ছন্ন। (৩)

এই সপ্ত প্রকার কলার গুণ ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার। মাংসধরা কলা হইতে
"* * * শিরা ধমনয়স্তথা।
স্নায়ু শ্রোতাংসি রোহন্তি পঙ্কে পঙ্কজকন্দবৎ॥"

অর্থাৎ পঙ্কে যেমন মৃণাল উৎপন্ন হইয়া তাহারই উপর ইতস্ততঃ লতাইত থাকে, সেইরূপ মাংস হইতে শিরা ধমনী স্নায়ু এবং স্রোতো বহা নাড়ী উৎপন্ন হইয়া শরীরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। রক্তধরা কলায় রক্তের উৎপত্তি ও অবস্থিতি এবং পূর্ব্বোক্ত শিরা ধমনী প্রভৃতি স্রোতোবহা নাড়ী দ্বারা শরীরের নানা বিভাগে প্রবাহিত হইতে থাকে। মেদোধরা কলা হইতে

(১) "আত্মানঃ পূর্ব্বমাকাশস্ততোবায়ুস্ততোঽনলঃ।
অনলাজ্জলমেতস্মাৎ পৃথিবী সমজায়ত ॥
(২) রক্তশ্লেষ্মামপিত্তানাং পক্কস্য মরুৎস্তথা।
মূত্রস্যচাশয় সপ্তক্রমাদাশয় সংজ্ঞকঃ ॥
গর্ভাশয়োঽষ্টমঃ স্ত্রীণাং পিত্তপক্কাশয়ান্তরে ॥
(৩) সপ্তকলাঃ সপ্তস্নায়ু শ্লেষ্মজরায়ুভিঃ।
স্ব স্ব কোষাগ্নিভিঃ পক্কাস্তে ত্রিধানুত্তরোত্তরান্ ॥
সীমভূতাশ্চ ধাতুনাং কাষ্ঠসারো পমামতাঃ।
তেষামাদ্যা মাংসধরাঃ * * * *
অসৃঙ্মেদঃ শ্লেষ্মসকৃৎ পিত্তং শুক্রধরাঃ পরাঃ ॥

উৎপন্ন মেদ অবস্থান করে, শ্লেষ্মধরা কলায় স্নেহবৎ পিচ্ছিল শ্লৈষ্মিক পদার্থ উৎপন্ন হয় ও অবস্থান করে; সকৃৎ অর্থাৎ মলধরা কলা হইতে মলবিভাগ ও মলের স্থিতি হইয়া থাকে। পিত্তধরা কলায় পক্কাশয়গত আহারীয় বস্তুর পরিপাক-জনিত রস গৃহীত ও বিধৃত হয় এবং শুক্র ধরা কলা হইতে চরম ধাতু বা শ্রেষ্ঠ ধাতুর উৎপত্তি হইয়া স্ব স্থানে অবস্থান করে; পরন্তু ঘৃত যেমন সমুদয় দুগ্ধব্যাপক, সেইরূপ, শুক্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, তাহা সমগ্র দেহ-ব্যাপক। রক্ত, মাংস ও মেদকেও সর্ব্বদেহব্যাপক বলিলেও আপত্তি নাই, কিন্তু শ্লেষ্মধরা কলা স্নেহাক্ত পিচ্ছিল বিধায় দেহের সমগ্র সন্ধি-স্থানে অবস্থিত; এতদ্দ্বারা দেহের সন্ধিস্থান গুলি সুখে পরিচালিত হয়। শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলাসমূহ আপন আপন নি[illegible] স্থানে অবস্থিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে থাকে।

অনন্তর গর্ভস্থ ভ্রূণ যাবৎ মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তাবৎ মাতার অধিকাংশ দোষ গুণাবলী ও ভাবাভাব জাতকে প্রাপ্ত হয়; কারণ শিশু গর্ভবাস কালে মাতার ভুক্ত দ্রব্যের রসে পরিপুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে;* অর্থাৎ জাতকের নাভি-নাড়ী ধাত্রীর রসবহা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত বা আবদ্ধ থাকায় ধাত্রীর আহার্য্য রস জাতকের শরীরে সঞ্চারিত হইতে থাকে। দোহদা-বস্থায় প্রসূতির মনোভাব প্রভৃতি ধর্ম্মে, এমন কি, সদসৎ বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির দর্শনে সন্তান তত্তদ্ গুণাগুণ বিশিষ্ট হয়, যেমন,—

"* * ভোগী দোহদাদ্রাজদর্শনে।
অলঙ্কারে স্থললিতো ধর্ম্মিষ্ঠ স্তাপসাশ্রমে ॥
দেবতা দর্শনে ভক্তো * * *
ইত্যাদি। বিষয়ের অলাভে তদ্রূপ
'মাতুর্যদ্বিষয়ালাভস্তদার্ত্তো জায়তে সুতঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতার আহারাদি রসের পরিণাম-জাত রস রক্তাদির দ্বারা সন্তানের শরীর ও মন গঠিত হয়।

শুক্র শোণিত সংযোগ হেতু মাতার ন্যায় পিতৃজা গুণ ও ভাবাদি সন্তানে আরোপিত হইয়া থাকে। মানব ষড়বিধ ভাব সম্পন্ন, † তন্মধ্যে পিতা মাতা হইতে যে সকল প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেখান যাইতেছে।—

"মৃদব শোণিতং মেদো মজ্জা প্লীহা যকৃদ্গুদঃ।
হৃন্নাভীত্যেবমদ্যাস্তু ভাবা মাতৃভবা মতাঃ ॥
শ্মশ্রুলোম কচাঃ স্নায়ু শিরাধমনয়ো নখাঃ।
দশনাঃ শুক্র মিত্যাদি স্থিরাঃ পিতৃ সমুদ্ভবাঃ।

অতঃপর গর্ভাঙ্কুর হইতে ভূমিষ্ঠকাল পর্য্যন্ত কিভাবে জাতকের শরীর বর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে এবং এই রচনা-কৌশল কিরূপ অভিনব, তাহার কিছু আলোচনা এস্থলে কর্ত্তব্য।

"দ্রবত্বং প্রথমে মাসি কললাখ্যং প্রজায়তে।
দ্বিতীয়ে তু ঘনঃ পিণ্ড পেশী চ ঘনমর্ব্বুদম্ ॥"

গর্ভযন্ত্রে নিষিক্ত শুক্র যোষিদ্বর্গের শুদ্ধার্ত্তবের সহিত ক্ষীর নীরবৎ সংমিশ্রিত হইয়া জাঠর বায়ু ও জাঠর তাপে যখন অল্প ঘনতা প্রাপ্ত হয়, সেই ঘনীভূতাবস্থাই গর্ভের প্রথম মাসিক 'কলল' নামে প্রখ্যাত। দ্বিতীয় মাসে উহা ঈষৎ কঠিন মাংসপিণ্ড রূপ ধারণ করে, এবং তাহা পুংস্ত্রী ও ক্লীবভেদে পিণ্ড, পেশী ও অর্ব্বুদ নামে অভিহিত। *

* "মাতৃবসবহা নাড়ীমনুবদ্ধা পয়াভিধা।
নাভিস্থ নাড়ী গর্ভস্য মাত্রাহাররসাবহা ॥"

† ভাবাস্যু বড়্বিধাস্তস্য মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা।
রসজাঃ আত্মজাঃ সত্ব সম্ভবাঃ স্বাত্ম্যজাস্তথা ॥

* বিভিন্ন মাসে রূপান্তরিত জাতক দেখিতে কিরূপ,

"তৃতীয়ে ত্বঙ্কুরাঃ পঞ্চ করাস্ত্রি শিরসোমতাঃ।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গভাগাশ্চ সূক্ষ্মাঃস্যুর্য্যুগপত্তদা॥
চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাম্ ভাবনামুপজায়তে॥"

তৃতীয় মাসে মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সূক্ষ্ম বিভাগ সকল রচিত, বহিরিন্দ্রিয়াদির সংযোগ হইয়া থাকে; এবং চতুর্থ মাসে ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুব্যক্ত হয় ও ভাবনা-রূপ অন্তরেন্দ্রিয়াদির প্রস্ফুরণ হয়, এই মাসে ভ্রূণের চলৎক্রিয়া শক্তি হইয়া থাকে।

"প্রবুদ্ধং পঞ্চমে চিত্তং মাংস পোণিত পুষ্টতা।
ষষ্ঠেঽস্থি স্নায়ুনখর কেশ রোম বিবিক্ততা॥
বল বর্ণোচোপচিত্তৌ সপ্তমেত্বঙ্গ পূর্ণতা॥

পঞ্চম চিত্ত (মনের) বোধ বা জ্ঞান শক্তির বৃদ্ধি এবং মাংস শোণিতের পুষ্টতা হয়। ষষ্ঠে অস্থি এবং তদ্বন্ধনার্থ স্নায়ু ও রোম কেশ নখর প্রভৃতি অসম্পৃক্ত, (বিস্পষ্ট) বল ও বর্ণের সঞ্চার হয়। সপ্তম মাসে চিত্তের সঙ্কল্প শক্তি জন্মে, অর্থাৎ মনের সজীবতা বা চেতনা শক্তির উন্মেষ হয়; এবং প্রাগুক্ত বায়ুবাহী নাড়ী, স্নায়ু ও বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-বাহিনী শিরা প্রভৃতির রচনা সমাপ্ত হয়। প্রত্যুত এই সময়ে যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অষ্টমে ত্বকশ্রুতী স্যাতামোজশ্চৈব তু হৃদ্ভবম্।
শুদ্ধমাপীতরক্তঞ্চ নিমিত্তে জীকিতে মতম্॥"

অর্থাৎ অষ্টম মাসে মানবের প্রকৃতরূপে ত্বক্শ্রুতি (শ্রবণেন্দ্রিয়) ও মাংসের উৎপত্তি হয়; শ্রবণ ও স্মৃতি শক্তি প্রবল এবং মানবের জীবনী শক্তির শ্রেষ্ঠ ও প্রধান উপকরণ "ওজ" ধাতুর বিকাশ হয়। ইহা শুদ্ধ, স্বচ্ছ, ঈষৎ পীত ও রক্তাভ তরল পদার্থ এবং মানবের হৃদয়ে থাকে। শাস্ত্রে এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, এই মাসে মন ও স্মৃতি শক্তির প্রভাবে জাতক ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর কষ্ট অনুভব করতঃ উদ্বেগের সহিত অবস্থান করে, * এবং নিরূপায় হইয়া—

"কৃতাঞ্জলির্ললাটেঽসৌ মাতৃপৃষ্ঠমভিস্থিতঃ।
অধ্যাস্তে সঙ্কুচদ্গাত্রো গর্ভো দক্ষিণ পার্শ্বগঃ॥"

কৃতাঞ্জলি করদ্বয় ললাটে স্থাপন পূর্ব্বক মাতার পৃষ্ঠাভিমুখে অধোবদনে উপবিষ্ট থাকে।

অনন্তর নবম অথবা দশম মাসে শরীরের পুষ্টি লাভে প্রসব কাল উপস্থিত হইলে,—

"ক্রিয়তেঽধঃ শিরঃ সূতিমারুতৈঃ প্রবলৈস্ততঃ।
নিঃসার্য্যতে রুজদ্গাত্রো যন্ত্রচ্ছিদ্রেন বালকঃ॥
জাত মাত্রস্ততস্যাঽথ প্রবৃত্তি স্তন্য গোচরা।
প্রাপর্জন্ম বোধসংস্কারাৎ ইতি জীবস্য নিত্যতা॥"

প্রবল প্রসব বায়ুর দ্বারা মস্তক অধঃ (ও পদদ্বয় উর্দ্ধে) উৎসারণ করিয়া ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় পিণ্ডিত দেহ যন্ত্র ছিদ্র দিয়া বিনির্গত হয়। ভূমিষ্ঠ মাত্র বাহ্য বায়ু সংস্পর্শে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির বিনাশ হইয়া যায়, ইহাই শাস্ত্রে মায়া নামে অভিহিত।

এবম্প্রকার গর্ভাশয় গত সংসৃষ্ট একবিন্দু শুক্রার্ত্তব দিন দিন প্রবৃদ্ধ ও হস্ত পদাদি যুক্ত দেহী হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হওতঃ একজন মহা শূরবীর হয়, আবার লীলাময়ের বিচিত্রলীলা বিধানে কিছুকাল ধরায় অবস্থান ও নানা কীর্ত্তি করিয়া পরে জীর্ণ-শীর্ণ জরা-গ্রস্ত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য।

"এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালম
পরং যদ্গর্ভবাসস্থিতম্,
রেতশ্চেতিতি হস্ত মস্তক
পদংপ্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্ব যৌবন-
জরারোগৈরনেকৈর্ব্বৃতম্,
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি
তথা ধচ্ছত্যধাগচ্ছতি॥"

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

তাহা সেই সেই মাসের গর্ভচিত্র দেখিলে সম্যক অবগত হওয়া যায়। এবং পিণ্ড দক্ষিণ, পেশী বাম ও অর্ব্বুদ মধ্যভাগে অবস্থান করে।

"* পুমান্ দক্ষিণ পার্শ্বগঃ।
বামপার্শ্বে স্থিতা নারী ক্লীবং মধ্যস্থিতং মতম্॥"

* "উদ্বিগ্নে গর্ভসংবাসাদাস্তে গর্ভাশয়ে স্থিতঃ।
স্মরণ পূর্ব্বানুভূতাংস্তু নানো জাতিশ্চ যাতনাঃ॥"

সাহিত্য-সুহৃদ্ বিদ্যাসাগর। *

প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধানগণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে প্রাচীন ও তৎপরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালা ভাষাকে নবীন সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহাই যদি সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে, ইতিহাস হিসাবে, মাসিক পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী আর সাপ্তাহিক সোম-প্রকাশ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় কুমার দত্তের বাঙ্গালা রচনাই আধুনিক সাহিত্য-রচনার প্রারম্ভ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। এই আইন জারি হওয়াতে আমাদের আপত্তির বিশেষ কোন কারণ নাই, আপত্তি এই যে, এখনকার আধুনিক সাহিত্যসেবীদল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাতিল করিবার জন্য ব্যস্ত। ব্যস্ত হইবার কারণ আছে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দোহাই দিয়া, সেই মহাপুরুষের নাম লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় এমন একটা "জগা খিচুড়ী" তৈয়ার করিতে ইহারা ব্যাকুল। লেখ্য ও কথ্যভাষার অসঙ্গত মিলন ও মিশ্রণে এমন একটা অদ্ভুত নূতন আজগুবি ভাষার সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত যে, তাহাকে স্বেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তাই বিদ্যাসাগর বাতিল, আর অক্ষয়কুমারের "অক্ষয় যশের মাল্য" মাতৃভাষার কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লইয়া শয়ন কক্ষের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়া বর্ত্তমান লেখকদল শান্তি লাভ করিয়াছেন।

এ বাজারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য-সেবার আলোচনা ভয়ে ভয়ে করিতে হয়, কারণ এখন "উলুবুনেরাই" "কীর্ত্তনে" আর "কোদাল" ভাঙ্গিয়া এখন "করতাল" গড়াইতেছে। এ বাজারে, এ হট্টগোলের মাঝখানে কোন কথা বলাই নিরাপদ নহে। এখন খাঁটি বৈষ্ণব পদাবলী গাহিয়া আসর জমাইবার লোকাভাব ঘটিয়াছে। আমার এত গুলি কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আজকাল একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসাদারে বাজার ভরিয়া গিয়াছে। তাহা যদি না হইত, তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বাল্য-পাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্র সকল হইতে উঠিয়া যাইত। আমি জানি, বেশ

* মহাত্মা চণ্ডীচরণ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল সন্দর্ভ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার একটী প্রকাশিত হইল। মহাত্মার লেখনী চিরনীরব হইয়াছে! বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য! ন, স।

অনুভব করি, সত্য কথা বলিতে গেলে "বন্ধু বিগ্‌ড়ায়"। কিন্তু সত্য গোপন করিয়া ন্যায়ান্যায় বিচার-শূন্য হইয়া বন্ধু রক্ষা করা অপেক্ষা লোকের অপ্রিয়ভাজন হওয়া শত গুণে বাঞ্ছনীয়।

এই দেখ না, হাল আইনে নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলনে বঙ্গদেশীয় টেক্‌ষ্টবুক্-কমিটির সভ্য মহাশয়গণ যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া অবাধে বঙ্গীয় শিশুগণের মুণ্ডপাত করিতেছেন, তাহার ভাষা রচনার অপূর্ব্ব নমুনা আমার দিবার প্রয়োজন নাই। সে কাজটা দীর্ঘকাল ধরিয়া হিতবাদী সম্পাদক ভার হইয়া যথাধর্ম্ম কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন। এই অজাগর সভ্য-মণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণে যে সকল গ্রন্থ আমাদের দেশীয় বালকবৃন্দের শিক্ষার পুষ্টি সাধন করিতেছে, সেই সকল অপূর্ব্ব গ্রন্থের অত্যাশ্চর্য্য ভাষার নমুনা তুলিয়া পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিতে গেলে এক দিনের একটী প্রবন্ধে কুলায় না। তাই তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল এই বলিতে চাই যে, কি বাল্য পাঠ্য কি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? সেই মহাপুরুষের জীবনগত সাহিত্য বিষয়ে উচ্চ নীতির কথা বলিতে গেলে, একটা কথায় আলোচনা করার লোভ সম্বরণ করিতে পারা যায় না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর মিষ্টার এট্‌কিন্‌সন্ সাহেব সেন্ট্রাল-টেক্‌ষ্ট-বুক্-কমিটি নামে এক সদস্যমণ্ডলী গঠন করেন। বঙ্গের নিম্ন হইতে মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন কার্য্যের ভার সেই কমিটির উপর অর্পিত হয়। এট্‌কিন্‌সন্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়া ঐ কমিটির সদস্য হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিত কালে ও তাঁহার লোকান্তর গমনের পর সেই কমিটির সদস্য রূপে অনেকেই গ্রন্থকার হইয়া একাধারে রক্ষক ও ভক্ষক হইতে কুণ্ঠা বোধ না করিলেও, উচ্চ নীতি-জ্ঞানপরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া লিখিয়াছিলেন "আমি গ্রন্থকাররূপে যে সকল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিব, কমিটিতে আসন গ্রহণ করিয়া সেই সকল গ্রন্থের উপযুক্ততা বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কোন মতেই ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইবে না, বিশেষতঃ আমি উপস্থিত থাকিলে বা ঐ কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করিলে, আমার রচিত গ্রন্থগুলির গুণাগুণ বিচারে বাধা দেওয়া হইবে। সুতরাং আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কমিটির কার্য্যে যোগদান করিতে পারিব না।" দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রদর্শিত এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে থাকিতেও, বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য কমিটির সভ্য হইয়া গ্রন্থ রচনার দ্বারা এই আদর্শ পুরুষের পুস্তকগুলি ক্রমে ক্রমে সরাইয়া, নিজেদের রচিত তুলনায় অযোগ্য গ্রন্থ সকলের স্থান লাভে সহায়তা করিয়া অক্ষয় অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

হিন্দুর মেয়ে সাহেব বাড়ীতে ঝারার কাজ করে কি? বর্ত্তমান পাঠ্য কমিটির কৃপায় আমরা এরূপ শিক্ষাও পাইতেছি। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-পরিবার নির্ব্বিশেষে সকল ঘরের ছেলে মেয়েকে ধুচুনি, কুলা, চুপড়ি তৈয়ার করিতে শিখিতে হয়। যে, যে কাজ জীবনে কখন করিবে না, করার

প্রয়োজন হইবে না, তাহাও এখন শিখিতে হয়। হাঁস মুর্‌গীর বিবরণও হিন্দুর ছেলে মেয়েদিগকে জানিতে হইবে। উত্তম কথা, ইহাই এখন বাল্য-শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা দিবার জন্যই সর্ব্ববাদীসম্মত, সুসঙ্গত, সুখ-পাঠ্য বোধোদয়খানি নিম্নপ্রাইমারি হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু কি ইতর কি ভদ্র, সকল শ্রেণীর বালক বালিকার শিক্ষালাভের উপ-যোগী ঐরূপ আর একখানি গ্রন্থও আজ পর্য্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তকখানি সরাইয়া যে কমিটি, কমিটির সদস্য স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "নূতনপাঠ"খানির স্থান করিয়া দিয়াছিলেন, সেই আদর্শ সদস্যমণ্ডলীর দেশে পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন. ইহাও ভাবিতে লজ্জা বোধ হয়, বলিতেও হাসি পায়। তবে কথা এই যে, বাঙ্গালা-দেশের একই মাটীতে মনমত্তকারী সৌরভ পূর্ণ ও অপূর্ব্ব শোভন দৃশ্য বস্‌রাই গোলাপ ও গুয়েবাব্‌লা দুই ফুলই জন্মিয়া থাকে। দেশের লোকের পোড়া কপাল, গুয়েবাব্‌লার সমাদর করিতেই লোক বিব্রত। তাহা না হইলে কি আর ঐ কমিটির উপদেশ ও অনুরোধমত তদানীন্তন কমিটির সম্পাদক রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "সীতার বনবাসের" সংহার সাধন জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন? সীতার বনবাসের অপরাধ এই যে, উহাতে বহু বিবাহের নাম আছে। এটা হ'লো কামার বাড়ী ছুঁচ্ বিক্রয় করিতে যাওয়া, কারণ বহু বিবাহ নিবারণ কল্পে বিদ্যাসাগর মহা-শয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নশীল, যে বিষয়ের সংস্কারের জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া গেলেন, তাঁহারই রচিত সীতার বনবাসের ঘোরতর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অপ-রাধে, পুস্তকখানি পাঠ্য তালিকায় আর স্থান পাইতেছে না। কি লজ্জার কথা! গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর মহাশয় রাধিকা বাবুকে বলিয়াছিলেন,—"রাধিকা! সীতার বনবাস ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য হবে বলিয়া লিখি নাই, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পড়্‌বার জন্য সীতার বনবাসের রচনা করিয়াছিলাম, তোমাদের পাঠ্য-তালিকায় সীতার বনবাস থাকুক, আর না থাকুক, তাতে আমার আসে যায় না।" এই সদুত্তরে রাধিকা বাবু অপ্রস্তুত হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যে লেখনী হইতে একদিকে শিশু-সাহিত্য বর্ণপরিচয় ও বোধোদয়, অপরদিকে সীতার বনবাস, শকুন্তলা, মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ প্রসূত হইয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিতে সে সাহিত্য রচনা শক্তির সম্যক্ প্রশংসা বা সমালোচনা সম্ভব নহে। আমরা এখন "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" সাজিয়া অনেকে অনেক প্রকার সাহিত্য রচনা করিতেছি, এবং কথায় কথায় বঙ্কিম-চন্দ্র ও রবীন্দ্রের দোহাই দিয়া এই জাতীয় সাহিত্য-পারাবারে কর্ণধার সাজিয়া যে পথে ইচ্ছা চলিয়াছি, ফলও তদনুরূপ ফলিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে প্রাচীন তন্ত্রের লেখক-মণ্ডলীর মধ্যে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থান দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছি। এ ব্যগ্রতারও যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রের অনাবাদি অংশের কর্ষণ ভার এমন সকল লোকের হাতে পড়িয়াছে, যাহাতে উত্তম ফসল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বড়ই

অল্প। বাঙ্গালা সাহিত্যের রচনা-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই গুরু-স্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। একদা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—"তাঁহারই সঞ্চিত মূলধন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি।" তাঁহার এই উক্তির অন্য প্রমাণও বর্ত্তমান আছে। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই. এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" এখন দেখা যাইতেছে যে, ভাষার প্রাণই হইল মধুরতা ও মনোহারিত্ব, এই দুই বিশেষ গুণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা চিরদিনই আদর্শ স্থানীয়।

"সুমধুর ও মনোহর" ভাষাই রসের প্রাণ। ভাষায় রস সঞ্চার করিতে হইলে সৌন্দর্য্যের উপাসক হওয়া চাই। মধুরতা ও মনোহারিত্ব, এই উভয়বিধ গুণই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উপাদান। জগতের সর্ব্বজন-সমাদৃত কোন চিত্র দেখিলে, দেখা যায় যে, তাঁহার অঙ্কণ-শিল্পের প্রাণরূপে ঐ দুই গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে পরিমাণে ঐ উভয় গুণের অভাব হইবে, চিত্রাঙ্কণ-চাতুরীও সেই পরিমাণ খর্ব্বতাপ্রাপ্ত হইবে, এটা অবিসংবাদী সত্য। এইটী স্মরণ থাকিলে, লেখ্য ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ সাধনে একটা প্রকাণ্ড সন্দেহ থাকিয়া যায়। আজকালকার দিনে সে সন্দেহ দূর করিবার লোক লোপ পাইয়াছে। প্রবীণ ও প্রাচীন সাহিত্য-সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সে দিন চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যের আবাদী জমিতে ওকড়ার চাষ করিবার উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। এখন বঙ্গের সাহিত্য-সেবীরা প্রসন্ন মনে আবাদী ও অনাবাদী জমিতে ওকড়ার চাষ করিলে দোষের হইবে না। তিনি নিজ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ও তৎপরে গুরুস্থানীয় সাহিত্য-সুহৃদ্ বঙ্কিমচন্দ্রকে নবীনচন্দ্রের বিচারে বিদায় দিয়া, লেখ্য ও কথ্য ভাষার মিলন সাধনের ওকালতী করিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু যিনি যাহাই করুন আর বলুন, ভাষার প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে, ভাষায় রস সঞ্চার করিতে হইলে, ভাষার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে হইলে, ভাষাকে পল্লীগ্রামের পর্ণকুটীরেই হাজির করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থার ফলে, ভাষা যে ইতরত্ব অর্জ্জন করিবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞগণের দৃষ্টি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না থাকিলে কিরূপ হইবে? পল্লীপথে গাড়োয়ান গোযান চালাইতে চালাইতে প্রফুল্ল অন্তরে গাহিতেছে:—"ওরে রামশশি! হবি বনবাসী, কে আমায় ডাক্‌বে মা বলে; ক্ষীর সর,—হালার গুরু খাতি পার বইতি পার না।" ইত্যাদিতে যখন ভাষা রচনার পদ্ধতি আসিয়া পৌঁছিবে, তখনই কি ভাষা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হইবে? "রামশশী ও হালার গরু" পল্লীপথে শকট-চালকের প্রীতি-প্রবাহ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়াছে বলিয়া উহাই কি আমাদের ভাষা রচনার শিক্ষার স্থল হইবে? আজকালকার এইরূপ অসঙ্গত আবদারের ফলে তাহাই হইবার কথা। আর সেই জন্যই বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎপরে রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান লেখকদল "পাড়াগাঁয়ে" ইতর ভাষার ব্যবহারের সহজ পথ রচনায় ব্যস্ত। অনেকের হয়ত স্মরণ থাকে না যে, পল্লীচিত্র ভাল, কিন্তু পল্লীভাষায় অনেক

বিপদ আছে। ইংরাজের ভাষায় অনেক পল্লীশব্দ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ইতর ভাষা গ্রহণের ওকালতী কেহ করে না। কেবল আপনা আপনি যে গুলি ভাষায় আসিবার, তাহাই আসিয়া থাকে। ধরে বেঁধে পল্লী-ভাষা রচনা করিতে গেলে আবার অত্যধিক প্রাদেশিক শব্দ প্রচলন করার প্রয়োজন হইবে, আর সেরূপ অবস্থায় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টলের পল্লীভাষা ২৪পরগণা, নদীয়া, হুগলী ইত্যাদির পল্লীভাষার সঙ্গে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া যাইবে, অপর পক্ষে এদেশের গভর্ণমেণ্টের ইহাই লক্ষ্য, সাহিত্যে এইরূপ প্রাদেশিকতা সৃষ্টি করিতে পারিলে, সমগ্র বঙ্গদেশের ভাষাগত একতা সাধনের অন্তরায়টী বেশ দীর্ঘ স্থায়ী হয়। আমাদের জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে ভাষাগত প্রভেদ যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে, ইহার উপর যে সকল প্রবীণ সাহিত্যিক ও নবীন লেখকদল প্রাণপণ যত্নে পল্লীভাষার পক্ষপাতিতা করিতেছেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র বুঝিতে পারে, ইংরাজী ভাষা এইরূপ আকারেই দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। স্কট্‌ল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে কথ্যভাষায় কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও, লেখ্যভাষায় সে পার্থক্য তাহারা রক্ষা করিয়া চলে না। আর এক কথা এই যে, বিদ্যাসাগর-রচিত বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক কি ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বুঝে না? রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের গ্রন্থাবলী কি এ অঞ্চলের পাঠকগণ বুঝে না? বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের পাঠকদল কি কেবল পশ্চিম বাঙ্গালায় আবদ্ধ? রবীন্দ্রনাথ কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেই আবদ্ধ আছেন? তাই যদি না হয়, তবে এ সাহিত্যপ্রবাহকে বলপূর্ব্বক পল্লীভাষায় পরিণত করিতে সকলে কোমর বাঁধিয়াছেন কেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপ্রকাশিত বাসুদেব চরিত ও বেতাল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অপরিসমাপ্ত রামের অধিবাস ও আত্মচরিত পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থরচনায় ভাষার সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ-বাসনা বাঙ্গালী পাঠকগণের কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? "পরের মুখে ঝাল খাওয়াই" আমাদের স্বভাব। আবার জিজ্ঞাসা করি, সাহিত্যসেবী মোড়ল দলেরই বা কয়জন সে সাহিত্য সেবার উপযুক্ত পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন? আর কয় জনই বা তাঁহার অসামান্য উত্তেজনাপূর্ণ মৌলিক রচনা বিধবাবিবাহ-বিচার ও বহু বিবাহ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন? আমাদের অধিকাংশই লোকমুখে শ্রুত নিন্দাপ্রশংসায় পরিচালিত হইয়া অবাধে মতামত দিতে মজবুত। ইহাই এদেশের ব্যাধি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বা কবিসম্রাট রবীন্দ্রের রাশি রাশি রচনাই বা কে সমাদর সহকারে পাঠ করিয়াছেন? অথচ লোকে বলে বলিয়া, না জানিয়া, না বুঝিয়াও ঐ "সম্রাট" শব্দটী ব্যবহার করিয়া পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভাণ দেখাইতে আমরা সদা ব্যস্ত। ইহাই আমাদের ধাত।

আর আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্য জলপ্রপাতের বেগে শতধারায় সহস্রধারায় শত শত পথে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর আবর্ত্তপূর্ণ প্রবাহেই বা কয়জন ভাসমান? কে সেই বর্ত্তমান ত্বরিতগতিসম্পন্ন সাহিত্যের পূর্ণ সংবাদ রাখিয়া থাকেন? এমন লোক আছেন, যাঁহারা সাহিত্যসেবাকেই জীবনের

মহাব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই উদ্‌যাপনে জীবনপণ যত্ন করিতেছেন, ব্যবসায়ের জন্য নহে, স্বার্থ সাধনের জন্য নহে, কিন্তু কেবল সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ নিবন্ধন শত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও পথভ্রষ্ট হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবসাদারির ঢাক বাজাইবার লোক নাই, আজকালকার "আয় খরিদার চলে আয়", "এমন জিনিস হয় নাই, হইবে না" "যায় ফুরিয়ে যায়, এই বেলা নিয়ে নাও" ইত্যাদি, কত বলিব, কত তরুণ বয়স্ক যুবকের নামের পূর্ব্বে "সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক" "বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি" ইত্যাদি কত মধুরতর বিশেষণ সংযুক্ত দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। এই সকল বিশেষণে বিশেষিত হইতে যাঁহাদের বিনয় সৌজন্যেও ঘা লাগে না, একবিন্দু কুণ্ঠা বোধ হয় না, আবার স্থল বিশেষে নিজেরাই নিজেদের মহামহিমাময় নামের পূর্ব্বে ঐরূপ অপূর্ব্ব বিশেষণ বসাইতে ও নিজ নিজ গ্রন্থের সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, সেই সুধীমণ্ডলীর পুরোভাগে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচয় স্থলরূপে মধ্যপথে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মনোমোহন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিহারীলাল ও বড়াল প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর, সেই দলে রাজকুমারের ন্যায় রাজোচিত উন্নত মস্তকে বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, তোমাকে প্রণাম করিব। কিন্তু নিজের আয়োজনে বাজনা বাজাইয়া বাদ্যের পশ্চাতে লুকাইয়া খিড়কির দ্বারে অন্তঃপুরে প্রবেশের চেষ্টা কেন?

এতেই তোমাদের স্বার্থ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করা হইতেছে, এ পথে প্রবেশ করিয়া পরিণামে বাণী-মন্দিরে বসিবার স্থান পাইবে না। শেষে আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িতে হইবে, তাই বলি, দুর্দিনের সখ মিটাইতে গিয়া দেশের সাহিত্যিক স্বার্থ বিনষ্ট করার প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করিতে হইবে।

আজ যে দেশের অসংখ্য মহামান্য ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নপূর্ণ ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া রত্ন সংগ্রহে ব্যস্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে পথে সুহৃদ্‌রূপে দণ্ডায়মান। তাঁহার উপক্রমণিকা ও কৌমুদীই সহজ পথের প্রদর্শক। তাঁহার পঞ্চতন্ত্র সঙ্কলন, তাঁহার বহু শ্রমে সম্পাদিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণ সাহিত্য চর্চ্চার স্রোত প্রবলতর করিয়া দিয়াছে। আজকার সেবকদল ইংরাজী সাহিত্যের তর্জ্জমায় ব্যস্ত, কিন্তু দেশের প্রাচীন সাহিত্যের পরিত্যক্ত ভাণ্ডারে রত্ন সংগ্রহে সাগ্রহে ব্যস্ত, এমন লোকের সংখ্যা অল্প। অগাধ জলধিসদৃশ সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাণ্ডার লুট করিবার লোকাভাব দেখিয়া মনে হয়, সকলেই শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বার্ণ, বাইরণে ও টেলিশনে, সেক্‌সপিয়ার ও স্যার ওয়াল্‌টারে হাবুডুবু খাইতেছেন। ইঁহারাই পিতৃপিতামহের ধন সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া পরধনে লোলুপ দৃষ্টিপাতে ব্যস্ত।

তাই বলি, একবার মনের ঝোঁক হৃদয়ের দারুণ আবেগ রোধ করিয়া স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, তোমাদের ঘরে কিছু আছে কিনা? যদি না থাকে, তবেই পরের দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকা শোভা পাইবে, নতুবা এ ভিক্ষা-বৃত্তিতে জাতীয় কল্যাণ না হইয়া, সাহিত্যের পরিপুষ্টি না হইয়া সমূহ ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

এক্ষণে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কয়েকটী কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—"The moment my health is restored, it is my intention to devote my time and all intion to the composition and compilation of useful works in the Vernacular language of Bengal Thus, although my direct official connection with the education and enlightenment of my countrymen will have ceased, I Venture humbly to hope, that my remaining years will still be devoted to the advancement of a great and secred cause in which my deep and earnest interest can only close with my life."

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে এমন উচ্চ আদর্শ সাহিত্যসেবিগণের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতে, সাহিত্যচর্চ্চায় 'ফড়েগিরি' করাটা কি নিতান্ত হীনবৃত্তি নহে? তাই বলি, সাহিত্যের বাজারে ব্যবসায়ী সাজিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন চেষ্টায় বিরত থাকিলেই ভাল হয়। দেশের মধ্যে ধনোপার্জ্জনে ব্যবসায় করিতে চাও কর। আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, নাচ তামাসায় ব্যবসাদারি আনিয়াছ, বেশ, আচার আচরণে লেখা লৌকিকতায় ব্যবসায়ের ভাব প্রবিষ্ট করাইতেও ত্রুটি কর নাই, পূজা পার্ব্বণে, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ব্যবসাদারি আনিয়া সামাজিক জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছ, বাকী ছিল কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের অনাবিল ভাব রক্ষা করা, এই এক বস্তু এখনও আছে, যাহার সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনটা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। তোমরা দশে মিলে সবটাইত খোয়াইয়াছ, আর কেন? এই স্থানটিকে যদি রক্ষা করিতে, ব্যবসায়ের ফাঁদ হইতে রক্ষা করিতে না পার, তাহা হইলে জাতীয় সর্ব্বনাশ সাধনের শেষ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট লিখিত হইতে আর বিলম্ব নাই। দেখিতেছ না কি, ইহার পশ্চাতে ফেউ লাগিয়াছে, এখন এই দুর্দ্দিনে যদি তোমরাও ইহার গঙ্গা যাত্রার আয়োজনে সহায়তা কর, তবে আর আশা কোথায়? অনুসন্ধান কর, দেখিবে, ঐ ফেউগুলিও তোমাদের ঘরের লোক, যাহারা মোড়ল সাজিয়া তোমাদের উপদেষ্টা হইয়া তোমাদের পূজা চাহিতেছে, তাহারাই আবার ফেউ সাজিয়া তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর। সাবধান! সাবধান! আজ এই দুর্দ্দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্মরণ করিয়া, সেই সাহিত্য-গুরুর চরণ স্মরণ করিয়া, সাহসের পথে, ন্যায় নিষ্ঠার পথে, স্পষ্টবাদিতার পথে অগ্রসর হও। তবে সাহিত্য বাঁচাইতে ও রক্ষা করিতে পারিবে। নতুবা নহে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

দেহাত্যয়।

ভগ্নদেহ লইয়াও ব্লাভাস্কি সিক্রেট ডকট্রিন গ্রন্থ প্রণয়নে কিরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লিপিনিরতা ব্লাভাস্কির অদ্ভুত শ্রমশক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইত। উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হইলেও তাঁহাকে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত 'লুসিফার' (Lucifer) মাসিক-পত্রের সম্পাদনে, সমিতির নানাবিধ কর্ত্তব্য সাধনে, অসংখ্য জিজ্ঞাসুর জটিল প্রশ্ন মীমাংসায়, শিক্ষার্থী ও শিষ্যদিগকে শিক্ষাদানে তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। কেবল দেহত্যাগের কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে কাহারও সহিত বড় একটা মেলামেশা করিতেন না। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া অসমান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতেন। তিনি যে শীঘ্রই রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, শিষ্য প্রভৃতিকে তাহার পূর্ব্বাভাস দিয়া তাঁহার প্রত্যাসন্ন প্রস্থানের জন্য সকলকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার অসীম অদম্য চিত্তবল যেন তাঁহার শারীরিক অপটুতা অগ্রাহ্য করিয়া সেই ভগ্নদেহটীকে অবিশ্রান্ত একাগ্র সাধনার ভিতর দিয়া সবেগে চালিত করিয়া নিত,—কিছুতেই বিশ্রাম ভোগ করিতে দিত না। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে শিষ্যদিগকে উপদেশ দান এক প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি সকল শিষ্যকে একরূপ শিক্ষা দিতেন না। প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের ধারণার উপযুক্ত উপদেশ দিতেন। বেসান্ত বলেন :—

"শিক্ষয়িত্রীরূপে তিনি বিস্ময়কর ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেন। এক একটী বিষয় পুনঃ পুনঃ বুঝাইতেন, নানারূপে বুঝাইতেন। তাহাতেও যদি কেহ কেহ না বুঝিত, তাহা হইলে তিনি আসন-পৃষ্ঠে দেহ নিক্ষেপ করিয়া হতাশভাবে বলিতেন,—'হা ঈশ্বর! আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, ইহাদিগকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না!' তৎপর যদি অন্য কাহারও মুখের ভাবে বুঝিতেন যে, বিষয়টী তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও বোধগম্য হইয়াছে, তবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন,—'এই পুরাতন বোকাগুলিকে আমার বক্তব্যটী একবার বুঝাইয়া দাও ত।' কোন শিষ্যকে যদি তিনি উপযুক্ত পাত্র মনে করিতেন, অথচ বুঝিতেন যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানের গর্ব্ব বা অহমিকা লুক্কায়িত আছে, তবে আর রক্ষা থাকিত না। শ্লেষ ও ব্যঙ্গের তীব্র আঘাতে তাহার গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ শিক্ষা দিবার সময় কেবল শিষ্যদিগের কিসে উন্নতি হয়, তৎপ্রতিই তিনি লক্ষ্য রাখিতেন, এবং তদ্রূপ উপায়ই অবলম্বন করিতেন। ইহাতে, শিষ্যই হউক বা অপর কেহই হউক, কে কি মনে করিবে, তাহা তিনি মোটেই ভাবিতেন না। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মঙ্গল।"

কেবল শিষ্যগণের জন্য নহে, কি রোগে, কি স্বাস্থ্যে, সমিতি ও সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগ তাঁহার নিষ্কাম জীবনব্রতের অঙ্গীভূত ছিল। পাঠক জানেন, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ, তিনি স্বয়ং ইহা অনেকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। কাউণ্টেস ওয়াটমিষ্টার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তবে আপনি অলৌকিক ক্রিয়া কেন দেখান?" ব্লাভাস্কি উত্তর দিলেন,—'কারণ অবিশ্বাসী লোকেরা অনবরত, ইহা দেখাও, তাহা দেখাও বলিয়া আমাকে বিরক্ত করিত। আমি তাহাদের নিমিত্ত ঐ সকল ক্রিয়া দেখাইতাম। এক্ষণ উহার ফল ভোগ করিতেছি।" লোকে বিরক্ত করিলেই তিনি এইরূপ তুচ্ছ ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা কেন তাহাদের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেন? বিশেষতঃ উহাতে তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষয়, দেহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, ইহা জানিয়াও কেন তিনি ঐরূপ করিতেন? তদুত্তরে তিনি এই মর্ম্মে বলিতেন,—"এই সকল ক্রিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তুলনায় অতীব তুচ্ছ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমিতি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহার কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা ছিল। গুরুতর অধ্যয়ন, তপস্যা, অনুশীলন-সাপেক্ষ অধ্যাত্ম বিদ্যালাভে তখন কয়টী লোক অগ্রসর হইত? অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে যোগসাধনগম্য অবিসম্বাদিত সত্য সকল নিহিত আছে, যখন লোকেরা ইহার প্রমাণ পাইল, তখন হইতেই সহজে সাধারণ লোকের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা উদ্বুদ্ধ হইল। এক্ষণ সমিতি সে অবিশ্বাস সংশয়ের অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এক্ষণ তাহারা বিশ্বাস সহকারে জ্ঞানচর্চ্চা করুক। এক্ষণ আর অলৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এক সময়ে দেহপাত ও যশোহানির সূত্রপাত করিয়াও আমাকে উহা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।"

ব্লাভাস্কি কি নিজের যোগশক্তি প্রয়োগ করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন,—"অধ্যাত্ম যোগপথে উপাসকের পক্ষে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপার্জ্জিত বা কৃপালব্ধ যোগশক্তি প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে তাহাকে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ ঐরূপ কার্য্য তাহাকে আভিচারিক ক্রিয়ার (Black magic) পিচ্ছিল পথে চালিত করিয়া তমোগহ্বরে নিক্ষিপ্ত করিবে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনও যোগশক্তি প্রয়োগ করিব না,—আমাকে এইরূপ শপথ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা এই শপথের পবিত্রতা বুঝিবে না, কিন্তু আমাকে উহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। আমি যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কদাপি সত্যচ্যুত হইতে পারিব না। যদি বল, সমিতির কার্য্যের জন্যই ঐরূপ উপায়ে শরীরকে নিরাময় রাখি না কেন,—তাহাতে ক্ষতি কি? না, আমি তাহাও পারি না, নিষিদ্ধ উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে আমার অধিকার নাই। কেবল শারীরিক কষ্ট নহে, রোগযন্ত্রণা নহে, কিন্তু দারুণ মানসিক ক্লেশ, অপযশ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বনে আমাকে সহ্য করিতে হইবে।"

বস্তুতঃ দৈহিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য যেমন তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ করেন নাই, মানসিক ক্লেশেও তিনি তাঁহার অনিষ্টকারীর অমঙ্গল ইচ্ছা পূর্ব্বক নিজে সান্ত্বনা লাভে প্রয়াসী হইতেন না। যে সকল খল লোক তাঁহাকে দারুণ মানসিক

পীড়া দিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেন সত্য, কিন্তু কখনও কেহ তাঁহার মুখ হইতে সেই সকল লোকের বিরুদ্ধে একটী অশুভ বাণী নির্গত হইতে শুনে নাই। এই সকল লোকের মধ্যে এমন কয়েক ব্যক্তি ছিল, যাহারা পূর্ব্বে তাঁহার নিজগণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ্বাস-হন্তার চিত্র পৃথিবীর কোন্ মহদনুষ্ঠানকে কলঙ্কিত করে নাই? এস্থলেও একটী প্রশ্ন আছে। যিনি স্বীয় অন্তর্দ্দৃষ্টির সাহায্যে লোকের চিত্ত অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পারিতেন, তিনি এইরূপ খল প্রকৃতির লোকদিগকে কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিতেন,—"কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার আমার অধিকার নাই। আমি তাহাদের প্রকৃতি ভালরূপেই বুঝিতে পারিতাম, এবং ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফলও আমার অগোচর ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই। যে শিক্ষার্থী হইয়া আসিবে, আমি তাহাকেই মুক্ত হৃদয়ে উপদেশ দানে বাধ্য,—ফলাফলের দিকে, নিজের ইষ্টানিষ্টের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া আমি তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রত্যেকেই আমার সাহায্যে যত দূর সম্ভব, সুপথপ্রাপ্তির সুযোগলাভ করুক। আমি তাহাকে নিজ অনিষ্টের আশঙ্কায় সেই সুযোগ (chance) হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না।" কিন্তু ভবিষ্যতে কাহারও কাহারও দুর্ব্ব্যবহারে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যও যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত প্রাপ্ত হইত।

আবার সমিতির কোন সভ্য কোন দোষ করিলে, সেই ব্যক্তির দুষ্কৃতির ভারও লোকে তাঁহার উপর, তথা তাঁহার সমিতির উপর, চাপাইয়া দিত। তিনি যেন লোকের ব্যক্তিগত পাপ পুণ্যের জন্যও দায়ী। এই সকল নানা উপদ্রব হইতে তিনি সমিতিকে বীর রমণীর ন্যায় রক্ষা করিতেন। কিন্তু লোকের এই ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত ও স্বাস্থ্য ক্ষতবিক্ষত হইত।

দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া এবং উপরোক্ত নানা কারণ-জনিত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয়োন্মুখ হইল। তাঁহার শরীরের এইরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে লণ্ডন সহরে বাস করিতে হইল। তাঁহার প্রিয়তম ভারতের মাটীতে তিনি অন্তিমে দেহ রক্ষা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইল না।

প্রবল ঝটিকাময় জীবন-সমুদ্রে ভগ্নতরী আর কতদিন ভাসমান থাকিবে? অবিরাম তরঙ্গাঘাতে উহার কাষ্ঠদণ্ড চ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, বন্ধন গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তিনি এই ভগ্নতরী লইয়া অদ্ভুত নির্ভীকতা, অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম্মশেষ করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। এক্ষণ তরীও ক্রমে ডুবিতে লাগিল।

২০শে এপ্রেল, শনিবার (১৮৯১ খ্রীঃ) ব্লাভাস্কি অকস্মাৎ ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। পরদিন প্রভাতে চিকিৎসক ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন, রোগ ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা (Influenza) জ্বর ১০৫°। তিনি রোগীকে ঔষধ ও পথ্য নিয়মিতরূপে সেবন করাইতে এবং রাত্রে পরিচারিকা ব্যতীত বাটীর

অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রোগীর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। কারণ পূর্ব্ব হইতেই ব্লাভাস্কির শরীরে নানা পীড়ার প্রকোপ দেখিয়া তিনি উপস্থিত ব্যাধিকে কঠিন বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। ব্লাভাস্কির পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহের অন্যান্য লোকেরাও পর্য্যায়ক্রমে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। ব্লাভাস্কি নিজের যন্ত্রণার মধ্যেও সকলের সম্বাদ লইতেন। সেই সময়ে গৃহান্তরবাসী জনৈক সভ্য পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন, এ‌ং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া সুশ্রূষার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। সোমবার পর্য্যন্ত ব্লাভাস্কির জ্বর এক ভাবেই রহিল। মঙ্গলবার জ্বর কমিয়া গেল এবং তিনি উপযুক্ত পথ্য সেবন করিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে অন্য এক উপসর্গ দেখা গেল। তাঁহার কণ্ঠদেশে শ্লেষ্মা রুদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত কাশির প্রকোপ হইয়াছে, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে। ডাক্তারের ব্যবস্থামত পুল্‌টিস্ দেওয়াতে কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু ইহা ক্ষণিক মাত্র। শুক্রবার রাত্রি হইতে আবার কণ্ঠ-পীড়ার প্রকোপ বাড়িল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, নালির উপর ফোঁড়া হইয়াছে। ইহাতে পথ্যাদি সেবন অতীব কষ্টসাধ্য হওয়াতে ব্লাভাস্কি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অবস্থার বিশেষ কোন তারতম্য হইল না। তৎপর ফোঁড়াটী সারিল বটে, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট পূর্ব্ববৎ রহিল। এই দারুণ কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহাকে অনবরত ব্যজন করা হইতেছিল। ৬ই মে বুধবার তিনি একবার বসিবার গৃহে উপবেশন করিলেন। বিকালে ডাক্তার বলিলেন, জ্বর মোটেই নাই, কিন্তু রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং দুর্ব্বলতা দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইলেন। ব্লাভাস্কি তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, ইহা ভালরূপই বুঝিয়াছিলেন, এবং ইহা পুনঃ পুনঃ ডাক্তারকে বলিলেন। ডাক্তার ভাবিতেন, ব্লাভাস্কি ত পূর্ব্বে কতবার মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছেন, এবারও সেইরূপ হইতে পারে, সুতরাং তিনি হতাশ হইলেন না। বাটীর লোকেরাও ব্লাভাস্কির পূর্ব্ব পূর্ব্ব পীড়া-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও ডাক্তারের সহিত একমত হইলেন। কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, এবার আর ব্লাভাস্কি থাকিবেন না।

বুধবার রাত্রি হইতে পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। নাড়ি পাওয়া দুষ্কর, এবং নিশ্বাস গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রভাত হইতে রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইল। অপরাহ্নে বসিবার ঘরে আসিলেন, এবং নিজে যে বড় একটী আরাম-চৌকি ব্যবহার করিতেন, তদুপরি উপবেশন করিলেন। ব্লাভাস্কি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইলে সময় সময় শ্রান্তি অপনোদনের জন্য একাকিনী বসিয়া এক প্রকার তাসের (Paticuee নামক খেলা) করিতেন। তিনি অদ্য ঐরূপ ক্রীড়া দ্বারা রোগের কষ্ট ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তথাপি তিনি যে বসিয়াছিলেন, ডাক্তার ইহাতেই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং তাঁহার মানসিক বলের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। অদ্য চিকিৎসকগণের মতে তাঁহার অবস্থা গুরুতর

বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ব্লাভাস্কি শয্যায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং এহেন কাতর অবস্থায়ও অপর রোগীরা কে কেমন আছেন, এবং সমিতির অধিবেশন সুচারুরূপে চলিতেছে কিনা, জানিতে ইচ্ছা করিলেন। রাত্রে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কৃচ্ছ্রসাধ্যতা জন্য বড়ই কষ্ট হইতেছিল, কোন ঔষধেই ফল হইতেছিল না। শুইয়া থাকিতে অধিক কষ্ট হওয়ায় চৌকিতে উঠিয়া বসিলেন। ভোরবেলা তাঁহাকে একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইল।

আমরা যাঁহার * লিখিত বিবরণ হইতে ব্লাভাস্কির অন্তিম পীড়ার বর্ণন করিতেছি, এবং যিনি এই সময়ে তাঁগার সুশ্রূষার প্রধান ভার গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, অতঃপর তাঁহার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"আমি সকাল ৭টার সময় (৮ই মে শুক্রবার) ব্লাভাস্কির শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া আমার ভগ্নীর উপর সুশ্রূষা ভার দিয়া বিশ্রামার্থ গমন করিলাম। বেলা ৯ টার সময় ডাক্তার ব্লাভাস্কিকে দেখিয়া আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, উত্তেজক ঔষধে ফল ভালই হইতেছে, নাড়ীর অবস্থাও ভাল, আপাততঃ কোন চিন্তার কারণ নাই, অতএব আমি কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পারি, এবং আমার ভগ্নীও তাঁহার স্বীয় কার্য্যে গমন করিতে পারেন। বেলা ১১॥ টার সময় মিঃ রিট আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, ব্লাভাস্কির অবস্থা পুনরায় মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম, এবং একটী ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলাম। তিনি এত দুর্ব্বল যে ঔষধের গ্লাসটী ধরিতে পারিলেন না। আমি উহা তাঁহার মুখের কাছে ধরিলাম। তিনি কোন ক্রমে ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন। অতঃপর চামচে করিয়া তাঁহাকে একটু পথ্যও দেওয়া হইল। একটু পরেই আমি তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় আর্দ্র করিতে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার নেত্রদ্বয় তেজোহীন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ব্লাভাস্কির এই একটী অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার একটী পা নড়িতে থাকিত। যখন তিনি দেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিতেছেন, সেই সময়েও দেখা গেল, শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত তাঁহার একটী পা ঐরূপ নড়িতেছিল। আর কোন আশা রহিল না। সে সময়ে আমরা দুই তিন জন শিক্ষক মাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। দুই জন সম্মুখে জানু পাতিয়া তাঁহার এক একটী হাত ধরিয়া রহিলেন। আমি পার্শ্বে ছিলাম, আমার বাহু তাঁহার মস্তকের উপাধান হইল। আমরা কিছুক্ষণ এইরূপে স্থির হইয়া থাকিতে থাকিতে ব্লাভাস্কি এরূপ শান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন যে আমরা বুঝিতে পারিলাম না, ঠিক কোন্ মুহুর্ত্তে তাঁহার শেষ নিশ্বাসটী নির্গত হইল। একটী প্রশান্ত ভাবে গৃহটী পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার অন্তিম কাল প্রত্যাসন্ন জানিয়া আমরা যাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহারা আসিয়া আর ব্লাভাস্কিকে দেখিতে পাইলেন না। আমরা

* Laura M. Cooper, vide "In memory of Helena Petroona Blavatsky, by some of her Pupils".

বৃথা শোকে কালক্ষয় না করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইলাম।"

১৮ ১ সালের ৮ই মে, শুক্রবার, বেলা ২টা ২৫ মিনিটের সময় ব্লাভাস্কি এ মর্ত্ত্যধাম হইতে বিদায় লইলেন। ব্লাভাস্কির স্পষ্ট আদেশ ছিল যে দেহান্তে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যেন কোন প্রকার বাহিক আড়ম্বর না করা হয়, এবং শান্তভাবে তাহার দেহের যেন অগ্নিসংস্কার করা হয়। তদনুযায়ী ১১ই মে সোমবার প্রভাতে তাঁহার দেহ লণ্ডনের সমীপবর্ত্তী ওকিং (Woking) নামক স্থানের শবদাহ মন্দিরে নীত হইল। যে পথ দিয়া শিষ্যগণ তাঁহার দেহ লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার দুই পার্শ্বের লোক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কিরূপ সংস্কার ? কেহ কোন বাহিক শোক চিহ্ন ধারণ করেন নাই, জাতীয় প্রথামত সমাধি অনুষ্ঠানের উপযুক্ত কোন আয়োজন উদ্যোগ নাই, তাই পথের লোক কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল, এ কিরূপ সৎকার ? কিন্তু আজ যাঁহার সৎকার হইতেছে, তিনি যে জীবনে একেবারেই সামাজিক নিয়ম-বন্ধন মুক্ত ছিলেন, ইহা তাহারা জানিত না। সে দিনের মেঘনির্ম্মুক্ত হাস্যময়ী প্রকৃতি যেন তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছিল। পুষ্পাস্তীর্ণ শবাধারের চতুঃপার্শ্বে পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য ও সেবকগণ গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্পই ছিলেন, কারণ উপযুক্ত সময়ে সম্বাদ না পাওয়াতে অনেক সভ্য ও বন্ধুবান্ধব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিতে পারেন নাই। উপস্থিত সভ্যগণের অন্যতম য়ুরোপীয় শাখার প্রধান সম্পাদক মিঃ মিড (G. R. S. Mead) একটী অভিভাষণ পাঠ করিলেন। আমরা নিম্নে উহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"স্থূলদেহে যাঁহাকে আমরা ব্লাভাস্কি বলিয়া জানিতাম, তিনি আজ মৃত। কিন্তু আমাদের সুহৃদ্ ও শিক্ষাদাতারূপে যে ব্লাভাস্তিকে আমরা পাইয়াছিলাম, তিনি আমাদের হৃদয়ে ও স্মৃতিতে অমর। এ জন্মে তাঁহার প্রধান কার্য্য পরাবিদ্যা-সমিতির যাঁহারা পরিচালক, তিনি সেই মহোপদেশকগণের দূত স্বরূপ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস শত নিন্দা পরিবাদেও অবিচলিত ছিল। এই অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁহার নির্ভীক প্রকৃতির মূলমন্ত্র ছিল। থিওসফি তাঁহার জীবনে জাগ্রত জীবন্ত শক্তিরূপে বর্ত্তমান ছিল, এবং তিনি উহারই কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে যে জড়বাদ প্রবেশ করিয়াছে, উহার উন্মূলন করিয়া মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে এবং মানবজাতিকে ভ্রাতৃভাবের প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিতে তিনি স্বকীয় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা আজ তাঁহার নশ্বর দেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া যেন মনে না করি যে, তাঁহার উপদিষ্ট সত্যগুলিও নষ্ট হইল, কারণ সত্য অবিনাশী। সেই সত্যকে আমাদের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিয়া যাহাতে লোকের আদরণীয় করিতে পারি, সে দায়িত্ব এক্ষণ আমাদের উপর। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্লাভাস্কি তাঁহার সংঘ সুগঠিত এবং কার্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এক মুহুর্ত্তের জন্যও তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। কোন্

পথে চলিলে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারু-রূপে চলিবে, তিনি উহা পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। উহা আর কিছুই নহে, প্রত্যেকের জীবন দ্বারা তদুপ-দিষ্ট সত্যকে সপ্রমাণ করা,—ইহাই তাঁহার উপদেশের মুল। যদি ব্লাভাস্কি এক্ষণ এস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে আমাদের প্রতি, শুধু আমাদের প্রতি নয়, যাঁহারা আমাদের সহিত আজ হৃদয়ে ও সহানুভূতিতে এক, তাঁহাদের প্রতিও,—জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার সে উপদেশ এক মাত্র এই :—'শুদ্ধ জীবন, সরল মন, পবিত্র হৃদয়, তত্ত্বান্বেষিণী বুদ্ধি, বন্ধনহীন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, শিক্ষা ও উপদেশের আদান প্রদানে আগ্রহ, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতিতে দৃঢ় সহিষ্ণুতা. সত্যের নির্ভীক ঘোষণা, অন্যায় আক্রমণ হইতে নিরপরাধ ব্যক্তিকে সাহসপূর্ব্বক রক্ষা, অধ্যাত্মবিজ্ঞানানুমোদিত মানবজাতির উন্নতি ও পূর্ণতার আদর্শকে নিরন্তর নেত্র-সম্মুখে স্থাপন,—শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐশীজ্ঞান মন্দিরে আরোহণ করিবার এই গুলিই সুবর্ণ সোপান।"

শান্ত নীরবতার মধ্যে ব্লাভাস্তির দেহ প্রদীপ্ত অগ্নিমঞ্চে স্থাপিত হইল। দুই ঘটিকার মধ্যে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। বন্ধুগণ সেই মহীয়সী নারীর দেহের প্রতি তাঁহাদের শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দেহাবশেষ ভস্মরাশি অমূল্য রত্নজ্ঞানে সযত্নে বহন করিয়া গৃহে প্রত্যা-গমন করিলেন।

ব্লাভাস্কির নশ্বর দেহ ইংলণ্ডের শ্মশান-চুল্লিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যে কণ্ঠের উদ্বোধনবাণী জগতের জড়তা বিনাশ জন্য দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইতেছিল, আজ তাহা নীরব। আজ ইহরঙ্গভূমে এক মহাজীবন-নাটকের উপর যবনিকা পাত হইল। এক মহাযাত্রীর মর্ত্ত্যধামের তীর্থভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ এক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হইল, কিন্তু রহিল কি? কবি বলিয়াছেন,—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

বিত্ত সম্পদ, জীবন-যৌবন সবই চলিয়া যাইবে, কিন্তু কীর্ত্তি থাকিবে, এবং যাহার কীর্ত্তি থাকিবে, সে বাঁচিয়া থাকিবে। কীর্ত্তি-মানের মরণ নাই। এই মরণশীল জগতে, সব চলিয়া গেলেও, যাহার কীর্ত্তি আছে, সে অমর। প্রকৃত কীর্ত্তিমান কে? যাঁহার জীবন পরহিতায়, তিনিই কীর্ত্তিমান। যিনি জগতের জন্য দেহ ধারণ করেন, জগতের জন্য দেহ পাত করেন, তিনিই কীর্ত্তিমান। তাঁহার কীর্ত্তিমন্দির কোথায় স্থাপিত? রক্ত-প্লাবিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নহে, চাকচিক্যময় সম্রাটের সিংহাসনে নহে, নীরব ইষ্টকের উচ্চ চূড়ায় নহে, কঠিন মর্ম্মরের শিলা স্তম্ভে নহে, কিন্তু মানবের কৃতজ্ঞতা, কোমল হৃদয়োপরি, পুরুষানুক্রমিক অনুশীলনে সঞ্জীবিত চিন্তাধারায় সেই কীর্ত্তিমন্দির স্থাপিত। সে মন্দিরে স্মরণীয়ের মূর্ত্তি ভক্তি উপাদানে গঠিত, অনুরাগের বর্ণে রঞ্জিত, তদীয় কর্ম্মময় স্মৃতির মণি-খচিত হেমালঙ্কারে ভূষিত হইয়া চিরদিন মানবের প্রীতির উপহার গ্রহণ করিতে থাকে। ব্যাস-বশিষ্ঠ কপিল-কনাদের, বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের, নানক-করীর রামানুজের যিশু-মহম্মদ-লুথারের স্মৃতি কি কোন বাহ্য মন্দিরের অপেক্ষা

করে? এই ধর্ম্ম-পরিরক্ষকগণের, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের স্মৃতি মানবের প্রাণের সহিত, আধ্যাত্মিক প্রেরণার সহিত, গতিমুক্তির সহিত, ভূমানন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত, সনাতন সদ্বস্তুর সহিত জীবাত্মার যে মিলনাকাঙ্ক্ষা. সেই আকাঙ্ক্ষার সহিত ইহাদের জীবন-স্মৃতি জড়িত। কেন না, ইহাঁদের জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষার আরম্ভে উদ্বোধক, অবসাদে উদ্দীপক, অন্ধকারে জ্যোতিপ্রকাশক, সন্দেহে, বিশ্বস্ত পরি-চালক, ভ্রান্তিকুহেলিকায় পথপ্রদর্শক। অনন্তের পথে চিরযাত্রীর ইহাঁরাই সুহৃৎ, ইহাঁরাই আদর্শ, ইহাঁরাই গুরু। সুতরাং ইহাঁদের কীর্ত্তিমন্দির কোথায়, তাহা মানব নিজ প্রাণে, চিত্তে, আত্মায় অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে।

কোন মহাপুরুষের সকল মত কাহারও পক্ষে গ্রহণীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জীবন-প্রভাব অলক্ষিতে, প্রচ্ছন্নভাবে, কি বন্ধু কি বিদ্বেষ্টা, সকলের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকে। তাঁহার সরল, মহৎ, ত্যাগময় জীবন-প্রভা, তাঁহার আত্মোৎ-সর্গের মহিমা কেহই, এমন কি, ঘোর বিদ্বেষ্টাও এড়াইতে পারে না। ইহাই তাঁহার জীবনের এক বিশেষত্ব। মতভেদ হইলে, গতানুগতিক কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলে মানব অসূয়া বশে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়া বসে,—ইহার প্রমাণ সকল মহাপুরুষের জীবন-কাহিনীতেই পাওয়া যায়। যিনি যত মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে তত প্রবল বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। সেই বাধা বিপত্তির পরিমাণই তাঁহার কৃতিত্বের অনুমাপক। ব্লাভাস্কিকেও প্রর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া, ভীষণ বিদ্বেষ গ্লানি আক্রমণের মধ্য দিয়া স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রভাব কে এড়াইতে পারিয়াছে? তাঁহার প্রচারিত, বহুকাল-বিস্মৃত এবং অধুনা অভিনব উপায়ে ব্যাখ্যাত তত্ত্ব-বিদ্যা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে আজ সকল ধর্ম্মের ভিতর ক্রিয়া করিতেছে। সকল জাতির আধ্যাত্মিক আত্মবোধের উদ্দীপন করিয়াছে। আজ সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম-নিহিত জটিল তত্ত্বরাশি, আপন আপন সংস্কারানুযায়ী, তাঁহার তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে বুঝিবার অবসর পাইয়াছে,—কেহ বা বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, কেহ বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য জ্ঞানপিপাসু মাত্রেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি আজ পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত। তাঁহার অশেষ তত্ত্বভাণ্ডার Isis unveiled ও Secret Doctrine, অনুসন্ধিৎসুর জ্ঞান চক্ষু স্বরূপ Key to Theosophy, সাধকের পরম আদরণীয় Voice of the Silence পৃথিবীর সর্ব্ব-জাতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিত্ত অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ডের মহাকবি টেনিসনের (Lord Tennyson) মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে Voice of the silence রক্ষিত ছিল। এমন ভাবুক চিন্তাশীল সাধক নাই, যাঁহার নেত্রে এই গভীরার্থ-বোধক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ইঙ্গিত জ্ঞানাঞ্জনের কার্য্য না করিবে, যাঁহার মর্ম্ম-স্থান উহার গূঢ় প্রেরণায় স্পৃষ্ট না হইবে। আজ কত বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের চিন্তা ব্লাভাস্কির তত্ত্ববিদ্যার বর্ণে নবরাগে রঞ্জিত

হইয়া উঠিতেছে। কত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নাস্তিকতার চরম মাত্রায় উঠিয়া আজ পূর্ব্ব সংস্কার পরিহার পূর্ব্বক সেই তত্ত্ববিদ্যার দিকে আশা উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া আছে। তাঁহার দেহতত্ত্ব-ঘটিত, পরলোকতত্ত্ব-ঘটিত, মনস্তত্ত্ব-ঘটিত জীব-জগতের অভিব্যক্তিতত্ত্ব-ঘটিত, অনেক কথাই আজ বৈজ্ঞানিকের কঠোর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং উহা আর অমান্য করিবার উপায় নাই। তাই বলিতেছি, বিদ্বেষ্টারাও আজ তাঁহার আনীত জ্ঞান-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া নব কলেবর প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি তাঁহার গুরু পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের ন্যায় অরাতিকেও আশ্রয় দান করিয়াছেন। চন্দনতরু কর্ত্তিত হইলেও শত্রুকে সুগন্ধ ও ছায়াদানে বঞ্চিত করে না। তিনি শিক্ষা দিতেছেন,—"তোমার অন্তঃকরণকে সুপক্ক আম্রফলের ন্যায় করিতে হইবে। পাকা আমের শাঁসের ন্যায় পরদুঃখে যেন তোমার হৃদয় কোমল, মধুর রসপূর্ণ এবং প্রেমের সুবর্ণরাগে রঞ্জিত হয়। কিন্তু নিজের দুঃখকষ্টে কঠিন আম্রবীজের ন্যায় তোমার চিত্ত যেন দৃঢ় ও অটল থাকে। ...করুণা তোমাকে কি বলিতেছেন শুন ঃ— যতদিন পৃথিবীতে সকল প্রাণীর দুঃখশান্তি না হইল, ততদিন সুখ কোথায়? সমস্ত পৃথিবী কাঁদিতে থাকিবে, আর তুমি কি মুক্তি সুখ ভোগ করিতে চাও?" *

আমরা ভারতবাসী,—আমারের যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা এই জীবন-কথার বহু স্থানেই দেখিয়াছি। তিনি ভাবে ও সংস্কারে যেন হিন্দুরই একজন ছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেন, এমন কি, সিনেট সাহেব ইংরাজ হইয়াও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ব্লাভাস্কি পূর্ব্বজন্মে হিন্দু ছিলেন। এজন্মে তাঁহার বিজাতীয় দেহ পরিগ্রহের উদ্দেশ্য কেবল অপরজাতির মুখ দিয়া ঋষিপ্রোক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার পূর্ব্বক হিন্দুজাতির মহিমা বর্দ্ধন ও পুনরুত্থাপন। হিন্দুর মহিমা প্রচারের জন্য তাঁহাকে স্বদেশীয়ের নিকট কত না ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল! বস্তুতঃ ভারতে পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার বিরাগভাজন হইবার ইহা এক প্রধান কারণ। কিন্তু উহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া চিরদিন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতিকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন। আবার পাশ্চাত্য সমাজের কত লোককে তিনি স্বীয় তেজস্বিতায়, ন্যায়পরতায়, উদারতায়, ও শক্তি-প্রভায় স্বমতে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু অকৃতজ্ঞ নহে। ব্লাভাস্কির জীবিত কালে ভারতের নানা স্থানে হিন্দুগণ তাঁহাকে হৃদয়াবেগ যে সকল অভিনন্দন প্রদান করিয়াছে, কাশীধামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী যেরূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের গভীর কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। অদ্যাপি তাঁহার তিরোভাব-তিথিতে, শ্বেতকমল-বাসরে (White Lotus Day) ভূমণ্ডলের শত শত স্থানের কৃতজ্ঞ হৃদয় অধিবাসীগণের ন্যায়, ভারতের সর্ব্বজাতীয় লোক অকপট চিত্তে সমবেত কণ্ঠে যে সম্মান উচ্চারণ করে, তাহাতে হিন্দুই সংখ্যায়, সম্পদে, জ্ঞানে, আগ্রহে, উৎসাহে, সর্ব্ব প্রধান।

ব্লাভাস্কি! তুমি বিদেশে নিন্দা-গ্লানি বিদ্রূপ-বিদ্বেষ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া

* Vide "The Voice of the Silence."

অসীম সাহসের সহিত আমাদের ঋষি-নিষেবিত জ্ঞান-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছ, আবার আমাদের স্বদেশে আমাদের বিলুপ্ত বিস্মৃত ধনরত্নের সন্ধান বলিয়া দিয়াছ,—তুমি ধন্য, তোমার ঋণ আমাদের অপরিশোধনীয়। তুমি বিদেশে আমাদের চির-দৈন্য ঘুচাইয়া, প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, জগতের নিকট আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, আবার স্বদেশে আমাদের সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া আমাদের আত্মবোধকে, জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ও সর্ব্বজাতির সহিত আমাদের সৌভ্রাত্রভিত্তি স্থাপন করিয়া, ভারতীয় আর্য্যসন্তানের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছ,—তুমি ধন্য, তোমার ঋণ আমাদের অপরিশোধনীয়। আমরা আজ তোমার কি স্মৃতি রক্ষা করিব? তুমি নিজ শক্তি বলেই অমর হইয়াছ। যতদিন পৃথিবীতে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা থাকিবে, ততদিন তোমার মৃত্যু নাই, ব্যক্তিত্বের বিনাশ নাই, স্মৃতির লোপ নাই।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

সঙ্গণিকা।

(৩২)

শ্রাবণ মাসের সঙ্গণিকার কথা পাঠকগণ স্মরণ করুন। তন্মধ্যে (৩)—নম্বরে ফরিদপুরের কৃতী সন্তান ভূতপূর্ব্ব-গবর্ণমেণ্ট উকীল ৺তারানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের কথা আছে। তাঁহার শবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াই উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের তাহাতে কোনই অপরাধ হয় নাই। তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত রসিকবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি-এল মহোদয় লিখিয়াছেন যে, "শব স্থানান্তরিত হয় নাই, ওয়ারেণ্ট পাওয়ার পূর্ব্বেই দাহকার্য্য শেষ হইয়াছিল।" আমাদের সংবাদ ছিল যে, শবের অবশিষ্টাংশ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই সংবাদ সত্য নহে। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। এই শ্রদ্ধেয় পরিবারের কাহারও প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা কিছু লিখি নাই। যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিয়াছেন। এস্থলে রসিকবাবুর ৩১শে আগষ্টের (১৯১৭) লিখিত পত্রের কতকাংশ ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন "রায়বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র শরৎ বাবুর ধারণা হইয়াছিল যে, শবদাহ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দিবেন না। কারণ মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কিছু কিছু প্রস্তাব চলিয়াছিল এবং পূর্ব্বে মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে আরো শবদাহ হইয়াছিল। যথা মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের মাতা ও স্ত্রীর শব-দাহ বাড়ীর সীমার মধ্যেই হইয়াছিল এবং মোক্তার শ্রীনাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের শব এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতার শব মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যেই দাহ হইয়াছিল। রায়বাহাদুরের মৃত্যু হয় অপরাহ্ণ ৪॥ সময় এবং ৫টার সময় দাহকার্য্য আরম্ভ হয়, তৎপর মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র মহাশয় শরৎ বাবুর উপর নোটিশ জারি করেন যে, মিউনিসিপাল

এরিয়ার মধ্যে যেন দাহকার্য্য সম্পন্ন না হয়। শব তখন দাহ হইতেছিল, সুতরাং দাহকার্য্য চলিতেছিল। চেয়ারম্যান মহোদয় মিউনিসিপাল আইন অবলম্বন না করিয়া শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দাহ নিবারণের জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, সুতরাং দাহ-কার্য্য স্থগিত রাখার ওয়ারেণ্ট রাত্রি ১০টার পূর্ব্বে জারি হয় না। তখন দাহকার্য্য শেষ হইয়াছিল। সুতরাং অর্দ্ধদগ্ধ শব স্থানান্তরে লইয়া দাহ করা হয় নাই। তৎপর চেয়ার-ম্যান মহোদয় শরৎ বাবুর নামে মিউনিসিপাল এরিয়ার মধ্যে শবদাহ করার জন্য মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা তুলিয়া লয়েন।" ইত্যাদি।

আমরা মিউনিসিপাল-অত্যাচার ঘোষণার জন্য ঘটনাটী লিখিয়াছিলাম। রসিক বাবুর পত্রে জানিয়াছি, শবদাহ শেষ হইয়াছিল, শব স্থানান্তরিত হয় নাই। তাহা জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তারানাথ বাবু আমাদের এবং অনেকেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার শবদাহ উপলক্ষে যে গোল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই আমরা দুঃখিত। রসিক বাবুর পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। এই সামান্য ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শরৎ বাবু এবং রায়বাহাদুরের পরিবারবর্গ ঐরূপ লেখায় দুঃখিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে একথা বলিবই বলিব যে, তারানাথের ন্যায় মহাপুরুষের শবদাহ লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত না হইলেই আমরা সুখী হইতাম!

ঐ সামান্য ভুলের সংশোধনের জন্য কেহ প্রতিবাদ করিলেই, সত্যের খাতিরে, আমরা তাহা সংশোধন করিতাম। আমরা কোন বি-এল-উপাধিধারী বিশিষ্ট লোকের নিকট যেমন শুনিয়াছিলাম, তাহাই লিখিয়াছিলাম। বন্ধুবরের কথা যে ভুল, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য উকীলের পত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না।

(৩৩)

৺সারদাচরণ মিত্র ১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (১৩২৪) ও ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দেহ রক্ষা করিয়াছেন। মঙ্গলবার দুজনেরই স্বর্গারোহণের দিন। দুই জনই বঙ্গের কৃতী সন্তান—দুইজনের দ্বারাই বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহাদের তিরোধানে বঙ্গের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা উভয়ের জন্যই গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। এ স্থলে "বঙ্গবাসী" হইতে উভয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলিয়া দিলাম। তাহার প্রতি কথার সহিত আমরা একমত।

(ক)

"গত মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ৺ গঙ্গালাভ হইয়াছে। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে ৺ তীরস্থ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য, কৃতী পুত্রপৌত্র, আত্মীয় স্বজন, গুণমুগ্ধ জনসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সারদাচরণ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তটে শেষ শ্বাস আকাশে মিশাইয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন। ক্রমে

রোগে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। কালের গতি কে রোধিবে? মঙ্গলবার সব ফুরাইল!

সারদাচরণের গুণগরিমার কথা এ বঙ্গে আর কাহাকে বলিতে হইবে কি? অধুনা তাঁহার মত কর্ম্মী আর কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? তাঁহার সকল কর্ম্ম সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার অকপট কর্ম্মনিষ্ঠতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? তাঁহার আবাল্য জীবন-কথার কয়টা তুলিয়া তাঁহার গুণের মর্য্যাদা রাখিতে পারি? উনসত্তর বৎসর বয়সে সারদাচরণের লোকান্তর হইল। কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে, কি বিদ্যালয়ে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে সারদাচরণ যে প্রতিভা, যে একাগ্রতা, যে একনিষ্ঠতা, যে ঐকান্তিকতা, যে আন্তরিকতা লইয়া জীবন-সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ নহে কি?

পাঠশালায়, স্কুলে, কলেজে, অধ্যাপনায়, ওকালতীতে, জজিয়তিতে,—কোন্ ক্ষেত্রে সারদাচরণ পূর্ণ প্রভান্বিত প্রতিভার পরিচয় না দিয়াছেন? প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি একই বৎসরে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষা দেন। পর বৎসর তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পান। বি-এল পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেও, ওকালতীতে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিতেন, তাহাতে বিচারমণ্ডলী পদে পদে বিস্মিত হইতেন। জজিয়তিতে তিনি কিরূপ নির্ভীকতা সহকারে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিতেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিচারে তাহার একটা প্রমাণ জাজ্বল্যমান।

সাহিত্যে, স্বদেশে, সমাজে, সভা-সমিতিতে তাঁহার কীর্ত্তিকথা কত বলিব? সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভার সভাপতি-রূপে, বৈষ্ণব কাব্যের প্রচারে ও সংস্করণে, সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রে নানা সন্দর্ভ-প্রকটনে, সাহিত্য-সাধনায় সারদাচরণ যে শক্তিশালিতার পরিচয় দিয়া যশের মণি-মাণিক্য খচিত জ্যোতিষ্মান্ শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কি এ সময় কাহাকেও আর স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? বাল্যকাল হইতে সারাদাচরণ মধ্যে মধ্যে রোগকাতর হইতেন; কিন্তু রোগকাতরতার মাঝে এ পর্য্যন্ত কেহ কি কখন তাঁহার প্রতিভাক্রিয়ার তিলমাত্র ত্রুটি দেখিয়াছেন? এক-লিপি প্রচলন ব্যাপার, নিখিল কায়স্থসম্মিলন, ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলীর কার্য্য-সম্পাদন প্রভৃতি কর্ম্মসাধনার তিনি অবশ্য সর্ব্বসাধারণের মতানুসারী হন নাই; কিন্তু তিনি যে অতুল অধ্যবসায়ে, অদম্য উৎসাহে, অসাধারণ আগ্রহে, অচঞ্চল চিত্তে মহাবীর মহারথী কর্ম্মিরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বথা আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহাতে কি কখন কেহ অনুমান করিতে পারিতেন যে, সারদাচরণ বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বিবিধ বাঁধন বহিয়া মধ্যে মধ্যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেন? অনেক সময় হয় ত তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে ব্যাধির তপন-তাপ সহিতে হইত; কিন্তু বল দেখি, কখন কি তাঁহার বিনয়ৌদার্য্যের নিত্য নিদর্শন মৃদুহাস্যের আস্যাদর্শের অভাব অনুভব করিয়াছ? কি সমাজিকতা, কি শিষ্টাচারিতা, কি বাকপটুতা, কি বিনয়-নম্রতা,—কোন্ বিষয়ে সারদাচরণ অনুকরণীয় নহেন?

গত মঙ্গলবার সত্য সত্য ৺ভাগীরথীতটে

প্রতিভার প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি ভস্মীভূত হইয়া গেল! আর ভস্মীভূত হইল,—“স্বদেশী”র শত সৌরকরোজ্জ্বল বিরাট সাকার প্রতিকৃতি। এমন “স্বদেশী” আর কি পাইব! সারদাচরণের ধনকোষ নিত্য পূর্ণ,—সারদাচরণের কলিকাতার প্রাসাদসম বাস-ভবন; কিন্তু সারদাচরণ কি এক মুহূর্ত্তের জন্য জন্মভূমি হুগলী জেলার ক্ষুদ্র পল্লী পানসেওলা গ্রামকে বিস্মৃত হইতে পারিতেন? সত্য সত্য তিনি অচিন্ত্য অধ্যবসায়ে সিদ্ধ সংস্কারে নিত্য ম্যালেরিয়ামথিত পানসেওয়ালা পল্লীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে দেখিয়াছে, সে জানে, যে না দেখিয়াছে সেও শুনিয়াছে,”—সেদিনও আমরা বলিয়াছি,—সারদাচরণ পল্লী-সংস্কারকের নিত্য পুরোবর্ত্তী বিরাট আদর্শ! হউন সারদাচরণ লক্ষপতি;—ক্ষুদ্র পানসেওলা যে তাঁহার নিত্য আরাধ্যা দেবী,—তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে নিত্য বিরাজমানা! বাল্যে সারদাচরণ মাতাকে, কৈশোরে পিতাকে হারাইয়াছেন; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি পানসেওলা মাতৃমূর্ত্তিতে—আর স্বর্গ ধর্ম্ম-প্রতিম পরন্তপ পিতৃ মূর্ত্তিতে সারদাচরণের ধ্যানে নিত্য জাগরূক থাকিত। দৃষ্টান্ত কত দেখাইব? আর কত কথা বলিব? আবার বলি,—সারদাচরণের মতন কর্ম্মী আর কি পাইব? তাঁহার জীবন নাই,—জীবনী রহিল! তাঁহার নরমূর্ত্তি নাই,—তাঁহার অমর গুণস্মৃতি রহিল! শোকে ইহা অপেক্ষা আর শান্তি ও সান্ত্বনার কি আছে?”

বঙ্গবাসী, ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৪।

(খ)

“অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, রাত্রি ৩টা ৫ মিনিটের সময় মাত্র ছয়দিন জ্বরে ভুগিয়া তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ হুগলি-চুচুড়ার বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চুচুড়ায় হোমিওপ্যাথিক এবং পরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা যতদুর সম্ভবপর, তাহা হইয়াছিল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে চুচুড়ার বাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। ইনি খ্যাতনামা সদরালা স্বর্গীয় রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুরের এক মাত্র পুত্র। ইহার শিক্ষা দীক্ষা স্কুল-কলেজে যথারীতি হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ইনি পিতার কাছেই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, ইনি বাল্যকাল হইতেই পিতার কাছে সঙ্গী ভাবে থাকিতেন এবং পিতা হইতেই বঙ্গ ভাষার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসর্গও ইহার চরিত্র গঠনের সহায়তা করিয়াছিল। ইনি বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে বি-এল পরীক্ষায় পাশ হইয়া মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান; কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার এতই অনুরাগ যে, কিছুদিন ওকালতী করিয়া আর তাহা ভাল লাগিল না; এ ব্যবসায় ছাড়িয়া সাহিত্যে তিনি মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। সেই সময় বঙ্কিম বাবুর যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত, তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে যতদিন বঙ্কিম বাবু জীবিত ছিলেন, ততদিন উঁহাদের মধ্যে সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল। “বঙ্গদর্শনে” অক্ষয়চন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু বঙ্কিম বাবু নহেন, দেশশুদ্ধ লোকেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার “বঙ্গদর্শনে”র, প্রবন্ধের মধ্যে ‘গ্রাবু’

চিরপ্রসিদ্ধ। চুচুড়ায় বসিয়া তিনি “সাধারণী” নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উহা সংবাদপত্র হইলেও সে সময়ের শিক্ষিতদের পক্ষে উহা সাহিত্য-চর্চ্চার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অনেক সময়ে উভয়ে একত্র বসিয়া, “সাধারণী”র জন্য নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সময় গবরমেণ্ট ইঁহাকে প্রথম শ্রেণীর অনররি ম্যাজিষ্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ কার্য্য ইনি অনেক দিন করিয়াছিলেন।

বঙ্গের প্রাচীন কাব্যসমূহ প্রথম সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করায় বঙ্গদেশ চিরদিন তাঁহার কাছে ঋণী থাকিবে। ইঁহার ক্ষুদ্র একখানি কবিতা পুস্তক—“গোচারণের মাঠ” যুক্তাক্ষরহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ। বহুদিন পরে “সাধারণী” বন্ধ করিয়া উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকা করিবার মানসে ইনি “নবজীবনে”র প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা নবজীবন পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, অধুনাতন অসংখ্য মাসিক পত্রিকার তুলনায় “নবজীবন’ কিরূপ উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা ছিল। দুঃখের বিষয়, “নবজীবন” বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

প্রবীণ বয়সে তিনি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয় অবলম্বন করিয়া ‘সনাতনী’ নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ তাঁহার চিন্তাশীলতার অক্ষয় নিশান। ইহার পূর্ব্বে তিনি “আলোচনা” নামক এক প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত ‘বঙ্গ’ ভাষার লেখক নামক গ্রন্থে ইনি ‘পিতা’-পুত্র প্রবন্ধে ইঁহার নিজের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারই লিখিত “চন্দ্রালোকে” নামক এক প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র আদর করিয়া তাহার ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অযাচিতভাবে তাঁহাকে বি-এ পরীক্ষার বাঙ্গালা পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লর্ড লিটনের প্রথম দিল্লী দরবারে ইনি সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দরবারে গিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র পুস্তকাদি বেশী কিছু না লিখিলেও, তাঁহার মত ‘সাহিত্যিক’ আর নাই বলিলেই হয়। তিনি আজীবন সাহিত্যের আলোচনা, চর্চ্চা, চিন্তা—এই লইয়াই জীবন যাপন করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া বঙ্কিম বাবুও তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিকই সাহিত্য-সমালোচনায় অক্ষয়চন্দ্রের বেশ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে ইনিই সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। আজ সেই আজীবন সাহিত্যিক, সূক্ষ্ম সমালোচক সাহিত্যপ্রাণ অক্ষয়চন্দ্রকে হারাইলাম এবং বঙ্গদেশ হারাইল। ইনি চিরকাল ‘বঙ্গবাসী’র বন্ধু ছিলেন। “বঙ্গবাসী”র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং “বঙ্গবাসী”র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সাহিত্য-শিষ্য।

ইনি প্রায় ২৬ বৎসরকাল বিপত্নীক ছিলেন। বর্ত্তমানে ইহার দুই পুত্র বর্ত্তমান এবং উভয়েই কৃতী! ভগবান্ পুত্রদ্বয়ের মনে শান্তি দান করুন। আমরা আশা করি, ইহার পুত্রেরাও জীবিকার জন্য যে কার্য্যেই লিপ্ত থাকুন, যেন পিতার মত বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা ও সেবা করিয়া পিতার নাম রক্ষা করেন।” বঙ্গবাসী, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৪।

(৩৪)

পঞ্জাবের সর্দ্দার দয়াল সিংহ, বঙ্গের ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তারকচন্দ্র পালিত প্রভৃতির শিক্ষার জন্য বিপুল দানের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য টিকারীর মহারাজকুমার যে বিরাট দান করিয়াছেন, সত্যই তাহার তুলনা হয় না। টিকারীর মহারাজকুমার বিহারের সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমীদার। তিনি একটী উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন। উইল অনুসারে এই কয় জন ট্রষ্টি হইয়াছেন,—মহারাজকুমার স্বয়ং এবং স্যর এস, পি, সিংহ, মামুদাবাদের রাজা, মিঃ সরফুদ্দিন, ডাক্তার সাপ্রু, স্যর আলি ইমান, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ, মিঃ হাসান আলি, মিঃ ব্রজেন্দ্রলাল, রায়বাহাদুর হরিহর প্রসাদ, মিঃ চার্লস্ এণ্ড্রুজ্ ও টিকারীর মহারাণী সীতাদেবী। মহারাজকুমার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের জন্য বৃত্তি-নির্দ্দেশের পর এই উইল করিয়াছেন। যে সম্পত্তি তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন, তাহার বার্ষিক মোট আয় ১৭ লক্ষ টাকা, তবে খরচ-খরচা বাদ দিয়া ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এই দশ লক্ষ টাকার কিরূপ বিপুল ভাবে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এ দেশে হইতে পারিবে, তাহা অনুমানে স্থির করুন। যাহাতে ৬ বৎসরের বালিকা হইতে ১৮ বৎসরের তরুণী পর্য্যন্ত অবরোধ প্রথা বজায় রাখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, মহারাজকুমারের ইহাই ইচ্ছা। ভগবান্ করুন, মহারাজকুমারের এই শুভ ইচ্ছা সাফল্য লাভ করুক; দেশের অন্তঃপুর শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক। ভারত ললনার জাগরণের সময় আসিয়াছে। টিকারীর মহারাজকুমার সে জাগরণের সহায় ও উপলক্ষ হইয়া অশেষ কীর্ত্তিমান হইলেন। তাঁহার নাম এদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হউক।

(৩৫)

১২ মাইলব্যাপী প্রাচীন সহর মুর্শিদাবাদ এখন আমবাগানে পরিণত হইয়াছে—পলাশীর মহাশ্মশানের ধারে শুধু কেবল আম বাগান পরিশোভিত। মুর্শিদাবাদের বনভূমি ভ্রমণ করিলে সর্ব্বত্রই মস্‌জিদের ভগ্নস্তূপ পথিকের নয়নগোচর হয়। এক সময় এমন ছিল, মুসলমানগণের মধ্যে যাহার অবস্থা একটু ভাল ছিল, তিনি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতেন, একথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মুর্শিদাবাদে দেখা যায়। আর প্রাচীনকালে হিন্দুগণের অবস্থা সচ্ছল হইলেই দীঘী বা পুষ্করিণী কাটাইয়া জনসাধারণের উপকার করিতেন। বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ইহারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর এরূপ ঘটনা বড় একটা ঘটিতে দেখা যায় না। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট, কিন্তু কেহ আর জলাশয় খননে টাকা ব্যয় করে না, আর মস্‌জিদ বা ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠাই বা কয়জন করে? লোকের রুচি এবং মনের গতি একালে অন্যদিকে ছুটিয়াছে। আত্ম-সুখ এবং বিলাসিতা দেশের ধনীদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কাশীতে অনেক অন্নসত্র আছে বটে, কিন্তু কাজ ভাল চলিতেছে কি? কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশের রাস্তাটী নিতান্ত অপ্রশস্ত, কিন্তু কই কেহই তাহা প্রশস্ত করিয়া টাকার সৎব্যবহার করিতেছেন না। এজন্য প্রতিদিন কত যাত্রীর, বিশেষত মহিলাগণের যে দারুণ কষ্ট হয়, কেহই তাহা দেখেন না। আজকাল এদেশের নবোত্থিত মাড়োয়ারী

সম্প্রদায়ের গুণগ্রাম স্মরণে আমরা মোহিত, যে স্থলে যাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। পুরুষোত্তমে সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের ধনী গোয়েনকার মহোদয় কর্ত্তৃক প্রভূত অর্থব্যয়ে মার্ব্বর-প্রস্তর মণ্ডিত যে প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, এ ভারতে তাহার দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। ধর্ম্মভাব কি এদেশে দিন দিন হ্রাস হইতেছে? আমাদের যেন তাহাই অনুমান হয়।

(৩৬)

মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এদেশের চতুর্দ্দিকে নবোদ্যমে আসন প্রতিষ্ঠা করিতেছে। তদুপরি ঘুষের প্রাবল্যে দেশ যেন মহাশ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সোণার ভারতের চতুর্দ্দিকে ঘুষের একি খেলা দেখিতেছি! হায় রে হায়, পূর্ব্বে শুনিতাম, যাঁহারা হাকিম বা অধিক বেতন পান, তাঁহারা ঘুষের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু এখন শুনিতেছি, তাঁহাদের মধ্যেও দিন দিন ঘুষের স্রোতের প্রাবল্য বাড়িতেছে। দুই একটা ঘুষের মকদ্দমা হয় বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেন সকল স্থানের ঘুষের প্রাবল্য দেখিয়াও ভাল করিয়া সে সব দেখেন না। বিচারালয়সমূহ যেন ভুতের লীলাস্থল হইয়া উঠিতেছে। কাহাকে দুঃখের কথা বলিব এবং কাহাকেই বা দেশের শোচনীয় অবস্থার হস্ত হইতে দেশোদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইতে বলিব? হায় রে হায়!

(৩৭)

অনেক চেষ্টায় এবার কংগ্রেসের গোল মিটিয়াছে, ধার্য্য হইয়াছে, আনি-বেসেণ্টই আগামী কংগ্রেসের সভাপতি হইবেন। তাঁহার মুক্তিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু মহম্মদ আলী, সকত আলীও হয়ত আন্দোলনের ফলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবেন, কিন্তু আরও কত সোণার চাঁদ যে নিগৃহীত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? দেশের প্রেসসমূহের উপর দিয়া ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইতেছে, তাহা কে রক্ষা করিবে? নৃত্য বা আস্ফালনের আর সময় নাই, দেশের অধোগতির আর কিছুই অবশিষ্ট নাই! কংগ্রেসবাদীরা দেশের উদ্ধারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, নচেৎ রক্ষার আর উপায় নাই। মতান্তর বা দলাদলির ইহা সময় নয়।

(৩৮)

"নরমের যম, শক্তের ভক্ত"—এই চিরন্তন প্রবাদ বাক্যের রাজত্ব এখনও এদেশে চলিতেছে। সাহস করিয়া দাঁড়াইলে বাঘও ভয় পায়, আর ভয় পাইয়া দৌড় দিলে কুকুরও আক্রমণ করিতে ধায়। সত্যসাধনের পথে এ দেশের নরনারী কবে সাহসে নির্ভর করিয়া অটল ও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে? ভয় বিভীষিকা সম্মুখ-সমর হইতে তিরোহিত হউক, বিধাতার নিকট সর্ব্বদা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

(৩৯)

বড়ই আনন্দের কথা, ভারত-সেক্রেটারি মণ্টেগু সাহেব মহোদয় বড়লাট বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিতে ভারতে আসিতেছেন। এই আগমনে ভারতে কোন সুভফল ফলিবে, আমরা আশা করি না, কেন না, আমাদের যে পোড়া ভাগ্য। কিন্তু তবুও আমরা আনন্দিত। আনন্দের কারণ, তিনি বড় উদার-হৃদয় ব্যক্তি, তাঁহাদ্বারা ভারতের কিছু মঙ্গল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই ভারতে আসিলেই যেন লোক কেমন হইয়া যায়, এই যা ভয়। বিধাতা মণ্টেগুর বাণীতে যেন অমৃত বর্ষণ করেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, বি-এল অনূদিত, মূল্য ।৵০। অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা সুন্দর, সরস ও সরল পদ্যে অনূদিত। অতি সুন্দর পুস্তক ; পকেটে রাখার যোগ্য।

২৪। তুকারাম-চরিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ প্রণীত, মূল্য ॥৵০। বহুদিন এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাওয়া যাইত না, যোগীন্দ্রনাথ ইহা পুনঃ প্রকাশিত করিয়া বিশেষ ধন্যবাদেরপাত্র হইলেন। যেমন সরল ভাষা, তেমনি বিশুদ্ধ রুচি, তেমনি বিষয়-বিবৃতি, তেমনি মাধুর্য্য। পুস্তকখানি গ্রন্থকারের সর্ব্বগুণের যেন পকেট সংস্করণ। যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন। এরূপ সুন্দর পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইব।

২৫। মন্দাকিনী। গীতিকাব্য। শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত, মূল্য ।৵০। গ্রন্থকারের কৈশোরের রচিত এই পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। বালক যেমন ভাবী মনুষ্যের নিদর্শন বক্ষে ধারণ করে, এই কবির কৈশোরের লেখাও তেমনি ভাবী কবিতার সৌন্দর্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। একটী কবিতা তুলিয়া দিলাম, গ্রন্থকারের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

সন্ধ্যা।

অয়ি সন্ধ্যে সন্ন্যাসিনি! আগমনে তোর,
থেমে গেছে ধরণীর সব কলরোল,
নির্ব্বাণের সে পবিত্র ভাষাহীন সুখ,
স্মরাইয়া দেয় বিভু-শান্তিময় কোল।
তোরি সম একদিন মোদের জীবনে
আসিবে উদাস সন্ধ্যা ঘিরি' অন্ধকার,
নিবে যাবে জীবনের শেষ আলো রেখা,
জানি না কো আগমন কবে সে তাহার
থেমে যাবে সব শক্তি সব কণ্ঠরোল।
মুছে দিবে সব কীর্ত্তি সেই আলিঙ্গন।
পড়ে রবে ধরণীর রচা গৃহগুলি।
যেতে হবে যথা সেই আসল ভবন।
গো তাপসী আজি তোর এই আগমনে,
জীবনের সেই সন্ধ্যা পড়ে শুধু মনে।

২৬। জননীর কর্ত্তব্য। শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১॥০। আনন্দচন্দ্র সেনের গৃহিণীর কর্ত্তব্য অতি উপাদেয় পুস্তক যিনি সে পুস্তক পড়িয়াছেন, তিনিই গ্রন্থকারের লিপি-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। "জননীর কর্ত্তব্য" আদর্শ গৃহিণীর পার্শ্বে যোগ্য পুস্তক। গ্রন্থকার প্রবীণ হইয়াছেন, এই প্রবীণ বয়সে যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সুশৃঙ্খলার সহিত এই পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেখানে যে তথ্য পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়াছেন। বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে কার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও চুনীলাল বসু প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ গৃহপাঠ্য পুস্তক রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ; আনন্দচন্দ্র তাঁহাদের ন্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া না থাকিলেও, তাঁহার এ সংগ্রহ অবহেলার জিনিস নয়। গ্রন্থখানি অবশ্য স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তকাবলীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল, মত উদার, রুচি মার্জ্জিত। এ পুস্তকের বিশেষ প্রচলন আমরা প্রার্থনা করি।

কালো-গোরার নূতন যুদ্ধ।

ষাট বৎসর পরে কলিকাতার সহরে কালো-গোরার এক নূতন যুদ্ধ চলিতেছে। গোরা বণিকেরা বলিতেছেন, "আমরা এ দেশের তাঁতি, মুদী, দোকানী, চাষী ও চামারের প্রতিনিধি। কারণ আমরা বিলাতী সূতা আনি, তাহাতে তাঁতি ও জুগী কাপড় বোনে। আমরা বিলাত হইতে জাহাজ করিয়া চিনি, লবণ ও কাপড় আনি ; মুদী ও দোকানিরা তাহা বিক্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে ; আমরা পাট, সরিষা ও ধান গোম বিলাতে পাঠাই, তাহার চাষ করিয়া চাষীরা, দুই সন্ধ্যা না হউক, অন্ততঃ এক সন্ধ্যাও খাইতে পায় ; মাটীর সান্‌কের পরিবর্ত্তে কাঁশার থালায় ভাত খায়। আমরা চামড়া বিলাতে পাঠাই, তাহাতে ডোম ও চামারের পেটে অন্ন উঠিতেছে। নতুবা তাহারা অর্দ্ধাহারে শীর্ণকায় হইয়া পড়িত।" কালো জমিদারেরা বলিতেছেন, "আমরাই প্রজাকুলের মান ইজ্জতের মালিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও আমরা তাহাদের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। আমরাই তাহাদের ভাল মন্দ বিচার করিয়া তাহাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিয়াছি।"

এই দুই পক্ষের মধ্যে কাহার দাবি সঙ্গত, তাহার বিচারের ভার মুদী ও তাঁতি, চাষী ও দোকানী, কামার ও চামার—ইহাদের উপর কেহই দিতে চাহেন না। ইহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মণেরা যেমন দেশের কয়েক জনের যাজন করিয়া অবশিষ্ট বার আনা হিন্দুকেই অযোজ্য ও অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টও 'তেমনি' উচ্চশ্রেণীর জনকয়েককে গবর্ণমেণ্টের চাকুরির উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া অবশিষ্ট পনর আনা লোককে নিরেট মূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিরেট মূর্খদিগকে—তাঁতি, মুদী, চাষিদিগকে—জমিদারেরা বিশ্বাস করেন না ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্বাস করেন না। ইংরেজগবর্ণমেণ্ট এবং জমিদার—এই উভয় দলে ইংরেজ-রাজত্ব এক শত বৎসর বেশ চলিতেছিল। কিন্তু ইদানীং জমিদারের সৌভাগ্য ইংরেজ-বণিকের চক্ষের শূল হইয়াছে ; তাহার উপর ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত অনেকে দেশের তাঁতি-মুদীকে, চাষী-খালাসীকে জুগী-জোলাকে চিরন্তন জাতিবিদ্বেষ ভুলিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। এই দুই কারণে কালো-গোরার এক নূতন যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরেজেরা পুনরায় জমিদারদিগকে বলিতেছেন যে "তোমরাই দেশের নেতা ; যাহা করিতে হয়, এস মিলিয়া মিশিয়া কাজ করি।" শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস-প্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতেছেন যে, 'মুদী তাঁতিকে, চাষী খালাসীকে, জুগী জোলাকে বাদ দিয়া দেশ শাসন চলিবে না। কারণ ২৩ লক্ষ কৈবর্ত্ত, ১৯ লক্ষ নমঃশূদ্র, ১৮ লক্ষ রাজবংশী, ৬ লক্ষ পোদ, ৫ লক্ষ মুচি, ৪ লক্ষ জুগী এবং ১০ লক্ষ বাগ্দী, সকলেই ঘোর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং ইংরেজ-রাজত্বে তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবি করিতেছে। ইংরেজ-গভর্ণমেণ্ট ও ইংরেজ বণিক, এবং দেশী জমিদার এবং "ভদ্রলোক" এই সকল তাঁতী জোলার এবং চাষী খালাসীর মনুষ্যত্বের দাবি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। শাসনবিষয়ে ইহারা আবার কথা বলিবার কে?

বাঙ্গালা দেশে ৪॥ সাড়ে চারি কোটি লোকের বাস। তন্মধ্যে ২॥ কোটি মুসলমান এবং ২ কোটী হিন্দু। এই ৪॥ কোটির মধ্যে

আন্দাজ অর্দ্ধ কোটী হিন্দুমুসলমান শিক্ষাসাপেক্ষ জীবিকা (learned professions) অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে; অবশিষ্ট চারি **কোটী লোক চাষী ও থালাসী, জুগী ও দোকানী, তাঁতি ও মুদী, কামার ও কুমার, মুচি ও চামার** এবং জেলে ও জোলা। এই চারি কোটী লোককে বাদ দিয়া স্বায়ত্তশাসন চলিবে কি না? ইহাদিগকে বাদ দিয়া ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী চলিবে কি না? ইহাদিগকে নির্ব্বাচনকারীর (Electors) শ্রেণী হইতে বাদ দিয়া বাঙ্গালার লাটসাহেবের কাউন্‌সীলের কাজ চলিবে কি না? ইহারা কি শুধু ট্যাক্‌স্‌ দিয়াই মরিবে, এবং ট্যাক্‌স্‌ কি প্রকারে ব্যয় করা হয়, তাঁহার উপর উচ্চবাচ্য করিতে কি ইহাদের কোন অধিকার থাকিবে না? এখন শিক্ষা-সাপেক্ষ জীবিকাধারী ৫০লক্ষ লোকের মধ্যে আন্দাজ ৫লক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেণ্ট লাটসাহেবের কাউন্সীল্‌, মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক বোর্ড চালাইতেছেন। ইংরাজেরা অবশিষ্ট ৪৫ লক্ষকে ডাকিয়া নিলে ভদ্রলোকেরা কি ৪ কোটী চাষী-থালাসী-মুদী-দোকানী-তাঁতি-জোলাকে ভুলিয়া যাইবেন? অথবা তাহাদিগকে বাদ দিয়া স্বায়ত্তশাসন বা "Government of the people by the people আরম্ভ করিবেন?

শ্রীমতী আনি বেশান্ত দেবী বোম্বাইতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "বাণিজ্যলিপ্ত ব্যক্তিদিগকে স্বায়ত্তশাসন হইতে দূরে রাখিলে চলিবে না।" বাঙ্গালার কোন্ জাতির শতকরা কত লোক বাণিজ্য ও শিল্পে (trade and industries) নিযুক্ত, তাহার একটী তালিকা নিম্নে সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট(Subsidiary Table VIII) হইতে প্রকাশ করিতেছি। যথা :—

বাগ্দী—১২। বৈদ্য—৬। বৈষ্ণব—২০। বারুই—১৯। বাউরি—৮। ভুঁইমালী—১৩। ব্রাহ্মণ—৬। চামার ও মুচি—৪১। ধোবা—৫। গন্ধবণিক—৫৬। গোয়ালা—৫। জুগী—৫৩। জোলা—৬৫। কৈবর্ত্ত(চাষী)—১১। জেলে কৈবর্ত্ত—৫। কলু—৪৮। কামার—৭১। কাঁশারি—৭২। কায়স্থ—১২। কুমার—৮১। মালো—১৭। নমঃশূদ্র—৮। নাপিত ১১ পোদ—৫৮। রাজবংশী—৫। সদ্‌গোপ—১১। শুঁড়ি—৩২। ছুতার—৭৬। তাঁতি—৬০। তিলি—৩১।

জিজ্ঞাসা করি, যদি শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে স্বায়ত্তশাসনে স্থান দেওয়া হয়, তবে যাহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত—যথা বারুই, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, তেলি, রাজবংশী—তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইবে কেন?

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

জন্ম ও মৃত্যু।

মাতৃক্রোড়ে সদ্যজাত শিশুটী যখন
কাঁদিল অজানা দুঃখে নয়ন মেলিয়া,
আনন্দ-সরস মুখে পরিজনগণ;
বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ চৌদিকে বেড়িয়া।

ক্রমে শিশু মাতৃ-স্তন্য করি পরিত্যাগ
বিমল কৈশোর মাঝে হলো উপনীত;
প্রভাত অরুণ সম স্নিগ্ধ অঙ্গরাগ
ভাতিল সে দেহ-লতা রম্য কুসুমিত।

দুঃখ, দৈন্য,ব্যাধি-ক্লেশ জীবন-সংগ্রামে
কত কাল এইরূপে ক্রমে কেটে গেল।
বার্দ্ধক্যের সন্ধ্যা পুনঃ আসি মর্ত্ত্যধামে
চিন্তা-ম্লান পাণ্ডু মুখে কালিমা লেপিল!

দেখিতে দেখিতে এল শিয়রে মরণ,
থেমে গেল জীবনের কর্ম্ম কোলাহল!
আছাড়ি পড়িল বুকে পুত্র কন্যাগণ
শ্মশান-সৈকত পরে বিশ্রাম উজল।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক-বিভ্রাট ও আমার কর্ম্মচ্যুতি। (২)

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচারক-জীবন সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক বক্তব্য আছে, তাহার কিছুটা এস্থলে নিবেদন করিব। আজকাল ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত কোন নব্যপ্রচারক কিরূপ আবদারে হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। একবার একজন ঈদৃশ প্রচারক চট্টগ্রামে গেলেন, সেথান হইতে তাঁহার নিত্যধামে সমাজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন, তাঁহার বাচ্চাধনের জন্ত একটী ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু তাহা পাইলেন না। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া একটী তোতা পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া পোষিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন; তাহাও পাইলেন না। তারপর হাঁস, কবুতর, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি পোষিতে লাগিলেন, তাহাদের অত্যাচারে প্রচারাশ্রমের শান্তিভঙ্গ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা বলিলে শুনে কে? তার কিছুকাল পরে, প্রচারক মহাশয় সমাজ-কমিটীতে একখানি লিখিত আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার আবাস-গৃহে কয়েকটী বৈদ্যুতিক বাতি প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু হায়! তাঁহার সে আবদারও রক্ষিত হইল না। এখন কোন্ সময় যে ঈদৃশ ব্যক্তি সোণার চেইন-ঘড়ী, আইভরি ছড়ি আর মটরকার গাড়ী চাহিয়া বসিতো, ইহাই বা কে জানে? অমুকের গাছে পাকা কাঁঠাল আছে, আর অমনি নন্দদুলাল তাহা চাহিয়া বসিলেন, তার পরেই চারি পাঁচটী একত্রে পাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। মাদারীপুরের পাটালী গুড়ের জন্য এক নিরীহ ব্রাহ্মবে-চারাকে জ্বালাতন করিয়া করিয়া হয়রান করিতে লাগিলেন, তাহাতেও না পাইয়া নিরাশ প্রাণে মনের দুঃখে অবশেষে ক্ষান্ত হইলেন। প্রচারক মহাশয় টাকার জন্য কোন দেশবিখ্যাত সাধু পুরুষের জীবনী লিখিলেন, আর তার পরেই কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক আর একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জীবনচরিত লিখিয়া প্রকাশ করিলেন, সুতরাং তাঁহাকে ও তাঁহার গ্রন্থকে খাট করিয়া, নিজেকে ও নিজের গ্রন্থকে প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; কিন্তু হায়! সে আশা পূরিবে কি? আচার্য্য মহাশয় সপ্তাহান্তে বিশ্রামবারে একদিন একটু হবিষ্য খান, আর বেদীর উপর হইতে পুনঃ পুনঃ সে কথারই বড়াই করেন, কিন্তু বিগত মাঘোৎসবের উদ্বোধনে মুর্গি এবং শান্তিবাচনেও মুর্গি আকণ্ঠ পূরিয়া উদরস্থ করিয়া উৎসব সাঙ্গ করিলেন, ইহা ডুব দিয়া জল খাইয়া একাদশী করা নয় কি? সপ্তাহে কখন কখন প্রায় দুইটী মুর্গি হজম করিয়া একদিন একটু আতপান্ন ও সৈন্ধব লবণ সেবন করিলে যে কি কৃতিত্ব হইল, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। মানুষের ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকা উচিত, তাহা না হইলে, সে ধৃষ্টতা শেষে পাগলামিতে পরিণত হয়। আচার্য্য মহাশয় এক রবিবার সন্ধ্যাকালে খুব আয়োজন ও আড়ম্বরের সহিত ভক্তি ও মুক্তি বিষয়ে মন্দিরে

এক উপদেশ ঝাড়িলেন, তার পরদিন প্রাতঃকালে নির্লজ্জের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "গত কল্যকার sermon কয়জন বুঝ্‌তে পেরেছে? আমার sermon এখানে বুঝে কে?" গর্ব্ব এবার গগন স্পর্শ করেছে। বেদী হইতে নিজের চটুল কথায় অপর দশ জনকে হাসাইয়া বাহাদুরি নেওয়ার প্রলোভনও ইনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু ইহা অন্য সময়ে যেমন, যদি বেদীর কার্য্যের সময়েও তেমন হয়,—বিশেষতঃ নিতান্ত অ-প্রয়োজনে, শুদ্ধ বাহাদুরি নেওয়ার প্রলোভনে কোন রূপ চপলতা প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে যে বেদীর গাম্ভীর্য্যই নষ্ট হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আচার্য্য মহাশয় বিগত বৈশাখের এক রবিবার সন্ধ্যাকালে মন্দিরে যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে পারশ্যের শা'র বোম্বাই আম খাওয়া লইয়া এবং তাহার রেকর্ড দাঁড়ী লইয়া যে উপহাসের হাসি হাসিয়াছেন,—যে লঘুতা ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপাসকগণের স্মরণ আছে, এবং ইহা দ্বারা ব্রহ্মসাধনের যে কি সাহায্য হইতে পারে, তাহাও তাঁহাদের জানা আছে। জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে কোন এক তত্ত্বকথা লইয়া কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আচার্য্য মহাশয়ের আলাপ হইয়াছিল, ভদ্রলোক, আচার্য্য মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া একজনের নিকটে বলিয়াছিলেন, "উনি কি আর এসকল বুঝিবেন?" একথা আচার্য্য মহাশয়ের কাণে গেল। তার পর রবিবার মন্দিরে উপাসনার উদ্বোধনেই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "যাঁহারা জ্ঞানের বড়াই করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে বিনাশ করবেন"। একথা বার বার বলিয়া ক্লান্ত হইলেন। আবার কোন্ দিন কে বলিয়াছিল, "ব্রাহ্মসমাজে কি হইল?" আর একজন উত্তর করিল, "বানরের গান হইল"। আচার্য্য মহাশয় অদূরে দাঁড়াইয়া একথাও শুনিয়াছিলেন। তারপর ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক নিকটে ছিল, তাহাদের মধ্যে যেখানে যতপ্রকার তিরস্কার ও অভিসম্পাতমূলক বাক্য ছিল, সমস্ত বোধ হয় একত্র সঙ্কলিত করিয়া, রবিবার সন্ধ্যাকালে বেদী হইতে এমন অনর্গলভাবে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, উপাসকগণ ভীত, সঙ্কুচিত ও দুঃখিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। উপাসকগণ শান্তিলাভের আশায় মন্দিরে আসিয়া অশান্তি পাইলেন, অভয়ধামে আসিয়া ভয় পাইলেন। আচার্য্য মহাশয় একদিন রাজপথে বেড়াইবার সময় এক নূতন বন্ধুকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, "দশ জনে যাহাকে কোন একস্থানে উচ্চপদে বসাইয়া দিয়াছে, তাহাকে সমালোচনা করা অন্যায়"। এবার যে পৌরোহিত্যের দৌরাত্ম্যের এক কাঠি উপরে অভ্রান্ত গুরুবাদের দরজা পরিষ্কার করিতেছেন, তাহা বুঝিতে আর বাকী আছে কি? টাকার তাড়নায় সমাজের কেরাণী বাবু অস্থির, একদিন টাকা দিতে যদি বিলম্ব হইল, তখনি ধমক্ দিলেন, "আমি চলিয়া যাইব"। ব্যবসায়ী প্রচারকের আর কি লক্ষণ হ'তে পারে? প্রচারক মহাশয়, প্রচার-কেন্দ্র হইতে যখন যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন, আজ যদি কোন রাজবাড়ীর মহোৎসবের আহ্বান আসিল, অমনি ছুটিয়া চলিলেন, নিষেধ করিবার সাধ্য নাই,

অনাচার্য্যদের কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই, পাছে বা আচার্য্যদের মান করিয়া চলিয়া যান। আবার প্রচারক ফিরিয়া আসিলেন, বেতনের টাকা লইয়া আবার অন্য দিকে ছুটিলেন। প্রচার-কেন্দ্রে সাপ্তাহিক উপাসনা চলুক আর নাই চলুক, তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর কোন কল্যাণ হউক আর নাই হউক, কিছুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান না রাখিয়া, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, অথবা যেখানে গেলে বহুসংখ্যক লোকের বাহবা পাইবেন, বড় বড় লোকের সহিত করমর্দ্দন করিয়া আপনার জীবনকে সার্থক করিতে পারিবেন, সেই দিকে ছুটিলেন। ব্যবসায়ী প্রচারকের আর কি লক্ষণ হতে পারে? ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ যেদিন মাটী খেয়ে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন, সেই দিনই ধর্ম্মপ্রচার হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী ছিল। যে দিন জ্ঞানী নগেন্দ্রনাথ ঘোর দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই দিনই ধর্ম্ম প্রচার হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী ছিল। যে দিন সাধু অঘোরনাথ কৌপীন-করঙ্গধারী হইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্গম পার্ব্বত্যভূমি ডেরাগাজী খাঁ ও ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই দিনই ধর্ম্মপ্রচার হ'য়েছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী ছিল। সে দিন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ শুধু জল রুটী খেয়ে শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানামৃত উদ্ধার করিতেছিলেন, সেই দিনই ধর্ম্ম প্রচার হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী ছিল। আর এখন শতমুদ্রা মাসিক বেতনে ধর্ম্মদরিদ্র, গলাবাজীপটু, অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী প্রচারক নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দশা! অমুক ব্যক্তি সে দিন ছিলেন নগণ্য স্কুল মাষ্টার, আজ তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক; অমুক ব্যক্তি সে দিন ছিলেন ভুঁইফোঁড় স্বদেশী বক্তা, আজ তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক; অমুক ব্যক্তি সে দিন ছিলেন এল্-এ কিম্বা বি-এ ফেইল্ ভবঘুরে, আজ তিনি ধর্ম্মপ্রচারক; এইরূপ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার হয় না। মেডিকেল কলেজের পরীক্ষাটী পাস্ করিতে পারিলেই বড় ডাক্তার হইব, আর পাস্ করিতে না পারিলেই ভগবানের আদেশ পাইব,—সে আদেশ আবার একশ টাকা মাসিক বেতনে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য। আদেশও বেশ ফাঁক বুঝিয়া অবতীর্ণ হয়। ইহা ধর্ম্মসাধনা নহে, আত্ম-প্রবঞ্চনা। আমাদের দেশে সিপাহী-মিউটিনীর সচরাচর যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয়, তন্মধ্যে একটী কারণ সৈনিক বিভাগের দুর্ব্বলতা। লর্ড ড্যালহৌসি যে বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়া যান, তাহার শাসনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সিবিলিয়ান্ কর্ম্মচারী তখন এদেশে ছিল না, তজ্জন্য সৈনিক বিভাগ হইতে যত সব অফিসার লইয়া কাজে লাগাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে এক দিকে যেমন সৈন্যদল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য দিকে সুশাসনের অভাবে দেশের প্রজাসাধারণও নিতান্ত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ইহাতেই এই অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজেরও অনেকটা সেইরূপ দশা।

এবার বিজয়ডমরুর বাদন পালা। আজকাল ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে নানা

রঙ্গবিরঙ্গের অভিনয় চলিতেছে, এখানে কখন বা তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন বা ভয় প্রদর্শন; কখন বা আত্মবিসর্জ্জন, কখন বা আত্মসমর্থন। জয়মাল্য কণ্ঠে পরিয়া বীরদর্পে পুর-প্রবেশের পর প্রথম রবিবার সন্ধ্যাকালে বেদী হইতে আত্মসমর্থনে ঘোর ঘটায় বক্তৃতা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাতের পর অভিসম্পাত হানিয়া উপনিষদের বচন আওড়াইয়া বলা হইল, 'যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি,"—"পাপী" নয়, তুমি যে পাপো ভবতি", পাপ হয়ে গেছে। ইত্যাদি। ইত্যাদি। কেমন স্বদেশবাসি, এ ব্যক্তি বেদীর যোগ্য অধিকারী বটে !!! কলিকাতার ও ঢাকার কর্ত্তারা তাঁহাদের সেই প্রিয়পোষ্য নন্দদুলালের,—তাঁহাদের সেই অভিমানী নাড়ু গোপালের সম্বর্দ্ধনার জন্য,—তাহাকে তুলিয়া ধরিবার জন্য, নানা আয়োজন করিতেছেন। অতি-আদরের বিষম ফলে, শেষে উৎকট প্রেমের বিকট পরিণাম না হয়। এখানে এই উপলক্ষে হনুমান বৈশ্বানরের গল্পটী আমাদের স্মরণ হইতেছে। শ্রীমৎ হনুমানজী আজন্মকাল বৈশ্বানর অগ্নির উপাসক ছিলেন, যখন লঙ্কাকাণ্ডের অগ্নিকাণ্ডে তাহার মুখকমল পুড়িয়া গেল, তখন হনুমান মনোদুঃখে অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আমি চিরজীবন আপনার সেবা করিয়াছি, তাহার ফলে শেষে কি এই হইল?" অগ্নিদেব উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি ত তোমার মুখ পুড়ি নাই, আমি স্নেহভরে তোমার মুখচুম্বন করিয়াছি মাত্র। বৎস, ইহাতেই এইরূপ হইয়াছে।" ওগো ত্রিতলবাসী দরদী পৃষ্ঠপোষক মুরুব্বি এবং ভবদীয় সাঙ্গোপাঙ্গগণ, এখানেও শেষে এই ননীগোপালের মুখটী পুড়িয়া না যায়, ইহাই আমাদের আশঙ্কা! কলিকাতা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রগণ্য পুরুষ, ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যে জ্বালাময়ী ভাষায় ঐ পত্র লিখিত হইয়াছে, লেখক যে তেজে এই নিরীহ লাইব্রেরিয়ানকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত অগ্নি স্থানে স্থানে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ্যে এই চিঠিখানি প্রকাশিত হইলে একটা দেখ্‌বার মত জিনিষ হইত। সুরলোক হইতে নরলোকের দিকে, অমরধাম হইতে মর্ত্ত্যধামের দিকে যে আদেশ-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য হইয়াছে। কাক মারিতে কামান ধরার ন্যায়, প্রভূত আয়োজন করিয়া কর্ত্তারা এবার নরমেধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন। তাঁহাদের সেই নন্দদুলাল এবার বৃটন্-বিজয়ী জুলিয়াস্ সীজারের ন্যায় সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া আসিয়া সিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন। এ ব্যাপারে এখন মহাভারতের মুসলপর্ব্বের পুনরভিনয় না হইলেই মঙ্গল। যাহা হউক, গ্যালিলিওকে যতই নির্য্যাতন করনা কেন, তাঁহার উক্তির সত্যতা কভু নড়িবার নহে; পৃথিবী কিন্তু ঘুরেই ঘুরে !!!

আজ যদি ব্রাহ্মসমাজের সে দিন থাকিত, তাহা হইলে এসমস্ত লোক কোথায় থাকিত? একদিন যাহারা ধর্ম্মের জন্য মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ন্যায় দিগ্বিজয়ী পুরুষকেও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা রামা শ্যামা নব

ভবা ইত্যাদির নিকটে অবনত। ব্রাহ্মজীবনের কি দুর্গতি! ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মও এখন কোন কোন স্থলে কেবল একটী মামুলী বক্তৃতার ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। শিখিবার অপেক্ষা শিখাইবার দিকে, জানিবার অপেক্ষা জানাইবার দিকে, এবং পাওয়া অপেক্ষা দেওয়ার দিকে, ব্রাহ্মপ্রচারকের ঝোঁক বেশী। কাহারও বক্তৃতা-কণ্ডূয়ন বৃত্তি এতই প্রবল যে, অতিরিক্ত কথা বলিতে গিয়া শেষে কেবল বাচালতাই প্রকাশ করে।

কলিকাতার ত্রিতল অট্টালিকায় বাস করিয়া যিনি ত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন, সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারত্ব প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন, আর্ত্তের সেবা করিয়া যিনি দেশব্যপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি আজ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যের দিকে, কলিকাতা হইতে ঢাকার দিকে, মক্ষিকা দলনে তাঁহার সেই অমোঘ আদেশ প্রচার করিলেন। ইনি কি প্রকার বর্জ্জন-নীতির পক্ষপাতী, একটী ঘটনা দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে। একবার কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের সময়, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী একটী মুসলমান ভদ্রলোক, এই দয়াময় পুরুষের গৃহে আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ইনি বলিয়াছিলেন, মুসলমানকে গৃহে স্থান দিলে তিনি আর চাকর বাকর পাইবেন না। অহো, ব্রাহ্মধর্ম্মের কি চমৎকার পতাকাবাহী! যে বন্ধুর মুখে এইখানে বসিয়া এই কথাটী শুনিয়াছিলাম, আজ তিনি জীবিত থাকিলে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করিতাম, কিন্তু হায়! লুসিটেনিয়ার ধ্বংস সাধনে আটলান্টিকের অতল জলে তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এই ত সমাজের নেতা, এই ত সমাজের কর্ণধার, আবার এঁরাই করেন ধর্ম্মপ্রচার। বাহ্যাড়ম্বর, লোকরঞ্জনস্পৃহা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা অধিকার করিয়াছে, বিশেষতঃ তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজী প্রচারক ত এ বিষয়ে আরও অগ্রগণ্য, ইহার নাগাল পায় কে? দুধের স্বাদ ঘোলে মিটে না, মাকাল ফলেও আম্রের আস্বাদ মিলে না, আসল জিনিষ পাইতেই হইবে। বাক্‌পটুতায় আর শিক্ষিত লোকের মন আকৃষ্ট হয় না, আবার অশিক্ষিত সাধারণ লোকেও ভুয়ো পাণ্ডিত্যের বা বাগাড়ম্বরের ধার ধারে না, সুতরাং সভ্যতাভিমানী, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, প্রশংসা-প্রিয় অসার লোক বাদ দিয়া, সরল শান্ত সাধক দ্বারা,—'তস্মিন প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনং' যাঁহার মূলমন্ত্র, সেইরূপ লোক দ্বারা, এখন দেশের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হইবে।

আমি আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। প্রবন্ধের ভাষা অন্যান্যের নিকটে কিছু তীব্র হইলেও এবং স্থানে স্থানে কাহারও কাহারও আপত্তিকর কঠিন দুই চারিটি শব্দ থাকিলেও, তাহা যে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কোন এক স্থানে দুই চারি পঙ্‌ক্তি পাঠ করিয়া, কিম্বা এখানে ওখানে দুই চারিটী শব্দ পাঠ করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। সমস্ত লেখাটী আগা গোড়া পাঠ করিয়া, লেখকের মনের গতি কোন্ দিকে, তাহার মনের ভাবটা কি, তাহা ধরিবার চেষ্টা করাই বিজ্ঞ পাঠকের কর্ত্তব্য। ভাষা, ভাব প্রকাশের উপায়মাত্র, ভাব লক্ষ্য, ভাষা উপলক্ষ্য; সুতরাং উপায়

বা উপলক্ষ্যকে ধরিয়াই বিচার করা কাহারও উচিত নহে। আমার প্রবন্ধের প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ কামনায়,—আপন আদর্শের মলিনতা দেখিয়া, কি মর্ম্ম বেদনায় আমি উহা লিখিয়াছি, এবং ব্রাহ্মসাধারণের নিকটে উহা নিবেদন করিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ সেই দিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিলেন না, এ বিষয়ের সূক্ষ্মবিচারে সময়ক্ষেপ করার আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন না। আমার লেখা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের মহারথিগণের কেহ কেহ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাঁহাদের বৈরনির্য্যাতনবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, মক্ষিকাদলনে আপন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের prestige রক্ষা করিলেন। এইখানে মনে হইতেছে “নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ, যা দেবী ব্রাহ্মশাসনে প্রেষ্টীজ্‌ রূপেন সংস্থিতা”।

আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে ও বর্ত্তমান্ প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যে এই দোষে দোষী, তাহা অবশ্যই নহে, সেই ভাবে আমি কোথাও কিছু বলি নাই, এবং সেইরূপ বলাও আমার উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানী কর্ম্মী, ভক্ত, প্রেমিক লোক অনেক আছেন, আমি তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি। বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ প্রতিক্রিয়া ও পুনরুত্থানের দিনেও যদি দেশের উপরে ব্রাহ্মসমাজের কিছু প্রভাব থাকে, তবে তাহা ইঁহাদেরই গুণে। একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি। ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী, এবং কমিটীর প্রতিনিধি স্বরূপ সম্পাদক। সুতরাং কমিটী বা সম্পাদক কোনও কার্য্য করিলে, তাহা সমাজের উপরে গিয়াই পড়ে। আমি আজ পাঁচ বৎসর কাল ব্যাপিয়া লাইব্রেরিতে কাজ করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে মাদৃশ ক্ষুদ্র মানবের দ্বারা যত দূর সম্ভব, ইহার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। ভগবানের কৃপায় তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি কখনও বলিতে পারেন যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি লাইব্রেরির কার্য্যের কোন অবহেলা বা অনিষ্ট করিয়াছি? লাইব্রেরির মেম্বার ও সাধারণ পাঠকগণ এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ আমার কর্ম্মের পরিদর্শক। আমার লেখায় কাহারও মতে আপত্তিকর যদি বা কিছু থাকে, তদ্দ্বারা লাইব্রেরির কাজের কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সে কথার বিচার না করিয়া, কেবল ক্ষমতা গৌরবে আমাকে বিদায় দিয়া আপনাদের অবাধ ইচ্ছার সার্থকতা অনুভব করিলেন, ন্যায়বান্ ব্রাহ্মসমাজ এই ভাবে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বাইবেলের পুরাতন বিধানে আছে যে, প্রতিশোধের জন্য চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ গ্রহণ করিবে; ব্রাহ্মসমাজ এ স্থলে সেই আদিম সমাজের নীতিশাস্ত্রই গ্রহণ করিলেন। আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহার উত্তরে আমার কি বলিবার আছে, তাহা আমাকে লিখিত পত্রে জিজ্ঞাসা না করিয়া এবং আমার লিখিত বিষয় অন্ততঃ মোটের উপর সত্য বলিয়াও ব্রাহ্মসমাজ কোনও দোষের নিরাকরণে মনোনিবেশ করিলেন না, এক দিবসের মধ্যেই তাঁহাদের সমস্ত

বিচার নিষ্পত্তি শেষ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, কেবল ব্রিতলবাসীই তাহার দরদী নহে, আপন শক্তি সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই ইহার মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু বলিবার অধিকার আছে, কিন্তু আজ এক ব্রাহ্মই অন্য ব্রাহ্মের এই অধিকার হরণ করিতেছেন; ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়াছেন, কিন্তু আজ এক ব্রাহ্মই অন্য ব্রাহ্মের এই স্বাধীনতার প্রতিরোধ করিতেছেন। আমি ব্রাহ্মসমাজের সংশোধনের জন্য তাহার ভিতরের দোষগুলি বাহির করিয়া দেখাইয়াছি বলিয়াই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসাপের ফণা-দলনকারী “বেদরদী” দেবী বাবুর নব্যভারত পত্রিকায় লিখিয়াছি বলিয়াই, ব্রাহ্মসমাজ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং আমাকে বিদায় দিলেন, তাহা সমস্ত দেশের লোকে চাহিয়া দেখুক। যাঁহারা বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা আজ এই ভবরঙ্গমঞ্চমাঝে যে প্রেমলীলার অভিনয় করিলেন, তাহা সমস্ত দেশের লোকে চাহিয়া দেখুক। যাঁহারা কর্ম্মজগতে প্রেমের সাধনা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা আজ এই ভবের হাটে প্রেমের নাটে যে নাট্যাভিনয় প্রকটিত করিলেন, তাহা সমস্ত দেশের লোকে চাহিয়া দেখুক। যে দিন আমি লাইব্রেরির কর্ম্মভার অর্পণ করি, সেই দিন পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতৃস্থানীয় পুরুষ বড়ই উত্তেজিত ভাবে এবং অবজ্ঞা ভরে আমাকে বলিলেন, “তোমার বড় আস্পর্দ্ধা বে’ড়ে গিয়েছে, কোথা হ’তে কোথায় এসেছ, একবার চিন্তা ক’রে কথা বলিও”। হায়, কি সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মসমাজে এখন আর দীন দুঃখী পাপী তাপীর স্থান নাই, ব্রাহ্মসমাজ এখন উচ্চ শ্রেণীর লোকের সমাজ, ব্রাহ্মসমাজের লোক এখন বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, সম্পত্তি, পদমর্য্যাদা ও আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত, ব্রাহ্মসমাজে জাতি-ভেদরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচ প্রবেশ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ঢাকা জিলার অন্তর্গত দোহারগ্রাম-নিবাসী সীতানাথ বিশ্বাস নামক এক জন নমঃশূদ্র জাতীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক, দীক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কলিকাতা ভবানীপুর পদ্মপুকুর-নিবাসী ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার জেনারেল্ উমাচরণ দাস (ধোপা দাস) ব্রাহ্মসমাজে স্থান না পাইয়া পুনরায় হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, দেশের লোকে সে কথা এখনও ভুলিতে পারে নাই! হায় কেশবচন্দ্র! তুমিই ত একদিন দিগন্ত প্রধাবিতরবে জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলে,—“নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার”। আজ সেই আদর্শ, সেই শিক্ষা, সেই নীতি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছে, তোমার আধ্যাত্মিব উত্তরাধিকারিবর্গের কি দশা ঘটিয়াছে, একবার দেখ। এখানে মানবের বেশে এখন দানব প্রবেশ করিয়াছে; ক্ষমতাপ্রিয়, যশোলিপ্সু, কৌশলময়, বুদ্ধিজীবী, ধনবলদৃপ্ত, জাত্যভিমানী লোক এখন এখানে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। হায়! এ দুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। দীন হীন ধর্ম্মার্থী ব্যাকুল আত্মা আর এখানে স্থান পাইবে না। ভারতে ব্রাহ্ম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, যে যেখানে আছ, ধর্ম্মপ্রাণ

ছাড়িয়া পরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটী আমি শুনিয়া ইহার সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হই। মাইকেলের জনৈক আত্মীয় ইহা অমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি তাহা যোগীন্দ্রবাবুকে বলি। কিন্তু শ্রীমতী মানকুমারী বলেন, ইহা সত্য।

মাইকেলের এই পত্রখানি সাধারণে বিশেষ পরিচিত নহে। ইহা সর্ব্বপ্রথম আমি "মৃণ্ময়ী"তে প্রকাশ করি। পত্রখানি মাইকেল ডাক্তার রামদাস সেনকে লিখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য পত্রেই ব্যক্ত।

"মহাশয়,

যদ্যপিও আপনকার সহিত আমার সাক্ষাদ্দর্শন নাই, তথাপি আপনকার যে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ, এবং এ লেখকের প্রতিও যে স্নেহসম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুরাগ আছে, তাহা লোকমুখে সে সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকে, সেই হেতুই এ ব্যক্তি মহাশয়কে আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থা এই ভরসায় জানাইতেছে যে, যদিও আপনি তাহাকে এ বিপদরূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদন পত্র তাহার পক্ষে অবমাননার কারণ হইবে না।

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে, নাধমে
লব্ধকামা॥

অদ্য দেড় বৎসর হইল, আমি নিজের ও পরিবারদিগের শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কাজকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারি নাই, সাংসারিক ব্যয় অধিক। তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, এবং মহাজনেরা যতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে কষ্ট দিয়াছে, এবং দিতেও ত্রুটি করিতেছে না, এমন কি, ২।৩ জন আমাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টাতে আছে, এবং কেহ কেহ আমার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, প্রায় সকলই বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। আমি ভয়ে এক প্রকার গতিহীন হইয়া পড়িয়াছি, মহাশয়, যদি ঋণরূপে ৬।৭ হাজার টাকা আমাকে পাঠাইয়া দেন, তবে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হই, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। ঋণ পরিশোধ করিবার প্রণালী আপনার হস্তে। হয়ত, বিচারালয় সম্পর্কীয় কার্য্যদ্বারা মহাশয় অতি অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন, না হয় আমিও বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু দিয়া ২।৪ বৎসরে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে পারি। আপনকার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় যে আমি কতদূর ব্যগ্রতার সহিত পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলাম, তাহা আপনিই বুঝিয়া দেখিবেন। ভরসা করি, আপনি আমার এ প্রার্থনায় বিরক্ত হইবেন না। আর মহাশয় আমার বিপদতারক রূপ ধারণ করিলে আরও ২।৩জন হিতৈষী মহোদয়ের সহকারে এ বিপদজাল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, কিন্তু মহাশয়, যদি আপনি এ জনের প্রতি সদয় হন, তবে যেন কালিদাসের মেঘদূতের কবিতাটী স্মরণ থাকে।
৩০শে জানুয়ারি, ১৮৭২।

নিঃশব্দোপি প্রদদসি জল যাচিতঃ চাতকেভ্যঃ। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য।

সাহিত্য পরিষৎ।—অনেক দিন পূর্ব্বে, নব্যভারতে লিখিয়াছিলাম "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী পণ্ডিতগণের সমিতি। পরিষদে উপস্থিত হইয়া আমরা কয়েকটী কথা শিখিয়া ও বুঝিয়া আসিয়াছি।

(১) বুঝিয়া আসিয়াছি যে বাঙ্গালা লেখার পাঠক জুটে না কেন।

২) শুনিয়াছিলাম যে, কোথাও

তোলা হাতের সংখ্যা গণিয়া ঈশ্বর আছেন কি না স্থির হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শিখিয়া আসিয়াছি যে, হাত তুলিয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। একটী উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। ছেলেবেলা আমরা লোকা ধোপা ও দুগো ঘড়েলের যাত্রা শুনিয়াছি। এখন দুগো ঘড়েলের নাম অনেকে জানেন না। সুতরাং দুগোর জীবনচরিত লিখিলে ভাল হইতে পারে। প্রথম বিবেচ্য, দুগোর প্রকৃত নাম কি? দুর্গা হইতেই দুগো হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্গাদাস কি দুর্গাচরণ? দাস অপেক্ষা চরণ একটু শুনিতে ভাল—কথাটা ঠিক করিবার জন্য "ভোটে" দেওয়া হইল। অধিকাংশ সভ্য হাত তুলিয়া জানাইলেন, দুর্গাচরণ। সুতরাং ঠিক হইল, সেই যাত্রাদলের অধিকারীর নাম দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল। এখন ঘড়িয়াল শব্দের অর্থ কি? এমন বিচিকিৎস উপাধি কোথা হইতে আসিল? ঘড়িয়াল একপ্রকার জলজীব। দুর্গাচরণ কি সেই জলজীবের বংশাবতংশ? যাহারা ঘড়ি বেচে—তাহারাও ঘড়িওয়ালা বা ঘড়িয়াল। দুর্গাচরণের সঙ্গীতে অনেক প্রাকৃত শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষতঃ তাঁহার গানে কলিকাতা কি বর্দ্ধমানের নাম নাই, বল্লাল সেন ও আদিশূরের বা বিজয় সিংহ কি সিংহবাহুর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ প্রাচীন হইলে স্বতঃই একটু সম্মাননীয় হয়। কিন্তু এমন প্রাচীনকালে রাধাবাজারের সৃষ্টি হয় নাই, হ্যাণ্ডহার্ট ও মরের দোকান হয় নাই, তবে কি দুর্গাচরণের পিতামাতা ঘড়িওয়ালা হওয়া সম্ভব হয়? তখন কিন্তু পেটাঘড়ির ব্যবহার ছিল, কালানন্দের কাব্যে পূজার সময় পেটাঘড়ি পিটিবার প্রথা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা ঘড়ি পিটে, তাহাদিগকেও ঘড়িয়াল বলা যায়। কথাটা ভোটে দেওয়া হইল—দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল নামক জলজীবের সন্তান, কি ঘড়িওয়ালার সন্তান? অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে, দুর্গাচরণ ঘড়িপেটা ঘড়িওয়ালের সন্তান। একজন দুর্দ্ধর্ষ সভ্য আপত্তি করিলেন যে তাহা হইলে দুর্গাচরণকে অতি নীচবংশসমাগত বলা হয়—সুতরাং এ বিষয়ে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। আর একজন বলিলেন, বংশ যত নীচ হইবে, ততই দুর্গাচরণের পুরস্কারের গুণাপনার গৌরব বাড়িবে। সভাপতি মহাশয় নিজেই এ গোলমেলে মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, যাহারা ঘড়ি পিটিত, দুর্গাচরণের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাজসরকার হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঘড়িয়াল এটী হিন্দু-রাজা প্রদত্ত উপাধি—ইহাতে যাবনিকতা কিছু দেখা যাইতেছে না। সুতরাং যখন বাঙ্গালাদেশে হিন্দুরাজত্ব ছিল, তখন দুর্গাচরণের আবির্ভাব হয়। সুতরাং তিনি বিদ্যাপতির সাত শত উনপঞ্চাশ বৎসর ছয় মাস নয় দিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকলে করতালি দিয়া এ মীমাংসা অনুমোদন করিলেন।—" (নব্যভারত—বৈশাখ, ১৩০৫)

তাহার পর অনেকদিন গিয়াছে। সম্প্রতি নগেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার পাহাড়ের চন্দ্রবর্ম্মার inscription পাঠ করিয়া ঠিক করিয়াছেন, খ্রীষ্টপর চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার হইত। সেদিন মালদহের ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়

পাণ্ডুয়ার নিকট প্রাপ্ত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের দুটী মুদ্রা দেখিয়া স্থির করিয়াছেন,—খ্রীষ্টশতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালার ব্যবহার ছিল। ললিতবিস্তরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব বঙ্গলিপি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ললিতবিস্তর রচিত হইয়াছিল, তার অনেক আগে, সুতরাং ভবিষ্যতে আর কেহ বাঙ্গালাকে আরও পেছনে ঠেলিয়া দিতে পারেন। এইরূপে settled facts উল্টাইয়া দিবার জন্ম Young Bengal পরিষৎ স্থাপন করিয়াছিলেন !!

পণ্ডিত রামগতি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তন্ত্রে লণ্ডনের উল্লেখ আছে, সুতরাং তন্ত্রগুলি সম্ভবতঃ ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বরের পর রচিত হইয়াছিল। তন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের figureএর উল্লেখ আছে, সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি খুব আধুনিক, একথা তাঁহারা মানিতে পারেন না।

উড়িষ্যাও এই সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পায় নাই। যোগেশ বাবু আসামী ভাষার origin লইয়া হুজুগ তুলিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন—বাঙ্গালা ভাষাকেও তিনি আক্রমণ করিয়াছেন। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেলে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালা সংস্কৃতে তদ্ভাব—কিন্তু ইহাঁরা স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গালা পালি বা ঐ রকমন্ত্র কিছু একটা aboriginal ভাষা হইতে উৎপন্ন—সংস্কৃত শব্দাদির আমদানী অনেক পরে হইয়াছিল। এই সব কচকচী ভাল না লাগায় আমরা এ বিষয়ে তত মনোযোগ দি না।

তাহারপর 'প্রবাসী'তে বিজয়চন্দ্রের কালিদাসকে rehabiliate করিবার প্রয়াস Goldstucker, Maxmuller, Weleer হইতে বঙ্কিম, রামদাস, চন্দ্রনাথ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কবরের উপর এক মুষ্টি ধূলা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পরিচয় অন্ধকারে ফেলিয়াছেন, সর্ব্বশেষে বিজয়চন্দ্র শেষমুঠা মাটী দিয়া কবর ভরিয়া এক পাথর পাঁথিয়া দিয়াছেন। বিজয়চন্দ্র বলিতেছেন, কালিদাস গুপ্তদিগের সভাকবি ছিলেন এবং তিনি রঘুবংশে সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। এক যোগেশ বাবুতেই আমরা সন্ন্ন্ত, তাহার পর বিজয়চন্দ্র আসিলেন ! কবি বলিয়াছেন—

ও আমার ভাঙ্গা দশা, যেখানেতে মা মনসা
জুটেছে ধূনার গন্ধ তায়।
এক যোগে রক্ষা নাই, তিন যোগে এক ঠাঁই
অমাবস্যা যোগিনী মথায় ॥

আলিপুরের মেজিষ্ট্রেট ব্রডলে সাহেব।—প্রথম প্রথম যে সকল সাহেবেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ভদ্র ছিলেন। ব্রডলে সাহেব তাঁহাদেরই একজন। ইনি আলীপুর কোর্টের মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন আমি সবে ব্রাহ্ম হইয়াছি—কলিকাতা হইতে যেদিন বঁড়িশায় ফিরিলাম, সেই দিন হঠাৎ আমার জ্ঞাতিদিগের কয়েকজন আমার ঘরে ঢুকিয়া আমায় জুতা ছাতা লাঠি প্রভৃতি দিয়া মারে। পাছে আমি পালাইয়া যাই, এইজন্য সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমার ভগ্নী ও মাতা আমার অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করেন। তখন আমার বোনের বয়স আট দশ বৎসর। যাহা হউক, তাহারা চলিয়া গেলে আমি সেই দুপুরেই

আলীপুরে হাঁটিয়া যাই। তখনত আমি বালক মাত্র—যতদিন কোর্টে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরিচিত কেহ নাই—অসহায় ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে ব্রডলে সাহেব আমাকে এই ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া আমায় ডাকিয়া, আমার কি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সব সবকথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি আজ বাড়ী যাও কাল আমি তোমার গ্রামে যাইব। এ মকদ্দমা নিজে লইলাম।' আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, পরদিন ব্রডলে সাহেব চাপরাসী প্রভৃতি লইয়া বঁড়িশায় আসিলেন। চারিদিকে লোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আমি বাড়ীর মধ্যে ছিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া আমার বাড়ীতে আসিলেন। পরে তিনি রীতিমত জবানবন্দী লইলেন, আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পর তিনি আমার সাক্ষী কাহারা, জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রামের সকল লোকেরা, আমার উপর অত্যাচার হইয়াছে, অস্বীকার করিল। অবশেষে তিনি বলিলেন, তোমার পরিবারস্থ কেহ দেখে নাই। আমি বলিলাম, হাঁ, আমার বোন ও মা দেখিয়াছেন। তিনি তখন জুতা খুলিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন "মা—আপনি বলুন, কাল কি হইয়াছিল।' মা সকল কথা বলিলেন। তাহার পর আমার বোনকে ডাকিয়া সাহেব তাঁহার কোলে বসাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেও সব বলিল। সাহেব প্রীত হইয়া এক বাটী ডাবের জল পান করিয়া চলিয়া গেলেন। যথারীতি মোকদ্দমা হইল—যাহারা প্রহার করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও অর্থ দণ্ড হইল, কাহারও জেল হইয়াছিল। ব্রডলে সাহেব যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, আমি প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। এমন উদার—সরল প্রকৃতির লোক বড় বেশী দেখি নাই। আমি গেলে তিনি সকল কাজ ছাড়িয়া আমার সহিত আলাপ করিতেন—প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন "গ্রামে আর কেহ অত্যাচার করিতেছে না ত ?" তিনি মিশরদেশে ফিরিয়া যাইবার পর আমি তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—

Cairo, 13—12—82.

My dear Khirodchandra Rai,

I receivel your letter with great pleasure as I remember you qute well and the circumstances of the case. I only tried to do my duty as I always did when in India. I should like you to remember me to many friends around Alipore. Is Poshupoty Gangoli the pleader still alive ? Please tell them all I never forget them. Someday we will meet again. I enclose you my portrait I. In a week I go back to Tunis.

Truly yours,
A. Broadley.

(২)

(তাঁহার পুরাতন খাতাপত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটী পাইয়াছি। প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা বলিয়া "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধটী এই সংখ্যায় শেষ হয় নাই। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। প্রকাশক)

যজ্ঞ দুইপ্রকার—হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ ; দধি দুগ্ধ ঘৃত পুষ্প প্রভৃতি আহুতি দিয়া হবি-

যজ্ঞ ও সোমরস আহুতি দিয়া সোমযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত। হবির্যজ্ঞ অনেক প্রকার যথা অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রয়ণী, চাতুর্মাস্য, ইত্যাদি। সোমযজ্ঞ নানাপ্রকার—তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্য্যাম, রাজসূয় ও অশ্বমেধ সর্ব্বপ্রধান। অন্যান্য-দিগের মধ্যে এই কয়টীর নাম করা যাইতে পারে—পুরুষমেধ, গোমেধ, পঞ্চসারদীয়া, শূলগব, মহাপ্লব, দ্বাদশাহ, পিতৃমেধ, সর্ব্বমেধ, অবেষ্টী। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটী উত্তরকুরু সমাজে বাসকালে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে বাসস্থাপন করিয়াও আর্য্যগণ সে পুরাতন প্রথা পরিহার করেন নাই।

অশ্বমেধ যজ্ঞ একবিংশতি যূপে হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি ছয়শত নয়টী বিভিন্ন প্রাণী আবদ্ধ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্য সমাপনান্তে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করা হইত। তদনন্তর যজ্ঞীয় অশ্ব বলিদান পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই মাংসে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে ভোজনার্থ বিতরণ করা হইত। সকল যজ্ঞের প্রারম্ভে সামমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিতে হইত। অরণি নামক দুইখণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করা হইত। (এই অগ্নি ব্যতীত অন্য উপায়ে উৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ হইতে পারে না। উড়িষ্যায় কোন একটী করদ রাজ্যে দেখিয়াছি, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ একমুঠা দুর্ব্বাদল লইয়া কয়েকবার ফুঁ দিয়া অগ্নি উৎপন্ন করে।) অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ষোড়শ পুরোহিতের আবশ্যক হইত, কিন্তু অশ্বমেধ ছয়জনে সম্পন্ন করিতেন। ইহাদিগের উপাধি হোতা, অধ্বর্য্যু, অগ্নিসিদ্ধ, সংস্তর। অতি প্রাচীন যজ্ঞ সকল এবং গার্হস্থ অন্নাদি এক-জনে সম্পন্ন করিত, এবং গৃহকর্ত্তা স্বয়ং পৌরোহিত্য করিতেন। ক্রমে পুরোহিতেরা কর্ত্তার আসন অধিকার করেন এবং তাঁহাদিগের সংখ্যা ও যজ্ঞের কৌটিল্য অনুসারে বৃদ্ধি পায়। সোমযজ্ঞে হোতা ও অধ্বর্য্যু, এই দুইজন পুরোহিতের আবশ্যক হইত—ক্রমে ব্রহ্মা ও উদ্গাতা আর দুইজন প্রধান হন এবং আর তেরজন তাঁহার সহযোগী হন। অবগজ অধ্বর্য্যুর সহকারী ছিলেন। যখনি অধ্বর্য্যু কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, হোতা তখনি অনুবাক্য এবং যাজ্যমন্ত্র পাঠ করিতেন এবং অধ্বর্য্যু "ওঁ শ্রাবয়" বলিয়া আদেশ করিবা মাত্র অগ্নিমিদ্ধ, অগ্নিমীড়, "অস্ত শ্রৌসৎ" এই বাক্যটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। রাক্ষসকর্ত্তৃক যজ্ঞ পীড়ন নিবারণ তাঁহার কর্ম্ম, এজন্য তিনি একটী দারুময় অসি গ্রহণ করিতেন—দ্বাদশটী কুশ দ্বারা সে অসিকে ত্রিসন্ধান বদ্ধ হইত। স্বিষ্টকৃৎ সমাপন পর্য্যন্ত তিনি অসি ত্যাগ করিতেন না। সোমযজ্ঞে অধ্বর্য্যু প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে সোমলতা সমাবেশ করিয়া রস পেষণ করিতেন—সোমরসের পবিত্রতা হেতু মন্ত্র পাঠ করা হইত। বসন্ত কালে সোমযজ্ঞ বিধেয় ছিল।

গোমেধ যজ্ঞে গরু বলিদান করিয়া সেই মাংস সকলে ভোজন করিতেন।

রাজসূয়, বাজপেয়, শূলগব প্রভৃতি যজ্ঞে গোমাংসের প্রয়োজন হইত। নগরের বাহিরে নির্জ্জনে স্থানে নিশীথ রাত্রে শূলগব যজ্ঞ সাধন করিতে হইত। সকল প্রাণীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে পুরুষমেধ যজ্ঞ করিতে হইত। পুরুষমেধ যজ্ঞে নরবলি দেওয়া হইত। বিভিন্ন জাতি

ব্যবসায় ও চরিত্রের একশত পঞ্চাশিতি লোককে একাদশ যূপে আবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন দেবতার নিকট উৎসর্গ করা হইত। চত্বারিংশ দিবসে পুরুষমেধ সম্পন্ন হইত।

জ্যোতিষ্টোম একটী প্রধান যজ্ঞ, ইহা সাত অংশে বিভক্ত। কেহ সম্পূর্ণ জ্যোতিষ্টোম করিত, কেহ একটী অংশ সাধন করিত।

আর্য্যঋষিগণের পরম প্রীতিপাত্র সোমরস। গন্ধর্ব্বমণ্ডলে সোমের জন্ম। ঋগ্বেদ সোম-গুণগানে পরিপূর্ণ, সোমপানে ঋষিগণ মোহিত হইতেন, সোম উৎসর্গ করিয়া দেবগণকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। সোমযজ্ঞ আর্য্যমণ্ডলে প্রধান উৎসব, উত্তরকুরুর প্রাচীন ব্রত। চন্দ্রালোকিত রজনী যোগে গিরি-দেশে আমূল সোমলতা উৎপাটন করিয়া, পত্রশূন্য করিয়া, ছাগবাহিত যানে গৃহে আনিতে হইত। যজ্ঞগৃহে তাহা যত্নে রক্ষা করিতে হইত। অনন্তর অধ্বর্য্যু শিলাপেষণ করিয়া ছাগলোমনির্ম্মিত সীবনীতে রক্ষা করিতেন। এবং সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক শোভিত-অঙ্গুলি-দ্বারা পুনরায় পেষণ করিয়া রস নিষ্কাসিত করিতেন—যব গোধূম ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গোচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে সেই রস পেয় রূপে পরিণত হইত।

অগ্নিষ্টোম সোমযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। কখন কখন জ্যোতিষ্টোম বলিলেই অগ্নিষ্টোম বুঝায়। জ্যোতিষ্টোমের আর যে কয়েকটী শাখার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা বিকৃত অগ্নিষ্টোম মাত্র। এই যজ্ঞের পূর্ণ নাম জ্যোতিষ্টোম—অগ্নিষ্টোম—সোমযাগ। যজমান প্রথমপ্রথমে সোম-প্রবাক নামে দূত প্রেরণ করিয়া শ্রোত্রীয়-দিগকে বরণ করিতেন। তদনন্তর দেবতা-দিগের মধ্যে পুরোহিত নির্ব্বাচন করা হইত। "অগ্নি আমার হোতা, আদিত্য, অধ্বর্য্যু, চন্দ্র, ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য, উদ্গাতা, আকাশ, জল, কিরণমালা—এই যজ্ঞে আমি এই সকল দেবতাকে পুরোহিত রূপে বরণ করি।" দেবপুরোহিত নির্ব্বাচিত হইলে নরপুরোহিত বরণ হইত। হোতাদি বরণ করিবার সময় যজমান আপন নাম ও গোত্র উল্লেখ করিতেন এবং দক্ষিণা স্বরূপে এক শত দ্বাদশটী গাভী দান করিবেন বলিয়া দিতেন। যজ্ঞে গাভী প্রভৃতি যে দশবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তাহাও বলিয়া দিতেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ পাঁচ দিনে সম্পূর্ণ হইত। প্রথম দিনে পুরোহিত বরণ, মধুপর্কদান, দীক্ষনীয় ও দীক্ষা ইষ্টি, দ্বিতীয় দিনে প্রয়োজনীয় বা সূচনা, সোম আনয়ন, অতিথ্য-ইষ্টি, প্রবর্জ্যা এবং প্রাতে ও বৈকালে দুইবার উপাসদ, তৃতীয় দিনে আবার প্রবর্জ্যা ও দুইবার উপাসদ, চতুর্থ দিনে অগ্নিপ্রণয়ন, অগ্নিসোমপ্রণয়ন, হবির্দ্ধান প্রণয়ন ও পশুবলি এবং পঞ্চমদিনে সোম-পেষণ, বিতরণ ও পান, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার, সমাপ্তি করিয়া স্নান করিলে যজ্ঞ সমাপন হইত। চতুর্থ দিবসের বলিদানের পশু যজমানের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইত। পশু বলিদান করা হইলে সে দেবসমাজে আসন পাইত—সুতরাং সে যাহার প্রতিনিধি, তিনিও দেবতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। দেবতুল্য পরিগণিত হইলে যজমান দেবগণের ন্যায় সোমরস-পানের অধিকারী হইতেন—সোমরস পান করিলে তাঁহার নূতন কায়ার উদ্ভব হইত। এইজন্য পশুবলির পরে সোমপান বিহিত হইয়াছিল। যখন হিন্দু ও পারসিক আর্য্যগণ একত্রে বাস করিতেন, তখনই অগ্নিষ্টোমের বিধান হইয়াছিল।

দর্শপূর্ণমাস ও অগ্নিষ্টোম আর্য্যসমাজের সর্ব্বপ্রধান যজ্ঞ। আর্য্যদিগের সামাজিক চরিত্র এই দুইটী যজ্ঞে চিত্রিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রধান প্রধান সকল যজ্ঞের প্রধানতঃ অংশ সোম অর্চ্চনা। এই লতা-নিঃসৃত অমৃতরসে আর্য্যবৃন্দের শুষ্ক ধমনী আনন্দে নাচিয়া উঠিত—সারি সারি পাত্র সাজাইয়া সোমরসে পূর্ণ করিয়া আর্য্যসন্তান বন্ধু বান্ধব লইয়া যখন একত্র হইতেন, তখন তাঁহাদের আনন্দ উছলিয়া পড়িত। দুর্ভাগ্যক্রমে সে ;সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল। বাস পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যসন্তান বিদেশে বিদেশে নূতন আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইলেন। জন্মভূমির মমতা পরিহার করা সহজ নহে—যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, আবার অদৃষ্টের কঠোর কশাঘাত স্মরণ করিয়া জলভরা চোখে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। বিশ্বামিত্র আপন জ্ঞাতিবন্ধু লইয়া নবনিবাস আবিষ্কার করিতে বহির্গত হইলেন—সে কতদিনের পথ, কোন পথে, বিপদ কত, কেহ জানিত না। ভরসা, আর্য্যের অগ্নি বিশ্বানর ; ভরষা, আর্য্যের আর্য্যশোণিত, ভরসা, আর্য্যের অব্যর্থ শর সন্ধান। সংবাদ আসিল, বিশ্বামিত্র যে দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কুরু হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ তখন কণ্ব আপন জ্ঞাতি গোত্র লইয়া সেই দিকে ধাববান হইলেন, কাণ্বের পর গৌতম, বামদেব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও অঙ্গীরস আপন আপন দল লইয়া কেহ পুরাতন পথে, কেহ নূতত পথ আবিষ্কার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ প্রবেশ করিলেন। সপ্তসিন্ধুর বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন আর্য্যনিবাস সংস্থাপিত হইল। গোচারণ ভূমির অভাব নাই, প্রাচীন অধিবাসীগণ দস্যুপ্রকৃতির হইলেও আর্য্যসন্তান বাহুবলে তাহাদিগকে শাসন করিতে সক্ষম। অবাব কিছু ছিল না, শুধু একমাত্র নিদারুণ অভাব, আর্য্যাবর্ত্তে সোমলতা জন্মে না। সোমরস আর্য্যের প্রাণ—সোমরস বিহনে আর্য্যহৃদয়ে সুখ নাই। অনেক যত্নে বহু ব্যয়ে গান্ধারীদিগের সহিত বিনিময়ে আর্য্যসন্তান সোমলতা লাভ করিতেন। কোন প্রকারে কয়েকটী লতা সংগৃহীত হইলে প্রাচীন স্মৃতি হৃদয়-বেলা আলোকিত করিত—আবার জ্ঞাতি বন্ধু সকলে তেমনি একত্র হইয়া তেমনি ভাবে বসিয়া সেই প্রাচীন সঙ্গীত, যাহার কলনাদে কুরুমণ্ডল আর্য্যবাস কল্লোলিত হইত, সকলে সমস্বরে সেই প্রাচীন সঙ্গীত গান করিতেন—যে সঙ্গীত ঋগ্বেদ সূক্তের পূর্ব্বতন, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যনিবাসের বহুপূর্ব্বে রচিত, হিন্দুপারসিক নানা বর্ণ আর্য্যের পৈত্রিক সম্পত্তি। আর্য্যাবর্ত্তে সোমলতা সহজে সংগ্রহ হইত না বলিয়া আর্য্যসন্তান উৎসব মাত্রে সোমলতা সংগ্রহ করিতেন—সোমরস না হইলে আর্য্যের যজ্ঞ পূর্ণ হইত না।—হিন্দু আর্য্যের যজ্ঞের প্রাণ সোম, পরশিক যজ্ঞের প্রাণ হোম। (ক্রমশঃ)

৩

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।—রাজা রামমোহন রায়ের পরে বিদ্যাসাগর ও ভূদেব বাবুর মত লোক বাঙ্গালা দেশে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বিদ্যাসাগর হৃদয়ের গুণে বাঙ্গালীর প্রধান এবং ভূদেব বাবু মনস্বিতায় বাঙ্গালীর রাজা। তাঁহার পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহাকে রঘুনন্দনের সমকক্ষ বলিয়া বোধ হয়।

ভাবুকতা ভূদেব বাবুর সামান্য ছিল না

একদিন আমার সম্মুখে পণ্ডিত বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় এই গানটী ভূদেব বাবুকে গাহিয়া শোনাইতেছিলেন। গানটী পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের রচনা।

কেবা ভালবাসে বল গগনচন্দ্র সুধাকরে
কেবা ভালবাসে বল খলধর্ম্ম বিষধরে ?
কেঁদে শিশু আকুল হ'লে
আয় চাঁদ চিক্ দেযা ব'লে
মায় ভুলায় তায় অবোধ ছেলে
ধরিতে চায় চাঁদ কমল করে॥

"অবোধ ছেলে—"ইহা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় আনন্দ হইয়াছিল। আনন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "অবোধ" এই বিশেষণটী বড় সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। শিশু মাত্রেই অবোধ, কিন্তু এখানে প্রয়োগে কিছু বৈচিত্র্য আছে। কুমুদ চাঁদকে ধরিতে পারে, কমলে চাঁদের আসক্তি নাই, সুতরাং কমলকর বাড়াইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা নিতান্ত অবোধের কাজ।

হার্মিটেজ
কটক } সংগ্রাহক ও প্রকাশক—
শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী।

সৃষ্টিতে মানবের বিশেষত্ব।

১। নিজ গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া বিদেশে যাওয়া আমার ভাগ্যে বিশেষ ঘটে নাই, কিন্তু যাহাদের মধ্যে বাস করি, তাহাদের অনেকেই নানা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে নানা স্থানে যাতায়াত করে। আমার জীবন-সূর্য্য প্রায় অস্তমিত। আর কয় দিনের জন্য এ ভববন্ধন, তাহা শুধু সেই অন্তর্যামীই জানেন। প্রতিবেশী রায় মহাশয় অল্পদিন হইল সপরিবারে গ্রামস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোক সহ শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। রেল পথে না গিয়া তিনি জাহাজে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে সমুদ্রের বর্ণনা শুনিয়া সহধর্ম্মিণীরও সমুদ্র দেখার তীব্র বাসনা জন্মিয়াছে, নিজেরও যে সে ইচ্ছা নাই, তাহা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু জীবনে কখনও কোথাও যাই নাই। সেজন্য মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়াছিলাম। সহসা গতকল্য গুরুদেবের শুভাগমন হইয়াছে পত্নী নিজ মনোবাঞ্ছা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন যে, সমুদ্রের দৃশ্য একবার দেখা কর্ত্তব্য, সে দৃশ্য অতি মহান্ ও মনোরম। সে দৃশ্যে অনেক সময়ে অনেকের মনে সেই অনন্তরূপী ভগবানের যে আভাস আসে, নিজে না দেখিলে তাহার ধারণা হয় না। সে জন্য সঙ্কল্প করিলাম, গুরুদেব সহ এবারে সস্ত্রীক কিছু ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আসিব। দিনও শেষ হইয়া আসিল, শুভদিন দেখিয়া সকলে জাহাজে আরোহণ করিলাম। দিবসের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা ও সে রাত্রি নদী অতিবাহিত করিতেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে শুনিলাম, আমরা সমুদ্রে আসিয়াছি। কিন্তু মিত্র বরুণ সহ পবনদেবের অত্যাচারে কাহার সাধ্য ক্ষুদ্র ক্যাবিনের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসে। এ দিকে সমুদ্রে আসিয়া সমুদ্র দেখিতে না পাইয়া আমার প্রাণের অস্থিরতা ক্রমেই অসহ্য হই।

উঠিতেছে। অবশেষে প্রায় দুপ্রহরের সময় দেবতাদ্বয় ক্রোধ হয় আমার কষ্ট দেখিয়া দয়া করিয়া শান্তভাব ধারণ করিলেন। তখন আর থাকিতে না পারিয়া গুরুদেব সহ তিন জনে একেবারে ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, জীবনে আর কখনও তাহার ন্যায় কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। ইহা ব্যতীত জীবনে আর কিছুই দেখিবার ছিল বলিয়াও বোধ হইল না। ভাবিলাম, সর্ব্বদর্শী ভগবান উপযুক্ত কারণেই দর্শন শক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত ব্যবহার করিয়াছি কি? যাহা, দৃশ্য শুধু তাহাই দেখি নাই; অদর্শনীয় পদার্থেই এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি শক্তির বৃথা পরিচালন করিয়াছি ইচ্ছা করিয়াই অন্ধ হইয়াছিলাম। অপরাধ কাহার? হায়! গুরুদেব কৃপা না করিলে সম্ভবতঃ ইহজীবনে আর এ শক্তির সদ্ব্যবহার হইত না।

পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ আশা করিয়া থাকেন যে, এইবার সেই বিশাল নীলাম্বু রাশির এক বিরাট বর্ণনা আরম্ভ হইবে, তাহা হইলে তিনি ক্ষমা করিবেন। কারণ সে অনন্তের বর্ণনা আর আমি কি করিব! আর আমার ন্যায় মুর্খের সে শক্তিই বা কোথায়? কত কত সরস্বতীর বরপুত্র কত ছন্দেবন্দে তাহার মনোহারিণী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার হৃদয়ে সেই মহানের যে ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, সে দৃশ্যে আমার অন্তর্দৃষ্টি উদ্ভাবিত করিয়া সেই অনন্তের যে আভাস আমার মনে আনিয়া দিয়াছিল, তাহাও আমি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে অক্ষম। বোধ হয়, তাহা অনুভব ব্যতীত অপরকে বুঝানও যায় না। দেখিলাম, সেই সুবিস্তৃত নিলাম্বুরাশির যতদূর পর্যান্ত দৃষ্টি যায়, শুধু বুদ্‌বুদে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে ইহা কখনও দেখি নাই। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, 'উহাকে বুদ্‌বুদ্ কহে। সহধর্ম্মিণী তখন বলিয়া উঠিলেন ওগো! যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে বুঝিয়া দেখ, গুরুদেবের উপদেশ সত্য কি না? গুরুদেবকে তখন সভক্তি প্রণাম করিয়া বলিলাম, আপনি যে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, অদ্য তাহা সফল হইল। দেখিতেছি, ইহাদের এই মহান্ সমুদ্র হইতেই উদ্ভব, অথচ ইহারা যে মহান্ হইতে পৃথক, ইহাদিগকে সমুদ্র বলা যাইতে পারে না। আবার দেখিতে দেখিতে ইহাদের কতশত প্রতিমূর্ত্তি এই মহানেই মিলাইয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ আমাদের জ্ঞাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও আমাদের অজ্ঞেয় কত কোটী কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সকলই কি সেই অনন্তের এইরূপ বুদ্‌বুদ্ নহে? সেই অনন্ত হইতেই উৎপত্তি, আবার সেই অনন্তেই লয়। সৃষ্ট হইয়া কোন একটী বুদ্‌বুদ্ যদি মনে ভাবে যে, সে কাহার ও অংশ নহে, সে কিছুহইতে উদ্ভূত হয় নাই, সে পুর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, মোট কথা সে স্বয়ং এক সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব, তাহা হইলে তাহার এইরূপ ধারণাকে কি অভ্রান্ত বলিব?

২। বিন্দু বিন্দু বারি-সংযোগে এই মহান্ সমুদ্র। প্রত্যেক বিন্দু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, সেই মহান্ সমুদ্রের অংশ। এ সমুদ্রের বারিতে হাঙ্গর মীনাদি প্রাণিগণ, নানারূপ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্‌গণ ও পর্ব্বতাদি নানারূপ দৃশ্যমান কঠিন পদার্থ

আছে। আবার লবণ ইত্যাদি অনেক প্রকার দ্রব্য এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, তাহার অস্তিত্ব সহসা অনুমিত হয় না। কিন্তু এ সকলের কোনটীকে কি বারিবিন্দুর ন্যায় সেই সমুদ্রের অংশ বলা যাইতে পারে? সমুদ্র থাকে বলিয়া এই সকলের তাহাতে বিশেষ কোন সুখানুভূতি আছে কি না, তাহা উহারাই বলিতে পারে। মহানের অংশ হওয়ায় যে মহিমা তাহা যে উহাদের ভাগ্যে ঘটে না, তাহা বোধ হয় নিশ্চিত। যাঁহারা ঈশ্বরে মিলিত হইতে অসম্মত হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যের প্রয়াসী, তাঁহাদের দশাও কি ঐরূপ নহে?

৩। দেখিতে পাই, যে কোন কারণেই হউক, সেই বারি বিন্দু সকল সময়ে সময়ে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া সেই মহান্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই বিচ্ছিন্নতা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই, বুঝি বা, শক্তিওনাই। বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত হাসিতেছেন। কিন্তু কারণের কারণ ও তাহার কারণ, এইরূপ পর পর কারণ জানিতে চাহিলে কারণ নির্দ্দেশ হইতে পারে? সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, সেই মূল কারণকে যত দিন না জানা যায়, তত দিন এ সকলের কারণ জানিবার শক্তি বোধ হয় থাকে না। আপাততঃ তাহা জানিতে না পারায় কোন ক্ষতিও নাই, বোধ হয়, ইহা সেই অনন্তেরই লীলা, এইরূপ একটা ধারণা করিলেই যথেষ্ট। বিন্দুগুলি ঐরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথমতঃ দিক্‌দিগন্তে ছুটিতে থাকে। ক্রীড়ার অন্তে বা ক্রীড়ান্তে যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন পুনরায় স্বস্থলে আসিবার বাসনা হয়। প্রথমটী যেরূপ সহজ, দ্বিতীয়টী তাহা নহে। যদি কেহ বলেন এ কিরূপ কথা? ভগবান লীলাস্থলে নিজ অংশ পৃথক করিয়া পুনরায় তাহা মিলিত করিতে যদি না পারেন, অথবা সহজে তাহা করিতে গিয়া তাঁহাকে কোনরূপ বেগ পাইতে হয়, তাহা হইলে আর তিনি সর্ব্বশক্তিমান কিসে? সম্পূর্ণ অক্ষমতা ভগবানে অসম্ভব, তবে তাঁহার কার্য্য সময় সাপেক্ষ হইতে পারে। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

(১) শতাধিক অত্যুজ্জ্বল কিরণদায়ী মনোহর কান্তিবিশিষ্ট শুক্তির মালা রাজকুমারের গলায় পিতা আদরে পরাইয়া দিয়াছেন। রাজকুমারের সে মালা পাইয়া কতই আনন্দ। এই আনন্দদায়িনী সুন্দর মালাটী আমার, ক্রীড়ার সঙ্গী অপর বালকগণের ইহাতে বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। ইহার একমাত্র মালীক আমিই। এই আনন্দে অধীর হইয়া রাজপুত্র মালাটী লইয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার বন্ধনী ছিন্ন হইয়া শুক্তিগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, স্থানটীও তত পরিষ্কার ছিল না। রাজকুমার অতি দুঃখিতান্তকরণে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যতদূর পারিলেন, শুক্তিগুলি একটী একটী করিয়া সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার একটী না মিলায় রাজাকে জানাইলেন। রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, মন্ত্রী অধীনস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে একত্র করিয়া বহু অনুসন্ধানে অবশিষ্ট শুক্তিটীর উদ্ধার করিলেন। সুতরাং দেখা গেল, শক্তি থাকা সত্ত্বেও কার্য্যটীতে কাল গৌণ হইল ও পরিশ্রম লাগিল। (২) আমার "পরিবারে" অনেক লোক, যদিও আমিই তাহার কর্ত্তা। পিতার অংশে পুত্র, দয়াময়ের কৃপায় তাহারও কয়েকটী

পাইয়াছি, এতদ্ব্যতীত ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রগণও আমার এই পরিবারের অংশ। কারণ তাহারা সকলেই আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা একত্রেই আছি এবং ইহাদিগের সকলকে লইয়াই আমার এই পরিবার। সকলেই আমাকে তাহাদের কর্ত্তা বলিয়া মানে এবং আমার ইচ্ছামতই এ পরিবারের কার্য্য পরিচালিত হয়। নিজে চিরদিন একস্থানে বাড়ীতেই থাকি। ছোট পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটী আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়; সে কারণে তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তারাল করিতে না পারিয়া বাড়ীতেই সর্ব্বদা নিজের নিকট রাখি। অপর পুত্র, ভ্রাতা ও তাহার অপর পুত্রগুলি কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থানে থাকে। এইরূপে দিন কাটাইতে কাটাইতে শেষের দিন প্রায় উপস্থিত। তাই এবারে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, জগদম্বার রাঙ্গাচরণ একবার শেষ নিজ বাড়ীতে দেখিয়া যাই। বিদেশস্থ সকলকেই নব বর্ষের প্রথম হইতেই এ বাসনা জানাইয়া পূজার সময় উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিয়াছিলাম। কেহ সহজেই আসিয়াছিল। কাহাকেও বা সাধ্য সাধনা করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কাহারও ছুটী মঞ্জুরীর জন্য নিজেকেও অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, যে কোন প্রকারে সকলকেই একত্রিত করিতে পারিয়াছিলাম, ইহাই আনন্দের বিষয়। (৩) কার্য্যবশতঃ বাড়ী হইতে অন্যত্র আসিতে হইয়াছে। বিদায়কালে অর্দ্ধাঙ্গিণীর কাতরতায় অঙ্গিকার করিয়া আসিয়াছি, অতি সত্বর কার্য্য সমাধা করিয়া ২।৩ দিন মধ্যেই ফিরিব। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তথাপি প্রত্যাগমনের উদ্যোগও করিতে পারিলাম না। আপাততঃ দেখিতে পূর্ণ নিজ শক্তির পরিচালনেই যদি এ ব্যতিক্রম হইতে পারে, তবে অংশের যে ব্যতিক্রমে না ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুধীগণের মনে হয়ত তর্ক উঠিয়াছে যে, এ কিরূপ উদ্ভট উদাহরণ? ক্ষুদ্র মানুষের শক্তির সহিত সেই অনন্ত শক্তির তুলনা! পরে বলিতেছি। অংশের ধর্ম্ম পূর্ণতেও বিদ্যমান না থাকিয়া পারে না।

৪। অনন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অংশ রূপেস্থিত যাবতীয় দৃশ্যমান সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব যে অনন্ত হইতে আপাততঃ পৃথক, তাহা বলিলে বোধ হয় কিছু অসঙ্গত বলা হয় না। তর্ক হইতে পারে যে, তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতে হয় যে, যতদিন এই অংশগুলির পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, ততদিন তিনি পূর্ণ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণের ধারণা সেরূপে করিলে চলিবে না। অংশ যেখানে যে ভাবেই থাকুক না কেন, তিনি সেইখানেই বিদ্যমান। যেমন ভারত-সৈন্যদল (Indian Army) বলিলে যে সৈনিক সমষ্টি বুঝায়, তাহা সর্ব্বদা একত্রে একস্থানে করে না, এমন কি, তাহার কোন অংশ নিজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া এক কালীন সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশেও যাইয়া থাকে। তথাপি তাহারা সেই ভারত-সৈন্যদল (Indian Army)। আর এক তর্ক উঠিতে পারে যে, অংশগুলি যতদিন বা যে সময় পর্য্যন্ত পৃথকরূপে অবস্থিতি করে, সে সময় পর্য্যন্ত তাহাদের শক্তি হইতে সর্ব্বশক্তিমান বঞ্চিত থাকেন। এ ধারণাও ঠিক নহে। কারণ অংশের শক্তি তাঁহার শক্তি হইতে পৃথক নহে। শুধু সমষ্টিভাবে না থাকিয়া—বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতির

কারণ নাই। যেমন পুর্ব্বোক্ত ভারত সৈন্য দলের সৈন্যগণ নানাবিভাগে ভাগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলেও ঐ সৈন্যদলের নিরূপিত কার্য্যের কোন রূপ বিঘ্ন হয় না, সেইরূপ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কার্য্যেও কখনও শক্তির অভাব হয় না। প্রতিমুহূর্ত্তে শত সহস্র বারিবিন্দু বাষ্পাকারে সমুদ্র হইতে পৃথক হইয়া যাইতেছে। সেই মহান সমুদ্রের শক্তির তাহাতে কি কোন হ্রাস দেখা যায়? অনন্ত হইতে কি পৃথক হইয়া গেলে অনন্তের অনন্তত্ব নষ্ট হয় না। সুতরাং অনন্তের ক্ষমতার লাঘব হয় না।

৫। অংশ সসীম। পূর্ণ অসীম অংশের ধর্ম্ম পূর্ণতে না থাকিয়া পারেনা। কারণ এইরূপ সকল অংশ লইয়াই পূর্ণ। তাই বলিয়া অংশ ও পূর্ণের সকল ধর্ম্মই যে এক, তাহা নহে। ইহা বুঝাইতে বোধ হয় বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিগত সৈনিক পুরুষ লইয়া যদিও একটী সৈন্যদল গঠিত হয়, তথাপি সেই সৈন্য দলের শক্তি ব্যক্তিগত সৈনিকের শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ এই শেষোক্ত শক্তি পূর্ব্বোক্ত শক্তির অন্তর্নিহিত। এমন কি, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিগত শক্তির অভাবে ঐ সমষ্টি শক্তির অস্তিত্বই থাকে না। যে দুই বায়ুর সম্মিলনে এক বিন্দু বারির উৎপত্তি, বিন্দু বিন্দু বারি সম্মিলনে যে অগাধ জলরাশির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেও তাহাই বিদ্যমান। কিন্তু এই বিন্দু বিন্দু বারি একত্রিত হইয়া যে মহান সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে, প্রবল বায়ু বেগে সেই সমুদ্রে যে প্রলয়কারী উত্তাল তরঙ্গ উঠে, কে বলিবে, সেই তরঙ্গের শক্তি ক্ষুদ্র বারিকণার শক্তির তুলনায় অসীম নহে?

৬। যাউক, যে কথা বলিতেছিলাম। পূর্ণ হইতে অংশের সৃষ্টি হইতেছে। অসীম হইতে অসীমের আবির্ভাব দেখিতেছি। আরও দেখিতেছি, এই অসীম বা অংশের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নহে। সহজে হউক কঠিনে হউক, আজি হইক কালী হউক, দুদিনে হউক—যুগযুগান্তরে হউক, এই অংশকে, এই সসীমকে সেই অনন্তে পুনরায় মিলিত হইতে হইবেই হইবে। নতুবা যে পূর্ণ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, অনন্তে বিয়োগ ঘটিবে। এই অংশকে চিনিতে পারার নামই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান স্থির হইলেই মুক্তি। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, বারিবিন্দুসকল খেয়ালের বশীভূত হইয়া স্ফূর্ত্তিতে প্রথমত অতি সূক্ষ্মরূপে দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া যায়। মনে করে না জানি, ইহাতেই চরম তৃপ্তি। কিন্তু কিছু কাল পরেই সে ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। তখন পুনরায় নিজ স্থানে যাওয়ার বাসনা তীব্র হয় এবং তখন হইতেই কিছু নরম হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু হায়, আসা যাওয়া এক কথা নহে। অথচ না গেলেও চলিবে না। স্বস্থান ও স্বরূপ ছাড়িয়া কতক্ষণ থাকা যায়! এই ফিরিবার আকাঙ্ক্ষাই—বোধ হয় মানব মনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি; ইহাকে সইচ্ছা, নৈতিকজ্ঞান, কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিবেক, ধর্ম্মভাব ইত্যাদি যে কোন নামেই অভিহিত কর না কেন, বস্তুত ইহার আবির্ভাব এই ফিরিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে। মনের অবস্থা সর্ব্ব সময়ে একরূপ থাকেনা। নানা কারণে তাহার বিকৃতি ঘটে। সে কারণে এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্ব সময়ে বিদ্যমান থাকে না। নানারূপ প্রলোভন তাহাকে চাপিয়া রাখে। যাহাদের মনে উহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, শুধু তাহারাই পথ খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাহা ধরিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়।

অন্যের যখন সে আকাঙ্ক্ষা মধ্যে মধ্যে এক এক বার মনে আসে, তখন কি করিলাম বলিয়া হায় হায় করে, আবার পরক্ষণেই প্রবৃত্তির বশে অন্যদিকে ধাবিত হয়।

৭। বিন্দু বাষ্পকণা গুলি নরম হওয়ার পর প্রথমতঃ বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। যে বিন্দুগুলির অদৃষ্টের বল অত্যন্ত বেশী, তাহারা সৌভাগ্য বশতঃ পুনরায় সমুদ্রে পড়িয়া সহজেই তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়। অবশিষ্ট গুলি নানারূপ পার্থিব পদার্থের সংস্পর্শে আসে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী যাহারা, তাহারা পতিতোদ্ধারকারিণী পুণ্যবতী গঙ্গা ইত্যাদি স্রোতস্বিনীর সাহায্যে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার আসিতে আসিতে পথে নানারূপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ও অন্যান্য প্রশস্ত জলাশয়, নদী নালা ইত্যাদিতে চলিয়া যায় এবং অনন্তে মিশিবার পূর্ব্বে আবার কত জন্ম জন্মান্তর অতিবাহিত করে। ইহারা নানারূপ আকৃতি বিকৃতি পাইয়া নানাস্থানে অবস্থানের পর অবশেষে সেই সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। কারণ, কে কবে দেখিয়াছে যে, তুষার চির কালই তুষার থাকে, কর্দ্দম চিরদিনই কর্দ্দম থাকে, তুষার গলিয়া কখনও জল হয়না এবং কর্দ্দম শুকাইয়া কখনও নীরস শুষ্ক মৃত্তিকায় পরিণত হয় না? অথবা অন্যান্য সরস পদার্থের রস চিরদিনই তাহাতে বর্ত্তমান থাকে, কখনও তাহার সহিত বিচ্যুতি ঘটেনা! যে কোন স্থানে যে কোন রূপে রস বিদ্যমান থাকুক না কেন, পরিণামে তাহাকে সেই সব রসের আধার সেই অনন্ত সমুদ্রে মিশিতে হইবে। নতুবা পূর্ব্বেই যে বলিয়াছি, বিন্দুমাত্রের অভাব হইলেও সেই অনন্তে বিয়োগ ঘটিবে।

৮। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, এই অংশকে চিনিতে পারিয়া সেই জ্ঞান দৃঢ় করিতে পারিলেই মুক্তি। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন বাষ্পে মেঘ বৃষ্টি তুষার দেখিয়া, মাটীতে নির্ম্মিত ঘট কলসি ইট কি দুর্গোৎসবের সিংহমূর্ত্তি দেখিয়া, বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তির যেরূপ তাহার প্রকৃত সত্বাতে ভ্রম জন্মে না, সেইরূপ এই দৃশ্যমান্য জগতের সর্ব্ববিধ সৃষ্ট পদার্থের মূলে সেই একই সত্বা যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। মায়া আমাদিগকে ঐ সত্বা ধরিতে দেয় না, বুঝিতে দেয় না। অজ্ঞান হইতেই এই মায়া। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই এই মায়া। সাধারণ জ্ঞানে যেমন মেঘ, বৃষ্টি ও তুষারকে এক বলিয়া বুঝিতে দেয় না, বিজ্ঞানের আলোক পাইলেই আবার সে অজ্ঞানতা দূর হইয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ, আমাদের সাধারণ জ্ঞানের উন্নতি করিয়া প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে পারিলে এই মূল সত্বাকে বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকৃত জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে মতভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকিতে পারে। যিনি সে পথ দেখিয়াছেন, যিনি সে পথের পথিক, সে কথা তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত যে উদ্ধার বা উপায় নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

৯। দৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই এক এই জ্ঞান হইলেই এ দুঃখ কষ্ট অশান্তি ইত্যাদি কেন যাইবে? ক্ষুদ্র বারিবিন্দু, অতি ক্ষুদ্র বালুকাকণা বা সূক্ষ্ম একটী আলোক রশ্মি হইতে আমি পর্য্যন্ত অনুভূত সমস্তই সেই অনন্তের অংশ, সেই অসীমের ভিন্ন ভিন্ন সসীম অবস্থা, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে তাহাদের মধ্যে মায়াজনিত বর্ত্তমানে

যে পার্থক্য জ্ঞান আছে, তাহা বিদূরিত হইবে। মনুষ্য-দেহ যে যে উপাদানে নির্ম্মিত, দেহান্তে সেই সেই উপাদান আবার মৌলিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে মাত্র। আবার সেই মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। এই জ্ঞান যদি আনিতে পারা যায় এবং সে উপাদানগুলিও অনন্তের অংশ এবং তাহা হইতে পৃথক নহে, এই ধারণা যদি দৃঢ় করা যায়, তাহা হইলে মানবের মৃত্যুতে শোক করিবার কি সঙ্গত কারণ আছে, জানি না। যদি স্বীকার করা যায় যে, এই সব মৌলিক উপাদানের সমষ্টি ব্যতীতও মানুষে আরও পৃথক কিছু একটা আছে, তাহার জন্যই বা আক্ষেপ কি? বিজ্ঞানের মতে কিছুরই ধ্বংস নাই, রূপান্তরিত হয় মাত্র। যিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ত কোন কথাই হইতে পারে না। পরম তিনি ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ঐ মানুষের আর যাহা কিছু, সেই পূর্ণের অংশ বইত নয়।

১০। পূর্ণ যদি লীলাচ্ছলে তাঁহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজ গরজেই তাহাকে পুনরায় মিলিত করিবেন। তোমার আমার এত মাথা ব্যথা কেন? পূর্ব্বে ক্ষুদ্র বালুকাকণাকেও ভগবানের অংশ বলাতে কেহ লেখকের মস্তিষ্কের সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছেন কিনা, জানি না। যে যাহাই মনে করুন, লেখকের বলার এ উদ্দেশ্য নয় যে, পুনর্মিলনের পূর্ব্বে বালুকাকণা চিরদিনই বালুকাকণা থাকে, অথবা বারিবিন্দু চিরকালই বারিবিন্দুরূপে অবস্থিতি করে। অংশরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া কোন অংশ পুনরায় মিলিত হইবার পূর্ব্বে কতরূপ যে ধারণ করে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? "Like to the like shall fly" সমানে সমান মিশিবে, যে যাহার সে তাহার সহিত মিলিত হইবে। তুমি আমি বলিলেও হইবে, না বলিলেও হইবে। তবে দু'দিন আগে আর পরে, সহজে অথবা বিলম্বে। তাঁহার অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বাধ্য হইয়া অংশরূপে স্থিত ক্ষুদ্র বালুকাকণাকে রূপের পর রূপ ধরিয়া অবশেষে সেই অনন্তরূপীর নিকট পৌঁছিতে হইবেই হইবে। কিন্তু হায়, কে জানে তাহা কত যুগ যুগান্তর পরে ঘটিবে। নিজের অংশ ছাড়িয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা। কিন্তু উপায় কি? সকলই নিয়মের অধীন। ধ্বংসের অপরূপ অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলতা! লীলাচ্ছলে একবার যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিবিধান নিয়মের বশীভূত হইয়াই করিতে হইবে। নতুবা বিশৃঙ্খলতা যে আরও বৃদ্ধি পাইবে। দূতকে শত্রুরাজ্যে পাঠান সহজ। কিন্তু তাহার প্রত্যাবর্ত্তন সকল সময় সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত নহে। বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরম সুখে থাকিবে আশায় পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষার্থে পরদেশে পাঠাইলাম। প্রত্যাগমনের সময় সহসা আন্তর্জাতিক সমর বাধিয়া আজি দুই বৎসর হইতে আসিতে পারিতেছে না। অবশেষে অতি কষ্টে ছাড়পত্র (passport) সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কোনরূপে দেশে আনাইয়াছি। সসীমের এই ক্ষণিক অশক্ততার ধর্ম্ম অসীমে না থাকিতে পারে কেন? অংশের ধর্ম্ম পূর্ণতেও বিদ্যমান থাকিবে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অংশের সমষ্টিতেই পূর্ণ, এককালীন অক্ষমতা পূর্ণে থাকিতে পারে

না! কারণ তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। যে কোন বিষয়ে অপূর্ণ থাকিলেই পূর্ণের ধারণার ব্যাঘাত হয়। আর ইহা অসম্ভব নয়। ৫/ মণ মাল লইতে এক ব্যক্তি সক্ষম হইভে না পারে। ১০ ব্যক্তি একত্রে তাহা অনায়াসে। লইয়া যাইতে পারে। এই লইবার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই কিছু না কিছু থাকিতে হইবে। কিন্তু এই সমবেত লইবার ক্ষমতা যাহা হইতে পারে, অংশে তাহা পারিয়া উঠে না। প্রবল সমুদ্র-তরঙ্গের অর্ণবপোত ধ্বংস করার যে ক্ষমতা আছে, একবিন্দু বারির সে শক্তি নাই সত্য। কিন্তু বিন্দু বিন্দু বারি সম্মিলনেই সেই তরঙ্গের উংপত্তি। আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষুদ্র বালুকাকণাকে নিরূপিত নিয়মের পথে চলিয়া চলিয়া অবশেষে সেই অনন্তে মিলিত হইতে হইবে। আমাকেও কতকটা সেইরূপ নিয়মের অধীনে থাকিয়া মিলিত হইতে হইবে সত্য। কিন্তু বালুকাকণা হইতে আমাতে এক পৃথক প্রবল শক্তি আছে, যদ্বারা ইচ্ছা করিলে আমি সেই নিয়মের অনেকটা সংক্ষেপ করিতে পারি। তাহার বলে ইচ্ছা করিলে আমি আমার মিলনের পথ সহজ ও কাল সংক্ষেপ করিতে পারি। আর যদি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উপযুক্ত পথ পরিত্যাগে বিপথে চলিতে থাকি, তাহা হইলে আমার দশাও সেই বালুকাকণা হইতে কোনরূপে পৃথক হইবে না। করুণাময় কৃপা করিয়া শক্তি দিয়াছেন। ইচ্ছা হয়, তাহার সুযোগ লও, না হয় নিজবাড়ী ঘর ছাড়িয়া পরের দেশে যুগযুগান্তর বৃথা ঘুরিয়া মর।

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

একখানি পত্র।

* * *

পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের চরিত্র-চিত্র যাহা নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে অনেক বার পড়িয়াছি। আপ নি আমাদিগকে বড়ই ভালবাসেন, স্নেহ করেন। আপনার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের যোগ্য পাত্র হইতে পারি, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

ভাই দেবকুমারের দ্বিজেন্দ্রলাল বাহির হইয়াছে। পুস্তক খানি খুব বড় হইলেও নানা ভাবে নানা স্থানে অসম্পূর্ণ। স্থান বিশেষে, নীতি বিষয়ে দেবকুমার যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। দেবকুমার এই জীবনী রচনায় পরিশ্রম করিয়াছেন, ভাষা অনেক স্থানেই সুন্দর, সরল ও সুবিন্যস্ত, তবে, পুনরাবৃত্তি, অসঙ্গত বাহুল্য-বিস্তারে পুস্তকখানি দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গত বাদছাদ দিলে, আরও effective হইত। এ পুস্তক খানি সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। অবশ্য তাহা নব্যভারতেই প্রকাশিত হইবে। ঘটনাবলির বিবৃতিতেও ভুল চুক আছে; সে গুলি দেখাইয়া দিলেই দ্বিতীয়

সংস্করণে সংশোধিত হইবে। আমার এই প্রস্তাবিত সমালোচনায়, অবশ্য যাহা নব্যতারতেই প্রকাশিত হইবে, অনেক নূতন কথা, নূতন তথ্য, বিবিধ বিষয়, বিবিধ মন্তব্য বিন্যস্ত হইবে, সেই সঙ্গে—অগ্রজ মহাশয় (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুর) কথা এবং অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ ও প্রকৃত সচ্চরিত্র বন্ধুবর্গের কথা পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন।

গত তিন চারি সংখ্যা নব্যভারত বড়ই উচ্চদরের—বড়ই সুন্দর হইয়াছে। আমি নব্যভারত খানিই পড়ি, কারণ ইহাতে প্রাণ আছে, সার আছে, সুতরাং সৌন্দর্য্যও আছে।

ঘুষের কথা লিখিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে। উৎকোচে যেন দেশটা ছাইয়া গিয়াছে। আমরা ওকালতী করি—নানা লোকের সংঘর্ষে আসিতে হয়। ঘুষ নেওয়াটা যেমন দোষ,ঘুষ দেওয়াটা তদপেক্ষকম দোষ নহে। পাঁচশো, ছশো, আটশো টাকার বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারীরা যদি ঘুষ নেয় এবং এই ঘুষের সরবরাহ বন্দোবস্তে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যবহারজীবী—তথা-কথিত দেশের নায়ক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ যদি লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে স্বায়ত্ব-শাসনই বা করিবে কে ? Responsible Govt বা কোথা হইতে আসিবে ? অর্থাকাঙ্ক্ষা এতদুর প্রবৃদ্ধ—অর্থাগমে সকল দোষ ঢাকিয়া যায়, এই বিশ্বাস এতদূর প্রবল হইয়া পড়িয়াছে,—চরিত্র-নীতির আদর্শ এতই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, বিশিষ্ট উন্নত চরিত্রের জীবন-ধারণ নিতান্তই কষ্টের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে যাও, সেখানেই ঘুষ—আইনকানুন ব্যাপারে ঘুষ, আদালতে ঘুষ, বিচার-বিভ্রাটে অনেক সময় এ ঘুষের জয়।—তথাকথিত সাহিত্যিক,চরিত্র থাকুক আর নাই থাকুক, যাহাকে দু পয়সায় কেনা যায়,দুপয়সায় বেচা যায়,পাণ্ডিত্য,চিন্তাশীলতা, সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন নাই. সংযমের ধার দিয়াও যাঁহারা যান না, উপস্থিত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা যাঁহাদের জীবনের মুলসূত্র বা মুলনীতি,এই তথাকথিত সাহিত্যিক কর্ত্তৃক সাহিত্য-সুসেষ্ঠব সম্পন্ন হইবে, যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। দারিদ্র্যে নুইব না, চরিত্র-বল হারাইব না, ইন্দ্রিয়-তাড়নে সংযমী হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব, সর্ব্বভূতে প্রীতি-সম্পন্ন হইব, মদ্যপান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিব, লোকের দুঃখ দুর করিতে যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, বিলাস বাসনা পরিহার করিব, এই সব যদি প্রতিজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে, রাখে রাম তো মারে কে ? আর যদি নিজের স্ত্রী, নিজে ছেলে মেয়েই আমার যথাসর্ব্বস্ব হয়, দুনিয়া চুলোয় যাক, আমার মোটর হউক, আমার ভাণ্ডার সদাসর্ব্বদা পূর্ণ থাকুক, বাড়ীখানি বিলাসে ভরপূর হউক, এই যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে দালালের সাহায্যে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন, উৎকোচে হাকিম বশ করে মামলা জেতা এবং হেয় ব্যবসার প্রসার হইবেই হইবে।—এখন সরল সোজা নির্ভীক কথা নাই, ভাষা দাঁড়াইয়াছে ব্যাকাচোরা ফ্যানান (যাহাকে ইংরাজিতে বলে টিউমিড (tumid), মনের জোর নাই, চরিত্র-বল নাই, একান্ত কোন বিষয়ে আগ্রহ নাই, আছে কেবল মাত্র ভরসা, সাহিত্যে বিশেষণ ও উপমা এবং আছে চালাকি, কপট শিল্পনৈপুণ্য, ভাষায় প্যাঁচের উপর প্যাঁচ—নিতান্ত সোজা ভাবকে

জোর জবরদস্তি করে জটিল করে চমক লাগানের চেষ্টা। এখন আর্ট (Art) আর আর্ট নাই, আর্ট আর্টিফসে (Artifice) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জীবনে উচ্চ আদর্শ নাই, সুতরাং সংযম নাই, ভাব-সম্পদ নাই, সুতরাং শব্দ-সম্পদের প্রতিষ্ঠা—নিজের মাল মসলা নাই,যাহা ছিল ফুরাইয়া আসিয়াছে, অথচ একটা নূতন কিছু করিতে হইবে,চমক লাগাইতে হইবে, তাই ইবসেনের অনুকরণে "ঘরে বাহিরের" আবির্ভাব। পুরাণ স্বামী, পুরাণ স্ত্রী ভাল লাগে না। অবাধ ইন্দ্রিয় লিপ্সা চাই, অবাধ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ চাই, তাহা না হইলে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইবে, Individualism নিভিয়া যাইবে, যাহা একশো লোকের মধ্যে ৯৬ জন দোষ বলিয়া ভাবিত এবং ভাবিয়া থাকে, এখন সেটা গুণ প্রতিপন্ন করিয়া আর্টের সৃষ্টি ও অবতারণা, সামাজিক অশুভ ও অসুখের প্রতি লক্ষ্য নাই, নীতি লুপ্ত হউক, ঘরে বাহিরে অশান্তির সৃষ্টি করুক—ক্ষতি কি, একটা নূতন কিছু করিলাম, চমক লাগাইয়া দিলাম তো। আর যাহারা দুর্নীতিপরায়ণ, ভ্রষ্টচরিত্র, তাহারাও ব্যভিচারে অনাচারে, ক্ষণিক সুখ পাইলেও উগ্রতর আনন্দ সম্ভোগ করিয়া বাহবা তো দিবেই। বটেই তো কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করিয়াই তো দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে—বাপমাকে মানিব না, স্বামীর বিধি নিষেধ মানিব না, সমাজের বিধি নিষেধ মানিব না? যে পথ দিয়া চিরদিন গন্তব্য সুখময় স্থানে পৌঁছিয়াছি, দেখে ঠেকে যে পথ—যে নিরাপদের পথ, চিনিয়া লইয়াছি, তাহা ছাড়িতে হইবে—তাহা না হলে একেবারে নিভে গেলে—এখন b:rtyর স্থানে L cen:e চাই,মদ খাওয়া, পরদার করা— মিথ্যা কথা কওয়া—এসব কার্য্যে দোষ কি? কাউকে লুকিয়ে চুরিয়ে তো একাজ করিতেছি না—যাহা করিতেছি,তাহা দোষ বিবেচনা করি না, তাহার প্রমাণ, আত্ম গোপন করি না। সে কাজ সকলের সামনে করি—এবং প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না—যাহা করি Openly ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নাই—একেবারে অনাবিল সরলতার অনাবিল পবিত্রতা একেবারে শুদ্ধমপাপবিদ্ধম—অন্যের পরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে নিজের দিকে টানিয়া আনিলাম সকলের সামনে—কোন লুকোচুরি নাই, নিজের স্ত্রীকে বলিলাম, তোমাকে পছন্দ করি না। যখন কথায় বা কাজে আত্মগোপন নাই, তখন আর দোষ কি? কি অপূর্ব্ব সরলতা কি?কি অপূর্ব্ব Individualism! স্ত্রীকে দুবেলা পদাঘাত করি—সকলের সামনে, কোন প্রকার লুকোচুরি নাই। আমার টাকা আছে, গায়ের জোর আছে, কারণ টাকা ও জমিদারী আছে। ইংরেজি ও জার্নি—পুঁথিগত বিদ্যাও আছে, আবার তাহার উপর আইন-ব্যবসায়ী, সুতরাং দেশোদ্ধারের নায়ক হইতে পারিব না কেন? সুতরাং Home rule চাই হোমকে rule করা কর্ত্তাকে rule out করা,স্ত্রীকে overrule করা এতো আমাদের আছে। তাহার উপর আমরা বিগতভী,একেবারে সর্ব্ব প্রকারে নির্ভীক যাকে বলে দুকাণ-কাটা, সুতরাং সহরের ভিতরেই মুখ ফুলাইয়া বেড়াইয়া থাকি এখন democracyর অবাধ প্রসারে—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হবার যো নাই। বিধিনিষেধ? কিসের বিধি-নিষেধ!! এখন Individualismর শঙ্খ, ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—সব উলটে পালটে দাও। তাহা হইলেই একটানা

উন্নতির দিকে সজোরে অবাধে চলিতে থাকিবে। বলিহারি যাই—Democracy, Home Rule, বলিহারি যাই স্বেচ্ছাচার ব্যভিচার "ঘরে বাহিরে"।—যেখানে Kant বলিয়াছেন ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন, morality"Immutable", সেখানে এখন নীচের (Neitzhe) নীচ মত, স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার,ভ্রষ্টাচার ঘোষণাওপ্রচার। Responsible Govt. চাও! আগে Responsible to God,Responsible toTruth,Responsible to morality, Responsibie to Govt. হও তা হলে Responsible Govt. আনন্দ সুখ প্রফুল্লতা বিতরণ করিবে। যাহারা নীতির পক্ষ, ধর্ম্মের পক্ষ সত্যের পক্ষ, সংযমের পক্ষ, তাঁহারা এই লেখকের সাহায্য করুন. নির্ভীক নব্যভারত-সম্পাদকের জীবনব্যাপী সাধনার সাহায্য করুন—ঘরে ঘরে বিধবাকে বিবাহ করিলেই দেশ উন্নত হবে না,বিলাতফেরতারা সমাজে থাকুন বা যান, এ আন্দোলনেও ফল হইবে না, জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্ম হইলেও দেশোদ্ধার হইবে না। হিন্দু ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টয়ান মুসলমান চরিত্রবান হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। যাহা আমার স্বর্গীয় ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রকে বলিতাম"—সমাজ সংস্কার,সমাজ সংস্কার? আগে নিজের চরিত্রের সংস্কার কর,তারপর সমাজের সংস্কার। দেশের লোক আগে মানুষ হ'ক,তাহা হইলেই সব সংস্কার সরল,সহজ হইয়া যাইবে। এই আমাদের মানুষ হইবার চেষ্টায়,হে ভগবান,তুমিই আমাদের সহায় হও, যেন আমাদের politico patriotism last refuge of scoundrelsয়ে দাঁড়াইয়া না যায়!

বিনীত—শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়

পৌরাণিকী। *

অভ্রভেদী হিমালয় স্নিগ্ধ ছায়াতলে
প্রকৃতির কুঞ্জ সম বিজন কানন।
সুগন্ধি কুসুম গন্ধে আমোদি আকাশ
বহমান গন্ধবহ; শ্যাম শষ্পরাজি
আরাম আসন বুঝি বন দেবতার।
চৌদিকে উন্নতশীর্ষ বট, শাল, তাল
রক্ষীসম জাগিছে সে রমণীয় বনে।
তরুশিরে মনোহর বিহগ কাকলি,
তার সনে নিঝরের কলতান মিশি
মধুর সঙ্গীত কিবা উঠিছে সঘনে?
চরিছে কুরঙ্গ যূথ আরণ্য কুঞ্জর,
তৃণাহারী অহিংসক শার্দ্দূল, কেশরী,
সুপুচ্ছ চমরী-কুল, নকুল, শশক,
সজারু, ভুজঙ্গ রঙ্গে করে বিচরণ।
মাঝে সে মানস সরঃ দিনঙ্গনা যেন
নীলকান্ত মণি-রচি বিশাল আরসী
রাখিয়াছে খুলি সেথা নীলজলরাশি
ছুটিছে চুমিয়া তট, ফেণ পুঞ্জ যেন
দ্রব হীরা-স্রোতঃ সম চলেছে ভাসিয়া!
কনক কমল কত রয়েছে ফুটিয়া,
আলো করি বনভূমি রূপের ঝলকে
শান্তি সনে পবিত্রতা মিশিয়া মিশিয়া
রয়েছে সে বন মাঝে, মরতে যেমতি
জননীর কোলে রহে যমজা কুমারী।
সেথা বসি ব্যাঘ্রাজিনে দেব পুরন্দর;
আবরিত বর বপুঃ গৈরিক বসনে,

* মহাভারত হইতে সংগৃহীত।

লেখিকা।

ধ্যানমগ্ন, রুক্ষ কেশ, রুদ্রাক্ষ ভূষণ,
যোগীবেশে ধর্ম্ম নিজে তপোরত যেন।
সহসা উজলি বন, বিজলীর সমা
অতুলা রূপসী দেবী পশিলা সেখানে
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে আনত আননা
নীরবে প্রতীক্ষা করি ধ্যান শেষ তরে।
কতক্ষণে সুরপতি গললগ্ন বাসে
উদ্দেশে প্রণমে নিজ পূজ্য দেবতায়
ভূতলে লুটায়ে শির। মেলিয়া নয়ন
চাহিতে বিশ্বের পানে যে দৃশ্য দেখিলা
চমকিত পুলকিত! কৃতাঞ্জলি পুটে
নিবেদিলা দেবরাজ গদ গদ ভাষে
"এতদিনে ভগবতি! পড়িল কি মনে,
পাপাত্মা অধম দাসে—তাই মা, আসিলে?
কাঁদে যথা ক্ষুদ্র শিশু জননীর তরে,
অমনি আকুলা মাতা আসেন ছুটিয়া,
দয়া করি কহ মাতঃ! দীন দয়াময়ি।
এত দিনে পাপ তাপ ঘুচিল কি মম?
উত্তরিলা মৃদুভাষে পীযূষভাষিণী
(বন্দিয়া দেবেন্দ্র পদ বিনত নয়নে)
"নহি আমি দেবরাজ তব আরাধিতা
মহাশক্তি মহামায়া, দেখ চাহি এবে
দেবোত্তম, দেববালা উপশ্রুতি আমি।"
নিরাশার দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে ত্যজিয়া
সুধিলা বিস্মিত শক্র "দেবী উপশ্রুতি
দেবগণ-বরণীয়া! কি কারণে আজি
এ বিজনে? তপোরত অনুতপ্ত চিতে
এবে আমি; কহ শুভে! কি আদেশ তব,
কিবা প্রয়োজন হেথা এ দীন তাপসে?
কহিলা বিনীতা দেবী "নিজ কাজ মম
নাহি কিছু, হে দেবেন্দ্র! ইন্দ্রাণীর সনে
আসিনু এ অসময়ে তোমার সকাশে।
"কোথা সুরেশ্বরী মম" সুধিলা বাসব,
কি হেতু স্মরিলা মোরে কহ ভগবতি?

অমনি হেরিলা ইন্দ্র, গজেন্দ্র গমনে
অমরার রাণী শচী আসে ধীরে ধীরে।
মুক্তকেশী, কৃশ তনু, আভরণ-হীনা,
কেবলি এয়োতী চিহ্ন রহিয়াছে করে,
কেবলি সিন্দূর বিন্দু সীমন্ত উজলে,
গৈরিকবসনা, মরি! পদ্মরাগ মণি
যেন ধূলা কাদা-মাখা, শৈবাল-জড়িত
নব কোকনদ যেন সরসী-সলিলে!
প্রণমিলা পতিব্রতা পতি পদ-তলে,
ভিজিল কপোল যুগ নয়ন-আসারে।
স্বাগত সম্ভাষি ইন্দ্র কহিলা "ইন্দ্রাণি!
কেন ত্যজি সুরপুরী তুমি এ বিজনে?"
আঁচলে মুছিয়া আঁখি দাঁড়ায়ে নিকটে
কহিলা বাসবপ্রিয়া (বীণা-বাণী যথা)
"একি বেশ হে দেবেশ অমর ঈশ্বর!
সত্যই সন্ন্যাসী তোমা দেখিলাম আজি?
ত্রিদিবের রত্নাসন সুখাসন যার,
ছত্রধারী চিত্ররথ, বিশুভ্র চামর
ব্যজনে নিরতা সদা বিদ্যাধরীগণ।
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে বিলেপন তরে,
আজ্ঞা মাগে কত জনে তৃষাকুল চিতে।
অহরহঃ দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব নিচয়
রহে ঘিরি, শশধরে নক্ষত্র যেমতি।
কহেন কমলাসন বেদ বিধি যত;
সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, মন্ত্রী গুরু নিজে,
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা বাহন যাহার।
অচলা কমলা গৃহে বাণী জ্ঞানাগারে।
নন্দন কানন মাঝে মধুর পবন
বহিয়া মন্দার গন্ধ নিত্য চিত্ত তোষে।
গায়ক কিন্নর যার নর্ত্তকী অপ্সরা,
অতুলা অমরাবতী যাঁর রাজধানী;
দিবানিশা মহোৎসব যে রাজভবনে;
শিব বিষ্ণু যেই জনে করেন রক্ষণ,
সর্ব্বলোক পূজ্য সেই ত্রিদশের পতি,

আজি কি দেখিনু তারে!—অশনি আঘাতে
কেন না শচীর বক্ষ গেল না বিদরি?
একাকী অরণ্য মাঝে শ্বাপদের সনে,
ফল পত্রাহারে তুমি দীন হীন সম!
রাহুগ্রস্ত রবি এযে, কহ সুরপতি,
এব্যথা অভাগী শচী সহিবে কেমনে?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী॥

সঙ্গণিকা।

(৪১)

হিন্দু ইউনির্ভাসিটীর অর্থ কাশীর একটী কলেজ, যাহা এখন এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে অভিলাষী হইয়াছেন! এত ডাক হাঁকের পরিণতি এইরূপ হইলে কে সুখী হইতে পারেন! এদেশের অনেক কাজই বরারম্ভ-লঘুক্রিয়ার পরিণত হইয়া থাকে। হায়রে পরাধীনতা!!

(৪২)

কলিকাতার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতি দেখিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? এখন সকলেই উদাসীনতার ক্রোড়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সুষুপ্তিতে ডুবিয়া যাইতেছেন। মতের স্থিরতা ও দৃঢ়তা যে জাতীয় জীবনে এখনও সম্যক বদ্ধমূল হয় নাই, সেখানে কিছু সুফলের আশা করিতে সঙ্কোচ হয়! চরিত্রহীনতা ভারতীয় জাতীয় উন্নতি-সমস্যার ঘোরতর অন্তরায়। হোম-রুল লিগের জন্য ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত কার্টিস সাহেবের কৌশল জাল ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইতেছি, কিন্তু হোম-রুল-লিগের পরিণতি কোথায়, তাহাই দিবানিশি ভাবিতেছি। ভারতের সকল অভাবের মূল চরিত্রহীনতায় নিবদ্ধ। সেই নেতা কোথায় লুক্কায়িত আছেন, যিনি ভারতের চরিত্র-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন? ভারত চরিত্রে যদি সমুন্নত হয়, আর কি কিছু অভাব থাকিতে পারে? আমরা দিবানিশি শুধু ইহাই ভাবিতেছি।

(৪৩)

"ছোট ও বড়" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তিনি মহৎ ব্যক্তি, ভারতের চরিত্র-সমস্যার যদি তিনি মীমাংসা করিতে পারেন, চিরকাল তিনি পূজা অর্চ্চনা পাইবেন। দেশে চাই নীতি, চাই ধর্ম্ম, চাই চরিত্র। তারপর আসিবে একতা। একতা ভিন্ন জাতীয় উত্থান অসম্ভব। পরশ্রীকাতরতা জাতীয় উত্থানের ঘোর শত্রু। "ঘরে বাইরের" ন্যায় পুস্তক লেখা ছাড়িয়া, জাতীয় উত্থানের জন্য স্যর রবীন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর হউন, তাঁহার লেখায় পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইবে। অন্তরীনদের হইয়া তিনি দুকথা সাহসের সহিত বলিতে পারিয়াছেন যখন, তখন জাতীয় উত্থানের মূল রজ্জুও তিনি আকর্ষণ করিতে পারিবেন, আশা হয়। হায়, কবি হেমচন্দ্র আজ কোথায়?

(৪৪)

এদেশের নিম্নশ্রেণী, চিরপদানত, চির-অস্পৃশ্য, চির-ঘৃণিত, চির-উপেক্ষিত। নেতা, তুমি যে দিন গ্রামে গ্রামে যাইয়

নিম্নশ্রেণীকে তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে, সেই দিন বুঝিব, তোমার জীবন ধারণ সার্থক। বৃথা বাক্যবিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া সংযম-সহায়ে পরিপন্থী শক্তিকে জয় করিতে বদ্ধপরিকর হও, জীবন সার্থক হইবে ও ঘুমন্ত ভারত আবার জাগিবে।

(৪৫)

ভারত-ষ্টেট-সেক্রেটারী কলিকাতায় আসিয়াছেন, ইহা কলিকাতার পরম সৌভাগ্য। ইংরাজ-গৌরবের উচ্চমুকুটধারী রাজধানী কলিকাতা আজ মৃতবৎ,—বাঙ্গালী ঘৃণা, বাঙ্গালী-পরিত্যাগ-মন্ত্র সর্ব্ব দেশে জাগিয়া উঠিতেছে—কলিকাতা মরণের পরিচর্য্যায় চিরঅভ্যস্ত হইতেছেন। এহেন কলিকাতায় তাঁহার পদার্পণ বড়ই আনন্দের কারণ। কিন্তু সেই আনন্দ কি কৌশল-জালে পূর্ণ? ভারতের বহিঃ-সীমা-সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্যই কি তিনি ভারতে আসিয়াছেন? না, ভারতকে কিছু অধিকার দিতে আসিয়াছেন? আয়র্লাণ্ড শতবর্ষে যে অধিকার পায় নাই, ভারত কি সহজে তাহা পাইবে? আমাদের যে পোড়াভাগ্য, আশান্বিত হইলেও আমরা ভীত! বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক—চির-দাসত্ব-মগ্ন জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হউক।

[৪৬]

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কীর্ত্তি অক্ষয় হইতে চলিয়াছে,—তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে সকলেই আনন্দিত। কিন্তু বৃক্ষের চৈতন্য প্রতিপন্ন করার অপেক্ষা মানবের উন্মেষের চেষ্টা ভাল নয় কি? সে জন্য সচেষ্ট কে? চেতনা থাকিতে যাহারা অচেতন, এহেন নিম্নশ্রেণীর জন্য কোন্ বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে? নিম্নশ্রেণীকে অচেতন রাজ্যে ফেলিয়া রাখিয়া যাঁহারা আরো উচ্চে, আরো উচ্চে উঠিতে চাহেন, তাঁহাদের বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রশংসা হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় শক্তির প্রশংসা হইতে পারে না। এদেশের গণ-তন্ত্র ঘোরতর অচেতনের রাজ্যে নিমগ্ন। কোন জগদীশচন্দ্র কি তাঁহাদিগের চৈতন্য প্রতিপন্ন করিতে এদেশে অগ্রসর হইবেন না? সহৃদয় বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র এই কাজে প্রবৃত্ত হউন না?

(৪৭)

এদেশের শিক্ষিত লোকের বুদ্ধি এবং প্রতিভার অভাব নাই, কিন্তু সহৃদয়তার যেন বড় অভাব দেখিতেছি। নিম্নশ্রেণীকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ক্রেডিট-ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিয়া লাভবান হইতেছেন, বহুদিন লিখিয়াও কঙ্গ্রেসকে এই কার্য্যে ব্রতী করা যায় নাই। আর্য্যসমাজ ভারতের একতার মুলমন্ত্র নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের জন্য কত কি করিতেছেন, কিন্তু কঙ্গ্রেস একাজে ব্রতী হন নাই। রামকৃষ্ণমিসন দরিদ্র-রক্ষায় বদ্ধপরিকর—কত শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেছেন, কিন্তু কঙ্গ্রেস এ কাজ হাতে লন নাই। শুধু কথায় চিড়ে ভিজে কি? কথা ছাড়িয়া কবে কঙ্গ্রেস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা শুধু তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আবেদন-নিবেদন রূপ ইন্দুরের পরামর্শের দিন এখনও অবশিষ্ট আছে কি? উঠ, জাগ, স্বকার্য্য সাধনে বদ্ধপরিকর হও।

(৪৮)

ছড়া।

চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায়, জোনাকী আলোক দেয়। সব বুদ্ধিমান উপেক্ষিত, চোরের আত্মীয় প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস।

প্রকৃতির রঙ্গভূমি সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির শান্তিময় নিকুঞ্জে কবিতা ছন্দ ও মাধুর্য্য নিত্য বিরাজিত। তাই শৈশব হইতে বাঙ্গালী জাতি কোমল মনোহর সুন্দর কবিতার অনুপ্রাণনে উন্মত্ত। বর্ত্তমান প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধানকারীগণ মহাকবি কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, এবং তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, একথা ঠিক হইলে বঙ্গভূমির অতীত গৌরব-কাহিনীর উপরে একটী হীরকস্তম্ভ গ্রন্থিত হইয়াছে, যাহার সৌন্দর্য্যে জগৎ মোহিত হইবে। নিম্ন-বঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, নিম্নবঙ্গ জাহ্নবী-গঙ্গাসাগর-সম্মিলনের একটী বদ্বীপ। সমুদ্রগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে ইহা মস্তকোত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেরও কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং কবে বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া নবসৌন্দর্য্যে জগৎ মোহিত করিবার জন্য উত্থান করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে শত বৎসর পূর্ব্বেই নিম্ন বঙ্গের উপর সমুদ্র-তরঙ্গ বিরাজ করিত, এরূপ কল্পনা ঠিক নহে। সহস্র সহস্র বৎসর এই বঙ্গদেশ ভারতের প্রাচ্য প্রদেশ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। মহাভারতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রদেশের নাম বিদ্যমান আছে। মৎস্য দেশ মহাভারতের এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তির নিকেতন।

নিম্ন বঙ্গের প্রাকৃতিক ইতিহাস যাহাই হউক, উত্তর বঙ্গ যে সমধিক প্রাচীন, এবং হিমালয়ের পাদদেশে বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত নানা প্রাচীন ঘটনাবলীর আকরস্থান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আসামের সহিত ভগদত্তের অসীম বীরত্ব-কাহিনী সংযুক্ত, মণিপুর বভ্রুবাহনের নামে গৌরবান্বিত, এবং বিরাটপর্ব্ব যে মৎস্য দেশে অভিনীত হইয়াছিল, সে মৎস্য দেশ যদি সদানীরা করতোয়া-বিধৌত বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় স্থাপিত হয়, তবে উত্তর বঙ্গ অর্ব্বাচীন নহে। প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণের যদি এ বিষয়ে মতভেদ থাকে, তথাপি পৌণ্ড্র-দেশ যে পালরাজগণের সময় হইতে মানব-ইতিহাসে গৌরবান্বিত, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের কুয়াসাময় যুগ যাহা সত্যমিথ্যা কল্পনায় বিরাজিত, তদপেক্ষা দৃঢ়তর ভূমিতে আমরা উপনীত হই, যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিধান ভারতে তাহার মহোজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন করিয়া তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, তাতার, বোর্ণিও সুমাত্রা, জাপান ও যবদ্বীপের সর্ব্বত্র তাহার মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল, তখন যে বাঙ্গালী তন্মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছিল, অতীত সাক্ষী ইতিহাস তাহা ঘোষণা করিতেছে। আজিও শ্যামদেশে বঙ্গীয় রাজবংশ বিরাজিত। এবং শান নামক বৌদ্ধ প্রচারকের কন্যার নাম হইতে শ্যামদেশ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্যাম দেশের ভাষা মধ্যে শতকরা ৩৫টী বাঙ্গালা শব্দ। আজিও জাপানের বৌদ্ধ-মন্দিরে বঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত শাস্ত্র বিদ্যমান আছে। সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে যব ও বলি দ্বীপে ভারতীয় বাঙ্গালী ঔপনিবেশিকগণের কার্য্য, বংশ ও ভাষার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজিও বাঙ্গালী পরিব্রাজক উক্ত দ্বীপ ও দেশ সকলে অতি সম্মান প্রাপ্ত হওয়ার কথা স্বর্গীয় পরিব্রাজক ৺শরৎচন্দ্র দাস রায় বাহাদুরের নিকট

শুনিয়াছিলাম। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাঙ্গালীর প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। সুতরাং বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালীর শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হইয়াছিল কিনা, বলা কঠিন।

শ্যাম দেশের ভাষা যদি বাঙ্গালা মিশ্রিত হয়, এবং ধর্ম্মাশোকের প্রচারকগণ কর্ত্তৃক যদি তথায় ঐ ভাষা বিস্তৃত হইয়া থাকে, তবে মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের সময় বাঙ্গালা ভাষা কোন প্রকারে বর্ত্তমান ছিল।

বাঙ্গালী রাজপুত্র বিজয় সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন, তথন সিংহলেও বাঙ্গালা ভাষার সংমিশ্রণ থাকা অসম্ভব নহে।

অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালী মৌলিক আর্য্যজাতি নহেন। দ্রাবিড়, তামিল ও আর্য্য জাতি মিশ্রণে এ জাতি উৎপন্ন। বাঙ্গালী মিশ্রজাতি। ঢেকি, কুলা, ধুচুনী প্রভৃতি কথা সংস্কৃত নহে, এইরূপ পরিভাষা সংস্কৃতের ভাষাভাষীগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। সুতরাং তথনকার ভাবা বাঙ্গাল ভাষা না হওয়াই সম্ভব।

বৌদ্ধধর্ম্ম পালিভাষায় প্রচারিত হইত! পালিভাষার সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ সম্বন্ধ, নিম্নে লিথিত হইল।

শীল পরিভাষিত সমাধি মহফ্ফল হোতি।
সমাধি পরিভাষিত পজ্ঞা মহফ্ফল হোতি।

পজ্ঞা পরিভাষিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্যতে।

শীল দ্বারা পরিব্যাপ্ত সমাধিতে মহৎ ফল হয়।
পমাধি পরিব্যাপ্ত প্রজ্ঞাতে মহৎ ফল হয়।

প্রজ্ঞা পরিব্যাপ্ত চিত্ত সমুদয় বিপদ হইতে মুক্ত হয়।

এথানে পরিভাষিত—পরিব্যাপ্ত, মহফ্ফল —মহৎফল, হোতি—হয়। পজ্ঞা—প্রজ্ঞা। সম্মদেব—সমুদয়। আসব—দুঃখ। বিমুচ্যতি —মুক্ত হয়।

যদিও ইহার ধাতুর পরিণতি সংস্কৃতবৎ, কিন্তু বঙ্গভাষা হইতে ইহা সংস্কৃত বহুল নহে। বরং প্রজ্ঞা স্থানে পজ্ঞা বঙ্গ সাধুভাষা হইতে নিকৃষ্ট।

ভবতি হইতে হোতি, উড়িয়া হউতির সহিত বাঙ্গালার হয় হইতে অধিক মিলে।

আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা পালি বঙ্গভাষার অতি সন্নিকট, নানক, কবির ফরিদা প্রভৃতির ভাষা ইহা অপেক্ষা কতদূর নিম্নে, উদাহরণ দেওয়া গেল।

আপিয়া ন যাই কীতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই।

তাঁহাকে স্থাপনা করা যায় না, কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেই নিরঞ্জন পুরুষ আপনা আপনিই রহিয়াছেন।

এথানে আপিয়া স্থাপন করা, ন যাই যায়না, কীতা কৃত নির্ম্মিত, ন হোই হয় না, আপে আপি আপনাআপনি, সোই তিনি।

ফরিদা, জঙ্গলু জঙ্গলু কিয়া ভবহি বহি বলি কণ্টা মৌউংহি, বসি রব হিয়ানি এ জঙ্গল কিবা ঢুংউঁহি।

ফরিদা, জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়া বনের কণ্টক দলন করিয়া কেন ভ্রমণ কর, হৃদয়ের মধ্যে তিনি আছেন, বনে কেন তাহাকে অন্বেষণ কর।

কবীর জিস্থু মরণেতে জগ ডরে মেরে মন আনন্দ। মরণে হিতে পাইয়ে পুরণ পরমানন্দ।

কবীর কহেন, যে মরণে জগৎ ভীত হয়, তাহাতে আমার মন আনন্দিত হয়। কেননা মৃত্যুর পর পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হইব।

আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা সমূহ তুলনা করিলে

মনে হয়, জননী সংস্কৃত ভাষা এক একথানি আভরণ উন্মোচন করিয়া তাহার কন্যাগণকে সাজাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গভাষাকে তাহার সুমধুর বীণাধ্বনি নূপুর নিক্কণ প্রদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া দিয়াছেন! বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় মধুর ভাষা জগতে অতি দুর্লভ। সকল প্রাকৃত ভাষার মধ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালাই বহু পরিমাণে সংস্কৃতমূলক। আসামী উড়িয়া, নেপালী ভাষা বঙ্গভাষারই কন্যা, কেবল উচ্চারণের পার্থক্যে উড়িয়া ও আসামী ভাষা বঙ্গভাষা হইতে ভিন্ন বোধ হয়. কিন্তু আভ্যন্তরিক বিশ্লেষণ করিলে ইহাদিগের একতা স্পষ্টই অনুভূত হয়।

অশোক রাজা মৌর্য্যবংশাবতংশ, তাহার সময়ই পালিভাষা বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মভাষা ছিল। এবং তাহাই সমস্ত চীন জাপান পূর্ব্ব উপদ্বীপ প্রভৃতিতে প্রচারিত হইয়াছিল।

তৎপরে গুপ্তবংশ দ্বয়ের সময়ে বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় নাই। বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীর রাজসভার অমর সভাসদ কলিদাস যদি প্রকৃতই বাঙ্গালী হয়েন, তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, তথনকার প্রচলিত সাহিত্য সংস্কৃত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা যে হয় নাই, তাহা বোধ হয় না। কালিদাসের সমসাময়িক বরাহমিহির, তৎপুত্রবধূ থণা গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। থণার বচন এক্ষণেও আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহা অতি সুন্দর গ্রাম্য প্রবচন সংগ্রহ। সুতরাং বরাহমিহিরের পুত্রবধূ কালিদাসের সমসাময়িক হইলে তথনও বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল। দুই একটী বচন আবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ডাকে পক্ষী না ছাড়ে বাসা, থণা বলে সেই সে উষা। রোচে পোচে থা. মন চলেত যা। কোদালে কোদালে আকাশের গায়, এলোমেলো বহে বায়, শোন শ্বশুর বাঁধ আইল, বৃষ্টি হবে আজ কাল।

পালরাজগণ বঙ্গদেশে অনেক দিন রাজত্ব করেন, পৌণ্ড্রদেশ তাঁহাদের রাজধানী ছিল, আমি পুণ্ডরিয়া নামক গ্রামে একবার গিয়া দেথিলাম, তথায় দেওয়া অর্থাৎ দেবপাল রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে, তথা ৭২ কাহারও মতে ৮৮টী দীর্ঘিকা আছে। সেদিন মাননীয় মিঃ মনাহান বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী তত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১ম মহীপাল রাজার সময়ে সেতিশা নামক বৌদ্ধ প্রচারক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ কবেন, এরূপ বলেন। তাঁহার জন্ম সময় ৫৮০। এই সালে প্রথম মহিপাল রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তান্ত্রিক ধর্ম্ম-সম্মিলন হয়, ও সাহিত্য ও স্থপতি বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়।

প্রকৃত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সেনরাজগণের সময়ে আরম্ভ হয়। প্রকৃত বাঙ্গালী জাতি সেই সময়ই গঠিত হয়। অশোক রাজার সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয়। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন! বঙ্গে জাতি নির্ণয় করা আজি কালি অতি কঠিন ব্যাপার ও তজ্জন্য অতিশয় বিবাদ বিসংবাদ দেথিতে পাই। কিন্তু একথা বলা অলীক গবেষণা নহে যে, বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে জাতিলোপ হইয়াছিল, তৎপরে সেনরাজগণ সময়ে জাতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, এবং যে জাতি যে ব্যবসা করিল, সেই জাতি বলিয়াই গণ্য হইলেন। তথন নূতন জাতিভেদ পত্তন হইল। আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। বল্লাল

কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করিলেন। লক্ষ্মণ ও দেবীবর ঘটক মেলবন্ধ করিলেন। তখন জাতিভেদ-হীন বাঙ্গালী আচারপূর্ণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মী হিন্দু হইলেন, পরে রঘুনন্দন আসিয়া মুড়া ও পোছা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র রাখিয়া আর সকল জাতি বিলোপ করিলেন। ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও অন্য জাতির দাসত্বে আর আপত্তি রহিল না।

সেনরাজগণ সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণের সহিত যে চিঠি পত্র চলিয়াছিল, তাহা সংস্কৃত, কিন্তু তখন যে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। মেল-বন্ধনকারী দেবীবর ঘটকের গুরু প্রভাকর শর্ম্মা। দেবীবর বলিলেন, "ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, কুল নাই প্রভাকর"। প্রভাকর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া শাপ দিলেন, ডাক দিয়া বলে প্রভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর। কুলজা গ্রন্থে এইরূপ অনেক বাঙ্গালা শ্লোক আছে, যেমন ধন্বন্তরী নাগের ঘা কি করবে তার বিষে। বালীর দত্ত কুলের কান্ধা, যার দুয়ারে হাতী বান্ধা। সুতরাং তখন বাঙ্গালা ভাষা কাথাপকথনে ও গ্রাম্য কবিতায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পালরাজ ও সেনরাজগণের সময়ে যত প্রস্তরফলক হয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কিন্তু তদ্দ্বারা এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে যে, বাঙ্গালা তখন গঠিত হয় নাই। সংস্কৃত দেবভাষা, সুতরাং যত পবিত্র অনুষ্ঠান, তাহাতে সংস্কৃত ভাষাই লিখিত হইত। এক্ষণেও তদ্রূপ রীতি আছে। লক্ষ্মণের সভাসদ জয়দেব এই সময়ে বসন্ত কোকিলের ন্যায় কবিতা-মাধুর্য্যে জগৎ বিমোহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কবিতা সংস্কৃত, বাঙ্গালা সংস্কৃত।

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন
কোমলমলয় সমীরে।
মধুকর নিকর কর করম্বিত
কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।

ইহা বাঙ্গালীর সংস্কৃত, এমন মধুর কোমল পদাবলী জগতে দুর্লভ।

চলসখি কুঞ্জং ইত্যাদি।

যেন মনে হয় জননী সংস্কৃত তাঁহার ওড়না ও কাচুলী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সাড়ী পরিধান করিয়াছেন, এবং নূতন বেশে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা বাঙ্গালী সরস্বতীরূপে জগৎ আলো করিতেছেন।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণেতে শুনলু
শ্রুতিপথে পরাণ না গেল।

যেন মায়ের নূতন মূর্ত্তি সংস্কৃত ছটা পরিত্যাগ করিয়া নবযৌবন-সম্পন্না কিশোরীর ন্যায় তালে তালে নৃত্য করিতেছেন।

লাখ লাখ যুগ হিয়ায়হিয়া রাখিনু
না বুঝিনু কৈছন ভেল।

সংস্কৃত ব্রজবুলীর মধুর বেশ ধারণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে লীলা করিবার জন্য মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও গৌড়েশ্বরের সভাকবি চণ্ডীদাসের মুখে আবির্ভূতা হইলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক কবি। তাহাদের পরস্পর সাক্ষাতের বিষয় বর্ণিত আছে।

বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ দরশনে
ভেল অনুরাগ।
চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে
ভেল অনুরাগ।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া একই সময়ে যাত্রা করিয়া পথে মিলিত হইয়াছিলেন। এ সাক্ষাৎ কার্লাইল

ও ইমার্সনের সন্দর্শনের সহিত তুলনীয়। এই দুই মহাজনের পরে শত শত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদানুসরণ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধকের ভগবৎ প্রেমকে মানবীয় মূর্ত্তি প্রদান করিয়া নায়ক নায়িকার প্রেমে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ কৃষ্ণ রাধার প্রেম তাঁহাদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। আকারে বৈষ্ণব কবিতা অতি বহুল। শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সমগ্র ইংরাজী কবিতার সহিত বৈষ্ণব কবিতার তুলনা করিয়াছেন।

এই সময়ে রাজনৈতিক বিপ্লব আসিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশকে পর্য্যুদস্ত করিল। সেনরাজগণের সময়ের সাহিত্যচর্চ্চা যেন ইন্দ্রদাবানলে থামিয়া গেল। মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মুসলমান অধিকারের পর ২০০ বৎসর বঙ্গ কি সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। তখন মুসলমান সাহিত্য আরবী ও পারস্য ভাষায় নিবদ্ধ ছিল। এবং দিগ্বিজয়ই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বক্তিয়ার খিলজি একটী বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করিয়া সকলের শিরশ্ছেদ করিলেন। পরে দেখিলেন, ওখানে অনেক কেতাব রহিয়াছে। একজন হিন্দুও সে সকল পুস্তক পাঠ করিবার জন্য পাওয়া গেল না, পরে জানা গেল সে একটী বিশ্ববিদ্যালয়। এইরূপ অত্যাচারেই হউক, বা হিন্দু বাঙ্গালীর প্রতি জেতাজিত ভাবের আতিশয্য হেতুই হউক, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য মূর্চ্ছিতভাবে অবস্থিত ছিলেন। এদিকে মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, ওদিকে শাক্তধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে আবার বঙ্গভাষার নবজীবন উন্মেষিত হইল। বৈষ্ণব কবিগণ আবার কবিতাময় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নে নিপুণ হইলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রমুখ শত শত কবিতা গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন চারিদিকে প্রচলিত হইল। এই কীর্ত্তনের অবশেষ আমাদের সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি বঙ্গদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি এই যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। আজিও এই মহাভারত ও রামায়ণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালীর অতি উপাদেয় ধর্ম্মগ্রন্থ। কবিকঙ্কণ চণ্ডী অতি কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ, শাক্তগণ যাহা আনন্দে পাঠ করিতেন এ সমস্ত হইতে কত যাত্রা, পাঁচালী, রামায়ণগান সমস্ত বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এবং এই সমস্ত মহৎ-চরিত্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি শিরায় প্রতি ধমনীতে প্রতিফলিত হইতেছে। মনসার ভাসান আর একখানি গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গে বিজয় গুপ্ত ও বগুড়ার জীবন মৈত্র এবং দেশে ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও নবীনীকৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সত্যদেবের পাঁচালী বা সত্যপীরের সিন্নি, শনির পাঁচালী, প্রভৃতি বহু গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। তখন ছাপা প্রচলিত ছিল না, এজন্য গৃহে গৃহে এ সমুদয়ের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচিত ছিল। কিন্তু মৌলিক গ্রন্থ রচনা না করিয়া অনেকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণে সুপটু ছিলেন। ঘনরাম, শিবচন্দ্র সেনের সারদা সাধন, মাণিক চাঁদের মহাভারত প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র অভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র আদিরসের কবিতায় সুবিখ্যাত। তাঁহার রচনার ভাষা মার্জ্জিত, সুসংস্কৃত ও মধুর,

কিন্তু তাহার রুচি যদি তদনুরূপ মার্জ্জিত হইত, তবে ভারতচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত যুগের কোন কবি হইতে নিম্নস্থান অধিকার করিতেন না। কিন্তু তিনি সুবর্ণ, হীরক ও মাণিক্য দ্বারা একটী বানর অঙ্কিত করিয়াছেন, চরিত্র অঙ্কণে তিনি সুবিখ্যাত নহেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত ভক্ত-রামপ্রসাদ চিরদিন ভক্ত ও সাধকগণের হৃদয়-সিংহাসনে রাজত্ব করিবেন। বঙ্গভাষায় এমন ভক্তিভাবের গান অতি বিরল। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের কোমল ও উর্ব্বরা ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও কবিত্ব চিরবিরাজিত। দেওয়ানজী নীলকমল, গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথী প্রভৃতির ধর্ম্মসঙ্গীত সাধকগণের হৃদয়ে চিরশান্তি ও আনন্দ প্রদান করিবে।

এক্ষণে আমরা বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাসে আগমন করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীতে যুগান্তর আনিয়াছেন। তিনিই বঙ্গসাহিত্যে গদ্য রচনার জন্মদাতা। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বেও গদ্য প্রচলিত ছিল। অসম্ভব নহে। কারণ দলিল, দস্তাবেজ, আরজী ও পত্র লেখার জন্য গদ্যের প্রয়োজন। এ সকল চলিত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গদ্য গ্রন্থ বিষয়ে বোধ হয় রামমোহনই জন্মদাতা, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। বলিয়াছি, রামমোহন যুগপ্রবর্ত্তক, কি শুভক্ষণে তিনি বঙ্গদেশে সমুদিত বালার্করূপে উদিত হইয়াছিলেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি এই মহাত্মার সময়েই যেন, বারিধারা বর্ষণের পরে মাত বসুন্ধরা যেমন শত শত ওষধি তরু লতা গুল্মগণে পরিবেষ্টিত হয়েন, তেমনি রামমোহনের মস্তিষ্ক-প্রসূত অমৃত সিঞ্চনে বঙ্গসাহিত্য নবজীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যে সমস্ত মহাত্মা বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পূজ্যপাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্গসাহিত্যের গৌরব মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অতুল প্রতিভায় সমুজ্জ্বল তাঁহার পুত্রগণ, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত, চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রভৃতি বক্তা, লেখক, সঙ্গীতকার ও কবি একটী বনস্পতির নব নব পল্লব ও কোরকের ন্যায় বঙ্গভাষার মুখ সমুজ্জ্বল করিতেছিলেন। এই সমস্ত মহাত্মা রামমোহনের ধর্ম্মের ধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন। আবার ইংরাজী শিক্ষা, যাহার জন্য রামমোহন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গ্রন্থকার উদিত হইলেন। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আদি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান কবি। কবিত্ব বিষয়ে তাঁহার ধারে আর দুইজনের নাম করিতে পারি। হেমচন্দ্র সেন ও নবীনচন্দ্র সেন, কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন মিত্র, নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অনেক পিককুল বঙ্গনিকুঞ্জের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত করেন। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, ১৮৭০ সালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব

হইতে বঙ্গসাহিত্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করি। আমরা তখন সাহিত্যের দুই ধারা প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি। অক্ষয়কুমার, মহর্ষি, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র-প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজ, অন্য সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের লেখকগণ। তখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব, সুলভসমাচার, বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্র, বাহিরে সোমপ্রকাশ, ঢাকাপ্রকাশ, হিন্দু হিতৈষিণী প্রভৃতি সংবাদপত্র প্রচলিত হইল। এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শন লইয়া বঙ্গসাহিত্যের নেতারূপে উদিত হইলেন, তখন তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী ভিন্ন আর কোন পুস্তক লিখিত হয় নাই। এই সময়ে বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখকগণ বঙ্গদর্শনের পতাকা-মূলে একত্র হইলেন। হেম বাবু গাহিলেন—

কি ফুলে তুলনা দিব বল বঙ্গকুসুমে
এমন কোথায় আর কোমল কুসুম হার,
পরিবে দেখিবে ছুঁবে, আছে এ নিখিলভূমে।

রাজকৃষ্ণ বাবুর—

অদিতিনন্দিনী ঊষাবিনোদিনী
প্রফুল্ল বদনা মধুর ভাষিনী
কোমল-বসনা কুসুমমালিনী
এস দেবী তুমি অবনী তলে।

ব্রাহ্মাচার্য্য বৃহন্নাঙ্গুল, অক্ষয় সরকারের গ্রাবু, বঙ্কিম বাবুর সুবর্ণ গোলক, দীনবন্ধু বাবুর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, মিল কোমতের অনুবাদ প্রভৃতি আমাদের মন অতিশয় আকৃষ্ট করিত। তখন ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য সুলেখকগণ অবাধে ইংলণ্ড ফরাসীর নাস্তিকতা, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতি চালাইতে লাগিলেন। তাহার চাকচিক্যে বঙ্গ মুগ্ধ হইলেন। তখনও হিন্দু ধর্ম্মের নবোত্থান হয় নাই। সেই যে ডিরোজিও সাহেবের সাহেবী দল, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার আধ্যাত্মিক প্রতিবাদ, বঙ্গদর্শন তাহার জ্ঞানের প্রতিবাদ, কিন্তু তাহার মধ্যে হ্যাট কোটের ছায়া দূর হয় নাই। বঙ্গদর্শন সাহিত্যের কুরুচি ও অনেক কলঙ্ক দূর করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের দল ও এই দল প্রায় একমতাবলম্বী, কিন্তু ইহারা স্বাধীন-চিত্ত, কমলাকান্ত লিখিয়াছিলেন, যদি ব্রহ্মাণ্ডে কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন, তাঁহাকে ডাকি। বিষবৃক্ষে বঙ্কিম লিখিয়াছেন, তুমি স্বর্গ মাননা, আমি স্বর্গ মানি। এইরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসহীনতা বঙ্গদর্শনের প্রথম যুগে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা দেশানুরাগী, সাহিত্যসেবী, কুরুচিসম্পন্ন বিদ্বান। ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত এই দুই সম্প্রদায় বঙ্গসাহিত্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বঙ্গদর্শন কয়েক বৎসর এই সুযোগ্য নেতৃত্ব শীঘ্র শেষ হইল।

নাট্যশালা। মহাকবি ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমাবস্থায় কতকগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন, রংপুরের অনেক জমিদার ও কলিকাতায় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণ রঙ্গভূমে তাহার অভিনয় করেন, কেশবচন্দ্র শৈশবে নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক প্রভৃতি সাময়িক কুপ্রথা-নিবারক নাটক তখন অভিনীত হইত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎপরে বা পূর্ব্বে নূতন থিয়েটার ব্যবসায়রূপে স্থাপিত হইল, সেই সময়ে বঙ্গদর্শনে যাত্রার বিদ্রূপ ও অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, বোধ হয়, রামদাস সেনের এই লেখা বাহির হইল। এখানকার প্রধান অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সকলের

চিত্তাকর্ষণ করিতেন। অনেক সাধু শিক্ষিত লোক ঘিরিয়া আনন্দে দর্শন করিয়া উৎসাহ দিতেন। কিন্তু প্রায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই থিয়েটারের দল নাট্যাকারে বেশ্যা প্রবেশ করাইলেন। সেইদিন হইতে অনেক জমিদার-তনয় ও ধর্ম্মনাশের সর্ব্বনাশের সূচনা হইল এবং তদ্দ্বারা কত পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যে কয়েকজন নাটককার আমাদের দেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে মাইকেল, দীনবন্ধু সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু সমধিক প্রসিদ্ধ। মনোমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র নাটক এই শ্রেণীর। রঙ্গভূমির অধঃপতনের পরে দুইজন নাটককার সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অমৃতলাল বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রুচি ভাল হইলে ইঁহাদের দ্বারা অনেক উপকার হইত, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব ও চৈতন্যলীলা প্রভৃতি দুই একখানি ব্যতীত অধিকাংশ পাপের ইন্ধন প্রদান করিয়াছেন। কুরুচিপূর্ণ নাটক যে বিষফলপ্রসূ, সম্প্রতি আমরা অমৃত বাবুর খাস দখলে সে ফল হাতে হাতে পাইয়াছি। একটী প্রসিদ্ধ শিক্ষিত পরিবারে এই পুস্তকের অনুপ্রাণনে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই সকল কারণে আমি ইহাদিগের অধিক প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রণীত নববৃন্দাবন এই দুর্নীতির প্রতিবাদ জন্য হইয়াছিল এবং শেষ ভাগে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি বঙ্গভূমির গৌরববার্ত্তা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা এবং এই নাটকশ্রেণী অপচয় হইলে বোধ হয় পূর্ব্বের কুরুচি সকলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। ক্ষীরোদ বাবুর নাটকাদি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তের ইতিহাস লিখিয়াছি, তাহার পরের কথা যদি সময় পাই, পরে লিখিব।

১৮৮০ সালে আর এক নূতন যুগ আসিল, বঙ্গবাসী নামক সংবাদ-পত্র বঙ্গসাহিত্যে উদিত হইল। ক্রমে সুরেন্দ্র বাবুর জেল সম্বন্ধে আমোদ করাতে তাহার সহিত বিবাদ করিয়া সঞ্জীবনী পত্রিকা আবির্ভূত হইল। এই দুই পত্রিকা বঙ্গদেশের দুই দলের নেতা হইলেন, এই সময়ে কতকগুলি বিপজ্জাল বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের তিরোধান, বঙ্গদর্শনের অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি মেঘ বঙ্গ আকাশকে আচ্ছন্ন করিল।

বাঙ্গালী জাতির নিয়তিচক্রে দয়াময় পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপা আমরা দেখিতেছি, যাহাতে এই বহুদিনের প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমশঃই উন্নতির ভাব লক্ষিত হইতেছে। নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। নবোন্মেষ, নবসভ্যতা বঙ্গে আনয়ন জন্য তাহা বিধিপ্রেরিত। আমরা একান্ত মনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিশ্বাস করি যে, সংসারে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি হইবে। বঙ্গসাহিত্য আবার জগতের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিবে। বাঙ্গালী সিংহবিক্রমে তাহার বীরকুণ্ডল আন্দোলিত করিয়া জগতে তাহার মহত্ত্ব প্রচার করিবে, সেদিন জগতে শীঘ্র আসিবে। দয়াময় ভগবান সেইদিন আমাদের জাতীয় জীবনে আনয়ন করেন, তাহার শ্রীচরণ-তলে আমাদের এই প্রার্থনা।

বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আরও কতিপয় উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ঢাকার প্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সায়াহ্ণ চিন্তা, প্রভাত চিন্তা প্রভৃতি লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়া, অবশেষে বান্ধব

নামক অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা সম্পাদন করেন, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ আর্য্যদর্শন সম্পাদন করেন। যোগেন্দ্রনাথ অতিশয় সুলেখক, তাঁহার পত্রিকাও অতি উচ্চ দরের হইয়াছিল। নবীন বাবুর আর্য্যদর্শনের এই কয়েকটী পদ স্যার গুরুদাস কবিবর রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা-সভায় উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"উদিবে নবীন কবি, গাইবে নবীন কবি
নবীন বেশেতে ধরা করিবে বিহার।"

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণাও উল্লেখযোগ্য, আমরা ছাত্রজীবনে তাঁহার বীণায় কবিতা লিখিতাম।

বঙ্গদর্শনের তিরোধানের পরে খ্যাতনামা সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবন ও প্রচার প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

বঙ্গদর্শনের তিরোধানের পূর্ব্বে ভারতী পত্রিকা প্রচারিত হয়, স্বর্ণকুমারী দেবী নারী হইয়াও এই পত্রিকা অতি সুযোগ্য ভাবে পরিচালিত করেন। এক্ষণেও ভারতী কালের সর্ব্ববিধ্বংসী শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া জীবিত আছে এবং একই ভাবে চলিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর পরিবারের লেখাই এই পত্রিকার জীবনস্বরূপ। নারীজাতির জন্য পাবনার ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা তলাপাত্র মহাশয়ের স্ত্রী বামাসুন্দরী এক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। পরে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী অবলাবান্ধব, উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পরিচারিকা, গিরিশচন্দ্র সেন মহিলা প্রভৃতি প্রকাশ করেন। অন্তঃপুর আর একখানি পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের পরেই বান্ধব, আর্য্যদর্শন, বীণা, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশ, নববিভাকর পত্রিকা, সাধারণী, মফঃস্বলের চারু মিহির, রংপুর দিকপ্রকাশ প্রভৃতি অনেকদিন সাহিত্যসেবা করিয়াছেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের সমসময়ে বঙ্গবাসী নামক দুই পয়সার কাগজ বাহির হয়, পূর্ব্বে এক পয়সার সুলভ সমাচার কেশবচন্দ্র প্রবর্ত্তিত করেন বঙ্গবাসীর সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবনী, বঙ্গনিবাসী, সময় প্রভৃতি পত্রিকা সুযোগ্য ভাবে পরিচালিত হয়। এই সময়ে নব্যভারত পত্রিকা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া আজিও সমুজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছে। জ্ঞানাঙ্কুর নামক পত্রিকা রাজসাহী হইতে শ্রীকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের দুই একখানি পুস্তক তাহাতে বাহির হয়। উপন্যাস বিষয়ে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই নিম্নে।

বঙ্গদর্শন আবার রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় দ্বিতীয়বার প্রচারিত হয়। কিন্তু একজন কর্ত্তৃক নানা পত্রিকা সম্পাদন সম্ভব নহে। স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে ইহা চলিত, কিন্তু তাঁহার তিরোধানে বঙ্গদর্শন চির-নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

আমরা এই যুগকে বঙ্গের এলিজাবেথান যুগ সদৃশ ভিক্টোরিয়া যুগ বলিতে চাই। এই যুগে বঙ্গ সাহিত্যের যত উন্নতি হইয়াছে, এমন আর পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হইবার আশাও সুদূর-পরাহত নহে।

এই যুগের পরে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, বেহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও অনেকানেক সুকবি বঙ্গ ভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, সভাপতি মহাশয়ের নারায়ণ ও আরও কত পত্রিকা বাহির হইতেছে। বসুমতী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের

হিতবাদী এক্ষণেও উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্ব-ভূষণ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য সুলেখক বঙ্গভাষায় আবির্ভূত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব যুগে সঙ্গীত বিষয়ে যুগান্তর হইয়াছে। পূর্ব্বে সুরুচিসম্পন্ন সঙ্গীত প্রায় পাওয়া যাইত না, এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, এবং ঠাকুর পরিবার, ত্রৈলোক্যনাথ (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) বিষ্ণুচরণ, হরিনাথ, কিশোরীলাল রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতচর্চ্চার দ্বারা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আর কত নাম করিব? গোবিন্দ চৌধুরীর নামে আমরা বগুড়াবাসী গর্ব্ব করিতে পারি। বঙ্গ ভাষার সহস্রাধিক সঙ্গীত বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। আমোদ আহ্লাদের সময় বাঙ্গালীর বন্দে-মাতরং ও বহু কীর্ত্তনাদি ভিন্ন-প্রদেশীয় ভারতবাসীকে মুগ্ধ করে। আজিকালি মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে কয়েকজন সুলেখক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গত সম্মিলনে আমাদের বন্ধু মুন্সী হামিদ আলি মিঞা আমাদের সম্মিলনের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সিরাজী তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন, আর মশারফ হোসেন, মৌলবী আবহুল করিম, অনেক মুসলমান বক্তা বাঙ্গালাসাধু ভাষায় বক্তৃতা করেন, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান একত্রিত না হইলে উন্নতির কিছুই আশা নাই। থমে খ্রীষ্টান প্রপাদরীগণই বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করেন. কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি বঙ্গভাষার প্রথম প্রচলন সময়ে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহা সাহেবী বাঙ্গালা হইলেও, এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষা তাহার দ্বারা অনেক উপকার পাইয়াছেন। সাহেবের ব্যাকরণ আমাদের পূর্ব্বে স্কুলে অধীত হইত। এক্ষণে পাদরীদের বাঙ্গালা বঙ্গ ভাষার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিতেছে, যেমন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে একদিকে কাল জল, এক দিকে সাদা জল প্রবাহিত, সেইরূপ, সাহেবী বাঙ্গালা পড়িলে ও শুনিলেই চিনিতে পারা যায়।

এইরূপে মাতৃভাষা শত শত জাতি, শত শত মহাত্মার জলসিঞ্চনে জগতের সকল ভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, ক্রমশঃ বাঙ্গালা জগতের প্রধান ভাষা বলিয়া গণ্য হইতেছে। বাঙ্গালীজাতির অদৃষ্টচক্রে ভগবানের বিশেষ করুণা আমরা দেখিতেছি। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, নবোন্মেষ, নবসভ্যতা প্রচার জন্য তাহা বিধিপ্রেরিত। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একান্ত মনে বিশ্বাস করি যে, সংসারে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি হইবে। বঙ্গভাষা ক্রমে তাহার বীরকুণ্ডল আন্দোলিত করিয়া সিংহ-বিক্রমে তাহার মহিমা প্রচারিত করিবে। আমার মনে হয়, শীঘ্রই বঙ্গভাষা তাহার সকল সম্পদ লইয়া জগৎকে মোহিত করিবে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইবে, বঙ্গভূমির নাম গৌরবান্বিত হইবে। দয়াময় ভগবান সেইদিন আনয়ন করুন, তাঁহার নিকটে আমাদের এই প্রার্থনা।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, যিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইবার যোগ্য হন। আরও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা। ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম। জীব প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া ভগবানেই প্রতিষ্ঠিত হন।

এ কথার অর্থ এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। গীতায় নানা স্থানে ব্রহ্মভূত হইবার কথা—ব্রহ্ম নির্ব্বাণের কথা উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তাঁহারা ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মে গমন করেন—বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। যথা—

"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।"
(৪।২৪)

"যজ্ঞশিষ্টামৃতো ভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্।"
(৪।৩০)

"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।"
(৫।৬)

"ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ (৫।১৯)

যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাহাদের ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হয় (২।৭২)। যাহাদের মৃত্যুর পর দেবযানে গতি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মবিদ, তাহারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

"তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ।"
(৮।২৪)

সেইরূপ যাহারা যোগী, তাহারা ব্রহ্মে স্থিত হয় (৫।২০) এবং ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করে। (৫।২৪-২৬)। তাহারা ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হয় (৮।২১); এবং ব্রহ্ম সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করে (৬।২৮)।

অতএব কর্ম্মযোগী, কি ধ্যানযোগী, কি জ্ঞানযোগী, কি ভক্তিযোগী, সকলেই সাধনা-সিদ্ধির ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মবিদ হইয়া,—ব্রহ্মভূত হইতে পারেন ও পরিণামে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। গীতায় আছে যে,

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥

* * * *

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমো সন্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

ইহা হইতে ব্রহ্মভূত হইবার অর্থ আমরা কতক বুঝিতে পারি। যখন কাম ক্রোধাদি সমুদায় ত্যাগ করা যায়, নিস্পৃহ, নিরভিমান ভাব হয়, আপনাকে অকর্ত্তা বা প্রকৃতিজ গুণ কর্ম্মে নিজের অকর্ত্তৃত্বে ধারণা হয়, যখন পরমশান্তি লাভ হয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা বা জ্ঞানে স্থিতি হয়,—তখন ব্রহ্মভূত হওয়া যায়। অর্থাৎ তখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন ব্রহ্মভাব কতক লাভ হয়।

তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া প্রপঞ্চোপশম ব্রহ্মের যে তুরীয় বা চতুর্থ পদ তাহাতে গতি হয়।

অতএব এই ব্রহ্মভাব নির্গুণ ব্রহ্মভাব। এই নির্গুণ ব্রহ্মভাব লাভ হইলে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। যখন সর্ব্ব পরিচ্ছেদ দূর হয়, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, সর্ব্ব উপাধি দূর হয়, তখন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মভূত হইয়া এই ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মভূত হইবার মূল সূত্র গীতাতেই উক্ত হইয়াছে –

"যদাভূতঃ পৃথগ্‌ভাবং একস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥"

(১৩।১০)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মভূত হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪ ৬)।

"অভয়ং ব্রহ্ম...য এবং বেদ ব্রহ্ম ভবতি!"

(ঐ ৫।৪।২৫)।

'তৎ ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ব্রহ্মবান ভবতি।"

(তৈত্তিরীয়, ।১৩।৪)।

অতএব ব্রহ্মভূত হওয়া অর্থ—ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি অর্থাৎ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি।

কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই যথেষ্ট নহে। ব্রহ্মের দুই ভাব। এক নির্গুণ ব্রহ্মভাব—যাহাকে এ স্থলে 'ব্রহ্মভাব' বলা হইয়াছে, আর এক সগুণ ব্রহ্মভাব—যাহাকে ঈশ্বরভাব বলা হইয়াছে। এজন্য প্রকৃত পরব্রহ্মের ভাব লাভ করিতে হইলে এই ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই লাভ করিতে হয়।

আরও এক কথা এস্থলে বুঝিতে হইবে। ত্রিগুণাতীত হইলে যে ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মের অর্থ শঙ্করের মতে দুইরূপ হইতে পারে। ইহার এক অর্থ পরমাত্মা। আমি অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা এই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ নিশ্চয় হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন যে, "প্রত্যগাত্মারই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়। অহং প্রত্যগাত্মা, আর ব্রহ্ম, নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। আমি প্রত্যগাত্মা নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমি বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে স্থিত হইলেও পরম ব্রহ্ম। জ্ঞাতা আত্মার উপাধি রহিত হইলে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়। নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্মের আমি অর্থাৎ আত্মাই প্রতিষ্ঠা বা স্বভাব স্থিতি হেতু। বুদ্ধি উপাধিযুক্ত আত্মার চৈতন্য দ্বারাই নিরুপাধিক ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়।" সুতরাং আমি সাধনা দ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়াও একান্ত ভক্তিযোগ সিদ্ধিতে ঈশ্বরভাব লাভ করিয়া আমার প্রত্যগাত্ম স্বরূপ—ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব বা শাশ্বত ধর্ম্মত্ব, নিত্য সুখত্ব লাভ করিতে পারি। এ অর্থও এস্থলে বুঝিতে হইবে।

গীতায় পরে (১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ঈশ্বরে পরানুরক্তি লাভ দ্বারা বা অনন্য ভক্তি বলে ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিয়া সেই ব্রহ্মভূত সাধক ঈশ্বরে প্রবেশ করে এবং ঈশ্বর প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদপ্রাপ্ত হয়। অতএব গীতা অনুসারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির সহিত ঈশ্বরের ভাব লাভ করিতে হয়, তবে পরম অব্যয় পদ লাভ হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বে ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥

এইরূপে ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বর ভাব উভয়ই

লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। গীতায় এই ঈশ্বরে নির্ব্বাণ লাভ নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন, (৪র্থ শ্লোক) যে যাহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যোগীদের সম্বন্ধেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি যোগযুক্তাত্মা, তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন, এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত দেখেন (৭।২৯)। তিনি সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন (৭।৩০) তিনি সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরকে অনন্য ভাবে, একত্বে স্থিত হইয়া ভজনা করেন, এবং ঈশ্বরেই অবস্থিত থাকেন (৭ ৩১)। সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ঈশ্বরে স্থাপিত অন্তরাত্মা হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরকেই ভজনা করেন (৬।৭)। এবং ভক্তিযোগে ভগবানের স্বরূপ সমগ্র জানিয়া তদনন্তর তাঁহাতেই প্রবেশ করেন (১৮।৫৫)। যাঁহারা ভগদ্ভক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতার তত্ত্বজ্ঞানলাভ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত হন (১৩।১৮)। এইরূপে যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তাঁহারাও ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া অব্যয়পদ লাভ করেন।

'সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।

(১৮।৫৬)।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

২৭। বীরভুম বিবরণ ১ম খণ্ড—(বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি-গ্রন্থাবলী নং ১) মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্পাদিত (প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহোদয় লিখিত ভূমিকা সহ)। "বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি" হইতে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, হেতমপুর-রাজবাটী, বীরভূম। কলিকাতা বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। রয়েল আটপেজি ২৫৬+৫৩ পৃঃ। ৫১ খানি হাফটোন ছবি আছে; মূল্য কাপড়ে বাঁধা ২৲।

গ্রন্থকার হইতে অনেকেরই ইচ্ছা, কিন্তু অনেকের বিদ্যাবুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে না। অনেকে অর্থব্যয় করিয়া অন্যলোকের সাহায্যে গ্রন্থকার হইতে চাহিলে নানা বিপদ ঘটে। এই গ্রন্থকারের ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়াছে। কর্ম্মকারের হস্তে কুম্ভকারের কাজের যে দশা হয়, এই পুস্তকেরও সেই দশা হইয়াছে। ১৩২৪ সালের ভাদ্রমাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

"পুস্তকখানি দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। পাকা মাঝি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, সম্পাদক মহোদয় পূর্ব্বে আরও চারি খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; স্বয়ং আবার তিনি বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি—তথাপি পুস্তক খানিতে এত অসাবধানতার চিহ্ন কেন থাকিয়া গেল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ইহাতে হেতমপুর, ভদ্রপুর, সুপুর, ভাণ্ডীরবন, বক্রেশ্বর, মঙ্গলডিহি, জোফলাই,

কেন্দুবিল্ব ও শ্যামারূপার গড়, এই নয় স্থানের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। শ্যামারূপার গড়ের কাহিনী বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনে প্রবন্ধরূপে পঠিত হইয়াছিল। শ্যামারূপার গড়, সেনপাহাড়ী প্রভৃতি স্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত; অথচ তাহা বীরভূম-বিবরণের অন্তর্গত করিবার জন্য কৈফিয়ৎ এই—"কেন্দুবিল্বের কথা উঠিলেই লাউসেন তলাও'এর কথা আসিয়া পড়ে। শ্যামারূপার গড় মনে পড়িয়া যায়।"—মনে ত অনেক কথাই উঠে, তাই বলিয়া কি অবান্তর কথা বলিতে হইবে? এই শ্যামারূপার গড়ের ইছাই ঘোষের দেউল সম্বন্ধে ৩৫৬ পৃষ্ঠার একস্থানে বলা হইয়াছে, "যাহা হউক এই দেউল এখনো বীরভূমের একটি দর্শনীয় সামগ্রী;" আবার ঐ পৃষ্ঠার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, "বীরভূম-বর্দ্ধমানে এই প্রাচীন সম্পদ রক্ষাকল্পে বীরভূম-বর্দ্ধমানবাসী জনসাধারণের সাহায্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

ভদ্রপুর গ্রাম প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন বীরভূমের অন্তর্গত। সেই সূত্রে ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমারের বিবরণ বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতির স্বকীয় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার কুঞ্জঘাটার রাজবংশের বিবরণ কোন অধিকারে বীরভূম-বিবরণে স্থান পায়? হেতমপুর রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া কি? কুঞ্জঘাটার কুমার দুর্গানাথকে বলা হইয়াছে "ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর।" মহারাজ নন্দকুমারেরর দৌহিত্র বংশের পোষ্যপুত্র হইয়াও নন্দকুমারের বংশধর—ইহা নূতন তথ্য বটে।

পুস্তকের পাঠ্য বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশ হেতমপুর কাহিনী। তাহাতে রাজবংশের কাহিনীই বেশীরভাগ। পুস্তকে ৫১ খানি ছবির মধ্যে ২৩ খানি হেতমপুর-রাজের সহিত সংশ্লিষ্ট, তন্মধ্যে ৯ খানি রাজবংশীয় মহারাজকুমার, কুমার প্রভৃতি মহোদয়গণের। এরূপ ছবি দেওয়া বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য না হইলেও ক্রেতার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু যখন মহারাজকুমার, মহারাজকুমারী ও তদীয় পুত্র-কন্যাদের জন্মের, বিবাহের তারিখ, যেখানে বিবাহ হইয়াছে সেখানকার বিবরণ, এই সব পড়িতে হয়, তখন পাঠকের বিভীষিকা জন্মে। (৬৫—৭১ পৃঃ)

মহারাজ বা মহারাজকুমারেরা যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের গৌরব করিতে পারেন, কিন্তু কৌশলে বংশগৌরব লাভ করিবার চেষ্টা কেন? সকলেই জানেন, রেলওয়ে বা পোষ্টাপিসের প্রদত্ত নামের সহিত সাধারণের বড় সম্বন্ধ থাকে না। ২।১জন প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া কহিয়া নূতন নামকরণ করাইয়া লন। হেতমপুর পোষ্টাপিসের নাম হেতমপুর রাজবাটী, বর্দ্ধমানেও বর্দ্ধমান রাজবাটী নামে একটী পোষ্টাপিস আছে, অথচ কেহ সমস্ত বর্দ্ধমান সহরকে বর্দ্ধমান রাজবাটী বলে না। কিন্তু বীরভূম বিবরণের সম্পাদক বলিতেছেন, "সমস্ত গ্রামখানি হেতমপুর নামেই সুপরিচিত। স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার বর্ত্তমান অধিপতি, তদনুসারে ইহা হেতমপুর রাজবাটী নামে প্রসিদ্ধ।"

৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে, "শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার প্রণীত হেতমপুর

কাহিনী পাঠ করিয়া মনে হয় 'হেতমপুর রাজবংশের আদিপুরুষ মুরলীধর চক্রবর্ত্তী অতি দরিদ্র ছিলেন এবং এই বংশে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রমে উন্নত হন।' কিন্তু অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা সরকার মহাশয়ের কথিত বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত।" এইবার পাঠকগণ বিচার করিবেন, তাহা কিরূপ বিপরীত। হেতমপুর রাজবংশ তালিকায় দেখিতে পাই, মুরলীধরের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষের নাম রুদাই বা রুদ্র। টীকায় আছে, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধনির্ণয়" ধৃত শ্লোক-"রুদস্তু পৃথিবীপালো রাজল্লোকহিতে রতঃ। সুতরাং রুদাই বা রুদ্র রাজা ছিলেন। আজি সম্বন্ধনির্ণয় বা তাহার ক্রোড়পত্রে কোথাও এই শ্লোক খুঁজিয়া পাই নাই। শব্দকল্পদ্রুমে রুদ্র অর্থে শিব, একাদশ রুদ্র প্রভৃতি আছে, কিন্তু রাজা নাই। সে কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। গ্রন্থকার ৪৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, 'তৎপুত্র মুরলীধর তস্করের উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ১০৫৭ সালে জীবিকান্বেষণে বীরভূমে আগমন পূর্ব্বক * * কর্ম্মগ্রহণ করেন।" তবে কিশোরী বাবু তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া এমন কি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। অন্যত্র আছে, শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, সংসারে "সহায় স্বজন শূন্য মুরলীধর।" এইবার রাধানাথের বিবররণ সম্পাদকের কথায় শুনুন। "চৈতন্য-পত্নীর (রাধানাথের জননী) কষ্টের অবধি ছিল না। দারিদ্র্যের প্রবল পেষণে দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে তিনি সামান্য যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে কোনরূপে সংসার প্রতিপালিত হইত মাত্র।" ইহা যদি হীন অবস্থা না হয়, তাহা হইলে হীন অবস্থা আর কাহাকে বলে, জানি না। পাঠক যদি রাধানাথের বংশগৌরবের প্রমাণ চান, তবে সম্পাদক তাহাও হাজির করিয়াছেন—"কিন্তু জননীর নিকট আপনাদের বংশের অতীত গৌরব-কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে 'জমিদার' হইবার দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা এতই প্রবল হইয়া উঠে যে, অল্পদিন পরেই স্বাধীনভাবে কতকগুলি মৌজা ইজারা গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের পিপাসা আপাততঃ ঘোলে নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ এই বংশগৌরব স্মৃতিই তাঁহার সকল সৌভাগ্যের মূল।" (৪৫ পৃঃ) আরও প্রমাণ চান? "পিতৃপিতামহের (?) গৌরবস্মৃতি হৃদয়মান মানবকে কিরূপ উন্নত করিয়া তোলে, রাধানাথ চক্রবর্ত্তী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। 'ভূস্বামী' হইবার উচ্চ আশা তাঁহার হৃদয়ে এত বলবতী ছিল যে, তিনি ঋণ করিয়াও জমিদারী খরিদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।" আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এই ধার করিয়া জমিদারী খরিদ কার্য্য অতি কঠিন।

পুস্তকখানিতে যাহা মালমশলা আছে, তাহা গুছাইয়া লিখিতে পারিলে বীরভূমের সুন্দর ইতিবৃত্ত হইত। কিন্তু পদে পদে অসাবধানতা ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা অপাঠ্য না হউক, সুপাঠ্য হয় নাই। যশোহর, খুলনার ইতিহাসের ন্যায় যে ইহার 'ইতিহাস' নামকরণ হয় নাই, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং সুপুর, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি লইয়া সম্পাদক ও ভূমিকা-লেখকের মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখের কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন, পরে তাহা ভুল বলিয়া সপ্রমাণ হইলে পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সরল সত্যানুসন্ধিৎসা আজকাল নবীন ঐতিহাসিকদের মধ্যেও নিতান্ত বিরল।

অসাবধানতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই। বীরভূম জেলার 'সাঁইতিয়া' গ্রামের নাম অনেকেই জানেন। চলিত কথায় ইহার নাম 'সাঁইতে'। 'সাঁইতে'র নাম বীরভূম-বিবরণের প্রথম পৃষ্ঠায় হইয়াছে 'সিন্থিয়া' অথচ ১৫৮ পৃষ্ঠায় আছে 'সাঁইতিয়া'। ৪র্থ পৃষ্ঠায় "পোষ্টাপিস ও টেলিগ্রাফ আফিস" কিন্তু নবম পৃষ্ঠায় আছে. "পোষ্টাপিস ও তাড়িৎবার্ত্তা।" সম্পাদক একস্থানে লিখিতেছেন, "১৭৩৭ খ্রীঃ রেনেল সাহেব কৃত সার্ভে ম্যাপে * * হেতমপুরের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।" (১০ পৃঃ)। অন্যত্র লিখিতেছেন, "আমরা যথাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সম্ভবতঃ ১৭১৩/২৪ খৃঃ হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রেনেল সাহেব তাহার বহু পরে এ প্রদেশ জরীপ করিলেও তাঁহার মানচিত্রে হেতমপুরের নাম নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখন হেতমপুর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া একটি নগণ্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছিল।" ৪৪ বৎসর হইল বহুকাল, আর প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ৪৪ বৎসরে একটি নূতন গ্রাম শ্রীভ্রষ্ট হইল! কি অপূর্ব্ব অনুমান।

একটি তুলনা ও একটি ভাবুকতার দৃষ্টান্ত দিই। লেখক বলিতেছেন, "বারাণসী যেরূপ বরুণা ও অসি নাম্নী নদীদ্বারা পরিবেষ্টিতা, বক্রেশ্বর ক্ষেত্রও সেইরূপ দুইটি স্বল্পসলিলা তথঙ্গিনী বেষ্টিতা" লেখক কি ভুলিয়া গেলেন যে, বারাণসীতে বরুণা ও অসি ব্যতীত গঙ্গা নদীও আছে? ভাবুকতা শুনুন। "যোদ্ধার ক্রীড়াক্ষেত্র (নারায়ণক্ষেত্র?) যে এতদঞ্চলের লোকের নিকটে এখন 'কাঁদুনে ডাঙ্গা'য় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। 'কালস্য কুটিলা গতি। টিপ্পনী নাবশ্যক।" এই সমীচীন সমালোচনার প্রতি কথা কথা সত্য, আমরাও ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছি। এই পুস্তকখানি অকৃতিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

৴১৮। সুনীতিবিকাশ।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য।৴০ হিসাবে ৷৷৴০। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত।

এই দুইখানি পুস্তকই উপাদেয় হইয়াছে; সকল প্রবন্ধ গ্রন্থকারের নিজস্ব নয়, কয়েকটী সঙ্কলিতও হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে প্রণীত ও সঙ্কলিত লেখাই সঙ্গত ছিল। এই দুইখানিই স্কুলপাঠ্য পুস্তক। ভাষা বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল, রুচি মার্জ্জিত, ভাব-বিকাশ পরিপাটী, বিষয় নির্ব্বাচন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এই দুইখানি পুস্তক স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

২৯। ধুলামাটী।—শ্রীললিতমোহন সেন কবিভূষণ প্রণীত, মূল্য ৵০। ক্ষুদ্র পুস্তক, কিন্তু লেখা অতি সুন্দর। সকলের মনোযোগের যোগ্য।

৩০। কিণ্ডার-গার্ডেন ছড়া।—পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম বা মূল্য লেখা নাই। সচিত্র পুস্তক। শুনিয়াছি মূল্য ৵৹ এবং গ্রন্থকর্ত্রী পাটনার ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইন্স্পেক্ট্রেস্ ছিলেন। শিক্ষা বিভাগের লোক না হইলে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক সকলে লিখিতে পারেন না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভাব অনুসারে বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। পুস্তকখানি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

৩১। স্তবক ও কোরক।—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ বিরচিত, মূল্য ৸০। পুস্তকখানি উচ্চাঙ্গের কাব্য নয়, কিন্তু ভাবে ও রুচিতে ইহা মধুময়। সরলতা ও প্রাঞ্জলতা ইহার অঙ্গের ভূষণ। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন, আশা আছে।

কেশবচন্দ্র।

কার্লাইল বলিয়াছেন—তাঁহারও বিশ্বাস কিরূপ আমায় বল, তাঁহার জীবন কিরূপ ছিল, আমি বলিয়া দিব। অন্ততঃ কেশবচন্দ্রের জীবন ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন রেখা টানা যায় না। তাঁহার জীবনই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই জীবন। তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মকে এজন্য স্বতন্ত্রভাবে দেখা অসম্ভব।

একটী কথা প্রায়ই মনে হয়—কেশবচন্দ্রকে বোঝা এত কঠিন কেন? কত বৎসর তাঁকে জানবার জন্য, বোঝবার জন্য চেষ্টা করেছি, প্রতি বৎসরই মনে হয়, তাঁকে কিছুই বোঝা হয় নাই; নূতন বৎসর আবার নূতন ক'রে তাঁকে অধ্যয়ন করতে আহ্বান করে। তিনি ত তাঁর কথা কতরূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করলেন, প্রকাশ করা হয়েছে কি? সকলকে বোঝাতে পেরেছেন কি? এখনও কত দুর্ব্বোধ্য তিনি র'য়ে গেলেন। এমন কি, কেহ কেহ তাঁকে বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রে বিফলতা নিয়ে চলে এলেন, দুর্ব্বোধ্য—a bundle of contradictions, কেহ কেহ—meaningless jargon কিম্বা full of crochets ব'লে মুখ ফিরা'য়ে রহিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন, চরিত্র, কথার মধ্যে কি এক অপ্রতিহত শক্তি আছে, যাহাতে সকলের হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ে। "যখন কেশব কথা বলেন, সমগ্র পৃথিবী উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করে।" কেহ কেহ বলেছেন, তাঁর মধ্যে এক অসীম magnetic power সঞ্চিত হইয়াছিল; তিনি একজন charmer—তিনি মন্ত্র প্রভাবে সকলকে মুগ্ধ ক'রে রাখতেন। তাঁর শক্তি কি তাঁর এই পার্থিব জীবনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে? না, সেই শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হচ্ছে; প্রতি বৎসর নূতন নূতন পরিচয় নিয়ে আসছে, নূতন আলোকে জীবন মরণ ও মরণান্তের সকল প্রশ্ন অধ্যয়ন করবার জন্য আহ্বান করছে? সমালোচনার তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে অধ্যয়ন করিতে গেলাম, তাঁর ত্রুটী দুর্ব্বলতা জীবন চিন্তার পরিসর নির্ণয় করিতে গেলাম, আর তিনি কত গূঢ়ভাবে প্রাণে নূতন অধিকার স্থাপন করে নূতন জন্মলাভ করলেন, আর ভেতর থেকে নূতন নূতন সমস্যা তুলে নূতন আলোকে চক্ষু মনকে পূর্ণ করে দিলেন। তবে, তাঁর এই শক্তি কি একটা m... কি magnetic power? এই শক্তির ... কোথায়?

বলিতেছিলাম, কেশবচন্দ্র হইতে যত দূরে যেতে চেষ্টা করা যায়, ততই তিনি হৃদয় মন অধিকার করেন। তথাপি বলিতে হয়, তিনি দুর্ব্বোধ্য রয়ে গেলেন। সত্যই তাঁর জীবন, তাঁর কথা, তাঁর জীবনের প্রভাব সমুদায়ই স্ববিরোধী; পরস্পর বিরোধী সমালোচনার তীব্র আলোকে লোকে যে তাঁকে বিচিত্র বিরোধের মধ্যে খণ্ডশঃ বিভক্ত করে তাঁকে কতগুলি কথা ভাব ধারণার মৃত আধার রূপে দেখ্‌বেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তাঁর ভেতর যে জীবন ছিল, যে আত্মা ছিল, যাহা সকল বিরোধের সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থিতি করে ও বর্দ্ধিত হয়, এত স্তূপাকার বিরোধের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, অথচ তাহার শক্তি ও প্রভাব অপরিহার্য্য। শুনিতে পাওয়া যায়, স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন কেশবচন্দ্রের কোন বক্তৃতার স্ববিরোধিতা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তার পর দিনই তাহার মধ্যে কত

গভীর ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটী পরস্পর বিরোধী সমালোচনা প্রদর্শন করা যাক। তিনি আপনাকে যিশুদাস বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। কেহ বলেন, তিনি খ্রীষ্টকে বিশেষ সৃষ্টি, ভগবানের বিশেষ অবতরণ, বিশেষ বিধান, পূর্ণ আদর্শ মানবের ভগবজ্জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠাবিধায়ক ও একত্ব-সাধন প্রায়শ্চিত্ত (Reconciliation and atonement) রূপে পরিত্রাণপ্রদ শক্তি ও মধ্যবর্ত্তী বলেছেন; আবার অন্য পক্ষে, প্রত্যেককে এক একটী খ্রীষ্ট হতে হইবে, প্রত্যেককেই ভগবানের বিশেষ অবতার, বিশেষ বিধান ও পূর্ণসৃষ্টিতে পরিণত করিতে হইবে—এই সকল কথা বলে খ্রীষ্টকে তিনি মানবের ভূমিতে নাবায়ে এনেছেন, কিম্বা মানবকে খ্রীষ্ট জীবনের উচ্চভূমিতে উন্নীত করেছেন। আবার, তিনি দূরবর্ত্তী স্বর্গের অনুসরণ ক'রে তাহারই স্বপ্নালোকে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন—যেখানে ঈশা গৌর শাক্য মহম্মদ শঙ্কর সক্রেটিস সকলে সকলের সুর মিলিত করে দেবাদিদেবের বন্দনা-সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতেছেন, সমুদয় প্রাণ ও প্রাণের সাধনাকে একীভূত করে এক-প্রাণ একতানে মহাযোগ সমাধিতে নিমগ্ন আছেন; অপর পক্ষে, তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, গৃহ পরিবারে, সমাজে মণ্ডলীতে জাতিতে জাতিতে মানব-পরিবারে স্বর্গের মিলন-সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন ও সামঞ্জস্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দর্শন করিতেন। কেহ বলেন, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা ক'রে তিনি জাতীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ও হিন্দুধর্ম্মকে আঘাত করিয়া জাতীয় আত্ম-সম্মানকে আঘাত করিয়াছেন; অপর দিকে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের মূলে তিনি, তিনিই মূর্ত্তিপূজার প্রথম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, ব্রহ্মের মাতৃ-ভাব সাধন করেন, খোল করতাল সংকীর্ত্তনকে শিক্ষিত সমাজের আদরণীয় করেন, ব্রাহ্ম-সমাজে ভক্তি-উদ্দীপক লীলা-প্রকাশক হরি, লীলা, লীলারসময়, নব-বৃন্দাবন, বংশীধ্বনি, নটবর প্রভৃতি বৈষ্ণব-শব্দ ও বৈষ্ণব-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণ ভাব প্রেমলীলা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ঔপনিষদিক গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছেন, ও ব্রাহ্মসমাজকে 'নেড়া নেড়ীর' দল করিয়া তাহার অধঃপতনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। সংসারের নানা সম্পর্ক-বন্ধনের মধ্যে, পারিবারিক জীবনে ব্রহ্মপূজা অসম্ভব, ও ব্রহ্মপূজার সঙ্গে ভক্তি প্রেম প্রভৃতি নিম্নাঙ্গের সাধনার সংযোগ সাধন অসম্ভব; এবং তাহা সংযুক্ত করিয়া তিনি ব্রহ্মপূজাকে সরস, সুমিষ্ট ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া তাহাকে, ভাব ও শব্দার্থদানে কাল্পনিক বা মানসিক মূর্ত্তি পূজায় পরিণত করিয়াছেন; অপর দিকে, সকলের জন্য ব্রহ্ম-উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া সাধারণ জনবর্গের ধর্ম্মসাধনার পথ বন্ধ করিয়াছেন ও ব্রাহ্মসমাজকে জ্ঞানমার্গী উচ্চ শিক্ষিতদিগের সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজকে স্বতন্ত্র সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায় চিহ্নিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন; অপর দিকে হিন্দুসাধনার সঙ্গে খ্রীষ্ট জীবন-শিক্ষা-ধর্ম্ম সংযোজিত করিয়া তিনিই রামমোহনের পথানুসরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজকে নবহিন্দু-সমাজ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়েছেন। সকল ধর্ম্মে

যাহা কিছু আছে, সমস্তকে নিয়ে এসে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহজ স্বাভাবিক সরল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন ও তাহাকে কিম্ভূতকিমাকার বিসদৃশ স্থূলোদর বীভৎস জীবে পরিণত করিয়াছেন, কিম্বা Hodge-podge করিয়া তুলিয়াছেন; অপর পক্ষে বলা হয়, তাঁর ধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড *world culture* প্রদর্শন করে, তাহা সকল ধর্ম্ম, সকল সাধনা, সকল অনুষ্ঠানের এক grand synthesis বা সমন্বয়, উহা কেবল কেশবচন্দ্রের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব ছিল, অন্যের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়, তার পর কেশবচন্দ্রেরও সেই পাণ্ডিত্য, সেই উচ্চতর সমালোচনা (higher criticism), দার্শনিক অধ্যয়ন (Philosophic study) ও অন্তর্দৃষ্টি (insight) ছিল কি না, বলা যায় না, যাতে এমন একটা conception বা সূত্র পাওয়া যায়, যাহাতে সমুদয় চিন্তা, ভাব, ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান, সভ্যতার আদর্শ সমন্বিত হইয়াছে; তার পর তাকে নূতন জীবনচরিত্রে নূতন কার্য্যপ্রণালী, সমাজসংস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাধন করা, তা' ত আরও কঠিন; অন্যের পক্ষে এ সমন্বয় একটা কথার কথা কিম্বা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র, পৃথিবী তাহাতে প্রবঞ্চিত হইবে না; তবে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ বলেন, তাঁর ধর্ম্ম একটা পাঁচ ফুলের সাজি বা ডালা, সে ফুল ত শুকাইয়া যাবেই; তাহাতে প্রাণের গতিশীল বর্দ্ধনশীল ঐক্য কোথায়; অপর পক্ষে বলেন, তিনি যে ঐক্যের উচ্চ ভূমিতে উঠেছিলেন, তাহা ত একটা abstraction মাত্র, তাহাতে সমুদয় পার্থক্যের স্থান কোথায়? এক পক্ষ বলেন, তিনি পশ্চিমদেশীয় ছাঁচে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঢালিয়াছিলেন, তিনি একজন revolutionary, প্রাচীন জাতীয় ধারা অনুসরণে সমাজের ক্রমিক বিকাশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া চূর্ণ করিয়া নূতন করিয়া সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন; অপর পক্ষ বলেন, তিনি ভয়ঙ্কর conservative রক্ষণশীল ছিলেন; conservatism তাঁর *instinct*; তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে দিলেন না; কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজকে দ্রুতবেগে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর conservative instinct সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির গতিকে সজোরে বাধা প্রদান করিয়া তাহাকে অনেক দূর পশ্চাতে লইয়া চলিল। এক পক্ষ বলেন, তিনি বৈরাগ্যের মন্ত্র (ascetic ideal), যোগ, বিশ্বাস, সাধন প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তিনি মধ্য-যুগের (mediæval) আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; অন্য পক্ষ বলেন, তিনি বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মময় জীবনের নূতন সভ্যতার মধ্যে বাস করিয়া কিছুতেই উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম-সাধনা করিতে পারেন না। এক পক্ষ বলেন, তিনি মহাপুরুষদের জীবনচরিত্রকে ব্রহ্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া মধ্যবর্ত্তীবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাঁর অনুচরগণ মহাপুরুষদের সমন্বয় ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার জীবনকেই সেই সমন্বয়ের প্রতিভূস্থানে তাঁহাকেই মধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন, এবং তিনিও এরূপ করিবার ইঙ্গিত কোথাও দিয়াছেন; অপর পক্ষ, তিনি মধ্যবর্ত্তীবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া, সামান্য প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন সাধন প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া ধর্ম্মজীবনের প্রথম ভিত্তিভূমি নির্ম্মাণ

না করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। এক পক্ষ, তিনি আপনাকে authority বা অভ্রান্ত গুরুরূপে তাঁর উপদেশকে অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; অপর পক্ষ, তিনি যদি আপনাকে একটু সামান্য জোরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতেন, আপনাকে সকলের মধ্যে বিসর্জ্জন না করিতেন, সকলের মধ্যে একটা উৎকট স্বাধীনতাকে অবাধে ক্রীড়া করিতে না দিতেন, সকলের বিশেষত্বকে একটা বিচিত্রময় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কল্পনায় অবিশেষরূপে ফুটাইয়া না তুলিতেন, তিনি, স্বাধীনতা ভগবানের বিশেষ দান, তাহার সম্মান সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহা কোন লোক কিম্বা majority বা অধিকাংশের নিকটও বিসর্জ্জন করিলে প্রত্যেকের জীবনে ভগবানকে অস্বীকার করা হয়, এরূপ শিক্ষা না দিতেন, তিনি সকলের সকল মতের সমন্বয়ের ভূমির উপর মণ্ডলীকে সংস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মণ্ডলীতে এত বিরোধ দেখা দিত না, এবং উহার কর্ম্মকুশলতাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইত না। তিনি ধর্ম্মসাধনায় ও অনুষ্ঠানে symbol আনয়ন করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিয়াছেন; তিনি যথেষ্ট symbol আনিয়া আধ্যাত্মিক জীবন হইতে artএর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, এবং art সহযোগে আধ্যাত্মিক সাধনা প্রবর্ত্তনা করিতে সক্ষম হন নাই, এবং হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের Religio-art cultureএ সম্পূর্ণ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই, এবং তাঁর ধর্ম্মসাধনাকে সমগ্র জীবনের বিচিত্রতাময় প্রকাশের অনুকূল করিতে পারেন নাই। এক পক্ষ বলেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও সাধনা অত্যন্ত জটিল; অপর পক্ষ বলেন, তাঁহার সমুদয় অতি সরল, অতি সহজ; কেহ বলেন, তিনি হিন্দু, তিনি অদ্বৈতবাদী, যখন তিনি বলেন ব্রহ্মজীবন—কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, দুগ্ধে ননীর ন্যায় সকলের জীবনময় হইয়া আছে; আর "হরি হে তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও তালে তালে, মানুষ ত সাক্ষী গোপাল, মিছে আমি আমার বলে; সমাধির গভীরতায় তুমি আমি এক, কোথায় আমি, আমাতে খুঁজে পাই না। আবার যখন তিনি বলেন এই দশাই স্বর্গ, দশাতের ভিতর দিয়া স্বর্গের বাণী আসে, অন্যত্র মৃত্যু ইত্যাদি— তাঁহার খ্রীষ্টজীবন ও বাইবেলের য়িহুদি ভাব তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে। তাঁর বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক জীবন, ও আর্থিক ও পার্থিব জীবনের একতার উপর সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা একটা utopia মাত্র; অপর পক্ষ হিন্দুপরিবার ও হিন্দুসমাজের যে solidarity, তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ-পল্লীতে নূতন স্বাধীনতার ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পৃথিবীর পক্ষে একটা নূতন আদর্শ; এবং উহা বর্ত্তমান জগতের অনেক সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্ম্মজীবনের অনেক নূতন সমস্যা পূরণ করিতে পারে, এজন্য এই চেষ্টা realityর উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ আরও অনেক পরস্পর-বিরোধী সমালোচনা তাঁহার সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়; এবং যিনি তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে যান, তাঁহাকে এইরূপ বিরোধের ভিতর দিয়া তাঁর জীবন ও চরিত্রের উচ্চ সমন্বয়ের ভূমিতে উঠিতে হইবে। ইহার প্রত্যেক কথাই তাঁহাকে প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু ইহার কোন একটাতে তাঁহাকে নিবদ্ধ করা যায় না।

এখন কথা হইতেছে, তাঁর জীবন এত দুর্ব্বোধ্য কেন? কোন কোন কলাশিল্পী

আছেন, যাঁরা একটা সৌন্দর্য্যের আদর্শ পরিকল্পনা করেন, তাঁরা সেই আদর্শকে বর্ণের বিচিত্রতার, প্রস্তরের সমাবেশে কিম্বা প্রস্তর ও কাষ্ঠখণ্ডের নানা আকৃতি পরিবর্ত্তনে কিম্বা চরিত্রসৃষ্টি কিম্বা ঘটনাসমবায়ে মূর্ত্তি প্রদান করেন। তাঁদের আদর্শ সম্যক্ পরিস্ফুট, সুনির্দ্দিষ্ট, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেও সুচিহ্নিত ও সুসম্বদ্ধ (clear and definite)

তাঁদের চিত্রে বা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য ও চরিত্র কিম্বা চরিত্রসম্বলনায় সুনির্দ্দিষ্ট ও সম্যক্ পরিস্ফুট। মাতৃ-হৃদয়ের আত্মহারা ভাব, ভগবৎ-ভক্তির উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতময় উর্দ্ধগতি, প্রত্যেক মাংসপেশীর ভিতর দিয়া শক্তির সতেজ সুদৃঢ় মূর্ত্তি, জ্ঞানের স্বর্গীয় দীপ্তি, চিন্তার অসীম প্রসারতার মধ্যে কর্ম্মশক্তির আত্ম-বিলোপ, অসংযত শক্তির সর্ব্বধ্বংসী উদ্দাম প্রবাহ, প্রজাধীন প্রজারঞ্জন সমাজ-সংরক্ষক রাজ-শক্তি, মৃত্যুর গভীর অন্ধকারে ভীষণ করাল মৃত্যুর নিকট কিম্বা অগ্নিপরীক্ষায় পতিগতপ্রাণ পতিলোকগতি সতীত্বের উজ্জ্বল মহিমাময় ভাব ও জীবনপ্রদা শক্তি, পারলৌকিক জীবনের অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে গতি, মুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা, প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—এর এক একটী আদর্শের পরিকল্পনা সম্যক্ পরিস্ফুট ও সুনির্দ্দিষ্ট। শিল্পীর সাধনা, ধ্যান, অধ্যয়ন সকলেরই এই এক মুখে গতি, এই এক আদর্শ-সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়াছে। তাঁর জীবন-সাধনা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাঁর আদর্শ সহজে বোঝা যায়, তাঁর সৃষ্টির একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা [illegible] করা যায়। এইরূপ সৃষ্টি সম্যক পরিস্ফুট হইলেও তাহাও এক রহস্যে মণ্ডিত। চিত্রের পশ্চাতে আদর্শ, আদর্শের পশ্চাতে সুনির্দ্দিষ্ট সাধনা, জীবনচরিত্র সাধনার পশ্চাতে এক অসীম প্রাণ আছে। এই অসীম প্রাণ সকল আদর্শ-সৃষ্টিকে রহস্যে মণ্ডিত করিয়া রাখে। আর এক প্রকার সৃষ্টি আছে। এই অনন্ত অসীম রহস্যময় প্রাণ নিত্যকাল ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে অসীম রহস্যময় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। এই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সমুদয়ই অসীম রহস্যময় —তাতে ভাঙ্গা আছে, গড়া আছে, বর্জ্জন আছে, আবার সমুদয়কে অন্তর্ভূত করিয়া নূতন সৃষ্টি আছে, বিশৃঙ্খল বিচিত্রতা আছে, সামঞ্জস্যের সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্য আছে। একটী ক্ষুদ্র ফুলে সকল বিশ্বের চিরন্তন সাধনার সৌন্দর্য্যময় পরিণতি, অনাদি অনন্ত জীবন প্রবাহের মধুময় সঙ্গীতময় বিকাশ; একটী ক্ষুদ্র শিশু জীবন সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার তপস্যার ঘনীভূত পরিণতি, মাতৃজীবনের পূর্ণতার আনন্দময় মূর্ত্তি। অনন্ত রহস্যময় প্রাণ ফুলের সৌন্দর্য্যে তৃণের সবুজ তরঙ্গায়িত জীবনের পূর্ণপ্রবাহে, অরণ্যানিতে, শিশুর জীবনে, পরিবারে, সমাজ-গঠনে আপনার নব নব রহস্যময় বিচিত্র মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি চির-রহস্যময়; শত বিরোধের ভিতর দিয়া সকল বিরোধের সামঞ্জস্যের মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত ক্রমে ফুটিয়া উঠে। এই বিকাশের বিরাম নাই, এই সৃষ্টির শেষ নাই। কোন কোন শিল্পীর প্রাণ সৃষ্টির মধ্যে তার রহস্যময় অনির্দ্দিষ্ট, অসম্বদ্ধ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এই সৃষ্টির আদর্শ ধারণা করা যায় না, তার ধারাকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় নাই, তার গতি-ভঙ্গের সমগ্র অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,— অথচ হৃদয়ে গভীর আনন্দ, প্রাণে শান্তি, বুদ্ধিতে তৃপ্তি, আত্মায় শাশ্বত অমৃতজীবনে

আত্মপ্রাপ্তি ও আত্ম-স্থিতির অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অভিজ্ঞতা আনয়ন করে। কেশবচন্দ্রের জীবন অনন্ত প্রাণময় ইচ্ছাময় পুরুষোত্তমের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাঁহার চরিত্র যেখানে বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব (personality) পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই পরম পুরুষ—পুরুষোত্তম—যাঁহাতে সকল ব্যক্তি সমন্বিত—তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম প্রতিষ্ঠা।

তপস্বী সাধক কত জীবনব্যাপী সাধনায় এই আদর্শ লাভ করেন; তাঁহার অধ্যয়ন, চিন্তা, ধ্যান ধারণা কত গভীর; তিনি কত উচ্চ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া, কত গভীর অতল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া, কত সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়া, কত প্রান্তর, মরুভূমি, গভীর বনরাজি অতিক্রম করিয়া, আলোর মধ্যে, অন্ধকারে, জীবনের ভিতর দিয়া, মরণের সেতু পার-হইয়া,* কঠোর তপস্যায় জীবন শুষ্ক, দেহ জীর্ণ করিয়া এই আদর্শ লাভ করেন। তাঁর প্রত্যেক পদবিক্ষেপ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, প্রত্যেক চেষ্টা ও সংগ্রাম কাল অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তিনি কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া আলোকের পথ মুক্ত করিয়া, কঠোর প্রস্তরে সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে উচ্চতম পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া তিনি জাতীয় জীবনের নূতন উষালোক দর্শন করিয়াছেন, সেই উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। মুখে, চোকে, প্রাণে সেই আলোক লইয়া সুপ্ত পৃথিবীকে নবজীবনে জাগ্রত করিয়া, বিশ্বপ্লাবী আলোকের মন্দাকিনী স্রোত হৃদয়-কমণ্ডলুতে ধারণ করিয়া লইয়া আসিয়া সকলকে নব সূর্য্যের আলোক-রাজ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া আসেন, আর সেই জীবন, [illegible] ছাপাইয়া সেই আলোক সমস্ত দিকে নূতন যুগ আনয়ন করে, ভগবানের নূতন প্রকাশ নূতন প্রতিষ্ঠার নবধর্ম্ম নব সভ্যতার অভ্যুদয় প্রদর্শন করে।

কেশবচন্দ্র কি এই শ্রেণীর সাধক ছিলেন? তাঁর কঠোর সাধনা ছিল, তীব্র বৈরাগ্য ছিল, বিবেকের শাসনে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জহরব্রতের উৎযাপন ছিল, অধ্যয়ন ছিল, চিন্তা ছিল, ধ্যান ধারণা ছিল; অথচ তিনি এই শ্রেণীর সাধক ছিলেন না। তাঁর সকল সাধনা চরম বিসর্জ্জন, সাধনারও বিসর্জ্জনের মন্ত্র উচ্চারণ করিত, সকল তপস্যা শূন্যে আপনাকে পরিসমাপ্ত করিত, প্রখর বুদ্ধির আলোক অন্ধকারে আপনাকে বিলীন করিয়া দিত, সকল ধ্যান ধারণা আপনাকে হারাইয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইত, জীবনের সকল সংগ্রাম সকল শক্তিসঞ্চয় অসীম দুর্ব্বলতায় ও নিষ্ক্রিয়তারূপে ফুটিয়া উঠিত, চিন্তা ও বাক্য অব্যক্ত নিস্তব্ধতাকে আশ্রয় করিত, আর আত্মপ্রাপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অব্যক্তের তরঙ্গায়িত প্রলয়মূর্ত্তিতে আপনাকে মিশাইয়া দিত। তিনি শক্তিসাধনা করিয়াও দুর্ব্বল শক্তিহীন স্থানু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; চিন্তা বাক্য সাধনা করিয়াও মূক নিস্তব্ধ—মুখে কথা বাহির হয় না; অধ্যয়ন, ধ্যান ধারণা করিয়াও অজ্ঞানার অন্ধকারে বেষ্টিত; আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জীবনব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে তিনি অব্যক্তের শূন্যতা ভিন্ন কিছুই অর্জ্জন করিতে পারিলেন না। যিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মীদিগের সঙ্গে সমান আসন লাভ করিতে পারেন, তিনি নিজে বলিয়াছেন—ভগবান যদি আমার ভিতর কথা না কন, তাঁর ভাবে যদি আমাকে অনুপ্রাণিত না করেন, আমি একটা

কথা কহিতে পারি না, কথা কহিতে গেলে পদে পদে ভুল করি। যিনি বীরের ন্যায় ভারতে মহাযুগপ্রলয় আনিয়াছিলেন তিনি বলিতেন, ভগবান যদি ব্যক্তিত্বের মহীয়সী শক্তিরূপে অবতীর্ণ না হন; তিনি কারও কাছে দাঁড়াইতে সাহস করিতে পারেন না, লজ্জায় সঙ্কোচে আপনাকে লুকাইয়া রাখেন, ভগবান যদি তাঁর ভিতরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মণ্ডলী সমাজ গঠন না করেন, তিনি শূন্য হইতেও শূন্য, অতি অকিঞ্চিৎকর।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—তিনি একদিন কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবানের করুণাই যদি আমাদিগকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে, তবে মানবের স্বাধীনতার স্থান কোথায় রহিল? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—একটা স্রোত খরবেগে বহিয়া যাইতেছে, আর আমরা তীরে দাঁড়াইয়া আছি; আমাদের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবলমাত্র একটা লাফ দেওয়ার স্বাধীনতা মাত্র, আমাদের আছে, আর স্রোতে লাফাইয়া পড়িবা মাত্র, আর কিছুই আমাদিগের নাই; আর এই স্রোত আমাদিগকে তীর্থ হইতে তীর্থে, উন্নতির পর উন্নতির ঘাটে নিয়ে চলেছে। এখানেই বিধান-জীবন। সকল সাধনাও অর্জ্জনের মধ্যে ভগবানের করুণা ভিন্ন আর কি দেখিতে পাই? ভগবানের আত্মপ্রকাশের ও প্রত্যাদেশের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া—এই জীবনকে শুধু সাধনার জীবন বলিলে তাকে ভাল করে জানা গেল না। এইখানে সাধনা আছে, সংগ্রাম আছে, গতি আছে—আর সাধনার পরিণতি সাধনার বিসর্জ্জনে, সংগ্রামের পরিণতি আত্ম-শক্তি আত্ম-প্রকাশের বিলোপে, এখানে গতির পরিণতি নিষ্ক্রিয় স্থিতিতে; আপনাকে এক বারে শূন্য করে প্রার্থনাযোগে ভগবৎ করুণার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া। অর্জ্জন ভিন্ন বিসর্জ্জন কোথায়? Old testament-এর পরই New testament—old manই New manএ রূপান্তরিত হয়, মানবই দেব জন্ম লাভ করে—সাধন-জীবনের পরই বিধান জীবন—পুরাতনের মধ্যেই নিত্য নূতনের জন্ম। আট শ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপধামে একবার হরিনামের বান ডাকিয়াছিল, আর নদেরচাঁদ গৌরচন্দ্রের প্রাণ বিসর্জ্জনের মন্ত্রে জাগ্রত হইয়াছিল; তিনি আপনার সমুদয় পাণ্ডিত্য স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিয়া তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হইয়া আপনাকেও বানের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন; আর নিমাই পণ্ডিত আর আপনাতে আপনি নাই,—ভগবৎ লীলার স্রোতে আত্মহারা হইয়া আপনি ভগবৎ লীলায় বিভোর, চক্ষু লীলার বর্ণে রঞ্জিত, কর্ণ লীলার মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, প্রাণ বৃন্দাবনধাম, আর সমুদয় জগৎ লীলার মূর্ত্তি ধারণ করিল, পঙ্কিল-শুভ্র গঙ্গা কৃষ্ণ যমুনারূপ ধারণ করিয়া প্রেমের তুফানে উজান ছুটিয়াছে, নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবনের মূর্ত্তি ধারণ করিল, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল সমুদ্রের কৃষ্ণ তরঙ্গের অপরূপ ভঙ্গীমাময় লীলা প্রেমময়ের আলো অন্ধকারে মধুময় লীলায় পরিণত হইল। তিনি সকল পাণ্ডিত্য বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণে কোন্ বৈকুণ্ঠ, কোন্ লীলাবৃন্দাবন অবতীর্ণ হইল্ আপনার তত্ত্ব-কথায় পৃথিবীর সকল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য দর্প চূর্ণ করিল। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পেলেষ্টাইনের শৈল প্রদেশে বিধানের আর এক মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। বার বৎসরের বালক এত তত্ত্ব কথা কোথা হইতে শিখিল—তিনি যে ভূতগ্রস্তের ন্যায়

কথা বলেন, সকল পণ্ডিতের সকল গর্ব্ব, ধর্ম্ম-যাজকের পৌরোহিত্যের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তিনি স্বর্গের কি তত্ত্ব কথা বলেন; স্বর্গ যেন তাঁর প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া আপনার নিগূঢ় রহস্য আপনি প্রকাশ করিতেছে। কই, তিনি ত পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন না, শিশুর প্রাণ, শিশুর কথা,—অথচ এত যুগ ধ'রে পণ্ডিতেরা সেই কথার অর্থ সম্যক পরিগ্রহ করিতে পারিল না। তিনি ইহুদি ছিলেন, আর কোন্ যুগে—আর কথা বলিলেন সকল যুগের সকল দেশের—সার্ব্বজনীন;—কি করে তিনি অখণ্ড বিচিত্ররূপী মানবের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলেন?—সাধনা কোথায়? কিন্তু আমরা দেখি কি—একটা কি তাঁতে অবতীর্ণ হইল, আর তিনি দেশের কালের অতীত অমরত্বের উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া কি অমর তত্ত্ব শুনাইলেন—"Blessed are the pure in spirit, for they shall see God." "Be ye perfect as thy father in Heaven is perfect." "I am the vine, ye are the branches thereof." "Man is not for law, law and institution are for man." "You are to be born of the Spirit to enter into the kingdom of Heaven. The kingdom of Heaven is not lo here, lo! there, it is within! Seek ye first the kingdom of Heaven, and every thing shall be added unto thee. Love God with all thy heart and with all thy might and love man as thyself. Let thy will be done on earth as it is heaven. I am in you, ye are in me. When you turned away the hungry and the thirsty out of the door, you turned me away &c."। আর পিতৃ হৃদয়ের গভীর বেদনা ও sacrifice রূপে ভগবানকে লাভ করিয়া পিতা পিতা বলিতে বলিতে তিনি নিজের জীবন কঠোর মৃত্যুর মধ্যে বিসর্জ্জন করিলেন ও মৃত্যু ও নির্য্যাতনের মধ্যে পরাশান্তি লাভ করিলেন। শ্রীবুদ্ধদেবও কত কৃচ্ছ্র সাধনা করিলেন, কিন্তু তাঁর সাধনার ব্যর্থতার ভিতর দিয়া নূতন আলোক লাভ করিলেন, যাহাতে দুঃখময় জীবনের সকল সমস্যার পূরণ হয়। আর শ্রীমহম্মদ—কি বাণী তাঁর ভিতর অবতীর্ণ হইল, যার শক্তির নিকট কত নিষ্ঠুর নির্ম্মম নৃশংস রাজশক্তি মস্তক নত করিল।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদা আত্মানং সৃজাম্যহং"—গীতায় এই শ্লোকে বিধানের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। মানব মনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে বিধাতৃত্ব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের ও সকলের জীবন রক্ষার উন্নতিবিধায়িনী, পরিত্রাণদায়িনী এক মঙ্গলময় পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, এই মঙ্গলময় ইচ্ছা প্রেমময়ের প্রেমের প্রতিষ্ঠা দ্বারা পরিবার সমাজ গঠন করিতেছে। এই বিশ্বাস হইতেই প্রবীণ আর্য্যগণ দেবতাদিগের নিকট সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহাদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেন। ভগবান কত মহৎ হৃদয়ে জাতীয় জীবনের নূতন নূতন আদর্শ প্রকাশিত করিয়াছেন, নূতন নূতন বিধি শুনাইয়াছেন। কিন্তু গীতাতে যে বিধানের পরিস্ফুট ভাব দেখিতে পাই—তাহাতে ভগবান অবতীর্ণ হন। আবার ভাগবতে আছে—ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ অধর্ম্ম সঃ। যখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ তখনই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ধর্ম্মের অর্থই সামঞ্জস্য—সকল ভাবের, সকল সত্যতার

মিলন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনই—সকল ভারতীয় দর্শন ও সাধন পন্থা—কর্ম্মমার্গ, ভক্তি-মার্গ, জ্ঞানমার্গ, ও আর্য্য অনার্য্য ও তাহাদের সভ্যতার মিলনভূমি—মহাভারত। ঈশার জীবনে সকল বিধি ও prophets পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই সামঞ্জস্যের ভূমি জীবন ও চরিত্র—যাহাতে ভগবজ্জীবনের মহাসম্মিলন কালের সীমায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—এখানেই ভগবানের অবতার। বিধান একটী ভাব, একটী কল্পনা বা মত নয়;—idea চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে একটা abstraction—অবাস্তব কল্পনা মাত্র। বিধান—জীবন, বিধান চরিত্র, এই জন্যই বিধান একটী মহাশক্তি। এই জীবন আপনার সুচিন্তিত ব্যাখ্যা দ্বারা দর্শনের সৃষ্টি করে, আপনাকে সমাজে পরিবারে শিল্পে সাহিত্যে আচার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন যুগ ও নূতন সভ্যতার সূচনা করে। বিশ্বের আদি বিশ্বের প্রাণ, বিশ্বের পরিণতি ও উদ্দেশ্য একটা ভাব (idea) নয়; উহা পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের আত্মার প্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং যিনি পুরুষ বা ব্যক্তি তিনি চরিত্রে জীবনে ব্যক্তিতেই আত্ম-প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানেই তাঁর সৃষ্টি; এই বিশ্বে তিনি আপনার গৌরব মহিমা বিভূতি সৌন্দর্য্য সঙ্গীত প্রকাশিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টির ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তাঁরই প্রকৃতি, তাঁরই স্বভাব, তাঁরই প্রতিকৃতি। বলিতে গেলে তিনি আপনাতে আপনি পূর্ণ হইয়াও কালে আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ইহারই নাম সৃষ্টি। পরমপুরুষের সৃষ্টি আত্ম প্রতিকৃতি, পুরুষ, জীবন, চরিত্র। জীবন জীবনকে উদ্ভূত করে, চরিত্র চরিত্রেই আত্ম প্রকাশ করে। ধর্ম্ম, সভ্যতা, মহত্ব যদি জীবন, চরিত্র না বুঝায় তবে তাহা বাস্তবিকতা (reality) বিহীন কল্পনা মাত্র। খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয় সাধু চরিত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুসংঘ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা যায় না। ভগবান যে জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহাকে পূর্ণও বলা যায়—অপূর্ণও বলা যায়। একটা ফুল—ফুলরূপে তাহা পূর্ণ, অথচ তাহার অর্থ বা উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই—কত বৃক্ষ কত অরণ্যে তাহা ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই অপূর্ণতায়—এই পূর্ণতর বৃহত্তর জীবনের সম্ভাবনার মধ্যে তাহার একটা পূর্ণতা এবং পূর্ণতার আনন্দময় মধুর প্রকাশ আছে—এই পূর্ণতার আনন্দময় প্রকাশের নামই সৌন্দর্য্য, এজন্যই ত কবি বলিয়াছেন—A thing of beauty is a joy for ever! আনন্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই তাহা আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সকল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রাণ অব্যক্ত অজানিত অসীমতা; আর এই অসীমতা পূর্ণতার আনন্দের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রেম, ভালবাসার নিকট ও অনন্ত অসীমতা পূর্ণতার মূর্ত্তি প্রকাশিত করে। ভক্তি—অনন্ত অসীমতাকে চরিত্রের পূর্ণতায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত দেখে। আর যেই মুহূর্ত্ত আত্মিক জীবনের পূর্ণতা ও গভীরতা প্রকাশ করে, সেই মুহূর্ত্তও "অনন্ত মুহূর্ত্ত"। ঈশা সমস্ত রজনী গভীর মর্ম্মন্তুদ প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন, কথিত আছে রক্তবিন্দু ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় শরীর দিয়া বাহির হইল—আর যে মুহূর্ত্তে তিনি প্রার্থনা করিলেন,—পিতা, যদি তোমার ইচ্ছা হয় এ পানপাত্র স্থানান্তরিত কর, তবুও আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই এই জীবনে পূর্ণ হউক, আবার

যখন ঈশা ক্রুশকাষ্ঠে ঝুলিতে ঝুলিতে অনন্ত-প্রেম সহানুভূতির আত্মহারা দৃষ্টিতে সেই তাঁর পার্শ্বে ক্রুশস্থিত দস্যুর দিকে তাকাইলেন, আর সেই মুহূর্ত্তে সে নবজীবন লাভ করিল; সেই মুহূর্ত্তের গভীর তাৎপর্য্য কাল কি পরিসমাপ্ত করিতে পারে? যেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে সমুদয় জীবিত মৃতদিগকে প্রদর্শন করিলেন, আর অর্জ্জুন গাহিয়া উঠিল, তাহা অনন্ত মুহূর্ত্ত নয় কি? কবি মহৎ চরিত্রকে একটা মুহূর্ত্তেই প্রদর্শিত করিয়াছেন। সীতা দেবী যখন পতি-ভক্তিকে হৃদয়ের সর্ব্বময় প্রাণ ও দেবী করিয়া মা ধরণীর অমৃতময় বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেই এক মুহূর্ত্তে বাল্মীকি-প্রণেতা সীতা চরিত্রের দেবী-মহিমা প্রকাশিত করিলেন। চরিত্র আত্মিক জীবন—ব্যক্তিত্ব পরমপুরুষের প্রতিকৃতি—তাহা পূর্ণ ও অপূর্ণ। তাহার অনন্ত সম্ভাবনা, অনন্ত বিকাশ,—কিন্তু এই সম্ভাবনার মধ্যে একটা পূর্ণতা আছে, অনন্ত বিকাশ বা গতির মধ্যে তাহার একটা পরিপূর্ণতার স্থিতি ও সমাপ্তি আছে; কালে তাহার গতি ও বিকাশ, অনন্তে তাহার পূর্ণতা, স্থিতি ও শান্তি। এই আত্মিক জীবন বা চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব কালাতীত, চিরন্তন, শাশ্বত, প্রতিমুহূর্ত্তে পূর্ণ প্রতিমুহূর্ত্তে আত্ম-স্থ, অনন্তে প্রতিষ্ঠ, অথচ কালের অধীন ও চিরবর্দ্ধনশীল। চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের বা আত্মিক জীবনের অর্থ কালাধীনের কালাতীত স্থিতি, অনন্তে নিত্যনবজন্ম—চিরশিশুত্ব অথবা কালাতীতের কালের চির উন্নতিশীল গতিতে আত্ম-বিকাশ—উহা কবি "fountain" সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন—Ever flowing, ever at rest. এই চরিত্রই ভগবানের আত্মপ্রকাশরূপ সৃষ্টি-ক্রিয়া—আবার চরিত্রই নিত্য নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে—তাহা হইতেই সাহিত্য শিল্প, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-পদ্ধতি, সমাজ, সভ্যতার জন্ম। এইজন্য বিধান বা ধর্ম্মের অর্থ চরিত্রসৃষ্টি এবং চরিত্রের আত্মপ্রকাশ। জীবনে চরিত্রে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আপনার ধর্ম্মপ্রচার করেন, নূতন যুগের অবতারণা করেন। যুগধর্ম্ম, যুগবিধান যুগাবতার ভিন্ন কি সম্ভব হয়? এই যুগাবতার পূর্ণ ও অপূর্ণ। কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, গৌর, মহম্মদ প্রভৃতি যুগাবতার ভগবজ্জীবনের নূতন আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা-রূপে তাহার অনন্ত সম্ভাবনা ও বিকাশ লইয়া পূর্ণ ও সকলের প্রতিনিধি। তাঁহার জীবন, চরিত্র, সাধনার মধ্যে সকলের বিকাশ, উন্নতি ও পরিত্রাণের বীজ নিহিত রহিয়াছে, এবং সকল মানবজীবনের ভিতর দিয়া সে জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এইরূপে সকল যুগাবতার ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি, বিশেষ অবতার, বিশেষ আত্ম-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র। খ্রীষ্টের মধ্যে কেশবচন্দ্র এই ভাবে পূর্ণতা দেখিতেন, মানবের পরিত্রাণের বীজ দেখিতেন, তাঁহার জীবন সকল জীবনে, চরিত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন ও সভ্যতায় ফুটিয়া উঠিতেছে, দেখিতেন। আবার খ্রীষ্টের জীবনের ও অনন্ত সম্ভাবনা কালে তাহা চির-উন্নতিশীল ও বর্দ্ধনশীল। খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণ যদি বিশেষ সৃষ্টি বা বিশেষ অবতার হন, এই জীবন-বিধানের ভিতর দিয়া প্রত্যেককেই বিশেষ সৃষ্টি, বিশেষ অবতার, অনন্ত সম্ভাবনাময় আত্মিক জীবনে পূর্ণপ্রতিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র লাভ করিতে হইবে। এইজন্য খ্রীষ্টের অবতার স্বীকার করিয়া কেশব সকলেরই অবতারত্বের আত্মিক বা দেব-জীবনের চির-নবীন চিরশিশু অমৃতময়

শাশ্বত জীবনের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেন। এইরূপে তিনি খ্রীষ্টকে মানবত্বের ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন এবং মানবকে খ্রীষ্টের দেবজীবনের উন্নত ভূমিতে উত্তোলন করিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবন বিধানের জীবন। তিনি যখন দেবজীবনে, আত্মিক জীবনে, চির-শিশু জন্মে সুপ্রতিষ্ঠ, তখন তাঁহার শক্তি, তাঁহার প্রতিভা, তখন তিনি পাপের অতীত, পুণ্যময় জীবনে জ্যোতিষ্মান্—আশার চন্দ্র; নতুবা তিনি দুর্ব্বল হইতেও দুর্ব্বল, পাপের অনন্ত সম্ভাবনায় ম্রিয়মাণ।

বিধান বা যুগ-ধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম, কেশবচন্দ্রের জীবনও সামঞ্জস্যের জীবন—বিশ্বাস ও বিজ্ঞানে সামঞ্জস্য, আদর্শে আদর্শে মিলন, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলন, চরিত্রে চরিত্রে মিলন, ধর্ম্মসাধন প্রণালীতে মিলন, সভ্যতায় মিলন, প্রাচীনে নবীনে মিলন। তাঁর জীবন ও ধর্ম্ম এমন কোন উচ্চভূমি লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে সমুদয় ধর্ম্ম, জীবন ও সাধন প্রণালী মিলিত হইয়া বিচিত্রতাময় ঐক্যে সুসঙ্গত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ বিশ্বের মিলনতীর্থ—ভারতের আত্মা মিলন প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের ইতিহাস ধর্ম্মের সাধনার ও জীবন ও সভ্যতার মিলন ইতিহাস। উপনিষদে ও গীতায় কর্ম্ম-মার্গ, ভক্তি-মার্গ ও জ্ঞানমার্গের মিলন, বৌদ্ধধর্ম্মে আর্য্য ও অনার্য্যে মিলন, নানক, কবির, শ্রীচৈতন্যে—হিন্দু মুসলমানের মিলন। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান যেই এককে নির্দ্দেশ করে, ভারতীয় transcendentalism তাহাতে, এক পরম পুরুষ—যো দেব অগ্নৌ যো অপ্সু, যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, যো সর্ব্বং ভুবনমাবিবেশ—তাঁহারই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ প্রদর্শন করে; অন্য পক্ষে Science ভারতীয় transcendentalismকে একটা reality প্রদান করিয়াছে। বিজ্ঞান এককে নির্দ্দেশ করে,—এক শক্তির বিচিত্র প্রকাশ ঘোষণা করে। ইচ্ছা-শক্তি ভিন্ন ত আর কোন শক্তির কল্পনা করা যায় না; আর সংকল্প-বিহীন ইচ্ছা-শক্তিও কল্পনা করা যায় না। আর বিশ্বের গতি এক মঙ্গল উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে। সেই এক বিশ্বব্যাপী মঙ্গলসংকল্প ইচ্ছাই পরম পুরুষ; সেই পরমপুরুষ আপনার কালাধীন ক্রমিকপরিবর্দ্ধনশীল চিরবিকাশময় মূর্ত্তি রচনা করেন। সকল গতিশীল পরস্পর-বিরোধী পুরুষকে আপনার মধ্যে অন্তর্ভূত ও সমঞ্জসীভূত করিয়া তিনি পুরুষোত্তম। সেই মহান্ আত্ম-স্থ পুরুষ আপনার মধ্যেই বহু বিভিন্ন চরিত্র-সৃষ্টিতে নিত্য-লীলাময়, আনন্দ-বিলাস-সম্ভোগময়—তাই তিনি নিত্য বৈকুণ্ঠ, নিত্য-বৃন্দাবন, শ্রীধাম—এখানে নিত্য-মানব—Son—Logos, বাণী Chistos, রাধা-প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতি। এই পরম পুরুষ, এই নিত্য বৈকুণ্ঠ—প্রত্যেক মানব-আত্মায় বহু পুরুষকে সমন্বিত করিয়া পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে পরিবার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত আছে। মানব-আত্মায় পরিবার ও সমাজ রচনা করিয়া এই পরম পুরুষ পরিবার ও সমাজ গঠন করেন। এই জন্যই বলা যাইতে পারে—পরিবারই পরিবার রচনা করে, সমাজই সমাজ গঠন করে, Constitution বা রাজ্য-সংস্থানই রাজ্যসংস্থান আনয়ন করে, মণ্ডলী-প্রাণই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করে, Institution—Institution স্থাপন করে। Peter the Great বলিয়াছিলেন—I am the constitution, কারণ রাজ্যের সকল স্বার্থ

(interest) তাঁহাতে সমন্বিত। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিম্বা মণ্ডলীগত জীবন-আদর্শ (যাহা পুরুষোত্তম চিরশক্তি-শালী ও ক্রিয়াশীল)—যে জীবন ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ (representation or great man) রূপে প্রকাশিত করিয়াছে, সে জীবন ও চরিত্র অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্তম অপর জীবন ও চরিত্র গঠন করিয়াছেন, এবং এই চরিত্রের সমবায়ে পরিবার ও সমাজ গঠন করিয়া কালের সীমায় আপনার উচ্চ প্রতিষ্ঠান প্রদর্শন করিতেছেন। এই পরমপুরুষের জীবন ও চরিত্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষের মধ্যে পরিবার, সমাজ, জাতি গঠন অসম্ভব। এই পুরুষোত্তম—যাঁহাতে সকল পুরুষের সমন্বয়—যিনি বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ, তিনি প্রত্যেক হৃদয় ও আত্মাকে এই বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গে পরিণত করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ-প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ভারতকে—এক কল্পিত গতিহীন স্থিতি—পার্থক্যবিহীন একত্বের, স্বার্থ বিরোধের বিনাশজনিত শান্তি লইয়া নয়।—এই পুরুষোত্তম,—যাঁহাতে গতি আছে, স্থিতি আছে, বিচিত্রতা আছে, ঐক্য আছে—আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিত্য সংগ্রাম আছে, নিত্য সিদ্ধি, নিত্য আত্ম-প্রাপ্তি, নিত্য শান্তি আছে—এই পুরুষোত্তমকে লইয়া পশ্চিমের পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সমুদয় জটীল সমস্যার সমাধান আনিতে হইবে। প্রাকৃতিক জীবনের বিরোধী প্রবৃত্তি ও স্বার্থের মধ্যে গঠনের বীজ রহিয়াছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর অভিষেক দ্বারা, বিসর্জ্জনের মন্ত্র দ্বারা, পুত করিয়া না লইলে তাহা গঠনের উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে না। মহত্তর জীবনে ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জ্জন করিয়া ক্ষুদ্রকে মহৎ, মহৎকে ক্ষুদ্রে প্রতিষ্ঠা না করিলে বৈকুণ্ঠের শান্তি, আত্ম-প্রাপ্তির ভূমানন্দ এবং আনন্দজাত পূর্ণ ও সৌন্দর্য্যময় গঠন ও সৃষ্টি অসম্ভব। স্বার্থের গঠন-বীজ অবলম্বন করিয়া যে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে—সেই জাতীয় জীবন ভারতের নিকট বিসর্জ্জনের মন্ত্র দ্বারা পুরুষোত্তমের প্রভাবে আন্তর্জাতিক সম্মিলনের শ্রেষ্ঠ জীবনে শান্তি ও স্থিতি লাভ করিবার জন্য নব অভিষেকের প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আত্মঘাতী জাতির সংঘর্ষ সাধন—নির্ঘোষে পৃথিবীর বক্ষকে বিদীর্ণ করিতেছে; আর বসুন্ধরা বিশ্বপিতার নিকট শান্তি ভিক্ষা করিতেছে। হৃদয়হীন প্রতিযোগীতা, নখদন্তী সংগ্রাম ও পাশব-শক্তি-দৃপ্তের উৎবর্ত্তন-মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমের সভ্যতা আত্ম-রুধির-পায়ী ছিন্নমস্তার বেশে কি বিকট তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করিতেছে; আর মানব-আত্মা, স্বয়ং বৈকুণ্ঠ, মহা প্রকৃতি, চিরন্তন সন্তান খ্রীষ্ট আজ কি পুরুষোত্তমের অবতরণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে না?

কেশবচন্দ্রের জীবন পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমন্বয়—পুরুষোত্তমের আত্ম-প্রতিষ্ঠায় যে জীবন ও চরিত্র, তাহাতে পশ্চিমের উদ্দাম কর্ম্ম-ময় সংগ্রামময় জীবন, বিরোধের উল্লাস, প্রকৃতির উপর আধিপত্য এবং প্রকৃতির শক্তিতে শক্তিমান জীবন, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ—এই সকলের সঙ্গে ভারতের অনন্তে স্থিতি, ব্রহ্ম-দর্শন, অমর জীবনের শান্তি ও পূর্ণতায় আনন্দ সমন্বিত হইয়াছে। কেশবের জীবন এই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন সাধন করিয়া এক নূতন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে।

গীতার পঞ্চদশ সর্গে—পুরুষোত্তমের এই-রূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি-ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ
পুরুষোত্তমঃ ॥

ক্ষর এবং অক্ষর নামে এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তাহার মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষর পুরুষ, আর কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন; যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম, এই জন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি।

ক্ষর ও পুরুষ—কালে প্রকাশমান পুরুষ; এবং পুরুষোত্তম ক্ষরের অতীত ও অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, পুরুষোত্তমে অক্ষর ও ক্ষরের সমন্বয়; তিনি এক দিকে আত্মস্থ, অপর দিকে কালে প্রকাশমান; এবং আত্মস্থ স্বরূপের মধ্যে প্রকাশমান সকল পুরুষ সমন্বিত; এইজন্য পুরুষোত্তমের আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক পুরুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর পুরুষ হইয়া আপনারই আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠারূপ পরিবার ও সমাজ সৃষ্টি করেন। এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষোত্তমে সমন্বিত—ইহা গীতা উক্ত সর্গের প্রথম শ্লোকে ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ বৃক্ষের symbolism মূর্ত্তিপরিকল্পনায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদস বেদবিৎ।

এই পুরুষোত্তম সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন, তিনি সকলকে আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এজন্য তিনি সর্ব্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই খানেই transcendental realism—বাস্তবের ভূমাত্ব-বাদ অথবা personal idealism—পুরুষোত্তম-বাদ। যে চরিত্রে এই পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুগ-ধর্ম্ম প্রণয়ন করেন, নূতন যুগ, নূতন সভ্যতার বীজ স্থাপন করেন—সে চরিত্রও এক দিকে representative অপর দিকে creative—একদিকে All, অপর দিকে *ahead of all* সর্ব্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যে স্রোতের কথা কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তাহাতে ঝাঁপ দেওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ, এই স্রোত তীর্থ হইতে তীর্থে, জীবন হইতে জীবনে, চরিত্র হইতে চরিত্রে লইয়া গিয়া সাধককে কোন্ মহাতীর্থে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের তীর্থে লইয়া যায়। সাধক যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করেন, হোমানল প্রজ্বলিত করেন, সকলই আহুতি প্রদান করেন, দেবতাদের নানা মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করেন, মহাদেবের আবির্ভাবের সহস্রসূর্য্যপ্রভ উজ্জ্বল মহিমার ধ্যান করেন, কিন্তু একবার সর্ব্বশূন্য হইয়া এই স্রোতে ঝাঁপ না দিলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, তপস্যা সিদ্ধ হয় না, দেবতাদের আবির্ভাব, মহাদেবের দর্শন লাভ হয় না।

এই স্রোত বিধানের স্রোত—তাহা জীবন স্রোত। তীর্থ জীবন্ত হইয়া ভক্তের জীবনে নব নব জন্মলাভ করিয়া তাহাকে নূতন নূতন জন্মে বিকশিত করে। অতীত এখানে অতীত নয়। জীবন অতীত জানে না। অতীত বর্ত্তমানে নূতন জন্মলাভ করে। অতীতের ভক্তগণ, সাধকগণ, যুগপ্রবর্ত্তকগণ সকলেই

কালের গর্ভে কত যুগের সুপ্তি হইতে নব জাগরণে জাগ্রত হইয়া উঠেন। অতীত এখানে অতীত নয়--বর্ত্তমানে নব জাগরণ লাভ করিয়াছে। এই জীবনের স্রোতে পুরাতন ও নবীন একীভূত।

পুরাতন যাহা কিছু তাহা মৃত্যুর অধীন, কালের কুক্ষিগত! কেশবচন্দ্রে পুরাতন আপনার মৃত্যুলাভ করিয়াছিল। তিনি সকল পুরাতনকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাহা কালের অধীন তাহাকে কালের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যাহাকে পুরাতন বলি তাহাতে শাশ্বত চিরন্তন অমৃতময় জীবন আছে, তাই পুরাতন তাঁহার মধ্যে নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার বর্জ্জন দেখেন, এবং তৎপর তাহাই আবার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার স্ববিরোধীতা দেখেন, তাঁহারা জীবনের তত্ত্ব জানেন না। জীবন চিরনবীন, তাহা চিরন্তনের আত্মপ্রকাশ, তাহা কবির ভাষায়—নিত্য নূতন নূতন নবীনতার মালা গাঁথে। তাহা পুরাতন বা অতীতের কি কালের অধীন হইতে পারে না। পুরাতন মৃত্যুর অধীন—তাহা মৃত্যুরূপী, তাহাকে মরিতে না দিলে, তাহার ভিতরকার শাশ্বত নিত্য চিরনবীন জীবন নব-জন্ম লাভ করিয়া তাহার নব-পরিচয় প্রদান করিতে পারে না, এই নব-পরিচয়ে নূতন অবস্থা সমবায়ের নূতন সমস্যার মীমাংসা রহিয়াছে। বিসর্জ্জন না করিয়া কেহ প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে পারে না—কারণ, বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া শাশ্বত আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যদি কেশবচন্দ্র সকল প্রাচীনকে পরিত্যাগ করিয়া আবার প্রাচীনকে জীবনস্রোতে নব-জীবনরূপে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রাচীন যে প্রাচীন নয়, তাহাই প্রমাণিত হয়—প্রাচীনের শাশ্বত জীবনই আত্ম-পরিচয় প্রদান করে। তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিপূজার গভীর রহস্যে প্রবেশ করিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার গভীর তত্ত্বে নবজীবন লাভ করিলেন, অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদের ভূমিলাভ করিলেন,—গুরু শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলকে ও সকল গ্রন্থকে শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন, বহুদেববাদ পরিত্যাগ করিয়া ঘটে ঘটে অবতীর্ণ ভগবানকে দর্শন করিলেন, অবতারবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্রের আত্ম-বিসর্জ্জনে অনন্তপূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ করিলেন, কঠোর জ্ঞানানুশীলনের ভিতর দিয়া হরিলীলামৃত পান করিলেন, ভক্তি-রস পানে উন্মত্ত হইলেন,—জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়া অমৃতানন্দ লাভ করিলেন, পরিবার বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গের মিলন সম্ভোগ করিলেন, সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সমাজের মুল প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করিলেন, কঠোর বৈরাগ্যের বিসর্জ্জনের মধ্যে নব-জীবন লাভ করিলেন। বিসর্জ্জন ভিন্ন প্রকৃত প্রাপ্তি হয় না। এখানেও সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। Everlasting Naya মধ্য দিয়া Eternal yeaতে স্থিতি। এই সমুদয় প্রাচীনকে তিনি নব-জীবন—নূতন চরিত্ররূপে লাভ করিলেন এবং ধর্ম্ম, সাধনা, ভাব, ভক্তি, তত্ত্ব, জ্ঞান তাঁহার নিকট জীবন্ত হইয়া চরিত্র-গৌরব প্রকাশ করিল। এজন্য তাঁহার নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্ট সাধনা—খ্রীষ্ট জীবন, হিন্দুধর্ম্ম, ঋষি-জীবন। তিনি ব্যক্তিত্ববিহীন ধর্ম্ম কি তত্ত্ব কল্পনা করিতে পারিতেন না।

লোকে জিজ্ঞাসা করেন—ব্রহ্ম কি আমার

পক্ষে যথেষ্ট নন, তবে এই খ্রীষ্ট-তীর্থ, বুদ্ধ-তীর্থ, চৈতন্য-তীর্থ প্রভৃতিতে নবজীবন লাভ করার প্রয়োজন কি? তিনি যে বিধানের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে জীবন, যে চরিত্র-তীর্থে তাঁহাকে নিয়া নব-জীবনে নব দীক্ষা দিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার যে বলিবার কিছুই ছিল না। এই বিধান-স্রোত তাঁহাকে যে তীর্থে তীর্থে লইয়া গিয়াছিল, গুরু হইতে গুরুর নিকট, শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রের নিকট লইয়া গিয়াছিল, সে সকল বাহিরে নয়, তাঁর নিজের আত্মার গভীরতায় অনন্তে চিরশায়িত ছিল, এবং তাঁরা জীবনরূপে চরিত্ররূপে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে ক্রমে উচ্চতর মহত্তর বিস্তৃততর, পূর্ণতর জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহাকে পুরুষোত্তমে—যাঁহাতে সকল পুরুষ সমন্বিত হইয়াছে—সেই পুরুষোত্তমে নব জন্ম দান করিয়া পুরুষোত্তমের নব-উপাসনা ও ধ্যানের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। পুরুষোত্তম যে যে পুরুষে কালের সীমায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পুরুষোত্তমের নব-বিধানই কেশব-চন্দ্রের জীবনকে সেই সকল প্রকাশে নব নব জীবন দান করিয়া পুরুষোত্তমের জীবন-পূজার উপযুক্ত করিয়াছিল। আর বিধান যে উপাস্য দেবতার নিকট তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন, তিনি ত আপনার একাকিত্বে স্থিতি করেন না, তিনি এক ও বহু—সর্ব্বাতীত ও সর্ব্ব, সকল পুরুষের সমন্বয়ে পুরুষোত্তম, নানা চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া আত্ম-স্থ। কাজেই বহু প্রকাশ পরিত্যাগ করিয়া একের পূজা তিনি করেন নাই; একে-বহু, বহুতে একের পূজা করিতেন বলিয়া একের সঙ্গে বহু প্রকাশকে দেখিতেন—এই সর্ব্ব,—কোথাও পরিস্ফুট ও প্রকট, আর কোথাও সুপ্ত, অপ্রকাশিত, সম্ভাবনরূপী।

পূর্ণ যিনি তাঁর সৃষ্টি বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা পূর্ণ। তিনি প্রকাশময়। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াও 'বহু'তে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'বহু' তাঁহার প্রকাশ ক্ষেত্র বলিয়া 'বহু'রূপে পূর্ণ। এখানে পূর্ণ পিতার সন্তান পূর্ণ, পূর্ণ জননীর শিশু পূর্ণ। 'শিশু' চিরকাল পূর্ণ;—ফুল ফুলরূপে পূর্ণ, বীজ—বৃক্ষের সম্ভাবনা রূপে পূর্ণ; বৃক্ষ—ফুলফলের আধার-রূপে পূর্ণ; এবং বিকাশ—পূর্ণতা হইতে পূর্ণতায় বিকাশ—শিশু জন্ম হইতে নবতর শিশু-জন্মে গতি। পূর্ণ যিনি তিনি কালের অতীত; তাঁর সৃষ্টিও নিত্য, কালাতীত, এবং কালের সীমার মধ্যে ও প্রতিমুহূর্ত্তে কালাতীত। পরমাত্মা যেমন কালাতীত, মানবাত্মাও কালাতীত। Carlyle বলিয়াছেন—আত্মার ইতিহাস কে লিখিবে? অতীত ও ভবিষ্যৎ তার কহিনী নিঃশেষ করিতে পারে না—সে যে কালাতীত। কালের সীমায় যে আত্মা নব নব জন্মে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা অনন্ত সম্ভাবনারূপে পূর্ণ; কিন্তু এই সম্ভাবনা কোথায় পূর্ণ হইয়াছে? ইহার কোন নিত্য type আছে,—এই type আদর্শের কল্পনা নয়; এই type নিত্য ব্যক্তি; এই type এক নয়; উহা বিচিত্ররূপী; এইরূপ 'বহু-পুরুষের' সমন্বয় সেই এক পুরুষোত্তমে। পুরুষোত্তমে—নিত্য-ব্যক্তি, এবং ব্যক্তি-সম্ভাবনা সমন্বিত।

এই বিধান কি যুগ-ধর্ম্ম মাত্র? এই যুগের অনেক সমস্যা আছে, মহৎ জীবনে সে সকল সমস্যা পূর্ণ হইয়াছে। নূতন যুগ-ধর্ম্ম এক নূতন প্রভাস-যজ্ঞ। সমুদ্র-সৈকতে সকল নদী যেথানে এক হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, সেইখানে নব-যুগের শ্রীকৃষ্ণ নূতন প্রভাস-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; সকল তীর্থ

তাঁহার মন্ত্র-প্রভাবে আপনাদের ঋষি জন্মে জাগ্রত হইয়া দেখা দিয়াছেন, সকল জীবনের ধারা, ধর্ম্মের স্রোত, যত যুগাবতার, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগকে বহন করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ দেব-বাণীর শাশ্বত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত। সকলে একস্বরে, একপ্রাণে একমন্ত্রে উচ্চারণ করিতেছেন—ওঁ ভগবতে নমঃ। বহিপ্র্রকৃতি, অন্তপ্র্রকৃতিতে বিলীন; অন্তর বাহিরে তাহার বিচিত্ররূপ দর্শন করিতেছে। এক মহৎ প্রাণ 'মহান্ পুরুষঃ বৈ সঃ'—সেই মহান্ পুরুষ সেই বিশাল সমুদ্র বক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া প্রকাশিত—এবং সেই প্রকাশের জ্যোতিতে সকলে স্থির-দৃষ্টি। আর প্রকাণ্ড বান ডাকিল; বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্র প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদয় যজ্ঞ-ভূমি, দেব-মানব সংঘকে আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া ফেলিল। আর এই প্রলয় কাহাকেও বিনষ্ট করে নাই; আবার সকলকে নিজ নিজ শাশ্বত-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিল,—প্রলয় সেই পরম পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবার তাঁহার স্বর্গ-রূপ, বিশ্ব-রূপ, বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি, মানব-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন,—তাঁহাতে সকল দেবগণ, মানবগণ, নদ নদী পর্ব্বত সমুদ্র, সকল যুগের সকল আদর্শ, নিত্য, অমর জীবন-ধারা সমুদয় এক প্রাণে অন্তর্লীন 'বহু'র অভিব্যক্তিরূপে, এক পুরুষের 'বহু'তে আত্ম-প্রতিষ্ঠারূপে, প্রকাশিত হইল।

কেশবচন্দ্র কি নিয়ে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন?—হিন্দু সাধনা জননীরূপে আপনার শোণিতে পুষ্ট করিয়া তাঁহাকে জন্ম দান করিয়াছিলেন; ভক্তি তাঁহার কৌলিক ধর্ম্ম; তিনি নামাবলি গায়ে দিতে, হরি-নামের ছাপে তাঁহার শরীর রঞ্জিত করিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টের চরিত্র প্রভাবে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি বাইবেল পড়িতেন, বিবেকের বাণী শুনিতেন, বালকের ন্যায় কেবল প্রার্থনা করিতেন। তিনি বালক-কাল হইতে আপনাতে আপনি থাকিতে পারিতেন না; দশ জনকে নিয়ে তিনি 'আপনি'; দশ জনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠ। তাঁর নিজের ভাব, নিজের চিন্তা, নিজের জীবন-সমস্যা, নিজের কর্ম্ম ও তপস্যা—সকলের ভাব, সকলের চিন্তা, সকলের সমস্যা, সকলের কর্ম্ম ও তপস্যা। নিজের কথা সকলের প্রাণে প্রতিধ্বনি তুলিত; আর সকলের প্রাণের নিগূঢ় ভাব তাঁহাতে ভাষা ও মূর্ত্তিলাভ করিত। তিনি প্রাণ, মন ধ্যান, ধারণা, সমাধির ভিতর দিয়া আপনার জীবনকে গঠন করিয়াছেন। কত অধ্যয়ন করিতেন, চিন্তা করিতেন, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ, দেশের গতি ও নিয়তি ও বর্ত্তমান অবস্থা, নিজ জীবনে ভগবানের নিয়োগ, ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ও সাধন,—বিশ্বের ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম-চিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, বিজ্ঞান-তত্ত্ব তিনি অধ্যয়ন করিতেন, চিন্তা করিতেন, ধ্যানযোগে ধারণা করিতেন, সমাধিযোগে সকলের সঙ্গে একীভূত হইয়া পূর্ণ প্রকাশময় জীবন লাভ করিতেন; এবং পূর্ণ জীবনই প্রকাশময়, যেখানে পূর্ণতা সেখানে প্রকাশ; আত্মস্থিতিতে এক পূর্ণতা আছে—সেই পূর্ণতা আনন্দময় প্রকাশ লাভ করিয়াই প্রকৃতরূপে পূর্ণ হইয়া উঠে—"আনন্দাৎ খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে।" পূর্ণ-তার আনন্দময় প্রকাশই সৃষ্টি;—প্রলয়ের পূর্ণতা—আনন্দময় সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ধারণা যখন সমাধির ভূমিতে আত্মার সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়—আত্ম-যোগ, আত্ম স্থিতির উপাদান রূপে যখন আপনাকে লাভ করে, তখন ধারণা নিজের সাফল্যের ভিতর সুদৃঢ় ও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। যে ধারণা জীবনে সাফল্য লাভ করে না, সে ধারণা কল্পনা মাত্র। কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রত্যেক ধারণা সমাধি প্রভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহার গভীরতা ও শক্তি। কেশবচন্দ্র রজনীর পর রজনী, দিনের পর দিন, অধ্যয়ন, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি (ধারণাকে আত্মার সঙ্গে একীভূত করিয়া পূর্ণতর আত্ম-দৃষ্টি ও পূর্ণতর জীবন লাভ)—এই সকলের ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিয়াছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র বিসর্জ্জনের একমাত্র মন্ত্রই সাধন করিতেন। অর্জ্জন ভিন্ন বিসর্জ্জন অর্থশূন্য। আমি অধ্যয়ন চিন্তা ধ্যান ধারণা সমাধি-যোগে আপনার কোন উচ্চতর অবস্থা লাভ করিলাম না, আমার বিসর্জ্জন কোথায়? আবার কর্ত্তব্য সাধনের মধ্য দিয়াও কেশব-চন্দ্র আপনার জীবনকে উচ্চতর মহত্তর করিয়া লইয়াছিলেন। মানব-জীবন সম্পর্কময়; সম্পর্কের ভিতর দিয়াই পুষ্ট, বর্দ্ধিত। সম্পর্ক বিরহিত জীবন জীবনই নয়। এখানেও অর্জ্জনের জন্য বিসর্জ্জনের মন্ত্র তাঁহার জীবনে উচ্চারিত হয়। অর্জ্জন না হইলে যেমন বিসর্জ্জন অর্থশূন্য, তেমন বিসর্জ্জ-নের ভিতর দিয়া—অনন্ত জীবনে আমার ক্ষুদ্র জীবনকে আহুতি দান করিয়াই পূর্ণতর রূপে সেই জীবন অর্জ্জন করা হয়। শূন্যের ভিতরেই নব-সৃষ্টি। শূন্য না করিতে পারিলে পূর্ণতর জীবন দেখা দেয় না। অর্জ্জন—বিসর্জ্জন—অর্জ্জন, জন্ম—মৃত্যু—জন্ম, সৃষ্টি—প্রলয়—সৃষ্টি এই cycleএ জীবন রথ ঘুরিতে ঘুরিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কেশবচন্দ্রের জীবন বিসর্জ্জন—পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, মহা-প্রলয়,—অজানিত করুণার স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়া। বিসর্জ্জন আপনাতে স্থিতি করে না, প্রলয় আপনার পরিসমাপ্তি আপনাতে পায় না; ইহা বীজাকার সৃষ্টি, অর্জ্জনের মূল।

আপনাকে একেবারে শূন্য করিয়া করুণার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়ার নাম প্রার্থনা। আমি যদি আমার উপর নির্ভর করি, আমার অর্জ্জনের ইট পাথর সাজাইয়া যদি জীবন মন্দির প্রস্তুত করি, তবে সেখানে প্রার্থনার স্থান কোথায়? আমার অর্জ্জন চাই, সেই অর্জ্জন যখন আপনার ব্যর্থতায় শূন্য হইয়া যায়, তখনই করুণার উপর একান্ত নির্ভর; আর সেই করুণার প্রতি বিশ্বাস-নয়নে তাকান, তাহারই নাম প্রার্থনা। এই প্রার্থনা কেশবচন্দ্রের অবলম্বন, তাঁহার গুরু, জীবন পথের সম্বল ও সঙ্গী। কেহ কেহ বলেন—প্রার্থনা নিম্নাঙ্গের সাধনা,—উহা তাঁহার প্রথম জীবনের সাধনার ভূমি। প্রার্থনা তাঁহার জীবনের আদিতে, প্রার্থনা মধ্যে, প্রার্থনা অন্তে। প্রার্থনাই গভীর হইতে গভীরতর হইয়া তাঁহাকে যোগ সমাধির গভীর-তায় ভক্তি-প্রাণ প্রদান করিয়াছিল। প্রার্থনা—বিশ্বাস-প্রাণ বিসর্জ্জনের মন্ত্র। ভগবানের করুণা এক নূতনবিধানরূপে প্রাণের অভ্যন্তরে বহিয়া যাইতেছে—ইহা অনন্ত বিশাল পূর্ণ জীবনের বিধান—অতীত, ভবিষ্যৎ লইয়া পূর্ণ, স্বর্গ মর্ত্ত্য লইয়া পূর্ণ,—দেহ মন, বুদ্ধি, আত্মা লইয়া পূর্ণ,—সকল জাতির, সকল সমাজের, সকল মানবের সকল ধর্ম্ম, সাধনা, জাতীয় জীবন, অনুষ্ঠান, সভ্যতা লইয়া পূর্ণ—শ্রেষ্ঠতর আত্মিক জীবনে সমুদয়ের পূর্ণতা; এই বিধান

চরিত্রে জীবনে, নব মণ্ডলী, নব সমাজে পুরুষোত্তমের আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এই করুণার বিধানে কেশবচন্দ্র তাঁহার সমুদয় অর্জ্জন ও আপনাকে অঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। এই বিধানের জীবন স্রোত তাঁহার মধ্যে খ্রীষ্ট জীবনকে এই যুগ-সমস্যাপূর্ণ করিবার জন্য যুগের উপযোগী করিয়া জন্ম দান করিলেন—খ্রীষ্টের জীবন আত্মার প্রার্থনাযোগে চিরবর্দ্ধনশীল জীবন, খ্রীষ্টের জীবন স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন, খ্রীষ্টের জীবন —প্রাচীন মানবের নবদেব-জীবনে জন্মলাভ, খ্রীষ্টের জীবন—দীন দুঃখীর সান্ত্বনা, নিরন্নের অন্ন, গৃহহীনের প্রাসাদ, অজ্ঞানের জ্ঞান-মন্দির, পরিবার সমাজের নব-প্রতিষ্ঠা ভূমি, নূতন রাষ্ট্র তন্ত্র, জীবন-সমস্যার মীমাংসা, মানবের ভগবজ্জীবনে প্রতিষ্ঠা, মানবের সকল সম্পর্কে বন্ধন—মুক্ত ও স্বাধীন স্থিতি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম খ্রীষ্টের জীবন বিসর্জ্জনের লীলা, মানবের দুঃখ ভার বহনের জীবন, সকলের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত অঙ্গাঙ্গী জীবন; এবং বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া নানা সম্পর্কের মধ্যে আত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই নূতন বিধান—খ্রীষ্ট জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁর জীবনে নব-ভারত—নব মানব রচনা করিলেন। এই খ্রীষ্ট জীবন—Self consecrated জীবন, বীজাকার পুরুষোত্তম। ইহা সম্পর্ক-বিরহিত জীবন নয়। এই জীবন—নিত্য শিশুজীবন—নিত্য নব জীবন। এই জীবন বড় হইয়া পরিবার রচনা করিল, দল মণ্ডলী গঠন করিল, সকলের ও সকল জাতির সুনির্দ্দিষ্ট নিয়তি-সমন্বয়ে সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আদর্শ অঙ্কিত করিল, ভগবজ্জীবনের স্বাধীনতার ভূমির উপর স্বার্থ-বিনাশে স্বার্থ সমন্বয়ের নূতন রাষ্ট্র-তন্ত্র প্রদর্শন করিল। আবার এই কর্ম্ম-বহুল বিচিত্রতাময় জীবন কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আত্মা আপনাতে প্রবেশ করিল, আর প্রাচীন ঋষি বংশ এই জীবন হইতে উত্থিত হইয়া আত্ম-স্থিতির মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন; আত্মার অনন্ত গভীরতায় আত্মারাম সমাধিতে নিমগ্ন; আর সেই পুরুষোত্তম সমাধির ভূমিতে নব-যুগের কর্ম্ম-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কর্ম্ম-সাধনায় আত্মস্থিতি ও সমাধির গাম্ভীর্য্য সংযুক্ত করিলেন;—আর আত্মা কর্ম্মে-সমাধিতে, ধ্যানে-সম্ভোগে,—পুরুষোত্তম, নরোত্তমের বিশ্ববিমোহন পরম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সকল ইন্দ্রিয়, সকল প্রাণ, সকল প্রবৃত্তি লইয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, আর তাঁহাকে ঘেরিয়া প্রমত্ত আনন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাতে ভক্তিযোগে বিলীন হইল, এই ভক্তিযোগে, কর্ম্মযোগ ও সমাধিযোগ পূর্ণতা লাভ করিল।

কেশবচন্দ্র বলিলেন—তাঁহার যোগ ছিল না, ভক্তি ছিল না;—ছিল বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য। বিবেকের অর্থ—শ্রেয়ের নিকট প্রেয়ের বিসর্জন, বৈরাগ্যের অর্থ—মানব জীবনের—নানা সহজ প্রবৃত্তি সূত্রে গ্রথিত সম্পর্ক-জনিত মানবজীবনের বিসর্জ্জন,—আর বিশ্বাস —এই বিসর্জ্জনে বিশ্বাস, বিসর্জ্জনের মধ্যেই নব জীবনের বীজ নিহিত আছে, পরমপুরুষ নব জীবন দেওয়ার জন্য এই বিসর্জ্জনের মধ্যে চিরক্রিয়াশীল, এই বিশ্বাস,—এই পরিত্রাণে বিশ্বাস বিশ্বাসমূলক, করুণৈকনির্ভর বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধমুখী দৃষ্টির নামই প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই খ্রীষ্টজীবন—নব উন্নততর-বৃহত্তর জীবনে নিত্য নব দীক্ষা। এই প্রার্থনাকে গুরু ও পথপ্রদর্শক করিয়া তিনি চলিলেন, আর যাহা ছিল না সকলই পাইলেন,—কারণ প্রার্থনাতে সকলই বীজরূপে নিহিত আছে। যোগ ছিল না, ভক্তি ছিল না, যোগ পাইলেন, ভক্তি পাইলেন, পাপী যিনি তিনি প্রতিদিন অমৃত আত্মিক জীবনে দীক্ষা লাভ করিয়া পুণ্যময়ের পুণ্য জ্যোতিতে নব জীবন লাভ করিতেন,—আর পাপী কি করে পুণ্য হইতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পাপী জগতের আশার বস্তু হইলেন। যিনি জীবন ভগবজ্জীবনের স্রোতে বিসর্জ্জন করেন, তাঁর জীবনই শাস্ত্র ও ভগবানের বাণী; জীবনই বেদ, জীবনই সংহিতা। তাঁকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি কে প্রদান করিল? ভারতের ঋষি রামমোহনের প্রাণে ঋষিদৃষ্টি নূতন করে খুলে দিলেন, ভারতের যোগ-আত্মা মহর্ষির প্রাণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নবযুগের মহর্ষি পদে বরণ করিল, আর ভারতের ভক্তি-প্রাণ নবযুগের নব ভক্তিরূপে কেশবের প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" রূপে প্রকাশিত করিলেন। আমরা যদি তাঁহার কোন উপাধি দিই, তার মূল্য কত? আর যদি ভারতপ্রাণ রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ কেশবের প্রাণে নূতন জীবন লাভ করে থাকেন, তখন তাঁদের জীবন গ্রন্থ যুগের নববেদ, নব-সংহিতা, নব-পুরাণ ও নব তন্ত্র। কেশবচন্দ্র এইজন্য নিজের জীবনকেই নিজের একমাত্র বেদ, নিজের একমাত্র শাস্ত্রসংহিতা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ জীবনের ভিতর দিয়াই তিনি ভগবানের আত্ম-পরিচয়, জীবনের বিকাশ ও সাধনা প্রণালী সকল যুগের সকল ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন।

এই যুগের বিধানের বিশেষত্ব কি? ইহা পবিত্রাত্মার বিধান, ইহা খ্রীষ্টের নবজন্ম—উহা সকল বিধানের নবজাগরণ, উহা জীবন-সমন্বয়। ইহা পূর্ণজীবনের বিধান;—সম্পর্কজনিত কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, উহা সেই ব্যক্তিত্বের বিধান,—উহা পুরুষোত্তমের আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিধান। অপর বিধান কোন বিশেষ ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া অন্যেরা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। এই বিধান ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যোগ ও পুরুষোত্তমের প্রভাবে জীবন-সমন্বয়ের বিধান।

শ্রীবেণীমাধব দাস

হিন্দুর ঈশ্বরভাব বিকাশে পুরাতত্ত্বের নির্দ্দেশ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ ধারণা হিন্দু মাত্রেরই নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত। এই ধারণাটী ঐতিহাসিক সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই সংগঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রটীতে যে হিন্দু ধর্ম্মের সমগ্র ইতিহাসই সংক্ষেপে সংগ্রথিত রহিয়াছে, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। সেই সূত্রটী উদ্ধার করিতে পারিলে কেবল হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাসই আমাদের নিকট অভূতপূর্ব্ব সুগমতা প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে, কিন্তু আর্য্য-জীবনের ইতিহাসও সুগমতা প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিতে যে প্রথমে নিজ জাতি বা সমাজের আদর্শে করিবে, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। আর্য্যদিগের

ঈশ্বর-ভাবে আমরা সেই আদর্শই প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ব্রহ্মাতেই আর্য্যদিগের প্রথম ঈশ্বর ভাবের বিকাশ হইয়াছে। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। সমস্ত মানব তাঁহার প্রজা বা সন্তান। সুতরাং তিনি প্রজাপতি। তিনি সমস্ত মানব জাতির সর্ব্বপ্রকারের বিধান-কর্ত্তা। সুতরাং তিনি 'ধাতা', 'বিধাতা' বা 'বিধি'।

মানবজাতির আদি ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে মানবদিগের একজন জাতীয় নেতা (Tribal chief) থাকে। তাহার দ্বারাই তাহাদিগের সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। তখন জাতীয় সাধারণতন্ত্রতা (Communal rights) প্রচলিত থাকা হেতু কাহারও ব্যক্তিগত কোন অধিকার না থাকায় সকলেই এক সাধারণ নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাতে সন্তানের প্রতি পর্য্যন্ত কাহারও বিশেষ অধিকার থাকে না। সকল সন্তানের প্রতিই জাতির সাধারণ অধিকার বর্ত্তমান থাকে এবং তখনও স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের উৎপত্তি না হওয়ায় স্ত্রী পুরুষের যথেচ্ছ বিহারের দ্বারা সন্তানোৎপাদন হওয়ায় সন্তান কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া সাধারণভাবে নেতারই নামে পরিচিত হয়।

ব্রহ্মাতে আমরা উল্লিখিত আদিম জাতীয় নেতার আদর্শই দেখিতে পাই। তিনি জাতীয় সকল সন্তানেরই সাধারণ আদি পালনকর্ত্তা বলিয়াই "প্রজাপতি" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টিতে কেবলই মানসিক সৃষ্টি ছিল, তাহাতে যথেষ্ট প্রজা বিস্তার হইত না বলিয়া পরে তিনি নিজদেহ দ্বিধা ভাগ করতঃ নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেন। এই প্রকারে তিনি কয়েকটা সন্তান সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগেরই দ্বারা প্রজাবিস্তারের উপায় উদ্ভাবন করেন। এই প্রজাবিস্তারকারী তদীয় সন্তানগণও 'প্রজাপতি' নামেই আখ্যাত হইয়াছেন। এই সমস্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগের নিকট ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম যথেচ্ছ বিহারের দ্বারা যে সন্তান উৎপাদিত হইত, তাহাতে সন্তানের লালন পালন সমুচিত রূপে হওয়া সম্ভবপর না থাকায়, লোকবৃদ্ধি যথোচিতরূপে হইতে পারিত না বলিয়াই স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গরূপে একত্র ভার্য্যা ও পতিরূপে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে সন্তানোৎপাদনের যেমন সুব্যবস্থা হয়, সন্তান সুরক্ষিত হওয়ারও তেমনই সুব্যবস্থা হয়। স্ত্রী পুরুষের এইরূপে পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গরূপে মিলিত হওয়া প্রথম ব্রহ্মার উপাসনাকালে হয় বলিয়াই তিনি নিজের দেহ ভাগ করিয়া নারী ও পুরুষের সৃষ্টি করেন, এইরূপ আখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রদিগের মধ্যে যাহাদিগের দ্বারা বিশেষরূপে প্রজাবৃদ্ধি হয় বলিয়া 'প্রজাপতি' নাম হয়, দক্ষ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের দ্বিতীয়রূপ 'মহেশ্বর', এই দক্ষেরই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহেশ্বরেই আমরা প্রথম স্বামিভাবের বিকাশ দেখিতে পাই।* দক্ষকন্যার নাম 'সতী'। এই 'সতী' নাম হইতেই তিনি যে পতিব্রতা নারীর আদর্শ

* মহেশ্বরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে প্রাদুর্ভাবেই ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ বর্ত্তমান ;—

"ত্রিশূল পাণিরীশানঃ প্রাদুরাসীৎ ত্রিলোচনঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বর বপুর্দ্দুষ্প্রেক্ষ্যোঽতি ভয়ঙ্করং॥
বিভজাত্মানমিত্যুক্তা ব্রহ্মাচান্তদ্ধে ভয়াৎ।
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ।

কূর্ম্মপুরাণ—১১শত অধ্যায়।

ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সতী পিতা দক্ষকর্ত্তৃক পতিনিন্দায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আপনার পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পতি মহেশ্বরও তদীয় মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া তৎপ্রতি আপনার ঐকান্তিক প্রেমের একশেষ প্রমাণ প্রদান করেন। দুর্গা ও গৌরী সতীরই রূপ। শিবদুর্গা, হরগৌরী, স্বামী স্ত্রীর সম্যক্ মিলনেরই রূপক হইয়াছে। কেবল স্বামী স্ত্রীভাবেরই আদর্শ শিবদুর্গাতে রহিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু পিতৃমাতৃভাবের আদর্শ শিবদুর্গাতে আরও স্ফুটতর। শিবদুর্গার ধারণায় আমরা পরিবারের আদর্শই প্রাপ্ত হই। শিবদুর্গা যেরূপ পিতৃমাতৃভাবে উপাসিত হন, এরূপ আর কোন দেবতাই হন না। ইঁহাদের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধেরই রূপক প্রকটিত।

মহেশ্বর পিতারূপে স্বীকৃত ও পরিবারের কর্ত্তা। আর্য্যদিগের অপেক্ষাকৃত আধুনিক পারিবারিক জীবনের উপাস্য দেবতা হইয়া যেমন মহেশ্বর পিতা হইয়াছেন, আর্য্যদিগের আদিম জাতীয় জীবনের উপাস্য দেবতা হইয়া তেমনই ব্রহ্মা "পিতামহ" হইয়াছেন।

মহেশ্বর পিতৃরূপে কল্পিত বলিয়া উদার পিতৃবাৎসল্য ভাবের পূর্ণ আধার হইয়াছেন। আর্য্য সন্তান যেমন তদীয় অসীম স্নেহের পাত্র হইয়াছিল, অনার্য্য সন্তানও তুল্যরূপেই তদীয় স্নেহের পাত্র হইয়াছিল। এই সময়ে অনার্য্য জাতির পক্ষপাতী উদার মতাবলম্বী এক সম্প্রদায় আর্য্যজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহারা আর্য্যদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনার্য্যদিগেরও অধিকার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন মতাবলম্বী আর্য্যগণ এই সংস্কার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহাতেই প্রজাপতি দক্ষের সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞ অনার্য্য সহায় সংস্কারবাদী আর্য্যদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত হইল। দক্ষ শিবের শ্বশুর ছিলেন, শিবই শ্বশুরের যজ্ঞভঙ্গের প্রধান নায়ক হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই শিবের এক নাম "ক্রতুধ্বংসী" হইয়াছে। যজ্ঞ ব্রহ্মারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুষ্ঠান বা বৈদিক অনুষ্ঠান। শিব এই বৈদিক অনুষ্ঠানের ধ্বংসকারী বলিয়াই বোধ হয় সংহারকর্ত্তারূপে পরিচিত হইয়াছেন।

বিষ্ণু আর্য্যদিগের সামাজিক জীবনেরই উপাসিত দেবতা। সমাজের মধ্যে যেমন সাম্যভাবের স্ফুরণ দেখা যায়, বিষ্ণুর মধ্যেও তেমন সাম্যভাবের স্ফুরণই আমরা দেখিতে পাই। তিনি বালক কৃষ্ণরূপে গোপ ও গোপীদিগের সখা, আবার প্রৌঢ়কৃষ্ণরূপে অর্জ্জুনের সখা। শিব অনুচররূপে অনার্য্যদিগকে আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন—কৃষ্ণ নিজে অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ করিয়া এবং পুত্র ও পৌত্রদিগকে বিবাহ করাইয়া কুটুম্বরূপে অনার্য্যদিগকে আপনার দলভুক্ত করিয়াছিলেন। শৈবধর্ম্মে বা তান্ত্রিক ধর্ম্মে আর্য্য অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণ দ্বারা নবসমাজ গঠনের যে সূচনা আমরা দেখিতে পাইয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহারই পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই সমাজ প্রতিষ্ঠার ভাব হইতেই বিষ্ণু স্থিতিকর্ত্তারূপে পরিচিত হইয়াছেন।

পরিশেষে আমরা একটী মন্তব্য করিয়াই আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম যে ক্রমে প্রাপ্ত হই, উপরে তাঁহাদের বিকাশ সেই ক্রমে প্রদর্শিত না হইয়া ভিন্ন ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মার পর বিষ্ণুর বিকাশ উল্লিখিত না হইয়া মহেশ্বরের বিকাশ উল্লিখিত হইয়াছে এবং বিষ্ণুর বিকাশ সর্ব্বশেষে উল্লিখিত

হইয়াছে। আমরা মনে করি, ইহাই তাঁহাদিগের ঐতিহাসিক বিকাশক্রম। মহেশ্বরের বিকাশ 'রুদ্র' হইতে হইয়াছে। রুদ্র বেদের একজন প্রাচীন দেবতা। বেদে 'ইন্দ্র' রুদ্র অপেক্ষা পরবর্ত্তী দেবতা। ইন্দ্র অপেক্ষাকৃত নূতন দেবতা বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ ইন্দ্রের নাম ভারতীয় আর্য্য জাতির অন্যতর শাখা পারসীকদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ জেন্দাবেস্তায় দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণু বিকাশে ইন্দ্র অপেক্ষাও পরবর্ত্তী, তদীয় 'উপেন্দ্র' 'ইন্দ্রাবরজ' (ইন্দ্রের কনিষ্ঠ) নামে তাহার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। সুতরাং বিষ্ণুকে আমরা ত্রিমূর্ত্তির সর্ব্বশেষ বিকাশ বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।

মহেশ্বর ও বিষ্ণুর মধ্যে এই প্রকারে যেমন আমরা বিকাশ-ক্রমের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতেছি—তেমনই তাঁহাদের ধারণাসম্বন্ধে ব্যতিক্রমও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। মহেশ্বরের 'শিব' নামে ও দুর্গার 'সর্ব্বমঙ্গলা' নামে আমরা যে কল্যাণ ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহাতে বিষ্ণুর অপেক্ষা শিব ও দুর্গাতে "জগতের হিত" বা প্রতিপালন ভাব কম লক্ষিত হয় না, বরঞ্চ সংহার বা প্রলয়ের সহিত বিষ্ণুরই অধিক যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সূর্য্য, বিষ্ণুরই মূর্ত্তি। প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিবে, পুরাণে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। প্রলয় শেষে বিষ্ণুই 'নারায়ণ' রূপে প্রলয় পয়োধিতে শয়ান হইয়া থাকেন।

এই রূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বিকাশের মধ্যে আমরা পুরাতত্ত্বের একটী নূতন ক্রমের সন্ধানই প্রাপ্ত হইতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঘি ভাত।

নদীর তীরে একলা ব'সে, আপন মনে দিন কাটাই
কল্পনার সুতা ছাড়ি,এলিয়ে দিয়ে মন-নাটাই।
ভাবের ঘুড়ি উধাও হ'য়ে, ইথার ভেদি ঊর্দ্ধে ধায়,
আর তো মনে নাহিক ধরে বসুন্ধরার শ্যামতায়।
তখন ছিল পৃথ্বী ঘেরা সরল প্রাণের সরল হাস
তখন ছিল সখায় সখায় গলাগলি মধুর ভাষ।
Neptuneবৎ আশার আলোয় উজল ছিল সবার মন
পৃথ্বী ছিল স্বর্গরাজ্য স্বর্গ ছিল শুধু স্বপন।
আপন পরে মেশামিশি পরকে আপন করা
তেমন যদি থাকতো এবে গোলক হ'ত ধরা।
আপন এখন পর হ'য়েছে পর তো আছেই পর,
হায় কি হ'ল স্বার্থ বিষে জগৎ জর জর।
প্রাণ ভরা প্রাণ সমাজপতি (এখন) Cynic অবতার,
প্রাণের বড়াল 'এষা'র পরে যশ বুঝেছেন সার
দেবেন সেনের প্রাণের মাঝে নিবিয়ে দিয়ে আলো,
নিরাশ দেবী ব'সে আছেন এলিয়ে চুল কালো।
ভাঙ্গা হাঁড়ি জোড়া দেওয়া আমার 'শরৎ' বঁধু
'নিম' চিনেছেন পরিহরি পদ্ম পলাশ মধু।
ধরি মাছ না ছুঁই পাণি দুলালি জানেন,
Warm কি না বুঝতে নারি ভগাই জানেন;
পত্নীপরাণ চারুচন্দ্র ব্যস্ত ল'য়ে corporation
ভুলে গেছেন জুগিয়ে দিতে বন্ধুতায় healthy ration.

হাসের উৎস 'নিত্যকৃষ্ণ' চলে গেছে আঁধার দেশে,
'অরুণ' তাহার তাইতে আজি ঘুরে বেড়ায় মলিন বেশে।
গুণগ্রাহী book-worm নলিনীকান্ত আর যে নাই,
পালিয়ে গেছে প্রাণের সখা বুড়ির মুখে ফেলিয়ে ছাই।
স্থানুর মত বন্ধু কজন আছেন যাঁরা জীবিত
স্বার্থপূজা করিয়ে তাঁরা আপন কাছেই পূজিত।
স্নেহের বাঁধন ছিড়ে ফেলে পান ক'রেছে নিশির জল,
অচেনা ভাণ কেউ বা করে দেখলে আঁখি ছল ছল।
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে অঙ্গ জ্বলে বেরিয়ে আসে চোখে বিষ,
মানুষ কি আর মানুষ আছে আবার হচ্ছে তুচ্ছ কীশ।
কবি 'লাহা' সেও তো ভুলে, স্মরণ নাহি করে আর,
কারে দোষী কর্ব্বোরে হায় বিশ্ব ভরা ব্যভিচার।
দ্বিজুর নামের দোহাই দিয়ে কাল মাণিক ফাঁদ পেতেছে,
নামিক লেখক টাকার কুমীর! লেখক যারা জাত দিয়েছে।
কাব্যবনে বড়ই কাঁটা শক্তি নাই আর ভ্রমিতে
নামের তরে 'লোলুপ কবি' তাও তো নারি সহিতে।
নগ অগ, অদ্রি রবির সানু দেশটা দেখা যায়,
শীর্ষ তাহার কোন আকাশে জানি না তা কেমনে ভায়।
দীপ্ত আজিকে নিখিল বিশ্ব রবির কল্প প্রতিভায়
বঙ্গভাষা উঠিছে হাসিয়া ভাবের সুধা-চন্দ্রিকায়
কাব্যটারে bony কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন রবি
কবীন্দ্র আর থাকতে চান্ না (বুঝি) বিশ্ব-প্রিয় কবি।
"ঘরে বাহিরে" বুঝল না কেউ সজ্জিত কত মণিয়ায়,
দূর ভবিষ্যৎ আসচে যখন বুঝবে দীপ্ত মহিমায়।
অজিন-পরা 'অজিত' কেন ইব্সানের কথা পাড়ে?
আমার রবিরে—কে কর্ব্বে খাটো দুটো মাথা কার ঘাড়ে?
সমেদ্দার—কি সমেজদার? মালুম নাহি মিলা
সম্মিলনে হায়রে কপাল নেম্তা নাহি দিলা।
'অমর রায়ে' ছাট দিয়ে ভাই তাও করেছেন মদ্দানি,
চাপরাসিরা বিদ্যার জাহাজ এ কথাটা বেশ জানি।
মানীর মানে কালী দিয়ে এরাই যে দেয় হাততালি,
ফিরে জন্মে এরাই হবে ডেপুটীদের আরদালি।
মিত্তের মিতে "অময় চন্দ্র" আমার কাছে ঠিক Latin
রসগ্রাহী তাঁরে বলা আমার পক্ষে নয় কঠিন।
গাফিলিটা নত মাথে স্বীকার নাহি করে কেউ,
স্যায়ের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনি করে খেউ খেউ।
By the bye—প্রভাত কুমার এখন তিনি রাজার মিতে,
মত্ত থাকেন কাব্য চর্চ্চায় মত্ত থাকেন নৃত্য গীতে
নূপুর পরা সরলতার কোথায় রুণু রুণু বোল?
ক্ষুদ্র চিত্তে অহমিকা তোলে রুদ্র মহারোল।
Autonomy ডিন ছেড়েছে হিতৈষিগণ দিচ্ছে তা,
সর্ব্বগ্রাসী bureaucracyর শুনতে পাচ্ছি বিকট রা।

আঁধার রাতি পুইয়ে যাবে, দেখা দিবে
কনক উষা.
গর্ভব্যথায় শৈল কাতর প্রসবিবে gaunt মৃষা
আর কাজ নাই ফুরিয়েছে দিন, সন্ধ্যা
আসে ধীরে,
পেতেছি তাই আপন আসন ঘাগোট নদীর
তীরে।
বিশ্ব যন্ত্রের কোথায় যেন একটা screw ঢিল
পড়েছে,
সুর গুলো সব ভেঙ্গে চুরে খাপছাড়া এক
রব তুলেছে।
কম্র নম্র অশেচনক সুরেশচন্দ্র ডিপুটী
কালের বশে তিনিও এখন হ'য়ে পড়ছেন
'টিপু'টি
'বেলা'র কবি গিরিজানাথের মিতালিতে
নাহিকো আটা,
উপেক্ষা তাঁর যখন তখন ফুটিয়ে প্রাণে
দেয় যে কাঁটা।
সখার সেরা Mister 'নুটু' চুটিয়ে কচ্চেন
জজিয়তি,
কোথায় তাঁহার উদার আদর কোথায়
তাঁহার শুভ্রমতি?
স্বর্ণে আনার প্রস্তুত করি 'পোল্টু' করেন
পান,
পাস্তা খেগো কবির তরে গলে না তাঁহার প্রাণ,
বিলাস আপনি কুন্দ কুসুমে শয়ন করিয়া রচন
বিলাসিনী গড়া বিজন লইয়া করেন যতনে
বাজন।
কবি 'হরিশ' নীলবসনার মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ,
উপেক্ষাতে Callous পরাণ হয়না কখন ক্ষুব্ধ।
Penny a liner—কর্ব্বোনা নাম নিয়ে
merit ordinary,
বাঙ্‌লা জোড়া সব কাগজেই করেন কতই
জারিজুরি।

ধুয়ে যাবি—মুছে যাবি রবি obscure হ'য়ে,
(ভবিষ্যৎ আস্‌বে যখন)
আস্‌বে তখন justiceএরে সঙ্গে ল'য়ে।
চাটাচাটি কর্ব্বে কে আর? রইবি পড়ে
কোন শ্মশানে,
সাম্য শান্তি বিরাজিত ভেদাভেদ নাই যেখানে
নাই যেখানে কুটিলতা অহঙ্কারের হুহুঙ্কার,
নাই যেখানে কাণাকাণি অন্ন চিন্তা চমৎকার।
ছোট লোকের palm itchingএর বের্ত্তো
গুলি এসে,
কে জান্‌তো হাকিম গুলোও আদর ক'রে
নেবে?
নিচ্চেন বের্ত্তো খাচ্চেন ঘের্ত্তো ফুলছে
গিন্নির বুক,
brooch-খচিত দেহের মাঝে উথলে
উঠছে সুখ।
(দূরে বাজে একতারাটী গুব গুবা গুব গুব)।
কেউ নিচ্চেন আস্ত টাকা কেউ বা in a
shape
Hat-coatএতে shahib বটে আক্কেলেতে
ape.
বিলাস বেটা আস্ত গোঁয়ার নীতির মুখে
মাচ্চে লাথি,
অবাক হ'য়ে আমরা দেখছি জান্‌লা খুলে
জ্বালিয়ে বাতি।
ভবঘুরে 'বেঙ্কচর্জ্জি' তাড়াতাড়ি ছুটে এসে,
নীতিটারে রক্ষা কল্লো একটু মৃদু মৃদু হেসে।
ছোট লোক যে হচ্চে বড় স্পষ্ট দেখতেছি,
হ্রস্ব যুত ককার হলেন গুণ্ড যুক্ত 'কী'।
ওই যে দেখছ—
পঞ্চ বেদীর দুই minus, প'ড়ে প'ড়ে যার
বক্র ঘাড়,
কড় মড়িয়ে চিবান যিনি Philosophyর
আস্ত হাড়,

তিনিও তিনিও ওম্ বিষ্ণু ওম্ বিষ্ণু যাবেন
বটে ঐ পথে
লিখবো না আর আস্‌ছে টাছি * আমার
কাছে ঘুমের রথে।
আমার মিতে দেবীর মিতে অভাব রাণীর
প্রাণেশ্বর
কই 'গোবিন্দ' প্রাণ 'গোবিন্দ' জানিনে
তাঁর খোঁজ খবর।
দেখে শুনে অবাক হ'য়ে সব দিয়েছি ছেড়ে,
স্নেহের স্বরে ডাকিস্ না আর আমায়
নিস্‌না কেড়ে।
পোট্‌লা পাঁট্‌লি বাঁধছি আমি মহাযাত্রা তরে
ডাকিস্ নে রে আমায় তোরা স্নেহমাখা স্বরে।
বিরাগ এসে আপন হাতে আঁখির কাজল
দিছে মুছে,
প্রেম বিরহের বিকিকিনি জন্মের মত
গেছে ঘুচে।
আমার—
Dancing day গেছে চলে—এখন কেন
প্রেমের কথা?
আঁচল এখন ধর্ব্বো কাহার গিন্নির চির
মাথার ব্যথা।
তখন ছিল নিত্য কোঁদল, নিত্য মধু সম্মিলন,
কোঁদলান্তে স্নিগ্ধ কর্ত্তো প্রেম মাখা আলিঙ্গন।
দ্রাক্ষারসে সিক্ত হ'তো পিপাসু এই
অধর জোড়া,
হাতে ধরে দিত কে যে কমল ফুলের
কমল তোড়া।
অবাক্ চোকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম্
প্রিয়ার মুখখানি,
যত্ন ক'রে আদর ভরে নিতাম্ তারে
বুকে টানি।

তখন কলহ আন্‌তো ধারে এক পশলা বরিষণ,
এখন কোঁদল হ'লে পরে হয় অগ্নি উদ্গীরণ।
মনে করি Xantippe বা আমার ঘরে
এলো ফিরে
তর্জ্জনেতে গর্জ্জনেতে করাঘাত করি শিরে।
প্রেম ভেঙ্গেছে প্রাণ গিয়েছে কি
আছেরে আর?
বেঁচে আছি ও কিছু নয় ধুক্ ধুকুনি সার।
গিন্নি এখন হবিষ্যান্নের করিয়ে মনে কল্পনা,
মাছের সাধটা মিটিয়ে নিচ্ছেন সেটা
বড় অল্প না;
ঠেলে ফেলে সকল বাধা মরণ বঁধু আস্‌বে যবে,
বুকে ধরে সান্দ্র স্নেহ আলি[illegible] আমায় লবে।
আমার গর্ব্ব অভিমান য[illegible]খচিত মুকুট খানি
ভস্ম করি ও মিতেগণ দিবি কি তোরা আনি?
ওই ছাই গাত্র অঙ্গে মাখিয়া ধরিব যতির বেশ,
না রবে হৃদয়ে বাসনার কণা না রবে
বিলাস লেশ!
হে পূত ধ্রুব স্তুত চিন্ময়! মোহনিয়া নিরঞ্জন,
তোমারে বাঁধিতে ভক্তির ডোরে করিতেছি
আয়োজন।
ভবের বন্ধন চোকের উপর তূর্ণ হইল ছিন্ন,
সমষ্টি আছিল ব্যষ্টি হইল, হইল ভগ্ন ভিন্ন।
প্রেম প্রেন প্রেম—ও কিছু নয় কামের
মধুর তান,
ভালবাসাবাসি হায় রে কপাল একটা
মধুর ভাণ।
আমায় যদি কত্তে বলো রুসোর মত
confession,
স্বীকার করে দিচ্ছি ফেলে, পাপের গায়ে
হুতাশন।
আমিই ছিলাম মনে পড়ে স্বাধীন প্রেমের
প্রচারক,
ফিরে এলাম ভগ্নচিত্ত যখন হ'লেম অপারগ।

* Tacita.

চক্ষু দুটী twin কৃষ্ণ রূপ রাধারে বাঁধতে চায়,
সৃষ্টি করি বৃন্দাবন দুলবে বসি হিন্দোলায়।
ভেঙ্গে দেও, এই হৃদয় মাঝারে, সুখ
দুঃখের দ্বন্দ্ব,
আমারে করহ, গোলকবিহারি! তোমার
গীতির ছন্দ;
নিরাকার ভাবে চাহি না তোমায়, দিব্য
মূরতি ধরি,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেও হে ব্রজের হরি!
আমি হীন—আমি হইব যখন ঘুচে যাবে
অহমিকা,
আমি হীন—আমি প্রকৃতি মূরতি তুলে ধর
যবনিকা।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ডাক্তার ৺যজ্ঞেশ্বর রায় রায় সাহেব।

জন্ম—২৭শে আষাঢ়, সাল ১২৫৯।

মৃত্যু—২৭শে ভাদ্র, সাল ১৩২৩।

(বাৎসরিক শ্রাদ্ধসভায় পঠিত।)

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্"। শরীর-ধারী জীব মাত্রেরই মরণ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যে মুহূর্ত্তে নবজাত শিশু সূতিকা-মন্দিরে আনন্দের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার স্নিগ্ধ মধুর আলোকে পিতামাতা এবং অন্যান্য স্বজনবর্গের হৃদয়কন্দর উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, সেই মুহূর্ত্তেই শ্মশান-বহ্নির ভীষণ আলোকের তীব্র রশ্মির জ্বালাময়ী দীপ্তির আভাসও জ্ঞানীর হৃদয়পটে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয়—হউক তাহা অতি দূরস্থ—হউক তাহার উত্তাপের তেজ অননুভূত—কিন্তু—সে আছে—জন্মের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে মরণ জড়িত আছে। সে বন্ধন কাটিবার উপায় নাই—তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই! সুতরাং এ সংসারে জন্মও যেমন স্বাভাবিক, মৃত্যুও তেমনি স্বাভাবিক। তার পর সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মৃত্যু আমাদের শত্রু নহে, সে আমাদের পরম বন্ধু—যদি শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করিতে হয়—যাহার ন্যায় কল্যাণ-দায়িনী শ্রুতির উপদেশ মনে করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকে তাড়নের ইচ্ছা না করিয়া বরণের অভিলাষই করিতে হয়! যদি মানব আত্মার চরম উন্নতি ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়—যদি সুখ-দুঃখাতীত অবস্থায় উপস্থিত হওয়াই আমাদের বাসনার নিবৃত্তির কারণ হয়—তাহা হইলে মৃত্যুর সাহায্য আমাদের অত্যাবশ্যক—অপরিহার্য্য। এই বিষয়ে এই ক্ষুদ্র লেখকের প্রণীত সতী-প্রশস্তি নামক পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

"মরণ আত্মার উন্নতি সোপান,
মরণেই ঊর্দ্ধতর লোকে স্থান,
মরণেই মৃত্যু হতে পরিত্রাণ
অবিদ্যা বাসনা হয়গো দূর।
মরণ আত্মার শত্রু কভু নয়
সেই করে দেয় ব্রহ্মপদে লয়,
তাহার প্রসাদে ক্রমে নীত হয়
পাপী জীব শুদ্ধ আনন্দ পুর।
মরণে মরণে কর্ম্মের বন্ধন
এ ভব মাঝারে কাটি জীবগণ
মৃত্যুর পশ্চাতে জীবনায়োজন
নিশ্বাস প্রশ্বাস তাহারি ছায়া;

সংকীর্ণতা সব দূর হয়ে যায়
মৃত্যু হতে জীব নব কান্তি পায়,
করে বিচরণ সর্ব্বত্র স্বেচ্ছায়
লাভ করি অষ্ট সিদ্ধির কায়া।
মরণ কেবল সার মাত্র নাম
কর্ম্মফল মাত্র জীবের বিশ্রাম
জীবন জগতে বহে অবিরাম
প্রকৃত মরণ এ বিশ্বে নাই,
চৈতন্য স্বরূপ জগৎ কারণ
তাঁহার জগতে কোথা অচেতন,
প্রস্তর কঙ্কর তাতেও জীবন
প্রাণেই জগৎ ভাসে সদাই।"

অতএব দার্শনিক ভাবে দেখিতে গেলে মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সাধারণ মানব দার্শনিকের হৃদয় লইয়া সংসার করে না, সুতরাং মৃত্যুর করাল ছায়াই সে সর্ব্বদা দেখে, তাহার প্রশান্ত মনোহর রূপের সহিত সে পরিচিত নহে, সে পরিচিত হইতেও চাহে না। যে স্নেহময়ী জননীর অমৃতভাণ্ড-পূর্ণ কক্ষ হইতে কুসুম সুকুমার শিশুকে নির্ম্মম ভাবে আকর্ষণ করিয়া মাতৃক্রোড় শূন্য এবং **হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ করিয়া দিতে পারে। পতিব্রতার স্বর্গীয় প্রেমালিঙ্গন হইতে তাহার** ইহ পরকালের সুখাস্পদ স্বামী ধনকে অবলীলা ক্রমে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে কোমল হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্য বিদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না। অপোগণ্ড শিশুগণকে অনাথ করিয়া তাহাদের আশ্রয়-স্থল জনক জননীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসৃত করিতে দ্বিধা বোধ করে না, কেমন করিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিব? কেমন করিয়া তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া ঘরে তুলিব? যে স্নেহ রসাত্মক তন্তু অন্তর্ম্মর্ম্ম জীবন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে যে নির্দ্দয় ভাবে ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাকে কোন্ প্রাণে অভ্যর্থনা করিব! স্নেহ মায়া মোহবদ্ধ জীব আমরা তাহা পারি না, আমাদের স্বার্থপর হৃদয় বিচ্ছেদ দুঃখ সহিতে চাহে না; সুতরাং চির বিচ্ছেদ ঘটনা পটীয়ান যমরাজকে আমরা সানন্দে পূজা দিতে পারি না!—তাই প্রিয় বিরহে আমরা শোক করি! জানি শোক করিয়া লাভ নাই, প্রাণপাত করিলেও যে গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না, হৃদয়ে যে ক্ষত যমদণ্ডের দ্বারা ঘটিয়াছে, আজীবন সে ক্ষত শুকাইবার নহে, তথাপি আমরা শোক করি! এ শোক স্মৃতির পূজা! এ শোক পরলোকবাসী প্রিয়-জনের, এ ক্ষতের বেদনা অসহনীয় হইলেও ইহা প্রেমাস্পদের স্মৃতি চিহ্ন বলিয়া আমরা সযত্নে পুষিয়া রাখি। শরীরের কোন স্থানে কোন ক্ষত হইলে তাহার বেদনা নিবৃত্তির জন্য আমরা সাগ্রহে চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করি, কিন্তু মহাকালের বিধি নিক্ষিপ্ত এ প্রহারের ক্ষতের সুস্থতা বিধানের জন্য আমরা চিকিৎসক চাহি না। যদিও মুখে আমরা বলি বটে—"Doctor, canst thou minister to a mind deceased, and root out the cause of sorrow" ইত্যাদি। কিন্তু সত্য সত্যই যদি তখন কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা-সম্পন্ন চিকিৎসক আসিয়া সে ক্ষত সারাইয়া দিতে চাহেন, সে শোকের মূল উৎপাটন করিয়া দিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আমরা সম্মত হইব কি? যে হতভাগিনী জননীর কোল খালি করিয়া তাহার হৃদয়ে সহস্র ক্ষত উৎপাদন করিয়া তাহাকে অহর্নিশ পাগলিনীর মত কাঁদাইয়া ফিরাইতেছে, যদি কেহ আসিয়া তাহাকে বলে "এস মা, এই ঔষধ সেবন কর, তোমার মৃত পুত্রের স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যাইবে, আর শোকের অবসন্ন,

থাকিবে না” তবে সে জননী কি সে ঔষধ সেবনে সম্মতা হইবে? যে সতী প্রিয়তমের বিরহ জ্বালায় কঙ্কালসার হইয়া নিরন্তর চিন্তার আগুনে দগ্ধ হইতেছে, সে কি বিস্মৃতির প্রলেপে সে অগ্নিদাহের নিবৃত্তি কামনা করিতে প্রস্তুত হইবে? যে পুত্র দেবপ্রতিম পিতার স্নেহ-ক্রোড় হইতে কালের ক্রূর হস্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া অহরহ বিলাপ-প্রলাপে অন্যের হৃদয় পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিতেছে সে কি সেই পুণ্য-স্মৃতির বিনিময়ে স্বীয় শোকাপনোদন প্রার্থনা করিবে? অথবা সকলেই এক বাক্যে বলিবে “না, না, পৃথিবীর বিনিময়েও আমরা এ পবিত্র স্মৃতি ভুলিতে চাহি না—হউক বেদনা, হউক কষ্ট, কিন্তু এ বেদনার মধ্যে যে স্বর্গীয় কান্তি আছে, এ শোকের সঙ্গে যে রসামৃত আছে—তাহার তুলনা কোথায়?”

প্রিয়জনের জন্য কৃত শোকের মধ্যে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ, একটা অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি আছে, তাহারই জন্য, আমরা সে শোক ভুলিতে চাহি না, ভুলিতে পারিনা! তাই মৃত্যু প্রেমের নিকট পাষাণ! আমাদের প্রেম, আমাদের স্নেহ, আমাদের প্রীতি, আমাদের ভালবাসা প্রকৃত কি না, হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় উদ্ভূত কি না, অথবা কেবল বাহেন্দ্রিয়ের মোহ মাত্র—মৃত্যু তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়! যেখানে শুধুই “প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর”—সেখানে অঙ্গের অভাবে এক দিনেরও নিবৃত্তি হইতে অধিক দিন সময় লাগে না!

অলোকসামান্য রূপবতী কামিনীর সুখময় স্পর্শে পরিতৃপ্ত হৃদয় অনেকেই রামচন্দ্রের ন্যায় আত্মহারা হইয়া বলিতে পারেন ‘বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখ মিতি বা দুঃখ মিতি বা’ কিন্তু কয়জন সেই নরদেবের ন্যায় স্বর্ণময়ী সীতার প্রতিকৃতিতেই অখণ্ডিত প্রেম ন্যস্ত করিতে পারেন, সেইটীই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। প্রেম খাঁটি কি না, তাহা অনাবিল স্বর্গঙ্গার পূতধারা কি না, তাহা প্রকৃতই সুবর্ণ কি না, তাহার পরীক্ষা শ্মশানের চিতাগ্নিতেই সর্ব্বোত্তম ভাবে হইয়া থাকে, তাই

“মরণের ছলে হইলে ধরায়
জীবন আহুতি শ্মশান চিতায়,
পবিত্র প্রণয় সুরলোকে ধায়
সে চিতা-বিভূতি শিরেতে মাখি;
রক্ত মাংস সনে বাঁধা যে প্রণয়
দেহ সনে তাই ভস্মেতে মিলায়,
তাই সদা তারে জিয়াইতে হয়
প্রণয়-আস্পদে হৃদয়ে রাখি।
সেথাই বিচ্ছেদে বিস্মৃতি ঘটায়
মরণের ছবি দেখিতে না চায়,
লালসার সনে সব মিটে যায়,
নূতনের তায় আসন দিয়া
শত ভালবাসা সহস্র চুম্বন,
প্রেম আলাপন, প্রাণ বিসর্জ্জন,
তিলেক বিচ্ছেদে নিকট মরণ
যায় দেহ সনে সব চলিয়া।
নামে মাত্র প্রেম, দেহের মিলন
মত্ততা ঘটায় স্পর্শন, নয়ন,
তাই পবিত্র প্রেমের পরীক্ষা কারণ
মরণের খেলা ধরায় রয়।”

প্রেমাস্পদের চির অদর্শনে আজীবন তাঁহার প্রতি সেই পবিত্র প্রেম, বা স্নেহ বা ভক্তি অর্পণের জন্য আমাদের প্রাণের যে ব্যাকুলতা, সেই প্রিয় স্মৃতি হৃদয়ে জাগরুক রাখিবার জন্য আমাদের যে আন্তরিক আগ্রহ,—তাহাই শ্রাদ্ধ, তাহাই তর্পণ! আমাদের

হৃদয়ে কাম অপেক্ষা প্রেমের আসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য, লালসা অপেক্ষা তৃপ্তির ঔৎকর্ষ্য খ্যাপনের জনাই আর্য্যঋষিগণ শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণই শ্রাদ্ধ,—আত্মার তৃপ্তি সাধনই তর্পণ! খৃষ্টানাদি ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে মৃত্যু তিথির উপলক্ষে সাম্বৎসরিক সভাদির সূচনা করেন তাহাও ঐ শ্রাদ্ধ তর্পণেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সকলেরই উদ্দেশ্য প্রিয়জনের পুণ্য স্মৃতির সম্মান! এই স্মৃতির সম্মানই শোকের সান্ত্বনা—তাহাতেই প্রাণের সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালায় শান্তি! সেই জনাই যে শোক অনেক লোকে নিজের মনে করিয়া ভাগ করিয়া লয়, সে শোকে বেশী সান্ত্বনা পাওয়া যায়! সমবেদনা সম দুঃখীই প্রকাশ করিতে পারে। যে ব্যক্তির অভাবে অনেক লোকেই নিজ প্রিয়জন বিয়োগ যাতনা অনুভব করে, তাঁহার পরিবারস্থ শোকার্ত্তগণ সমবেদনার শীতল প্রলেপে এই ভয়ানক দাবদাহ শোকদহনেও কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন।

এই জন্যই ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকে এরূপ ভাবে চলিতে উপদিষ্ট হয়, যাহাতে সে সংসার পরিত্যাগ করিলে তাহার জন্য অধিক সংখ্যক লোকে শোক করিতে পারে।

যিনি কর্ম্মক্ষেত্র এই সংসারে আসিয়া স্বীয় কার্য্য দ্বারা সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া সকলকে কাঁদাইয়া এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! বিষ্ণু শর্ম্মা বলিয়াছেন—

গুণীগণ গণনারম্ভে ন পততি কঠিনী
সুসম্ভ্রমাৎ যস্য
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী
ভবতি।

অর্থাৎ গুণীগণের নাম গণনা কালে যাঁহার নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গণিত না হয়, তাঁর দ্বারা যদি মাতা পুত্রবতী হইবার গর্ব্ব করেন, তবে বন্ধ্যা কিরূপ?

যাঁহারা এই মর জগতে আসিয়া স্বীয় কর্ম্মবলে কীর্ত্তিধ্বজা প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, সংসারের জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি-তরু রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুকে উপহাস করিয়াছেন, মৃত্যু তাঁহাদের জড় দেহ সংসার হইতে অপসৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের যশঃ শরীর ধ্বংস করিতে পারে নাই! কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে অমর করিয়াছে, সুযশ তাঁহাদিগকে ধন্য করিয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ সংসারে ধন্য হইবার চারি প্রকার উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—কেহ নিজের নামেই সর্ব্বত্র বিখ্যাত, কেহ বড় লোকের ছেলে বলিয়া সম্মানিত, কেহ বড় লোকের জামাতা বলিয়া আদৃত, আর কেহ বা বড় লোকের ভগিনীপতি বলিয়া পরিচিত; ইহাদের মধ্যে স্বনাম পুরুষই ধন্য বলিয়া সম্মানিত এবং শ্যালকের পরিচয়ে আদৃত পুরুষ অধমাধম বলিয়া ধিক্কৃত!

অদ্য আমরা যে মহাত্মার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এখানে সমবেত হইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিতেছি, সেই পূত চরিত্র ৺যজ্ঞেশ্বর রায় মহাশয় যে ঐ প্রথম শ্রেণীভুক্ত স্বনামধন্য পুরুষ, তাহাও কি ব্যক্ত করিতে হইবে? গুণীগণ গণনারম্ভে তাঁহার নামে যে গণকের কঠিনী অর্থাৎ খটিকা সুসম্ভ্রমেই পতিত হয়, তাহাও কি প্রকাশ করিয়া এ সভায় বলিবার প্রয়োজন আছে?

হুগলি জেলায় গোঘাট গ্রাম যে তাঁহার জন্মভূমি, কায়স্থকুলের ৺ব্রজমোহন রায় যে

তাঁহার পিতৃদেব, তাহা আমরা কয়জন লোকে জানি, অথবা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি?

আমরা জানি, চিকিৎসা কার্য্যে সুনিপুণ ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায়, আমরা জানি, বিপন্ন-বন্ধু যজ্ঞেশ্বর রায়; আমরা জানি, উন্নতচেতা, পবিত্র-চরিত্র যজ্ঞেশ্বর রায়; আমরা জানি, দরিদ্র-বান্ধব যজ্ঞেশ্বর রায়; আমরা জানি, সুরসিক বিদগ্ধ যজ্ঞেশ্বর রায়; আমরা জানি, স্বাধীনচেতা তেজস্বী যজ্ঞেশ্বর রায়; আমরা জানি, প্রবাসে বাঙ্গালীর গৌরব খ্যাপনকারী যজ্ঞেশ্বর রায়—আমরা জানি, সুসামাজিক বন্ধু প্রিয় যজ্ঞেশ্বর রায়। অশেষ সৎগুণের আধার স্বনামধন্য পুরুষ নিজগুণে গোরক্ষপুরের এবং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অন্যান্য স্থানের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান্ সকল জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়া স্বীয় শক্তিবলে সকলের হৃদয়ে স্নেহ প্রীতির আসন চিরস্থায়ী রূপে স্থাপিত করিয়া পরিণত বয়সে পুত্র কন্যা, দৌহিত্র পৌত্রী প্রভৃতিকে দেখিতে দেখিতে আজ এক বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

আমরা বৎসরান্তে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজা করিবার জন্য, তাঁহার প্রতি আমাদের অখণ্ডিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, আজ তাঁহার আলয়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা অর্পণ করিতে এবং তাঁহাদের বেদনায় গুরুভারের অংশ গ্রহণ দ্বারা লাঘব করিতে আসিয়াছি। সুখের অংশ সকলকেই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের অংশ, বেদনার অংশ আত্মীয়জন ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না। তাই তাঁহার উপযুক্ত কৃতী পুত্রগণ এই বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে যাঁহাদিগকে আত্মীয় মনে করেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইয়াই এ পুণ্য স্মৃতির পূজায় উদ্যোগী হইয়াছেন। সুতরাং এই সময় পরলোকগত সেই পরম বান্ধবের কর্ম্মময় জীবনের কথার কোন কোন অংশের আলোচনা করা আমাদের একটা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি।

বসুধৈব কুটুম্বক আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ এমনই উদার-হৃদয় ছিলেন যে, তাঁহারা কেবল নিজ নিজ পরিবারভুক্ত পরলোকগত আত্মীয়গণের তৃপ্ত্যর্থ তর্পণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই—যাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, অন্য কোন উপায় সিদ্ধি নাই, যাহারা অগ্নিদগ্ধ, জলমজ্জনে বা উদ্বন্ধনে বা অন্য অপঘাত দ্বারা মৃত, তাহাদের প্রতিও তাঁহাদের তর্পণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অশ্রেদ্ধেয় সমস্ত জগতের তৃপ্তির অবস্থা করিয়া তবে নিবৃত্ত হইয়াছেন। সেই উদার-সত্ব বিশ্বপ্রেমিক মহর্ষিগণের সন্তান আমরা ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায় মহাশয়ের ন্যায় পরম বন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন দ্বারা আত্মার তৃপ্তি ও ঔৎকর্ষ সম্পাদনে ব্যগ্র হই, এটা স্বাভাবিক। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাকালের দণ্ডাঘাতকৃত প্রিয়বিচ্ছেদজ এই ক্ষতি আমরা স্মৃতির সাহায্যে সর্ব্বদাই নবীকৃত রাখিতেই ব্যগ্র হই।

এখানে আমাপেক্ষা অনেক অধিক বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত পরিচিত এবং তাঁহার চারিত্র্য-পঞ্জিকার বিষয়ে সম্যক ভাবে অভিজ্ঞ অনেকেই উপস্থিত আছেন, তাঁহারা থাকিতে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ও অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এই আলোচনার প্রয়াস পাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু আমি হৃদয়ের প্রবল উত্তেজনা

বশেই ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—এজন্য আপনাদিগের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর এস্থলে তাঁহার ন্যায় মহাত্মার প্রতিভা ও চরিত্রের সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব, আমার এ প্রচেষ্টা উদ্বোধন মাত্র, ইহা যেন সকলে কৃপা পূর্ব্বক স্মরণ রাখেন, এই প্রার্থনা।

১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে যেদিন আমি এই গোরক্ষপুর সহরে প্রথম আসি, সেই দিনই এই মহাত্মার সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় ঘটে। তারপর ৮ বৎসর তাঁহার সহিত নানা সূত্রে আমি বিশেষরূপেই জড়িত হইয়া পড়ি। তিনি নিজগুণে আমাকে একটু বিশেষ স্নেহ চক্ষে দেখিতেন এবং শ্রদ্ধাও বিশেষরূপেই করিতেন। তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায় সূত্রে আমার পরিবারে তাঁহাকে অনেকবার যাতায়াত করিতে হইয়াছে; সে উপলক্ষেও আমি তাঁহার অসাধারণ চিকিৎসানৈপুণ্য এবং হৃদয়ের আর আর অনেক সৎগুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আমি ব্যক্তিগত ভাবে যে কতদূর ঋণী, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তিনি আমার বিপদ আপদে যেরূপ ভাবে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, যেরূপ ভাবে আমার ব্যাকুলচিত্তে সান্ত্বনার প্রলেপ প্রদানে শীতল করিয়াছেন, নানাপ্রকার উপদেশ ও পরামর্শ দানে আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়স্থ হৃষীকেশই জানেন। সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমার এ উদ্যম নহে।

প্রবাসে আসিয়া স্বীয় প্রতিভা এবং চরিত্রপ্রভায় যে সমুদয় মনীষী বঙ্গসন্তান স্বীয় মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই জন্যই তাঁহার কর্ম্মময় পূতজীবন-কথার আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। বঙ্গমাতার যে সমুদয় অযোগ্য কুলপাংশুল সন্তান বিদেশে আসিয়া সমাজশাসনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতৃভূমির মুখে নানাপ্রকারে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া স্বদেশবাসীর মুখ লজ্জাবনত করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে, যাহাদের অকথ্য ব্যবহারে প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম তত্তৎদেশে ধিক্কারজনক ও ধিকৃত হইতেছে, যদি এই সব মহৎ জীবনের আলোচনায় তাহাদের চৈতন্য হয়! তাহাদের মান আত্মমর্য্যাদা এবং দেশমর্য্যাদার ভাব জাগিয়া উঠে। ইংরাজ-কবি বলিয়াছেন যে, মহাপুরুষগণের জীবনী কথার আলোচনাতে ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তীগণও সংসারে মহনীয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এই জন্যই মহৎ জীবনীর অনুশীলন প্রয়োজন।

গোরক্ষপুরে আমাদের বাঙ্গালী সমাজে ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর বাবু যে সর্ব্বজনের নিকটই মুরুব্বি স্বরূপে সম্মানিত হইতেন, একথা বোধ হয় অবিসংবাদিত ভাবেই বলা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে যখনই কোন কথা বা কার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত যুক্তি পরামর্শ করিবার ইচ্ছা এবং তাঁহার মত গ্রহণের ইচ্ছা সকলের মনেই উদিত হইত। তিনিও তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যাহা ভাল বলিয়া মনে করিতেন অকপটে ব্যক্ত করিতেন। কোন ভাল কাজের বিষয় পরামর্শ করিতে আসিয়া কখনই তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হই নাই। এখান-

কার হিন্দুস্থানীগণের মধ্যেও তাঁহার প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। চিকিৎসা কার্য্যে এ সহরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারাও সরকারী সিবিল সার্জ্জন অপেক্ষা তাঁহাকেই বেশী শ্রদ্ধা করিতেন, একথা সকলেই জানেন। কি হিন্দুস্থানী, কি বাঙ্গালী, সকল রোগীরই মনে যেন কেমন একটা ধারণা ছিল যে, ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর বাবু চিকিৎসা করিলেই সে ভাল হইয়া যাইবে। সাহেব মহলেও তাঁহার এমন প্রতিপত্তি ছিল যে, কয়েক ক্ষেত্রে তাঁহার ডাক্তার বাবু সহরে না থাকা অবস্থাতে সিবিল সার্জ্জনকে না ডাকিয়া তাঁহার আসার অপেক্ষাতে পদস্থ সাহেবেরা ২।১ দিন কাটাইয়া দিয়াছেন। একবার একজন উচ্চপদস্থ সাহেবের একখানি পত্র ডাক্তার বাবু আমাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, এ সহরে সর্ব্বাপেক্ষা ডাক্তার বাবুর উপরই তাঁহার শ্রদ্ধা বেশী। চিকিৎসা-নৈপুণ্যেও তিনি অসাধারণ ছিলেন, একথা এখানকার আর আর ডাক্তারেরা স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ তিনি ঔষধের মাত্রা অতি অল্প পরিমাণেই ব্যবস্থা করিতেন। সময় সময় এত অল্প মাত্রা ব্যবহার করিতেন যে, অন্য ডাক্তার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ডাক্তার বাবু আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, বিলাতী ডাক্তারদের সর্ব্বনিম্ন মাত্রাই আমাদের দেশের লোকের পক্ষে অনেক সময় সর্ব্বোচ্চ মাত্রা বলিয়া ধরিতে হয়। জলবায়ু, মৃত্তিকা ও শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনায় মাত্রার পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার অতুলচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে আমি ডাক্তার বাবুর রোগ নির্ব্বাচন বিষয়ে আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক কতকগুলি কাহিনী শুনিয়াছি, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম; বিশেষতঃ এখানে উপস্থিত সকলেরই সে বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মদ্যাদি আহার সম্বন্ধে ডাক্তার বাবুর বড় বিতৃষ্ণা ছিল। একবার আমি আমার পরিবারস্থ কোন রোগীকে ভাইব্রোণা ব্যবহার করান যায় কিনা জানিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে "পোর্ট ভাইব্রোণা প্রভৃতি ব্যবহার আরম্ভ করিলে অনেক সময় ফোঁটা হইতে গেলাস, গেলাস হইতে বোতল এবং বোতল হইতে পিপাতে পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং লিখিয়া তাহার ব্যবস্থা দিতে আর ইচ্ছা হয় না।" তামাক, সুর্ত্তি প্রভৃতি খাওয়াও তিনি পছন্দ করিতেন না। বিশেষতঃ সুর্ত্তি ব্যবহারের প্রতি তাঁর বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। আমাকেই সেজন্য মধ্যে মধ্যে রহস্য ছলে তিরস্কার করিয়াছেন।

দাঁতের বেদনার জন্য আমাকে কেহ কেহ আফিং ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছিল। ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, তাহলেই হুঁকো চব্বিশ ঘণ্টা মুখে লেগেই থাক্‌বে।" তারপর বল্লেন, "আপনি পাগল নাকি যে আফিং ব্যবহারে দাঁতের বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন?" নেশা মাত্রই তাঁহার চক্ষু-শূল ছিল।

কাঙ্গালী ভোজনে, দরিদ্রকে সাহায্য দানে তিনি সর্ব্বদা বিশেষ উৎসাহী এবং উদ্যোগী ছিলেন। যখনই কোন দরবার কি অন্য কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে চাঁদার কথা উঠিত, তখনই তিনি কাঙ্গালীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। দরিদ্রদিগকে, বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য করিবার জন্য যখন শ্রীমান্ রাধারমণ

সেন-প্রমুখ সকলে এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন, তখন ডাক্তার বাবু তাহাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাহার সভাতেও সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন, সাধ্যমত সাহায্য দিতেও ত্রুটী করেন নাই। বিপন্নগণকে ও দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অনেক দান অতীব গোপনে প্রদত্ত হইত। ২।১ ক্ষেত্রের কথা আমি জ্ঞাত আছি, যাহাতে গ্রহীতা নিজেই জানিতেন না যে দাতা কে! আমি জানিতাম, কিন্তু আমাকে উহা প্রকাশ করিতে—বিশেষতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রকাশে দৃঢ় সত্যে আবদ্ধ করিয়া—নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, ঐরূপ দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের লোকের এরূপ সাহায্য গ্রহণের কথা প্রচার করিলে তাঁহার আত্মসম্মানে ভয়ানক ভাবে আঘাত করা হয়। একথা যে অতি সত্য এবং যিনি এরূপ ভাবিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় যে কত উচ্চ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালিদের পরিবারে চিকিৎসা করিতে অধিকাংশ স্থলেই তিনি কখন ভিজিট লইতেন না। নিতান্ত যেখানে লইতেই হইত, সেখানেও অর্দ্ধেক ভিজিট লইতেন। তিনি ব্যবসায় সূত্রে স্থানীয় অনেক বড় লোক এবং রাজকর্ম্মচারীর সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু কখনও কাহারও খোসামোদ বা ছন্দানুবর্ত্তন করেন নাই। সকলের নিকটই নিজ স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। কিছুকাল তিনি মিউনিসিপালিটির কমিশনার হইয়াছিলেন। কিন্তু যখনই দেখিলেন যে, কমিশনার হইয়াও তিনি নানা কারণে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারিবেন না, স্বার্থপরের দল তাঁহার সকল সৎকার্য্যেই পরিপন্থী হইতেছে, যখনই দেখিলেন, তাঁহার আত্মসম্মানে সামান্য আঁচড় লাগিবার সম্ভাবনা হইতে পারে, তখনই উক্ত পদ ত্যাগ করিলেন। কাহারও অনুরোধ উপরোধই তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার যে সব কথাবার্ত্তা হয়, তাহা এখানে খুলিয়া বলিতে নানা বাধা আছে, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার মনস্বিতা এবং তেজঃ দেখিয়া আমি সে দিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

সরকারী কার্য্যে থাকা কালীনও তিনি কখন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণকে অযথা খোসামোদ করিয়া চলেন নাই, অথবা চাকরীর নিকট আত্ম-সম্মান বলিদান দেন নাই। তাহা করিলে অনেক উচ্চতর রাজ-সম্মানে ভূষিত হইতে পারিতেন। তাঁহার মুখেই কথা প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে একটী খেতাব দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি নিজেই বিনীত ভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ বয়সে ১৯১২ সালে অযাচিত ভাবেই তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১১ সাল হইতে তিনি অবৈতনিক মুনসেফের কার্য্যও করিতেছিলেন। এ সব তাঁহার গুণের সম্মানের নিদর্শন মাত্র।

সামাজিক নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বদা কিরূপ উৎসাহিত ছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। মাঘ মাসের শীতেও তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহাদির নিমন্ত্রণে রাত্রি ১টা ২টা পর্য্যন্ত সানন্দে কাটাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার তুলনায় বালক বলিলেই হয়, এমন অনেক লোক দিনের বেলায় সাদর নিমন্ত্রণও শারীরিক অসুস্থতার

দোহাই দিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন, দেখা যায়।

এই বৃদ্ধকালেও তিনি অনেক সময়ই এমন সুন্দর এবং নির্দ্দোষ রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা হইতেই তিনি কিরূপ সুরসিক ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইত।

কু চরিত্রের লোকের প্রতি তাঁহার প্রবল বিদ্বেষ ছিল। ব্যবসায় সূত্রে যখন কোন কুৎসিত রোগগ্রস্ত রোগীর সংস্রবে আসিতেন, তখন সে রোগীকে তাঁহার নিকট অনেক সময় তিরস্কৃত হইতে দেখিয়াছি। যেখানে শিশুরোগী পিতামাতার দোষে কষ্ট পাইতেছে দেখিতেন, সেখানে সেই সব পিতা মাতার প্রতি কঠোর ভৎসনা করিতেন, আর শিশুটীর প্রতি করুণায় তাঁহার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া আসিত।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, লোকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে প্রথম পক্ষীয় সন্তানের প্রতি যেন কতকটা বীতস্নেহ হইয়া পড়ে এবং ঐ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষীয় সন্তানগণের প্রতিই বেশী আনুরক্তি প্রদর্শন করে, কিন্তু ডাক্তার বাবু যে সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং শ্রীমান্ রাধাবিনোদ রায় মহাশয়ের প্রতিই অত্যন্ত স্নেহবান্ ছিলেন, মৃত্যু-শয্যাতেও যে তিনি সর্ব্বদা 'বিনু' 'বিনু' করিয়াই অস্থির হইতেন, তাহা সকলেই জানেন। এ বিষয়ে তাঁহার বর্ত্তমান সুশীলা পত্নী মহোদয়া এবং শ্রীমান্ রাধাবিনোদ বাবুর আর আর ভ্রাতাদিগেরও প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধান্বিত থাকিয়া অতি সুখ ও শান্তির সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করি যে, চিরদিন যেন তাঁহাদের এইরূপ সৌখ্য এবং প্রীতির বন্ধন অটুট থাকিয়া পরলোকগত মহাত্মার সুখের কারণ হয়; দ্বেষ হিংসার তীব্র জ্বালা যেন তাঁহাদের নির্ম্মল হৃদয়-ফলক কোনও দিন কলুষিত না করে।

স্বধর্ম্মে তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ছিল। বিদেশীয় খাদ্যাদির উপর প্রবল বিতৃষ্ণা পোষণ করিতেন। খাদ্য পানাদি বিষয়ে যাঁহারা ইংরাজের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদিগকে হনুকরণপ্রিয় বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। চিকিৎসা বিষয়েও দেশীয় টোট্‌কা ঔষধ প্রভৃতির তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, ছোট ছেলে পিলেদের সামান্য সামান্য রোগে মধু খাওয়ান, বুকে শরিসার তেল মালিস, তুলসী পাতার রস প্রভৃতিই বেশী ব্যবহার করিতে বলিতেন। একদিন বলিলেন যে, "মহাশয়, আজকালকার গৃহলক্ষ্মীরা আমাদের প্রতি বড় অনুকূল। তাঁরা উলমোজা বোনেন, নভেল নাটক পড়েন, ছেলে পিলেরা একটু হাঁচিলে কি কাশিলেই আমাদের ডাক পড়ে। সেকালের গিন্নিরা ছেলে পিলের চিকিৎসাতে ত আমাদের গ্রাহ্যই কর্ত্তেন না, বরং আমাদিগকে দু দশটা শিখিয়ে দিতে পারতেন। আজকালকার বৌ বাবুদের সে সময় কোথায় ?"

পথ্যাদি বিষয়েও দেশীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বেশী শ্রদ্ধা ছিল। সাগু, বার্লি ছাড়া আজকালকার বিলাতী ফুড্ প্রভৃতি সব খাদ্য তাঁর দুই চক্ষের বিষ ছিল বলিলেই হয়। একদিন আমি সানাটোজেনের উপকারিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "মশায়, আমাদের টাটকা মুড়ি, খৈ, চিঁড়া ভাজা, মানমণ্ড, মুগের যুস্, মুসুরের ক্বাথ, এ সব থাকতে আর টাট্‌কা দুধ থাকিতে ঐ সব

কত কালের পচা আর না জানি কি সব দিয়ে তৈরী বিলাতী জিনিসগুলো কেন ব্যবহার কর্ত্তে যাওয়া! আমাদের ঐ সব পথ্য ঐ সকল বিলাতী পথ্যের চেয়ে সহস্র গুণে ভাল, বিশেষতঃ আমাদের ধাতুতে।" আমি একবার কাশিতে বড় কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তার বাবুকে একটা ব্যবস্থা লিখে দিতে বলাতে তিনি বল্লেন "মশায়, কেন মিছে কতকগুলো পয়সা দণ্ড দেবেন, মিছরি, পিঁপুল, মরিচ, সুঁট এই সবের ক্বাথ করে খান, কি গুঁড়ো করে মধু দিয়ে লেহন করুন, বড় জোর বাসকের পাতার রস করে খান, সেরে যাবে।" বলা বাহুল্য ৮।১০ দিন এতদনুসারে কার্য্য করিয়াই আমি কাশির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

তারপর একদিন আমাকে রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি মশায়, কাশি গেলেন কি কাশী পেলেন ?" প্রবল অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার আর একটী বিশেষত্ব! বঙ্গভাষার উপর তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি ছিল, তাঁহার আলমারিতে ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া নাটক উপন্যাস আদি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক আছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কথকতার পুঁথি পর্য্যন্ত তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাল ভাল বইও তিনি খুব পড়িতেন। শেষ বয়সে থিওসফি বা তত্ত্ববিদ্যার পুস্তক এবং occultism বা অধ্যাত্ম গুপ্ত বিদ্যাবিষয়ক অনেক গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছেন। এমন দিন যায় নাই, যেদিন কতক সময় তিনি পাঠে অতিবাহিত না করিয়াছেন। এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিলেও আয়ুর্ব্বেদের অনেক পুস্তক এবং হোমিওপ্যাথির অনেক ভাল ভাল প্রামাণ্য পুস্তক তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়াছেন। যদিও ১৮৭৫ সালে তিনি ডাক্তারির উপাধি লাভ করেন, তথাপি চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সব নূতন মত, আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতি হইয়াছে, সে সমুদায়েরই খবর তিনি রাখিতেন, ডাক্তারি বিলাতী সাময়িক পত্রাদি সর্ব্বদা পাঠ করিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার সমভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার এই মহৎ গুণ আমাদের বালক, যুবক ও প্রৌঢ় সকলেরই বিশেষরূপে অনুকরণের যোগ্য!

আমি ২।৩ বৎসর যাবৎ তাঁহাকে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম; যখন বলিতাম, তখন একটু হাসিতেন, আর বলিতেন 'কি হবে তাতে!' আমি বলিতাম, "আপনাদের সে সময়ের কথাতে তাৎকালিক সমাজের একটা ভাল চিত্র পাওয়া যাইবে, মেডিকেল কলেজের সে সময়ের ছাত্রজীবনের একটা ইতিহাস পাওয়া যাইবে, ইহাতে সাহিত্য হিসাবে যথেষ্ট লাভের আশা আছে।" তিনি বলিতেন, আচ্ছা, চেষ্টা করিব। ক্রমাগত অনুরোধের পর মৃত্যুর ২।৩ মাস পূর্ব্বে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কেবল ছয় পৃষ্ঠা মাত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার শৈশব জীবনের হাতে খড়ি, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু শিক্ষার কথা মাত্র আছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্পূর্ণ করিতে পারিলে উহা হইতে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা, সামাজিক জীবন প্রভৃতির পরিচয়ও পাওয়া যাইত, মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবনের বিবরণও আমরা জানিতে পারিতাম, তারপর এদেশের

তাৎকালিক অনেকরূপ অবস্থার বিষয়ও আমরা অবগত হইতে পারিতাম। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কৈলাস-চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন শুনিয়াছি। আহারের বিষয়ে ফল খাওয়ার তিনি বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন এবং ফল খাওয়ার উপকারিতার বিষয়ে আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন। নিজ জীবনেও তিনি ফল বড়ই ভালবাসিতেন, তাহা সকলেই জানেন। প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘাৎদীর্ঘতর হইয়া পড়িতেছে, তথাপি আমার বক্তব্য সব যেন বলা হয় নাই। আত্মীয়জনের গুণগান করিতে কাহার রসনার ক্লান্তি বোধ হয়? কিন্তু আমার ইচ্ছার সীমা না থাকিলেও, আর সমুদয় পাঠকবৃন্দের সহিষ্ণুতার প্রতি অত্যাচার করা আমার অতি সাহস বলিতে হইবে। এজন্য আর বাড়াইব না। কেহ বলিতে পারেন, তাঁর কি দোষ ছিল না? কেবল গুণের ব্যাখ্যাই যে শুনিতেছি। তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মানবমাত্রেই ভ্রম প্রমাদের অধীন! এক পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ব্যতীত নির্দ্দোষ কেহ হইতে পারেন না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মহাত্মারও দোষ থাকা বিচিত্র নয়। ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকাও অসম্ভব নহে, কিন্তু যিনি এখন নিন্দা প্রশংসার উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দোষ থাকিলেও তাহার আলোচনা করা একটা অপরাধ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার দোষ ত্রুটী যাহা কিছু ছিল, তাহা তিনি আপনার শ্মশান-শয্যাতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তাহা সকলই তাঁহার ভৌতিক দেহের সঙ্গে তাঁহার চিতা ভস্মে মিশিয়া গিয়াছে, পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত মানবীয় ত্রুটীর অবসান হইয়াছে. কিন্তু তিনি তাঁহার গুণাবলী এ সংসারে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অম্লান শুভ্র যশোকুসুমের সহিত সৎগুণ মুক্তা-বলী গুম্ফিত করিয়া আমরা তাঁহার বন্ধুবর্গ স্মৃতি-সূত্র সাহায্যে মাল্য রচনা করিয়া সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখী হই এবং সাধারণের নিকট তাহা সগর্ব্বে প্রদর্শন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করি। সংসারে তাঁহার শত্রু ছিল না, এ কথা বলি না; তাঁহার যশোগৌরবে পরশ্রীকাতর সঙ্কীর্ণচেতা কাহারও কাহারও যে অন্তর্দাহ না জন্মিত, তাহা ত বলিতে পারি না, তিলকে তাল করিয়া তাঁহার দোষ ব্যক্ত করিবার জন্য, যেখানে দোষ নাই সেখানেও মক্ষিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া নীচ আত্মতৃপ্তি অনুভব করিবার জন্য তাঁহারা তৎপর ছিলেন—এখন তাঁহার পর-লোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব নিন্দকের রসনারও বিরতি হওয়াই উচিত। যদি তাঁহারা তাহাতে অক্ষম হন, তবে দোষ প্রদর্শনের জন্য ত তাঁহারা রহিয়াছেনই—ঝর্ঝরির পক্ষে সূচের ছিদ্রপ্রদর্শনের ন্যায় তাঁহারা স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকুন, তাহাতে স্বর্গীয় আত্মার কোন ক্ষতি হইবে না। আমরা যাঁহারা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করি, তাঁহার নিকট উপকৃত বলিয়া কৃতজ্ঞ, আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার অশেষ গুণাবলীর মধ্যে যৎসামান্য মাত্র আলোচনা করিয়াও তাঁহার অভাবে আমা-দের ক্ষতির গুরুত্ব উপলব্ধি করি, তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি—এবং পরম মঙ্গলালয় নারায়ণের চরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, আমাদের পরম প্রিয় বন্ধু যজ্ঞেশ্বর বাবুর পূতাত্মা যেন সেই যজ্ঞেশ্বরের চরণে পরম শান্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ পূর্ব্বক স্বকর্ম্মার্জ্জিত সুফল লাভে ধন্য হন। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! ওঁম্।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

নীজ্‌শে দর্শন। (২)

আমি নীজ্‌শে সম্বন্ধে বিগত প্রবন্ধে বহু কথার আলোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। তাই ভয়ে ভয়ে পাঠক ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উক্ত মহাপুরুষ সম্বন্ধে আর একটা প্রবন্ধের অবতারণা করিতে সাহসী হইতেছি। বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয় নীজ্‌শের পরিচয় বিশ্বময় বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বক্ষে নীজ্‌শের স্থান কিরূপ এবং কতটা তাহার আভাষ, এখনও আমরা পাই নাই। নীজ্‌শে রূপী ধূমকেতু এই কুরু-ক্ষেত্রের শান্তির পর মিলাইয়া যাইবে, না অধিকতর পরিস্ফুট হইবে, জগতের চিন্তাশীল-গণ এখনও তাহার একটা সঠিক মীমাংসায় উপনীত হন নাই। জগতের মতামত যাহাই হউক, নীজ্‌শে আপনাকে জগতের কাছে বাকী না রাখিয়া শেষ করিয়াই গিয়াছেন। তাঁহার যাহা বলিবার ছিল, তাহার কিছুই বাদ পড়ে নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটিলেও তিনি কালকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াই গিয়াছেন। তিনি তাঁহার Artকে—সৃষ্টিকে —দর্শনকে একটা সর্ব্বাঙ্গীনতা দান না করিয়া নিরস্ত হন নাই। ভবিষ্যৎ তাঁহার জানা ছিল, এ জগতে যে তাঁহার জীবনকাল অল্প, ইহা তাঁহার তৃতীয় চক্ষু পরিজ্ঞাত ছিল, তাই তিনি Ecce Homo অর্থাৎ "মানুষটাকে দেখ" লিখিয়া আপনার জীবনের খাতা সম্পূর্ণ করিয়া যান।

আমি বহুবার বলিয়াছি, সম্পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতাই আর্টের মুক্তি—suggestion বা ইচ্ছা পরিচালনা নহে। মহাত্মা নীজ্‌শে তাই ভ্রূণ লইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি আর্টকে একটা সঞ্জীবনী শক্তি ও তেজপুঞ্জ কলেবর দিয়া তবে জীবন্মুক্ত হন। এবং এই জন্যই নীজ্‌শের স্থান একটা অটল অচলের উপরেই সমুন্নত হইয়া রহিবে—অস্থায়ী তাসের ঘরে পর্য্যবসিত হইবে না।

নীজ্‌শের অনুভাবিত Culture অর্থাৎ সভ্যতা কেবল জীবনের চন্দন-বিলাসিতা নহে, তিনি Culture অর্থে মানব জীবনের শৃঙ্খলা-কেই বুঝিতেন। তাঁহার মতে,—Culture is, above all, uniformity of artistic style in the vital functions of a nation. Culture is not a decoration of life, it is Harmonious life itself.

ইংলণ্ডের Spencer নাগরিকের বাবু-য়ানাকেই সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জার্ম্মাণির নীজ্‌শে জাতীয় জীবনের শৃঙ্খলাকেই সভ্যতার মাপকাটি বলিতেছেন, এক্ষণে পাঠক বিচার করুন, কাহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

নীজ্‌শের দর্শনের বিশেষত্ব ও রহস্য এই যে, নীজ্‌শে উন্নতি চাহিয়াছেন—মানবকে অতিমানব হইতে বলিয়াছেন—অথচ তাহার অতিমানব অলৌকিক নহে, পৃথিবী ছাড়া নহে, অস্বাভাবিক নহে। স্বভাববাদের উপরেই নীজ্‌শের দর্শন প্রতিষ্ঠিত, এমন কি, তাঁহার অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তন-বাদও (eternal recurrence) স্বভাব ছাড়া নহে! নীজ্‌শে এই ঐহিকতার মধ্যেই দেখিতে পাইলেন :—

"Everything happens quite involuntarily, as if in a tempestuous outburst of freedom, of absoluteness, of power and divinity. Everything seems to present itself as the readiest, the truest and simplest means of expression. All things came to one, and offered themselves as similes." এই যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও ঘটনা পরম্পরার অবশ্যম্ভাবিনী শৃঙ্খলা বা ধারা, ইহা নীজ্‌শে কেবল মানবজীবনেই লক্ষ্য করেন নাই, ইহা তিনি পৃথিবীর অণু পরমাণুর মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ব্যাদানে ওই যে মৃগ আসিয়া ধরা দিতেছে, উহাতেই ওই একই নিয়ম বিরাজ করিতেছে —ইহা নীজ্‌শে দেখিতে পাইলেন। সংহার ও সৃষ্টির এই অবশ ভাবের মধ্যেই তাঁহার অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তন-বাদ নিহিত—সবই যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ও অতিমানবের পথে চলিয়াছে! অথচ তাঁহার অতিমানব এই পৃথিবীরই মানব। "The superman is the meaning of the earth. Remain true to the earth." নীজ্‌শের দর্শনের মর্ম্ম এইখানেই!

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে দুইটী ধারা দেখিতে পাই, তন্মধ্যে একটী নীজ্‌শের ধারা ও অপরটী হুইটম্যানের ধারা। উভয় ধারাই স্বভাববাদের (naturalism) উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু একটী গিয়াছে উন্নত আভিজাত্যের দিকে, অপরটী গিয়াছে বিস্তৃত গণতন্ত্রের দিকে, একটা চাহিয়াছে আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিতে, অপরটী চাহিয়াছে সাগরের অসীম বিস্তৃতি উত্তীর্ণ হইতে। নীজ্‌শে ও হুইটম্যান উভয়েই চাহিতেছেন, অনন্ত এই পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও অনন্ত, কিন্তু একজন চাহিতেছেন আভিজাত্যের সোপান—অতিমানবের বিমান পোত, অপরজন চাহিতেছেন গণতন্ত্রের বিস্তৃত রাজপথ! উভয়েই সত্য, কিন্তু এই উন্নতি ও বিস্তৃতির সামঞ্জস্যের প্রয়োজন Nietzche এবং Whitmanএর বাণীর মিলনের প্রয়োজন। এক দিকে যেমন প্রতিভাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, অন্যদিকে পতিত পথিককেও তুলিয়া ধরিব, এই দুই ভাব একত্র করিয়া জগৎ ও জীবনের প্রকৃত মুক্তি দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। বিংশ শতাব্দী বোধ হয়, এই দুই ভাবকে এক করিয়াই চলিবে। নীজ্‌শে পাশ্চাত্য জগতের শাক্ত এবং হুইটম্যান বৈষ্ণব। উভয়েই সত্য, অথচ উভয়ের বিরোধে জগতের এত দুঃখ।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—এই শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই নীজ্‌শে তাঁহার দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের অপরাপর দার্শনিকগণও নীজ্‌শের বহু পূর্ব্বে শক্তিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নীজ্‌শের মত শক্তি-তত্ত্বকে কেহই সূক্ষ্ম ভাবে ধরিতে পারেন নাই।

তিনি কেবল Schopenhauerএর ন্যায় সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে বাঁচিবার ইচ্ছাই (will to live) বলবতী দেখিলেন না, তিনি দেখিলেন, জীবনকে সমুন্নত করিবার ইচ্ছাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী; তিনি কেবল Darwin এর ন্যায় জীবন-যুদ্ধকেই (struggle for existence) জগতের যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি তাহারই ভিতর একটা সুমহৎ ও সুবৃহৎ অস্তিত্বের বিকাশ দেখিতে পাইলেন; তিনি কেবল Spinozaর ন্যায় প্রকৃতির মধ্যে আত্মরক্ষার প্রাবল্যই (instinct of self-preservation) লক্ষ্য

করিলেন না, তিনি আত্মোৎকর্ষকেই প্রাধান্য দান করিলেন, তিনি কেবল Empedocles এর ন্যায় প্রেম এবং বিরোধকেই (love and strife) বিশ্বের স্বধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন না, তিনি জয় এবং শ্রেষ্ঠত্বকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন।

অপরাপর দার্শনিকগণ জগতকে এবং জীবনকে forward বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু নীজ্‌শে দেখাইলেন onward!—কেবল গতিতেই মুক্তি নহে, উন্নতিতেই মুক্তি। মানুষকে উপরের দিকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা, মানুষকে উৎসাহ দান নীজ্‌শে যতটা করিয়াছেন, এমন বোধ করি আর কোন দার্শনিকই করিতে পারেন নাই। নীজ্‌শেই বলিতে পারিয়াছেন—mankind would rather desire nothingness than have no desire at all. কারণ বাসনাই যে সৃষ্টি! এবং সৃষ্টিই যে নীজ্‌শের দার্শনিকতার মূলাধার! নীজ্‌শের মতে সৃষ্টিটাও একটা মুক্তি। Creating—that is the great salvation from suffering and life's alleviation. বেদনার বিপরীত আনন্দ এবং সৃষ্টিক্রিয়াও একটা আনন্দমাত্র! নীজ্‌শে সেই আনন্দে মুক্তি দেখিতে পাইলেন।

"সৃষ্টির আনন্দ"।—কথাটী রবীন্দ্রনাথের রচনার যথায় তথায় শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহা যে নীজ্‌শেরই নিকট ধার করা কথা, তাহা হয়ত পাঠকগণের বিদিত নাই। আমি এই স্থানে "সৃষ্টির আনন্দে"র প্রকৃত রহস্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিব।

নীজ্‌শে দেখিলেন,—মানব-মনের দুইটী অবস্থা বা সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে—তন্মধ্যে একটা Apollonian অবস্থা এবং অপরটা Dionysian অবস্থা। মানব যখন কোনরূপ সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন দেখে,—তখন সেই প্রত্যক্ষ অবস্থাকে Apollonian বলে। কিন্তু Dionysian অবস্থা সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ অবস্থা, সেই অবস্থায় সৃষ্টির আনন্দের একটা নেশা বা উন্মত্ততা ছাড়া আর কোন ভাবই থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি,—তাজ-মহল একটী সৌন্দর্য্য!—তাহা নিরীক্ষণ করিয়া মানবের মনে যে স্বপ্নের উদয় হয়—তাহা Apollonian অবস্থা। Dream of beautyই তথায় পরিস্ফুট! তাহার পর, Dionysian অবস্থা—যেমন সঙ্গীত। সঙ্গীতের রাজ্যে কোনরূপ দেখিবার বস্তু নাই—কোন বহিরাবরণ নাই—কেবল একটী নাদ রাজ্য। সে রাজ্যে ষড়জ সুর আছে, রাগ-রাগিণীময় স্বর নাই, নির্ম্মল আনন্দ আছে, অভিব্যক্তি নাই, বৈখরী নাই। Dionysian প্রবাহে কেবল পরাপশ্যন্তী ও মধ্যমার অব্যক্ত তরঙ্গ-ভঙ্গী উত্থিত হইতেছে, কোনরূপ চাক্ষুষ ভাষার দেউল বা Plastic art তথায় স্থান পাইতেছে না, তথায়—"The will amuses itself in the eternal fulness of its joy" আমাদের মনোময় কোষ তথায় সৃষ্টির আনন্দে বিভোর অর্থাৎ আনন্দময় কোষে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

যেখানে Dionysian অবস্থা ও Apollonian অবস্থার মিলন ঘটিতেছে, যেখানে ভাব ও ভাষার, সুর ও স্বরের মন্থন চলিয়াছে, যেখানে মধ্যমা, বৈখরীর নিকট ধরা দিতেছে, যেখানে গায়ত্রী বীজ ফুটিয়া উঠিতেছে, সেখানে lyric বা গীতি কবিতা অবয়বী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে—চিত্ত (will) সেখানে চিত্র (image) হইয়া পড়িতেছে।

ওই যে সংহারের দেবতা, বিয়োগান্ত নাটকের (Tragedy) নটরাজ, ভূতনাথ ভবদেব মরণের শ্মশানক্ষেত্রে "দে সতি, দে সতি" বলিয়া ক্রন্দনের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, —উহার অন্তরালে নীজ্‌শের Dionysian Artই প্রকাশ পাইতেছে। পড়িয়া দেখ হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা—দেখিবে, সতী দেহ-ত্যাগে শিবের বিলাপে ওই Dionysian Artই নিহিত রহিয়াছে—অমন অপূর্ব্ব নিদর্শন আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া ত বোধ হয় না।

নীজ্‌শে বলিয়া গিয়াছেন—Tragedy was born of the spirit of music. সংগীতের অশ্রুজলেই যে Tragedyর জন্ম তাহার আর কোন ভুল নাই এবং ভোলানাথ ভূতনাথই সেই সংগীত রাজ্যের দেবতা! নীজ্‌শে তাঁহাকে Tragic myth বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সেই আত্ম-ভোলার স্বষ্টিতেও আনন্দ, সংহারেও আনন্দ! আত্ম-ভোলা না হইলে কি অগ্রসর হওয়া যায়? যখনই চিন্তাকে ক্রিয়ায় পরিণত করিতে হইবে, তখনই সব ভুলিতে হইবে। তাই নীজ্‌শে বলিয়াছেন—In order to be able to act we need the power of forgetfulness. কোনরূপ স্বষ্টি কার্য্যেই এই ভ্রান্তির প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের Italyর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Croce (ক্রসী) নীজ্‌শেরই অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি মনকে প্রকৃতি (nature) বলিয়াছেন—মন আত্মা (spirit) নহে। মনে ক্রিয়া চলিতেছে. আত্মা নিষ্ক্রিয়। মন practical, আত্মা theoretical, মন অজ্ঞান, আত্মা চৈতন্য-ময়, কবি প্রথমতঃ অবশভাবেই রচনা করিয়া যান, তাহার পর দোষ গুণের বিচার করিতে গিয়া কবিই সমালোচক হইয়া পড়েন—কবি যখন আত্ম-ভোলা, তখনই স্বষ্টিশীল, যখন সমালোচক, তখন তিনি বিবেক ও বিচারের দ্বারা চালিত ক্রিয়ার অবসানে বিচারের উদয় হয়। নীজ্‌শেকে সমর্থন করিতে ক্রসীও বলিতেছেন—"Indeed the artist at the moment of artistic activity is not conscious of his creation. His action becomes conscious only afterwards, either in the mind of the critic or of the artist who becomes critic of himself." স্বষ্টি প্রবাহ-ময়ী, আনন্দময়ী, যেখানে বিচার (conscience) সেইখানেই বেদনা—অনুভূতি।

একদিকে ডাইওনীসিয় আর্টে যেমন স্বষ্টির আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি ধ্বংসেরও আনন্দ! A Dionysian life-task needs the hardness of the hammer and one of its first essentials is without doubt the *joy even of destruction.* The command "Harden yourselves!" and the deep conviction that *all creators are hard* is the really design of a Dionysian nature.

নীজ্‌শেকে বুঝিতে হইলে অগ্রে এই ডাইওনীসিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, তিনি যে গ্রীক দার্শনিক Dionysusএর শিষ্য, ইহা তাঁহার আত্ম-জীবনীতেও স্বীকার করিয়াছেন।

এক কথায়, নীজ্‌শের ধর্ম্ম, শক্তি ও কঠিনতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ভক্তি ও কোমলতা তাহাতে অল্পই স্থান পাইয়াছে। তিনি খ্রীষ্টানদিগকে পরিহাস করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, —I refuse to be a saint; I would rather be a clown. এখানে বুঝিতে

হইবে, ডাইওনিসীয় তত্ত্বটা আগাগোড়াই খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের বিরোধী।

খ্রীষ্টীয় সমাজে নীতির দোহাই যত দেওয়া হইয়াছে, এমন আর কোন সমাজে নহে, অথচ সেই সমাজের অন্তরালে পাপের বিভীষিকা মূর্ত্তি যত স্থান পাইয়াছে, এমন আর কোন সমাজে নহে। এই জন্যই তিনি খ্রীষ্টীয় সাধুতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ভদ্র ব্যক্তি-(Good men) দিগকে তিনি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"Good men never speak the truth. False shores and false harbours were ye taught by the good. In the lies of the good were ye born and bred. Through the good everything hath become false and crooked from the roots." জগতে প্রচারক অনেক দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃত আচরক কয়টা পাওয়া যায়? জগতে উপদেষ্টার আসন অনেকেই অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আদর্শ কয়জন রক্ষা করিয়া থাকেন?—নীজ্‌শে কোন দিন উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন নাই। বরং নিজেকে তিনি জগতের প্রথম immoralist বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—"I am the first immoralist and in this sense I am essentially the annihilator." নীজ্‌শেকে যাঁহারা প্রাণ দিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তের দল গঠন করেন নাই, তাঁহারা নীজ্‌শেকে prophet বা ঋষি না করিয়া নিজ নিজ আত্ম-শক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন—নীজ্‌শের বচনের উপরে নির্ভর করেন নাই। কারণ নীজ্‌শে সব কথা বলিয়া শেষ কথা এই বলিয়াছেন—"Now do I bid you lose me and find yourselves; not until all of you have disowned me will I return unto you." নীজ্‌শে যে কত বড় মহাপ্রাণ, তাহা তাঁহার এই কয়টী কথায় বুঝিতে পারা যায়।

আর একস্থলে নীজ্‌শে বলিতেছেন—"Ye had not yet sought yourselves when ye found me. Thus do all believers; therefore is all believing worth so little." নীজ্‌শে নির্জ্জন তপস্বী, নীজ্‌শের যাঁহারা প্রকৃত অনুরাগী, তাঁহারাও নির্জ্জন তপস্বী, নীজ্‌শের তোষামোদকারী নহে, অন্ধ ভক্তও নহে। নীজ্‌শের গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে জীবনে আত্মান্বেষণ-স্পৃহা উত্তরোত্তর বলবতী হইয়াই উঠে এবং পরের মুখে ঝাল খাওয়া কমিয়া যায়। নীজ্‌শের মধ্যে যে দিন পড়িলাম—"The scholar who does little else than handle books ultimately forgets entirely and completely the capacity of thinking for himself. In him the instinct of self-defence has decayed, otherwise he would defend himself against books. The scholar is a decadent."

যে দিন পড়িলাম,—"The scholar and the old maid are alike respectable, but comprehend nothing of procreating and producing. The fully matured ideal scholar is a precious instrument, a mirror but nothing in himself, neither an end nor a beginning." সে দিন হইতে আমার গ্রন্থ-কীট (book-worms) হইবার বাসনা জীবন হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, প্রবন্ধ-রচনার খেয়ালও অহঙ্কারত কমিল এবং তাহারই ফলে আজ গ্রন্থের মোহজাল পরিত্যাগ করিয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি!

নীজ্‌শের এক একটী বাণী, এক একটী আঘাত স্বরূপ, নীজ্‌শে যে ক্ষত দিয়া যান,

তাহার দাগ জীবনে মিলায় না! নীজ্‌শে পড়িয়া আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আর আত্মগোপন-স্বভাব ভাল মানুষের (good men) দলে আমি নাই। নীজ্‌শে পড়িলে জীবনে অস্পষ্টতা ঘুচিয়া যায়, জীবন সহজ ও সরল হইয়া আসে, অসত্যের মুখস (musk) খুলিয়া গিযা জীবনে সত্যের নির্ভীকতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। আজীবন যাহাকে ভাল বলিয়া জানিতাম, নীজ্‌শের একটী মাত্র আঘাতে তাহাকেই আজ জীবনের উন্নতির সবিশেষ অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতেছে—ওই যে প্রিয়দর্শন বান্ধবগণ, উহারাও আজ ক্রমে ক্রমে আমার ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িতেছেন—আজ শত্রুকেই যেন অধিকতর আত্মীয় ও প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে—কারণ নীজ্‌শের মুখে যে শুনিয়াছি—"The knight of knowledge must be able not only to love his enemies, but also to hate his friends" (তোষামোদকারী)।

নীজ্‌শে সর্ব্বাপেক্ষা চাপা দিয়া চলাটাকে জীবনের বিশেষ ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেন এবং মুখে এক, মনে আর এরূপ ভাল মানুষদিগকেই তিনি মানবতার সর্ব্বপ্রধান শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। খ্রীষ্টীয় নীতি-বাগীশদিগের উপর এই জন্যই তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া ছিলেন। নীজ্‌শে এই সব তথা কথিত নিরীহদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"And whatever harm the slanderers of the world may do, the harm of the good is the most calamitous of all harm. The good—they cannot create; they are ever the beginning of the end. They crucify him who writeth new values on new tables; they sacrifice unto themselves the future; they crucify the whole future of humanity."

আজ পাশ্চাত্য জগতে যে সংস্কারের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নীজ্‌শে তাহার অগ্রদূত! বার্গসোঁ, ক্রসী, ইব্‌সেন, আঁদ্রিফ, এমন কি আমাদিগের বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্বনগুলিও জার্ম্মাণির নীজ্‌শেরই প্রতিধ্বনি মাত্র —ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ওই যে যৌবনের শ্যামলতা, ওই যে বাতাস আলো, ওই যে অরুণ তরুণতা, ওই যে সবুজ ভাব, সবই নীজ্‌শেরই নিজস্ব (originality) ব্যক্ত করিতেছে। বার্গসোঁর দৃঢ়তাবাদ (Determination theory), ক্রসীর সৃষ্টি তত্ত্ব, ইব্‌সেনের Brand, আঁদ্রিফের The life of Man, রবীন্দ্রনাথের moralityর ধারণা, সবই নীজ্‌শের প্রতিধ্বনির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"I love freedom and the wind over fresh earth; but they (নিরীহ ভাল মানুষগণ) sit cool in the deep shade. All sun-love is innocence and creative desire"—নীজ্‌শের পূর্ব্বে এই নব বারতা য়ুরোপের ক্ষেত্রে আর কেহ জানায় নাই।

Morality সম্বন্ধে আজ যে নূতন ভাব বঙ্গদেশে গজাইয়া উঠিতেছে, ইহার আদি গুরুও নীজ্‌শে! কারণ নীজ্‌শে দেখিতে পাইলেন—"Nothing that exists must be suppressed, nothing can be dispensed with." নীতি মাত্রকেই নীজ্‌শে সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন—"Every system of morals is a kind of tyranny against "nature". লোকলজ্জা এবং লোকভয় হইতেই নীতির জন্ম, লোকে কি বলিবে,

—এই জন্যই আমরা প্রবৃত্তি সত্ত্বেও আত্মগোপন করিয়া চলি; নীজ্‌শে সেই লোকভয়ের বিরোধী এবং আত্ম-বিলাসে বিশ্বাসী। তাই নীজ্‌শে বলিতে বাধ্য হইলেন—"Morality is the herd instinct in the individual." এবং নীতিবাগীশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"Morality is the idiosyncrasy of decadents, actuated by a desire to avenge themselves with success upon life." পৃথিবীর মধ্যে পনেরো আনা লোক নিজেকে চাপা দিয়া চলে, অথচ অপরের বেলায় নীতির দোহাই দেয়—এই ভণ্ডামির স্রোত ফিরাইবার জন্য realist নীজ্‌শে নীতিকে, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় নীতিকে জীবনোন্নতির প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করিলেন। জানি না, এই মহাকুরুক্ষেত্রের পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম monogamy (এক বিবাহ নীতি) কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? এই সময়ে নীজ্‌শে বাঁচিয়া থাকিলে খ্রীষ্টীয় সমাজ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পরিহাস আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। বাস্তবিক কথায় এবং কাজে মিল খ্রীষ্টান নীতি-তত্ত্বের ভিতর খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। এক গালে চড় মারিলে যাহারা আর এক গাল পাতিয়া দেয়, তাহাদিগের দ্বারা এই মহাকুরুক্ষেত্র কেমন করিয়া বাধিয়া উঠিল, তাহা ত ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। এইরূপ মিথ্যা নীতিকে তিনি পদে পদে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। নীজ্‌শের অপ্রিয় সত্যের তীব্রতা খ্রীষ্টীয় নীতিবাগিশগণ সহিতে পারে না—তাই তিনি বলিতেন—"But my truth is terrible for hitherto *lies* have been called truth."

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীজ্‌শে অতিমানববাদের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার দর্শনে প্রত্যক্ষবাদ ব্যতীত অতীন্দ্রিয়তা বা অলৌকিকতা কিছুই ছিল না। তাহার জরথুস্ত্রের বিশেষত্ব পার্থিবতাকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই—এই পৃথিবীর সত্যের উপরেই তাঁহার জরথুস্ত্র অতিমানবের সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন—এই পৃথিবীতেই নীজ্‌শে স্বর্গ ও নরক, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, অথচ সেই অবশ্যম্ভাবী সম্পদ বিপদে তিনি বিচলিত হইতেন না। যাহা জাগিয়া ও জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা করিয়া যাও, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভাল মন্দ বিচারের তুমি কে? এ জন্মের তুমি কতটুকু! জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল তুমি, তোমার সব ইতিহাস মনে আছে কি? তুমি কোথায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিলে, কোথায় নির্ব্বাণ পাইবে, ইহা যখন তোমার জানা নাই, তখন চোখ বুজিয়া করিয়া যাও—ভাল ও মন্দের দিকে তাকাইও না। কিসে ভাল, কিসে মন্দ, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার তোমার অধিকার নাই—ভাল মন্দ কর্ম্মফল—ভাল মন্দ ভবিষ্যতের গর্ভে! সেই গীতার জ্ঞান গম্ভীরা বাণী নীজ্‌শে প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন—"No one knoweth yet what is good and evil unless it be he who createth man's aim and giveth to the earth its significance and its future." কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে, কারণ ফল যে ভবিষ্যতের গর্ভে—যতক্ষণ না সেই ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখীন হইতেছে, ততক্ষণ তোমার ভাল মন্দের ধারণা কল্পনা মাত্র।

নীজ্‌শে তাঁহার Beyond good and evil পুস্তকেও এমনি ভাবের কথা বলিয়া কর্ম্মকে উৎসাহিত করিয়াছেন—"If nothing was caught, it was not I who was

at fault. *There were no fish to come and bite.*" মানুষ একটা চেষ্টামাত্র—কর্ম্মমাত্র, কর্ম্মফলের সুগভীর ভবিতব্যের ভিতর সে কেবল চেষ্টা করিয়া প্রবেশ করিতেছে—তাহাতে যদি সে কৃতকার্য্য হয়, ভালই, না হইলেও কোন দুঃখ নাই। মানুষ অজানা নদীতে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে, মাছ আসা আর না আসা তার ভাগ্য! নীজ্‌শের মত realistকেও বলিতে হইয়াছে—Man hath been an attempt. We fight step by step with the giant *chance.*"

চেষ্টার বিফলতা লক্ষ্য করিয়াই বোধ করি, নীজ্‌শের মনে অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তনবাদ উদিত হইয়াছিল—এ জন্মে না হইলেও পর জন্মে হইবে—এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল! যাহা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ না হইয়া যাইবে না, তাহা সফল করিবার জন্য কি ইহ জীবনে, কি পরজীবনে বহু বার মরিতে হইবে এবং এই জন্যই বুঝি শক্তিপূজক নীজ্‌শে Eternityর ভক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তে বিশ্বাসী না হইলে ভবিষ্যৎ-ধর্ম্মী নীজ্‌শের দর্শনের যে সম্পূর্ণতা ঘটে না। তাই নর নারীর জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের মধ্যে তিনি আপনার সুদর্শন-চক্র (eternal recurrence) দেখিতে পাইয়াছিলেন। নীজ্‌শে নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। তিনি অনন্তের মধ্য দিয়া আশা ও উন্নতির সোপান অতিক্রম করিতে বলিয়াছিলেন—যেখানে নৈরাশ্য, যেখানে অবসাদ, সেখানে নীজ্‌শে আশা ও উদ্ধারের বর্ত্তিকা হস্তে হাজির হইয়াছেন। "Into every abyss do I bear the benediction of my yea to life." এইরূপ আশা ও উৎসাহের বাণী নীজ্‌শের গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে নানা আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে—অতি বড় পাপীও নীজ্‌শে অধ্যয়নে আপনার উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, মহা যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তিও মর্ম্মাহত অবস্থাতেও শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়াছে। নীজ্‌শে কোন দিনও জীবনটাকে তুচ্ছ ও ভার বলিয়া মনে করেন নাই,—"Life was easy—in fact easiest—to me, in those periods when it exacted the heaviest duties from me." ফলরহিত কর্ম্মেই মুক্তি, গীতার পর এই কথাটা নীজ্‌শে যত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, এমন বোধ করি আর কাহারও মুখ হইতে শুনি নাই। নীজ্‌শে মননকেই (To will is to create) কারণ বলিয়াছেন এবং ইচ্ছাশক্তিকেই মানবের প্রধান শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ সৃষ্টি রহস্যটাই যে ইচ্ছাশক্তির নামান্তর মাত্র। "আমি বাহু হইব"—এই ইচ্ছা করিয়াই এই বিরাট বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়াছে। নীজ্‌শের বাণী মুক্তি এবং আশার বাণী। যাহারা কোন দিনও জীবনে পথ পাইবার আশা করে নাই, যাহারা পশ্চাতে পড়িয়াই দিন কাটাইয়াছে, নীজ্‌শে তাহাদিগকে বুক ফুলাইয়া নির্ভয়ে চলিতে বলিয়াছেন, পতিত এবং বঞ্চিতকে নীজ্‌শে উন্নতির শত দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন, অসহনীয় যন্ত্রণা, নিদারুণ শোক, ভয়াবহ দুঃখ দুর্দ্দৈব জগতে নিরর্থক হইয়া আসে নাই, তাহারও অন্তরালে অজানিত ভবিতব্যের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। "The world is deep and deeper than ever the day thought it. The poorest shall be the lords of the earth, the least recognised, the strongest; the midnight souls, which are brighter and deeper than

any day." একমাত্র Whitman ছাড়া এমন উৎসাহের কথা আর কাহারও লেখনীতে প্রকাশ পায় নাই। গণ-তন্ত্রের বাণী ত এইখানেই, Democracyকে চরিতার্থ করিতে হইলে এই পথ ধরিয়াই করিতে হইবে। পতিতের মনে আভিজাত্য ও আত্ম-বিশ্বাস না জাগাইতে পারিলে গণ-তন্ত্রের বাণী কোন দিনও সফল হইবে না। নীজ্‌শের আভিজাত্যে দরিদ্র বিতাড়িত হন নাই। বরং জগতের যত বড় বড় কাজ ধনহীনেরা করিয়াছে—ইহাই নীজ্‌শের বিশ্বাস। নীজ্‌শের আভিজাত্য চরিত্রের আভিজাত্য (aristrocracy of character) তাহাতে ধনী ও নির্ধনের ভেদাভেদ নাই, তাহাতে বিদ্যা বুদ্ধি এবং সগৌরবেরও গর্ব্ব নাই। তাহাতে যিনি উপযুক্ত তিনিই স্থান পাইয়াছেন। মানুষ তাহার চরিত্র ও ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত—মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা দেখিবার আবশ্যক করে না, কোথায় যাইতেছে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজ আমাদিগকে চলিতে হইবে। নীজ্‌শের সহৃদয়তা এবং সুমহানতা মানুষকে অতিমানুষ করিয়া মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়াইয়া—মানুষকে নিরাশ করিয়া নহে। দেখ, মহাপ্রাণ নীজ্‌শে পতিত ও অবসন্নদিগকে কি ভাবে টানিয়া তুলিতেছেন!—

"Alas, it is ye alone, ye creatures of gloom, ye spirits of the night, that take your warmth from that which shineth, ye alone suck your milk and comfort from the udders of the light." নির্জন তপস্বী নীজ্‌শে এই জন্যই দিবস অপেক্ষা রাত্রিকে অধিকতর ভালবাসিতেন—নীজ্‌শের হৃদয়ের যত প্রেম, যত সঙ্গীত, যত আলাপন নিশীথের নীরবতার মধ্যেই প্রকাশ পাইত। নীজ্‌শের dithy ramb night song হইতে দুই একটী পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"It is night; now do all gushing springs raise their voices. And my soul too is a gushing spring.

It is night; now only do all lovers burst into song. And my soul is the song of a lover.

Alas, within me is a thirst that thirsteth for your thirst!"

নীজ্‌শের রচনায় স্পষ্টতা এবং উজ্জ্বলতাই অধিক, কোনরূপ হেঁয়ালির আবরণে তিনি তাঁহার রচনাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলেন নাই। নীজ্‌শে অনেক নূতন কথা কহিয়াছেন, অথচ তাহাতে কোন বিরক্তির লেশ মাত্র নাই। তাঁহার নূতন কথায় সেই চির সনাতন সত্য কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। মিথ্যাটাই মানুষ শুনিয়া আসিতেছিল—মিথ্যাতেই সে গঠিত হইতেছিল, নীজ্‌শে আসিয়া সেই আত্ম প্রতারণার উপর কঠিন ও অপ্রিয় সত্যের hammer আঘাত করিলেন। আজ যাহা কিছু খ্রীষ্টীয় জগতের কল্পনা, সত্যের কঠিন আঘাতে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া খসিয়া পড়িতেছে। সেই সত্যের উপর নীজ্‌শের দাবী সর্ব্বাগ্রে—য়ুরোপে এমন অদ্বিতীয় পুরুষ আর জন্মায় নাই। সত্যের কাছে, প্রয়োজনীয়তার কাছে, ক্ষুধার কাছে আজ য়ুরোপের ভাবুকতা (idealism) খসিয়া ধসিয়া পড়িতেছে, এই মহাহবের অবসানে য়ুরোপকে সম্পূর্ণভাবে নবকলেবর ধারণ করিতে হইবে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাইব, নীজ্‌শের অনেক বাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। যাহা কেহ কখনও কল্পনাতেও

আনতে পারে নাই, তাহা সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। হুইটম্যানের গণ-তন্ত্রের রাজপথেই নীজ্‌শের অতিমানবের রথচক্র আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী বক্ষে করিয়া পৃথিবীর গগন পবন আলোড়িত করিবে। সেই রাজ-পথে এবং রথে ধনগর্ব্বীর অহম্মিকা অপেক্ষা দরিদ্রের ক্রন্দনের দাবী অধিক—তাহাতে জাতিভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ধনী ও নির্ধন-ভেদ থাকিবে না। সেই বিশ্বমানবের সিংহাসনে শ্রমের মর্য্যাদা ও মুকুট সযত্নে রক্ষিত হইবে—বিলাসিতার অপব্যয় তথায় স্থান পাইবে না। অতিমানব তথায় বিশ্বমানবের জন্য ধ্যানস্থ, অতিমানব তথায় অতি মানবের অন্বেষণে ব্যস্ত! পৃথিবীর যাহা কিছু ক্ষুদ্রত্ব, দীনতা এবং মলিনত্ব, অতিমানব এবং বিশ্ব-মানবের মহামিলনে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ওই যে বিংশ শতাব্দীর লেলিহান কুরুক্ষেত্র!—ইহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, ইহার বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—সবই ভবিষ্যতের গর্ভে! কিন্তু ইহাতে মানবের ইহপার যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পরপার তেমনই নির্ম্মিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিবারও সবিশেষ কারণ রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে য়ুরোপের আসল মানুষটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—স্বাধীনতার ক্ষেত্র পাইয়া য়ুরোপের চোর ডাকাতও আজ মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পাইয়াছে—এই মহা কুরুক্ষেত্রে স্বার্থ রক্ষার জন্য ত্যাগের আয়োজনও ত বড় কম নহে। এই ত্যাগটাই রহিয়া যাইবে! তখন য়ুরোপের আসল মানুষটার মুখে শুনিতে পাইব—"We shall not so prepare ourselves with the mere selfish object of surviving. Whether we survive or not will be a matter of indifference to us. We shall make ourselves as fit and ready and our individuality as full and perfect as we can make it, in order that we may have the more to give and more to sacrifice for the good of all, for the good of our country, for the good of humanity. Neitzche's principle that man must surpass himself, must prepare the way and even sacrifice himself for the larger, greater, higher men to come whom he must help to create, is one which all true man will have to adopt." ইহা একজন বড় ইংরাজের কথা। একদিন যে ইংরাজের মুখে শুনিয়াছিলাম—"natural selection survival of the fittest, struggle for existence"—আজ সেই ইংরাজ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যোগ্যতমের জয়, জীবন-যুদ্ধের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ভুলিয়া ত্যাগের মহাবীরতার জয় ঘোষণা করিতেছে। আজ সেই ইংরাজ বলিতেছে—"That by natural selection is meant the selection of those who have most bare strength, that by the survival of the fittest is meant those who are fittest in the athletic sense; that by the struggle for existence is meant the pushing back of others into the water that we ourselves may be saved—such an idea will have to be abandoned and exterminated." ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ক্ষুদ্রমনা স্বার্থান্ধ য়ুরোপ সুমহান ও সহৃদয় হইতে চলিয়াছে। য়ুরোপের প্রকৃত genius এইবার ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইব, বিংশ শতাব্দীর বক্ষে নীজ্‌শে কতটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন!

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

পৌরাণিকী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কহিলা ত্রিদশ পতি 'সে কি সুরেশ্বরি,
পতিপ্রাণা পৌলমীর কেন এ বেদনা?
জান তো সুভগে, আমি অভাগ্যের বশে
ত্রিশিরা ও বৃত্রাসুরে ছলিয়া বধিনু!
রাজনীতি? শ্রেষ্ঠতমা ধর্ম্মনীতি সদা।
তাই অনুতাপ-অগ্নি কাল বহ্নি রূপে,
ভস্ম করি দিল, যাহা চিত্তের প্রসাদ।
আমি আচরিনু পাপ দেবরাজ হয়ে,
তবে কি করিবে পরে, অশক্ত অক্ষম!
আচরি এ মহাপাপ, শাসিব কেমনে
ন্যায়-পথ ভ্রষ্ট জনে, ন্যায় দণ্ড ধরি?
যখনি জাগিবে মনে—বিজলী ঝলকে—
আমি সে বিশ্বাসঘাতী পাপী দুরাচার;
অমনি কুস্পর্শে মম উঠিবে কাঁপিয়া
অমরার সিংহাসন চির পুণ্যময়!
নিত্য জাগে চিত্তে ব্যথা, শমী বক্ষে যথা
নীরব অনল কুণ্ড জাগে নিরবধি!
সে জ্বালা জুড়াতে সতি, আসিয়াছি চলি,
নির্জন বিজন মাঝে ইষ্টদেবতায়,
পূজিয়া আবার পাব শান্তি, পুণ্য ফিরি।
অমৃত-ঔষধে বাঁচে মুমূর্ষু যেমতি।
বরষায় বাঁচে যথা শুক শস্য রাশি।
তবে কেন ধর্ম্মপ্রাণা হে সহধর্ম্মিণি!
অমর-বিভব সুখ বিমুখ যে জন
তার তরে ক্ষুব্ধা হেন—এ বিরহ ব্যথা
আনন্দে সহিবে পতি-কল্যাণে ইন্দ্রাণী।
উত্তরিলা মঞ্জুকেশী, কুঞ্জবনে যথা
মধুমাখা রবে পিক গাহে মধুমাসে।
"ভ্রান্তি বশে শচীকান্ত অরাতি বিনাশি,
হেন অনুতপ্ত হায় পুণ্যময় তুমি!
বিশুভ্র বসনে তাই মসীবিন্দু সম,
এ বেদনা-চিহ্ন তব জানি সে বারতা।
সহসা এ বেশ তব হেরিয়া দেবেশ,
বাজিল কেমন মনে তাই কি বলিনু,
ক্ষমিও জীবিত নাথ, ক্ষমিও দাসীরে
চিরদিন ক্ষমিয়াছ সুপ্রসন্ন চিতে।
ধর্ম্ম কর্ম্মে রত পতি, তাঁহার বিরহে
আকুলা, অধীরা কবে কে সহধর্ম্মিণী?
গগনে বিরাজে রবি তাহার আলোকে
পুলকিতা সূর্য্যমুখী দূরে—ধরাতলে।
যথা রহ তুমি প্রভো, পূজি মনে মনে
দিবানিশা যাপে শচী জানিও নিশ্চিত।
তুমি আরাধিছ নিজ আরাধ্য দেবতা
আমিও আরাধি মোর অভীষ্ট ঈশ্বরে।
বিরহের ডরে নাথ, নাহি ডরি আর
ত্রাসিতা, এ পদাশ্রিতা দুর্জ্জনের ডরে"।
সবিস্ময়ে সুরপতি সুধিলা "কি কথা,
ত্রাসিতা দুর্জ্জন-ডরে ইন্দ্রাণী আমার?
অমরা-সাম্রাজ্ঞী তুমি দেবেন্দ্র মহিষী,
ত্রিলোকের বরণীয়া, স্বর্গ সম্মানিতা;
কহ দেবি, কহ শুনি, কে অধম হেন,
কোন ভাগ্যহীন; হেন কুবুদ্ধি কাহার,
ফণীন্দ্রের শিরোমণি হরিতে প্রয়াসী,
স্বর্গে হেন দুরাকাঙ্ক্ষ করে কি বসতি?"
জুড়াইল জ্বালা সতী পতির আদরে,
যেমতি সে দগ্ধ ক্ষত অমৃত লেপনে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরকুমার বধ-রচয়িত্রী।

অণু ও পরমাণু। (শেষ)

৭২। এখন পরমাণু কাহাকে বলে, সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়,—পরমাণু বলে মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে—বিভিন্ন মূল পদার্থের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া নানাজাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশের মধ্যে ঐরূপ সংযোগ ঘটে না, অতএব রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারে যাহারা অবিভাজ্য, এইরূপ অংশগুলিকে। আর অণু কাহাকে বলে, সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, অণু বলে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে—যাহারা বিভাজ্য, অথচ বিশ্লেষণ না ঘটাইয়া যাহাদিগকে ভাগ করা যায় না, এইরূপ অংশগুলিকে।

৭৩। এখানে একটা খট্‌কা উঠিতে পারে। পরমাণু বলিতে মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বুঝায়। কাজেই পরমাণু বলিতে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকেও বুঝাইয়া থাকে; কেন না, গোটাকত মূল পদার্থ লইয়াই ত এক একটা যৌগিক পদার্থ। ফলে, কি মৌলিক, কি যৌগিক—পদার্থ মাত্রকেই পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু জড়মাত্রকেই অণুর সমষ্টিরূপে গ্রহণ করা চলে কি? অণু অর্থে যদি যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশই বুঝিতে হয়—ইহাই যদি অণুর সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে, কেবল যৌগিক দ্রব্যগুলিকেই অণুর সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা চলে, মূল পদার্থগুলিও অণুময়, ইহা ত বলা চলে না। জিজ্ঞাস্য, জড় মাত্রই কি অণুময় নহে? শুধু যৌগিক পদার্থেরই অণু আছে, মূল পদার্থের অণু নাই? যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহাকে অণু বলি, উহা কতকগুলি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। বিশিষ্ট ধর্ম্মের ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কতকগুলি পরমাণু লইয়া এক একটী যৌগিক অণু নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার এরূপ কোটি কোটি অণু লইয়াই এক একটা যৌগিক পদার্থ। প্রশ্ন হইতে পারে, এই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ কারবার চলে কি? উহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার কেমন? উহারা স্থির না চঞ্চল? এক একটা অণু, উহার সমজাতীয় অণুগুলির মধ্যে দিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় কি? এবং চলিতে চলিতে একে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে কি? অথবা উহাদের পরস্পরের মধ্যে টানাটানি, ঠেলাঠেলি, এরূপ ব্যাপার আছে কি? যদি থাকে, তবে ঐরূপ ব্যাপার কেবল যৌগিক পদার্থের কণাগুলির মধ্যেই—যাহাদিগকে যৌগিক অণু বলি, তাহাদিগের মধ্যেই থাকিবে, এইরূপ কথা কি আছে? মূল পদার্থগুলিও কি ঐরূপ কতকগুলি কণা লইয়া গঠিত নহে?—গোটা গোটা কণা, প্রত্যেকে যাহারা ২।৪ টা বা ৫।৭ টা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, যাহারা একজাতীয় পরমাণু লইয়া গঠিত হইলেও, প্রত্যেকের এক একটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, যাহারা সর্ব্বাংশে পরস্পরের সমান, যাহারা উহাদের সমজাতীয় অপর কণাগুলির মধ্যে দিয়া ছুটিয়া বেড়ায় এবং ছুটিতে গিয়া পরস্পরে

ঠোকাঠুকি করে, এক একটা মূল পদার্থও কি এইরূপ কতকগুলি কণা লইয়া গঠিত নহে? যদি মূল পদার্থগুলিও এরূপ কণা লইয়া গঠিত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকেও কি অণুময় বলা চলে না?—এই কণাগুলিকেই মূল পদার্থের অণু বলিয়া গ্রহণ করা চলে না?

৭৪। এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, অ্যাভোগাড্রো। অ্যাভোগাড্রো বলিলেন, হঁা মূল পদার্থেরও অণু আছে। কি যৌগিক পদার্থ, কি মূল পদার্থ, পদার্থ মাত্রকেই অণুর সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, প্রত্যেকে যাহারা বিশিষ্ট ধর্ম্মের ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার গোটাকত পরমাণু লইয়া গঠিত, যাহারা বিভাজ্য, অথচ যাহাদিগকে ভাগ করিতে গেলেই একটা সমস্যার মধ্যে পড়িতে হয়, যাহাদের প্রত্যেকের এক একটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কারবার চলে,—যাহারা কোন কোন কারবারে অবিভক্ত রহিয়া যায়, আবার কোন কোন কারবারে ভাঙ্গিয়া গিয়া পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, প্রত্যেক পদার্থকেই এইরূপ কতকগুলি কণার সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহারাই অণু। এইরূপ কতকগুলি অণু লইয়া এক একটা যৌগিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে, আবার এইরূপ কতকগুলি অণু লইয়া এক একটা মূল পদার্থও গঠিত হইয়াছে। তফাৎ এই, একটা যৌগিক অণুর মধ্যে যে সকল পরমাণু রহিয়াছে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, আর একটা মূল অণুর মধ্যে যে সকল পরমাণু রহিয়াছে, উহারা সকলেই একজাতীয়। কিন্তু আর সকল বিষয়ে, কি যৌগিক অণু কি মূল অণু, সকলেরই ব্যবহার একপ্রকার। একটা যৌগিক দ্রব্যের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেরূপ ব্যবহার, একটা মূল পদার্থের অণুগুলিরও পরস্পরের প্রতি ব্যবহার তদনুরূপ; এবং এই ব্যবহারের কাহিনী লইয়াই Physics বা পদার্থবিজ্ঞান। আবার বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলির মধ্যেও নানারকমের কারবার চলে। বিভিন্ন জাতীয় অণুগুলির মধ্যে এই যে কারবার, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই Chemistry বা রসায়ন শাস্ত্র। মূল পদার্থের সহিত মূল পদার্থের অথবা যৌগিক পদার্থের সহিত যৌগিক পদার্থের অথবা মূলপদার্থের সহিত যৌগিক পদার্থের যে মিলন, যাহার শাস্ত্রসম্মত নাম হইতেছে, রাসায়নিক সংযোগ, এবং যাহার ফলে নানাপ্রকারের যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সমস্ত ব্যাপারই অণুর সহিত অণুর কারবার লইয়া, মূল অণুর সহিত মূল অণুর অথবা যৌগিক অণুর সহিত যৌগিক অণুর অথবা মূল অণুর সহিত যৌগিক অণুর কারবার লইয়া। পদার্থ মাত্রই অণুময়, ইহাই হইতেছে গোড়ার কথা—কারবারের কথা বা ব্যবসায়ের কথা। পদার্থ মাত্রই পরমাণুময়, ইহাও ঠিক কথা; ঠিক কথা এইজন্য যে, অণুমাত্রই পরমাণুময়, কিন্তু কারবারের হিসাবে ইহা তত জোরের কথা নহে। যেরূপ কতকগুলি মানুষ লইয়া এক একটা সমাজ গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ কতকগুলি অণু লইয়া এক একটা জড়দ্রব্য গঠিত হইয়াছে। এক একটা গোটা মানুষ যেন সমাজের এক একটা অণু, আর রক্ত, মাংস, হাড় এইগুলি হইতেছে যেন, মানুষ-রূপ অণুর পরমাণু। যে সমাজকে আমরা মনুষ্য-সমাজ বলি, ইচ্ছা হইলে উহাকে হাড়-মাংসের সমাজও বলা চলে, কিন্তু ঐরূপ ইচ্ছা হওয়াটা

সমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে না। যে অর্থে সমাজকে মানুষের সমষ্টিরূপে গ্রহণ করাই ঠিক, হাড়-মাংসের সমষ্টিরূপে গ্রহণ করা ঠিক হয় না, সেই অর্থে জড়-দ্রব্যকে অণুর সমষ্টিরূপে দেখাই সঙ্গত হয়, পরমাণুর সমষ্টিরূপে দেখাটা উচিত হয় না। আবার মনুষ্য সমাজকে হাড়-মাংসের সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করাও চলে, যখন মানুষের সহিত মানুষের কারবারটা একটা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে—যখন কারবারটা কাটাকাটি ব্যাপারে দাঁড়ায়। তখন সমাজরূপ জড়ের ইতিহাস আর পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত থাকে না, তখন উহা রসায়ন বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল কারবারের মূল কথা হইতেছে, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহার লইয়া, মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ-মমতা বা হিংসা-দ্বেষের কাহিনী লইয়া। কাটাকাটি ব্যাপারেও গোড়াতে প্রাধান্য গোটা গোটা মানুষের ; ফলে, আমাদের পক্ষে, সমাজকে মনুষ্যের সমষ্টিরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত হইয়াছে এবং এই অর্থে জড়দ্রব্য মাত্রকেই অণুর সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে।

৭৫। জিজ্ঞাস্য হয়, অ্যাভোগাড্রোর এই সিদ্ধান্তের মূলে কোন যুক্তি আছে কি ? ইহা সমর্থন পক্ষে পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষণ আছে কি ? ইহার উত্তর এই যে, বিনা প্রমাণে কোন সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সমাজে কখনও আদর লাভ করিতে পারে নাই ! অণু সম্বন্ধে অ্যাভোগাড্রো যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ রহিয়াছে। ফলে, অ্যাভোগাড্রোর সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

৭৬। পরীক্ষা করিয়াছিলেন—গে লুসাক। গে লুসাক গ্যাস লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম পরীক্ষাটা হইতেছে ভৌতিক পরীক্ষা—উষ্ণতার ফলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি লইয়া। এই ফরাসী পণ্ডিত দেখিলেন, তাপপ্রয়োগে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি ঘটে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার চাপও বাড়িয়া যায়। ইহা আরও অনেকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু গে লুসাকের পরীক্ষা হইতে দেখা গেল, যদি গ্যাসের চাপটা বাড়িতে না দেওয়া যায়, তবে উহার আয়তনটা বাড়ে ঠিক উষ্ণতার সমান হারে। পরীক্ষার ফলে, গে লুসাক এই নিয়মটা আবিষ্কার করেন। কেবল গ্যাসের সম্বন্ধে এই নিয়ম এবং সকল গ্যাসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম। যদি সমানোষ্ণ, সমান চাপের, এবং সম আয়তনের কতকগুলি গ্যাস লইয়া প্রত্যেকের উষ্ণতা একই পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উহাদের সকলেরই আয়তন একই পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কেন এই নিয়ম ? সকল গ্যাসেরই আয়তন একই হারে বাড়ে কেন ? উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আয়তন বৃদ্ধি, ভাল কথা। গরম হইলে সকলেরই আয়তন বাড়িয়া থাকে—কঠিন পদার্থের বাড়ে, তরল পদার্থের বাড়ে, গ্যাসেরও বাড়ে, এবং গ্যাসের বেলায় একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই বাড়িয়া থাকে। কিন্তু সকল গ্যাসের একই হারে বাড়ে কেন ? কঠিন পদার্থগুলি, অথবা তরল পদার্থগুলি ত সমান হারে বাড়ে না ; গ্যাসগুলিরই কেবল বৃদ্ধির হারটা সকলের পক্ষে সমান কেন ?

৭৭। পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির অর্থ কি ?—উহার কণাগুলি ফাঁক ফাঁক হইয়া যাওয়া। কঠিন, তরল, গ্যাস সকল পদার্থই কণাময়। উষ্ণতা বাড়াইলে সকলের কণাই

ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে, ফলে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু কঠিন বা তরল পদার্থের সহিত গ্যাসের প্রভেদ কোন্ খানে ? প্রভেদ আছে—গ্যাসের কণাসমূহ কঠিন বা তরল পদার্থের কণার ন্যায় অত ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। গ্যাসের কণাগুলি খুব ফাঁক ফাঁক, উহাদের মধ্যে সেরূপ আকর্ষণও নাই, এবং উহারা স্বচ্ছন্দে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিয়াও থাকে। কঠিন ও তরলের সহিত গ্যাসের এই প্রভেদ এবং গ্যাসের সহিত গ্যাসের ইহাই সাদৃশ্য। বেশ কথা, কিন্তু এই সাদৃশ্য আছে বলিয়া সকল গ্যাসের আয়তন একই নির্দ্দিষ্ট হারে বাড়িবে কেন ? কতকগুলি সমান আয়তনের গ্যাস রহিয়াছে। গ্যাস অর্থ কি ?—একদল কণা। এইরূপ কতকগুলি কণার দল। গ্যাসগুলি সমানোষ্ণ ও সমান চাপের। যদি চাপ ঠিক রাখিয়া গ্যাসগুলির উষ্ণতা বাড়ান যায়, যদি সকলেরই উষ্ণতা সমান পরিমাণে বাড়ান যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, উহাদের সকলেরই আয়তন সমান পরিমাণেই বাড়িয়া যায়। কেন এমন হয় ? উষ্ণতা বাড়াইলে কণায় কণায় ফাঁক বাড়িয়া যায়। কিন্তু এই ফাঁকগুলি সকল দলেই সমান পরিমাণে বাড়ে কি ? এক নম্বর দলে যতখানি বাড়ে, দুই নম্বর কি তিন নম্বর দলেও ততখানি করিয়া বাড়ে কি ? যদি বাড়ে, তবে কণার সংখ্যা সকল দলেই সমান বলিয়া বুঝিতে হইবে কি ? অর্থাৎ কি না, চাপ ও উষ্ণতার সাম্যাবস্থায় গ্যাসগুলির সমান সমান আয়তনের মধ্যে সমান সংখ্যার কণা রহিয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে কি ? হইতে পারে, কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না।

৭৮। তার পর গে লুসাকের রাসায়নিক পরীক্ষা। ইহাও গ্যাস লইয়া। কঠিনে-কঠিনে বা তরলে-তরলে বা কঠিনে-তরলে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। আবার গ্যাসের সহিত গ্যাসেরও রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া থাকে, এবং সংযোগের ফলে যে যৌগিক পদার্থটা উৎপন্ন হয়, উহাকেও গ্যাসের অবস্থাতেই পাওয়া যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে, যখন দুইটা গ্যাসে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, তখন উভয়ের মধ্যে একটা আয়তনগত সম্বন্ধ থাকে কি না, এবং উহাদের প্রত্যেকের আয়তনের সহিত, উহাদের সংযোগের ফলে যে যৌগিক গ্যাসটা পাওয়া যায়, তাহার আয়তনের কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় কি না ? গে লুসাকের পরীক্ষা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। দেখা গেল, গ্যাসের সহিত গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারে একটা আয়তনগত সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। নিয়মটা এই ;—দুইটা গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ কালে, একটার যতটা আয়তনের সহিত অপরটার যতটা আয়তন মিলিত হয়, এবং উভয়ের সংযোগের ফলে যে যৌগিক গ্যাসটা পাওয়া যায়, তাহার যতটা আয়তন, এই তিনটা আয়তন মাপিলে দেখা যাইবে, উহাদিগকে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। অর্থাৎ কি না, গ্যাস তিনটার আয়তনে পরস্পরের সম্বন্ধ হইবে ১ : ১ : ২ অথবা ১ : ২ : ২ অথবা ১ : ২ : ৩ এইরূপ।

৭৯। নিয়মটা সরল অনুপাতের নিয়ম এবং অখণ্ড অনুপাতের নিয়ম। তবে কথা হইতেছে, এখানে মাপিতে হইবে আয়তন। আর এই আয়তন মাপা সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা হইতেছে যে, গ্যাস তিনটা সমানোষ্ণ ও সমান চাপের কি না, ইহা দেখিয়া আয়তন মাপিতে হইবে। যদি চাপে বা উষ্ণতায় গ্যাস তিনটার

মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে উহাদের চাপ ও উষ্ণতা সমান করিয়া লইয়া আয়তন মাপিতে হইবে। এইরূপ ভাবে আয়তন মাপিলে আয়তন তিনটার মধ্যে উক্ত সম্বন্ধ দেখা যাইবে। উদাহরণ :—

৮০। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন দুইটা গ্যাস। ইহাদিগকে একত্র করিয়া যদি ঐ মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহাদের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড নামক একটা যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়। চাপ ও উষ্ণতার সাম্যাবস্থায় এই গ্যাস তিনটার আয়তন মাপিলে দেখা যাইবে ১ আয়তনের হাইড্রোজেনের সহিত ১ আয়তনের ক্লোরিণ মিশিয়া ২ আয়তনের হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে আয়তন তিনটার সম্বন্ধ হইতেছে ১ : ১ : ২।

৮১। আবার হাইড্রোজেনের গ্যাসের সহিত অক্সিজেনের গ্যাসেরও রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং সংযোগের ফলে জলীয় বাষ্প পাওয়া যায়। দেখা যাইবে, ১ আয়তনের অক্সিজেনের সহিত ২ আয়তনের হাইড্রোজেন মিশিয়া ২ আয়তনের জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে আয়তন তিনটার সম্বন্ধ হইতেছে ১ : ২ : ২।

৮২। আবার হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেন গ্যাসেরও রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া থাকে এবং ইহার ফলে অ্যামোনিয়া নামক একটা গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখা যায়, ১ আয়তনের নাইট্রোজেনের সহিত ৩ আয়তনের হাইড্রোজেন মিশিয়া ২ আয়তনের অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। এখানে আয়তন তিনটার সম্বন্ধ হইতেছে ১ : ৩ : ২।

৮৩। পরীক্ষা ও পরিমাপের ফলে গে লুসাক এই নিয়ম দুইটা আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু কেন এই নিয়ম, তাহার প্রকৃত মীমাংসা করিলেন অ্যাভোগাড্রো। অ্যাভোগাড্রো বলিলেন, পদার্থ মাত্রেই অণুময়, এই জন্যই এইরূপ ঘটে।

৮৪। কথাটা এই রকম। মনে কর, কতগুলি সমান আয়তনের কুঠরী। প্রত্যেক কুঠরী গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীতে ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস—কোনটায় রহিয়াছে হাইড্রোজেন, কোনটায় অক্সিজেন, কোনটায় ক্লোরিণ ইত্যাদি। এই গ্যাসগুলি হইতেছে মূল পদার্থ। আবার কোন কুঠরীতে রহিয়াছে ষ্টীম, কোনটায় অ্যামোনিয়া, কোনটায় হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইত্যাদি। এই গ্যাসগুলি যৌগিক পদার্থ। গ্যাস অর্থ কি? —না, একদল কণা,—বেশ ফাঁক ফাঁক, স্বচ্ছন্দে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, এইরূপ একদল কণা। এইরূপ কতগুলি কণার দল। এক একটা কুঠরীতে এক একটা দল। তফাৎ এই, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের কুঠরীতে রহিয়াছে একদল মূল কণা, আর ষ্টীম বা অ্যামোনিয়ার কুঠরীতে রহিয়াছে একদল যৌগিক কণা। কিন্তু কণাগুলি সকলেই স্বাধীন ও যথেচ্ছ বিচরণশীল। তার পর মনে কর, এই গ্যাসগুলি চাপে ও উষ্ণতায় পরস্পরের সমান। যদি সকলের উষ্ণতা সমান না হয়, যদি কোন কুঠরীতে উষ্ণতার পরিমাণ কিছু বেশী দেখা যায়, তবে ঐ কুঠরীটা ঠাণ্ডা করিয়া উষ্ণতার মাত্রা সমান করিয়া লওয়া চলে। আর যদি চাপের পরিমাণ কোন কুঠরীতে বেশী দেখা যায়, তাহা হইলে উহার গ্যাসের পরিমাণ কমাইয়া, অর্থাৎ কি না ঐ কুঠরী হইতে কতগুলি কণা বাহির করিয়া লইয়া চাপের মাত্রা

সর্ব্বত্র সমান করিয়া লওয়া, চলে। এইরূপে গ্যাসগুলি যখন চাপে ও উষ্ণতায় পরস্পরের সমান হইল, তখন কোন কুঠরীতে কতগুলি গ্যাসের কণা আছে গণিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, কণার সংখ্যা সকল কুঠরীতেই সমান। অ্যাভোগাড্রো বলিলেন, যাহাদের চাপ ও উষ্ণতা সমান, এইরূপ কতগুলি গ্যাস লইলে দেখা যাইবে, উহাদের সমান সমান আয়তনের মধ্যে সমান সংখ্যার কণা রহিয়াছে। যে গ্যাসটা মূল পদার্থ, উহার কণাগুলি হইবে মূলকণা, আর যে গ্যাসটা যৌগিক পদার্থ উহার কণাগুলি হইবে যৌগিক কণা; কিন্তু মূল কণাই হউক আর যৌগিক কণাই হউক, সমান সমান আয়তনের মধ্যে উহাদের সংখ্যা সমান হইবে। অ্যাভোগাড্রোর এই সিদ্ধান্ত একটা অনুমান মাত্র।

৮৫। অ্যাভোগাড্রো আরও বলিলেন, যখন দুইটা পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, তখন কারবারটা আরম্ভ হয় এই কণাগুলি লইয়া এবং সংযোগের ফলে যে যৌগিক পদার্থটা উৎপন্ন হয়, তাহাও এইরূপ কতগুলি কণারই সমষ্টি। এই কণাগুলির ব্যক্তিত্ব লইয়াই যা' কিছু কারবার। যদি জড়ের সহিত জড়ের কারবারে ব্যক্তিত্বের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই কণাগুলির দিকেই তাকাইতে হইবে;—ইহাদের ব্যক্তিত্ব লইয়া ভৌতিক পরিবর্ত্তন এবং ইহাদের ব্যক্তিত্ব লইয়াই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। পার্থক্য এই, ভৌতিক পরিবর্ত্তনে এই ব্যক্তিত্বটা টিকিয়া যায় এবং রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে উহারই বিলোপ ঘটে। এই জড়কণাগুলির ভাঙ্গাগড়া লইয়াই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। এই কণাগুলিকে বলা যাইবে "অণু"। যখন দুইটা মূল পদার্থে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, তখন একটার এইরূপ একদল অণুর সহিত অপরটার এইরূপ একদল অণুর একটা বিশেষ রকমের কারবার আরম্ভ হয় এবং কারবারের ফলে নূতন একদল অণু পাওয়া যায়। পুরাতন অণু ভাঙ্গিয়া যায়, নূতন অণুর আবির্ভাব ঘটে। ইহারই নাম রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। অ্যাভোগাড্রোর এই সিদ্ধান্তও একটা অনুমাত্র মাত্র।

৮৬। এখন অণু কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হইবে, অণু বলে জড়পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবিশেষকে—কঠিন বা তরল বা গ্যাস, উহা মূল পদার্থ হউক বা যৌগিক পদার্থ হউক—পদার্থ মাত্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবিশেষকে, অর্থাৎ কি না যাহাদের পরস্পরের দূরত্ব বাড়িলে পদার্থটার আয়তন বাড়ে ও দূরত্ব কমিলে আয়তন কমে, যাহারা পদার্থের কঠিন বা তরল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি থাকে, আর গ্যাসের অবস্থায় বেশ ফাঁক ফাঁক থাকিয়া স্বাধীন ভাবে ছুটিয়া বেড়ায় এবং অ্যাভোগাড্রোর মতে, সম আয়তনের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে সংখ্যায় যাহারা সমান, আর যাহাদের ব্যক্তিত্বের ভাঙ্গাগড়া লইয়াই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন, এইরূপ অংশবিশেষকে। ইহাই অণুর সংজ্ঞা।

৮৭। এখন আমরা গে লুসাকের নিয়ম দুইটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। গে লুসাকের প্রথম নিয়মটা হইতেছে, উষ্ণতার ফলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি লইয়া। মনে কর, দুইটা গ্যাস রহিয়াছে। গ্যাস দুইটা সমোষ্ণ ও সমান চাপের এবং উহাদের আয়তনও পরস্পরের সমান। এইরূপ অবস্থায়, অ্যাভোগাড্রোর মতে, গ্যাস দুইটার মধ্যে অণুর সংখ্যাও সমান হইবে। তার পরে মনে কর, চাপ ঠিক রাখিয়া উভয় গ্যাসের উষ্ণতা সমান পরিমাণে বাড়ান গেল। এই যে আয়তন বৃদ্ধি, ইহাকে

বলা যায়, ভৌতিক পরিবর্ত্তন। অণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব বাড়িয়া গেল, কিন্তু উহাদের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিল না। প্রথমে, গ্যাস দুইটার অবস্থা ছিল, সকল বিষয়েই সমান— চাপে সমান, উষ্ণতায় সমান, আয়তনে সমান এবং অণুর সংখ্যাতেও সমান। উষ্ণতা বাড়াইবার পর উহাদের অবস্থা হইল তিনটা বিষয়ে সমান—চাপে সমান, উষ্ণতায় সমান, এবং অণুর সংখ্যাতে সমান। আর উহাদের আয়তন? অ্যাভোগাড্রোর নিয়ম মানিলে বলিতে হইবে, এখন গ্যাস দুইটার আয়তনও সমান হইবে; কেন না যদি অসমান হয়, তাহা হইলে দুইটা অসমান আয়তনের মধ্যে অণুর সংখ্যা সমান হইয়া দাঁড়ায়। অতএব বলিতে হইবে, আয়তনেও গ্যাস দুইটা সমান হইবে—পূর্ব্বেও সমান ছিল, পরেও সমান হইবে; অর্থাৎ কি না উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে উহাদের আয়তন সমান সমান পরিমাণেই বাড়িবে। ফল কথা, অ্যাভোগাড্রোর নিয়ম হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, (চাপও উষ্ণতার সাম্যাবস্থায়) সম আয়তনের কতগুলি গ্যাস লইয়া যদি উহাদের উষ্ণতা সমান সমান পরিমাণে বাড়ান যায়, তাহা হইলে উহাদের আয়তনও সমান সমান পরিমাণেই বাড়িবে। ইহাই হইল গে লুসাকের প্রথম নিয়ম—উষ্ণতার ফলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিয়ম। পরীক্ষা দ্বারা গে লুসাক এই নিয়মটা আবিষ্কার করেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, অ্যাভোগাড্রোর অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে এই নিয়মটা আপনি আসিয়া পড়ে।

৮৮। তার পর গে. লুসাকের দ্বিতীয় নিয়মটা—গ্যাসের সহিত গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগকালে উহাদের আয়তনগত সম্বন্ধের নিয়ম। মনে কর, দুইটা গ্যাস রহিয়াছে— ১নং ও ২নং গ্যাস। গ্যাস দুইটা মূল পদার্থ ও উহারা সমোষ্ণ ও সমান চাপের। মনে কর এই অবস্থায় ১নং গ্যাসের একটা বিশিষ্ট আয়তনের সহিত ২নং গ্যাসের একটা বিশিষ্ট আয়তনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিল। সংযোগের ফলে একটা যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হইল—ইহাকে বল ৩নং গ্যাস। এই যৌগিক গ্যাসটার চাপ ও উষ্ণতা ঐ মূল গ্যাস দুইটার সমান করিয়া লইলে, অর্থাৎ সংযোগের পূর্ব্বে উহাদের চাপ ও উষ্ণতা যাহা ছিল, তাহার সমান করিয়া লইলে, যৌগিক গ্যাসটার একটা বিশিষ্ট আয়তন পাওয়া যাইবে। এই যে তিনটা আয়তন—সংযোগের পূর্ব্বে ১নং ও ২নং গ্যাসের আয়তন ও সংযোগের পরে ৩ নং গ্যাসের আয়তন, ইহাদের পরস্পরে কি সম্বন্ধ হইবে, তাহাই দেখিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, চাপে ও উষ্ণতায় গ্যাস তিনটা পরস্পরে সমান। অতএব অ্যাভোগাড্রোর মতে, এই অবস্থায়, উহাদের সমান সমান আয়তনের মধ্যে অণুর সংখ্যা সমান হইবে; অর্থাৎ কি না বুঝিতে হইবে, এই অবস্থায় ১নং গ্যাসের মূল অণুগুলি প্রত্যেকে গড়ে যতটা স্থান অধিকার করে, ২নং গ্যাসের মূল অণুগুলি এবং ৩নং গ্যাসের যৌগিক অণুগুলিও প্রত্যেকে গড়ে ততটা স্থানই অধিকার করে। এইরূপ গড়ে প্রত্যেক অণু যতটা স্থান অধিকার করে, তাহাকে বলা যাউক ১। এখন অ্যাভোগাড্রোর মতে, অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ রকমের একটা কারবারের ফলেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ১নং গ্যাসের সহিত ২নং গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগের ফলে ৩নং গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। বুঝিতে হইবে, ১নং গ্যাসের এক

দল মূল অণুর সহিত, ২নং গ্যাসের একদল মূল অণুর একটা বিশেষ রকমের কারবার ঘটিয়া ৩নং গ্যাসের একদল যৌগিক অণু উৎপন্ন হইয়াছে। সব দলের অণুগুলিই, প্রত্যেকে গড়ে, ১ পরিমিত স্থান অধিকার করে। কাজেই যে দলে অণুর সংখ্যা যাহা হইবে, উহার আয়তনও সেই সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এখন, গ্যাস তিনটার অণুর সংখ্যা করিলে প্রত্যেকটার মধ্যেই ৮ বা ১০ বা ১৭ বা ২৫ এইরূপ এক একটা অখণ্ড সংখ্যাই পাওয়া যাইবে। সুতরাং প্রত্যেক গ্যাসের আয়তনও ৮ বা ১০ বা ১৭ বা ২৫ ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে। ফলে দেখা যায়, গ্যাসের সহিত গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া একটা যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হইলে, চাপ ও উষ্ণতার সাম্যাবস্থায়, এই গ্যাস ৩টার আয়তনে একটা অখণ্ডানুপাতের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে।

৮৯। প্রশ্ন হইতে পারে, এই অখণ্ডানুপাতের নিয়মটাতে বিশেষত্ব কি আছে? এ সম্বন্ধটা ত সকল গ্যাসেই থাকিতে হইবে। যদি অ্যাভোগাড্রোর সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায়,—যদি পদার্থ মাত্রই অণুময় হয়, আর যদি গ্যাসের বেলায়, অণুমাত্রেরই অধিকৃত স্থানটাকে, অবস্থা বিশেষে ১ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে, সকল গ্যাসের আয়তনেই ত, উহাদের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটুক আর না ঘটুক—একটা অখণ্ড অনুপাতের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু কথা হইতেছে, সম্বন্ধটা অখণ্ড অনুপাতের হইলেই যথেষ্ট হইল না, অনুপাতের সম্বন্ধটা সরলও হওয়া চাই। গ্যাসের সহিত গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারে আয়তন ৩টার সম্পর্ক ৫, ১১, ১৩ অথবা ৭, ৭৯, ৮১ ইত্যাদি প্রকারের অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা চলিবে না, নির্দ্দেশ করিতে হইবে ১, ২, ২ অথবা ১, ২, ৩ এইরূপ ৩টা অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা। ইহাই গে লুসাকের নিয়ম।

৯০। এখন এই আয়তনের অনুপাতটা সরল হইবে কি না, ইহা দেখিতে হইলে, এক একটা অণুর মধ্যে কতটা করিয়া পরমাণু রহিয়াছে, তাহা জানিবার আবশ্যক হয়। সরল অনুপাত পাইতে হইলে এক একটা মূল অণুর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা ২টা বা ৩টা বা বড় জোর ৪।৫টার অধিক হইলে চলিবে না। কতগুলি পরমাণু লইয়া হাইড্রোজেনের অণু, কতগুলি লইয়া ক্লোরিণের অণু, অথবা কতগুলি লইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণু গঠিত হইয়াছে, ইহা ঠিক করিতে হইবে।

৯১। অ্যাভোগাড্রোর সিদ্ধান্ত হইতে আমরা এ সম্বন্ধেও কতকটা আভাষ পাইতে পারি। পূর্ব্বের উদাহরণ লওয়া যাউক। আমরা দেখিয়াছি, ১ আয়তনের হাইড্রোজেনের সহিত ১ আয়তনের ক্লোরিণের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া ২ আয়তনের হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। গ্যাস ৩টার আয়তনের অনুপাত হইতেছে ১ : ১ : ২। অ্যাভোগাড্রোর মতে ইহার অর্থ হইল, এক একটা হাইড্রোজেন অণুর সহিত এক একটা ক্লোরিক অণুর একটা বিশেষ রকমের কারবার ঘটিয়া দুইটা করিয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণু উৎপন্ন হয়। কারবার আরম্ভ হইল দুইটা মূল অণু লইয়া—১টা হাইড্রোজেন অণু ও ১টা ক্লোরিণ অণু লইয়া। কারবারের ফলে পাওয়া গেল ২টা যৌগিক অণু—২টা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণু। বুঝিতে হইবে, কারবারটা যাহাই হউক, তাহার ফলে, ঐ

মূল অণু ২টা—ঐ হাইড্রোজেনের অণু ও ঐ ক্লোরিণের অণু—ইহারা প্রত্যেকে দুইটা সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং এটার একার্দ্ধের সহিত ওটার একার্দ্ধ সংযুক্ত হইয়া এক একটা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণু গঠিত হইয়াছে। এইরূপে দুইটা যৌগিক অণু পাওয়া গিয়াছে। অ্যাভোগাড্রোর মত মানিয়া লইলে রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারটাকে এইরূপেই বুঝিতে হইবে এবং এইরূপ ভাবে ব্যাপারটাকে দেখিলে বলিতে হয়, ঐ মূল অণু দুইটা, ঐ হাইড্রোজেন অণু ও ঐ ক্লোরিণ অণু—ইহারা প্রত্যেকে ২টা সমান ভাগে বিভাজ্য। ইহারা আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য কি না, তাহার প্রমাণ নাই, অতএব হাইড্রোজেন অণু বা ক্লোরিণ অণু যে দুইটা সমান অংশে বিভক্ত হইয়াছে, উহার প্রত্যেক অংশকে পরমাণু বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ কি না, বলিতে হইবে, হাইড্রোজেনের অণু অন্ততঃ ২টা হাইড্রোজেন পরমাণু লইয়া, ক্লোরিণের অণু অন্ততঃ ২টা ক্লোরিণ পরমাণু লইয়া এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণু অন্ততঃ ১টা হাইড্রোজেন পরমাণু ও ১টা ক্লোরিণ পরমাণু লইয়া গঠিত এবং এইরূপ গঠিত বলিয়াই রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারে এই গ্যাস ৩টার আয়তনের অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ১ : ১ : ২।

৯২। এইরূপে, অ্যাভোগাড্রোর সিদ্ধান্ত হইতে, আমরা একটা মূল পদার্থের অণুতে, অথবা একটা যৌগিক পদার্থের অণুতে কতটা করিয়া পরমাণু রহিয়াছে, তাহার মোটামুটি একটা আভাষ পাই। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন মূল পদার্থের অণুর মধ্যে, মাত্র একটা পরমাণু রহিয়াছে, কতকগুলি অণুর মধ্যে রহিয়াছে মাত্র ২টা, আর কোন কোন অণুর মধ্যে রহিয়াছে ৩টা বা ৪টা বা বড় জোর ৬টা। এইরূপে আমরা গে লুসাকের রাসায়নিক সংযোগের নিয়মটাও বুঝিতে পারি—গ্যাসের সহিত গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ ব্যাপারে, উহাদের আয়তনের সম্বন্ধটা সরল অনুপাতের কেন, তাহাও বুঝিতে পারি।

৯৩। মোটের উপর কথা দাঁড়াইল এই—প্রত্যেক জড়-দ্রব্যকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও পরস্পরের মধ্যে অল্প বিস্তর দেশের ব্যবধান রহিয়াছে, এইরূপ বহু সংখ্যক কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ কি না জড়দ্রব্যকে কণাময় ও ফাঁকময় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে আমরা পদার্থের সঙ্কোচন বা প্রসারণ বুঝিতে পারি না। আরও অনুমান করিতে হইবে, এই কণাগুলি, পদার্থের কঠিন বা তরল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি থাকে, আর গ্যাসের অবস্থায়, বেশ দূরে দূরে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। অবশ্য ছুটিতে গিয়া কণাগুলি পরস্পরের খুব গা ঘেঁসে না চলে, এমন নহে; তবে, গ্যাসের বেলায়, কণায় কণায় দূরত্ব, গড়ে, কঠিন বা তরল পদার্থের তুলনায় বেশী, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। তাপ প্রয়োগে কণাগুলির পরস্পরের দূরত্ব বাড়িয়া যায়; ফলে পদার্থের প্রসারণ ঘটে। চাপ প্রয়োগে বা ঠাণ্ডা করিলে, কণাগুলি অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি হয়; ফলে পদার্থের সঙ্কোচন ঘটে। এইরূপে গ্যাস তরল হয়, তরল পদার্থ কঠিন হয়। এই কণাগুলির গতিবিধি লইয়াই ভৌতিক পরিবর্ত্তন। এইগুলি হইতেছে পদার্থ বিদ্যা শাস্ত্রের গোড়ার কথা। ইহা না মানিলে চলে না।

৯৪। তার পর অ্যাভোগাড্রোর কথা। অ্যাভোগাড্রো এই কণাগুলিরই নাম দিলেন 'অণু' এবং বলিলেন, গ্যাসের বেলায় উহারা মূল পদার্থ হউক বা যৌগিক পদার্থ হউক, যে সকল গ্যাস, চাপ ও উষ্ণতায় পরস্পরের সমান, তাহাদের সমান সমান আয়তনের মধ্যে অণুর সংখ্যা সমান হইবে। অ্যাভোগাড্রো আরও বলিলেন, এই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ রকমের একটা কারবারের ফলেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এক একটা অণু গোটাকত পরমাণু লইয়া গঠিত। আরম্ভে কারবার গোটা গোটা অণু লইয়া—পরমাণুর সমষ্টি একদল অণুর সহিত, পরমাণুর সমষ্টি অপর একদল অণুর কারবার ঘটে। শেষটা অণু ভাঙ্গিয়া যায়; অণুগুলি পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং পরমাণুতে পরমাণুতে সংযোগ ঘটিয়া একদল নূতন অণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অণু ভাঙ্গিয়া পরমাণু, আবার পরমাণুর সংযোগে নূতন অণু—এই ভাঙ্গা-গড়া লইয়াই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন।

৯৫। বিভাজ্য হইলেও, অণুগুলিকে ছুরি কাঁচির সাহায্যে ভাগ করা যায় না; ভৌতিক পরিবর্ত্তনে, ইহাদের ব্যক্তিত্ব অবিকৃত থাকে। অতএব ভৌতিক পরিবর্ত্তনের পক্ষে, অণুগুলিকেই জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—যৌগিক পদার্থের অণুগুলিকে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং মূল পদার্থের অণুগুলিকেও মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৬। অণুগুলি বিভক্ত হয়, যখন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে—যখন অণুতে অণুতে একটা বিশেষ রকমের কারবার ঘটে। এজন্য চাই তাপ বা তাড়িত প্রবাহ। তাপ ও তাড়িতের প্রভাবে অণু ভাঙ্গিয়া যায় ও উহার মূল উপাদানগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার নাম রাসায়নিক বিশ্লেষণ। এই যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন, যাহার ফলে অণু ভাঙ্গিয়া যায়, এই পরিবর্ত্তনটাও আরম্ভ হয় গোটা গোটা অণু লইয়া, অণুর ভগ্নাংশ লইয়া নহে; অতএব এই ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যাপারের পক্ষেও অণুগুলিকেই জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৭। পরমাণুও জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ, অণুও জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ, কিন্তু একটু ভিন্ন অর্থে। পরমাণু ক্ষুদ্রতম অংশ, উহা রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে বিভক্ত হয় না বলিয়া, আর অণু ক্ষুদ্রতম অংশ, উহাই ঐ ব্যাপারে বিভক্ত হয় বলিয়া এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশ বিভক্ত হয় না বলিয়া। পরমাণু যেরূপ জড় দ্রব্যের ক্ষুদ্রতার একটা বিশিষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, অণুও সেইরূপ জড়-পদার্থের ক্ষুদ্রতার আর একটা বিশিষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পদার্থ মাত্রকেই পরমাণুর সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, আবার পদার্থ মাত্রকেই অণুর সমষ্টি রূপেও গ্রহণ করিতে হইবে। ড্যাল্টনের অনুমানও মানিতে হইবে, অ্যাভোগাড্রোর অনুমানও মানিতে হইবে। উভয়ের উক্তিতে বিরোধ নাই।

৯৮। এখন, পশ্ন হইতে পারে, ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ হইতে আমরা নূতন কোন কথাটা শিখিলাম? রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে ড্যাল্টনের মতে, কারবারটা হইতেছে কতকগুলি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা লইয়া—যাহাদের এক একটা বিশিষ্ট ওজন রহিয়াছে, যাহারা স্বীয় স্বীয় ওজন বজায় রাখিয়া পরস্পরে মিলিত হয় ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যাহারা এই সংযোগ ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে ভাঙ্গিয়া

চূর্ণিয়া যায় না, এইরূপ কতগুলি কণা লইয়া। এই কণাগুলিই অ্যাটম্ বা পরমাণু। কিন্তু ইহার মধ্যে নূতন কথা কোনটা? রাসায়নিক সংযোগের অর্থ ইত হইতেছে কণায় কণায় মিলন। যখন দেখিতে পাই, দুইটা পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিবার পক্ষে, উহাদের পরিমাণ খুব বেশী হইলেও চলে, আবার খুব এতটুকু হইতেও আপত্তি নাই, তখনি ত বুঝিতে পারি, পদার্থ দুইটার খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই এই সংযোগটা ঘটিয়া থাকে। তখনত বুঝিতে পারি, জড় দ্রব্যকে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—গোটা গোটা কণা, যাহাদের এক একটা বিশিষ্ট আকৃতি ও আয়তন রহিয়াছে, যাহারা যার যার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াই পরস্পরে মিলিত হয় ও পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায়, এইরূপ কণার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ কণাগুলিকেইত ডাল্টন পরমাণু বলিয়াছেন, এবং ইহাদিগকে পরমাণু বলিলে, পরমাণুবাদ ত আপনি আসিয়া পড়ে।

৯৯। তার পর বিশেষানুপাতের নিয়ম ও অখণ্ডানুপাতের নিয়ম। এই নিয়ম দুইটা হইতে আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, একই মূল পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন পরস্পর সমান আর বিভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণুর ওজন ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে, ইহাও ত আপনি আসিয়া পড়ে। মূল পদার্থ কি?—যাহা আগাগোড়া একই উপাদানে গঠিত। এইরূপ পদার্থ পরমাণুময় হইলে ঐ পরমাণুগুলি পরস্পর সমান হইবে না ত কি অসমান হইবে? অতএব ভিন্নরূপ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে পরস্পর সমান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার বিভিন্ন মূল পদার্থের উপাদান যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন উহাদের পরমাণুগুলিও যে অসমান হইবে, ইহাও ত সহজেই বুঝা যায়। যদি লোহের পরমাণু ও স্বর্ণের পরমাণু সর্ব্বতোভাবে সমানই হইবে, তাহা হইলে ত লোহাতে সোণাতে পার্থক্যই থাকিত না।

১০০। ফলে দেখা যায়, রাসায়নিক সংযোগের অর্থ বুঝিতে হইলেই আমরা পরমাণু স্বীকার করিতে বাধ্য হই; আর মূল পদার্থের অর্থ বুঝিতে হইলেই আমাদিগকে বলিতে হয়, একই মূল পদার্থের পরমাণুগুলি পরস্পর সমান, এবং বিভিন্ন মূল পদার্থের পরমাণুগুলি অসমান। আর, ইহা স্বীকার করিলেই রাসায়নিক সংযোগের নিয়ম দুইটা—সমানুপাতের নিয়ম ও অখণ্ডানুপাতের নিয়ম—আপনি আসিয়া পড়ে। কাজেই জিজ্ঞাস্য হয়, পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণেই হউক, অথবা রাসায়নিক সংযোগের নিয়মগুলির আবিষ্কারেই হউক, অথবা পরমাণুবাদের সহিত এই নিয়মগুলির সম্বন্ধ স্থাপনেই হউক, ডাল্টন যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য কতটুকু?

১০১। তার পর প্রশ্ন হইতে পারে, ডাল্টন যাহাকে পরমাণু বলিয়াছেন, উহাকেই যে জড়ের ক্ষুদ্রতম কণা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? ডাল্টনের অ্যাটম্ খুবই ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই, কিন্তু হাজার ক্ষুদ্র হইলেও উহা যে একেবারেই অবিভাজ্য, তাহা বলা যায় কিরূপে? রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে অ্যাটম্ ভাঙ্গেনা; তা'ত ভাঙ্গিলেই না, কেন না ঐ ব্যাপারে ভাঙ্গেনা বলিয়াই ত অ্যাটম্ অ্যাটম্। কিন্তু জগতে আরও সহস্র রকমের ব্যাপারও ত রহিয়াছে। একটা ব্যাপারে যাহাকে ভাঙ্গিতে দেখা যায় না, ভিন্ন ব্যাপারে তাহা যে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? হয়ত

অ্যাটমেরও অ্যাটম্ আছে। হয়ত সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রকৃতিতে বিদ্যমান, যাহার সাহায্যে অ্যাটমকে সহস্র খণ্ডে ভাগ করা যাইতে পারে। হয়ত ডাল্টনের অ্যাটম্ কতগুলি সূক্ষ্মতর কণার সমষ্টি মাত্র—অ্যাটম্ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অথচ গোটা অ্যাটমের ন্যায়; যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কারবার চলে, হয়ত কোন নূতন রকমের কারবার চলে, এইরূপ কতগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার সমষ্টি মাত্র। অ্যাটমেরও অ্যাটম্ আছে, এইরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমানে ডাল্টনের অ্যাটমকে জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশরূপে গ্রহণ করা যায় কি প্রকারে এবং ডাল্টন কথিত পরমাণুবাদকেই বা খাঁটি পরমাণু বলিয়া স্বীকার করা যায় কি প্রকারে?

১০২। তার পর প্রশ্ন হইতে পারে, ডাল্টনের অ্যাটম্ যে অসীম ক্ষুদ্র নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি? জড় বস্তুর ক্ষুদ্রতার সীমা নির্দ্দেশ করিবে, ইহাতেই অ্যাটমের অ্যাটমত্ব. কিন্তু অ্যাটমের ক্ষুদ্রতার সীমা কোথায়? আয়তনে বা বস্তুপরিমাণে অ্যাটম কতটুকু, এ সম্বন্ধে ডাল্টন ত কিছু বলেন নাই। অ্যাটমকে জড়বিন্দুরূপে কল্পনা করিতেই বা দোষ কি? বিশেষানুপাতের নিয়ম?—তা' অনুপাত বজায় রাখিবার জন্য অ্যাটমের ক্ষুদ্রতায় সীমা আরোপ করিবার ত কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বৃত্তের পরিধির সহিত উহার ব্যাসের একটা বিশিষ্ট অনুপাত রহিয়াছে। এই অনুপাতটা বজায় রাখিবার জন্য, বৃত্তের পরিধিটা ও ব্যাসটা খুব বড় হইলেও চলে, আবার উহারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, বিন্দু পরিমিত হইলেও চলে। সেইরূপ অ্যাটমের সহিত অ্যাটমের সংযোগ ব্যাপারে পরস্পরের ওজনে একটা বিশিষ্ট অনুপাত থাকা সত্ত্বেও, উহাদের প্রত্যেকের ওজন অসীম ক্ষুদ্রও হইতে পারে। অখণ্ডানুপাতের নিয়ম? এ নিয়মটা হইতেও ত অ্যাটম যে অসীম ক্ষুদ্র নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেন না, হাজার ক্ষুদ্র হইলেও, এক জাতীয় অ্যাটমগুলির মধ্যে একটার ওজন যাহা হইবে, দুইটার ওজন তাহার দ্বিগুণই হইবে এবং তিনটার ওজন তাহার তিন গুণই হইবে। আর এইটা স্বীকার করিলে অখণ্ডানুপাতের নিয়মটাও ত অমনি স্বীকার করিতে হয়। এজন্য, অ্যাটমের ক্ষুদ্রতায়, একটা বিশিষ্ট সীমা আরোপ করিবার ত কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ফলে দেখা যায়, ডাল্টন যাহাকে অ্যাটম্ বলিয়াছেন, উহা যে অনন্ত ক্ষুদ্র নহে বা বিন্দু পরিমিত নহে, ডাল্টনের পরমাণুবাদ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার পরমাণু সম্বন্ধে যে কথা, অণু সম্বন্ধেও সেই কথা। দুইটা বা চারিটা পরমাণু লইয়া ত এক একটা অণু গঠিত হইয়াছে। পরমাণু বিন্দু পরিমিত হইলে, অণুও বিন্দু পরিমিতই হইবে। প্রশ্ন হইতেছে, অণু, পরমাণু যদি অসীম ক্ষুদ্রই হইল, তাহা হইলে পরমাণুবাদের সার্থকতা কোথায়?

১০৩। যাহারা সসীমের পক্ষপাতী, তাহারা এ কথায় আপত্তি উত্থাপন করিবেন। তাহারা বলিবেন, অ্যাটম্ অসীম ক্ষুদ্র হইতেই পারে না। যাহার ক্ষুদ্রতারই অন্ত নাই, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কারবার চলিবে কিরূপে? অ্যাটম্ অসীম ক্ষুদ্র হইলে জড়-দ্রব্য অনন্ত অখণ্ড বিভাজ্য হয়: তাহা হইলে ভাগ কার্য্যও শেষ হয় না এবং জড়কে ভাগ করিতে করিতে অ্যাটমেও পঁহুছান যায় না। যদি অ্যাটমেরই খোঁজ না মিলে, তবে অ্যাটমে অ্যাটমে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিবে কিরূপে এবং সংযোগের ফলে একটা যৌগিক পদার্থে-

রই বা উদ্ভব হইবে কিরূপে? যদি কোন ব্যক্তিকে খানিকটা গন্ধক ও খানিকটা পারদ দিয়া বলা যায় যে, উহাদের প্রত্যেককে অনন্ত-ভাগে ভাগ করিয়া যে সকল গন্ধক কণা ও পারদ কণা পাওয়া যাইবে, উহাদিগকে যোড়ায় যোড়ায় মিলাইয়া একটা যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে হইবে, তাহা হইলে আবহমান কাল চেষ্টা করিয়াও তিনি ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন কি?

১০৪। কিন্তু তর্ক এইখানেই থামে না। যাহারা অসীম ক্ষুদ্রের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিবেন, একখণ্ড গন্ধক বা খানিকটা পারদকে যেমন ক্রমে ক্রমে খণ্ডের পর খণ্ডে, ভাগ করা সম্ভব, সেইরূপ এক আঘাতেও ত উহাকে সহস্র খণ্ডে বা লক্ষ খণ্ডে ভাগ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগে, যাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষ খণ্ডে বা কোটি খণ্ডে ভাগ করা যায়, উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগে, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্ত খণ্ডেই বা বিভক্ত না হইবে কেন? ফলে বিন্দু পরিমিত গন্ধক কণার সহিত বিন্দু পরিমিত পারদ কণার সংযোগ ঘটিতে পারে না, ইহা জোর করিয়া বলা যায় কিরূপে? যদি জ্যামিতি শাস্ত্রোক্ত সরল রেখার উপর সরল রেখা রাখিয়া, একটার প্রত্যেক বিন্দুর সহিত অপরটার প্রত্যেক বিন্দু, যোড়ায় মিলান সম্ভব হয়, তবে একজাতীয় কতগুলি জড় বিন্দুর সহিত অপর জাতীয় কতগুলি জড়বিন্দুর যোড়ায় যোড়ায় মিলনের ফলে একটা যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? ড্যাল্টনের অ্যাটম্ যে এইরূপ কতগুলি জড়বিন্দু মাত্র নহে, তাহার প্রমাণ কি?

১০৫। তর্কের শেষ দেখা যায় না; অতএব এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার পাঠকের উপর সমর্পণ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কনক-পল্লী।

বৈশাখ-পত্তনে (Vizagapatam) মাস দুই তিন থাকিয়া তাহার দৃশ্যগুলি আমাদের চক্ষে যখন নূতনত্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তখন সকলে মিলিয়া আমরা অন্‌কা-পল্লী যাইবার মনস্থ করিলাম। অন্‌কা-পল্লী বৈশাখ-পত্তন (Vizag) * হইতে বেশী দূর নহে, 'ভাইজাগ' জেলারই উহা অন্তর্ব্বর্ত্তী। ওয়ালটেয়ার ষ্টেশন হইতে রেলে যাইলে ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর অনকাপল্লী যাওয়া যায়।

অন্‌কাপল্লী নামটী শুনিতে বেশ মিষ্টি, ইহার প্রকৃত নাম কনকপল্লী। কনকপল্লীর আদ্যক্ষর 'ক'টি লোপ পাইয়া লোকমুখে অন্‌কাপল্লী রূপে পরিণত। কনকপল্লী নাম হইল কেন? কনকপল্লী অর্থাৎ সোণার পল্লী। যে কারণে বাঙ্গালা দেশকে আমরা সোণার বাঙ্গালা বলি, সেই কারণে ইহারও নাম কনক-পল্লী। সমগ্র বৈশাখ-পত্তন প্রদেশে অমন উর্ব্বরাশক্তিশালিনী-পল্লী আর দুটী নাই। লোকে ইহাকে সচরাচর বৈশাখ-পত্তনের বাগান বলিয়া থাকে।

বৈশাখ-পত্তন নগরে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল-ফলারী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ কনকপল্লী অন্তরালে থাকিয়া যোগান দিয়া থাকে। সুস্বাদু আম কাঁটাল পেয়ারা আনারস প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও তরী তরকারী এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কনকপল্লীতে আকের চাষও খুব বেশী। সেই কারণে চিনি এখানে সস্তা। এখানকার কোন বিশিষ্ট জমিদার আমাদের বলিলেন, অন্‌কাপল্লীতে চার টাকায় গুড়ে চিনির মন।

যখন কলিকাতা অঞ্চলে পনের যোল টাকা করিয়া চিনির মণ, তখন এখানে চারি টাকায় চিনির মণ শুনিয়া বিশ্বাস না হবার কথা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'এত চিনি যায় কোথায়? জমিদার বন্ধু বলিলেন, 'বড় বড় কোম্পানীরা বিদেশে চালান করে।'

কনকপল্লীতে আমরা ছিলাম ডাক-বাংলায়। সমস্ত ডাক-বাংলাটী আমরা কয়েক দিনের জন্য দখল করিয়াছিলাম। এই বাংলায় লোক জনের বড় একটা আনাগোনা নাই। বাংলাটী চারিদিকে পুষ্পিত তরুলতা গুল্মে পরিবেষ্টিত; যেন কুঞ্জবনের মধ্যে অভিসারিকার ন্যায় প্রিয় আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জমিদার বন্ধুটী প্রত্যহ দুই বেলা আসিয়া আমাদের খোজ খবর লইতেন। দুধ দই প্রভৃতি খাদ্য সম্ভার পাঠাইয়া দিতেন। আমাদের পরিভ্রমণের জন্য তাঁহার নিজের দুই গরুর 'ঝট্‌কা' আসিয়া উপস্থিত হইত।

কনক-পল্লী একটী সামান্য নগরী মাত্র। বরঞ্চ ইহাকে পল্লী বলিলেই ঠিক হয়। নিজ কনক-পল্লীতে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গিরিরাজির কক্ষে কক্ষে নাকি অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে বলিয়া শুনা যায়। সেই সব প্রাচীন ধ্বংস-চিহ্ন দেখিবার লোভে আমাদিগের এখানে আসা। কিন্তু সকলগুলি দেখিতে যাওয়া বড় সহজ নহে। পর্ব্বতের মধ্যে দুর্গম পথ দিয়া সেই সকল স্থানে যাইতে হয়। আমরা নিকটবর্ত্তী যে দু একটী স্থানে গিয়াছিলাম, এখানে তাহারই কথা বলিব।

'শঙ্করম্' ও 'বজ্রপাণ কুণ্ড' এই দুইটী খণ্ড পর্ব্বত কনক-পল্লীর অতি নিকটে পাশা-পাশি অবস্থিত। এই শৈলদ্বয় বৌদ্ধ যুগের অতীত গৌরব বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও দর্শকদিগের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে কোন্ সাধকেরা নির্জ্জন আবাস রচনা করিয়াছিলেন, শৈলদ্বয় আজিও সেই পুরাণ স্মৃতি বহন করিয়া দণ্ডায়মান। সে সাধকেরা আজ কোথায়? নীরব পর্ব্বতেরা বুঝি তাঁহাদের ধ্যানে নিমগ্ন।

এই প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে হইলে সহর হইতে তিন চার ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। ক্ষুদ্র নগরীর রাস্তাটী অতি মনোরম। বটচ্ছায়ার মধ্যবর্ত্তিনী রথ্যা যেন সেকালের অসূর্য্যম্পশ্যা সুন্দরীর মত শোভা পাইতেছে। শৈল-প্রবাহিনী 'সারদা' সখীর মত পার্শ্ব-বর্ত্তিনী হইয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র রাজ-পথটী বটশ্রেণীর নিবিড় ছায়ার অন্তরালে অবস্থিত। সেই কারণে দ্বিপ্রহর রৌদ্রেও আমাদের যাইতে কষ্ট হয় নাই।

সেদিন হাটবার ছিল। ঝট্‌কাটী হাটের কাছাকাছি আসিয়া আর চলিতে চাহে না। চৌদিকে পাহাড়ী জঙ্গলী লোকদের জনতা। সকলেই গো মহিষাদির ক্রয় বিক্রয়ে পরি-ব্যস্ত। কিন্তু তাহার মাঝখানে গো-রথে

---

* ইংরাজিতে বৈশাখ পত্তনের সংক্ষিপ্ত নাম Vizag.

উপবিষ্ট বিদেশী আমাদের দেখিয়া তাহারা কত অপূর্ব্ব চক্ষে দেখিতে লাগিল। লোকেরা গাড়ীর চতুর্দ্দিকে এমনই ঘিরিয়া দাঁড়াইল যে, গরু দুইটী আর এক পাও অগ্রসর হইতে সমর্থ নয়। ভাগ্যক্রমে ডাকবাংলার পরিচারিকা হাটে জিনিষ কিনিতে আসিয়াছিল। সেই সাহসী পরিচারিকা তাহাদের দেশীয় ভাষায় এমনই গালি দিতে লাগিল যে, তাহারা একটী মেয়ের গালিতে লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। এইবারে সুযোগ পাইয়া গাড়োয়ান পূরা জোরে গাড়ী চালাইতে সুরু করিল। হাতীর পিঠে বিনা হাওদায় চাপিলে যেমন পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়, গোযান যখন সবেগে চলিতে লাগিল, আমাদিগেরও সেই দশা হইল। এক একবার যেন ব্যাটারীর 'শক' অনুভব করিতে লাগিলাম। এক রকম ভাল, এই ঝাঁকুনির দরুণ খাবার দাবার হজম হইয়া যেতে বেশী বিলম্ব হয় নাই।

ক্রমে গাড়ী রাজপথ ছাড়িয়া ধানের ক্ষেতে আসিয়া উপস্থিত। গোযানে চড়িয়া মাঠে মাঠে বেড়ান বৃষভবাহন শিবেরও অসাধ্য ত আমরা কোথায়? কিন্তু এখানে গোযান ভিন্ন উপায় নেই। মাঠের কোথাও উচ্চ আল কোথাও বা নিম্ন খাল। এক একবার যখন গরু দুটা আলের উপর উঠিতে পারে না, তখন রাখাল বালকগুলা আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া গাড়ীটাকে প্রাণপণে ঠেলিতে থাকে। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা এ রকম গরুর গাড়ীর দোল খাইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সমুদ্রের দোল খাওয়াটা সামান্য মনে হবে। অবশেষে এমন উঁচু নীচু যায়গায় আসিয়া উপস্থিত, যেখানে মানুষ লইয়া গাড়ী টানা গরুর পক্ষে অসাধ্য। এইখানে আমরা গাড়ী থেকে নামিয়া হাঁটিয়া যাবার সুযোগ পাইলাম।

মাঠে পদার্পণ করিয়া দেখি, সম্মুখে 'শঙ্করম্' ও 'বজ্রকুণ্ড' গিরিদ্বয়। দূর থেকে মনে হইতেছে যেন পাহাড়ের উপরে শত শত গবাক্ষ হইতে কাহারা উঁকি মারিতেছে। এইখানে একটী গান মনে পড়িয়া গেল :—

"এ শিব শঙ্করম্ শম্ভরম্
সচ্চিদানন্দনা
শৈলকন্যা-বরম-পরম-রম্যম্
শিব শঙ্করম্।"

গানটী গাহিতে গাহিতে শেষে 'শঙ্করম'-এর তলে আসিয়া উপস্থিত। পাহাড়ের ঠিক নীচে একটী প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সেখানকার লোকেরা বলিল যে, এই প্রস্তর মূর্ত্তিটী বড় ভয়ানক। ইনি শিশুভোজী। সেই কারণে তাহারা এই দুষ্মন্ মূর্ত্তির উপরে আমাদিগকে পাথর ছুড়িয়া মারিতে বলিল। এইরূপ প্রস্তর বৃষ্টির কারণে সেখানে এত পাথর জমা হইয়া গেছে যে, মূর্ত্তিটী প্রায় ঢাকা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

পাহাড়ের উপরে উঠিবার রাস্তা ভাল নেই। যাই হোক, সেই গড়ানে রাস্তা দিয়াই অনেকটা অগ্রসর হওয়া গেল। খানিক দূর উঠিয়া দেখি, পাহাড়টী কাটিয়া একটী বৃহৎ কক্ষ বা কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার একটী মাত্র দ্বার। সেই কক্ষের মাঝখানে একটী বৃহদাকার শিবলিঙ্গের মত প্রস্তরস্তূপ স্থাপিত। আমরা সেই গুম্ফার ভিতরে প্রবেশ করিলে নিশাচর পাখীদের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাহারা বোধ হয় বহুকাল এখানে মানুষের চলাচল দেখে নাই। এই স্তূপটীর ভিতরে বুদ্ধের ভস্মাবশেষ বা কোন স্মৃতিচিহ্ন লুক্কায়িত থাকিতে পারে। এই কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সমস্ত পাহাড়টী তিনটী স্তর বা তিনটী তলায় বিভক্ত। তিনটী স্তরে ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি তিনটী কক্ষ নির্ম্মিত হইয়া শিল্পীর আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিতেছে। এইখান থেকে উচ্চে উঠিবার পথ আরও দুর্গম। পাথর ও ঘাসের গোড় আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোন ক্রমে উঠা গেল। সেই দ্বিতীয় তলেও দেখি, পূর্ব্বের অনুরূপ আর একটী কক্ষ। দ্বারের নিকট বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত। সেই ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কত যুগ যুগান্তরের ছায়া যেন মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল। কক্ষের বাহিরে চারিপার্শ্বে গির্জার ঘণ্টার মত গড়নের কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। এখানকার লোকেরা এগুলিকে শিবলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। এমন কি, অতিশয়োক্তি সহকারে একেবারে কোটি লিঙ্গ বলিয়া বসিল। এইগুলিই দূর হইতে পাহাড়ের গায়ে গবাক্ষের মত দেখাইতেছিল। তৃতীয় তলে আসিয়া একবার পাহাড়টাকে প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। শেষে দেখি, পাহাড়ের সব উপরে যাইবার একটী বাঁকা চোরা রাস্তাও আছে। বোঝা যায় যে, যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে এখানে ইষ্টক-নির্ম্মিত আবাস গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও দেখা যায়, কোথাও বা পরিষ্কৃত চাতাল কোথাও বা প্রাচীরের কতকাংশ পড়িয়া আছে। সেই চাতালের উপর বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত-গগনের বিশুদ্ধ সমীর উপভোগ করিলাম। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম দেখাইতেছিল। নিম্নে বহু দূর পর্য্যন্ত ধানিরঙ্গের শস্যক্ষেত্র। তাহারি চারিপার্শ্বে ঢেউ খেলান সারি সারি পর্ব্বতের হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য দেখিতে কি চমৎকার! কোথাও দেখি, সাদা সাদা মেঘেরা আসিয়া যেন পর্ব্বতের কাণে কাণে কি কথা কহিয়া যাইতেছে। সূর্য্যদেব বিশ্রাম-গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে গিরিবালারন্দের কণ্ঠে নিজের হাতে যেন কনকহার পরাইয়া দিতেছেন।

যদিও সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, তবুও এমন রম্য স্থান ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা হয় না। এমন নির্জ্জন ও পবিত্র স্থান যে, মনে হয় পাষাণ বুদ্ধমূর্ত্তির মত সারাক্ষণ এইখানে পড়িয়া থাকি। এখনও বজ্রপাণিকুণ্ড দেখিতে বাকী। দুইটী পাহাড়ই অনেকটা একই ধরণের। দেখিলে মনে হয়, একই কারিগরের হাতে নির্ম্মিত। সেই জন্য বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পাহাড়ের উপর হইতে নামিবার সময় এক নিশ্বাসে নামিয়া আসিলাম। আসিবার কালে গাড়োয়ান আমাদের অন্য পথ দিয়া লইয়া আসিল। লোকেরা দূর হইতে 'মস্তকুণ্ড' পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া দেখাইতে লাগিল। 'মস্তকুণ্ড' সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিলাম, যাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই দুর্গম পর্ব্বতের মধ্যে একটী জলাশয় আছে। সেখানকার বড় বড় মাছগুলি শিবের ন্যায় ত্রিনেত্রসম্পন্ন। ডাকিলেই কাছে চলিয়া আসে। কিন্তু আহারের লোভে যদি কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিবার চেষ্টা করে ত তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। একবার এই কারণে একটী লোকের মৃত্যু হওয়ায়, সেই অবধি আর কেহ ঐ দুষ্কার্য্য করিতে সাহস করে না। আমরা এইরূপ গল্পকথা উপভোগ করিতে করিতে সন্ধ্যার পরে বাটী পৌছিলাম।

যে কয়জনে এক সঙ্গে আমরা কনক-পল্লী গিয়াছিলাম, তাহাদের অনুরোধে কনক-পল্লী

কথা বর্ণনা করিয়া আমি একটী কবিতা লিখি। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে সেইটীও এই সঙ্গে গাঁথিয়া দিলাম।—

কনক-পল্লী।

কনক পল্লী সবাই চল্লি
ছেড়ে 'ভাইজ্যাগ';
তাড়াতাড়িতে গাড়ী চড়িতে
ফেলে এনু ব্যাগ।
তাইতে কষ্ট হই আড়ষ্ট
কর্ত্তে সব কাজ;
টিফিন বাক্স জিনিষ একশ
অগোছাল সাজ।
গরুর গাড়ী চড়িয়া নাড়ী
ছিঁড়িল পেটের;
চান্টি করে' সকালে ভোরে
ভাবনা পেটের।
খান্সামা ছুটি মাথায় ঝুঁটি
খেতে দিল বেশ;
ডাকবাংলাতে তাসখেলাতে
কেটে গেল শেষ।
হাটের দিনে আনিগো কিনে
যাহা দরকারী;
চলিল তায় কপ্টাটি প্রায়
ভরা তরকারী।
ছুপুর বেলা ছাড়িয়া খেলা
একদা 'শঙ্করং'
দেখিতে গেনু, চরছে ধেনু
মাঠে রং বেরং।
অনেক কষ্টে অঙ্গেতে অষ্টে
ব্যথা হল ভারী;
গো-যানে উঠে ক জনে জুটে
হয় মারামারি।
সেদিন হাট মাথায় কাঠ
লয়ে আসে সবে,
জঙ্গলা লোক লাগচে চোখ
করে কলরবে।
বিদেশী দেখে লোকেরা ঝেঁকে
দাঁড়াইল এসে;
বাংলার দাসী তাড়ায় আসি
গালি দিয়া শেষে।
রৌদ্দুর হানে চৌদিক পানে
মাথা আসে ধরে';
পল্লী ছাড়িয়ে গড়গড়িয়ে
গাড়ী যায় জোরে।
মাঠেতে এসে হাঁফিয়ে শেষে
হাওয়া লাগে গায়;
পাহাড় ঠিক সাম্নের দিক
দূরে দেখায়।
পায়েতে হেঁটে মানুষ বেঁটে
দিনু শেষে পাড়ি;
'শঙ্করং' তলে আসিনু চলে'
ছাড়ি দিয়ে গাড়ী।
সেখানে দেখি মূরতি একি
ধ্যানে মগ্ন বুদ্ধ!
আঁধার গুহা দেখিয়া উহা
বাক্য হয় রুদ্ধ।
উপরে উঠি অনন্তে ছুটি
হই আত্মহারা;
চৌদিকে গিরি আনন্দে ঘিরি
দেখি মাতোয়ারা।
বসেছে মেলা মেঘের খেলা
পাহাড়ের গায়;
তাদের সঙ্গে খেলিতে রঙ্গে
প্রাণটি জাগায়।
আসন পেড়ে হাঁফটি ছেড়ে
বসে খেলা দেখি,
মুক্ত বাতাসে নীল আকাশে
চলে লেখালেখি।

ডুবিছে রবি সন্ধ্যার কবি
অস্তগৃহে যায়;
কনকহার কণ্ঠে যাহার
কিবা শোভে তায়।
সন্ধ্যা আসিতে ভাবমগ্ন চিত্তে
বাড়ী যেতে হবে;
এসেছি কে কে গাড়ীটি ডেকে
ফিরে চলি সবে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃথিবীর উন্নতি।

"পৃথিবীর উন্নতি", কথাটার অর্থ কি? এই পৃথিবীটা প্রধানত মৃত্তিকা ও জলময়। বায়ু ও আলোক এই মৃত্তিকা ও জলকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত ও প্রকাশিত।

বৃক্ষলতা গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ, স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি ধাতু এবং হীরা মণি মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজি সমস্তই মাটির বিকার। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মৃত্তিকাময়ী ধরণীর উন্নতি বলিতে কি বুঝিব?

আমরা এই পৃথিবীকে কাটিয়া ছাঁটিয়া খুঁড়িয়া পূরিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া যে ভাবে উন্নতি সাধন করিতেছি, বঙ্গভূষণ ডাক্তার জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কারকে শিরোধার্য্য করিলে, সেই উন্নতি সাধনে ধরিত্রীমাতা হয়ত অবিরাম বেদনা অনুভব করিতেছেন। মনোহর হর্ম্ম্য, অভ্রভেদী মনুমেণ্ট, অজেয় দুর্গ, সুবিশাল সরোবর, যাহাই নির্ম্মাণ কর, মায়ের বুক চিরিয়া খনিজ দ্রব্য, কেশ ছিঁড়িয়া লতা পুষ্পফল, যাহাই আহরণ কর, তাহাতে তাঁহার বেদনা ভিন্ন সুখ নাই এবং তিনি তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র উন্নতি বোধ করেন না, সুতরাং তোমরা যে পৃথিবীর উন্নতি বিধান করিতেছ, তাহা স্বয়ং পৃথিবীর পক্ষে যদি অতি সাংঘাতিক ব্যাপার নাও হয়, তবু উন্নতিকর কিছুই নয়।

এখন জড় এবং উদ্ভিদ জগৎ ছাড়িয়া প্রাণীরাজ্যে প্রবেশ কর। এই পৃথিবীতে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের পরিমাণ-ফল নাকি দ্বিগুণ, জলের গভীরতা ধরিলে গেলে উহার পরিমাণ ফল মৃত্তিকাপৃষ্ঠ অপেক্ষা বহু সহস্র গুণ অধিক হইবে, উহার সর্ব্বত্রই প্রাণিগণ বাস করে। এই সকল পরাদ্ধ পরাদ্ধ জীবের মধ্যে কতকগুলি মৎস্য, কুম্ভীর, কর্কট, কচ্ছপ এবং ঝিনুকের সঙ্গে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, এইগুলি সম্বন্ধে তোমরা যে আচরণ কর, তদ্দ্বারা ইহারা যে কিছুমাত্র উন্নতি অনুভব করে, এরূপ বলা যায় না, খেচরদিগকেও ভূচরের মধ্যেই ধরিলাম, কেন না যদিও তাহারা আকাশে উড়িতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতেই তাহাদের বিশ্রাম করিতে হয়, যতদূর অবধি বন্দুকের গুলি ঊর্দ্ধে উঠে ততদূর পর্য্যন্ত সাধ্যমত তোমরা ইহাদের উন্নতি করিতে কৃপণতা কর না। আর জলচর জন্তুদিগের উন্নতি চেষ্টাও তোমরা এইরূপেই করিয়া থাক। গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগকে তোমাদের উদরে আহুতি দেওয়ার জন্য যাহা কিছু করিয়া থাক, তাহাতে তাহারা যে উন্নতি অনুভব করে না, এ কথা একান্তই সত্য। সুতরাং হে মনুষ্য, তোমার পৃথিবীর উন্নতি চেষ্টায় স্বয়ং ধরিত্রীদেবী হইতে বৃক্ষ, ভূত খেচর জলচর দেহই

উন্নতিলাভ করে না, কেহই সুখী নহে। সুতরাং এখন এই দাঁড়াইল যে, পৃথিবীর উন্নতি শব্দের অর্থ শুধু মানুষের উন্নতি।

কিন্তু আজকালকার সভ্যতার নিকট উন্নতির এই সূত্রও পরিশুদ্ধ নহে, কেন না সভ্য জাতিরা অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণ ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং প্রাণবধ করিয়া পৃথিবীর উন্নতি বিধান করিতেছেন। তথাপি ধরিয়া লইলাম যে, মানুষের উন্নতি সাধনই পৃথিবীর উন্নতি সাধন, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে পৃথিবীটা বহুকাল অবস্থিত ছিল, সেটা বিধাতাপুরুষের হিসাবের ভুলে। এখন দেখা যাউক, মানুষের উন্নতির অর্থ কি? মানুষের একটা দেহ আছে, সেটা অতীব প্রত্যক্ষ বস্তু, আর কতকগুলি লোক বলেন যে, এই দেহ ছাড়া "আত্মা" নামে একটা বস্তু আছে, দেহটা নষ্ট হইয়া গেলেও সেটী বর্ত্তমান থাকে, সে কখনও মরে না।

এই আত্মাটা বিজ্ঞানের চক্ষে প্রমাণিত হয় না, এবং জ্ঞান পক্ষেও "অতর্ক-প্রতিষ্ঠ"। সুতরাং বহু বুদ্ধিমান্ ও সু-বিজ্ঞ লোকের মতে এরূপ একটা অদৃশ্য, অস্পৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা একটা সাংঘাতিক কুসংস্কার, ইহার উপরে পরকাল ও ঈশ্বর নামে কতকগুলি বিভীষিকার কল্পনা করিয়া মানুষ তাহার প্রত্যক্ষ জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। জগতের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া চক্ষু বুজিয়া অস্তিত্বহীন বস্তুর ধ্যান করা, তাহারই নামে নাচা-কোঁদা, চক্ষের জল ফেলা, তাহারই গুণগান করা, ইহা অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক পাগলামী আর কি আছে? এই প্রকৃতির লোকেরা আপনাদিগকে সর্ব্ব প্রকারের কু-সংস্কার বর্জ্জিত বলিয়া মনে করেন। অথচ ইহাদের মধ্যে অনেকে পৃথিবীর উন্নতি করিতে ইচ্ছুক। পরকাল চিন্তা, ঈশ্বর চিন্তা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি অকাজ করা অপেক্ষা, চাউল ডাইল মিশাইয়া আবার বাছিয়া লওয়াও ভাল, কেন না ঐ সকল তথাকথিত আধ্যাত্মিক চিন্তায় সংসার কার্য্যে অবহেলা জন্মায়।

ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, যখন আত্মাই নাই, তখন উন্নতি করিবে কিসের? বহু সৎকার্য্য করিয়াও তুমি শ্মশানে নিঃশেষ হইবে এবং যাহার জন্য তুমি খাটিয়াছ, রোগে যাহার শুশ্রূষা, বিপদে সাহায্য করিয়াছ, সঙ্কটে যাহাকে সুমন্ত্রণা দিয়াছ এবং অন্নজল, জ্ঞান ও প্রেম বিতরণ করিয়াছ, সে ব্যক্তিও ত ঐ চিতায়ই নিঃশেষ হইয়া গেল, সুতরাং তোমার কর্ম্মের কি রহিল? দুদিন পরে সবইত বৃথায় গেল। সমস্ত কর্ম্মফলকে মৃত্যুমুখে প্রেরিত করাই কি কর্ম্মযোগের সার্থকতা?

নাস্তিকেরা কিসের জন্য কর্ম্ম করে? যদি স্বজাতির (মানুষের) দুঃখ নিবৃত্তিই তাহাদের স্বধর্ম্ম হয়, তবে তাহারা নরহত্যা ও আত্মহত্যা করিয়া জীবের দুঃখ নিবৃত্তি করে না কেন? পশ্চাতে যদি কিছুই নাই, তবে এই পৃথিবীর বিবিধ দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজন কি? রোগ শোক, দৈন্য দারিদ্র্য, নিন্দা গ্লানির বিষম কশাঘাত সহ্য করার আবশ্যক কি? সংসারে দুঃখ অপেক্ষা দুঃখের প্রভাব অল্প নহে, কেন সে দুঃখ সহ্য করিব? যদি বল সংসারে সুখও আছে, সে সুখ কেন পরিত্যাগ করিব? দুটো কিল খাইয়া যদি ২টা সন্দেশ খাইতে পাই, তাহাতে ক্ষতি কি? এ কথার উত্তর এই যে, দুঃখ কখনই বাঞ্ছনীয় নহে, পরিণামের কল্যাণ ভাবিয়াই লোকেরা দুঃখ সহ্য করে, যাহার পরিণাম নাই, পরকাল নাই, বুকের কাছে বন্দুক ধরিয়া একটী

টিপ দিলেই তাহার সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া গেল। কিন্তু মানুষ যে ইহা করে না, তাহার কারণ এই যে, প্রকৃত নাস্তিক এই জগতে সুদুর্ল্লভ। মুখে যাহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া বড়াই করে, তাহারা আত্মদৃষ্টিহীন। যদি মানুষের পরিণাম কিছু না থাকে, তবে জগতের উন্নতির কিছুই অর্থ থাকে না। যদি স্বাস্থ্যরক্ষা ও ঔষধ পথ্যের সুব্যবস্থায় মনুষ্যের জীবনকাল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, সমস্ত লোক যদি অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়, গৃহ যদি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ থাকে, বিজ্ঞানের উন্নতি শতগুণ অধিক হয়, কিন্তু যদি মানুষের পরিণাম কিছু না থাকে, তবে এই সকল তথাকথিত উন্নতি কিছুই নহে, কেন না এ সকলেরই ফল চিতার আগুনে নিঃশেষ হইবে। আর একদিন যদি এই পৃথিবী কোন এক গ্রহের সংস্পর্শে চূর্ণ হইয়া যায়, তবে মানবীয় উন্নতি সকলই ধ্বংস হইল। বস্তুতঃ নিত্য সত্যকে অবলম্বন না করিলে কোন কর্ম্মই সুকর্ম্ম নহে, নিত্য-সত্য মানবাত্মার উন্নতিই জগতের প্রকৃত উন্নতি।

পরকালের অস্তিত্বে, আত্মার নিত্যত্বে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার পক্ষে পৃথিবীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, মৃতের নয়নে অঞ্জন পরাবার মতন নিরর্থক। আজকাল যাহারা আত্মার উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিয়া দেশের কিম্বা সমাজের উন্নতির চেষ্টা করে, তাহারাও মৃতের নয়নে অঞ্জন পরায়।

এই পৃথিবীতে দেহধারী মানুষের জন্য যে সকল কর্ম্ম আছে, পরকালে তাহার অধিকাংশই থাকিবে না। সে দেশে শরীর নাই সুতরাং রোগ নাই, শোক নাই, দারিদ্র্য নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। কাপড় চোপড়, বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, চালচুলো কিছুরই সেখানে দরকার নাই, সুতরাং সেবা করিবে কাকে? দান করিবে কাকে? কিই বা দান করিবে? পরকালে কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ, সে বিষয় আমাদের কিছুই ধারণা নাই। সেখানে কি ভাবে কোন্ প্রণালীতে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তাহাই বা কে বলিবে?

হিন্দু ও বৌদ্ধ বিশ্বাস করে, যতদিন বাসনা আছে, ততদিন পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া বাসনানুরূপ কার্য্য করিতে হইবে, বৈধভোগ কিম্বা তপস্যা দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে আর দেহ ধারণ করিতে হইবে না, তখন মানুষ আত্মারাম হইবে, আত্মানন্দ সম্ভোগ করিবে, ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকিবে। ইহাই মানুষের চরম অবস্থা, ইহাই লোভনীয় এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

খ্রীষ্টান ও মুসলমান বিশ্বাস করে, পরজন্ম নাই, সুতরাং পূর্ব্বজন্ম ছিল না, ইহাই মানুষের প্রথম জন্ম এবং ইহাই শেষ। এই জন্মের কর্ম্মফলে মানুষ নরকে কি স্বর্গে যাইবে। যেখানেই যাউক, চিরকালের জন্য, অনন্তকালের জন্য যাইবে, এ পৃথিবীতে কিম্বা অন্য কোনও লোক লোকান্তরে তাহার আর আসিতে হইবে না, স্বর্গ হইতে নরকে কিম্বা নরক হইতে স্বর্গে যাতায়াতের সম্ভাবনা নাই। স্বর্গে ইহলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু আছে, অনন্তকাল তাহা ভোগ করিবে। নরকের দুঃখ দুর্গতির ভীষণতা আমাদের কল্পনার অতীত, পাপীকে সেই দুঃখ অনন্তকাল ভোগ করিতে হইবে। বাইবেল এবং কোরাণের বিধিগুলি মানিয়া চলিতে পারিলেই স্বর্গলাভ এবং না পারিলে নরকভোগ সুনিশ্চিত।

নানা ধর্ম্মের নানারূপ মতামতের মধ্যে এই একটী ভাব ঠিক আছে যে, এই পৃথ-

বীটী কর্ম্মক্ষেত্র এবং মানবদেহই কর্ম্মের উপাদান। মানবগণ দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম করে এবং দেহধারীর জন্যই কর্ম্ম করে, কর্ম্মের অন্য কোনও উপায় নাই।

যে ব্যক্তি কূপ কিম্বা সরোবর খননের জন্য মাটি কাটিতেছে. জল বাহির করাই তাহার কর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই জল জীবের পানের জন্য, সেই পান প্রাণরক্ষার জন্য, সেই প্রাণধারণ আত্মার উন্নতির জন্য এবং আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, নিত্য এবং অমর। যদি আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার না কর,তবে কোদালী ধরা হইতে প্রাণ রক্ষা অবধি সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া গেল। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ, এই তিনটী না থাকিলে কর্ম্মফল কিছুই থাকে না। তুমি কর্ত্তা হইয়া রোগীর সেবা করিয়াছ, তুমি যদি অনিত্য হও, তবে তোমার রোগীও অনিত্য এবং কাজেই সেবা-কার্য্যও অনিত্য, সুতরাং তোমার জীবন ধারণ হইতে দেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিলে,তাহার কিছুই রহিল না, উহার কোন সম্পর্কও রহিল না।

যখন তুমি জলের জন্য কূপ খনন করিতে যাইয়া মাটি কাটিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখনই তোমার প্রাণের মধ্যে ঐ কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য তোমাকে উৎসাহী করিতেছে। পিপাসা নিবৃত্তির মধ্য দিয়া একটা মানবাত্মাকে তৃপ্ত করাই তোমার উদ্দেশ্য। তোমার কর্ম্ম দ্বারা অন্যে তৃপ্তি লাভ করিলে তাহাতে তোমারও তৃপ্তি লাভ হয়। এইরূপে দানের দ্বারা দাতা ও গৃহীতা উভয়ই উপকৃত হয়, উপকারী ও উপকৃত উভয়ই কল্যাণ লাভ করে। দাতা অথবা উপকারী যে কল্যাণ লাভ করে, সে কল্যাণের প্রকৃতি কি? শুভ কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাতে ঈশ্বরপ্রীতি জন্মে, উহাই সকল প্রকারের শুভ কর্ম্মের চরম ফল। এই চরম ফলে যাহার বিশ্বাস নাই, এই ফল যাহার প্রার্থনীয় নহে, সে ব্যক্তি প্রকৃতির বশীভূত হইয়া অথবা গতানুগত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সে ভাবের কর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি হয় না। মানবাত্মার উন্নতিই সমস্ত কর্ম্মের স্পৃহনীয় বস্তু এবং ভগবানে প্রীতিই মানবাত্মার চরম উন্নতি। এই বস্তুটুকু লাভের জন্যই মানুষ এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছে, এইটুকুই কর্ম্মকুসুমের নির্যাস এবং এইটুকু লইয়াই পৃথিবীর উন্নতি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। (৬)

(১)

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—

অঘোরনাথের সহিত আমার আলাপ পঠদ্দশার প্রারম্ভে। ১৮৬৭ খ্রীঃ তিনি ঢাকা হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি, রজনীনাথ, শশীভূষণ, শ্রীনাথ ও আমি সব এক সঙ্গে পড়িতাম। আমরা সকলে একই মেসে থাকিতাম—একসঙ্গে পড়িতাম, খাইতাম, শুইতাম। কেহ অপরকে কখন পর ভাবে নাই। একই দিনে আবার আমরা কেশবচন্দ্র দ্বারা দীক্ষিত হই। আমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে—তখন শ্রীনাথ ও অঘোরনাথ গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ লইয়া বিলাতে পড়িতে যান। অঘোরনাথ প্রথমে সিভিল সার্ব্বিশ

দেন—কিন্তু ভাল preparation না হওয়ায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাহার পর Cooper's hill পরীক্ষা দেন—অঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নম্বর পাইয়াও কিন্তু পাশ হন নাই। তাহার পর, সে বৎসর আমি এম্-এ দি—তিনিও সেই বৎসর B. Sc. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। সেই সঙ্গে Hope prize পাইয়া জার্ম্মেণীতে পড়িতে যান। জার্ম্মেণীতে আঠার মাস থাকিয়া এডিনবারায় ফিরিয়া আসেন; সেখানকার ইউনীভারসিটি হইতে D. Sc. উপাধি গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া নিজাম সরকারে কাজ পান—তাঁহার কর্ম্মজীবন বলিতে গেলে ঐখানেই আরম্ভ, ঐখানেই শেষ। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় দেশীয় রাজ্য পরিচালনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। বরোদা রাজসরকারে তিনি আদৃত হন—কিন্তু নানা কারণে সে চাকরী গ্রহণ করেন নাই।

ডাক্তার অতি সরলচিত্ত ছিলেন। মেসে রাত্রে সকলে একসঙ্গে একটী প্রদীপে পড়িতাম—বন্দোবস্ত ছিল, কেহ ঘুমাইলেই অপরে চড় মারিবে। ডাক্তার প্রায়ই ঢুলিতেন—জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ওহে—আমি এই জায়গাটী ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না—তাই think করিতেছি।" বৃদ্ধ বয়সে হায়দ্রাবাদ হইতে কটকে আসিলে প্রথমেই আমার ছোট ছেলেদের সঙ্গে মার্ব্বেল খেলিতে বসিতেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনে দক্ষ অঘোরনাথ মার্ব্বেলেও দক্ষ ছিলেন।

Botany তাঁহার favourite subject ছিল। আমার বাড়ীতে কটকের একজন হেডমাষ্টারের ছেলে প্রায়ই আসিত—অঘোরনাথ আসিলে সে আর আমাদের বাড়ী আসিত না; কারণ অঘোরনাথ একবার তাহাকে পূরা দুঘণ্টা Botany বিষয়ে lecture দিয়াছিলেন। এইরূপ মাঠে ঘাটে, রেলে ট্রামে, তিনি যে কত লোককে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। একবার কটকে তিনি Evolution বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন—বাবু যোগেশচন্দ্র রায় সে সভায় president ছিলেন।

অঘোরনাথ যদি সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন, তবে আমরা বিশেষ লাভবান হইতাম, সন্দেহ নাই। শেষ বয়সে কলিকাতায় বাস সময়ে তিনি একটু একটু বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা সুরু করিয়াছিলেন। পরিষদে যাইতেন।

Alchemyর চর্চ্চা করিতে গিয়া তিনি স্বাস্থ্য হারান। এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা অদম্য ছিল।

ডাক্তারের সাধু সন্ন্যাসীর উপর অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। অনেকবার ভণ্ড সাধু দ্বারা তিনি প্রতারিত হইয়াছেন—কিন্তু কখন ক্ষুণ্ণ হন নাই।

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষুধিত পাষাণ" এর বক্তা—ইনি। ডাক্তারই রবীন্দ্র বাবুকে ঐরূপ ভাবে ঐ উদ্ভট গল্পটী বলেন। যাঁহারা ডাক্তারকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহারা এ খবরে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। রবীন্দ্রনাথের "শ্রীঅম্বুকনাথ চট্টোপাধ্যায়" আমাদের ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাজনারায়ণ বসু—

পুণ্যভূমি দেবগৃহের ঋষি রাজনারায়ণকে যেদিন আমি দেখি—সেদিন আমার মধুপুর যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেণ ফেল করা সার্থক হইয়াছিল। বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু আমায় পরিচিত করিয়া দেন; তখন কাগজে আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে খুব প্রবন্ধ লিখিতাম।

দেখিলাম, তিনি সেই সব প্রবন্ধ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছেন। যেখানে মতের মিল ছিল না—তাহা অতি বিনীত ভাবে বলিলেন। পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করার পর—চলিয়া আসিবার সময় যোগীন্দ্র বাবু বলিলেন, আমি বৈষ্ণব নহি—ব্রাহ্ম। আনন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি আমায় তখন আলিঙ্গন করেন।

তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল—সকল ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব তিনি study করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু শিশুর মত সরল ছিলেন। তাঁহার সারল্য তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। শিশুদিগের সহিত তিনি শিশুর মতন হইয়া মিশিতেন—গল্প করিতেন, খেলা করিতেন, যেন এক বয়সী বন্ধু। তাঁহার শুভ্র দাড়ি দেখিয়া শিশুরা ভয় পাইত না—উপরন্তু তাহা লইয়া খেলিত। একবার হয়ত গিয়া দেখি, পুস্তক পাঠে মগ্ন—অপর সময় হয়ত দেখিব, দৌহিত্রাদির সহিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত।

তারাকুমার কবিরত্ন—

সরলপ্রাণ পণ্ডিত তারাকুমারকে আমি রাজনারায়ণ বাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দি। উভয়েই সরল হৃদয়, উদারমনা, চিন্তাশীল, ভাবুক—ভাবিয়াছিলাম, হয়ত কোন গভীর তত্ত্বের discussion শুনিব। আলাপ হওয়া মাত্রই দুজনে মুড়িমুড়কীর গল্প সুরু করিলেন। ফলারের গল্প উভয়ে মস্‌গুল। দইর সঙ্গে চিড়া ভাল লাগে, না খই ভাল লাগে, এই দুই জনের মহা তর্ক বাধিয়া গেল। ফিরিবার সময় তারাকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি হইল—আলাপ হওয়ার পর ও কি গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন?" তারাদা মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'আর ভাই—বুড়া হইয়াছি, এখন শুধু মজা করিতে ও মজা লুটিতে ইচ্ছা হয়।'

কলিকাতা জাতীয় মহা মেলায় পঠিত বালক তারাকুমারের উদ্বোধন শুনিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তখনই বলা হইয়াছিল, He will be a great man, for there is terrible sincerity in him. সেই কিশোর বালক আজ বৃদ্ধ পণ্ডিত তারাকুমার। ভাবের উচ্ছ্বাসে তারাকুমারের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেখা হইলে, তড়িৎ ছুটে, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে। তাঁহার ভক্তি, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ সম্প্রদায়ের রেখা অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার পাঠাগারে পাশাপাশি কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল দেখিয়াছি; এক দিকে ইতালীয় উলঙ্গ রমণীর চারুচিত্র—অপর দিকে ওঙ্কার ঘট, তারা ব্রহ্মময়ী স্তোত্র চিত্রকুসুমে সুরঞ্জিত। তাঁহাকে মস্‌জিদের সামনে নত হইতে দেখিয়াছি, তারা মা বলিয়া চীৎকার করিতে শুনিয়াছি, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনে এক সঙ্গে হাসিয়াছি, নাচিয়াছি, কাঁদিয়াছি। অদ্বৈতের তেজ জোহনকে স্মরণ করাইয়া দেয়—তাহাতে একটু প্রচণ্ডতা আছে—তারাকুমারকে দেখিলে যবন হরিদাস ও আপস্তল পলকে মনে পড়ে।

পুরীর মেজিষ্ট্রেট আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব—

চল্লিশ বৎসর আগে আমি যখন পুরীর হেডমাষ্টার হইয়া সেখানে যাই—তখন সেখানকার মেজিষ্ট্রেট ছিলেন আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব। ব্রড্‌লে সাহেবের মতন ইনিও উদার-হৃদয় ছিলেন। এই চল্লিশ বৎসরে পুরীর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন সমুদ্র-তট হইতে এত বালি উড়িত যে, স্কুলবাড়ীর দরজা বালিতে আটকাইয়া যাইত। আমি আট জন কুলি রাখিয়াছিলাম। রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় তাহারা বালি সরাইয়া দিলে তবে ছেলেরা ও আমরা স্কুলে ঢুকিতাম ও স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতাম। সেই আট জন কুলী আবার আসিয়া আমার বাড়ীর সামনে হইতে বালি সরাইয়া দিত—তবে আমি বাড়ীতে ঢুকিতাম। এখন পুরীর সমুদ্রতটে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী হইয়াছে, তখন মাত্র দুইখানি বাঙলো ছিল। একখানি Circuit House—অপর খানিতে Civil Surgeon থাকিতেন। তখন সিভিল সার্জ্জন ছিলেন B. B. Gupta I. M. S. আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব অনেক বলিয়া কহিয়া একজন উড়িয়া কণ্ট্রাক্টরকে দিয়া নিজের জন্য একখানা বাঙলো তৈয়ারী করান। ঐ বাড়ীর নাম ছিল "লালকুঠি"। এখন সেই বাড়ী Civil Surgeon এর বাড়ীরূপে ব্যবহৃত হয়।

আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব উড়িয়াদিগের নিকট "রাম্বা (পাগল) সাহেব" নামে পরিচিত ছিলেন। সত্য সত্যই তিনি একটু পাগল ছিলেন। কিন্তু সে পাগলামী বদমাইসির মুখোস ছিল না। রাত্রে ঘুমাইতেছি—হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—দেখি দরজায় কে knock করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? গম্ভীরস্বরে উত্তর আসিল—Joseph Armstrong Esqr. I. C. S. Magistrate and Collector, Puri. উঠিয়া দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব, ব্যাপার কি?" তিনি বলিলেন, "বড় সুন্দর রাত—let us enjoy the waves". সঙ্গে চলিলাম—হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্র তীরে বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। কোন দিন বা রাত্রে তাঁহার সঙ্গে সমস্ত পুরী ঘুরিয়া আসিয়াছি। কোন দিন হয়ত রাত একটার সময় বাড়ীতে আসিয়া বলিতেন, "চল, দাবা খেলিতে হইবে।" সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বাড়ী যাইতাম। খেলিতে বসিবার আগে বলিতেন, "আমরা জাগিয়া থাকিব—বুড়ী ঘুমাইবে, তাহা হইবে না; উহাকে তুলিয়া আনি।" নিদ্রিতা মেমকে তুলিয়া চেয়ারে বসাইতেন। যখনই মেম ঢুলিয়া পড়িতেন, তখনই সাহেব অযথা "চেকমৎ" বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন।

আরমষ্ট্রঙ্গ সাহেবের আড়ম্বর কিছুমাত্র ছিল না। Dinner এ ডাকিয়াছেন—গিয়া দেখি দাল, ভাত, শাক। সাহেবের টিফিন ছিল দু পেয়ালা চা—একটু পেঁপে, না হয় দু টুকরা শশা, না হয় দুটা ভুট্টা সিদ্ধ। তিনি আজকালকার মেজিষ্ট্রেট সাহেবদের মতন ছিলেন না। তিনি অশিক্ষিত (তখন সবে ইংরাজী শিক্ষা এ দেশে আসিয়াছে) উড়িয়াদিগকে ঘৃণা করিতেন না, native fools বলিতেন না, আপনার লোকের মতন ভাবিতেন। পুরীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে যখন আমি propose করি, তখন অনেকেই oppose করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে support করেন ও তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সংস্কৃত বিদ্যালয় পুরীতে স্থাপিত হয়।

পুরীর সমুদ্রতটে এখন ধনী, মধ্যবিত্ত সকলেরই বাড়ী দেখা যায়। এ সকলেরই মূল আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব। শিবপুর Botanical garden হইতে তিনি dragon grass এর cuttings আনিয়া—সমস্ত দিকে বালির উপর পুঁতিয়া দেন। চল্লিশ জন মালী সকাল সন্ধ্যায় এই সব গাছে জল দিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তখন আমি তাঁহাকে

বলিয়াছিলাম, "বোধ হয় এ চেষ্টা সফল হইবে না।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "No, Khirod Babu. I would turn these flying sands into golden sands. Puri will become a Brighton." তাঁর সে উজ্জ্বল চক্ষু আজ স্পষ্টই মনে আছে। তাঁর সে prophecy সফল হইয়াছে।

তিনি উড়িয়াদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এখানে স্কুল স্থাপন করিতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হয়ত কোন গ্রামের মধ্য দিয়া tour এ যাইতেছেন, খবর পাইলেন, সেখানে একটা পাঠশালা আছে। তৎক্ষণাৎ সেই পাঠশালায় যাইতেন। গুরুমহাশয়দিগকে আধ উড়িয়া, আধ হিন্দী ভাষায় উৎসাহ দিতেন। Aid দিতে চেষ্টা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইতেন ও সর্ব্বশেষে দশ বার টাকা গুরুমহাশয়ের হাতে দিয়া আসিতেন—গরীব ছেলেদের বই কিনিয়া দিতেন। গুরুমহাশয়গণও তাঁহার কৃপা লাভে বঞ্চিত হইত না।

আরমষ্ট্রঙ্গ সাহেবের নাম পুরীর ইতিহাস হইতে কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। পুরীর Armstrong Road এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বরদাচরণ মিত্র—

কৃতী বিচারক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বরদাচরণের অকালমৃত্যু বিশেষ দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ Statutary Civiliandের উন্নতির Projection সময় তাঁহার মৃত্যু বাস্তবিকই দুঃখের কারণ। জীবিত থাকিলে হয়ত ক্রমে তিনি হাইকোর্টের জজ হইতেন।

বরদাচরণের সঙ্গে আমার আলাপ বহুদিনের। তিনি যখন কটকে ছিলেন, তখন সেই আলাপ বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হয়। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও প্রায়ই সন্ধ্যার সময় তিনি আমার বাড়ীতে আসিতেন। সেই সময় তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ হইত। এক একটী বিষয়ে তাঁহার মতের গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। তাঁহার বুদ্ধি অতি প্রখর ও চিন্তা করিবার শক্তি অতি গভীর ছিল।

বরদাচরণ অতি দ্রুত কবিতা লিখিতে পারিতেন। আমার অনুরোধে তিনি এই গানটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করিয়া দেন ও তখনই সুর দেন। আমার মেয়েরা গাহিয়া শোনায়। গানটীর লালিত্য ও ঝঙ্কার প্রশংসনীয়।

আসিনু হেথা বৃন্দাবনে,
ধরি হৃদয় মন্দিরে
যুগলরূপ বন্দ্য হরি রাধা,
আসিনু হেথা আবেগ ভরে,
লয়ে স্বর্ণ কল্পনা,
হৃদি তন্ত্রী প্রেমতন্ত্রে সাধা।
আসিনু দেখিব বোলে
ফুল্ল চূত পল্লব
মাধবীলতা জড়িত প্রতি অঙ্গে,
কাঁপিছে ভয়ে লজ্জা বশে
আবেগ চারু হিল্লোলে—
বিলাসময়ী সমীরা—সখী সঙ্গে।
দেখিব বোলে আসিনু কিবা
বকুলবালা সুন্দরী,
মুকুলি ত্যজি, বিকল কাল কণ্ঠা
ছুটায় ফুটি স্বপ্ন ভরা
যৌবনের গৌরবে
পূর্ব্বরাগ সৌরভের বন্যা।

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য সম্ভ্রান্তের সকলেরই এক এক খণ্ড কৃষিভূমি, এক এক খণ্ড গোচারণের মাঠ থাকিত। প্রতিদিন প্রভাতে গৃহকর্ত্তা গাভী সকলকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিতেন। গৃহে যজ্ঞীয় অগ্নি নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত থাকিত, নির্ব্বাণ হইতে পাইত না। দৈবাৎ নির্ব্বাপিত হইলে সকলে অতি বিষণ্ণ হইত। পুনরায় শুদ্ধ হইয়া সে অগ্নি জ্বালিতে হইত। দারপরিগ্রহ করিলে দিবসে দুইবার—প্রাতঃ সন্ধ্যায় অগ্নির পূজা হইত। প্রথমে একটী কুণ্ডে অগ্নি জ্বলিত, তাহার পর তিনটী, তাহার পর পাঁচটী কুণ্ড স্থাপনের বিধান হয়। যখন একটী কুণ্ড ছিল, তখন একজন পুরোহিতে যজ্ঞ হইত। কুণ্ডাধিক্যের সহিত পুরোহিত সংখ্যারও বৃদ্ধি হয়। অগ্ন্যাবধানের পর দেবগণ উপহার গ্রহণ করিতেন। গৃহোপাচিত এ অগ্নির নাম হব্যবাহন বা দেবাগ্নি, কব্যবাহন বা পিত্রাগ্নি, সহরক্ষা বা অসুরাগ্নি।

গৃহকর্ত্তা সুখে পুত্র, পুত্রবধূ, জামাতা, দুহিতা, কন্যা, দৌহিত্র সকলকে লইয়া দিনপাত করিতেন। কোন কোন পরিবারে শতাধিক লোক বাস করিত। যজ্ঞোৎসবে সে সংসার প্রতিদিন পুলকিত। অতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের নাম অয়ন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকে ইষ্টি বলিত,—ইষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নানা পুরোহিত সাধ্য যজ্ঞকে সংস্থা বলিত,—আর বহুদিন ব্যাপিনী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু যজ্ঞ পূর্ণ বৃহৎ যজ্ঞকে সত্র বলিত। অগ্ন্যাধান করিয়া তাহাতে শিশু উৎসর্গ করিলে অয়ন হইত। তাহার সহিত মাংসপিণ্ড যোজিত হইলে ইষ্টি হইত। দশ পূর্ণ মাস একটী ইষ্টি। অন্য সকল ইষ্টি দশপূর্ণ মাসের অনুরূপ। যে যজ্ঞে মাংসপিণ্ডের সহিত সোমরস যোজিত হইত, তাহার নাম সংস্থা-জ্যোতিষ্টোম একটী সংস্থা। সকল সংস্থা জ্যোতিষ্টোমের অনুরূপ। এক একটী সংস্থার মধ্যে অনেকগুলি ইষ্টি থাকে। এক দিনে যে সোমযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহাকে একাহ বলে—দুই দিন বা ততোধিক দিবস যে যজ্ঞের অবস্থিতি, তাহার নাম অহীন—সোম যজ্ঞ। দ্বাদশ বা ততোধিক দিবসব্যাপী অহীনকে সত্র বলা হয়।

প্রতিদিন দুই বার অর্ঘ্য দান আর্য্যদেবতার পূজা করিতেন এবং গব্য ঘৃত বৈশ্বানরকে নির্জ্জল দুগ্ধ উপহার দিতেন। প্রতি অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসিতে নৈমিত্তিক একটী ইষ্টি হইত। বিধান বিহিতরূপে শুদ্ধ হইয়া পুরোহিতের সাহায্যে ইহা দুইদিনে অগ্নিপূজা করিয়া করিতে হইত। অগ্নি গৃহদেবতা, গৃহমধ্যে যে সকল নীচ কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে, তিনিই তাহার সাক্ষী। এই দুইদিন অগ্নি সমক্ষে জ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত সকল পাপের উল্লেখ করিয়া পবিত্র হইতে হইত। সাধারণ লোকে সামান্য ভাবে ইহা (ইহারই নাম দশপূর্ণমাস) সমাপন করিত। দুগ্ধবতী সদ্যপ্রসূত গাভী গৃহে না থাকিলে কেহ পূর্ণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিত না। যিনি যত সম্ভ্রান্ত ধনবান বা ভোগবিলাসী হউন না কেন, পক্ষান্তে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা প্রাতঃকালে সস্ত্রীক পদব্রজে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিতে হইত। উভয়কে দীন বেশ ধারণ করিতে হইত এবং মস্তকে করিয়া গৃহে আনিতে হইত। গৃহে আসিয়া দর্ভ বা সমির সম্মার্জ্জনী যোগে যজ্ঞবেদী পরিষ্কার করিতেন। তদনন্তর কৃষ্ণসার চর্ম্মে উপবেশন করিয়া বেদীর উপরে রন্ধন পাত্র সাজাইতে

হইত। সেই পাত্রে কর্ত্তা ও গৃহিনী স্বহস্তে দেবগণের জন্য রাজভোগ প্রস্তুত করিতেন। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে তণ্ডুল চূর্ণ প্রভৃতি যাহা কিছু করিতে হইত—কর্ত্তা গৃহিণী পরের সাহায্য না লইয়া আপনারাই করিতেন। প্রথমে অগ্নিকে ঘৃতাহুতি দিয়া আর সকল দেবতাকে আহুতি দিতে হইত। তদনন্তর সেই পুরোভাগের এক একটী অংশ. অগ্নি. বিষ্ণু, অগ্নিসোম, এবং ইন্দ্র বৈমৃদ্ধকে উৎসর্গ করা হইত। তাহার পর শিষ্টকৃত বা বিশ্ব দেবতাকে ঘৃতাহুতি করিতে হইত।—তাহার পর অনুযাজ নামে ঘৃতাহুতি, সূক্তবাক্ বাক-শ্রাক মন্ত্র পাঠ, এবং দেব পত্নীদিগকে ঘৃতাহুতি দিতে হইত। দেবপত্নীগণের লজ্জা নিবারণার্থ অগ্নি ও পুরোহিত এবং যজমানের মধ্যে এক খণ্ড ব্যবধান দিতে হইত। এইরূপে দশ-পৌর্ণমাসীষ্টি সমাহিত হইত।

যে সকল আর্য্য সম্ভ্রান্ত ইতিপূর্ব্বে সোমযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন,দশপূর্ণমাসে তাঁহাদিগকে আরও কিছু করিতে হইত। বৎসদিগকে বাথানে আবদ্ধ করিয়া সদ্যপ্রসূত ছয়টী গাভীকে তিনি মাঠে আপনি চরাইয়া আনিয়া দুগ্ধদোহন পূর্ব্বক ঘৃতাদি প্রস্তুত করিতেন। যাহার অবস্থা যত উচ্চ হউক না কেন, পক্ষান্তে এক একবার কুরুমণ্ডলের পবিত্র বৃহাণ জীবন স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বোধ হয় দশপৌর্ণমাসীষ্টির সৃষ্টি।

দশপৌর্ণমাসীষ্টি কৃষাণ জীবনের আনন্দ উৎসব—অগ্নিষ্টোম আর্য্যাবাস হইতে আর্য্যাবর্ত্ত স্থানে চিরপ্রস্থানের স্মরণোদ্দীপক। যখন "অভিজন" পরিহার করিয়া "নিবাস" স্থাপ-নোদ্দেশ জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবের নিকট করুণস্বরে বেদনাপ্লুত হৃদয়ে বিদায় লইতে হইয়াছিল, বাল্যলীলাময়ী জীবিত স্বর্গ জন্মভূমি যখন সজল নয়নে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, যখন অজ্ঞাতভীতিময় পথে অজ্ঞাত প্রদেশ প্রস্থানহেতু সন্দেহ-চিন্তায় হৃদয় আলোড়িত হইয়াছিল—বামে চিরপরিচিত প্রিয় জন্মভূমি, দক্ষিণে ভীতিসঙ্কুল তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞাতভূমি, সেই সময় অগ্নিষ্টোম মহাসংস্কার উৎপত্তি। যে বেদীতে অগ্নিষ্টোম সাধিত হয়, তাহার নাম উত্তর বেদী। প্রাচীন বেদী প্রাচীন আর্য্যবাসের প্রতিরূপ—তাহার নাম প্রাচীন বংশ। প্রাচীন বংশের উপর সোমলতা প্রভৃতি যজ্ঞদ্রব্য সমাহৃত থাকে। উত্তর বেদীর পার্শ্বে দুইখানি রথ—প্রাচীন বেদী হইতে দ্রব্যাদি উত্তর বেদীতে লইয়া উৎসর্গ করিতে হয়—উহা আনিবার জন্য রথের প্রয়োজন। উত্তর বেদী লতামণ্ডপে সমাচ্ছা-দিত—বেদীতে বিভিন্ন কুট্টীন অঙ্কিত। তাহার নাম দেবযজন দেশ। উত্তর বেদীর বিভিন্ন কুট্টীনে বিভিন্ন যাজক আপন আপন যজ্ঞীয় অগ্নি রক্ষা করেন।

দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অধ্বর্য্যু এবং উত্তর পূর্ব্ব কোণে অগ্নিধ্রের আসন দশপৌর্ণমাসীষ্টি সময়ে যেরূপ বেদী গঠিত হয়, প্রাচীন বংশ সেই আকারে গঠিত। তাহার সম্মুখে মহা-প্রস্থানোপযোগী বৃহৎ পতাকা—পতাকার অপ্রভাব বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। উপনিবেশ অন্বেষণে, স্বদেশে বিদেশে ভ্রমণে আর্য্যসন্তান কখন অগ্নি বৈশ্বানরকে বিস্মৃত হইতেন না—সদা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। উপনিবেশ সংস্থাপিত হইলে সর্ব্বাগ্রে অগ্নি বৈশ্বানরকে তিনটী পবিত্র কুণ্ডে আহিত করা হইত—পূর্ব্বে আহবনীয়, পশ্চিমে গার্হপত্য এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নির আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। একাগ্নি যে গৃহে সাধিত হয় নাই—আর্য্যসন্তান তাহাকে বাস উপযুক্ত মনে করিতেন না। যে ব্যক্তি

গৃহমধ্যে ত্রয়াগ্নি আধান করিত, তাহার নাম দীক্ষিত। অগ্নিষ্টোম সমাধানার্থ দীক্ষিত ব্যক্তি প্রণা, হোতা, মৈত্রাবরুণ, অধ্বর্য্যু, প্রস্তোতা, উপজাতা, প্রতিহর্ত্তা, প্রতিপ্রস্থাতা, নৈষ্ঠা, অস্থাবাক্, অগ্নীধ্র, আত্রেয়, সদস্য, ব্রতপ্রদ, প্রাবস্তুত, উন্নেতা, সমিতা এবং সুব্রহ্মণ্য নামে পুরোহিতদিগকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিতেন। স্বর্গ, সুবর্গ বা উৎকৃষ্ট উপনিবেশ লাভ, কামনায় কর্ত্তা ও গৃহিণী এই সকল পুরোহিত লইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাপন করিতেন। পুরোহিত বরণ করিয়া, সহ-কারীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া, বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, যজ্ঞপাত্র সমিধপুষ্প সাজাইয়া গৃহকর্ত্তা সস্ত্রীক স্নান করিয়া ক্ষৌর হইতেন। নখ মোচন করিলেই গৃহিণীর ক্ষৌর হইত। তদনন্তর ঘৃতাভিষেক। স্নান, ক্ষৌর ও ঘৃতাভিষেক অপস্নুদীক্ষা বলে। অপস্নুদীক্ষা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দ্বিতীয় পাদ—ইহা সমাপিত হইলে বুঝা গেল, কর্ত্তা পৃথিবীর মায়া কাটাইলেন। তৃতীয়পাদ দীক্ষনীয়েষ্টি। প্রাচীন আবাস পরিত্যাগ যেন প্রাচীন দেহত্যাগ করিয়া নবজন্মগ্রহণ করা।—যজমান বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া গর্ভাবাস অভিনয় করেন। প্রাচীন আবাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন নিবাসে গমন করিতে যে সকল দ্রব্যাদি অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন—সকলই আয়োজন করিতে হয়। কর্ত্তা পুরোভাগ প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণু ও বৈশ্বানরকে উৎসর্গ করেন—কৃষ্ণ সার চর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া কৃষ্ণসার শৃঙ্গ হস্তে ধারণ করেন এবং আর একখানি নূতন বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখেন। গৃহিণী রজ্জুদ্বারা কটিবদ্ধ করিয়া স্বামীর সহিত যজ্ঞ করিতে প্রস্তুত হন। যাজক যজমানকে সত্য কথন ও বৈরাগ্য অবলম্বনে উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ পাইলে আর্য্যসন্তান নিজেকে ধন্য মনে করেন ও মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হন। দীক্ষনীয়ইষ্টি সমাপ্ত হইলে যজ্ঞমানকে পূর্ণ দীক্ষিত বলা হয়।

(প্রবন্ধটি এইখানেই শেষ হইয়াছে। তাঁহার আরো লিখিবার ইচ্ছা ছিল নিশ্চয়, কারণ কয়েক জায়গায় note করা আছে। সম্পূর্ণ হইলে প্রাচীন যুগের একখানি সুন্দর চিত্র পাওয়া যাইত। প্রকাশক)

(৩)

(নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী এবার "নব্যভারত" এর পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। প্রবন্ধটী পূর্ব্বে কোন কাগজে বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না—বোধ হয় হয় নাই। আর যদি বা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবুও ইহা আমরা প্রকাশ করিলাম—কারণ সে পাঠক সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকাশক)

কবিতার উৎস কোথায়? কৈলাসে সিন্ধু, হিমালয়ে জাহ্নবীর জন্ম। কবিতার জন্ম কোথায়? কবিতার জন্ম—শব্দ ও ভাবে।

পক্ষী সুন্দর গান গায়। সে গান কি কবিতা? তাহাতে শব্দ আছে, ভাব নাই। পাখীর মোহন স্বর ভাবের সঙ্গে মিশিলে মুগ্ধ হই। সে তা পারে না বা করে না, কাক কোকিল তাহার নিকট সমান। পাখীর ভাব নাই, তা বলিলাম না। পাখীর দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, ভয় ভালবাসা আছে।

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন? অতীতের ইতিহাস, ভবিষ্যতের ভাবনা, বর্ত্ত-মানের ধ্যান, প্রণয়ের গাঢ়তা, জীবনের সর্ব্ব-ত্যাগিতা—একে সব, সবে এক—সে সব হারাইয়া তার নামের ব্যাটারী যোগে সমস্ত

হৃদয়ের আকুঞ্চন,—কোথায় বা তড়িৎ, কোথায় বা বজ্রাঘাত? ঝড় বৃষ্টি, ঘনঘটা শীত বসন্ত, আলোচ্ছায়া—সমস্ত পৃথিবী ঐ "এখানো এখনো"র মধ্যে দিয়া প্রবেশ করিতে পারে—কোহিনূর মিলিবে।

সে যাহা হউক, যদি প্রাণে বিষাদ থাকে, বিহঙ্গের নির্জ্জন সঙ্গীত এক গ্রামে মত্ততা চড়াইয়া দেয়, চোক দিয়া জল বাহির করে। নতুবা পাখী যখন গাহিয়া ছিল—সে কিছু মগজে ছিল না।

একদিন কার্য্যগতিকে পাহাড় দিয়া জঙ্গলের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিলাম। প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে প্রাণে প্রফুল্লতা ছিল, অন্ততঃ মনে কোন ভাবনা ছিল না। সহসা পথের পার্শ্বে এক সরোবরে ঢলঢল শ্যামল জলে নীল মেঘের তলে শত কমল বাতাসের উপর বুক দিয়া টলিতেছে দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। যদি সাধু হইতাম, তবে অক্ষয় কুমারের মতন হয়ত বিধাতার অপূর্ব্ব রচনা কৌশল দেখিয়া "কি দেখিলাম," "কি দেখিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতাম। আমার প্রাণের স্বর সে গান্ধারে উঠিল না—কি যেন কেমন করিয়া এমনি টলটল ঢলঢল কাহাকে মনে পড়িল—আরো কি মনে পড়িল, আরো, আরো কি বায়স্কোপের মত সাম্‌নে আসিয়া নিবিয়া গেল—বুক হইতে একটী নিশ্বাস বাহির হইল, চোখ হইতে এক ফোঁটা জল পড়িল।

জলে কি কমলে, আকাশে কি বাতাসে, ভাব কোথায়? চাঁদের আলোয়, গাছের ছায়ায়, পাখীর গানে, লতার পাতায়—ভাব কোথা? ভাব ত ক্ষেপার মনে—তাই না কেহ চন্দনে গরল, আগুনে বরফ, জীবনে মরণ কল্পনা করে? তাহার উপাধি, বাসনা মনে। তাই না নির্ব্বাণ সম্ভব? অবিদ্যায় গর্ভে উপাধি বাসনার উৎপাদন করে। যেখানে অবিদ্যার বিনাশ হইয়াছে, সেখানে উপাধি নিঃসন্তান।

তবে কি সবাই কবি? ভাবুক বটে সকলে, কিন্তু কবি সবাই নহে। যাহার জীবন আছে, সেই ভাবুক। কিন্তু ভাবুক হইলেই কবি হয় না। কবি দেখে ও দেখায়, বুঝে ও বুঝায়, ভাবে ও ভাবায়। যাহাকে দেখাইতে চায়—সে হয়ত দেখে না নিজের দৃষ্টিহীনতার—সে দোষ কবির নহে। তাঁহার নিজের দেখিবার ও দেখাইবার ক্ষমতা আছে,—ভাষা তাঁহার বীণা, ভাবা তাঁহার মোহ-দণ্ড, ভাষাতেই তাঁহার কারিগরী। ভাবুকের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে সে কবি হয়।

ভাব ও ভাষা উভয়েই পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। কেবল সে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইহাদের পরিবর্ত্তন, তাহা নহে—সময়ের পরিবর্ত্তনেও ইহাদের রূপান্তর ঘটে। ইহারাও সজীব—জন্ম, জরা, মৃত্যুর আয়ত্ত। কবিকে এ পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—নতুবা প্রভাতে পূরবী গাহিয়া তাহাকে লজ্জা পাইতে হয়।

সে কারণে হউক—পূর্ণচন্দ্রের মাহাত্ম্যে বা দখিণা বায়ের বাড়াবাড়ি হায় হায় রবে এখন বসন্তকাল আদি রসটা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে বর্ষার একাধিপত্য না থাকিলেও বসন্তের সহিত সমান সমান অংশ ছিল। ইংরাজী আইনে দায়ভাগের পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে—তাই বর্ষাকে জোত্রচ্যুত হইতে হইয়াছে।

(১)

এ সখি আমার দুখের নাহি ডর
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর।

কুলিশ শত শত, পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

(২)

সজনি আজু শমন দিন হোয়
হাম ধনীত তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ, পিয়া গেল দূর দেশ
রিপু ভেল মত্ত মাতঙ্গ।
পাপিয়া দারুণ, পিউ পিউ সোঙরণ
ভখি ভখি দেইত ছুকোর
ঘন ঘন গরজিত, শুনি জিউ চমকিত,
কম্পিত অন্তর মোর।
বরিখয়ে পুন পুন, আজি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ, শুন রমণিবর
মিলব পঁহু গুণবন্ত।

এইরূপ পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতি পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হইত, এখন দেখা যায় না। পঞ্চদেবতার বন্দনার ন্যায় নায়ক নায়িকার রূপবর্ণন আধুনিক কাব্যে তিরোহিত হইয়াছে।

দেশ কাল পাত্রে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হইলেও সেগুলি রস-পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। অভাবে কবি রস-ভঙ্গের দোষী হন। যখন বঙ্কিমবাবু কোন লেখককে আক্রমণ করিবার সময় তাঁহার ভাষাটা সায়েবী রকমের হইয়াছে বলিয়া তাঁহার সায়েবী দেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তখন লোকে বঙ্কিমবাবুকে রুচিবিকারের জন্য লাঞ্ছনা করিয়াছিল—লেখকের কবিত্বের নিন্দা করে নাই। যখন পদরত্নাবলী-রচয়িতা রায় রামানন্দ ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের পরিবর্ত্তে জগন্নাথ বল্লভ ও কবি কর্ণামৃত বসন্তরায় ও গোবিন্দ দাসের লেখা বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, তখন লোকে তাঁহারই ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাঁহার কবিত্বের অভাব হইয়াছে, কেহ বল্পনা করে নাই।

কবির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আরো কয়েকটী কথা বিবেচ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাবুক সকলেই—তবে কি অনুভাবকতা শক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতা থাকিলেই কবি হইতে পারা যায়? কবি দুই প্রকার—স্বভাব কবি ও শিক্ষা কবি। প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কাহাকেও শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু স্বভাব কবির মনোহর ভাব উৎসের মত কখন পর্ব্বত কখন বা পল্লব ভেদ করিয়া উঠে। স্বভাব কবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ দূরদর্শিতা—ইহাকে উদ্ভাবনা বলা যাইতে পারে। যাহা আমাকে ধ্যান ধারণায় সংগ্রহ করিতে হয়, যাহা আমার অনেক শিক্ষার ফল, দর্শন বিজ্ঞান মন্থন করিয়া যাহা লাভ করিতে আমি পারি না—অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির তাহা করতলগ্রস্ত আমলকবৎ। পশ্চিম বাঙ্গালার গ্রাম্য কবিতার সংগ্রহ হয় নাই, বন্ধু বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্ব বাঙ্গালার ধূলাকর্দ্দমলিপ্ত কতকগুলি হীরার টুকরা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত-মুক্তাবলী হইতে কতকগুলি ভাটিয়াল গান উদ্ধৃত করিয়া আমার উদ্দেশ্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। ঐ সকল সঙ্গীত-রচয়িতা কৃষিজীবী বা পথভিখারী, সায়র নৌকার মাঝি, মাঠের কৃষাণ, বা বাজারের মজুর। অথচ ইহাদের ভাব ও চিন্তা পরম দার্শনিক পণ্ডিতের অনধিগম্য।

(১)

আমি যাবনা সজনি ঘরে যাবনা
ওগো তোরা সরে যা—

তোরা বলিস বলিস গুরুজনার কাছে
সে যার দাসী তার সঙ্গে গেছে
আমার একে গৌর রাসবিহারী
বলিস সে কখন পুরুষ কখন নারী
যখন আমি নয়ন মুদে থাকি
আমি অন্তরে গৌর রূপ দেখি।

"সে যার দাসী তার সঙ্গে গেছে" সরল সহজ দুটা কথায়—দুটা প্রাণভরা মন-মজানো কথায় গ্রাম্য কবি যাহা বলিলেন, তাহা প্রাণের প্রাণে মিশাইয়া গেল। এই সহজ কথা মাইকেল এইরূপে বলিয়াছেন—

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সমর অরি,
সে সমরে স্মর যারে এ তিন ভুবনে।

আর এক রকমের কবি দাশরথী রায় এই কথাটা এই রকমে বলিয়াছেন—

ননদিনি বলো নগরে
ডুবছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।
কাজ কি বাসে কাজ কি বাসে, কাজ কি বল
তার পীত বাসে
যে পর-হৃদয় বাসে সে বাসে কি বাস করে?

(২)

বাঁশী বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশরী, কালা প্রাণত মানে না,
যখন আমি বসে থাকি গুরুজনার কাছে
নাম ধরিয়ে বাজে বাঁশী, শুনি মরি লাজে—
রন্ধনশালাতে বসি যখন আমি রাঁধি,
ভিজে কাঠ চুলায় দিয়ে, ধূঁয়ার ছলে কাঁদিরে।
সেনা ঝোরের বাঁশী, লাওর যদি পাই
ধরে মূলে উঠাইয়ে সায়রে ভাসাইরে।

আর একজন বলিয়াছেন—

তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি
রন্ধনশালাতে যাই, ধূঁয়ায় যাতনা পাই
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

(৩)

জলে ঢেউ দিও না সখী
আমি ঘাটে বসে কৃষ্ণরূপ নিরখি
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না—তোমরা
হবে পাতকী॥

(৪)

এত কি কপালে আছে গো আমার
হেরিব গৌরাঙ্গনিধিরে,
আমি অভাগিনী, চির পরাধিনী,
গৌর চিন্তামণি, কেন চেনো না আমারে॥
যে দুঃখেতে আমি পরের ঘর করি
দীঘল নিশ্বাস ভয়ে ছাড়িতে না পারি,
যদি মুখ তুলে চাহ, কলঙ্কে ডুবাই,
তবু যদি পাই মনের দুঃখ যায় দূরে।

(৫)

নাহি তার পীতধড়া, নাহি তার মোহন চূড়া
মুখে জয় রাধে বলে প্রেমের ভরা
কেবল ঐ ছিল ঐ ছিল ঐ ছিল বলে নয়নে
বহে ধারা,
ঠেকে সে প্রেমধারে, করদ নিল করে
বায় সে কার ধারে, বলে হারে
ও সে ভক্তিদ্বারে সদা ফিরে, বিষয় ধারে
যায় না ধরা॥

একদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কবি দীনবন্ধু মিত্রকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে একটী রোগী দেখিতে আসিয়াছিলেন। রোগী একটী কুমারী। মহেন্দ্র বাবু মিত্রজ্জাকে কহিলেন যে, কুমারী এখন সেক্‌সপীয়র পড়িতেছেন। কবি হাসিয়া বলিলেন, "বৈজ্ঞানিকের সহিত কবি সেক্‌সপীয়রের সম্বন্ধ কি? ডাক্তার শরীরের চিকিৎসক, কবি মনের চিকিৎসক।

বৈজ্ঞানিক উপস্থিত লইয়া, কবি ভবিষ্যত লইয়া, বৈজ্ঞানিক সত্য লইয়া, কবি আদর্শ লইয়া আনন্দ উপভোগ করেন। সে অনেক দিনের কথা—কথাগুলি মনে যেমন লাগিয়াছে, এখনও সেইরূপ জাগ্রত আছে—বিংশতি বর্ষেও পরিবর্ত্তন হয় নাই। বৈজ্ঞানিক ডাক্তার অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—দীনবন্ধু তুমি কবি—কবির কল্পনা চিন্তা তোমার পরিচিত—তুমি কবি কি জান—বৈজ্ঞানিককে জানি না। কাব্যেই বিজ্ঞানের আরম্ভ। কবিতা ও বিজ্ঞান উভয়েরই প্রসূতি কল্পনা। কবিতা কুমারী কোমল আরক্ত নয়নে বিজ্ঞানকে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেন। কিন্তু কল্পনা জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিজ্ঞান পথ প্রদর্শন না করিলে কবিতার রাজ্য সঙ্কুচিত হয়। অতীত ও বর্ত্তমান কবিতার—ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের। যখন কবি গেটে পাদচারণা-ক্রমে হরিণের মস্তক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এটী মেরুদণ্ড—সেই দিন বিবর্ত্তকদের উদয় হয়। দান্তে প্রতিভা বলে যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া কোমত তাহা বাহির করিয়াছিলেন। কবিতার সাহায্য না লইলে বিজ্ঞানের ব্রহ্মচর্য্যের তীব্রতা কোমল হয় না, বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলে কবিতা পূর্ণ হয় না—উভয়ে মিলিত হইলে জগতের দুঃখভার হ্রাস হয়। আমি বিজ্ঞানের বন্ধু, কিন্তু তুমি কবিতার দাস। ৮।৫।৯১

সংগ্রাহক ও প্রকাশক
শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায় চৌধুরী।

জয় জগদীশ্বর।

১

দিবানিশি সে আমারে রাখে কোলে কোলে!
আমি না থাকিতে চাই,
লাফায়ে পড়িয়া যাই,
আমি না উঠিতে চাই
সে ধরিয়া তোলে!
নানা রূপে কাছে কাছে,
পথ আগুলিয়া আছে,
আমি ত তাহারে ভুলি
সে ত নাহি ভোলে।
দিবানিশি সে আমারে রাখে কোলে কোলে!

২

আমার হৃদয় দ্বারে,
রুধি তারে বারে বারে,
আসিতে দেই না তবু
সে ত ঠেলে খোলে!
আমি ত দেই না কাণ,
তবু করে নানা গান,
তুষিতে আমার প্রাণ
জগতের রোলে!

৩

আমি ত না ভালবাসি,
তবু আসে হাসি হাসি,
সে হাসি মধুর গন্ধ
ফুলে ফুলে দোলে!
আমি ত চাহি না তায়,
তবু ফিরে পায় পায়,
আলিঙ্গন দিয়ে যায়
মলয় হিল্লোলে!

৪

আমি ত কই না কথা,
তবু তার কি মমতা,
ডাকে পিতা মাতা ভ্রাতা
সুমধুর বোলে!

কিছুই বুঝি না আমি,
সে কি জায়া, সে কি স্বামী?
কেন সে প্রেমের সিন্ধু
বহিছে কল্লোলে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ধর্ম্মের ভিত্তি।

"Humanity is the *Successive* incarnation of God."

Joseph Mazzini.

একজন ব্রাহ্ম সাধু ব্যক্তি একদিন বলিতে-ছিলেন, "প্রেম ও ভক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেবা ও পরিচর্য্যা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে যেরূপ প্রকটিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কুত্রাপি হওয়ার উপায় নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি ও সেবা পরিচর্য্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সমকক্ষ হইতে পারিবেন, সে আশা নাই। সত্য ও চরিত্র—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষত্ব ছিল,—তাহাতে যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অটল এবং সুদৃঢ় হইতে পারিতেছেন না, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি অসম্ভব। ব্রাহ্মধর্ম্ম আর যে কখনও মাথা তুলিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা কম।" আমরা বহুদিন সাধুর এই কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি।

ধর্ম্মের দুই সোপান,—বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ সাধনে ধর্ম্মের পোষাক পরিচ্ছদ মূলক বাহ্যানুষ্ঠান,—পূজা, অর্চ্চনা, জপ, তপ, যজ্ঞ, হোম, সেবা, পরিচর্য্যা, গৃহীর অষ্টবিধ ধর্ম্ম সকলই থাকিতে পারে, কিন্তু সেখানে চরিত্র নাও থাকিতে পারে। এদেশের চিরন্তন প্রথা—ধর্ম্মের সহিত চরিত্রের কোন সম্পর্ক রাখার যেন প্রয়োজন নাই। এদেশ বাহ্যানুষ্ঠানে চির-সিদ্ধ। এদেশে জিতেন্দ্রিয় বা রিপুজয়ী না হইলেও, গৈরিকধারী ও নিরামিষাশী হইলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায়। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, চরিত্র বলিতে যাহা বুঝা যায়, এদেশে তাহা বড় বিরল। এই জন্য ভেকধারীগণ চিরদিনই এদেশে আদৃত। প্রতারণা প্রবঞ্চনা, ছলনা বঞ্চনা, মিথ্যা অসত্য, নরহত্যা, ডাকাতি, ব্যভিচার মদ্য-পান, অত্যাচার অবিচার, পরপীড়ন পর-নিন্দা, ঘুষ উৎকোচ—সবই নাকি ধর্ম্মানু-মোদিত। নচেৎ ধর্ম্মভীত জাতি সকলের মধ্যে এদেশে এ সকল এত চলিতেছে কেন? বহু বহু যোগী ঋষিরও পতন হইয়াছিল কেন? এদেশে বাহ্য ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ ধারণ বা বাহ্যানু-ষ্ঠানের কি কখনও অভাব হইয়াছিল? জপ তপ, ক্রিয়াকলাপ সমানভাবে আবহমান কাল চলে নাই কি? তবুও কেন ভারত দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বল—মৃতবৎ? শ্রীবুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মন্ত্রে ভারতবর্ষ দীক্ষিত হইল না কেন? শ্রীচৈতন্যের কামিনীকাঞ্চন-বর্জ্জিত নিষ্কাম পূত চরিত্র ধর্ম্ম ভারত গ্রহণ করিল না কেন? "মৎস্যের ঝোল, কামিনীর কোল

ও মুখে হরিবোল" কেন এদেশে প্রচারিত হইল? এ মহা প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে?

"বাউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিও কাজে নাহি কাউল,
বাউলকে কহিও দেশ হইল আউল
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল"—

শ্রীঅদ্বৈত-গোস্বামীর মুখ হইতে এই নিরাশার বাণী বহির্গত হইয়াছিল কেন? এ কথার একমাত্র উত্তর—বহিরঙ্গ সাধনে ভারত চিরসিদ্ধ—প্রথম সোপানে ভারত চির-প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দ্বিতীয় সোপান—অন্তরঙ্গ সাধন ভারতে যেন চিরদিন অনাদৃত। সেকালের পরাশর, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি প্রভৃতির জীবন তাহার সাক্ষ্য, এবং একালের কামিনীকাঞ্চন-বর্জ্জিত শ্রীচৈতন্যের নিষ্কাম পবিত্রতার কলুষরাশিতে পরিণতি তাহার সাক্ষ্য। চণ্ডীদাসের সহিত রামী ধোপানীর মিলন সেকালের বাশুলি-মন্দিরের চির-কলঙ্ক, এবং এলোকেশী-মোহন্তের ঘটনা এ কালের তারকেশ্বর মন্দিরের চিরকলঙ্ক। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—চরিত্রকে বাদ দিয়াই যেন এদেশে ধার্ম্মিকের কাহিনী চিরদিন ঘোষিত হইয়াছে। দেবদ্বিজে ভক্তি, আচার অনুষ্ঠানে আনুরক্তিই ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীদাস-রামী এবং এলোকেশী-মোহন্তের ঘটনা অনুষ্ঠিত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কামাখ্যা-সীতাকুণ্ড, কাশী-বৃন্দাবন, কালীঘাট-নবদ্বীপ—সর্ব্বত্রই যেন ব্যভিচারের প্রকাণ্ড হাট; অথচ সে সকল কথার উল্লেখ করিলে লোকেরা বিরক্ত হন, লাইবেল করিতেও অগ্রসর হন! যোগী ঋষিদিগের পতন এদেশে চরিত্রের দৃঢ় শৃঙ্খল ছেদন করিয়া দিয়াছে, আচার্য্য এবং উপ-দেষ্টার চরিত্র-স্খলন এদেশের ধর্ম্মকে চির-উপেক্ষিত করিয়াছে। চরিত্রহীনতার [illegible] পুনিক অভিনয় এদেশে আবহমান [illegible] চলিয়া আসিয়াছে। [illegible] কথার প্রকৃতি নিষ্প্রয়োজন এবং অনাবশ্যক—[illegible] অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই অবগত আছেন। ভারতবর্ষে সমগোত্রিক [illegible] অভ্যুদয়ের ইতিহাস তাহা উজ্জ্বলরূপে ঘোষণা করিতেছে।

প্রকৃত ধর্ম্মের সম্যক প্রকাশ জগতে নাই বলিলেও চলে। কোন ব্যক্তি ধার্ম্মিক কি না, তাহা কেবল তাহার চরিত্রে প্রকাশ পায়। চরিত্র যাহার স্খলিত, তাহার ধর্ম্ম সাধনের কোনই অর্থ নাই। দে[illegible]স্পর্শেই চরিত্র, এবং চরিত্রই ধর্ম্ম। স্রোতের শৈবালের ন্যায় যে জন পাপ-সলিলে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার ধর্ম্ম সাধন কেবল কথার কথা। ধর্ম্ম সাধন করিলাম, অথচ রিপু জয় হইল না, এ কথার কোনই অর্থ নাই। ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি চরিত্র। চরিত্রেই ধর্ম্ম ধৃত। অথবা চরিত্রেই বিধাতার প্রকাশ। অথবা চরিত্রই বিধাতার ধৃতি। কেহ যদি বিধাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, মানব-চরিত্রেই দেখিতে পাইবেন। কেহ যদি বিধাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে চরিত্রের মূলে অনুসন্ধান করিবেন, তবেই দেখিতে পাইবেন। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, এজন্য, [illegible] সাধনা। তাঁহাকে চরিত্র-[illegible] দেখা যায়। এদেশে [illegible] সাধনের দৃষ্টান্ত যে নাই, তাহাও নহে। প্রাচীন কালের বুদ্ধ-দেব, শঙ্করাচার্য্য, সেকালের শ্রীচৈতন্য, এবং একালের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ, কেশবচন্দ্র, এবং বিজয়কৃষ্ণ এদেশে অন্ত-রঙ্গ সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বুদ্ধদেব,

শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ চরিত্রের আদর্শ এদেশে যে যে কারণে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, বুঝি বা সেই সেই কারণেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের নিষ্কাম-চরিত্রাদর্শ সর্ব্বত্র তাদৃশ বদ্ধমূল হইতে পারিতেছে না। কিন্তু সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিবার স্থান ইহা নয়।

বিগত ১৩ই চৈত্র আমি মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলাম, সেই দিন হইতে ভাবিতেছি, চরিত্র ভিন্ন এ জগতে আর কি ধর্ম্মের কোন ভিত্তি আছে? তুমি ভাল বক্তা বা কর্ম্মী, ভাল আচার্য্য বা উপদেষ্টা, ভাল নেতা বা সহায় হইতে পার, কিন্তু তোমার যদি চরিত্র না থাকে, তোমাতে ধর্ম্ম কখনও স্থায়ী হইবে না, তুমি কখনও বিধাতাকে দেখিতে পাইবে না। বক্তৃতা করা, উপদেশ দেওয়া, সেবা পরিচর্য্যা করা—অনেকের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, কিন্তু চরিত্র লাভ বড়ই দুর্লভ বস্তু। আমাদের মনে হয়, তাহা যেন মানবে ঈশ্বরত্ব, অথবা নরে হরির প্রকাশ, অথবা নরক ও স্বর্গের মহা মিলন! এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান চরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশে চরিত্রশুদ্ধির দিকে ততটা দৃষ্টি ছিল না, তদীয় জীবনে বিশুদ্ধ চরিত্র বিকাশের কথা তেমন শুনা যাইয়া না থাকিলেও, কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ে তাহা প্রকট হইয়াছিল। কঠোর সংযম লইয়া মাছমাংসত্যাগী কেশবচন্দ্র যখন এদেশে দাঁড়াইলেন, কৌলিক গুরুর নিকট "মন্ত্র গ্রহণ করিব না" প্রতিজ্ঞা করিয়া, বালিকা ভার্য্যাকে লইয়া যখন গৃহত্যাগ করিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন, তখন স্বর্গ হইতে যেন অমূল্য চরিত্র-রত্ন বর্ষিত হইল। কলিকাতা সে দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক "তামা তুলসি বিশ্বাস করি না" বলিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া আদালতে যখন শপথ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেই এক দিন কলিকাতার গলিতে গলিতে কাণাকাণি চলিয়াছিল, আর কৌলিক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া যখন বীর-কেশরী কেশবচন্দ্র রাস্তায় বাহির হইলেন, সেই একদিন—কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে মহা আন্দোলন উঠিয়াছিল; পাপ প্রলোভন যেন সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। এই দুই দিনের কথা বঙ্গ-ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কখনও প্রক্ষালিত হইবে না। এই দুই দিন সোণার বাঙ্গালা প্রকম্পিত হইয়াছিল।

অঘোর-বিজয়-গৌর-কান্তি-প্রতাপ-কেশব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চরিত্রের বিজয় নিশান তুলিয়া যখন রাস্তায় দাঁড়াইলেন, তখন মদ্যপায়ীর মদের গ্লাস মুখচ্যুত হইল, স্বৈরিণীর চরণের অর্ঘ্য ব্যভিচারীর কম্পিত হস্তচ্যুত হইল, বঙ্গে পবিত্রতার পৌষ-পার্ব্বণ সমাপ্ত হইল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কি শোভন-চিত্রই না বঙ্গে প্রকটিত হইয়াছিল। সে সব কথা ভাবিলেও শরীর আনন্দে পরিপ্লুত হয়। আর আজ কি দেখিতেছি? যে সকল চরিত্রহীন লোকেরা অশ্লীল কদর্য্য সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া নিজত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পৌরোহিত্যে কেশবের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতেছে! নব রঞ্জিত-মদের-গ্লাস চুম্বন করিয়া যাঁহারা বড়ত্ব পাইয়াছেন, কুলটার পদ-রজঃ যাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ, তাঁহারাও আজ গায়ক এবং পুরোহিত! শ্রাদ্ধের সভা বল, থিষ্টিক কনফারেন্স বল, সম্মিলন বল—সর্ব্বত্রই চরিত্রহীনদের নেতৃত্ব!! দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি।

কেশবচন্দ্রের সময়ে কোন একজন প্রচারকের একটু পদস্খলন হইয়াছিল, সেজন্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সমাজের বেদী পান নাই। কেশবচন্দ্রের কি কঠোর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। আর এখন—কিছু দিন পরেই, চরিত্রে যাঁহারা হীন, বিশ্বাসে যাঁহারা কপটাচারী, কিন্তু ঐশ্বর্য্যে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা গরীয়ান, তাঁহারাই পৌরোহিত্য পাইতেছেন! অনৃতের ঝুড়ি মাথায় বহিয়া যাঁহারা নানা উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারাই উপদেষ্টা এবং তাঁহারাই আচার্য্য। কত ব্যভিচারী সমাজের সভ্য হইয়াছেন, কে তাহার ইতিহাস গণিতেছে? চীৎকার করিয়া লম্বা লম্বা উপাসনা করা যাঁহাদের নিত্য ব্যবসা, যাঁহাদের চরিত্রের পূতিগন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত হয়, তাঁহারাই আজকাল দিগ্বিজয়ী নেতা! একদিন একজন সাধু ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের গতি কোন্ দিকে? ঈশ্বরের স্থানে কাহার প্রতিষ্ঠা হইবে? ব্রাহ্মসমাজ এ কথার স্পষ্ট 'না' উত্তর এখন দিতে পারেন কি? ব্রাহ্মসমাজ,—বল, কোন্ অতলে, কোন্ নিরয়ে তোমার গতি হইতেছে?

কিন্তু আরো কিছু বক্তব্য আছে। বক্তব্য আছে—প্রথম ধারা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-মহর্ষির পূতচরিত্র ধারা বহিয়া দ্বিতীয় ধারার ব্রহ্মানন্দের পরে বেণীমাধব প্রভৃতির এবং তাহা হইতে তৃতীয় ধারার আনন্দমোহন প্রভৃতির কথা বলিবার আছে। আনন্দমোহনের সম্বন্ধে, উমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে—পরে পরে, আরো পরে পরে ভুবনমোহন-দ্বয় এবং আদিনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। এই ত্রিধারাতে রামমোহন অনুস্যূত। ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় ধারায় আনন্দমোহন-উমেশ-ভুবন-অবিনাশ-আদিনাথ-প্রফুল্ল প্রভৃতির কথা উপেক্ষণীয় নয়। দ্বিতীয় ধারা বিজয়-অঘোর-কেশব-জীবন-ধারার বহিয়া বহিয়া আনন্দ-উমেশ-ভুবন-আদিনাথ-প্রফুল্ল প্রবাহিত হইয়াছেন,—তাঁহাদের চরিত্রসৌরভে, অথবা চরিত্রগৌরবে, অথবা চরিত্রমাধুর্য্যে তাঁহাদিগকে নেতৃত্বে উন্নীত করিতে পারে নাই, ইহা কম পরিতাপের কথা নয়। উমেশচন্দ্র অনাদৃত আচার্য্যগিরি এবং আনন্দমোহনও উপেক্ষিত সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কত কত রাহু যে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিল, সে ইতিহাস কেহ জানে না। পূজ্য শাস্ত্রী মহাশয় একাদিক্রমে ৫ বৎসরের জন্য সভাপতিত্ব চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এমনই সম্মান, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। হীনচরিত্র ব্যক্তিদের উল্লম্ফনে সমাজ যখন আন্দোলিত, তখন রাহুর কবলে কত কত মহারথীর চরিত্র-সৌরভ পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছিল? কত কত অনাদৃত মহা পুণ্যবান ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলেন কেন? আজকাল লোক ব্রাহ্ম হয় না কেন? কে উত্তর দিতে পারে? টাকার বিভীষিকায় সামাজিক কমিটী কার্য্যকারিণী শক্তি হারাইয়া বিলুপ্ত হইলেন, পুণ্যবানেরা লজ্জায় মুখ লুকাইলেন, গলার জোরে বা শ্বেতচক্র বা ব্যক্তিত্ব প্রচারের জোরে কত কত চরিত্রহীন ব্যক্তি প্রাধান্য পাইলেন! যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইতে দাও,—কি অহঙ্কারের কথা এই যুগে শুনিলাম! যাঁহারা সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলিতে যায়, তাঁহাদিগকে নেতারা শত্রু বলিয়া অভিহিত করেন।* গোস্বামী মহাশয় গেলেন,—কেহ দুঃখ করিল না, কালীনাথ দত্ত মহাশয় গেলেন, একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল না, গণেশ-

* ১৩২৪—১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদী ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চন্দ্র ঘোষ ও রামকুমার বিদ্যারত্ন গেলেন, কেহ একটি কথাও বলিল না। শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী বা মনোরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র এবং যোগেশচন্দ্র এবং আরো কতকজন গেলেন—সকলে নির্ব্বাক,—অহঙ্কারে সকলে দিগ্বিদিক-শূন্য—ধ্বনিত হইল, "যে যায়, তাহাকে যাইতে দেও!" এইরূপে কত কত মহারথী প্রস্থান করিলেন, কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ যাইতে দিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ এখন অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত। দুই-চারি জন সাধন-ভজনহীন হামবড় দাম্ভিকের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-সমাজের তৃতীয় ধারা টলটলায়মান। এখন উৎসবের অর্থ—কেবল ভেকধারীদের অহ-ঙ্কারের জৃম্ভণ মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ধারায় দেবেন্দ্রনাথ অনুসৃত সুধীন্দ্রনাথে, কিন্তু সেখানে সন্দীপ প্রভৃতির আলেখ্য চিত্রিত হইতেছে। দ্বিতীয় ধারায় বালখিল্যদের নেতৃত্বে কত চরিত্রহীনেরা নেতৃত্ব ও পৌরো-হিত্য পাইতেছে। পুণ্যশ্লোক বেণীমাধব, কালীনাথ, তারকেশ্বর প্রভৃতিও উপেক্ষিত হইতেছেন, এবং তৃতীয় ধারায়—আনন্দমোহন, আদিনাথ, প্রফুল্লের স্থানে রাজত্ব করিতেছে —চরিত্র-বিচ্যুতির দর্প। মদ্যপান প্রভৃতিও চরিত্রের অঙ্গাঙ্গি বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। রাজনীতি জগতে ঘোষিত হইতেছে, "চরিত্র-বল থাকুক বা না থাকুক, হোমরুল আমরা পাইবই পাইব"—ধর্ম্মসমাজের কৃতিত্ব মহলে ঘোষিত হইতেছে, চরিত্র থাকুক বা না থাকুক, শুধু বক্তৃতার জোরেই ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে! ক্রমে ক্রমে কত কত মফঃস্বলের সমাজের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তবু বাক্যবাগীশদের অহঙ্কারের মাত্রা কমে না। হায় রে হায়, হইল কি? সকলেই বলিতে ছেন—আমাদের জয় হইবেই হইবে। জয় পরাজয়ের নবতন্ত্র নবাকারে রচিত হইতেছে। শুধু মুখের কথায় পাপদস্যু কি কখনও বিনষ্ট হয়? পাপ-দস্যু বিনাশের মহা অস্ত্র মহা চরিত্রের নিগূঢ় তন্ত্রে নিবদ্ধ। হায়, সে চরিত্রবল আজ কোথায়? নগর দিয়া কত সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া যায়, দস্যু জগাই মাধাইর আর উদ্ধার হয় না! সকলই নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে পর্য্যবসিত।

ছত্রিশ বৎসরের অধিককাল আনন্দ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই ছত্রিশ বৎসর শুধু চরিত্রের উন্মেষের জন্যই আনন্দ-আশ্রম চেষ্টা করিলেন। চরিত্র লাভ এ জগতে বড় কঠিন ব্যাপার—অথচ লাভ না হইলে কিছুই হইল না। দেবতার সংস্পর্শ ভিন্ন চরিত্রের উদয় হয় না। সকল সম্প্রদায়ই চরিত্রের কাঙ্গাল—উঠিতে বসিতে শুইতে যাইতে সর্ব্বত্র কেবল চরিত্র-বিচ্যুতি ঘটিতেছে। আমরা আবাল্য ভবের হাট, পরিবারের মাঠ এবং ব্যক্তিত্বের গোঠের মায়া ছাড়িয়া এই চরিত্র লাভের জন্যই চেষ্টা করিতেছি। আমাদের ধর্ম্মসাধনের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল চরিত্রলাভের চেষ্টা। চরিত্র লাভ হইলে স্বর্গ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হয়—বিধাতার কৃপায় ঈশ্বর-বাণী নিয়ত শুনা যায়। ঈশ্বর বাণী শুনিতে শুনিতে আরো চিত্রের নিগূঢ় পথে দৃঢ় হওয়া যায়। নির্ভীকতা তখন মানুষের সহজসাধ্য হয়—অন্যকে কিছু করিতে বলিতে তখন আর ইচ্ছা হয় না,—নিজের কর্ত্তব্য কায়মনোবাক্যে পালন করিতেই ইচ্ছা হয়। তুমি কর কি না কর, সে সংবাদে আমার কাজ কি? আমার কর্ত্তব্য, শুধু প্রাণপণে বিধাতার আদেশানুসারে অগ্রসর হওয়া। যে ব্যক্তি কখনও চরিত্র সাধন করে নাই, ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বিশুদ্ধ চরিত্র না পাইলে ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ, দুইই অসম্ভব। বাণী শ্রবণ ভিন্ন নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে না, নির্ম্মল জ্ঞান লাভ ভিন্ন নির্ম্মল চরিত্র লাভ সুদুর্-লভ। চরিত্রলোকে যিশু খ্রীষ্ট, সন পল, নিমাই শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ সিদ্ধার্থ, শুদ্রক ব্রাহ্মণ, রত্নাকর বাল্মীকি, রামকৃষ্ণ পরমহংস, নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি। এই বিশ্বাসে কমলকামিনী চরিত্র লাভের জন্য আজীবন কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সংযমকে করিলেন অন্তরের ভূষণ, সেবাকে করিলেন সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ, বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিলেন, বিলাসিতা বলিতে সংসারের যাহা কিছু, সে সকলই বর্জ্জন করিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া আনন্দ-আশ্রমের সকলে অবাক্ হইলেন। সাধু ত্রিপুরাচরণ, ভক্ত ভগবীশ্বর গুপ্ত, প্রেমিক প্যারীলাল, সাধু হরিদাস প্রভৃতি ব্যক্তি তাঁহার তপস্যার কঠোরতা দেখিয়া মোহিত হইয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে গোস্বামী মহা-শয়ের এই গানটী ভক্তিভরে গাইতেন—

হৃদয় পরশমণি আমার।
নয়নের ভূষণ আমার বিভু দরশন,
বদনের ভূষণ আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন,
ভূষণ বাকী কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র
হার পরেছি।
হস্তের ভূষণ আমার সে চরণ সেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ
ভূষণ বাকী কি আছে রে, প্রেমমণি
হার পরেছি।

তাঁহার চরিত্রের প্রতাপ দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাসাধকও বলিতেন, ইহা সহজসিদ্ধ সাধ্বীরই যোগ্য। বিধা-তার সংস্পর্শেই কমলকামিনী সাধ্বী। নিরাভরণা, সকল অলঙ্কারের সার আভরণ চরিত্রে ভূষিতা। প্রথম প্রথম কমল-কামিনীর বিলাসিতা-বর্জ্জিত আকৃতি দেখিয়া সকলে অসভ্যা নারী বলিয়া ঘৃণা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন। সমস্ত দিন পরকে খাওয়াইয়া উপাধি পাইলেন—টাকা উপা-র্জ্জনের জন্য এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা! কত কত ব্যক্তি কত রূপেই এই আশ্রমের দোষ কীর্ত্তন করিল, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী—কমলকামিনীর চরিত্রের আদর্শে এই আশ্রমে কত সাধু সাধ্বীর অভ্যুদয় হইয়াছে। সাধ্বী বিদ্যুল্লতা, সাধু প্যারীলাল, নীলকান্ত, অম্বিকাচরণ, বনমালী, রাধাচরণ, হরিদাস প্রভৃতি কত চরিত্র-বীরের আবির্ভাব হইল! কমল-কামিনীর চরিত্র-স্পর্শে সকলেই দ্বিজত্ব পাইয়া-ছেন। তাঁহারা সকলেই আজ স্বর্গে—আজ তাঁহারা কমলকামিনীকে ঘেরিয়া নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন, আর এই মর্ত্ত্যে আমরা তাঁহাদের আদর্শ ধরিয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছি। আদর্শ ধরিয়া চলিতেছি, আর বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আনন্দ-আশ্রমে চিরদিন দেবস্পর্শে যেন চরিত্রই জাগিয়া থাকে।

অনেক সাধু সাধ্বীর পদধূলিতে এই আশ্রম পবিত্র—এই আশ্রমের সংস্পর্শে আসিয়া কেহ অপবিত্র থাকিতে পারে নাই। আজ নির্ভয়ে ঘোষণা করিতেছি, এই আশ্রমে কাহারও পদস্খলন হয় নাই। আমরা আর কিছু জানি না, বুঝি না—শুধু চরিত্রের মাধুর্য্যই বুঝি—বুঝি—চরিত্রই একমাত্র অক্ষয় জপমালা। বুঝি, চরিত্রই দেবস্পর্শ, দেব-স্পর্শেই সাধ্বী কমলকামিনীর মানবত্ব। সেবা-

পরায়ণতা শেষে যে জপমালায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার অর্থ আর কিছুই নয়, তাহা শুধু চরিত্র জপ, চরিত্র তপ, চরিত্র ধ্যান, চরিত্র স্নান। চরিত্রে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া অবিনশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবত্বে তিনি উন্নীতা হইয়াছিলেন। অথবা এই আশ্রমে দেবতার সংস্পর্শে মানবত্বের উদয় হইয়াছিল। সাধ্বী কমলকামিনী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যতদিন তাঁহার চরিত্রের আদর থাকিবে, ততদিন আনন্দ-আশ্রম অক্ষয়। অথবা যতদিন বিধাতার স্পর্শ থাকিবে, ততদিন আনন্দ-আশ্রম অক্ষয়। আনন্দ-আশ্রম! তুমি অনেক নিন্দার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছ, আজ সাক্ষ্য দেও, কে তোমাকে সুদীর্ঘকাল চালাইয়াছে? কাহার স্পর্শে তুমি ধন্য হইয়াছ? তোমার ললাটে লিখিত আছে—ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম: তুমি আজ বল ত, ব্রহ্মকৃপাই তোমাকে রক্ষা করিয়াছে কি না? তোমাকে সংসারের কেহ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, না, বিধাতাই এত কাল রক্ষা করিয়াছেন, আজ নির্ভয়ে তাহার সাক্ষ্য দেও। চরিত্রের জন্য প্যারীলাল, নীলকান্ত, হরিদাস, কমলকামিনী জীবন ঢালিয়াছেন,—সাক্ষ্য দেও—এই আশ্রমের সকলেই চরিত্র লাভে উজ্জ্বল কি না? ইষ্টকে ইষ্টকে এবং চূণের পরলে পরলে বিশ্বাস ভক্তির নিদর্শন যদি ধারণ করিয়া থাক, তবে আজ নির্ভয়ে ঘোষণা কর, এই বঙ্গে, এই ভারতে, এই ব্রাহ্মসমাজে চরিত্রের আদর আবার জাগিবে কি না? চরিত্র যদি জাগে, তুমি অক্ষয়; চরিত্র যদি থাকে, তুমি অবিনশ্বর, চরিত্র যদি জন্মে, তুমি অবিচলিত! কিন্তু চরিত্র কতদূর, তুমি আজ তাহার সাক্ষ্য দেও। তুমি আজ সাক্ষ্য দেও, মানব চরিত্র পাইলে দেবতা হয় কি না, নর হরি হয় কি না, মৃত নবজীবন পায় কি না? তুমি আজ নির্ভয়ে ঘোষণা কর—চরিত্রই ডিভিনিটি। তুমি ঘোষণা কর, এই মর্ত্ত্যে চরিত্রই স্বর্গ, চরিত্রই জাগরণ, চরিত্রই নবজীবন, চরিত্রই উদ্ধার, চরিত্রই মুক্তি, চরিত্রই কৈবল্য—চরিত্রই সাধন, চরিত্রই সিদ্ধি—চরিত্রই ধর্ম্মের একমাত্র অক্ষয় ভিত্তি। অথবা চরিত্রই তিনি। আনন্দ-আশ্রম,—ব্রাহ্মসমাজ চরিত্র হারাইলেও তুমি হারাইও না, ছোট মায়ের চরণে আজ একমাত্র প্রার্থনা। মা জগজ্জননী এই করুন, সাধ্বী কমলকামিনীর অক্ষয় চরিত্র-বল এই আশ্রমের যেন চিরসম্বল হইয়া থাকে—তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি যেন আনন্দ-আশ্রমের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া থাকে। এই আশ্রমে কাহারও যেন চরিত্র-স্খলন না হয়। মা জগজ্জননী এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আজ সকলে বল, ব্রহ্মের জয়, চরিত্রের জয়, কমলকামিনীর জয়। আর তোমাকে বলি, ব্রাহ্মসমাজ, তুমিও চরিত্র-বলে বলীয়ান হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও; দেবতার সংস্পর্শে তোমার চরিত্র লাভ হউক! যাহা হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাও; যাহা হওয়া উচিত, তাহার জন্য লালায়িত হও। তুচ্ছ আত্মবোধকে পরার্থবোধে পরিণত কর,—নিভৃতে লুকাইয়া কঠোর তপস্যায় নিরত হও, তাঁহার সংস্পর্শে চরিত্রধনে ধনী হইতে পারিবে। চরিত্রকে যদি জাগাইতে পার—এই ভারত তৎসহ জাগিয়া উঠিবে। নচেৎ ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে। মা জগজ্জননী স্পর্শ করুন, মাটী সোনা হইয়া যাক, ব্রাহ্মসমাজকে চরিত্র-ধনে ধনী করুন। সকলে বল, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

৬ই মাঘ, ১৩২৪।

সঙ্গিকা।

(৪৯)

এবার বড়দিনের সময় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল; বিদুষী শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিসংখ্যা ১০।১১ সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। এত লোকসমাগম আর কোন জাতীয় মহাসমিতিতে হয় নাই। স্বদেশের প্রতি দিন দিন লোকের ভালবাসা বাড়িতেছে, ইহা যারপর নাই সুখের বিষয়। বিভাগ নীতি ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ ভাবে বদ্ধমূল হইতেছে, এই মহামিলন তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। আর কিছু সুফল না হয়, বিভাগ-নীতিও যদি ভারত হইতে উঠিয়া যায়, জাতীয় মহাসমিতির জীবনধারণ সার্থক হইবে।

হোমরুলের জন্য জাতীয় সভাসমিতি খুব চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভারতের কিছু ভাল হইবে কি না, বুঝিতেছি না। বুঝিতেছি না, চরিত্রহীন ভারত ক্ষমতা পাইলেও তাহার সুব্যবহার করিতে পারিবে কি না। জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং স্বার্থ ভারতীয় জাতিসমূহের উন্নতির ঘোর অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমতার অপব্যবহার হইতেছে না, এরূপ স্থল ভারতে বিরল। যাহা হউক, বিভাগ-নীতির মূলে যদি জাতীয় সভাসমিতি কুঠারাঘাত করিতে পারেন, ভারতের বিশেষ মঙ্গল হইবে। বিভাগ-নীতি থাকিতে জাতীয় একতা কখনও হইবার সম্ভাবনা নাই।

জাতীয় মহাসমিতির এবারকার মিলনের মহা সুখকর দৃশ্য এই যে, অনেক মহিলা এবার প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হইয়াছিল। "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না", মহিলাদের উন্নতি ও যোগ ভিন্ন ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত।

জাতীয় মহাসমিতিতে অনেক ভলণ্টিয়ার ছিলেন, তবুও পুলিশ-প্রহরী রাখা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা বিনা দোষে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি তীব্র ব্যবহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। "হোমরুলে"র সময়ে পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করা হইল কেন, বুঝিতেছি না। তবে কি আমরা হোমরুলের অযোগ্য?

(৫০)

বড় দিনের সময় কলিকাতায় আরো বহু বহু সভাসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে আর কিছু কাজ না হইলেও যদি জাতীয় একতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি করিতে পারে, দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। শুধু বক্তৃতার আমরা কখনও পক্ষপাতী নই, কিছু কিছু কাজ দেখিতে চাই।

(৫১)

তাঁহারা বলেন, "বাঙ্গালী বলে ভাল, কিন্তু কাজে কিছু নন্।" কাজ কি বঙ্গে মৃতবৎ হইয়াই থাকিবে? জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় ফণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত না হইলে মনে করিতে হইবে, এ দেশ শুধু কথাতেই ভরপুর হইয়া থাকিবে। কার্য্যক্ষেত্রে কবে উন্নতি হইবে,—কবে বক্তৃতার স্থলে সুফল ফলিবে?

(৫২)

এবার বঙ্গের তিন জন কৃতী সন্তানের

মৃত্যুতে আমরা যারপর নাই বেদনা পাইয়াছি। (১) সুলেখক হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, (২) কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, (৩) স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ। হেমেন্দ্রনাথ বীরভূমের, গোবিন্দচন্দ্র ফরিদপুরের এবং চন্দ্রমাধব বিক্রমপুরের গৌরব।

(১) হেমেন্দ্রনাথের "প্রেম" অতি সুন্দর গ্রন্থ। তিনি একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বীরভূমের এস-পি-সিংহ বংশকে অত্যুজ্জ্বল ভূষণে সজ্জিত করিয়া এ দেশে অমর হইয়া থাকিবেন। (২) গোবিন্দচন্দ্র রায়, ১৭৬০ শকে, বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ৬ই কার্ত্তিক ফরিদপুরের অধীন দক্ষিণপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ৺গৌরসুন্দর রায়। গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়। বাল্যে ঢাকার বাঙ্গালা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। গোবিন্দচন্দ্র সংস্কৃত ও পারসী শিখিয়াছিলেন, জ্যোতিষ তাঁহার বিশেষ পাঠ্য ছিল। ৭৯ বৎসর বয়সে, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১২৬১ সালে বিবাহ। নবাবগঞ্জ ও কুমিল্লায় শিক্ষকতা করেন। তৎপর বাগ আচড়া যান। তৎপর দুর্গামোহন দাসের আশ্রয়ে, Govt. Survey Dept. ১৫৲ বেতনে কাজ করেন। ১৮৬৮ কাশী গমন করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ আগরায় একটী হোমিও ডিসপেনসারি করেন। তাঁহার যমুনা-লহরী বিখ্যাত সঙ্গীত। গঙ্গাতরঙ্গ নামক কবিতাও বিখ্যাত। গ্রের এলিজির ন্যায় তাঁহার যমুনা-লহরী ভাষার রত্নভাণ্ডারে স্থান পাইবে। এরূপ কবি ফরিদপুরে আর জন্ম-গ্রহণ করে নাই; যাবচ্চন্দ্র দিবাকর—তিনি ফরিদপুরের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। (৩) স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ। জন্ম ১৮৩৮—২৬শে ফেব্রুয়ারি, ঢাকা, বিক্রমপুরের অধীন ঘোলঘর। মৃত্যু ৬ই মাঘ, শনিবার, ভবানীপুর। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এই—

তাঁহার পিতার নাম রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। তিনি একজন সেকালের ডেপুটী কলেক্টর—দক্ষিণ বাঙ্গালার সেটেল-মেণ্ট কার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। স্তর চন্দ্রমাধব পুরাতন হিন্দু কলেজে (আধুনিক নাম—প্রেসিডেন্সি কলেজ) শিক্ষা লাভ করেন। একুশ বৎসর বয়সে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডেপুটীগিরি লাভ করেন। এ কার্য্যে তিনি অধিক দিন নিযুক্ত ছিলেন না। ডিপুটীগিরি পরিত্যাগ করার পর তিনি বর্দ্ধমানের সরকারী উকীলরূপে কিছুদিন কাজ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন-ফ্যাকালটির প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন ও পর বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের জজরূপে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। হাই-কোর্টের জজরূপে তিনি খুব বিচার-স্বাধীনতা দেখাইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত চিফ জষ্টিস স্তর ফ্রান্সিস উইলিয়ম ম্যাকলিনের অনুপস্থিতি-কালে তিনি অস্থায়িভাবে চিফ জষ্টিসের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'স্তর' উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসর তিনি সোসাল কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি স্তর চন্দ্রমাধব জজিয়তি হইতে অবসরণ গ্রহণ

করেন। কায়স্থ সভায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। ভবানীপুরে বিধবা বিবাহের দলাদলির সময় ইনি বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ দলে ছিলেন। গত বৎসর টাউন হলে মিসেস বেশান্তকে আটক রাখার প্রতিবাদ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন; পরে ভবানীপুরে নিজ বাটীতে সভা আহ্বান করিয়া কংগ্রেসের নেতৃগণের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুইবার ব্যতীত তিনি আর কখনও কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করেন নাই।

স্যার চন্দ্রমাধবের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তি এদেশে বড়ই বিরল। লর্ড ডফরিন এবং কর্জ্জন তাহা জানিতেন, এবং জানিয়াই সম্মান করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি আজীবন কঠোর সংযমী পুরুষ ছিলেন। কায়স্থ সমাজের চারি বিভাগ ভাঙ্গিয়া আদানপ্রদান যাহাতে চলে, এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন, কথায় এবং কাজে মিলাইবার জন্য তিনি বঙ্গজ হইয়াও অন্য বিভাগে তাঁহার পরিবারের ছেলে মেয়ে-দিগকে বিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রতিভা এবং নির্ম্মল চরিত্র একাধারে এ দেশে বড় দেখা যায় না;—একমাত্র চন্দ্রমাধবেই তাহা প্রতিভাত হইত। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং সদাশয়তা, এবং দেশানুরাগ বিক্রমপুরের গৌরবকে চিরদিন উজ্জ্বল করিবে।

বিধাতা এই শোকসন্তপ্ত পরিবার সকলে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

(৫৩)

পৌষ মাসের নব্যভারত মাঘ মাসে প্রকাশিত হইল বলিয়া মাঘ মাসেরও কিছু কিছু ঘটনা এই সংখ্যায় দিতে হইল। মাঘোৎ-সব এবার ব্রাহ্মসমাজের চারি ধারায় সম্পন্ন হইয়াছে। মাঘোৎসবের এবারকার প্রধান ঘটনা—প্রথম ধারা হইতে রবীন্দ্র-বর্জ্জন, দ্বিতীয় ধারায় কালীনাথ, প্রিয়নাথ-বর্জ্জন, তৃতীয় ধারায় শিবনাথ ও কুমুদনাথ-বর্জ্জন। ব্রাহ্মসমাজ উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিতেছেন, এবং কোন আচার্য্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন, প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁহার স্থান হওয়া কষ্টকর। পীড়ার অজুহাতে শিবনাথ-বর্জ্জন, নানা সমাজে গতি-বিধির জন্য কুমুদনাথ বর্জ্জন, জাতিভেদ না মানার অজুহাতে (আদিসমাজে) রবীন্দ্র-নাথ বর্জ্জন, এ সমাজ ও সমাজে গতিবিধির জন্য কালীনাথ বর্জ্জন। কালীনাথ-বর্জ্জনের আরো নাকি কিছু কিছু কারণ আছে। প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বিপিনচন্দ্র ও মনোরঞ্জন ঠাকুর বর্জ্জিত হইয়াছিলেন; ঐ কারণে বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনারায়ণ-বর্জ্জিত হইয়াছিলেন; এবং এবার উঁহারাও বর্জ্জিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের নাকি তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া বলেন, "গেল, বয়ে গেল।" সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের যুবক-বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাননীয় সভ্যপদে বরণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজের নেতাদের চক্রান্তে তাহা হইতে পারে নাই। প্রচার ১লা মাঘ হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে—এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু ললিতমোহন দাস ও বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাছে যুবকগণ রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্যপদে বরণ করিতে সমর্থ হন, এই জন্যই ঐ দুই খানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। গত বৎসরও যুবক-

WATER DAMAGED.

দিগকে পরাস্ত করিতে এইরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, এবারও এই নীচ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদী তাঁহাদের হাতের কাগজ,—পারস্পরিক গা চাটা সমিতির অন্যতর এক ব্যক্তি উহার সম্পাদক, সম্পাদক মহাশয়ও নীরবে থাকিতে না পারিয়া "ব্যক্তিত্ব ও সমাজ" সম্বন্ধে এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ভাষা কেমন, বর্ণজ্ঞান কেমন, তাহা জানার জন্য পাঠকগণকে একবার পড়িতে অনুরোধ করি—কোন ধর্ম্ম-পত্রিকায় যে এরূপ লেখা প্রকাশিত হইতে পারে, আমাদের সে ধারণা ছিল না: তবে ইহা নাকি প্রেমের বন্যার যুগ, ব্রাহ্মেরা প্রেমের বন্যায় ভাসিতেছেন, তাই তাঁহাদের দলের লোকের এরূপ লেখাও সহ্য হইয়াছে !! ইচ্ছা ছিল, সমস্ত মন্তব্যটী তুলিয়া দেই, কিন্তু নিতান্ত স্থানাভাব। মাঘোৎসবের কেমন ভাষা, তাহা বুঝাইবার জন্য দুই তিনটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম। কেবল ইহাই নয়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মিকা উৎসবের উপাসনার সময় এবং বার্ষিক সভার দ্বিতীয় দিনে যে রবীন্দ্র-নিন্দা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসহ্য! বড়ই আশ্চর্য্য, উহাঁকেই আবার যুবকেরা সম্পাদকত্বে নির্ব্বাচিত করিবার সহায়তা করিয়াছেন। এবারকার উৎসবে বড়ই খটকা লাগিয়াছে—এত স্ত্রীশিক্ষা এদেশে বিস্তৃত হইল, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলা-উৎসবে পুরুষ আচার্য উপাসনা করিলেন, মেয়েরা পারিলেন না; দ্বিতীয়টী এই,—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নাকি অনেক শিক্ষিত এবং গুণী মানী ব্যক্তি আছেন, কিন্তু নূতন নগরকীর্ত্তন রচনা করিতে পারেন না! তাঁহারা বড়াই করিয়া বলেন, প্রতিভা চাই না, তাহাতে অমঙ্গল হয়! শিক্ষার যে কি সুফল ফলিতেছে, বুঝি না। তবে সব মাথা কি গোময়পূরিত করিতে হইবে? উদ্ধৃত স্থান কয়টী অবিকল এই—

(ক) "সমাজের সম্বন্ধে এই কথাটা আমাদের স্মরণে থাকে না বলিয়াই আমরা বলপ্রয়োগে সমাজের মূল প্রকৃতি বিনষ্ট করিয়া তাহাকে আপনাদের ইচ্ছানুরূপ করিয়া গড়িতে অগ্রসর হই; বুঝি না যে, এরূপ না করিয়া সে সমাজ পরিত্যাগ করা ও মনোমত কোন সমাজে যোগ দেওয়া অথবা নূতন সমাজ গঠন করাই কর্ত্তব্য।"

(খ) "সর্ব্বপ্রযত্নে জীবন পোষণ ও রক্ষণ এবং প্রাণনাশক শত্রুদিগের দূরীকরণই যেমন প্রত্যেক অঙ্গের একান্ত কর্ত্তব্য, তেমনি সমাজের মূল প্রকৃতিকে পরিপুষ্ট ও সংরক্ষিত করা এবং তদ্বিরোধী প্রাণঘাতী শত্রু-দিগকে বিদূরীত করাই সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য।"

(গ) "আজ যদি সেই দীপ্যমান অনলোপম তেজঃপুঞ্জ শুদ্ধতনতায় স্বর্গধাম হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, * * কিন্তু তাঁহাকে কখনই ব্রাহ্মসমাজের সভ্যপদে বরণ করিব না।"

এইরূপ খ্রীষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

কেমন ভাষ, কেমন ভাব, কেমন রচনা! যুবকদিগকে সমাজ ছাড়িতে উপদেশ দিতেছেন! বলিহারি যাই—এরূপ ধৃষ্ট ব্যক্তিরাই নেতা এবং নাকি প্রেম জৃম্ভণ করেন! দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথকে সমাজে বহুবার আচার্য্য ও বক্তারূপে বরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু আজ মাননীয় সভ্য পদ দিতেও আপত্তি! রবীন্দ্রনাথকে এইরূপে অপমানিত হইতে যাঁহারা অবসর দিলেন, তাঁহাদিগকেও শত ধিক্কার দিতেছি।

(৫৩)

বাঙ্গালা সাহিত্যের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত, নিম্নলিখিত বিষয় পাঠে সকলে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ইহা পাঠ করিয়া কেহ কি এক বিন্দু অশ্রু ফেলিবেন?

"অনেকগুলি বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির নাম ও উহাদের প্রণেতার নাম সাধারণ্যে সম্যক্ প্রকাশ না থাকায় সময়ে সময়ে কোন কোন নাট্যশালার কর্তৃপক্ষকে অভিনয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির নাম প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য ঐ সকল পুস্তকগুলির নাম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম:—

১। সিরাজউদ্দৌলা (প্রণেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ২। মীরকাসিম (প্রণেতা ঐ) ৩। ছত্রপতি শিবাজী (ঐ) ৪। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) ৫। নন্দকুমার (ঐ) ৬। কর্ম্মফল (মনোমোহন গোস্বামী) ৭। সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয় (হারাধন রায়) ৮। রণজীতের জীবন যজ্ঞ (হরিপদ চট্টো) ৯। মীরা উদ্ধার (হারাধন রায়) ১০। দুর্গাসুর (হরিপদ চট্টো) ১১। মাতৃপূজা (কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী) ১২। সমাজ (মনোমোহন গোস্বামী) ১৩। সংসার (ঐ) ১৪। আশাকুহকিনী (অমরদত্ত) ১৫। আহামরি (ঐ) ১৬। হ'লকি (সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু) ১৭। চন্দ্রশেখর (অমৃতলাল বসু) ১৮। শরৎ সরোজিনী (দুর্গাদাস দাস) ১৯। হরিশ্চন্দ্র নাটক (৺মনোমোহন বসু)।

এই সকল পুস্তকগুলির মধ্যে ১১ নং ১২ নং ১৫ নং ১৭ নং ও ১৮ নং পুস্তকগুলি ব্যতীত বক্রী সমস্ত পুস্তক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তক কোন লাইব্রেরীতে রাখাও উচিত নহে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির অভিনয় আপত্তিজনক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোনও বিশেষ কারণ বা উদ্দেশ্য না থাকিলে এই সকল পুস্তকের অভিনয় করা চলিবে না।

১। দাদা ও দিদি (ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ) ২। রাণাপ্রতাপ। ৩। দুর্গাদাস ৪। মেবারপতন (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) ৫। নীলদর্পণ (৺দীনবন্ধু মিত্র) ৬। পদ্মিনী (হরিপদ চট্টো) ৭। প্রতাপাদিত্য (ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ) ৮। পৃথ্বিরাজ। ৯। রোসেনারা ও শিবাজী (মনোমোহন গোস্বামী) ১০। রাজারাম বা বীরপূজা (হরনাথ বসু)।

ইহা বাদে আরো কত পুস্তক যে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বৈরাগ্যশতক। *

প্রকাশ যাঁহার শুধু অনুভবে হয়,
দিক্ কালে নাহি হয় বিভাগ যাঁহার,
অনন্ত, চিন্ময় যিনি শুদ্ধতেজোময়,
শান্ত মূর্ত্তি ব্রহ্মে সেই করি নমস্কার। ১।

মাৎসর্য্য-আচ্ছন্ন হায় সুপণ্ডিতগণ,
গরবপূরিত সদা ধনাঢ্য নিকর,
অবোধে নিমগ্ন রহে সাধারণ জন,
সুকাব্যের তাই দেখি না হয় আদর। ২।

সংসারের গতি আমি না দেখি মঙ্গল,
সুকর্ম্মেরও পরিণাম দেখি' হয় ভয়,—

* কবিবর ভর্ত্তৃহরি প্রণীত।

WATER DAMAGED.

পুণ্যবলে সমর্জ্জিত বিষয় সকল
অবশেষে দুঃখরূপে পরিণত হয় ;—
চিরদিন তরে রহি' বিষয় মোহিত
হায় রে মানব হয় ব্যসন পীড়িত। ৩।

করেছি ভ্রমণ বহু দুরগম স্থানে,
লভি নাই আজিও তো কিছুমাত্র ফল!
সেবিনু ধনিরে, ত্যজি' জাতিকুল মানে
হায়রে সে সব মোর হয়েছে বিফল!
করেছি ভক্ষণ, মান করি পরিহার
পরগৃহে আশঙ্কিত বায়সের প্রায়!
ক্রূর-কর্ম্মপরায়ণে লালসে আমার
আজিও সন্তুষ্ট নও, বাড়' পুনরায়? ৪।

নিধিলোভে ক্ষিতিতল করেছি খনন,
অনলে করিনু দগ্ধ গিরি ধাতু চয়ে,
নদীপতি উত্তরিয়া করেছি গমন,
যতনে তুষিনু আমি নৃপ সমুদয়ে!
কত নিশা শ্মশানেতে করেছি যাপন
তৎপর হইয়া আমি মন্ত্র-আরাধনে,
কাণা কড়ি মাত্র লাভ না হল কখন ;
হে লালসে, ত্যাগ মোরে করহ
এক্ষণে! ৫।

হৃদি হতে উঠে বাষ্প,—চাপিয়া তা'সবে
কত হাসি হাসিয়াছি হায় শূন্য মনে
মূঢ়ের কুবাক্য কত সহেছি নীরবে
যোড় করে তা'সবার ভুলায়েছি মনে।
মিছে আশা! আশা তাই বলি গো
তোমায়,
আর কেন বৃথা তুমি নাচাও আমায়? ৬।

ভোগ নাহি ভুঞ্জিলাম কখন জীবনে,
মোসবারে ভোগ দেখ করিল সকলে,
তপঃ নাহি তপ্ত হল কখন যতনে
মোরা শুধু তপ্ত হনু সংসার-অনলে।
আমরাই যাই, দেখ, কাল নাহি যায়
তৃষ্ণা জীর্ণ নহে,—জীর্ণ মোরা
শুধু হায়! ৭।

অঙ্কিত পলিতে এবে শিরঃ মম হায়
বলিতে আক্রান্ত হল বদন মণ্ডল,
শিথিল হয়েছে দেখ অঙ্গ সমুদায়
তরুণ হতেছে মম লালসা কেবল! ৮।

ভিক্ষায় অর্জ্জন করি নীরস আহার,
দিনান্তে বারেক মাত্র করি তা' ভোজন,
নিজদেহ মাত্র এবে মম পরিবার
নিদ্রাগমে করি আমি ভূতলে শয়ন।
জীর্ণ শত খণ্ডে ম্লান কন্থা নিরমিয়া
তাহা পরি' করি আমি লজ্জা নিবারণ,—
হায় রে এমন দশা মাঝারে থাকিয়া
নারিনু বাসনা কুল করিতে নিধন! ৯।
দাহ-পীড়া না জানিয়া—দীপ্ত হুতাশন
দেখি' ধায় তা'র মাঝে পতঙ্গ মোহিত,
না জানিয়া মীন হায় করয়ে ভক্ষণ
সুতীক্ষ্ণ বড়িশে—মাংসখণ্ড-আচ্ছাদিত।
মোহের মহিমা কিবা! বিপদ-জড়িত
জানিয়াও রহি মোরা কামেতে
মোহিত! ১০।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

প্রিয়তমা দয়িতা।

ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে বসন্তের বীণা,
সকরুণ দৃষ্টি তা'র নিরাশা জাগায়;
মরম পরশে তা'র প্রতি অশ্রু-কণা,
অঙ্গের সৌরভ বহে মলয়ের বায় ;
রজত কৌমুদী-স্নাত পূর্ণিমা নিশিতে,
বিকচ কুসুম-দাম জড়াইয়া কেশে ;
শান্ত, স্নিগ্ধ, নিরমল অমিয় হাসিতে,

অক্ষয় সঙ্গীত লিখে একটি নিমেষে;
দিবসের কর্ম্ম-ক্লান্ত ক্ষীণ তনুখানি
সন্ধ্যায় ঢালিয়া যবে বিশ্রাম-শয্যায় ;
জীবন-যুদ্ধের কথা মনে মনে গণি,
সযত্নে সে কাছে বসি' পরাণ জুড়ায় ;
বিষাদ-তাপিত হৃদে ঢালে শান্তি-জল।
সে আমার প্রিয়তমা দয়িতা কেবল॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ শর্ম্মা মজুমদার।

দেবী কমলকামিনী রায়চৌধুরী।

কীর্ত্তন—একতালা।

ধন্য বঙ্গনারী মহিমা তোমারি
ভগিনী কমলকামিনী!
কে বলে মানবী? তুমি যে গো দেবী,
নারীকুলে তুমি রাণী।
প্রেম দিতে এলে, সেবা ক'রে গেলে,
প্রেমে তুমি অনুপম ;
প্রেম তব কান্তি, প্রেমে তব শান্তি,
প্রেম পরম-ধরম।
অন্নপূর্ণা সম "আনন্দ আশ্রম"
অন্নদানে ধন্য ক'রে,
(দিলে) বিলাস-বাসনা, সকল কামনা
পূর্ণাহুতি ধ'রে ধ'রে।
(সবা স্বজ্ঞানলে)
দয়াময় নাম যপি অবিরাম
অভয় চরণ পেলে,
নাম-ব্রত ধ'রে আমাদের তরে
পদ-চিহ্ন রেখে গেলে।
(ভবপারে যেতে)

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩২৪।

পূজারিণী।

কোন হেমন্তের এই সোনালী সন্ধ্যায়,
লীলা চঞ্চল নেত্রে আনত আননে,
সাজাইয়া অর্ঘ্য রাশি সৌন্দর্য্য ছটায়,
সান্ধ্যদীপ খানি জ্বালি সন্ধ্যার বরণে,
জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহলক্ষ্মী অয়ি সদাস্নাতা,
আসিতে পূজিতে তব প্রাণের দেবতা!
রক্তাম্বর অসংযত ঘন কেশ রাশ,
চন্দন চর্চ্চিত ভাল ভক্তিগীতা করে,
কাম গন্ধহীন প্রেম নহে রিপু দাস,
রূপ মুগ্ধ নহে কভু মদিরার ঘোরে,
প্রেম-পূজারিণী বসি অজিন আসনে
ঢালিতে প্রেমের অর্ঘ্য প্রেমময় পায়,
ধ্যান মগ্ন আঁখি দুটী যেন তাঁর ধ্যানে,
কহিত অন্তর ব্যথা নীরব ভাষায়।
মন্দিরে দেবতা আছে জ্বলে সন্ধ্যা দীপ
নন্দনের গন্ধে ফোটে পায়ে তাঁর নীপ,
আরতির কালে বাজে মঙ্গল রাগিণী,
নাই নাই পূজারিণী বলে প্রতিধ্বনি।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

জাতিভেদ।

যুগ যুগান্তর গেল বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য এল
কত মহাজন আসি ঘোষিল বারতা
কেহ নয় ছোট বড় নাহি লোকে ভেদাভেদ
সকল মানব জাতি লভুক একতা।
শাস্ত্র বলে নাবিশেষ বর্ণে বর্ণে নাহি দ্বেষ
সকলেই ব্রাহ্ম, সবে ঈশ্বর-নন্দন।
দেশ দেশান্তর হতে ঘোষণা হল জগতে
জোর করি ভেঙ্গে দিল জাতির বন্ধন।
কত যুদ্ধ কত হত্যা শিহরে ভাবিলে কথা
হল এ হিন্দুর দেশে সাম্য লাভ তরে!
না উঠিল নীচ জাতি ঘুচিল না ভেদনীতি
না হইল লোক প্রীতি ভারত ভিতরে।
দিন দিন এই হেতু না হইল সেই সেতু
যাহা হতে স্বর্গে মর্ত্ত্যে হবে পূর্ণযোগ।

ভাইকে চেনে না যারা আত্ম অভিমানে হারা
যত দিন এ ধরায় ভুঞ্জে কর্ম্মভোগ।
এখনও উঠিবে না ভেদাভেদ ঘুচিবে না,
এখনও কি উচ্চ নীচ রহিবে না গণনা।
কোথা ছিল কোথা গেল ধরায় জাতি সকল
আমরা পড়িয়া রব না লভি চেতনা।
সবে বলে উঠ উঠ ভেদাভেদ ভুলি জুঠ
কিন্তু দেখ একজন (ও) না উঠিতে চায়।
সবে বলে হায় হায় মুখেতে মারিতে চায়
কাজের সময় কেহ কথা নাহি কয়।

হায় রে একি জড়তা মরণের অবশতা
করিয়াছে অবসন্ন এই হিন্দু জাতি।
মূঢ়তা সুরার ঘোরে মূর্খতার হীন ক্রোড়ে
নাহি শুনে যে আহ্বান উঠে দিবারাতি।
উঠ পুনঃ শ্রীচৈতন্য হরিনামে করি ধন্য
সাম্য অসি করে ধরি নাশ ভেদাভেদ।
নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধ এই মহা কর্ম্ম,
উঠাও ভারত জাতি করি বঙ্গচ্ছেদ।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

নব্যভারতের পাঠকদের নিকট নিবেদন।

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালা দেশে আগমন করিয়া এবং বাঙ্গালার পূর্ব্বতন লোকদের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণে ও কায়স্থ জাতিতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষতা স্থাপন করিতে হইলে তেমনি আধুনিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে যৌন সম্বন্ধের সীমা এবং পাংক্তেয়তার পরিধি বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে সকল জাতির লোক বিশুদ্ধ কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ ও শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করা কর্ত্তব্য, এবং তাহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করা উচিত। কৃষিজীবী বারুই ও কৃষিজীবী নমঃশূদ্রে বিভিন্নতা কোথায়? চাকুরি-জীবী কায়স্থ ও চাকুরীজীবী মাহিষ্যে কি বিভেদ? জমিদার বৈদ্য এবং জমিদার সুবর্ণবণিকে কি বিভেদ? ব্রাহ্মণ বণিকে এবং সাহা বণিকে কোথায় তারতম্য? বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধুতা, সচ্চরিত্র, সদাচার, এবং ভগবদ্‌ভক্তি কোনও জাতের একচাটিয়া (নিজস্ব) সম্পত্তি নয়। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে দেশের সকল লোককেই সঙ্গী ও সহায় করিতে হইবে। জনকয়েক ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের রাজত্ব সময়ে দেশে একাধিপত্য করিতেছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজী অতি সহজেই তাঁহাদের হস্ত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লইলেন। পাঠান ও মোগলেরা জনকয়েক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সাহায্যে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন; ইংরেজেরা বিনা আয়াসে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া রাজত্ব স্থাপন করিলেন। ইংরেজেরা জন কয়েক দেশী লোককে ইংরেজী শিখাইয়া এই ১৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন; কিন্তু এই প্রকার রাজত্ব বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়া তাঁহারা আপনা হইতেই ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোককে দেশ শাসনে এবং দেশ রক্ষা কার্য্যে যোগ দিবার জন্য নূতন রাজনীতি প্রচলনের প্রয়াসী হইয়াছেন। ভারতবর্ষবাসী ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা এই প্রয়াসের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই বিরুদ্ধাচরণ

অতি সামান্য কথা নয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া ভারতবাসীদের জন্য যে সাম্যনীতির ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইহারাই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দেন নাই। শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা এই সকল ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীর সমকক্ষ নহেন, এই ৫০ বৎসরে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ৭॥ কোটি লোকের বাস: তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা সংখ্যায় ২৫ লক্ষও হইবেন না। অবশিষ্ট ৪। কোটি লোককে অবহেলা করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত গান্ধি মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত লোকেরা দেশের অন্যান্য লোক হইতে দিন দিন একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছেন। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র ইংরেজী-শিক্ষিত দেশী সম্প্রদায়ও তেমনি দেশের অবশিষ্ট লোক হইতে স্বতন্ত্র জাতি বা শ্রেণী হইয়া পড়িতেছেন। ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। নতুবা স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল বা স্বাধীনতা বা সাম্যলাভ করিলেও আমরা তাহা অনেকদিন রাখিতে পারিব না। দেশের ৪। কোটী লোককে বাদ দিলে অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ লোক কখনই দেশ রক্ষা ও দেশ শাসন করিতে পারিবেন না। এজন্য যে সকল জাতি এবং শ্রেণী বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত, তাহাদের সহিত যাজন, যৌন সম্বন্ধ এবং পাংক্তেয়তা (একত্রে পান ভোজনের) নিয়ম করিয়া দেশের সকল লোকের মধ্যে আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের পক্কান্ন আহার করিতেছেন, তাহাদের কাহারও জাতি নাশ হয় নাই। সুতরাং কায়স্থ ও নবশাখেরা যদি সুবর্ণবণিক ও নমঃশূদ্রাদির পক্কান্ন আহার করেন, অথবা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করেন, তবে তাহাদের জাতিনাশ হওয়া উচিত নয়। যে সকল পুরোহিত বাণিজ্যজীবী তিলির এবং কৃষিজীবী সদ্গোপের এবং শিক্ষাজীবী কুম্ভকার ও তন্তুবায়ের যাজন করেন, তাঁহারা যদি বাণিজ্যজীবী সাহা ও সুবর্ণবণিকের, কৃষিজীবী মাহিষ্য ও নমঃশূদ্রের এবং শিল্পজীবী সূত্রধর এবং যোগীর যাজন করেন, তবে তাঁহারা দেশের মহোপকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানের জল গ্রহণ এবং মুসলমান পাচকের পক্ক "কালিয়া কোরমা" অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যুবক আহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারও তো তজ্জন্য জাতিভ্রংশ হয় না। যে কাজ ধীরে ধীরে চলিতেছিল, এখন তাহার গতি দ্রুততর করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ ও নবশাখ দেখিয়া অনেক অভিমানী ব্রাহ্মণ "শূদ্র ক্ষুদ্র, কাকবিষ্ঠা" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। এখন আর এমন কথা কোন ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বাহির হয় না। ইহা দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। ব্রাহ্মণেরা কায়স্থ ও নবশাখকে যে প্রকার উন্নত পদবীতে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে আদর করিতেছেন, সাহা, শুঁড়ি, জুগী, ছুতার, পোদ, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী প্রভৃতি তথাকথিত শূদ্র জাতি সমূহকেও তদ্রূপ লেখাপড়া শিখিতে সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের যাজন করিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করুন। এই প্রকার প্রার্থনা করা কি অন্যায়? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই সকল জাতির উন্নতি জন্যই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণকুলে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহা ত বাঙ্গালা দেশে নির্ম্মূল হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা সাহা, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতির সহিত আবার প্রেমালিঙ্গন দিউন, এবং "জয় শ্রীচৈতন্য" ধ্বনি বাঙ্গালার প্রতি গৃহে উচ্চারিত হউক, নব্যভারতের পাঠকদের নিকট আমার এই নিবেদন।

শ্রীশ্রী[illegible] দত্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩২। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ। প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীযোগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মূল্য ॥০। নিবেদনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"জাতিভেদ বা চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে গুণকর্ম্মানুযায়ী,—মানুষেরই সৃষ্ট—সমদৃষ্টি ভগবান যে কাহাকেও বড় বা কাহাকেও ছোট করেন নাই, মানুষ আপন আপন গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়াছে মাত্র—এই ধারণা লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোকের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্যই ইহার প্রণয়ন ও প্রচার।" গ্রন্থকার অসাধারণ শক্তি লইয়া নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। স্থানে স্থানে অত্যধিক কঠোরতার পরিচয় পাইয়াছি বটে, কিন্তু উদারতার পরিচয়ে সে সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। গ্রন্থকারের ক্ষমতা অসাধারণ, গবেষণা গভীর হইতেও গভীর। সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইলে আমরা সুখী হইব।

৩৩। ব্রাহ্মণ্য-সাধনা। দিল্লী ব্রাহ্মণসভার মহাধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর-রায় বাহাদুর-প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵০।

ক্ষুদ্র বক্তৃতা, কিন্তু ভাল ভাল কথা আছে।

৩৪। নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

ইহাতেও ভাল ভাল কথা আছে, কিন্তু বড়ই বিস্তৃত। সংক্ষেপে সার কথা বলার অভ্যাসটা ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত।

৩৫। যোগশাস্ত্রের বর্ণপরিচয়। প্রথম ভাগ। সাধক শ্রীহরিশ্চন্দ্র প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ২৲।

সাধকের ক্ষুদ্র পুস্তকের এত মূল্য, ভাবিতেও কষ্ট হয়। পুস্তকের একস্থলে আছে,—"ধরে মোটামুটি ধর্ম্ম অর্থে পাঠক এইটী মাত্র বুঝিবেন যে, প্রকৃতির নিয়ম পালনাদি দ্বারা নিজ শরীর ও মনের উন্নতি-সাধন হয়, তজ্জন্য প্রকৃতিদেবীকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা অর্চ্চনা অর্থাৎ তাঁর নিয়মাদি পালন করা কর্ত্তব্য। এতদর্থে কঠোর ক্রিয়ার দ্বারা, যেমন শরীরকে কষ্ট দেওয়া অবিধি, উপবাসাদি ও মাদক দ্রব্য সেবন এবং অশাস্ত্রীয় মতে শরীর ক্ষয়কারী ইন্দ্রিয়সুখ সাধনা, অবিধি। সেগুলি আত্মহত্যারূপ মহা পাপ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে।"

পুস্তকখানিতে অনেক সুচিন্তিত কথার সমাবেশ আছে। পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম।

৩৬। প্রবাসীর প্রত্যাগমন। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মূল্য ১৲। ৭২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য ১৲ বড় বেশী বোধ হয়। পুস্তকখানির লেখা সুমধুর।

৩৭। সাধনা-সোপান। By John A. D. Khan, মূল্য ॥৵০।

এই পুস্তকখানিতে ২৪টী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মহা সাধকের এই সুচিন্তিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। পুস্তকখানিতে সাধনার অনেক নিগূঢ় কথা সরল বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩৮। বনমালা। শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত, মূল্য ৷৹। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি উপদেশপূর্ণ।

৩৯। জোয়ার। কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ॥০। হেমচন্দ্র একজন স্বভাবকবি; তাঁহার রচিত গান গাইয়া বরিশালের মুকুন্দ দাস সর্ব্বত্র-আদৃত। একটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

"সাধ যদি ভাই দেখ্‌বি সীতায় দ্যাখ্‌
বাঙ্গালীর ঘরে
আর কোনো ধন নাইরে তাদের সীতায়
আছে ভরে।
ছায়া-ঢাকা স্নেহ-মাখা পল্লী মায়ের কোল জুড়ে
সেথায় দেখ্‌বে আছে সীতা নগর হতে কত দূরে,
নিঃস্ব তবু বিশ্বে তারা সীতার গরব করে।
যূথীর মত কোমল মৃদু, লাজে সঙ্কুচিতা
তোরা নগর থেকে নির্ব্বাসিতা আত্মপ্রচার-ভীতা
যাদের রতন অন্ধ তারাই কি চিনিবে পরে?

ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ।

অতীতের মোহ এবং বর্ত্তমানের আত্মতৃপ্তিকে ভুলিয়া আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীকে সুকঠিন এবং সুগভীর তপস্যায় বসিতে হইবে, তবেই আমরা ভারতের ভবিষ্যশিশুকে জন্ম দিতে সক্ষম হইব। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ আমাদিগের আবালবৃদ্ধবনিতার তপস্যার অপেক্ষা করিতেছে। সুকঠিন এবং সুগভীর তপস্যা ব্যতীত সুমহান সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই. ব্রহ্মচারী এবং ঋষিদিগের তপস্যার ফলেই অতীতের ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার সেই সুমহান অতীতকে ভবিষ্যতের সম্মুখীন করিতে হইলে তদপেক্ষাও সুকঠোর তপস্যা ব্যতীত সফলকাম হইবার উপায় নাই।

আমাদিগের বর্ত্তমান নাই; বর্ত্তমানে আমাদিগের নির্ব্বেদ অবস্থা। বৌদ্ধযুগ হইতেই আমরা আমাদিগের প্রকৃত অতীতকে হারাইয়াছি। বৌদ্ধযুগ হইতে জাতি হিসাবে আমরা যেন একটা নির্ব্বেদ অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি—এই এত বৎসরকাল কেবল আমরা প্রতিবেশ-প্রভাবের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছি, তাহাতে আমাদিগের আত্মপ্রভাব এবং পিতৃপ্রভাব খুব অল্পই মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে। বড় আশার কথা এই যে, বর্ত্তমানে আমাদের কিছু না থাকিলেও, এই বর্ত্তমানেই আমরা আমাদিগের ভুল বুঝিয়া আবার আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছি—আপনাকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য দেশব্যাপী একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! আবার নির্ব্বেদ অবস্থা হইতে উঠিবার জন্য ভারতবাসীর আকুল আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগের আত্মপ্রভাব এবং পিতৃপ্রভাব খুব অল্পই বিদ্যমান আছে, এতদিন ধরিয়া একমাত্র প্রতিবেশপ্রভাবই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিতেছে। যিনি যত বড়ই ধর্ম্মান্ধ হউন না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জাতি হিসাবে আমাদিগের বহুদিন হইতে জাতি গিয়াছে। এত বড় জাতিভেদের দেশে ভারতবাসীর যে জাতি নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

আমাদিগের একটা মস্ত ভুল যে, কেবল মাত্র আহার বিহারকেই আমরা জাতিভেদের মুখ্য কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং চতুর্ব্বর্ণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই এই জাতিভেদকে ধরিয়া রাখিয়াছি। ইহা আমাদিগের মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজ যদি আমরা জাতি হিসাবে বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে এই জাতিভেদরূপ জালকে ভারতবর্ষের ভিতরে না ফেলিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে ফেলিতে হইবে। ভারতবাসী এক, ভারতবাসীর মধ্যে ভেদাভেদ নাই, ভারতবর্ষের বাহিরে ভেদের আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে গঠিত করিতে হইলে ভারতবর্ষের ভিতর হইতে জাতিভেদকে সর্ব্বাগ্রে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং জাতীয়তাকে সাগ্রহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বিশেষতঃ নির্ব্বেদ অবস্থায়, বিশৃঙ্খল অবস্থায় জাতিভেদ থাকিতেই পারে না। অগ্রে জাতীয়তা, পরে জাতিভেদ! অগ্রে সকলকে এক হইতে হইবে, তাহার পর কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মই পৃথক করিয়া দিবে। এই ভারতবর্ষের অণু পরমাণু হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত

সংই ব্রহ্ম, এই উদার ভাব লইয়া ভারতের নরনারীকে আজ অতি গভীর ভাবেই ধরিতে হইবে, এই মহাদেশের নিকৃষ্ট চণ্ডালকেও, গলিত কুষ্ঠকেও স্পর্শ করিলে জাতি যায় না, এই জন্মভূমির সবই পবিত্র, এই মহাভাব হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে।

কর্ম্মই তোমাকে আমাকে পৃথক করিয়া দেয়—কর্ম্মই উচ্চে তুলিয়া ধরে, আবার কর্ম্মই নীচে ফেলিয়া দেয়। এমন যে কর্ম্ম, তাহাকেই আমরা অবহেলা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশে বাধা জন্মাইতেছি। আমার আত্ম-প্রভাবের মধ্যে যেমন জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম লুকাইয়া রহিয়াছে, আমার ইহ জন্মের মধ্যেও ওই কর্ম্মেরই প্রভাব ক্রীড়া করিতেছে, আবার আমার জাগতিক সংসর্গেও ওই কর্ম্মই আমাকে ঘুরাইতেছে। যখন কর্ম্মই সব, তখন কতকগুলি বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর ফেলিয়া সেই কর্ম্মকেই চাপিয়া রাখিয়াছ কেন? যাহা ক্ষণকালের জন্য চাপিয়া রাখিয়াছ, জান না কি, তাহাই আবার তোমাকে অনন্তকাল ধরিয়া জ্বলাইবে?—পুরুষানুক্রমে ব্যথিত করিবে? অতএব ভগবানের নিয়মে যে কর্ম্ম মাথা তুলিতে চাহিতেছে, তাহাকে তোমার মনগড়া জাতি ও জন্মের মধ্যে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিতেছ কেন?

আমি কে?—আমি কর্ম্ম—আমি মূর্ত্তিমান কর্ম্মফল!—আমার কর্ম্মের কাছে আমার প্রাপ্ত এই দেহ কতটুকু—আমার জাতি ও জন্ম কয়দিনের? কর্ম্মই আমাকে করাইয়া লয়। আমার মূঢ় অহংটাকে তুমি কষ্ট দিতে পার অপমান করিতে পার! কিন্তু, সেটা কয় দিনের? কিন্তু আমার ভিতর যাহা জলিতেছে, তাহাতে হাত দিলে, তাহাকে বাধা দিলে, তুমিও যে ক্লেশ পাইবা থাক তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? তাই বলি, আমার ভিতর হইতে যেটা বাহির হইবার জন্য আকুল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেইটাকে তোমার গর্ব্বিত আভিজাত্যের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিও না। প্রবাহের পথ রুদ্ধ করিয়াই ভারতবর্ষ আজ এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে।

উত্তরাধিকার কি সব সময়ে সফল হয়? পূর্ব্ব পুরুষ ও পিতামাতার গভীর তপস্যা ব্যতীত উত্তরাধিকার সফল হয় না। তাহা হইলে পণ্ডিতের ছেলে মর্কট হইয়া জন্মিত না ও মৎস্যগন্ধার পুত্র বেদব্যাস হইত না। পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় যদি উত্তরাধিকারকে সফল করিতে চাও, তবে পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় তপস্বী হও।

অসংযমীর উত্তরাধিকার দুর্লভ! অসংযমীর আভিজাত্য গর্ব্ব আত্মপ্রতারণা মাত্র! ছিল একদিন যেদিন ভারতবর্ষের পিতা মাত্রেই অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত তীব্র নিয়মাবলম্বন করিতেন, সময়মত নিয়মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইতেন। পতিব্রতা সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি এইরূপ করিয়াছিলেন—অতি অল্প তপস্যার ফলে সাবিত্রী সত্যবানকে জীবিত করেন নাই। উত্তরাধিকারের সার্থকতা এইখানেই! বৈদিক যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অঙ্গরূপ ছিল; তখন বিবাহের মন্ত্রে স্বামী বলিতেন "আমাদিগের উভয়ের বেশ সংযম করিতে হইবে; পরে যথা সময়ে পুত্রোৎপাদন করিয়া আনন্দানুভব করিব।" আগে পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পুত্রোৎপাদন করিতে হইত। এখন প্রজনন ব্যাপার স্বেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। জানিতে হইবে, যেদিন ভারতবর্ষ হইতে সংযম চলিয়া গিয়াছে, সেদিন হইতে উত্তরাধিকারও গিয়াছে।

পূর্ব্বে, সৃষ্টিকার্য্যে পিতামাতার একটা লক্ষ্য ছিল, তাই তাঁহারা পুত্র অথবা কন্যা নিজ ইচ্ছামত সৃষ্টি করিতে পারিতেন, আর এখন প্রজনন কার্য্য অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, যথায় তথায় লাগিলেই হইল। তাই ভাল পিতামাতারও মন্দ পুত্র কন্যা জন্মিতেছে। অপত্যোৎপাদন কালে কেবল পিতামাতার স্বাস্থ্যই যথা সর্ব্বস্ব নহে, তৎকালীন মানসিক অবস্থাও অপত্যের প্রকৃতির কম নিয়ামক নহে। গীতায় যেমন ভগবান বলিয়াছেন, মৃত্যুকালে মানুষ যাহা চিন্তা করে তদগতি প্রাপ্ত হয়, অপত্যোৎপাদন কালেও পুত্র কন্যা পিতামাতার চিন্তার অনুরূপই হয়। এককালে এই ভারতবর্ষে প্রজনন-বিজ্ঞান এমনি উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে, তৎকালীন ঋষিগণ বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—

"তেজো বৈ পুত্র নামানি"

আর আজ তেমনই অবনতি! জগতে যত প্রকার সমস্যা আছে, তন্মধ্যে সমাজ-সমস্যাই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহার সুমীমাংসা কোন দিন হয় নাই, হইবেও না। কারণ, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন সামগ্রীই একভাবে বসিয়া নাই। নিত্য নব নব প্রয়োজন ও অভাব আসিয়া আমাদিগের দ্বারে করাঘাত করিতেছে। আমি আজ যাহা আছি, কাল তাহা নাই। অথচ এই নিত্য পরিবর্ত্তনের মালার মধ্যেই অনন্ত প্রত্যাবর্ত্তনের একটা সূত্র চলিয়া আসিতেছে! আমি নবীন হইয়াও প্রাচীন গুণে গুণবান্, পুঞ্জীকৃত অতীতের স্তূপের উপর আমার বর্ত্তমান দণ্ডায়মান রহিয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও আমি অতীতকে এড়াইতে পারি কই? আমি যে আত্মপ্রভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছি, তাহাতে আমার পিতামাতার কোন হাত নাই, আমার প্রতিবেশীরও কোন হাত নাই, তাহার ফলভাগী কেবল আমি, আমার অতীত! আমার অতীত যে কত দেশ ও জন্ম জন্মান্তরকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা এমন কি, আমারও স্মরণ নাই, আমি সেই অতীতের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া চলিয়াছি—কার সাধ্য সেই অতীতকে আমার রোধ করে? পাপ ও পুণ্য, দণ্ড ও পুরস্কার, অতীত আমাকেই দিতেছে। তাহাতে পিতামাতা ও প্রতিবেশীর কতটুকু অধিকার? আত্মপ্রভাবই আমার অদৃষ্টাকাশে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে—বংশ ও প্রতিবেশ প্রভাব তাহার কাছে জোনাকীর আলোর মত মিটমিট করিতেছে। একমাত্র আত্মপ্রভাবেই মানবের মুক্তি, আমি ছাড়া, আমার চারিদিকের যাহা কিছু, সকলেই আমাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, আমার জীবনের বন্ধন ও বাধা উহারাই। আমি যে উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছি, উহারা আমাকে উহাদের মত করিবার জন্যই সতত তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। সমাজ সমস্যা এইখানেই, সমাজ এইখানেই জটিল ও কুটিল হইয়া পড়িয়াছে। আজ যাহারা উঠিতে চায়, অগ্রসর হইতে চায়, তাহাদিগকে চাপিয়া না রাখিয়া তাহাদের জন্য সমাজের সহস্র দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। আজ সমাজকে ব্যক্তি কি চায়, ব্যক্তির অভাব ও অভিযোগ কোথায়, তাহার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উদাসীন ভারতবর্ষ এতদিন ধরিয়া ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই বলিয়াই আজ এতদূর অধঃপতিত! ব্যক্তিকে পদে পদে বিদ্রোহী করিয়াই সমাজ এত ক্ষতিগ্রস্ত।

সমাজ ব্যক্তির বিকাশের সহায়তা করিবে—ব্যক্তিকে বাধা দিবে না। এ দিকে ব্যক্তিও সমাজকে সম্মান করিয়া চলিবে। সমাজ পিতারও পিতা, ব্যক্তি পুত্রেরও পুত্র! ব্যক্তির বলিতে সমাজের পরিপুষ্টি, জাতির পরিপুষ্টি। যে ব্যক্তি সমাজের অঙ্কে আপনার ছাপ মারিয়া যাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সমাজপতি! একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে সমাজের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাও তেমনি প্রয়োজন। আমি আসাতেই সমাজের সকলকে সরিয়া বসিতে হইয়াছে, আমার বিকাশের জন্য তাঁহারা কতই না ক্লেশ এবং অসুবিধা স্বীকার করিয়াছেন। আমি একদিনে ত আর এত বড় হই নাই, আমাকে সকলের নিকট ঋণ করিয়া এত বড় হইতে হইয়াছে। সেই ঋণ আমাকে পরিশোধ করিতে হইবে—এই সুমহান্ ভাব লইয়া ব্যক্তিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার বলিতেই সমাজের পরিপুষ্টি! আমার ত্যাগেই জাতির পরিপূর্ণতা! আজ যে বড় বড় জাতির জয়পতাকা দেখিতে পাইতেছি, ইহাদিগের ভিত্তিমূলে ব্যক্তির ত্যাগের পরাকাষ্ঠা কি কম? সমাজকে বড় করিয়া ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে হইবে, তবে ত ব্যক্তি চিরস্মরণীয় হইয়া সমাজবক্ষে বিরাজ করিতে পারিবে। এক দিকে ব্যক্তির বিকাশের জন্য যেমন সমাজকে সহায়তা করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি সমাজের জন্যও ব্যক্তিকে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে! ব্যক্তি ত ভিখারী হইয়া আসিয়াছে! সমাজের নিকট আত্মোন্নতি কল্পে সে যে আজন্ম ঋণ করিয়া আসিয়াছে, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য তাহার পুরুষোত্তমের বলির প্রয়োজন। এতদিন কেবল survival of the fittest নীতির অনুসরণ করিয়া জীবনটা মরণের হাত হইতে এড়াইবার চেষ্টাই করিয়াছিল, আজ জগৎ sacrifice of the bestএর অপেক্ষা করিতেছে, আজ জীবনকে মরণের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে! আজ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া জাতিকে বাঁচাইতে হইবে! আজ আপনাকে নত করিয়া পরকে তুলিয়া ধরিতে হইবে—আজ ক্ষুদ্র জাতিভেদ ভুলিয়া বিরাট জাতীয়তাকে রক্ষা করিতে হইবে।

ব্যক্তি যত বড়ই হউন না কেন, সতত আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সমাজের হিতসাধন করিবেন—ব্যক্তি সমাজকে ধরা দিবেন না, সমাজ ব্যক্তিকে ধরিবে, ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিবে।

জগতে যাঁহারা প্রকৃত বিকাশ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপ্রকাশ থাকিবার শক্তিও বড় কম নহে। আর যাহারা রাজসিক বিকাশে উন্মত্ত—আপনার ঢাক আপনি বাজাইতে ব্যস্ত, জাতির বক্ষে তাহাদিগের জীবনের রেখা জললেখার ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! চক্ষের সমক্ষেই ত দেখিতেছি, জাতির বক্ষে কত নেতা উঠিল, কত মিলাইল! কেবল "ব্যক্তিত্ববাদ" "ব্যক্তিত্ববাদ" বলিয়া চীৎকার করিলেই সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। যিনি প্রকৃত ব্যক্তি, তিনি নির্জ্জন তপস্বী! নরনারী যদি সেইরূপ তপস্বীই হইত, তাহা হইলে সমাজে আজ এত হাহাকার পড়িবে কেন? নরনারী অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে বলিয়াই সমাজ অসংলগ্ন ও বিকল! ব্যক্তিত্ববাদের অর্থ যদি কেবল নরনারীর আত্মতৃপ্তি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এমন ব্যক্তিত্ববাদের আমদানি করিয়া কাজ নাই, ভারতবাসীর মনে বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমান জাগাইয়াও কাজ নাই।

ভারতবর্ষের আদর্শ কংস বা রাবণের আদর্শ নহে—অহং ভাবকে নাশ করাই ভারতবাসীর লক্ষ্য! বাহিরে কর্ত্তা এবং হৃদয়ে অকর্ত্তা—ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল মন্ত্র! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে, বশিষ্ঠ রামকে এই নীতি ধরিয়াই কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা যদি কোনদিন আবার জ্ঞানগরিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠে, তবে এই সনাতন পথ ধরিয়াই হইবে। অন্য প্রকার উন্নতিকে আমরা রাজা উত্তানপাদের উন্নতি বলিয়াই মনে করি—তাহাতে জাগতিক মঙ্গল থাকিতে পারে, কিন্তু পরমার্থিক ধ্রুব নাই! তাহাতে প্রেয় আছে শ্রেয় নাই—ধর্ম্ম এবং সত্য, ধ্রুব এবং শ্রেয়কে লইয়া!

প্রকৃতি আজ সমগ্র মানবজাতির উপর এমন নির্দ্দয় ভাবে প্রতিশোধ লইতেছে কেন? ইহার উত্তর মানব "বাহিরে কর্ত্তা ও হৃদয়ে অকর্ত্তা" হইতে বিমুখ হইয়াছে বলিয়া! ভারতীয় চিন্তার এইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ যদি এই বিশেষত্ব ও ধারাকে বজায় রাখিতে অপারক হয়, তবে কৃত্রিম ও নকল ভারত জগতের কোন উপকারেই আসিবে না।

আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, জগতের উন্নতি কল্পে ভারতবর্ষের উন্নতি একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ চিরদিনই দাতা। সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও ভারতবাসী দুই হাত তুলিয়া দান করিতেছে।

কিন্তু জগৎকে প্রকৃত দান আজিও ভারতবর্ষ করে নাই। ভারতবর্ষের কোন কিছু লইয়া জগতের কোন জাতিই অবনত থাকিতে পারিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। ভারতের সঙ্গে ব্যবসাদারী করিতে গেলেই পদে পদে ঠকিতে হইবে। ভারতের প্রকৃত বস্তু ধর্ম্ম, ভারতবর্ষের সে অমূল্য ভাণ্ডারের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকাইতেছে না। প্রতিবেশী জাপানও ব্যবসাদারীতেই ডুবিয়া রহিয়াছে, ভারতের আসল সামগ্রীর দিকে ভুলিয়াও তাকাইতেছে না। হে জগতের বণিকধর্ম্মীগণ, যত পার, আমাদিগের উপর তোমাদের ব্যবসা চালাও, আমরা সহিব, কিন্তু প্রকৃতি সহিবে না। ভাব দেখি, আমরা কাহাদের বংশধর, কতদিনের আমাদের ইতিহাস! আমাদিগের জাগতিক অবনতি দেখিয়া আমাদিগকে পরিহাস করিও না, চিরদিন কাহারও সমান যায় না। জাগতিক উন্নতির শেষ সীমায় আজি তোমরাও দণ্ডায়মান—সমগ্র য়ুরোপ আজ বিপন্ন ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, কেহই বলিতে পারিতেছে না, কি হইবে? জীবন-মরণের, উত্থান-পতনের এই সন্ধিক্ষণে, হে বিপন্ন য়ুরোপ, একবার তোমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম্মমূলক সহিষ্ণুতার দিকে তাকাইবে কি? একবার খুঁজিয়া দেখিবে কি কোথায় তাহার মহত্ত্ব। জগতের চক্ষে এত দীন হইয়াও ভারত এখনও দাতা। কিন্তু যে দান গ্রহণ করিতেছ, তাহা ত ভারতের প্রকৃত দান নহে, তাহাতে জগতের দুঃখ ঘুচিবে না! ভারতকে শ্মশান করিয়া, ভারতবাসীকে কঙ্কাল করিয়া জগৎ বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাই কি উন্নতির চরম আদর্শ, ইহাই কি সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ! ইহা উত্তানপাদের উন্নতি—উপরের দিকে পা তুলিয়া উন্নতি, ইহাতে পতন অনিবার্য্য! ইহাতে "কুলনাশন মুষলে"র সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে!

তাই বলি, এই নীচ পন্থা ছাড়িয়া দিয়া উন্নতির প্রকৃত দ্বারে উপনীত হইতে হইবে। অগ্রে

এই মহাদেশ ও ইহার সুমহান্ ইতিহাসকে বুঝিবার চেষ্টা কর—এ দেশের অন্তরাত্মাকে এখনও তোমরা ধরিতে পার নাই, এ দেশে জন্মিয়া আমরাও পারি নাই। আমরা যদি আজ আমাদের স্বরূপকে বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া জগতের দ্বারে হাত পাতিব কেন? আত্ম-বিস্মৃত আমরা, আত্ম-বিশ্বাসহীন আমরা, তাই আমরা পরপদলেহনে ও পরানুকরণে আজ এতদূর হৃতসর্ব্বস্ব! বর্ত্তমানে আমাদিগের মত আর কে?

যে দেশে যোগবাশিষ্ঠ, গীতা ও চণ্ডীর জন্ম, সে দেশ কেমন করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে পরাধীন হইতে পারে, আমি ত ভাবিয়াই পাই না, কেমন করিয়া সে জাতি দুর্ব্বল হয়, পরের অনুকরণে আনন্দানুভব করে, কেহ কি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মপ্রভাব ও বংশপ্রভাব আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অতি ক্ষীণ ভাবেই জ্বলিতেছে। আমরা যাহা একবার গ্রহণ করিতেছি, তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না—ত্যাগাত্মক শক্তি আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি! এইরূপ কত দেশের কতরূপ আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া আমরা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি যে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে হিন্দু বলিয়া আমরা পরিচয় দেই, তাহা আমাদের মহাভারত রামায়ণে খুঁজিয়া পাইবে না। অনেক সময়ে আমি ভাবিয়া থাকি যে, একমাত্র "হিন্দু" কথাটাই আমাদিগকে এত হীন করিয়া দিয়াছে। শব্দের শক্তি বড় কম নহে, শব্দ অনেক সময়ে অঘটন ঘটাইয়া থাকে—জাতীয় উত্থান-পতনের নিয়ামক হয়। আমাদিগের নামকরণেই যখন ভুল, তখন সারা জীবনটাই যে আমাদের ভুলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! সর্ব্বাগ্রে আমার মনে হয়, এই "হিন্দু" কথাটীকে বদলাইতে হবে, কারণ ইহা আমাদিগের সামগ্রী নহে, ইহা আমাদিগের গ্রহণাত্মিকা দুর্ব্বলতারই পরিচয়! আমরা যে অনুকরণপ্রিয় জাতি, আমরা যে আমাদের নামটা পর্য্যন্তও পরের নিকট হইতে ধার করিয়াছি, এই "হিন্দু" শব্দটী তাহাই ব্যক্ত করিতেছে! যাহাদিগের আত্মসম্ভ্রম বোধ আছে, তাহারা এমন ভাবে কখনই আত্ম-বিক্রয় করিতে পারে না। তাই বলি, এই হিন্দু কথাটীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি? ইহা তোমাদিগের মজ্জাগত হইয়া গেলেও উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে এবং হিন্দুর পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে কি? হায়, সেদিকেও প্রবল বাধা, অকুল সমস্যা! "সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণ করিতে হইবে!"—বিবেকানন্দের এই স্বপ্নকে সফল করিতে না পারিলে ভারতবাসীর জাতি হিসাবে মুক্তি নাই। ব্রাহ্মণ!—এই আত্মগৌরবে সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে ভারতের কল্যাণ নাই। এ দেশের কেবল মানুষ নয়, ইহার অণু পরমাণু, কৃমি কীট পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ!—এ ভাব লইয়া না নামিলে ঘোর তামসিকতার হস্ত হইতে আমাদিগের নিস্তার নাই।

সঙ্কীর্ণ মানুষ ইহাতে আপত্তি তুলিতে পারে, দেশাচার ইহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র ইহাতে উদার!—শাস্ত্র বলিতেছে—"ব্রাহ্মণ হও"—ভারতবর্ষের কার্য্যসাধিকা সংহতি শক্তি বাড়াইতে হইলে সমগ্র ভারতবাসীর ব্রাহ্মণ না হইয়া গতি নাই। অগ্রে এক হও, তাহার পর বিভাগ করিও। অত্রি সংহিতায় দেখা যায় যে, ব্রহ্মণে বিপ্র

দশবিধ হইয়াছে। শূদ্র ত অনেক উপরে, এমন কি নিষাদ, পশু ও ম্লেচ্ছও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদিগের কর্ম্ম যাহাই হউক না কেন,—সকলকে ব্রাহ্মণ বলিতে ক্ষতি কি? এই ব্রহ্মর্ষি দেশেই যাহার জন্ম, সে যে ব্রাহ্মণ হইয়াই জন্মিয়াছে—এ দেশে জন্মিবারও ত একটা সৌভাগ্য আছে! হে আভিজাত্যগর্ব্বী, সেই সৌভাগ্য হইতে এ দেশবাসীকে বঞ্চিত করিও না। তোমার পার্শ্ব দিয়া উহাদিগকেও বুক ফুলাইয়া চলিতে সাহস দাও, তোমার চরণতলে আর উহাদের মস্তক নত করিবার আদেশ ও উপদেশ দিও না—ভারতবাসী বলিয়া ওই কোল ভীল সাঁওতালকেও আপনার করিয়া লও, ব্রাহ্মণ করিয়া লও!—উহাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত সহিষ্ণুতা ও সরলতাই যে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়!—উহাদিগকেও উঠিতে দাও, জাগিতে দাও—বাধা দিও না—দূরে সরিয়া দাঁড়াইও না। আজ ভারতবর্ষের কৃমি কীটকেও আলিঙ্গন দিবার সময় আসিয়াছে। কাহার উপর ঘৃণা করিতেছ—উহারা যে তোমারই ছাঁচে তৈয়ারী মানুষ!

ঘৃণা করিবার কিছু আছে কি?—সবই যে প্রেমের সামগ্রী—সবই যে বিধাতার দান! সেই দানকে আজ আত্মপর ভুলিয়া বরণ করিয়া লও! সাঁওতাল কোল ভীল দেখিতে মেঘের মত কাল হইতে পারে, কিন্তু দেখ দেখি কেমন স্বাস্থ্য—কত সহিষ্ণুতা! তপস্যা আজ ওই চিরপদদলিত জাতির মধ্যেই সঞ্চিত হইতেছে, যদি আবার ভারতের হোমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তবে ওই সহিষ্ণুতার ক্ষেত্র হইতেই জ্বলিবে! তুমি আমি ত পরানুকরণপ্রিয় রুগ্ন বাবু হইয়া পড়িয়াছি; শূদ্র উহারা নহে, শূদ্র আমরা!—এখনও উহারা আত্মবশে দেদীপ্যমান, আপন গৌরবে গর্ব্বিত, কিন্তু তুমি আমি আজ কতদূর পরবশ, পরমুখাপেক্ষী—তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ?—তোমার আমার তুলনায় উহারা কত সুখী! উহারা তোমার আমার মত হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসনের কাঙ্গাল নয়—উহারাই ত ভারতাকাশের অবিচলিত স্বাধীন পক্ষী!—উহাদিগকে পরাধীন করা সহজসাধ্য নহে। ভারতের আদিম অধিবাসী উহারাই পর্ব্বতে জঙ্গলে, প্রান্তরে শ্মশানে ভারতের অতীতের সাক্ষ্য উহারাই দিতেছে। সাধে কি বিবেকানন্দ উহাদের ভিতর উত্থানের শিক্ষা দেখিতে পাইয়াছিলেন—সাধে কি শিবাজী এই কোল ভীলকেই হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন!

আভিজাত্যের মোহ এবং তজ্জনিত ঘৃণাকে আজ ভারতবর্ষের ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমবেদনার ভারতবর্ষ!—তাহাতে পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতি অসদ্গুণ আদৌ স্থান পাইবে না—সে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান একই মায়ের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিভিন্ন স্তন পান করিতেছে!—সে ভারতবর্ষে দরাফ খাঁর গাথা-স্তোত্র পড়িয়া হিন্দু পরমার্থ অন্বেষণ করিতেছেন, আবার মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-ক্ষেত্র সরস করিয়া তুলিতেছেন। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সেই সুমহান্ অতীতের আদর্শের উপর দণ্ডায়মান—অতীতের মোহের উপর নহে। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বাধার প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, এই অতীতের মোহ! তজ্জন্যই আমরা প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছি, অতীতের মোহকে ভুলিতে হইবে, তবেই প্রকৃত অতীত ভবিষ্যৎ রূপে জন্মগ্রহণ করিবে। ওই মোহই আমাদিগকে অগ্রসর

হইতে দিতেছে না, আমাদিগের প্রকৃত অতীতকে ধরিতে দিতেছে না। অতীতের মোহ যতদিন থাকিবে ততদিন হিন্দু-মুসলমান ত দূরের কথা, হিন্দুর ভিতরেই একতা স্থাপন হইবে না। অতীতের মোহ শাস্ত্রকে গোপনে রাখিয়া দেশাচারকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিয়াছে। অতীতের মোহ কাটিলেই নবোদিত ভাস্করের ন্যায় শাস্ত্র আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, দেশাচার আর দখল দিতে সমর্থ হইবে না।

একমাত্র দেশাচারই ভারতের উন্নতির পথে যত বাধার সৃষ্টি করিয়াছে—দেশাচারই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে—দেশাচারই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই দেশাচার হইতেই যত অনাচার এবং অত্যাচার মাথা তুলিবার অবকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্র উদার এবং উন্মুক্ত!—তাহার ভিতর বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম এমন সুন্দর ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে যে তাহার অনুশীলনে মানবজীবন সফল না হইয়া যায় না। পরার্থপরতাই শাস্ত্রের লক্ষ্য এবং স্বার্থপরতা হইতেই দেশাচারের সৃষ্টি—তাহাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই, পীড়ন এবং ভয় প্রদর্শনই তাহার ভিত্তি। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে দেশাচাররূপ অসুরকে নাশ করিতে হইবে—দেশাচারই সমগ্র ভারতকে এক হইতে দিতেছে না এবং ভারতবাসীর মনে বহু সঙ্কীর্ণতা আনিয়া ফেলিয়াছে! ত্যাগস্বীকারের পথ একমাত্র দেশাচারই রুদ্ধ করিয়াছে। অজ্ঞতা দেশাচারই বৃদ্ধি করিয়াছে! দেশাচার বশীভূত হইয়া ভারতবাসী পশুরও অধম হইয়া পড়িয়াছে!

ভারতবাসীকে আজ জগতের গগন পবন আলোড়িত করিতে হইবে। একস্থানে স্থবিরের ন্যায় বসিয়া থাকিবার আর দিন নাই—ছড়াইয়া পড়া ব্যতীত, আর উপায় নাই। বিস্তৃতিই জীবন। যদি বাঁচিতে চাও, ভারতকে বাঁচাইতে চাও—জগতে ছড়াইয়া পড়। মা যে বহু প্রাচীনা হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার নিঃশেষিত স্তনে আর দুগ্ধ নাই—কিসের লালসায় আর ঘরের কোণে মায়ের কোলে বসিয়া থাকিতে চাহ? আজ ভারতবাসীর বহির্গত হইবার দিন আসিয়াছে!—আজ ভারতবাসীকে অর্জ্জুনের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হইতে হইবে। আজ আক্রমণ ও অতিক্রমণের দিন! মায়ের অঞ্চলে বসিয়া আত্মরক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। রক্ষণশীলতা এবং সঞ্চয়শীলতাই জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথাসর্ব্বস্ব নহে, জাতির প্রকৃত উন্নতি অধ্যবসায় ও উৎপন্নশীলতায়! ইংলণ্ড, জর্ম্মাণি, জাপান আজ এত বড় কেন? —তোমরাই বা এককালে জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলে কেন?—তাহার কারণ ওই আক্রমণ ও অতিক্রমণের গুণে!—তোমাদের ঢাকাই মস্‌লিন, রোমের হাট বাজারে বিকাইত কেন? এখন যেমন জাপানের বিকাইতেছে! তাহার কারণ, তোমরা কেবল এখনকার মত defensive-এই ভুলিয়া ছিলে না, offensive তোমাদের উন্নতির মূল মন্ত্র ছিল—তোমরা বিস্তার এবং বৃদ্ধির মর্ম্ম জানিতে। তোমরা কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিতে। পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্ শৃণুয়াম শরদঃ শতম।—ইহা তোমাদিগের নরনারীর মুখে প্রবৃদ্ধির মন্ত্র ছিল। এই বিস্তার কেবল ইহলোক ও জড়জগৎ ব্যাপিয়াই ছিল না—অনন্ত ও অমৃতের তোমরা পুত্র ছিলে! ভাবিয়া পাই না, কেমন করিয়া এমন দিগ্বিজয়ী জাতিরও অবনতি হয়! ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থের জন্য এখনও জগতের

পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। ক্ষুদ্রত্বই যে শূদ্রত্ব। এ জ্ঞান আমাদিগের কবে জন্মিবে? এই ক্ষুদ্রত্বের বিপরীত ভাব হইতেছে ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণত্ব সকল সঙ্কীর্ণতা ও নীচ প্রবৃত্তির নাশক। ব্রহ্ম অর্থে অপরিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি, অখণ্ড ভাব। ভারতবাসীকে এক করিতে হইলে এই অপরিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি ও অখণ্ড ভাবের সম্মুখীন হইতে হইবে! বলা বাহুল্য, একমাত্র ব্রাহ্মণত্বই সেই ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার। আজ ক্ষুদ্রশকত্ব শূদ্রত্বকে বর্জ্জন করিয়া সুমহান্ ব্রাহ্মণত্বকে বরণ করিবার দিন আসিয়াছে। ব্রাহ্মণত্বে ব্যাপক ভাব নিহিত রহিয়াছে, ইহা কেবল সুখসর্ব্বস্ব কতিপয়ের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধাবাদ নহে, ইহা যে সকল গণ্ডী—সকল বাধার বাহিরে! ব্রাহ্মণত্ব বহু বৃহৎ! আজ ভারতবাসীর কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার দিন আসিয়াছে;—ওই যে সঙ্কীর্ণ দেশাচারের মধ্যে আবদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব—ওই যে কুসংস্কার—ওই যে মজ্জাগত স্বার্থপরতা—ওই যে জঘন্য প্রতিগ্রহবৃত্তি—উহাকে আজ ভারতবাসীর প্রাণপণ চেষ্টায় জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে—উহার বিষদন্ত, উহার অর্থহীন অভিমান না ভাঙ্গিলে ভারতবাসীর অনন্ত পরবশতা হইতে নিস্তার নাই—ভারতবাসীর মুক্তির আরম্ভ ওই দিন হইতেই!! ভারতের উন্নতির দিনে একদিন ব্রাহ্মণ অপমানকেই ভূষণ করিয়াছিলেন,—আজ ভারতবর্ষের ঘোর অবনতি! তাই ব্রাহ্মণ অভিমানী হইয়া পড়িয়াছেন—শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া কেবল দেশাচারেই আপনার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছেন। যে শাস্ত্র একদিন ব্রাহ্মণেরই করায়ত্ত ছিল, সেই শাস্ত্র—সেই উদারতা, আজ তথা-কথিত ব্রাহ্মণের পদতলে! আজ দেশাচারই তাঁহার জীবন ধারণের ক্ষেত্র—কি অভাবনীয় অধোগতি! শাপ দাও, কিম্বা ভস্মীভূত কর—ব্রাহ্মণের নির্ম্মল মূর্ত্তি আমরা দেখিতে চাই।—আমরা দেখিতে চাই, আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত!—আমরা দেখিতে চাই—ভারতের কুত্রাপিও শূদ্র নাই—এই জননী জন্মভূমির সুপবিত্র স্পর্শে ভারতের সকল সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে যে ভবিষ্য-ভারতের প্রতিষ্ঠা হয় না—তাহা না হইলে যে শক্তির সমন্বয় ঘটে না—জগৎ-গুরুপদে আর একবার ভারতকে বসাইতে হইবে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে" আর একবার যে এই সপ্নের কথাটীকে সত্যে পরিণত করিতে হইবে!

হে হংসাখ্য ব্রাহ্মণ, আবার তুমি সত্যযুগ আনয়ন কর। যাহা মিথ্যা—যাহা বৃথা, তাহা চলিয়া যাক্, যাহা অখণ্ড—যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা ফিরিয়া আসুক। তুমিই ত এতরূপে এত খেলা করিতেছ! ভারতের সুখও তুমি, দুঃখও তুমি—ভারতের উন্নতিও তুমি, অবনতিও তুমি। আর কেন? উঠ, জাগ—অন্ধকার ভেদ করিয়া নির্ম্মল হও!—ভারতের এ দীনতা তোমারই কর্ম্মফল;—তুমি যখন ভারতের মস্তিষ্ক, তখন তুমিই দায়ী!—তুমি মদমত্ত হইয়াছ বলিয়াই তোমার সর্ব্বাঙ্গ টলিয়াছে—এখন তোমার উত্তানপাদ অবস্থা,—তোমার পদতল মাথার দিকে উঠিয়াছে—স্বরূপ এবং স্বভাবে তুমি আর নাই। ভারতের অতীতকে জন্ম দিতে হইলে, অগ্রে তোমাকে স্ববশে আনিতে হইবে। আজ ভারতের আপৎকাল উপস্থিত, এ হেন সময়ে তোমার অভিমান কি ভাল দেখায়?—তোমার ঘরেই যে আগুন লাগিয়াছে!—অতএব তোমাকেই নিবাইতে হইবে।—এ কি কলহের সময়, না তর্কের সময়? ভারতের সর্ব্বত্রই আজ শ্মশান-চুল্লী জ্বলিতেছে—শূদ্রত্ব বা শবত্বে দেশ পূর্ণ—

চারিদিকেই পূতিগন্ধ—প্রেতের নৃত্য, শিবার চীংকার! তোমার অনাথ প্রতিবেশীর আর্ত্তনাদ!—এ বিপদে তুমি আপনাকে দূরে রাখিয়া বাঁচাইতে চাও! হে ব্রাহ্মণ, হে নীলকণ্ঠ, হে ভবদেব, অতীত ভারতের বর্ত্তমান শ্মশানে তুমি শিবের ন্যায় শবের উপর আবার বস—শব শিব হইয়া যাক্—তোমার সম-বেদনার স্পর্শে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া যাক। ইহাতে তোমার অপমান নাই। তুমি সূর্য্য—তুমি অগ্নি; তুমি সকলকে পবিত্র করিয়া লও—তাহাতে কি তোমার মর্য্যাদার কখনও লাঘব হয়? ভারতের ভবিতব্য তুমি!—অতীতের মোহ এবং বর্ত্তমানের আত্ম-তৃপ্তিকে ভুলিয়া নব্যভারতকে অগ্রসর হইবার পন্থা বলিয়া দাও!—তোমার অবহেলায় ও ঔদাসীন্যে আর কত কাল ভারত বসিয়া থাকিবে? তোমার ত্যাগ এবং তপস্যাতেই ভারতের মুক্তি! হে হংসাখ্য, তোমার মন্দিরের আজ সকল দ্বার খুলিয়া দাও—তোমার সোপানে সকলকে উঠিতে দাও—তোমার বিগ্রহকে দেখিবার জন্য আজ সমগ্র ভারত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। হে অপরিসীম বুদ্ধি, হে অনন্ত অগ্নে, তোমাকে বুঝিবার এ দীন ভারতকে অধিকার দাও। হে ভ্রান্ত, হে চিরভিক্ষুক ভারতবর্ষ, কাহাদের নিকট home rule চাহিতেছ? হে আত্মবিস্মৃত, আত্মবিশ্বাসহীন, আত্মসম্মানহীন অনধিকারী ভারত-সন্তানগণ! ইহাই কি তোমাদিগের প্রার্থনার শেষ পূরণ? ইহা পাইলেই কি তোমরা সুখী হইতে পারিবে? আত্মবলে বলীয়ান হও—ব্রহ্মবলে বলীয়ান হও—অতিমানব ব্রাহ্মণ হও। ভারতবর্ষের চরমোৎকর্ষ home-rule নহে—ভারত ভবিষ্যতে জগৎকে আক্রমণ ও অতি-ক্রমণ করিতে চায়—ভারত বশীকরণের মন্ত্র শিখিতেছে। অনুকরণে ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে ভ্রূণ হইয়া জন্মিতে চাহে না—ভারত জগৎকে নূতন কিছু দেখাইতে চায়। বন্ধ্যা নারীর গর্ভে প্রবেশ-অধিকার ভারত চাহে না—জড়ভরত হইতেও ভারত চাহে না। হেগেল বলিয়াছিলেন, সভ্যতার শেষ বিকাশ জর্ম্মাণীতে হইবে। আমার বিশ্বাস, সভ্যতার শেষ বিকাশ ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে! চক্রবৎ ভারতের পুনরুত্থান আবার ফিরিয়া আসি-তেছে! ওই হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে আবার কোন দিগ্বিজয়ী বিশ্বামিত্র এই ভারতবর্ষেই নব-স্বর্গের সৃষ্টিকল্পে অসীম তপঃ প্রভাবে জাগিয়া উঠিতেছেন—আবার কোন মহাপ্রাণ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ক্ষমার শাসন লইয়া দেশাচার-পীড়িত ভারতকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। হে ভগবান! ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সফল হউক, সফল হউক, সফল হউক!

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

পৌরাণিকী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জুড়াইল সব জ্বালা পতির আদরে,
যুগল নয়নে জল উঠিল উথলি;
অমনি মুছিয়া আঁখি কহিলা পৌলমী
"তোমার বিহনে নাথ! শূন্য স্বর্গপুরী
অশাসিত, বিশৃঙ্খল; দিবাকর বিনা
গ্রহ-উপগ্রহ-রাজ্য অম্বরে যেমতি,
হেরি সে দুর্দ্দশা দেব! বসিয়া বিরলে
দেবঋষি দেবগণ করিলা মন্ত্রণা;

রাজনীতি-বিশারদ নহুষ ভূপতি
স্বর্গবাসী, মরতের বহু পুণ্যবলে।
সকলে ইচ্ছিলা, তারে করিবে প্রদান
শূন্য রাজাসন তব—যতদিন তুমি
সাধিবে কঠোর ব্রত রহি নিরজনে।
আসিলা সপ্তর্ষি মিলি আমার সকাশে
দেবতার দূত রূপে; মম অনুমতি
লইবারে কহিবারে বিপত্তি-বারতা।
সকলি শুনিনু—কিন্তু তোমার আসনে
বসিবে অপরে আসি, সে যে বড় ব্যথা!
(ক্ষমিও ক্ষুদ্রতা মম দয়াময় তুমি!)
"তথাপি চিন্তিনু চিত্তে, পতিদেব মম
তপোরত রাজ্য তাঁর, মহা বিশৃঙ্খল;
শাসিতে পালিতে স্বর্গ দেব-হিত হেতু
আসুক অপর কেহ; পরের মঙ্গলে
আত্ম বিসর্জ্জিতে পাব আনন্দ অপার।
যতদিন রবে প্রভু সুদূর বিজনে,
গুরুগৃহে রহি আমি ব্রত আচরিব।
কি কাজ এ রাজপুরে, শচীনাথ বিনা
অভাগী শচীর কাম্য কি আছে জগতে?
তবে তাঁর-পদরেণু রঞ্জিত এ পুরী,
ছাড়িতে হইবে হায়, স্বর্গচ্যুতা সমা!
কিন্তু এই মর্ম্মতলে সে দেবতা মম,
বিরাজিত চিরদিন রাজ রাজেশ্বর!
এই সব ভাবি প্রভো, দিনু অনুমতি
গুরুগৃহে বাস তরে আসিলাম চলি।
"গুরুদেব গুরুপত্নী আদর যতনে
তোষে নিত্য অভাগীরে, বালিকা বয়সে
যেমন ছিলাম সেই মা বাপের ঘরে।
তোমার বিরহ বিনা, কোন দুঃখ আর
নাহিক তাঁদের কাছে; স্নেহ দয়া কত
জনক জননী রূপে বিতরেণ মোরে।
"একদা বিকালে নাথ! পারিজাত ফুলে
মালিকা গাঁথিতেছিনু (জানি চিরদিন
সুগন্ধি মন্দার মালা ভালবাস তুমি;
তাই সেই পুষ্পদামে প্রতি নিশাকালে
পূজিও চরণাম্বুজ মানসে নিজনে)
সহসা সেখানে আসি ঘৃতাচী অপ্সরা
কর পুটে, প্রণমিয়া রহিল দাঁড়ায়ে।
সুধিয়া শুনিনু যাহা—বলিব কেমনে
সে অকথ্য কথা প্রভো! নহুষ দুর্ম্মতি
অমরা ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জি প্রমত্ত কুঞ্জর,
সে চাহে লভিতে নাকি বাসব মহিষী!
সিংহী ইচ্ছে সারমেয়, বামন-বাসনা
ধরিবারে শশধরে কর প্রসারণে!
শুনি এ ঘৃণিত বাণী উঠিনু সরোষে,
গর্জ্জিয়া কহিনু আমি, নির্লজ্জ পামর
কাহারে এমন কথা কহিল ঘৃতাচী?
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী আমি সুরপুর-রাণী
ভৃত্যের অযোগ্য জনে দেবেন্দ্র-আসনে
বসাইনু দয়া করি, তাই মূঢ়মতি
ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত উঠেছে ক্ষেপিয়া!
বুঝিলাম কালপূর্ণ, পুণ্যক্ষয় তার
ফুরায়েছে স্বর্গভোগ তাই এ কুমতি!
"হায় এ ভর্ৎসিনু কারে? মর নর যথা
চলি যায় মৃত্যু-পথে নিয়তি-নির্দ্দেশে।
শোনেনা বান্ধব-বাণী, গুরু-উপদেশ,
মানেনা অতীত শাস্ত্র বোঝেনা কল্যাণ।
প্রত্যাখ্যানে সে পাপাত্মা উন্মত্তের মত,
পুনঃ পুনঃ মোর কাছে করিছে প্রেরণ
দূত দূতী, অনুনয় কভু ভয় দিয়া।
হেন অপমান প্রভো! সহিবারে নারি
আসিনু চরণে তব, লতার আশ্রয়
তরুরাজ; জলাশয় মীনের তেমতি
সতীর আশ্রয় পতি, সাহস ভরসা।
যদি ব্রত ভঙ্গ ভয়ে সে পাপী দুর্জ্জনে
নাহিক শাসিবে তুমি, দেহ অনুমতি
দেহ তব জায়া করে কুলিশ, কুলিশী;

দেখুক বিশাল বিশ্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
রক্ষে যারে পারে ধর্ম্ম, স্বামীর সম্মান।”

নীরবিলা পুলোমজা, বহিল নয়নে
দর দর শতধারা জাহ্নবী যমুনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীর কুমার-বধ-রচয়িত্রী।

সমবায়। (২)

(সমাজ-সমস্যা)

যে প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ক্ষত্রিয় বৃত্তির প্রতিকূল এবং বৈশ্য বৃত্তিরও সহায়ক নহে। সমাজ নেতৃগণ জাতির ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া বৈশ্য বৃত্তিরও অধম চাকচিক্যময়ী আপাতমধুর শূদ্রবৃত্তি — কেরাণীগিরি — করণোপযোগী শিক্ষাই বিদ্যা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য মনে করিয়াছেন দেখিয়া লেখকের মনে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যে পরিমাণে প্রতি বৎসর যুবকগণ লেখা পড়া মাত্র শিখিয়া বাহির হইতেছে, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত কেরাণীগিরি ইত্যাদি পূর্ণ হইয়া অনেক অবশিষ্ট যুবক নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে। অনেক পৃষ্ঠপোষক মহাশয় ব্যক্তি থাকা সত্বেও ইহাদের কার্য্য জুটিতেছে না। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর যুবকবৃন্দকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করিতেও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট পারিতেছেন না এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। ইহার উপর বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যদি কৃষক ও শিল্পিগণের বালকগণকেও তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তির উপযোগী বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া শিক্ষা না দিয়া যদি মাত্র লেখা পড়া শিখাইয়া কেরাণীগিরি ইত্যাদির উপযোগী করিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইহাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া আরও বিব্রত হইবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধন ও জনবল নষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে জন সংখ্যা হিসাবে শতকরা ৫ জন শিক্ষিত, ২০ জন শিল্পী একুনে ২৫ জন ও ৭৫ জন কৃষক। শিক্ষিত ও শিল্পী উভয়েই শতকরা ৭৫ জন কৃষক বা উৎপাদকের উপর নির্ভর করিতেছে। গত ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জন সংখ্যায় ভারতবর্ষে কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৮০ জন ছিল। গত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জন সংখ্যায় কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৫ জন কমিয়া ৭৫ জনে উপনীত হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীরই ফল বলিতে হইবে। ইহার উপর এই শিক্ষানীতির অনুসরণ করিয়া জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা প্রদান না করিয়া কৃষক ও শিল্পিগণের পুত্রগণকে যদি কেতাবী লেখা পড়া মাত্রই শিক্ষা দেওয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত যুবকগণ তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তির পরিবর্ত্তে কেরাণীগিরি ইত্যাদির উপযোগী মাত্র লেখা পড়া শিখিয়া গবর্ণমেণ্টের অর্থ ও জনবল হ্রাস করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বেকারগণের সমস্যা (Unemployed question) দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিবে এবং

কৃষক ও শিল্পির শতকরা জন সংখ্যা, যাহা এক্ষণে ৯৫ আছে, তাহা কমাইয়া তৎপরিমাণে শিক্ষিতের বর্ত্তমান শতকরা ৫ জনের বেশী করিবে। এইরূপ ভাবে ক্রমে ক্রমে কৃষক ও শিল্পির জন সংখ্যা হ্রাসের সহিত গণিতের হিসাবানুসারে কয়েক বৎসর পরে কৃষক অর্থাৎ উৎপাদক ও তাহার সাহায্যকারী শিল্পির জন সংখ্যা লোপ পাইবে। এবং এই কৃষি প্রধান দেশের অনুপযোগী শুধু কেতাবী শিক্ষিতের সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়া গবর্ণমেণ্টের গলগ্রহ স্বরূপ হইবে।

নেতৃগণ এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ধন ও জনবল বৃদ্ধি হয় ও সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সমাজস্থ সকল লোকের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থায় উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই লেখকের সনির্বন্ধ নিবেদন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহার ধন ও জনবল (Wealth i. e. money and man power) হ্রাস করিতে প্রস্তুত আছেন? এবং সমাজ নেতৃগণ তাঁহাদের সমাজস্থ সামাজিকগণকে শারীরিক দুর্ব্বলতম, মানসিকে উন্নত বা প্রবীণ বা পণ্ডিত, নৈতিকে অবনত * অর্থাৎ আত্মসম্মান বৃদ্ধির পরিমাণানুযায়ী অহঙ্কারী হেতু স্বার্থপরতা-জনিত-পরার্থ-পরতা-হীন ও নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী বিদ্যাহীনতা জনিত ‘ইতোঃভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট’ হইয়া অধ্রুব বৃত্তির অনুসরণে অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম করিতে চাহিতেছেন? কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির বোধ হয় ইহারই চরম ফল। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা সমাজ-নেতৃগণ তাহা চাহেন না। যদি না চাহেন, তবে গবর্ণমেণ্টকে এই কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫ জন কৃষকের ও তাহার সাহায্যকারী শতকরা ২০ জন একুনে ৯৪ জন শ্রমজীবী লোকের হিসাবে নিম্ন প্রাথমিক স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম কলেজ সকলকে শতকরা ৯৫টী স্কুল কলেজকে কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য মাত্র শতকরা ৫টী স্কুল কলেজ রাখিতে হইবে। সমাজনেতাগণকে তাঁহাদের সমাজস্থ সামাজিকগণকে কেবল কেতাবী লেখা পড়া না শিখাইয়া উক্তরূপ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়ে তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি উপযোগী বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া শিখিতেও উৎসাহ দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে বঙ্গ প্রদেশে কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৮০ জন, শ্রমজীবী কিছু কম ১৫ জন এবং শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু বেশী ৫ জন, সুতরাং বাঙ্গালা সম্বন্ধে এই অনুপাতানুযায়ী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা উচিত হইবে। রাজসাহী ডিবিসানের প্রায় অর্দ্ধাংশে কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ৯৫ এরও অধিক হওয়া উচিত হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ে কৃষক ও শিল্পিগণের সন্তানেরা বাল্যাবস্থায় শিক্ষারম্ভের সময় হইতে যাহাতে দিবসে পিতা, মাতা, অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের গৃহস্থালীর কার্য্যে সাহায্য করিয়া

* বাঙ্গালা দেশে দশ সহস্র কায়স্থের মধ্যে ৭ জন, ঐ সংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪ জন, আর তন্তুবায়, মাহিষ্য, যোগী, পোদ, সদ্গোপ, সাহা প্রভৃতি জাতির দশ সহস্র মধ্যে ১ জন বা তন্ন্যূন লোক জেল-প্রবাসী পাওয়া যায়। একলক্ষ রাজবংশীর মধ্যে জেল-প্রবাসী ২ জন মাত্র পাওয়া যায়। হিন্দু পত্রিকা ১৯১৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

শ্রম-পটুতালাভ, নৈসর্গিক শীত ও তাপ সহ্য করিয়া শরীরকে গঠিত করিতে পারে, তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে যাইয়া দিবা (Day school) স্কুলের পরিবর্ত্তে নিম্ন প্রাথমিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে। এই সকল নৈশ বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নৈতিক শিক্ষাও হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপ্রাথমিক, পরে মধ্য বাঙ্গালা বা মধ্য ইংরাজী, তৎপর উচ্চ ইংরাজী কৃষি শিল্প বিষয়ক দিবাস্কুল সকলে শারীরিক শিক্ষা পরিসমাপ্তি করাইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ ইত্যাদিতে প্রবেশ করিবার উপায় করিয়া দিলে কৃষক ও শ্রমজীবী যুবকগণের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। সমাজের নেতৃগণ শিক্ষা সংক্রান্ত এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাহাদের সমাজস্থ বালক বালিকাগণের উপযোগী অভিনব শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন ও প্রচলন করিলে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিরই পথ প্রশস্ত হইবে।

ব্যষ্টি লইয়া পরিবার, পরিবার লইয়া গ্রাম, গ্রাম লইয়া জনপদ এবং জনপদ লইয়া রাষ্ট্র; সুতরাং ব্যষ্টিকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, ও আর্থিক বিষয়ে উন্নত করিলে ঐ ঐ বিষয়ে পরিবার, গ্রাম, জনপদ ও রাষ্ট্র উন্নত হইবে। অতএব বালক বালিকাগণকেই সর্ব্বতোভাবে ঐ ঐ বিষয়ে উন্নত করিতে পারিলে ব্যষ্টি, পরিবার, গ্রাম, জনপদ ও রাষ্ট্র উন্নত হইতে বাধ্য। প্রত্যেক পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণকে ঐ ঐ বিষয়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন; এবং রাষ্ট্রপতি হইতে জনপদপতি, গ্রামপতি, গৃহকর্ত্তা বা গৃহস্থ এবং প্রত্যেক পিতামাতার তৎকল্পে সাহায্য করিবেন। ইহাকেই উত্তম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমবায় নীতি বলা হয়। এইরূপ সমবায়ে সমশ্রেণীস্থ লোকেরই আবশ্যক। ভিন্ন দেশী, ভিন্ন আচারী, ভিন্ন সামাজিক ও ভিন্ন* ধর্ম্মাবলম্বীর সহযোগে উত্তম সমবায় অসম্ভব। সকল বিষয়ে সমভাবাপন্ন না হইলে এই সমবায় প্রথা কথঞ্চিৎ পরিমাণে অচল হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজ বর্ত্তমানে বহু পরিমাণে ঐ সকল দোষে দুষ্ট, সুতরাং সমাজ নেতৃগণকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

দেশ কাল পাত্রভেদে সকল বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক হইয়া থাকে। সমাজ-সংস্কারকগণকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চিন্তা করিয়া দেশকাল পাত্রানুযায়ী এমনভাবে সংস্কার বিধান করিতে হইবে, যেন অতীতের সহিত বর্ত্তমান সংস্কার সমাজে খাপ খায়। ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া আমূল পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া নিতান্তই ভ্রম। বর্ত্তমানে রেল, জাহাজ, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির দিনে দূর নিকট হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের সহিত প্রতীচ্যের সম্মিলন হইতেছে, ভাব পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রতীচ্যের গতি নির্ণয় করিলে ভুল অবশ্যম্ভাবী। ফল বিধাতার হস্তে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে উভয়ের সামঞ্জস্যে যাহা প্রতীচ্যের পক্ষে ভবিষ্যৎ ভাল হয়, তাহাই কি করণীয় নহে? পাশ্চাত্য দেশে যদিও প্রতীচ্যের ন্যায় বর্ণাশ্রম নাই, তথাপি কি সে দেশে গিল্ড (Guild) বলিয়া একটা জিনিষ নাই? ভারতবর্ষের

* এস্থানে 'ধর্ম্ম' শব্দে Religion বুঝিলে ভুল হইবে।

বর্ত্তমান সমাজ-নেতৃগণ যদি বিশেষ বিবেচনা সহকারে পাশ্চাত্যের এই গিল্ডকে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমের সহিত তুলনা করিয়া এবং উভয়ের উত্তম অংশ গ্রহণ ও সামঞ্জস্য করিয়া পূর্ব্ব বর্ণাশ্রমের অনুকূল ও সর্ব্বসাধারণের গ্রহণোপযোগী ও কালোপযোগী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রণয়ন ও প্রচারিত করেন, তবেই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু তাহা না করিয়া পাশ্চাত্যের গিল্ডের অবিকল কিম্বা প্রতীচ্যের প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একান্ত অনুসরণরূপ সমাজ সংস্কার করিতে যাওয়া যায়, তবে তাহা দেশ, পাত্র ও কালোপযোগী হইবে না, এরূপ মনে হয়। অতএব সমাজ-সংস্কারকগণ! সাবধান হইয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হউন।

আশা করি, সমাজের নেতৃবর্গ তাঁহাদের নিজ সমাজ সংস্কারের সময়ে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। নতুবা সমাজরূপ শরীরে যেরূপ ইতিমধ্যেই দুষ্ট কীট প্রবেশ করিয়া শরীরকে মথিত করিতেছে, তাহা সমূলে বিনষ্ট না হইলে সমাজরূপ শরীর পুনঃ সবল ও সুস্থ হইতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতির দোষেই হউক, বা আমাদের নিজ দোষেই হউক, সামাজিকগণের মধ্যে ইতিমধ্যে পরার্থপরতা লোপ পাইয়া স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এইরূপ ভাবে চলিয়া যাইলে ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাইলে সমাজতন্ত্রতা আর কদাপি ফিরিয়া আসিবে না। যদিও নিয়ম করিয়া তাহা করিতে যাওয়া যায়, তথাপি তাহা ঠিক খাঁটী সমাজতন্ত্রতা না হইয়া ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যেরই একটী নিয়মাবদ্ধ নামমাত্র সমাজতন্ত্রতা গঠিত হইবে। তাহাতে লোকমতেরই প্রাধান্য হইবে। প্রকৃত নেতৃত্বের অনুশাসন মানিয়া চলিতে ঐরূপ সমাজ কুণ্ঠিত হইবে। লোকমত কখনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। নেতৃগণই ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যোগ্য পাত্র। অজ্ঞ বা সাধারণ লোকমতানুযায়ী নেতৃগণ চালিত হইলে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধার" ন্যায় কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। সুতরাং অধিকাংশ লোকমতের (Majorityর) প্রাবল্যে অল্প সংখ্যক বিজ্ঞের (Minorityর) দুরবস্থা বা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী! আবার এই মাইনরিটির প্রাবল্যে পূর্ব্ব মেজরিটি মাইনরত্বে পরিণত হইয়া অবশ্যই দুরবস্থা বা দুঃখ পাইবে। অতএব মাইনরিটি ও মেজরিটির মত লইয়া তাহা সমালোচনা পূর্ব্বক যাহা সুসঙ্গত ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহা নেতৃগণ নিজেরাই স্থির করতঃ উভয় পক্ষকে তদনুসারে চালিত করার নামই প্রকৃত সমাজ-নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রপতিত্ব। ইহাতে কোন পক্ষেরই কষ্টের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং উভয় পক্ষই তাহাদের নেতাগণের অনুবর্ত্তন (Follow) করে এবং সমাজের উন্নতি ধীর স্থিরভাবে ক্রমে উন্নতির শিখরে উন্নীত হইতে পারে। ইহাকে অন্ধানুগত্য (Servility) বলা যাইতে পারে না। আমরা ইহাকেই ব্যষ্টিতন্ত্রতা বা পরার্থপরতা বলিয়া আখ্যা দিব। বিপরীতটী ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থপরতা বলিব।

সমাজে থাকিলেই সমাজপতি আবশ্যক। সমাজপতির কর্ত্তব্য তাঁহার অনুশাসন সমাজের মধ্যে অপ্রতিহতভাবে যাহাতে সমাজের উপকারার্থে অনুসৃত হয় তাহা করা। দুর্ভাগ্য বশতঃ তদ্রূপ সমাজপতি বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে অভাব হইয়াছে। সুতরাং কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় এই

সমাজরূপ নৌকা নানা কারণে বিপ্লাবিত হইতেছে। এই সঙ্কিস্থল হইতে কে সমাজকে সুপথে লইয়া যাইবে? সেরূপ সমাজপতি কে হইবে? কাহার অনুশাসন মানিয়া সমাজ চালিত হইবে? ব্যষ্টি সমাজপতির আসন অধিকার করিতে পারে না, মুখ পাত্র হইতে পারেন মাত্র। সমাজপতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রপতিতেই সেই সকল লক্ষণ পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি সামাজিক ব্যক্তি হইলেই সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, নতুবা সুদূর-পরাহত।

বলিতে গেলে সমাজ বর্ত্তমানে শ্রমজীবীর। শ্রমজীবীর পক্ষে শ্রমীই আবশ্যক। ভূমি বা কৃষিজাত দ্রব্য (Raw material) এবং যৎসামান্য মূলধনেরও আবশ্যক। শ্রমীকে সমাজই উৎপন্ন করিয়া লইবে। সমাজপতি ভূমি ও মূলধন সংগ্রহ করিয়া সমাজের মধ্যে উপযুক্তরূপে বিভাগ করিয়া দিবেন ও অনুশাসন দ্বারা সকল বিষয়ে সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন এবং তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থাই আজ কালকার আইন এবং পূর্ব্বকার ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসনানুযায়ী চলিলে রাষ্ট্রপতির অনুশাসন মানিয়া চলাই হইল। বর্ত্তমানে আমরাও তাহাই করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান আইন আমাদের পূর্ব্বকার ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। কারণ যখন সমাজকেই শ্রমী উৎপন্ন করিয়া লইতে হইবে, তখন বিবাহাদির নিয়মাবলী বা শাস্ত্রানুশাসন কখনই ঋষিকল্প মনস্বী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অনুরূপ হইতে পারে না। মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ডিপেণ্ডেণ্ট বা আশ্রিত। শ্রমজীবী উৎপাদক, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ খাদক যদিও তাঁহারা সমাজরূপ শরীরের শীর্ষ স্থানীয় বা পূর্ব্ব বিশ্রুত ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রিত। বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রিত মধ্যবিত্ত সমাজের ন্যায় শাসক বা ক্ষত্রিয় সমাজও কৃষক শ্রমজীবীর আশ্রিত। ইহাদের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষতঃ বিবাহের নিয়মাদিও শিক্ষিত বা ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রিত সমাজের অনুরূপ হইতে পারে না। শ্রমজীবী সমাজের ন্যায় শাসক সমাজেরও যুদ্ধাদি হেতু বলক্ষয় পূরণার্থ বংশ বৃদ্ধি আবশ্যক। পরন্তু, শিক্ষিত বা ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রিত সমাজের বংশ বৃদ্ধি আবশ্যক না হইয়া বরং সমাবস্থা থাকা * ধর্ম্ম ও অর্থ নৈতিক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। আবার শ্রমজীবী বা বৈশ্য সমাজের এবং শাসক বা ক্ষত্রিয় সমাজের অনুরূপ সেবক বা শূদ্র বর্ণাশ্রিত সমাজেরও বংশ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। সুতরাং ইহাদেরও ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষতঃ বিবাহের নিয়মাদি শিক্ষিত বা ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রিত সমাজের অনুরূপ না হইয়া বরং বৈশ্য বা শ্রমজীবী এবং ক্ষত্রিয় বা শাসক সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অনুরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কাজেই উক্ত তিন সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী কখনই শিক্ষিত বা ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রিত সমাজের অনুরূপ হইবে না। অথচ বর্ত্তমান সময়ে যাহা দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই নিয়মের বিপরীত। এই বিপরীত

* নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণীনো জনার ন্যায় শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তি নম্র ও সার্ব্বভৌমিক প্রেমে প্রেমিক হয়েন বলিয়াই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা সূর্য্য ও গঙ্গা হইয়াছে এবং এই জন্য বর্ত্তমানে ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করণচাঁদ গান্ধির ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা রাজা হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত উপকৃত হইতেছে। পরার্থপরতার পরিণতি বিশ্বপ্রেমই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম।

প্রশ্নের সমাধান রাষ্ট্রপতি না করিলে কে করিবে? অথচ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে নানা কারণে তাহা করিতে নারাজ, কাজেই সমাজে নেতৃগণ আপনাদিগেরই সাহচর্য্যে আপনারাই ইহার মীমাংসা করিতে বাধ্য। অতএব সমাজনেতৃগণ সাবধান হউন। বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি বিবাহ বংশ বৃদ্ধির কারণে সমাজে প্রচলন অপ্রচলন বিষয়ে চিন্তা করুন। শ্রমজীবী সমাজ শ্রমী চাহে। শ্রমী সমাজরূপ শরীরের প্রাণ স্বরূপ। সুতরাং রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রকে সবল করিতে যাইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণাশ্রিত সমাজত্রয়ের বংশ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং এই সমাজত্রয়ের যাহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবেই।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্যষ্টির ক্ষমতাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এবং ব্যষ্টির বংশ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের বংশ বৃদ্ধি হয়। আরও দেখান হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকে সকল ধনে ধনী করিতে হইলে ব্যষ্টিকে সকল ধনে ধনী করিবার চেষ্টা করা রাষ্ট্রপতি হইতে গৃহের কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে হয়। সুতরাং মূলতঃ ব্যষ্টিকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিকে উন্নত করিলে উচ্চ পর্য্যায়ক্রমে রাষ্ট্রপতি পর্য্যন্ত ঐ ঐ বিষয়ে উন্নত হয়। সুতরাং ব্যষ্টিকে তাচ্ছিল্য করিলে রাষ্ট্রপতি কখনই প্রবল পরাক্রান্ত হইতে পারেন না। এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে ব্যষ্টির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে এবং তাহাতে রাষ্ট্রপতি হইতে নিম্ন পর্য্যায়ক্রমে গৃহস্থকেও পর্য্যন্ত একই উদ্দেশ্যে সমবায় প্রথামত সাহায্য (Co-Operate) করিতে হয়। তদভাবে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সুদূরপরাহত। এইরূপে জাতীয় চরিত্র গঠিত করিতে হইলে ব্যষ্টিকে প্রধানতঃ আজ্ঞানুবর্ত্তন (Obedience to Law and order) করিবার শিক্ষা শৈশব হইতেই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আজকাল অনেকেই এইরূপ শিক্ষা প্রদানের প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতাচরণের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এরূপ ছিল না, তখন অনুসরণ নীতিরই প্রাবল্য ছিল। এবং এই আজ্ঞানুবর্ত্তন (Military discipline) শৈশব হইতে ব্যষ্টিকে অভ্যাস করিতে হইত। সুতরাং ভারতবাসী বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরিবারের কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রপতি পর্য্যন্ত সকলকেই সম্মান করিয়া চলিত এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইত। এই আজ্ঞাবহতাই এক্ষণে ব্যষ্টির নিকট ঘৃণার সামগ্রীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে তাহা তাহাদের নিকট ঘৃণিত। কাজেই ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্য আসিতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে উচ্চ পর্য্যায়ক্রমে, এমন কি, রাষ্ট্রপতির অনুশাসন মানিয়াও চলিতে কুণ্ঠিত। রাষ্ট্রপতি হইতে নিম্ন পর্য্যায়ক্রমে ব্যষ্টি পর্য্যন্ত যেন কেমন একটী বিচ্ছেদের ভাব আসিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব যেন আর নাই। ইহার প্রতিকার কে করিবে? কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে, কোন্ পথে আমরা অগ্রসর হইব? পূর্ব্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজই ভাল, না বর্ত্তমান কালের বিশৃঙ্খল সমাজ-বন্ধনই ভাল?

বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে যাইয়াই আজকাল আইন কানুন, ফৌজদারী, আদালত ইত্যাদি নানা প্রকার উপায় রাষ্ট্রপতিকে করিতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, পুরাকালে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজকে

যাহাতে বিশৃঙ্খলে উপস্থিত না হইতে হয়, তজ্জন্য রাষ্ট্রপতি বা সমাজপতিকে মাত্র ধর্ম্মানুশাসন প্রস্তুত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণ প্রণালীতে শাসন সমরক্ষণের ভার কতক পরিমাণে শাসিতের উপর ন্যস্ত করিয়া মাত্র সূত্র ধারণ করিয়া থাকিতেন। তাহার ফলেই পুত্র কন্যাগণের শাসন সমরক্ষণের ভার গৃহস্থের, গৃহস্থ সকলের ভার গ্রামিক মণ্ডলের, মণ্ডল সকলের ভার জনপদপতির এবং জনপদপতি সকলের ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং তাঁহার ভার আজকালকারমত কেন্দ্রীকরণ নিয়মে গুরু না হইয়া লঘু ছিল। এই কারণেই আমাদের মনে হয় যে, যদিও আজকালকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Self-Government) আমাদের আদর্শানুযায়ী নহে, তথাপি তাহা বর্ত্তমানে সভ্য জগতে আদৃত। এবং তাঁহারই ফলে যে ব্যষ্টিতন্ত্রতা আমাদের ছিল, তাহা এখনকার ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যের চক্ষে ঘৃণিত।

আদর্শানুযায়ী ব্যষ্টিকে শিক্ষিত করিতে পারিলে সে কথনই অন্যায় ভাবে স্বার্থপর না হইয়া পরার্থপর হইবেই হইবে। এবং পরার্থপরতাতেই তাহাকে স্বদেশ প্রেমে ক্রমে সার্ব্বভৌমিক প্রেমে উপনীত করিবে, ইহাই কি ব্যষ্টিক্রমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে? ব্যষ্টিকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক ধনচতুষ্টয়ে ধনী করিতে হইলে আমাদের কি প্রকার আয়োজন করা উচিত, তাহা এক্ষণে যথাসাধ্য বিচার করা যাউক।

আদর্শ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হইতে পারে না এবং আদর্শানুযায়ী কার্য্য করাইবার নিমিত্ত গুরু না হইলেও আদর্শানুযায়ী কার্য্য করাও যাইতে পারে না। সুতরাং আদর্শ ও গুরু উভয়েই আমাদের ঐ ধনচতুষ্টয়ের প্রাপ্তির কারণ। আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ গ্রামমণ্ডল, আদর্শ সমাজপতি এবং আদর্শ রাষ্ট্রপতিকে লক্ষ্য করিয়া সদ্‌গুরুর সাহায্যে আমাদের নিজ নিজ গুণানুযায়ী আদর্শ পুরুষ হইবার চেষ্টা করিলে লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারদর্শী হইবেন, তাহাকে সেই সেই বিষয়ের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং সেই আদর্শও স্বকীয় দেশকাল পাত্রের মধ্য হইতেই লইতে হইবে, নতুবা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কাল, ভিন্ন পাত্র হইতে লইলে আদর্শ ভুল হইবে। কিম্বা আমাদের নিজ নিজ বিষয়ের অনুশীলন ভুল হইবে। আরব দেশের আদর্শ শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের কি উপযোগী? কিম্বা হিমালয় প্রদেশের আদর্শ কি নদী-মাতৃকা বাখরগঞ্জের ন্যায় স্থানের আদর্শ হইতে পারে? আরব মরুভূমি, বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান, সুতরাং সকল বিষয়ে আদর্শ নির্ব্বাচনে সমাজ-নেতৃগণ কি সাবধান হইবেন না? আবার আদর্শ নির্ব্বাচনে পূর্ব্ব সমাজ নেতৃগণ ভুল না করিলে বর্ত্তমানে কি আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইত? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আদর্শ নির্ব্বাচন সমাজ-নেতৃগণের পক্ষে একটী দুরূহ সমস্যা। তাহাদের দূরদৃষ্টি, ভূয়োদর্শনের তারতম্যানুসারে আদর্শ ভাল ও মন্দ হইয়া থাকে। অতএব সমাজের নেতৃবর্গের নিকট লেখকের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যে, তাঁহারা সাবধানতার সহিত সমাজের সম্মুখে উপযুক্ত আদর্শ স্থাপন করিবার চেষ্টা পাইবেন।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান
করে উপদেশ।
যেয়ছে কয়লা কি ময়লা ছুটে যেও আগ
করে পরবেশ॥

সদ্‌গুরু উপস্থিত আদর্শের ভেদাভেদ শিষ্যকে সরল ব্যাখ্যা করিয়া প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিবেন এবং আদর্শের মর্ম্ম শিষ্যের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা পাইবেন। গুরু শিষ্যকে আপন অপত্য নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিবেন। তবেই তো শিষ্য গুরুকে সম্মান করিবে। এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী অন্ধবিশ্বাসীর ন্যায় চলিবে। তদ্বিপরীতে গুরু শিষ্যে প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারেন না। সুতরাং গুরু-নির্ব্বাচনেও আমাদের সমাজের নেতৃগণ সাবধান হইবেন। গুরু নির্ব্বাচনেও কি উপরোল্লিখিত আদর্শ নির্ব্বাচনের নিয়ম অবলম্বনীয় নহে? গুরু-নির্ব্বাচনের ভুলে শিষ্যের উদ্দেশ্য কি সফল হইতে পারে? মনে রাখিতে হইবে যে, গুরুজন নিস্বার্থপর হইবেন। স্বার্থপর গুরুই শিষ্যের অনিষ্টের কারণ। মনে হয়, আমাদের সমাজের দূরবস্থা কতক পরিমাণে আদর্শ ও গুরু-নির্ব্বাচনের ভুলে হইয়াছে। এক্ষণে কিসে এই ভুল সংশোধন হইতে পারে, তাহা কি সমাজনেতৃগণ ও তদুপরি আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সমাজের উন্নতিকল্পে মনোযোগ করিবেন না?

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষে শারীরিকে অবনত, মানসিকে যদিও লেখা পড়ায় বিজ্ঞ কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানে অজ্ঞ, নৈতিকে অবনত অর্থাৎ আত্মসম্মান বৃদ্ধির পরিমাণানুযায়ী অহঙ্কারী হেতু স্বার্থপরতাজনিত পরার্থপরতাহীন এবং আর্থিকে নিজ ক্ষমতায় উপার্জ্জনে অক্ষম হেতু মুখ্যত পিতা মাতার পরে গৌণতঃ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া কি ছাত্রগণ পাঠ শেষ করিয়া বাহির হইতেছে না? শিক্ষা বিভাগ লেখা পড়া শিখাইয়াই কি তাহার কর্ত্তব্য পর্য্যবসিত করিবেন? শারীরিক, নৈতিক এবং আর্থিক সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান কি ঐ বিভাগের কর্ত্তব্য মধ্যে নহে? মহাজনগণের নিকট শুনিতে পাই, শারীরিক বল (Muscle), মস্তিষ্ক (Head), অর্থ (Cash) এবং আত্মসম্মান (Pride) জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তিতে উৎভিন্ন হইলে রাষ্ট্র ক্ষমতাপন্ন হয়। ছাত্রগণকে ঐ বিষয় চতুষ্টয়ে পারদর্শী করিতে এক শিক্ষা-বিভাগই সক্ষম।

পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে গুরুগৃহে বাস করতঃ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আর্থিক ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইত। যদিও পাশ্চাত্য দেশের অনুকল্পে আজকালকার হোষ্টেল ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি তাহাকে পূর্ব্বকার গুরুর আশ্রম নানা কারণে বলা যাইতে পারে না। গুরুগণ যেমন ছাত্রের শারীরিক, মানসিক বৃত্তির অনুশীলন করাইতেন, তেমনি নৈতিকে—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক—উন্নত এবং আর্থিকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন, ইহার ফলে ছাত্রগণ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতেন। মানসিকে—বিদ্যায়—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ হইতেন। নীতিজ্ঞানে যেমন সংসারক্ষেত্রে সকলের হিতে আপন হিতজনিত নীতিজ্ঞান লাভ হইত, তেমনি আত্মার সদ্‌গতির জন্য পারত্রিক উন্নতিও সঙ্গে সঙ্গে সাধিত হইত। বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ, জ্ঞানী ও নীতিপরায়ণ হেতু সংসারক্ষেত্রে ন্যায়ভাবে উপার্জ্জন করতঃ পিতা মাতার আত্মীয় পরিজনের সেবা, পরে, গ্রামের, তৎপর স্বদেশের, সর্ব্বশেষে বিশ্বের সেবায় জীবন যাপন করিতে পারিতেন।

গুরুর আশ্রমে ছাত্রগণকে শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তদনুসরণ করিতে হইত, তাহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক সকল বিষয়ে অভ্যাস হইত। শুধু কেতাবী শিক্ষা হইত না। হাতে হেতেড়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে হইত। কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ সংকল্প পরে সাধনা শেষে সিদ্ধি; ইহাই ত জীবনের উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল ইহলৌকিক? পারলৌকিক কি নয়? বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ইহলৌকিক হিতার্থে মাত্র। গুরুর আশ্রম ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হাতে হেতেড়ে শিক্ষার স্থান। প্রেয় ও শ্রেয়, উভয়ই সমভাবে সাধনীয়। গুরু ইহাদের ভেদ বলিয়া দিতেন এবং তাহা সাধন করাইতেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রেয়ের সাধনা কিঞ্চিৎমাত্র শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইতেছেন। শ্রেয়ের দিকে মাত্রই লক্ষ্য করেন না। সুতরাং উপরোক্ত দোষ সকল ছাত্রগণে পরিস্ফুট হইতেছে, সমাজপতিগণ ইহা কি লক্ষ্য করিতেছেন?

শ্রীজগদিন্দ্রদেব রায়কত।

'অনুন্নত'-সমস্যা।

একটা কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে,—অধিকাংশ অনুন্নত জাতি নাকি ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ প্রচেষ্টার প্রতিকূলাচারী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। সে দিন কাগজে পড়িলাম,—মাদ্রাজের অনুন্নত জাতি বিশেষ সভা করিয়া হোমরুল আন্দোলনের বিরোধ ভাব জানাইয়াছেন। নমঃশূদ্র ভ্রাতাদেরও লক্ষ্য করিয়া সেদিন কোনও সংবাদপত্র উপদেশ দিয়াছেন যে,—তাঁহারা উন্নতির চেষ্টা করুন, কিন্তু নিজেদের রাজভক্তি-উচ্ছ্বাস প্রদর্শনের ছলে যেন উচ্চজাতীয়গণ রাজানুরক্ত নহেন—ইহা বলিয়া না বসেন।

উচ্চজাতীয়গণ রাজনৈতিক আন্দোলন করেন বলিয়া রাজভক্ত নহেন, এই যুক্তি অতীব অসার ও হাস্যাস্পদ, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার দুই কোটি হিন্দুর প্রায় দেড় কোটি সমাজের নিম্নস্তরবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। রাজার নিকট কোনও আন্দোলনের সহিত যদি এই দেড় কোটি বঙ্গবাসীর হৃদয়ের যোগ না থাকে, তবে সে আন্দোলনের কোনও মূল্য আছে—ইহা রাজপক্ষ বিবেচনা করিবেন কি করিয়া? এই বিরোধ ভাব সত্য হইলে আশঙ্কার বিষয় মনে করিতে হইবে।

অনুন্নত জাতিগুলিকে দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এইরূপ দেশাত্মবোধহীনতার কারণ দেখা যাউক। বৃটিশ রাজত্বে অনুন্নত জাতি শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল আত্মসম্ভ্রমবোধ,—মানুষের 'মানুষ' বলিয়া অনুভূতি। যেমন উচ্চজাতীয়গণ আজ শিক্ষালাভ-প্রসূত মনুষ্যত্বে প্রবুদ্ধ হইয়া স্বরাষ্ট্রের অমৃতময় ফল আস্বাদনে উন্মুখ হইয়াছেন,—ঠিক সেইরূপই অনুন্নত জাতি শিক্ষার আলোকে আপনার জীবনের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন। উচ্চজাতিসমূহ তাঁহাদিগের এই অগণিত অনুন্নত ভ্রাতাকে অবমাননার যে লজ্জাস্কর নিষ্পেষণে

বদ্ধ রাখিয়াছেন,—তাঁহাদের মনুষ্যত্বের প্রতি কঠোর উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবধানের যে জ্বালাময় বহ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন,—তাহার পরিবর্ত্তে যদি অনুন্নতগণ উচ্চজাতির সর্ব্ববিধ আন্দোলন অনুষ্ঠানের সহিত হৃদয়ের যোগ অস্বীকার করিতে অগ্রসর হন,—তবে শুধু বিস্মিত হইলে চলিবে না,—ব্যাধির মূল অন্বেষণ করিতে হইবে।

অভ্যুত্থানের এই জ্যোতির্ম্ময় মুহূর্ত্তে উচ্চজাতীয়গণ বাহিরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে নিজের ঘরের দিকে একবার ভাল করিয়া দৃক্‌পাত করিতে ভুল করিতেছেন, ইহা বলা অসমীচীন হইবে না। সেদিন সাহিত্য-ঋষি যখন গভীর নির্ঘোষে এই ঘরের ভিতর অবিচারের কথা ঘোষণা করিলেন,—তখন বাঙ্গালার পূজনীয় রাষ্ট্রনেতার পরিচালিত কাগজে লিখিত হইল যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজকে গালি পাড়িয়াছেন। যেখানে নির্য্যাতিতের প্রতি সমবেদনার বাণী উচ্চারণও গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য,—যেখানে অনুন্নতদিগের আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বের দাবি চিরকালই বিদলিত করিবার একটা নির্ম্মম চেষ্টা নিয়ত জাগরিত,—সেখানে অভিমানের ফলে যদি বিরুদ্ধ আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়া ফেলে, তবে তাহাতে তেমন বৈচিত্র্য কিছুই নাই! স্বীকার করি, এরূপ বিরোধ ভাব আত্মক্ষতিকর, এমন কি, আত্মহত্যা প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র; কিন্তু যাঁহারা একটী ক্ষুদ্র গ্রামের জাত্যাভিমানী মানবগণকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে ধরিতে গিয়া ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিতেছেন,—তাঁহারা এত বড় দেশের বিরাট সমাজকে আপনার বলিয়া ভাবিতে প্রবৃত্ত হইবেন কিরূপে? তাঁহাদের দেশাত্মবোধের ভিত্তি, আরোহণের প্রথম সোপানই যে ভগ্ন রহিয়া গেল!

বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, অনুন্নত জাতীয়েরা স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজের এই নিয়ম অনুশাসনের মধ্যে সন্তোষের সহিত আত্মসমর্পণ করিয়া আছে,—কখনও ঘৃণা বা উপেক্ষার কথা মুখে আনে নাই,—যাহারা উচ্চ জাতির সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করাটাই পাপ বলিয়া মনে করিয়া সযত্নে ব্যবধানটুকু রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজ সহসা তাহাদিগের পক্ষে সমাজের গণ্ডী পার হইবার জন্য অধীর হওয়াটা অস্বাভাবিক। যাহারা এতদিন শান্তিতে উচ্চজাতির সহিত খুড়া, জ্যাঠা, দাদা প্রভৃতি গ্রাম্যসম্বন্ধ বজায় রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের সুখে উৎফুল্ল হইয়াছে,—দুঃখে সহানুভূতি ও সাহায্য করিয়া আসিয়াছে,—উচ্চ জাতির আচার ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যে যাহারা ভ্রমেও কখনও দ্বিধাভাব পোষণ করে নাই, যাহাদিগের নিম্নস্তরে অবস্থান পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বা জন্মগত (!), আজ তাহারা সমাজে নব অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইলে চলিবে কেন?—যদি অনুন্নত জাতির পক্ষ হইতে ইহার প্রত্যুত্তর আইসে যে, "হে শূদ্রজীবী বাঙ্গালার সামাজিক অভিজাতগণ, আপনারা দীর্ঘ দিন শূদ্র বা দাসাবস্থাতে কালক্ষেপ করিয়াছেন,—আজ রাষ্ট্রীয় নবশক্তির দাবি করিয়া ইউরোপের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজীবী জাতিসমূহের সমকক্ষ হইতে চাহিতেছেন কিরূপে? আপনাদিগের এই শূদ্রাবস্থা বিধির বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হউন না কেন?—" তাহা হইলে অন্যায় বলা হইল বলিয়া বোধ হয় না।

অনুন্নত জাতির এই মনুষ্যত্বের দাবি যে চিরন্তন,—উচ্চ জাতির উপেক্ষা-ভরা আচারের প্রতি যে তাঁহাদিগের বরাবরের জন্য বিতৃষ্ণা,—তাহার প্রমাণ ইতিহাস প্রদান করিবে। বাঙ্গালার ৩ কোটি মুসলমানের প্রায় কেহই যে ইরাণ বা তুর্কি হইতে আসেন নাই,—অধিকাংশই বাঙ্গালার এই তথা-কথিত অনুন্নত জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। তরবারির ভয়ে বাঙ্গালার কৃষিজীবী নিম্নশ্রেণীর দল ইস্‌লামের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; তাঁহাদের মুসলমান হইবার কারণ উচ্চ জাতির অন্ধ অবজ্ঞা ও পদদলনের চেষ্টা। উচ্চ জাতির কশাঘাতের ব্যথায় শান্তি পাইবার জন্য তাঁহারা নির্ব্বেদের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লামে আত্মসমর্পণ করিতেছিলেন; এমন সময় সমবেদনার মধুর প্রস্রবণ লইয়া,—সাম্য ও প্রেমের অমৃতময় সন্দেশ বহন করিয়া ভগবানের অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন;—তাঁহার প্রেমের বন্যায় সামাজিক অভিজাতগণের অত্যাচার ভাসিয়া গেল!—'মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'—ধর্ম্মের এই নব অধিকার লাভের মোহন আকর্ষণে দলে দলে অনুন্নত জাতি বৈষ্ণব ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলেন!—আজও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের সেবকদিগের মধ্যে অনুন্নতজাতির সংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হইবে। এখনও যেমন অনুন্নতজাতি উচ্চজাতির স্বেচ্ছাতন্ত্র ঠেলিয়া ফেলিতে সমুৎসুক, সেই ঐতিহাসিক যুগেও তাঁহারা তদ্রূপ ছিলেন বলিয়া আজ বাঙ্গালার অর্দ্ধেকেরও বেশী ইস্‌লাম সেবক,—লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। সুতরাং এই আন্দোলন,—এই বিক্ষোভ, এই সামাজিক স্বেচ্ছাতন্ত্র অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা বিংশ শতাব্দীতেই জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা মনে করা ভ্রমাত্মক। অনুন্নত জাতি কখনও সন্তোষের সহিত উচ্চ জাতির উদ্ভাবিত অবমাননাকর আচারকে মানিয়া লন নাই।

পক্ষান্তরে, বৃটিশরাজের উদার নীতিতে অনুন্নতের অভ্যুত্থান-বাসনা পরাহত হইতে পায় নাই,—তাঁহারা নিম্ন সমাজভুক্ত প্রজাকে মনুষ্যত্বের দাবি হইতে বঞ্চিত করেন নাই; তাঁহাদের আইনে নরঘাতক ব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন নাই। উচ্চ ও নীচ জাতি বিশেষে তাঁহারা অপরাধের গুরুত্বের হ্রাসবৃদ্ধি করেন নাই। তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টে অনুন্নত সাহা জাতি হাইকোর্টের দুর্লভ আসন অলঙ্কৃত করিলেন,—নমঃশূদ্র ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শত শত উচ্চজাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন। এত দেখিয়াও যদি উচ্চজাতির আসন না টলে, সহানুভাবক হস্ত প্রসারিত না হয়—তবে অনুন্নত জাতি আজ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় যদি উচ্চ জাতির আন্দোলনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেজন্য দোষী উচ্চ জাতি,—অনুন্নত জাতি নহে।

উচ্চজাতিগণ তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের জন্য যে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—ইতর জন্তুকেও ততটা ব্যবধানবর্ত্তী করেন নাই! তাঁহারা জল অনাচরণীয় করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, বোধ হয় ক্ষমতা থাকিলে বায়ু, আলোক প্রভৃতি জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য পদার্থগুলিও এই অনাচরণীয়তার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিতেন! যদি উচ্চ জাতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে (উচ্চজাতি অর্থে জাতিভেদপরায়ণ হিন্দুসমাজের লোকই আমার লক্ষ্যভূত) অনুন্নতগণের মনুষ্যত্বের দাবি বুঝিতে পারিয়া

তাঁহাদিগকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তবে আজ অবস্থা ক্রমে এত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। যখন তথা-কথিত উচ্চসমাজের করুণামেঘ হইতে বারি বর্ষিত হইল না;—যখন উচ্চজাতি-প্রবর্ত্তিত ক্রূর দেশাচারের অনুশাসনের রুদ্ধ গৃহমধ্যে অনুন্নতগণ হাঁপাইয়া উঠিলেন,—তখন কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য প্রতিপাদিত হইবার চেষ্টায় শাস্ত্রব্যবসায়িগণের শরণাপন্ন হইলেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থা আসিল;—কিন্তু 'ভবী' ভুলিলেন না,—দেশাচারের দুর্ভেদ্য দেওয়াল ভেদ করিয়া অনুন্নতের কাতর আর্ত্তনাদ উচ্চ জাতির কর্ণে প্রবেশ করিল না,—সামাজিক অভিজাতগণের আসন টলিল না দেখিয়া নমঃশূদ্রগণ passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিলেন। সাম ও দান নিষ্ফল দেখিয়া তাঁহারা ভেদনীতির শরণাপন্ন হইলেন। যে উচ্চ জাতির জল গৃহীতব্য ছিল, নমঃশূদ্রগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন। আঘাতে প্রতিঘাতের সৃষ্টি হইল। নমঃশূদ্রগণের সামাজিক ব্যাপারে মিশনারি প্রভৃতি অভ্যর্থিত হইতে লাগিলেন। যাঁহাদিগের বর্ত্তমানতায় উচ্চ জাতি উচ্চ জাতি,—যে অনুন্নত সমাজরূপ অন্ধকারের মধ্যে উচ্চজাতি আলোক বলিয়া স্বীকৃত,—আজ যদি তাঁহারা বাম হইয়া বসেন,—অন্ধকার অপসৃত হয়, উচ্চ জাতির উচ্চতাটুকু স্বীকার করিবার কেহ না থাকেন,—তাই বুঝি একবার শুনা গিয়াছিল—নমঃশূদ্র জাতির জল চলন চেষ্টা হইতেছে! যখন আর্ত্তনাদে সাড়া আসিল না;—আঘাত পড়িতেই দ্বার খুলিল!—কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধি এই স্বার্থপর ভাবটুকু ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই;—তাহা হইলে শুনিতে পাইতাম,—আরও কত কৃষিজীবী অনুন্নত জাতি,—লক্ষ লক্ষ পোদ, রাজবংশী প্রভৃতির জল চলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! আর, নমঃশূদ্রের জলচলন—তাহা শুধু প্রস্তাবেই পর্য্যবসিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তেমনই রহিয়া গেল। ক্ষত শুকাইল না,—নমঃশূদ্রের অসন্তোষ উচ্চ জাতির চাতুরীতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল মাত্র;—তাঁহারা উচ্চ জাতির সঙ্কল্প প্রতিরোধে অধীর হইয়া উঠিলেন! এই অধীরতার স্পষ্ট সাড়া সেদিন 'ডালহৌসি ইনষ্টিটুটে' পাওয়া গিয়াছে। যদি 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র কথা সত্য হয়,—২০ লক্ষ নমঃশূদ্রের প্রতিনিধি সভা ভারতের চিরপ্রত্যাশিত শাসনসংস্কারের প্রতিবাদ জানাইয়াছে! কি আশঙ্কার কথা!

হইতে পারে, এইরূপ সভার অধিবেশন ব্যাপারে অলক্ষ্যে এংলোইণ্ডিয়ান হস্ত রহিয়াছে,—কিন্তু উচ্চ জাতির উপেক্ষাপূর্ণ ব্যবহার কি ইহার কারণ নয়? অনুন্নতজাতিগণ বলিতেছেন,—শাসন-সংস্কারে বাঙ্গালার আন্দোলনকারী অভিজাতবর্গই অধিকতর কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইবেন,—কারণ তাঁহারাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। সেই প্রতিনিধি সভা উদার বৃটিশনীতির ক্ষমতা সঙ্কোচে অনুন্নতগণকে পীড়ন করিবার জন্য অভিনব ব্যাপার সৃষ্টি করিবেন কি না,—আবার বঙ্গে "জাতিমালা" কাছারির অভ্যুদয় হইবে কি না, কে বলিবে!

অনুন্নত জাতির অভ্যুদয় প্রচেষ্টার সহায় যতদিন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ হইতেছেন না, ততদিন বিক্ষোভ চলিবেই। ব্রাহ্মসমাজ, Social service league. Depressed classes mission society প্রভৃতির উদার আন্দোলন হিন্দু সমাজ বিতৃষ্ণার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছেন।—এই সহৃদয়তার

অভাব অনুন্নতের জন্য যে কোনও কর্ত্তব্য সম্পাদনের পথে অন্তরায় হইয়া আছে।—অনুন্নত-বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সর্ব্ববঙ্গ হিন্দু শিক্ষা সম্মিলন" কি এই হৃদয়হীনতার জন্যই নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হয় নাই? সেদিন প্রাদেশিক সম্মিলনের রত্নবেদী হইতে ঋত্বিকের যে মহান্ বাণী অনুন্নতের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ধ্বনিত হইয়াছিল,—তাহার সফলতা কোথায়? সেই উদার আহ্বানের সমপ্রাণতাময় প্রতিধ্বনি কোথায়?—শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—

"যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার ৪ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি,—যাহারা দেশের সার বস্তু;—যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের শস্য উৎপাদন করে;—যাহারা ঘোর দারিদ্র্য মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে;—যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে,—যাহারা আজিও শুদ্ধচিত্তে সরল প্রাণে জন্মে জন্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়,—মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে;—যাহাদের জন্য বাঙ্গালী বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালার জনের সঙ্গে এক হইয়া বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে যাজ্ঞিক অগ্নির মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে,—যাহাদিগকে আমরা বিলাতি শিক্ষার মোহে, আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা ন্যায় কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য শত প্রলোভন দেখাইয়া,—শত অত্যাচার করিয়া একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি নাই;—যাহারা বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ,—তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জলস্পর্শ করি না,—কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা,—যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি,—সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান,—সেখানে আঘাত করিতেছি! * * * বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইবে!—ঐ মা ডাকিতেছেন,—সাবধান!—"

সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গ স্ব স্ব আবাস স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া এই মহান্ বাণীর কি সার্থকতা করিয়াছেন,—মা'র ডাকে কিরূপ সাড়া দিয়াছেন—জানি না।—কিন্তু অনুন্নতের আর্ত্তনাদ মন্দীভূত হয় নাই,—বাড়িয়াই চলিয়াছে! শুধু বক্তৃতা শ্রবণই যদি প্রতিনিধিগণের কর্ত্তব্য মাত্র হয়,—তবে এরূপ সম্মিলনকে দূর হইতে নমস্কার!

সেদিন ভারতের শাসন-সংস্কার-বিদ্বেষী লর্ড সিডেনহাম বলিয়াছেন,—

"The Indians' most pressing need is the abolition of caste system and here lies a magnificent field of work for real Indian patriots."

সিডেনহামের এ কথা উচ্চ জাতিগণ উড়াইয়া দিলেও, অপমান-জর্জ্জরিত অনুন্নত জাতি ইহার সারবত্তা অস্বীকার করিতে পারেন না। উচ্চ জাতিগণ যদি নিজের ঘরের বেলায় যোগ্যতমের অভ্যুত্থান অস্বীকার করেন,—তবে পরের নিকট উহা প্রত্যাশা করিবেন কিরূপে? জাতিপ্রথা না উঠুক, যিনি যে জাতি তিনি তাহাই থাকুন,—কিন্তু মানুষ

মানুষকে পশু অপেক্ষাও হেয় ভাবিবে,—ইহা অভিপ্রেত নহে। আর এই ভেদভাব যতক্ষণ মানুষের মন হইতে বিদূরিত না হইতেছে, ততক্ষণ তাহার কোনও যোগ্যতা আসিয়াছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবেই।

উচ্চজাতি যাঁহাদিগকে সরল বলিয়া ঘৃণা করেন,—স্বচ্ছন্দে তাঁহাদিগকে ধোপা নাপিত প্রদান করিয়াছেন,—কারণ সে বড় কঠিন ঠাঁই! এই যে অত্যাচার-নির্জ্জিত শত শত অনুন্নতজাতীয়গণ মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে,—সেজন্য দায়ী উচ্চজাতি। রামচরণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু,—ধোপা-নাপিত-বর্জ্জিত; কিন্তু যেই সে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া বসিল,—ধোপা নাপিত তাহাকে আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না!—অহিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্যভোজীর বদন মণ্ডলে যে ক্ষুর নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়,—হিন্দু আচারী অনুন্নত জাতির অঙ্গ স্পর্শ সে ক্ষুরের পক্ষে বারিত! এই উপেক্ষা যে জন্মসংস্কারগত হইয়া শিক্ষিত সমাজেও ঈর্ষার খেলা খেলিতেছে, তাহা "নব্যভারতে" মদীয় "অনুন্নত জাতি ও শিক্ষিত সমাজ" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের একটী জেলার সরকারি অফিসের কোনও দেশীয় কর্ত্তার অধীনে কয়েকটী কর্ম্ম খালি ছিল,—উচ্চ কার্য্যের জন্য মনোনীতদিগের মধ্যে নাকি জনৈক নমঃশূদ্র ছিলেন,—আশ্চর্য্যের বিষয়, নমঃশূদ্রের দরখাস্তের উপর নিয়োক্তা কর্ম্মচারী মহাশয়ের যে আদেশ ছিল, তাহার মর্ম্ম অন্যান্য দরখাস্তগুলির উপর লিখিত আদেশের মর্ম্মানুবর্ত্তী হইলেও ভাষাটা এমন একটা অশ্রদ্ধা ও নিতান্ত আধিপত্যব্যঞ্জক ছিল, যাহা অন্যগুলিতে ছিল না। কোনও বৃটিশ রাজকর্ম্মচারী মনুষ্যত্ব ও যোগ্যতার উপর এরূপ ভ্রূক্ষেপশূন্য হইতে সঙ্কুচিত হইতেন, সন্দেহ নাই।

সামাজিক আচারগুলি স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে;—স্বেচ্ছাচারতন্ত্র কোথায় কঠোর, আবার কোথায় বা একটু কোমল! মেদিনীপুরের কাঁথি সবডিবিজনের একস্থানে বাগ্দীজাতির জল চল আছে,—তাহাদের ধোপা নাপিতও অচল নাই!—কিন্তু নবশাখ পর্য্যায়ভুক্ত কুম্ভকারের জল চল নাই! এখানে ব্রাহ্মণ সংশ্রবহীন 'শবর' নামক এক প্রকার বেদিয়া জাতি—সাপখেলা ও পাখী শিকার যাহাদের ব্যবসায়, স্বচ্ছন্দে ধোপা নাপিতের সেবা পাইতেছে:—কিন্তু কৃষিজীবী হিন্দু আচারী নমঃশূদ্রাদির তাহা নাই! আবার স্থানবিশেষে দৃষ্ট হইবে,—বাগ্দীর জল চলে না, শবরজাতি ধোপা নাপিত পায় না। এই খামখেয়াল-পরতন্ত্রের বলেই ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষিজীবী মাহিষ্যের জল চল নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—যেখানে অনুন্নত জাতির ক্ষমতা উচ্চজাতির বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, সেখানে অনুন্নতদিগের দাবি সংরক্ষিত হইয়াছে,—যেখানে তাহা হয় নাই—সেখানে বোঝাটা তেমনি ভারী রহিয়া গিয়াছে! দুই ক্রোশ ব্যবধানের এদিকে যাহার জল চল নাই, ধোপা-নাপিতের সংশ্রব নিষিদ্ধ,—অপর প্রান্তে তাহার জল চল ও ধোপা নাপিত বজায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সমস্ত জাতির গা ঝাড়া দেওয়াটা ইহাদের সমাজের মধ্যে সার্ব্বজনীন হয় নাই। যে সহিয়াছে,—নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে, তাহার বোঝা লাঘব করাটা দরকার হয়

নাই,—যেমন এখনও হইতেছে। যাহা হউক, ইহা দ্বারাও প্রতীতি হইবে যে, অতি পূর্ব্বকালেও অনুন্নতজাতির অভ্যুত্থানেচ্ছাকে উচ্চজাতীয়গণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

সেদিন কাগজে পড়িলাম, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতি জাতিভুক্ত লোকগণকে একটী সভায় আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—তাঁহারা হাড়ি, ডোম, চামারাদির জল গ্রহণ করিতে পারেন কি না?—নমঃশূদ্রাদি তাহাতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন বলিয়া নাকি এই সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হইয়াছে যে,—যাহারা অপরের দুঃখের প্রতিকারে বিতৃষ্ণ,—তাহাদিগের দুঃখ অপ্রতিকৃত রহিলে ক্ষোভের কারণ কি? কিন্তু আমরা বলি,—এই যে অনুন্নত জাতিগুলি হাড়ি, চামারাদির জল গ্রহণে নারাজ হইলেন,—তাহার কারণ উচ্চ জাতির সাহচর্য্য হইতে অত্যধিক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িবার ভয় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। উচ্চ জাতিকে অবহেলা করিবার জন্য, উচ্চ জাতির কার্য্যপরম্পরা নিয়মিত করিবার জন্য উচ্চতর অন্য কোনও সমাজসংঘ নাই;—কিন্তু অনুন্নত জাতির উপর উচ্চ জাতির স্বেচ্ছাচারতন্ত্র সর্ব্বদা সমুদ্যত। আজ পোদ নমঃশূদ্রাদি ডোম চামারের জল গ্রহণ করিলে উচ্চ জাতীয়গণ তাহাদের জল গ্রহণ করিয়া অনুরূপ মহানুভবতা দেখাইবেন কি না, তাহার নির্ণয় কি? প্রশ্নটা যদি এই ভাবে কর হইত যে, উচ্চ জাতীয়গণ পোদ নমঃশূদ্রাদির জল গ্রহণে রাজি হইবেন,—যদি তাঁহারা হাড়িডোমাদির জল গ্রহণে রাজি হন,—তাহা হইলেই বুঝা যাইত যে, অনুন্নত জাতি হাড়ি ডোমাদির জল গ্রহণ করিলেও উচ্চ জাতির অনাচরণীয় রহিবার আশঙ্কা তাঁহাদের নাই। সুতরাং হাড়ি ডোমাদির জল গ্রহণের সৎসাহস দেখাইতে বোধ হয় পশ্চাৎপদ হইতেন না। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, যাঁহারা দীর্ঘকাল হাড়ি ডোমকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, কার্য্যতঃ এই সংস্কার পরিবর্ত্তনের ধারণা তাঁহাদিগের নিকট অশক্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইবে। যাহারা আঘাতে অভ্যস্ত হইয়া বেদনানুভূতির বাহিরে দাঁড়াইয়াছে,—অভ্যাস ও সংস্কারের দৈর্ঘ্যটুকুও অতিক্রম করিতে যাহারা পারে না;—যাহারা আত্মতুলনা করিতে,—সহানুভব করিতে অক্ষম,—এই প্রস্তাবে তাহাদের অসম্মতি আসিতে পারে বটে, কিন্তু যাহাদের অনুভূতি আছে, যাহারা হৃদয় দিয়া মনুষ্য সমাজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছে,—তাহারা কখনও অসম্মত হইবে না,—হইতেও পারে না। নমঃশূদ্র পোদ রাজবংশীকে জল চল করা যেমন—তুমি উচ্চ জাতি—তোমার করায়ত্ত, হাড়ি ডোমকে জলাচরণীয় করা তেমনই তুমি উচ্চ জাতি, তোমারই সাধ্যায়ত্ত।

সকল প্রজা সাধারণের বিত্তে গবর্ণমেণ্টের তহবিল গঠিত। সেই তহবিলের অর্থসাহায্যে স্থাপিত "হিন্দু হোষ্টেলে" নমঃশূদ্রাদির স্থান নাই! উচ্চ জাতির আভিজাত্য-গর্ব্ব লাঠি উঁচাইয়া অনুন্নতদিগের জন্য 'হিন্দু হোষ্টেলে'র দ্বার রুদ্ধ রাখিয়াছে। এই হিন্দু হোষ্টেলে 'হিন্দু' নামধারী অনুন্নতগণের স্থান নাই! তাই ঢাকায় নমঃশূদ্র-হোষ্টেল স্থাপিত হইয়াছে;—রাজসাহীর নমঃশূদ্র বোর্ডিং, কুমিল্লার যোগী বোর্ডিং প্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ইহা শুভলক্ষণ নহে। নিপীড়নপরায়ণ উচ্চ জাতিগণ অনু-

ন্নতের এই স্বাতন্ত্র্যে উল্লসিত হইয়াছেন কি না, জানি না,—কিন্তু এইরূপ স্বতন্ত্র হোষ্টেল স্থাপন একটা আশঙ্কার বিষয়, সন্দেহ নাই। আজ নমঃশূদ্র হোষ্টেল দেখিতে পাইতেছি,—কাল হয়ত অনুন্নতদিগের জন্য নূতন কলেজ বা য়ুনিভার্সিটী দেখিতে পাইব!—ক্রমে Depressed classes League নামক অভিনব রাষ্ট্রীয় সংঘ গঠিত হইয়া উচ্চজাতির সর্ব্ববিধ সংকল্প বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়!

হিংসা ও আত্মসুখপরায়ণ উচ্চজাতি! একবার প্রকৃতিস্থ হইয়া আপন ঘরের দিকে দৃক্‌পাত কর। মানুষকে—আপনার ভাইকে শৃগাল কুকুরের অধম করিয়া রাখিবার চেষ্টা কখনও দীর্ঘকাল জয়যুক্ত রহিবে না। উদার হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বভূতের সমানত্ব প্রচার করিয়া জীব ও শিবের একত্ব প্রদর্শন করিয়াছে;—সেই প্রাণীরূপী নারায়ণকে, বেদান্তের সোহহংকে এত অবহেলা করিয়া প্রত্যবায়ের বোঝা আর ভারী করিও না! সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আর কলঙ্ক আনিও না! তুমি অন্তরে বাহিরে, গৃহে সমাজে অনুন্নতদিগের মনুষ্যত্বের প্রতি যে অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছ,—তাহাদিগের সহজ জীবনযাত্রার মাঝে যে মিথ্যা ও অপমানের স্তূপ পুঞ্জীভূত করিয়া দিয়াছ,—বিশ্বেশ্বরের রথচক্রে তাহা নিষ্পেষিত হইয়া যাইবেই। এখনও যদি তুমি অবহিত না হও, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এই পূর্ণ বিভূতিগুলির প্রতি আচারে ব্যবহারে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে যদি তোমার সমপ্রাণতা ও নিষ্ঠা জাগিয়া না উঠে, তবে তোমার স্বায়ত্বশাসন লাভ কল্পনা তাসের প্রাসাদের ন্যায় ফুৎকারে ধূলিসাৎ হইবে! তোমার স্বয়ম্প্রভুতা-তন্ত্র স্বপ্নই রহিয়া যাইবে। সফলতা কখনও যোগ্যতাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। যোগ্য হও, মনুষ্যত্বে ভূষিত হও,—আপনার ভাইকে বক্ষে ধরিয়া আপনার বলিতে ঘৃণা ত্যাগ কর,—তোমার সাধনা সার্থক হইবে,—বাসনা বলবতী হইবে।

এস, মুক্তিকামী সাধকবর্গ, আজ বাহিরে নব অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত ভাইগুলিকে অপমানের বোঝা হইতে মুক্তি দাও! এস, ভারতের রাজনৈতিক গগনের ধ্রুবতারাগুলি! নেতা, পরিচালক ও দেশহিতকামিগণ! ভ্রাতার মুক্তির সন্দেশ লইয়া গ্রামে গ্রামে ধ্বনিত কর। যাহাদের কত যুগ ধরিয়া অবজ্ঞা ভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছ,—আজ তাহাদের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া,—ব্যথায় সমবেদনা জানাইয়া, আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া 'এক মাতার সন্তান' এই অধিকারবোধের অনুভূতি জাগাইয়া দাও! ভগবানের রাজ্যে তাহারা উপেক্ষিত নয়,—উদার বৃটিশ শাসন তাহাদিগকে অবহেলা করে নাই। মানুষ তুমি,—মানুষকে ঘৃণা করিবার—তাচ্ছল্য করিবার তোমার কি অধিকার? চরিত্রে কি তোমরা এত উন্নত,—পবিত্রতায় কি তোমরা এত ভূষিত,—মনুষ্যত্বে তোমরা কি এত প্রদীপ্ত, যে জন্য নিরীহ ভাইগুলিকে অবহেলা করিয়া আছ! আজ সেন্সাস্ রিপোর্টের পৃষ্ঠা যে বলিতেছে,—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কারাবাসীর সংখ্যা অধিক, * ইহা কি তোমাদের পবিত্রতায় দম্ভ ম্লান করিতেছে না? দেশের নেতৃবর্গ হৃদয় ঢালিয়া

* "Inmates of jails—Brahman 542, Kayasth 817, Namasudra 268, Pod 54, Rajbanshi 43 etc." The Census Report for 1911, vide appendix to Table XVI part II, Group 168 (part).

দিয়া পতিতোদ্ধারে অবতীর্ণ হউন! শুধু কথায়,—শুধু বক্তৃতায় কিছু হইবে না; কার্য্যে, আচারে, অনুষ্ঠানে সমপ্রাণতা দেখাইতে হইবে! মনুষ্যত্বের দাবির প্রতি অবহিত হইতে হইবে!—দেশজননীর মলিন আস্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে!—নতুবা এই অনুন্নত-সমস্যা হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা হইতেও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে;—স্বধর্ম্মীর প্রতি, অনুরক্তের প্রতি এতটা অবিচার বিধাতা সহিতে পারিবেন না!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ।

শান্তি শতক।*

নম্বিব কি দেবগণে? তা'রা বিধিবশ;
কি ফল বিধিরে বন্দি'?—দেয় কর্ম্মফলে;
ফল কর্ম্মাধীন; পূজি বিধাতা ত্রিদশ
নাহি ফল!—নমি তাই করম সকলে!
করম নিচয়ে তাই করি নমস্কার
যা' সবে এড়াতে শক্তি নাহি
বিধাতার! ১।

সংসারেতে দুখ যত ভুঞ্জে জীবগণ
তা' সবার হয় যাহা বিনাশ সাধক,—
সন্তোষ লভয়ে যাহে সুপণ্ডিত জন,
এমন পুস্তক হয় এ শান্তিশতক!
শুদ্ধ বুদ্ধি শীলবান্ বিবেকী শিহ্লন
রচিলেন এ পুস্তক করিয়া যতন। ২।

বিবেকে যা'দের চিত্ত হয়েছে নির্ম্মল
কি দুষ্কর কর্ম্ম তা'রা সাধন করয়ে!
পৃথিবীর উপভোগ্য ঐশ্বর্য্য সকল
পরিহার করে তা'রা স্পৃহাশূন্য হ'য়ে!
লভিনি আমরা কভু ধন রত্নচয়,
এখনও তা'সবারে নারিনু লভিতে,
ভবিষ্যতে লভিব না ভাছে ঐ প্রত্যয়
কিন্তু হায়! তবু নারি আশা
তেয়াগিতে। ৩।

পর্ব্বত কন্দরে বসি' ধন্য মুনিগণ
ধ্যান করে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রধানে
নিঃশঙ্কে অঙ্কেতে বসি' বিহঙ্গমগণ
তুষ্ট হয় তাহাদের আনন্দাশ্রু পানে!
হায় রে আমরা সরঃ, প্রাসাদ, পুলিন,
ক্রীড়াবন, কেলিগৃহ, রচি কল্পনায়,
দেখিনাকো আয়ুঃ হয় দিনে দিনে ক্ষীণ
কল্পিত বিষয়ে সদা রহি' মুগ্ধপ্রায়। ৪।

করম-উদ্যম মোর হয়েছে বিকল,
শরীর এখন জরা-ব্যাধিতে বিধুর,
গিয়াছে স্বজনসেবা-ইচ্ছাদি সকল,—
তবু মুগ্ধ রহি! হায়, বিধাতা নিঠুর!
যাহাতে হইবে মোর দুখ-অবসান
আজিও তো উদিল না হৃদে তত্ত্বজ্ঞান! ৫।

নিন্দিত বুঝিতে পারি বিষয় সকল,
তথাপি তো বর্দ্ধমান হয় অভিলাষ!
একদিন জানি দেহ হইবে বিকল,
তথাপি তো নাহি হয় মায়ার বিনাশ!
কর্ত্তব্য যখনি বুঝি ব্রহ্ম-উপাসনা
বাসনা তখনি আসি' মনে নিবর্ত্তয়!—
সজ্জনেও দেয় যাহা অশেষ যাতনা
বাসনার তত্ত্ব সেই কে করে নির্ণয়? ৬।

দাহপীড়া না জানিয়া,—দীপ্ত হুতাশন
দেখি' ধায় তা'র মাঝে পতঙ্গ মোহিত,

* কবিবর শিহ্লন প্রণীত।

না জানিয়া মীন হায় করয়ে ভক্ষণ
সুতীক্ষ্ণ বড়িশে,—মাংসখণ্ড আচ্ছাদিত!
মোহের মহিমা কিবা! বিপদ জড়িত
জানিয়াও রহি মোরা কামেতে
মোহিত। ৭।

ক্ষমাগুণ নাই, তবু সব সহি' যাই
সন্তোষে না ত্যজি, তবু ত্যাগ করি সুখ,
তপঃ নাহি করি, তবু সহি তো সদাই
শীত বাত, সূর্য্যরশ্মি, সুদুঃসহ দুখ!
বিষ্ণুপদ চিন্তা বটে করি না কখন
বিত্ত চিন্তি' কাটে তবু চিন্তায় সময়,—
হায় রে যে সব কর্ম্ম করে মুনিগণ
সেই সব করি তবু সে ফল না হয়! ৮।

শস্ত্রভয় প্রদর্শিয়া করয়ে পীড়ন
কতিপয় গ্রামে যা'রা দীন প্রজাগণে
মুগ্ধ করে যা'সবারে ধূর্ত্ত জনগণ
পৃথ্বীপতি বলি' তারা বিখ্যাত ভুবনে।
জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ সাধন
যেই ঈশ নারায়ণ হ'তে সদা হয়,
সেই প্রভু পরমেশে না করি' গণন
নৃপগণে ভজি' বিজ্ঞ মোরা সমুদয়! ৯।

রহিছেন নাথ সেই পুরুষ-প্রধান,
ত্রিলোকের অদ্বিতীয় এক অধীশ্বর,
সেবকে করেন যিনি নিজ পদ দান
রহিছেন নারায়ণ অমর-প্রবর!
হায় রে আমরা ক্ষুদ্র অতি মূঢ় নর,—
যেই মোরা তেয়াগিয়া হেন নারায়ণ,
সেবি কোন কতিপয়-গ্রামের ঈশ্বর
পুরুষ-অধম যেই দেয় অল্প ধন! ১০।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

ব্রাহ্মবন্ধুগণের প্রতি নিবেদন।

(১)

আমি একজন খ্রীষ্টীয়ান। কিন্তু এক সময় ছিল, যখন আমিও একজন ব্রাহ্ম ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। যাঁহারা আমাকে জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ জগতে আর নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও আমারই ন্যায় জীবনের সায়াহ্ন-কালে খেলা ধূলা অবসানে গৃহ পানে চাহিয়া আছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে তাঁহাদের স্মৃতিপটে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। তা ছাড়া এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কেহ সুচক্ষে দেখিতেন, কেহ কুচক্ষে দেখিতেন। এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিও যে ভাবে চলা উচিত, সে ভাবে যে চলিত, তাহা নহে। অসংযত যৌবনের উদ্বেলিত উদ্ধতায় ধরাখানিকে সরা-খানি জ্ঞান করিত। প্রবৃত্তি যে পথ দেখাইত, সেই পথকে সত্য মনে করিয়া জ্ঞানী ও মানী জনের অবজ্ঞা করিত। প্রবৃত্তির বাণীকে বিবেক-বাণী মনে করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের পশ্চাতে চলিত। সে সকল পুরাতন কথা। মনে করিলে কষ্ট হয়। লাগাম-হীন জীবনকে স্বাধীনতা ভাবিতাম। অতএব আমার ব্যবহারে যদি কোন ভদ্র-লোক রুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার দোষ কি? যাঁহারা ভালবাসিতেন, তাঁহারা যে ভালবাসিতেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সে অনেক দিনের কথা। অষ্টাবিংশতি

বৎসর পূর্ব্বে এই দাস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিল। এই অষ্টাবিংশ বর্ষে জগতে কত কত বিপ্লব ঘটিয়াছে—কত কত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং এই নগণ্য ও ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবনে যদি একটা বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিরূপে প্রিয় বঙ্গ-দেশ ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক হিমাদ্রি শিখরে খ্রীষ্টের জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টের চরণে শরণ লইয়াছে, তদ্বিবরণ কতকটা কয়েক বৎসর হইল "জীবন কাহিনী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে *। সুতরাং তদ্বিবরণ এস্থলে পুনর্ব্বার বর্ণন করিবার আবশ্যকতা নাই।

পঞ্চবিংশতি বৎসর হইল আমি খ্রীষ্টের চরণে আসিয়াছি, অতএব সেও অনেকদিনের কথা। পঞ্চবিংশতি বৎসর এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ। এক নূতন বংশ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর আমরা, যাহারা নূতন বংশ বলিয়া জগতে আস্ফালন করিতাম, বার্দ্ধক্যের কাছাকাছি পৌঁছিয়া ভবিষ্যতের দিন কটি গণনা করিতেছি। অতএব এই পঞ্চবিংশতি বৎসরের খ্রীষ্টীয় অভিজ্ঞতা হইতে যদি আমি গোটাকতক কথা আপনাদের চরণে নিবেদন করি, তবে বোধ করি আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের উদারতা গুণে শ্রবণ করিবেন।

(২)

খ্রীষ্টীয়ান শব্দটা শুনিতেই আমাদের দেশের লোকের গা বমি বমি করে। ইহাতে তাহাদের যে সম্পূর্ণ দোষ, তাহা নহে। যে দেশে চুণাগলির সাহেবেরা খ্রীষ্টীয়ত্বের আদর্শ, সে দেশে খ্রীষ্টীয়ানের নামে গা বমি বমি না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তা ছাড়া ভারতীয় খৃষ্টীয়ানেরাও যে সকলেই খৃষ্টীয়ান, তাহা নহে। খৃষ্টীয়ান সমাজে অনেক খৃষ্টপ্রাণ ধার্ম্মিক পুরুষ ও ধার্ম্মিকা নারী আছেন। তাঁহাদের দর্শনে পুণ্য হয়। আবার খৃষ্টীয় সমাজে এমন অনেক লোকও আছে, যাহাদের জীবন ও চরিত্র খৃষ্টীয়মণ্ডলী ও খৃষ্টের নামের কলঙ্ক। আমরা এ কথাটা স্বীকার করি—আপনারাও এ কথাটা জানেন—আমিও খৃষ্টীয়ান হইবার পূর্ব্বে এ কথাটা জানিতাম। আমি যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি ও যে খ্রীষ্টীয়ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষী, সে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয়ত্ব (New Testament) নূতন ধর্ম্ম নিয়মের খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয়ত্ব। এই খ্রীষ্ট ভারতের আশা ও এই খ্রীষ্টীয়ত্বই ভারতের জীবন ও সাধনার বিষয়।

আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম, তখন মনে করিতাম, জগতে যতটা সত্য আবিষ্কার হওয়া সম্ভব, তা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া গিয়াছে। অনন্ত ঈশ্বরের সত্য কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটা কৌটায় আবদ্ধ বুঝিতাম। আধ্যাত্মিক জগতটাকে সেই কৌটার এক কোণে জন-কতক সাধকের জীবনে একখানি নেকড়ায় বাঁধা হীরা খণ্ডের ন্যায় মনে করিতাম। যেমন কলম্বসের সমসাময়িক লোকেরা আটলাণ্টিকের পরপারেও যে কোন দেশ থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিত না, সেইরূপ, আমি ও আমার সদৃশ যুবকেরাও ভাবিত যে, সার্ব্বভৌম সত্য ব্রাহ্মসমাজের দেওয়াল চতুষ্টয়ের মধ্যেই আবদ্ধ। সে অনেক দিনের কথা। গত অষ্টাবিংশ বর্ষে ব্রাহ্মসমাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছেন, জানি না,—ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী কতটা প্রসারিত

* এই পুস্তক ২৩ চৌরঙ্গী রোড হইতে কলিকাতা ট্রাকট ও বুক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হয়। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

হইয়াছে, জানি না। দূরদেশে থাকি—একটা বাগানের মধ্যে চুপি চুপি জীবনটা কাটাইয়া দিতেছি—জানিব কি করিয়া?

আবার খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যেও কতকটা এই ভাব দেখিলাম। খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয়ত্বের যে ব্যাখ্যা প্রতীচ্য দেশ সকল প্রদান করে, যদি সে ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোন নূতন কথা বল, তবে তুমি heretic, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সময় এখন বদলিয়া গিয়াছে। শুভক্ষণে সিকাগোতে ধর্ম্মের পার্লেমেণ্ট বসিয়াছিল—খ্রীষ্টীয় জগৎ অখ্রীষ্টীয় জগতকে আপন আপন ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এইরূপে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যে একটু খানি সদ্ভাব ঘটে। এদিকে মিশনারীরা নানা জাতির মধ্যে কাজ করিতে করিতে ঐ সকল জাতির ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িতেছিলেন—ঐ সকল জাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান করিতেছিলেন—ঐ সকল জাতির হৃদ্‌পিণ্ডটা কি ভাবে ধড়ফড় করে, দেখিতেছিলেন। তাঁহারা আমাদের নাড়ী টিপিয়া আমাদিগকে কতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। তবে এই নাড়ী টেপার ফলে তাঁহারা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা উদার হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহারই ফল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এডিনবরার বিরাট মিশনরী সভা। ঐ সভার কার্য্যবিবরণ নয় খণ্ডে বিভক্ত। ঐ কার্য্যবিবরণগুলি পড়িলে এই উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর শুভদিনে ডাঃ মট (Dr. Mott) সাহেবের ভারতে আগমন—ভারতের নানা কেন্দ্রে সভাসমিতি ও কলিকাতা নগরে সমগ্র ভারতের মিশন প্রতিনিধিগণের জাতীয় সভা (National council of Missions.) সেই সভায় এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও এক কোণে একটু স্থান মিলিয়াছিল। সেখানে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহা জীবনে একই বার দেখা শোনা যায়। এক কথায়, উদার-নীতি এখন খ্রীষ্টীয় মিশনের নীতি—অখ্রীষ্টীয় জগতকে আক্রমণ করিও না—খ্রীষ্টের প্রেমে ভাই বলিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন কর, খৃষ্টের সার্ব্বভৌম প্রেমে যদি পার তাহা-দিগকে টানিয়া খৃষ্টের নিকট আন ও সেই প্রেমে জগতকে মাতাও।

কলিকাতার সেই সভা বেশী দিনের কথা নহে। যেখানে খৃষ্টীয় মিশনের মহা-রথীগণ ভারতে খৃষ্টরাজ্য স্থাপনের সুপ্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই শ্বেতসঙ্ঘে আমার ন্যায় দু চারিজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ও ললনার নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হওয়াই পূর্ব্বোক্ত উদারনীতির পরিচায়ক।

কিন্তু সুখের দিন অল্পই হয়। যখন প্রতীচ্য ও প্রাচ্য জগৎ এক অপরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, তখনি ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে সমর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল—এক ভাই অপর ভাইয়ের গলা কাটিতে প্রবৃত্ত হইল—খৃষ্টীয় জগৎ খৃষ্টের প্রেম ও খৃষ্টের ক্রুশ ভুলিয়া গিয়া রক্ত-সাগরে নিমজ্জিত হইল !! উদারনীতি প্রতি-পদ চন্দ্রের ন্যায় উঠিতে উঠিতে ডুবিয়া গেল !

(৩)

কি লিখিতে বসিলাম, কি লিখিয়া ফেলিলাম। এখন প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের কথা যাইতে দাও। কলিকাতার এক কোণে আসিয়াটিক সোসাইটীর হলে বসিয়া জন-কতক মিশনরী ও জনকতক ভারতীয় খৃষ্টান যে সোণার যুগের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, প্রতীচ্য জগতের রণদুন্দুভি যেন সে স্বপ্নকে স্বপ্নেই পরিণত করিয়াছে। সে সোণার

যুগ কত দূরে, তাহা জানি না। যুদ্ধের অবসানে প্রতীচ্য জগত্তকে বুঝিতেই প্রতীচ্য জগতের অনেক দিন লাগিবে। যত দিন সে দিনগুলি না আসে, তত দিন আমরা—প্রাচ্যেরা কি অমনি বসিয়া থাকিব? এবং আমাদের ছোট ছোট খুঁটিনাটি লইয়া পরস্পর বিবাদ ও কলহে মাতিয়া রহিব? এবং আক্রমণ-নীতির পদানুসরণ পূর্ব্বক যোগ-ভূমিকে রণভূমিতে পরিণত করিব? আধ্যাত্মিক রণক্ষেত্রে এক অপরের গলা কাটিয়া ভ্রাতার রক্তে তর্পণ করিব?

আমি খৃষ্টীয়ান, আপনারা ব্রাহ্ম। কিন্তু "ঈশ্বর প্রেম" (God is love.) এ কথাটা খৃষ্টের ভক্ত মহা প্রেমিক যোহন ঋষি বলিয়া গিয়াছেন (দেখুন যোহনের প্রথম পত্র ৪।৮,১৬।) যদি ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ হন, এবং আপনারা ও আমরা সেই একই প্রেমময় ঈশ্বরের উপাসক হই, তবে আমাদের এক অপরকে সঙ্কীর্ণ নেত্রে দেখিবার অধিকার কোথায়? তাই বলিতেছি, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক অপরকে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

বুঝিবার পক্ষে অনেকটা ব্যাঘাত আছে, তাহা আমি স্বীকার করি। আপনারা যে খৃষ্টীয়ানের নামে সেই গা বমি বমি করা ভাবটা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে—"অমুক লোকটা খৃষ্টান হয়েছে" শুনিলেই মনটার ভিতর খট্ করিয়া শব্দ হয়। আবার আমরাও মন খুলিয়া কথা বলি না। আমাদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সাধনগুলির সম্বন্ধে যে সকল ভুল ধারণা প্রচলিত, সেগুলি শুধরাইতে চেষ্টা পাই না, কাজেই আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অনেকটা ভ্রান্ত অনুভূতি (misunderstanding) ঘটে।

একবার একজন মাননীয় ব্রাহ্মের সঙ্গে দেরাডুনে আমার দেখা হয়। তিনি বড় ভাইয়ের ন্যায় পরম স্নেহে বুকে ধরিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম প্রেমে আমরা উভয়েই গদ গদ হইয়া গেলেম। অতঃপর ক্রমে ক্রমে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "ব্রাহ্ম থাকিতে ঈশ্বরকে যাহা মনে করিতাম, এখনও তাহাই বিশ্বাস করি—সেই বিশ্বাসের সঙ্গে আর একটা নূতন সত্য এই শিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের একত্ব ত্রিত্ব সমন্বিত।"

অনেক সময় এই ত্রিত্ববাদ লইয়া ব্রাহ্মগণ আমাদের বিদ্রূপ করেন। এমন কি, রাজা রামমোহন রায় পর্য্যন্ত ত্রিত্ববাদ লইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। সে সেকালের কথা—তখন ত্রিত্ববাদকে অখৃষ্টীয় জগৎ তিন ঈশ্বরবাদ মনে করিত। কিন্তু একাল আর এক কাল। একালের ব্রাহ্মগণও যদি ত্রিত্ববাদকে তিন ঈশ্বরবাদ মনে করেন, তবে তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি যাহা মানি না, তাহাই যদি আমার প্রতি আরোপ করা হয়, তবে তাহাতে আমার দোষ কি? আমি একেশ্বরবাদী, আমাকে যদি আপনারা তিন ঈশ্বরবাদী বলিয়া জগতে ঘোষণা করিয়া আমাকে একঘোরে করিতে চান, তবে চুপ করে একঘোরে হইয়া থাকাই বোধ হয় আমার কর্ত্তব্য।

(৪)

একদিন ছিল, যখন মস্তিষ্ক নামক জিনিসটা হৃদয় নামক জিনিসের উপর অত্যাচার করিত। বুক হতে ভক্তির ধারা বেরুতে

চায়, মাথাটা তাকে বেরুতে দেবে না। মুখ চায় কাঁদিতে, মাথাটা তাকে চেপে ধরে। কিন্তু চেপে ধরিলে কি বুকের বেগ নিবৃত্ত হয়? যত চাপিয়া ধরিবে, ততই বেগ বাড়িবে, ততই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিব। এটা কেবল আমার অভিজ্ঞতা নহে, বরং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। ব্রাহ্ম সমাজে Unitarianism মাথার দোহাই দিয়া ত্রিত্ববাদকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় মনুষ্য-মস্তিষ্ক অপেক্ষা বলবান। মস্তিষ্ক চিন্তা করে, কিন্তু হৃদয় চায়। পতিত মনুষ্য ধরাতলে পড়িয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করে এবং অপতিতকে হৃদয়ের সন্নিধানে নাবাইয়া আনিয়া তাঁহারই হাত ধরিয়া উঠিতে চায়। মস্তিষ্ক অপতিতের নিম্নে অবতরণ বোঝে না। তাই জ্ঞানমার্গে না ত্রিত্ববাদ আছে, না অবতারবাদ। কিন্তু ভক্তিমার্গ, যাহা হৃদয়ের মার্গ, তাহা ত্রিত্ববাদ ও অবতারবাদে বিশ্বাস করে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ মস্তিষ্কের অবমাননা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁহাদের সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক জ্ঞানবাদ বা Unitarianism-এর ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু ভক্ত কেশব যখন ভাবের বশে পাগল হইলেন, তখন জ্ঞান-মার্গের বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—ভক্তির জোয়ারে ব্রাহ্মসমাজ ভাসিয়া গেল। কেহ যেন কেশবের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া দিল, তিনি সেই জ্ঞানাতীত "Marvellous Trinity"র ব্যাখ্যায় সেই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন, যাহা প্রত্যেক খ্রীষ্টবাদীর হৃদয়ের বিশ্বাস ও জীবনের অভিজ্ঞতা।

ভক্ত কেশব বলিতেছেন—"Gentlemen, look at this triangular figure with the eye of faith, and study its deep mathematics. The apex is the very God Jehovah, the Supreme Brahma of the Vedas. Alone, in His own eternal glory, He dwells. From Him comes down the Son in a direct line, an emanation from Divinity. Thus God descends and touches one end of the base of humanity, then running all along the base permeates the world, and then by the power of the Holy Ghost drags up regenerated humanity to Himself. Divinity coming down to humanity is the Son; Divinity carrying up humanity, to heaven is the Holy Ghost."

এটা ভক্তের কথা—সাধকের কথা। মস্তিষ্ক-প্রধান দর্শন বিজ্ঞানে ভক্তি ও সাধনার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যেও বড় বড় পণ্ডিত ও বড় বড় দার্শনিক আছেন। তাঁহারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুক্তি দ্বারা ত্রিত্ববাদাদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মতগুলিকে দার্শনিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু সে সকল মস্তিষ্কের যুক্তি। আমি মস্তিষ্ককে হেয় জ্ঞান করি না। তবু আমি আমার খ্রীষ্টীয়ত্বকে হৃদ্‌বৃত্তির উপর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তাই খ্রীষ্টীয়ান Theologianদের যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া ভক্ত কেশবের কথা কটী উদ্ধৃত করিলাম। আমি খ্রীষ্টকে মাথায় রাখি বটে, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার প্রেমে যে বিভোরতা ভোগ করি, তাহা রসনায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

আমি পতিত মানুষ। কিরূপে পড়িয়াছি, তাহা জানি না! য়িহুদীদের ধর্ম্মশাস্ত্র, যাহাকে আমরা "পুরাতন ধর্ম্ম নিয়ম"

(Old Testament) বলিয়া মান্য করি, তাহাতে মানবের পতনের একটা ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। সেই ইতিহাসটা রূপক কি অরূপক, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এইমাত্র জানি যে, আমি পতিত মনুষ্য। এটা একটা অকাট্য সত্য। আমি যেমন আমার নিজ অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ, আমি আমার দুর্ভাগ্যময় পতিত অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। ভবিষ্যতে অনন্ত নরক আছে কি না, তাহা আমি জানি না। থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান জীবনের দুর্গন্ধময় প্রকৃতি কি অনন্ত নরক অপেক্ষা অল্প? প্রকৃতির পিপাসা কি নির্ব্বাপিত হয়? এই তৃষ্ণার কি একটা সীমা আছে? আমি আপনাদের অভিজ্ঞতা জানি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যাহা জানিয়াছি, তাহা মানুষের সম্মুখে ব্যক্ত করিলে মানুষ আমাকে থুথু করিয়া ফুৎকার করিবে। ডুবিয়া ডুবিয়া পাপের গরল পান করিয়াছি, কিন্তু তৃষ্ণা মেটে নাই। তৃষ্ণা অনন্তকাল স্থায়ী হউক আর না হউক, ভোগেচ্ছায় যে অনন্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐটুকু পাইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইবে—কিন্তু ঐ টুকুর অন্তরালে যে অনন্ত হুতাশন। ঐ টুকুকে প্রাণে জড়াইয়া ধরিলাম—প্রাণ ত ঠাণ্ডা হইল না—হৃদয় ত জুড়াইল না—আরো আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যদি নির্ব্বাপিত না হয়, তবে এই আগুন কবে নিবিবে, কে বলিতে পারে?

বৌদ্ধধর্ম্ম এই তৃষ্ণা বা অনন্ত আগুন অনুভব করিয়াছিল। তাই নির্ব্বাণ মন্ত্রে ভারতকে দীক্ষিত করিতে বসিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম আগুন নিবাইতে গিয়া এই অগ্নিজড়িত অস্তিত্বটাকেই নির্ব্বাপিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু অস্তিত্বটা অমর—কে তাহাকে নির্ব্বাণ করিতে পারে? অতএব সহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম মানব প্রকৃতির তৃষ্ণানল নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইল না।

আমার প্রকৃতির এই অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছিল। সু-সু-সু—কোথায় সু? আমার সুটুকুও কুতে জড়িত। আমার পিতৃকুল শাক্ত ছিলেন, শক্তির উপাসনা করিতেন। কিন্তু সে কুণ্ডলিনী শক্তি কোথায়, যে আমার কু-কে বলিদান পূর্ব্বক আমার সু-কে সঞ্জীবিত করিতে পারে? সে সঞ্জীবন মন্ত্র আর ভারতে নাই—কখনও ছিল কি না, কে জানে? আমি ত আমার হৃদয়ে সে শক্তি পাইলাম না। লোকে বলে সেকালে শব সাধন হইত—সাধকের মন্ত্রবলে শব জাগিয়া উঠিত। আমি তো আমার এই পাপপূর্ণ শক্তিহীন হতভাগ্য অস্তিত্বটাকে শবাপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট পাইলাম না। শব পচে—আমিও পচিতে-ছিলাম। এই পচনশীল শবে কে প্রাণ ঢালিবে?

যিনি প্রাণের উৎস, কেবল তিনিই প্রাণ ঢালিতে পারেন। তিনি নিজে নীচে নেমে না এলে এই মৃত জগৎ প্রাণ পাইতে পারে না—আমার ন্যায় মহা পাপী পাপের অনন্ত তৃষ্ণা ও অনন্ত জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। অতএব সেই দয়াময় মনুষ্য প্রকৃতির এই নাচারত্ব দেখিয়া পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। কেশব সেই কথাটা Theologianএর ভাষায় না বলিয়া ভক্তের ভাষায় বলিলেন—"From Him comes down the Son in a direct line, an emanation from Divinity." এই "emanation from Divinity" ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নাই। এই Emanation from Divinity আসিয়া আমাকে ছুঁইলেন—তাঁহার স্পর্শে এই পচা শবে প্রাণ আসিল—আমার এই মানবীয় অস্তিত্বে একটা ঈশ্বরীয় অস্তিত্বের আবির্ভাব হইল। এই নব অস্তিত্বের নাম আমার নবজীবন লাভ।

(৬)

নীকদীম নামে যিহুদীদের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই নীকদীমকে একদিন রাত্রে খ্রীষ্ট বলিলেন, "সত্য সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পাইতে পারে না।" পড়ুন যোহন লিখিত সুসমাচার, ৩৷৩। মূল গ্রীক সুসমাচারে যোহন যে খ্রীষ্টোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার শাব্দিক অনুবাদ "নূতন জন্ম" নয়, পরন্তু "ঊর্দ্ধ হইতে জন্ম।" খ্রীষ্ট বলেন "ঊর্দ্ধ হইতে জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পাইতে পারে না।" ভক্ত কেশব ঠিক এই কথাটাই বলিলেন,—"From Him comes down the Son in a direct line, an emanation from Divinity. Thus God descends and touches one end of the base of humanity." কেশবের আধ্যাত্মিক ত্রিভুজের ভূমি পতিত মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যতে পুত্ররূপী ভগবান অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর সেই পুত্ররূপী ভগবান "running all along the base permeates the world." ঊর্দ্ধস্থ ঐশ-জীবন জগতে আসিল। সে জীবনে মৃত মানুষ প্রাণ পাইল। ইহারই নাম ঊর্দ্ধ হইতে জন্মলাভ করা—ইহাকেই সাধারণ ভাষায় নবজন্ম বা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি বলে। এই দ্বিজত্ব লাভের পর কেশবের আধ্যাত্মিক ত্রিভুজের অন্য ভুজে কি হইতেছে, একবার দেখুন। সেই ভগবান যিনি অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিলেন," তিনিই আবার "by the power of the Holy Ghost drags up regenerated humanity to Himself." কি সুন্দর ব্যাখ্যা! ঈশ্বরত্বের নিম্নে আগমন, আবার ঈশ্বরত্বের নিম্ন হইতে মনুষ্যত্বকে লইয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব শিক্ষা কি সত্য সত্যই আপনাদের দর্শন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ? সত্য সত্যই কি এ কথাটা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধ? আমার বুদ্ধি তো এ কথাটা বেশ বুঝিতেছে। এই অবতীর্ণ ঈশ্বরত্ব আমাকে স্পর্শ করিয়া আমাকে জীবন দিয়াছেন, আবার পবিত্রাত্মা আমাকে বহন করিয়া ঊর্দ্ধ লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার শক্তিতে যত উঠিতেছি, ততই পাপ প্রলোভন নীচে পড়িয়া রহিতেছে, ততই হা হুতাশের হস্ত এড়াইয়া শান্তিময়ের সিংহাসনের সন্নিধি লাভ করিতেছি। আমি তিন ঈশ্বরবাদী নহি—একেশ্বরবাদী। যে ঈশ্বরত্ব পিতারূপে উপরে বিরাজমান, সেই ঈশ্বরত্বই পুত্ররূপে নীচে অবতীর্ণ, আবার সেই ঈশ্বরত্বই আত্মারূপে আমাকে উপরে তুলিতেছেন। আপনারা কি এ কথাটা বিশ্বাস করিতে পারেন না?

অনেক কথা লিখিবার ছিল, লিখিতে পারিলাম না। যদি পুনর্ব্বার সুযোগ হয়, তবে আরো গোটাকতক কথা লিখিব। বাদানুবাদ আমার এই লিপির অভিপ্রায় নহে। যদি অভিপ্রায় হইত, তবে যুক্তিশাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতাম। কিন্তু সে পথ ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি ভক্তির ভিখারী—খ্রীষ্টের চরণতলে বসিয়া তাঁহার অযাচিত অনুগ্রহ ও অযাচিত প্রেমে প্রতিষ্ঠিত

থাকিয়া তাঁহার সেবায় জীবনের অবশিষ্ট দিন কটী কাটাইতে পারিলেই সার্থক হইব।

আমার এই নিবেদন আপনাদের চরণে পৌঁছাইয়া দিয়া 'নব্যভারত' সম্পাদক মহাশয় যে আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

বিশ্ব-মঙ্গল।

বিশ্বের বারতা ল'য়ে দুয়ারে তোমার
দাঁড়াইয়া হের বিশ্বরাজ,
প্রশান্ত, সরস, মুক্ত, সরল হৃদয়ে
লহ লহ বরি তাঁরে আজ।

খুলে ধর অন্তরের প্রশস্ত কবাট,
প্রবেশিয়া ঋত্বিকের বেশে
গাহুক মুক্তির মন্ত্র নিখিল বিশ্বের
প্রাণের অন্তরতম দেশে।

জাগিয়া উঠুক ধরা সাধনার বলে
সুমতি লভিয়া বরে তাঁর,
তাহার মঙ্গলে দেহ বিকাইয়া তুমি
ক্ষুদ্র, তুচ্ছ প্রাণ আপনার।

জ্ঞানে হও গরীয়ান, চরিত্রে মহান
ত্যাগে হও বিশ্বজয়ী বীর,
নব শক্তি লভি সাধ দেশের কল্যাণ
ধর্ম্মে, কর্ম্মে সদা হও ধীর।

বিশ্ব সাম্রাজ্যের অংশ তোমার এ দেশ
রেখো মনে ওহে মতিমান,
ধর্ম্মে সে দেশের ভিত্তি, পুণ্যে স্তম্ভ যার
তার কভু নাহি অকল্যাণ।

যে আছে যেথায়, জেনো, এ ধরার মাঝে
সে তোমার আপনার জন,
সম্মান, সহানুভূতি হৃদে ল'য়ে তারে
ভ্রাতৃ ভাবে কর আলিঙ্গন।

শিশু, বৃদ্ধ, কি যুবক, ধনী কি কাঙ্গাল,
উচ্চ, নীচ, ক্ষুদ্র কি মহান,
কেহ নহে তুচ্ছ হেথা অস্পৃশ্য তোমার,
দেও তারে তার যোগ্য মান।

কি রহস্য জীবনের কি উদ্দেশ্য তার,
কর মূল তত্ত্ব অন্বেষণ,
অধ্যাত্ম জীবন-পথে হও অগ্রসর,
খুলে যাক্ জড়ের বন্ধন।

ধৈর্য্যে ও বিপদে আর সৎকার্য্যে, সাহসে
সদা হও অচল অটল,
হেরিয়া পরের দুঃখ করিতে তা দূর
হৃদি তব গলে হ'ক জল।

দাঁড়ায়ে সংযম-দুর্গে অদম্য উৎসাহে
আত্মযুদ্ধে ধর প্রহরণ,
কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, লোভ রিপু করি জয়
প্রেমে কর অরাতি দমন।

বিশ্বের মঙ্গল কিসে হইবে সাধিত,
মুক্তিলাভ কিসে হ'বে তার,
ধরা কিসে স্বর্গপথে হবে আগুয়ান
চিন্তা হ'ক তাহাই সবার।

পবিত্র জগৎ এই সুধার আধার,
কলুষিত করিও না তায়,
আত্মশক্তি বলে তারে উঠাও স্বরগে,
কিংবা স্বর্গে নামাও ধরায়।

তাই বুঝি জীবনের উদ্দেশ্য হেথায়
বিশ্ব-মুক্তি, বিশ্বের মঙ্গল,
নহে ভোগ, বাসনার পরিতৃপ্তি শুধু,
নহে আত্ম উন্নতি কেবল।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

ভক্ত-জীবন। *

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥'

ক্ষণকাল মাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারা মানুষ অনায়াসে তরণীর ন্যায় এ ভবসিন্ধু পার হইয়া যাইতে পারে।

মহাত্মা বুদ্ধদেবের কোন শিষ্য একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাত্মন্! স্বর্গ কোথায়?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন,—"সাধুসঙ্গই স্বর্গ," আমাদের দেশেও একটী প্রচলিত কথা আছে,—"সাধু সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ"।

সাধু ও ভক্তদিগের জীবনের প্রভাব কি বিচিত্র! যাঁহারা ঈশ্বরানুগত প্রাণ হইয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহারা যে কেবল নিজেরাই বিমলানন্দ অনুভব করেন, তাহা নহে, তাঁহাদিগের মধুময় জীবনের প্রভাবে কত লোকের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—কত লোক পাপ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য ও প্রেমের পথে বিচরণ করিয়াছে।

কথা অপেক্ষা জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই অধিক মূল্যবান। ভগবৎ-লীলা মানব-জীবনেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আকাশের চন্দ্র তারা, কাননের বিকশিত কুসুমরাজি, খরস্রোতা স্রোতস্বিনী, বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ বনরাজি, তরুকুঞ্জ-বেষ্টিত গিরি-শ্রেণী—সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর। কিন্তু ভক্তদিগের জীবনের শোভা এ সকল অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

আমাদের দেশের একজন ভক্ত কবি, তাঁহার এক কবিতায় এই মর্ম্মের কয়েকটী কথা বলিয়াছেন,—নীলাকাশের পূর্ণচন্দ্র, উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি, রজতরেখা সদৃশ জলস্রোত, সকলই সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, সকলই চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত যখন তদ্গত-চিত্তে, পরমাত্মাতে চিত্ত সমাধান করিয়া, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে বারিধারা বহিতে থাকে, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যে এক অপার্থিব জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়,—সে মুখের সৌন্দর্য্যের নিকট প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য পরাস্ত হইয়া যায়।

পরমেশ্বর মানবাত্মাতেই বিহার করেন,—মানবাত্মাতেই ক্রীড়া করেন,—আপনার সৌন্দর্য্য ও লীলা মানবাত্মাতেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর হইলেও, এবং উহা ভগবানের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিলেও, মানবের ন্যায় উহা ভগবানের জীবন্ত লীলা প্রকাশে সমর্থ নহে। তাই উপনিষদের ঋষি ভক্ত-হৃদয়ের ভগবৎ-লীলার বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্ম-
বিদাং বরিষ্ঠঃ।"

অর্থাৎ তিনি পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই পূর্ণানন্দ লাভ করেন এবং সৎ-কর্ম্মশীল হন। ইনিই ব্রহ্মদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক বিবৃত।

ভক্তদিগের জীবনে যে সকল সদ্‌গুণ রাশি ফুটিয়া উঠে, অন্য সাধারণের জীবনে তাহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মসংযমে, নরপ্রেমে, ভগবৎনিষ্ঠায়, তাঁহারাই সংসারে সকল মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবনে আর একটী ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেটি অপরের জীবনে প্রায় দৃষ্ট হয় না,—সেটি আধ্যাত্মিক বীরত্ব। সাধারণ লোকের ধারণা এই,যেখানে মানব আপনার বাহুবলে অপরের শোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিতে পারে—শাণিত তরবারির আঘাতে অপরের শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ হয়, অথবা বিজ্ঞানের কৌশলে নিমেষের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ধরাশায়ী করিয়া তাহাদের জীবন বিনাশ করিতে পারে, সেই খানেই বীরত্বের পরিচয়। সমর ক্ষেত্রই জয় পরাজয়ের নিয়ামক বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু এ বীরত্ব শার্দ্দূল ভল্লুকের বীরত্ব অপেক্ষা কিছু অধিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। এ বীরত্ব প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা দেবত্বের পরিচায়ক নহে।

জগতের সাধু পুরুষেরা আধ্যাত্মিক বীরত্বেরই পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণাপথে রামানুচার্য্য যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম ঘোষণা করেন, তখন শৈবধর্ম্মাবলম্বী চোলরাজ, রামানুজ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উপর ঘোরতর অত্যাচারের সূত্রপাত করিলেন। রামানুজের অনুগত শিষ্যেরা গুরুদেবকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাকে লইয়া গোপনে অন্যত্র গমন করিলেন। রাজার আজ্ঞায় আচার্য্যের দাশরথী ও পূর্ণাচার্য্য নামক দুই জন শিষ্যকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। শিবোপাসক চোলরাজ, তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা শিবোপাসক বলিয়া, সকলের সমক্ষে আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর কর। দাশরথী ও পূর্ণাচার্য্য উভয়েই বিষ্ণু-পাসক—রামানুজের অনুগত শিষ্যদ্বয় উভয়েই সুপণ্ডিত, উভয়েই পরম ভক্ত। তাঁহারা কি রাজার ভয়ে আপনাদিগের বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারেন? কখনই না। তাঁহারা বীরের ন্যায় শৈবরাজের সমক্ষে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করা অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে, শৈবরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন, ইহাঁদের দুইজনের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেল। তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীরা নির্ম্মম হৃদয়ে, তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা পণ্ডিত ও ভক্তদ্বয়ের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। উভয়েই প্রফুল্লচিত্তে সকল কষ্ট সহ্য করিলেন;—চিরদিনের জন্য তাঁহারা বহির্দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইল না। যে দেবতার আরাধনায় তাঁহারা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দেবতার মোহন মূর্ত্তি তাঁহারা অন্তরে দর্শন করিবেন বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। এ কি বীরত্ব, এ কি অপূর্ব্ব ভগবৎ-ভক্তি! ইহাকেই বলে, আধ্যাত্মিক বীরত্ব; সমর ক্ষেত্রে শত্রু নিপাত অপেক্ষা, সত্যের অপলাপের ভয়ে যাঁহারা আপনাদিগের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আহুতি দান করিতে পারেন,তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও ধর্ম্মের নিশান উড্ডীন করিয়া থাকেন।

ভক্তদিগের জীবনের পবিত্রতার বল চিন্তা করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ভক্ত

যবন হরিদাস যখন বনগ্রামের সন্নিকটে বৃক্ষলতাদিপূর্ণ, জনকোলাহল-বিহীন স্থানে বসিয়া, নিত্য হরিনাম যপে দিবা-যামিনী যাপন করিতেন, তখন তত্রত্য জমিদার রামচন্দ্র খাঁ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একজন সুন্দরী বারবনিতা তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। এই নারী অসঙ্কোচে আপনার মনের কু বাসনা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। প্রথম দিন হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "অপেক্ষা কর, আমার নাম-যপ বাকী আছে, তাহা পূর্ণ হইলে, তোমার যে বাসনা, তাহা আমি পূর্ণ করিব।" বারবনিতা কুটীরের দ্বারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, হরিদাসের নাম-যপ শেষ হইল না। তখন আর সে অপেক্ষা না করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল, এবং রামচন্দ্র খাঁর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল, জানাইয়া বলিল, আজ রাত্রে আবার তথায় যাইব, এবং তাঁহার ভজনসাধন সমস্ত নষ্ট করিয়া দিব। সেদিনও সে তথায় গমন করিল, কিন্তু পূর্ব্ব রজনীর ন্যায় বিফলমনোরথ হইয়া প্রভাতে ফিরিয়া আসিল। রামচন্দ্র খাঁ সকল ঘটনা শ্রবণ করিলেন; শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। কিন্তু ঐ নারী তাঁহার মনে আশা দিয়া বলিল, আজ আবার আমি তথায় যাইব, আর সেই যুবার মন হরণ করিয়া, তাঁহাকে আমার ইচ্ছাধীন করিয়া ফেলিব! আপনি চিন্তা করিবেন না; আপনার চেষ্টা কখনই বিফলে যাইবে না। আজ তৃতীয় দিন। বারাঙ্গনা গভীর নিশীথে হরিদাসের সাধন-কুটীরে উপস্থিত হইল। গিয়া দেখিল, তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই নাম-সাধনে রত রহিয়াছেন। হরিদাস তাহাকে বসিতে বলিয়া, নাম-যপ ও নামকীর্ত্তনে রত হইলেন। বারবিলাসিনী এই নির্জ্জন নিশীথ সময়ে হরিদাসের জীবনের অপূর্ব্ব লক্ষণ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া গেল। তাহার পাপ বাসনা ভস্মীভূত হইল। সে ভক্তের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, সন্ন্যাসিনীর ন্যায়, সেই কুটীরে বসিয়া, হরিনাম যপে ও কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিতে বলিলেন। যে নারী বহুদিন নিজের কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, পাপের পথে বিচরণ করিতেছিল, সে আজ কি এক অপার্থিব বস্তু লাভ করিল! হরিদাস তাহাকে দীক্ষা দান করিয়া, চলিয়া গেলেন, সে সাধ্বী নারীর ন্যায় ভগবানের মধুর নাম জপে, কীর্ত্তনে তাহার অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে লাগিল।

ভক্তদিগের জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রেমের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার প্রেমের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। দক্ষিণাপথের কোন স্থলে এক ব্রাহ্মণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যান। শ্রীচৈতন্যের আগমনবার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইয়া পড়িল। বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বেই চৈতন্যের নাম শ্রবণ করিয়াছিল। সে গৌর-দর্শনে প্রাণ শীতল করিবে, এবং এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এই আশায় বহু দূর হইতে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌর বাসুদেবকে দেখিবামাত্র দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া,তাহাকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। কথিত আছে, প্রেমিক চূড়ামণি গৌরের প্রেম-বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া কুষ্ঠ রোগী বাসুদেব

রোগমুক্ত হইয়াছিল। বাসুদেবের রোগ-মুক্তির কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও গৌরের প্রেমের পরিচয় চিরদিনই ভক্তদিগের চরিত-রহস্যে কীর্ত্তিত হইবে।

খ্রীষ্টীয় ভক্তচূড়ামণি ফ্রান্সিস যৌবনে যখন কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত ধারণ করিয়া নরনারীকে বিলাসিতা, অপবিত্রতা ও বিবিধ অধর্ম্মের পথ হইতে যীশুর সুনির্ম্মল নীতি ও ধর্ম্মের দিকে আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার প্রতি কি না অত্যাচার হইয়াছিল? তিনি সম্পত্তিশালী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি যখন ধর্ম্ম-প্রচারে রত হইলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফ্রান্সিসকে কিছুতেই সে পথ হইতে ফিরাইতে পারিলেন না। ফ্রান্সের দুরন্ত লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া, পথিমধ্যে তাঁহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি সকল প্রকার অত্যাচারের মধ্যে, অত্যাচারীদিগের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবৎ প্রেমে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা এমনই পূর্ণ হইয়া থাকিত যে, মানবের প্রতি প্রেম ত দূরের কথা, তিনি নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের প্রতি যেরূপ ভালবাসা দেখাইতেন, তাহা ভাবিলে, অবাক্ হইতে হয়, তিনি তাহাদিগকে আপনার বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাঁহার শিষ্যেরা, তাঁহাকে ঘেরিয়া উপবেশন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার রচিত মৃত্যু-বিষয়ক দুইটী সঙ্গীত করিতে বলিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার রচিত সঙ্গীত গান করিলেন। সঙ্গীত দুইটীতে তিনি মৃত্যুকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিয়া-ছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। পরম ভক্ত ফ্রান্সিস যেন সহোদরার হাত ধরিয়া, এ মর-জগত হইতে চলিয়া গেলেন।

ভগবৎ-প্রেমই ভক্তদিগের চিত্তকে সর্ব্বদা রসযুক্ত করিয়া রাখে। যিনি অনন্ত প্রেমের আকর, অনন্ত শান্তি ও সুখের প্রস্রবণ, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিলে মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যায়। যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণে স্থান দান করিয়া, সংসারে বাস করেন, তাঁহারা সকল অবস্থার মধ্যেই, তাঁহারই প্রেম-মধু পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। সত্যই, চাতক যেমন তড়াগ ও পুষ্করিণীর জল পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদাই মেঘ-নিঃসৃত নির্ম্মল বারি পান করিবার জন্য ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্তেরা এ সংসারে বাস করিলেও তাঁহা-দিগের চিত্ত সকল সময়েই সেই রসস্বরূপ দেবতার দিকেই উন্মুখ হইয়া থাকে। সকল দেশের ভক্তেরাই আপনাদিগের জীবনের দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

মুসলমান তাপসদিগের সাধুতা ও তাঁহা-দিগের ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। ফকীর বায়জিদ ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। কোন এক যুবাপুরুষ, কি কারণে বলা যায় না, একদিন তাহার হস্তস্থিত একটী বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা ফকীর বায়জিদের পৃষ্ঠে আঘাত করে; যন্ত্রটী সেই সময় ভাঙ্গিয়া যায়। বায়জিদ্ অম্লানবদনে, যুবার প্রহার খাইয়া নিজ কুটীরে গমন করিলেন। কিন্তু কেন যে সে যুবাপুরুষ তাঁহাকে প্রহার করিল, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু পয়সা লইয়া সেই প্রহারকারীর উদ্দেশে বাহির হইলেন।

পথের মধ্যেই তিনি তাহার দেখা পাইলেন। বায়জিদ তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "বাপু! বোধ হয়, তুমি আমার উপর রাগ করিয়াই আমাকে প্রহার করিয়াছ; রাগের সময় মানুষের মুখ তিক্ত হইয়া যায়। আমি সেইজন্য কিছু মিষ্টান্ন আনিয়াছি; ইহা ভক্ষণ কর। আর তুমি যখন আমাকে প্রহার কর, তখন তোমার বাদ্যযন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য কিছু মূল্য আনিয়াছি, আর একটী নূতন কিনিয়া লইও।" সহস্র উপদেশে যাহা না হয়, নিমেষের মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল। সেই দুরন্ত যুবাপুরুষ তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার অনুগত শিষ্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। ফকির বায়জিদ্ কি প্রেম ও কি ধৈর্য্যের দৃষ্টান্তই প্রকাশ করিলেন! যে হৃদয়ে ভগবান লীলা করেন, যে হৃদয়ে তিনি আপনার প্রেম-সুধা নিরন্তর বর্ষণ করেন, সে হৃদয় কি সরস না হইয়া থাকিতে পারে?

অনেকে মনে করেন, যাঁহারা ভক্তিধর্ম্ম সাধন করিয়া জীবনকে মধুময় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সংসারের প্রতি বীত-রাগ প্রকাশ করিয়া, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ কথা এক দিকে অনেক পরিমাণে সত্য, তাহাতে আর সংশয় নাই, কিন্তু সংসার-ধর্ম্ম পালন করিলেও যে ভক্তি-পথের পথিক হওয়া যায় না, এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিবৃত্তের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনিই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের পথপ্রদর্শক। অদ্বৈতা-চার্য্য সুপণ্ডিত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। আচার্য্য গৃহী ছিলেন; স্ত্রী পুত্র লইয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতেন। কিন্তু কি ধর্ম্মানুরাগ, কি অকপট ভগবৎ নিষ্ঠা! কিরূপে চারিদিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে,—কিরূপে ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশের শুষ্কতা বিদূরিত করিবে, তজ্জন্য তিনি সতত চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেন; এবং প্রার্থনার উত্তর লাভ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়া, শয়ন করিয়া থাকিতেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল। অদ্বৈত, গৌর ও অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া, কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইতেন; এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও হরিকথা প্রসঙ্গে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। হিন্দুদিগের রথোৎসবের সময় গৌরের বহু-সংখ্যক শিষ্য লইয়া তিনি নীলাচলে গমন করিতেন; এবং চারি মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, গৌর ও তদীয় ভক্তবৃন্দের সহিত ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় ও নাম-সংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতেন। গৃহী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে কিরূপে এরূপ ধর্ম্মানুরাগ সম্ভবপর হইত? তাঁহার অন্তশ্চক্ষু কিরূপে খুলিয়া গেল? তিনি কিরূপে স্বর্গীয় দূতের ন্যায় ভক্তিধর্ম্মের গাথা গান করিয়া, নরনারীর মনকে প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন? সকলই ভিতরের ব্যাপার। সংসারী হইলে যে ভক্তিধর্ম্মের অধিকারী হইয়া চিত্তকে প্রেমরসে সরস রাখা যায় না, তাহা নহে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত যে আমাদের মধ্যে এক-বারে বিরল, তাহা নহে; প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কি দেখাইয়া গেলেন? বিপুল সম্পত্তি তাঁহার সাধনের কি ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছিল? বরং অর্থ তাঁহার সাধন ভজনের সহায়তাই করিয়াছিল। তাহারই সাহায্যে তিনি দেশ-

দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেই সত্যম্ শিবম ও সুন্দরমের মুখচ্ছবি দর্শনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঋষির ন্যায় বাস করিয়া, ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার কোন বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথা হইতেছিল, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন অনেকটা অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায়। আমি বলিলাম, ঠিক কথা। অদ্বৈতাচার্য্য যেরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের এক প্রকার পথপ্রদর্শক, ধনী ও গৃহী; দেবেন্দ্রনাথও তদ্রূপ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শক; ধনী ও গৃহী। সহজ কথায়, দেবেন্দ্রনাথ ভক্ত। অতএব ভগবদ্ভক্তির পথ যে কেবল সংসার-বিরাগী ব্যক্তিদিগের জন্যই উন্মুক্ত, তাহা নহে, ভক্তি সাধন সকল অবস্থাতেই সম্ভবপর। ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠাই তাহার মূল।

ভগবদ্ভক্তদিগের জীবনই মাধ্যাকর্ষণী শক্তির ন্যায় জগতের অসংখ্য নরনারীকে সতত ধৈর্য্য ও ক্ষমার পথে, প্রেম ও পুণ্যের পথে আকর্ষণ করিতেছে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দৃষ্টান্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ভেদ করিয়া উজ্জ্বল প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিবে,—দুরন্ত লোকদিগকে ক্ষমাশীল করিবে,—অপ্রেমিককে প্রেমিক করিবে,—অবিশ্বাসীর চিত্তকে সেই অবিনাশী প্রেমস্বরূপ পুরুষের দিকে ধাবিত করিবে। সিজর অথবা নেপোলিয়নের প্রভাব ক্রমে কালস্রোতে নিমজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা মানব-হৃদয়ের উপর রাজত্ব করেন, তাঁহাদের রাজত্ব কখন কি বিনষ্ট হইতে পারে? দুর্দ্ধর্ষ সমর-প্রিয় ইয়ুরোপে এখনও বহু লোকের মধ্যে প্রেমাবতার যীশুর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে কার্য্য করিতেছে।

অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরানুরাগী ভক্তদিগের জীবন অনুধ্যান ও অধ্যয়ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহাদিগের অমিয়মাখা জীবনের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের শুষ্কতা বিদূরিত করে। অবিশ্বাস ও দুর্দ্দিনের অন্ধকারে চিত্ত যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাদিগের অচলা ভগবৎ নিষ্ঠার মনোহর ছবি, আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ও ভক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। সাধুদিগের বিষয় আলোচনাতেও তাঁহাদের ভাব বহুল পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। নাট্যশালার কোন অভিনেতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলীলা অভিনয় করেন, তখন তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তিনি নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, অমিয়-নিমাইচরিতের ঘটনাবলী অভ্যাস করিয়াছিলেন। এই লীলার অভিনয়ে তিনি অন্ততঃ কয়েক মাসের জন্যও এ সংসারের অনেক উচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য, ভক্তপ্রসঙ্গ নামক একটী উপদেশে অনেক সুন্দর কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার উক্তির দুই এক ছত্রের অনূদিত মর্ম্ম এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। "যাঁহারা জীবনে প্রতিকূল প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে রত—যাঁহারা অধ্যাত্ম রাজ্যের উচ্চতর সত্য লাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তদিগের জীবন-চরিত অধ্যয়ন কি কল্যাণপ্রদ!" আর এক স্থলে বলিতেছেন, "বিশিষ্ট ভক্তেরা লোকাতীত হইলেও, তাঁহাদিগের চরিত পাঠে ও তাঁহাদিগের গুণাবলী চিন্তনে, আমরা অনেক সময় জীবিত ব্যক্তিদিগের সহবাস অপেক্ষাও উপকার লাভ করিয়া থাকি।"

শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক না কেন, মানুষ যে পর্য্যন্ত সেই জগতের আদি শিল্পী, সকল জ্ঞানের আকর ও পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবতাকে, আপন হৃদয়ে, পরিবারে ও সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কোন দিকেই প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে।

অতীত কালের সর্ব্বত্যাগী সাধু পুরুষদিগের জীবনী সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান সময়ে অনুকরণীয় নয় সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের চরিতালোচনাতে, আমাদের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে পারে; বিষয় সম্পদের মধ্যে অন্তরে বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে পারে, এবং যিনি আমাদের একমাত্র সুহৃদ্ ও ইহপরকালের দেবতা, তাঁহারই দিকে আমাদের চিত্তের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে পারে। তাঁহাদিগের জীবনের মধুর ধারা যতই প্রবাহিত হইবে, ততই সমাজের শুষ্কতা বিদূরিত হইবে,—অশান্তির স্থলে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। ইহাদিগের চরিত্রানুধ্যানে জীবন পবিত্র হয়, প্রাণ মধুময় হয়; জীবনের অনেক কঠিন সমস্যারও অনায়াসে মীমাংসা হইয়া যায়। কিরূপে অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সংগ্রামে সত্য জয়যুক্ত করিতে হয়, পাপের সঙ্গে সংগ্রামে পুণ্য লাভে জীবনের মলিনতা দূর করিতে হয়,—কালভুজঙ্গসম শত্রুকে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রেমের পথে পরিচালিত করিতে হয়, ঈশ্বরানুরাগী ভক্তেরা, আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বটলার-বিরচিত খ্রীষ্টীয় সাধুদিগের ও আমাদের দেশের ভক্ত বৈষ্ণবদিগের অপূর্ব্ব চরিতমালা, প্রতিনিয়তই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

কিন্তু মানব-চরিত্রে ভক্তির কুসুম যে বিকশিত হয়—সাধুতার স্নিগ্ধ সমীরণ যে প্রবাহিত হয়, তাহার মূল কে? স্বয়ং ভগবান; তাঁহা হইতেই সকল রস, সকল প্রীতি, সকল পবিত্রতা নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে। ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভক্তেরা চিরদিনই আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা আমাদের জীবনের পূর্ণ আদর্শ নহেন। তাঁহারা আমাদের পরম বন্ধুর ন্যায় অধ্যাত্ম জীবন-পথের সহায়তা করিবেন, এই মাত্র। যে শক্তির বলে, তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়াছিলেন, যাঁহার মধুর রসে তাঁহারা আপনাদিগের আত্মাকে রসযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসীন করিতে হইবে, আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

ঈশ্বরের স্বরূপ-সাধন।

উপনিষদুক্ত প্রাচীন ঋষিদিগের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং''—ঈশ্বরের এই স্বরূপ চিন্তার প্রথমাংশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শেষাংশ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সংযোজন করেন এবং অদ্যাবধি নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে এই স্বরূপের আরাধনা চলিতেছে। এরূপ আরাধনার প্রণালী পৃথিবীর আর কোন স্থানে দেখা যায় না। ব্রহ্মসা[illegible]র ইহা এক অমোঘ উপায়—সরস, সুখপ্রদ, অত্যাশ্চর্য্য, মনোমুগ্ধকর, প্রাণস্পর্শী, এবং চিত্তহারী। যাঁহারা মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ বা

প্রতাপচন্দ্রের আরাধনা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ঐ মন্ত্র প্রাণে যেরূপ সঙ্ক্ষোহন আনয়ন করিত, তাহা আর কোন সাধনপ্রণালীতেই দেখা যায় না। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার "আরাধনা" অঙ্গ এক অত্যুত্তম বৈজ্ঞানিক সাধন-প্রণালী। বিধাতা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, আনন্দময়, প্রেমময়, অদ্বিতীয়, এবং পুণ্যময়। এই আরাধনার প্রণালী অবলম্বন করিয়া মহর্ষি, রাজনারায়ণ, রামতনু, ব্রহ্মানন্দ,অঘোর-গৌর-প্রতাপ-কান্তি-প্রমুখ সাধকগণ এবং উমেশ-আনন্দ-শিবচন্দ্র-প্রকাশ-প্রমুখ বিশ্বাসীগণ এ দেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিধাতার এই সপ্তস্বরূপ চিন্তনে জীবন উন্নত হয়, হৃদয়ে ভক্তি-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, মানব অচ্যুত সাধন-মার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। এই ঋষি-প্রবর্ত্তিত সুচিন্তিত সাধন-মার্গ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হউক।

ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সাধকগণ এই সাধন-প্রণালী-মার্গ অবলম্বন করিয়া জীবনকে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন। আরাধনার সময় সপ্তস্বরূপের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে তাঁহারা বিধিপূর্ব্বক সচেষ্ট হইতেন। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পারম্পর্য্য রক্ষা না করিলে আরাধনার সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। সে সকল সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-কথা বিবৃত করিতে আজ চাই না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ প্রায়ই আরাধনার পারম্পর্য্য রক্ষা করেন না, সপ্তস্বরূপের সম্পূর্ণত্বও রক্ষা করিয়া চলেন না। কেবল কল্পনার অনুসরণ করেন, এজন্য এই আরাধনা-প্রণালী দিন দিন নিরস এবং দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয় পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেন এবং করেন, কিন্তু অন্যান্য সাধকগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবেই আরাধনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ বা দ্রুত শব্দাড়ম্বর করেন, কেহ বা চীৎকার করিয়া কল্পনার পূজা করেন। তাঁহারা বলেন, যখন যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন তাহা অবলম্বন করাই স্বাভাবিক, বৃথা সুদীর্ঘ মন্ত্রের পারম্পর্য্য অনুসরণ করিয়া লাভ কি? লাভ আছে কি নাই, সাধকগণের তাহা অনুধাবনার বিষয়। প্রণালী-ভঙ্গকারীদের নৈতিক জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ সম্ভব কি না, ভাবীবংশ তাহার উত্তর দিবেন। প্রণালীগত উপাসনা মানিতে গেলেই মন্ত্রের পারম্পর্য্য মানিতে হইবে। ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত না হইলেও, বেদী ইত্যাদি ভাঙ্গার সময় স্বেচ্ছাচারিতা চলিলেও চলিতে পারে, কিন্তু পূজার ক্রমবিবর্ত্তন অস্বীকার করিলে সাধন-মার্গ কলঙ্কিত হয়। তাহাতে পদে পদে সাধনার্থীদিগের বিপদ ঘটে। এদিকে সুধীগণের প্রণিধান আকর্ষণ করিতেছি।

এই সাধনমার্গের সুপ্রণালীর বিশেষত্ব এক সময়ে শ্রীযুক্ত স্তর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আর একবার শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত মহাশয়ও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবৃতি সত্ত্বেও যে স্বেচ্ছাচারিতা অবাধে চলিতেছে, ইহা যারপর নাই দুঃখের বিষয়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—মন্ত্র দর্শন, মন্ত্র ধারণ এবং মন্ত্র-সাধন যে একান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। স্বীকার করেন না, প্রত্যুতঃ তাঁহারা মন্ত্রগুপ্তিও হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। ঈশ্বরের স্বরূপ সাধনের অর্থ আর কিছুই নয়, স্বরূপত্ব প্রাপ্তিই একমাত্র সরল ব্যাখ্যা। মুখে মন্ত্র বলিয়া গেলেই মন্ত্র সাধন হয় না, অন্তরে মন্ত্র সাধন করিতে হয়। মন্ত্রসাধনের অর্থ, মন্ত্রের নিগূঢ়ত্বের অনুধাবন। শুধু অনুধাবন নয়, মন্ত্রের বিশেষত্বে আত্ম চরিত্র গঠন—অথবা আপনাকে স্বরূপত্বে নিমজ্জন করা। কথাটা পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি।

মহা সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আনন্দ-আশ্রমে বহু বার আসিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"যে ব্যক্তি কখনও সন্দেশ খায় নাই, তাহাকে সন্দেশের মিষ্টত্ব বুঝান যায় কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "না, তাহা যায় না।" তৎপর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "যে ব্যক্তি জীবনে কখনও দয়া উপলব্ধি করে নাই, সে "দয়াময়" বলিলে কোন ফল, দয়া

উপলব্ধি হয় কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "না, কোনই ফল হয় না, কখনও দয়া উপলব্ধি হয় না।" তৎপর আর যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা এখানে ব্যক্ত করার প্রয়োজন নাই। বিধাতার স্বরূপ সাধন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, যিনি সেই স্বরূপের গুণ সকল নিজ জীবনে লাভ করিতে অক্ষম। সত্য যে জীবনে লাভ করে নাই, বিধাতাকে সত্যস্বরূপ বলিলে তাঁহার মুখের কথা মাত্র ব্যক্ত হইবে, কিন্তু কিছু সত্য ধারণা হইবে না। সেইরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন না করিলে জ্ঞানের ধারণা হইবে না, প্রেম না পাইলে প্রেমতত্ত্ব ধারণা হইবে না, পুণ্য সঞ্চয় না করিলে পুণ্যের ধারণা হইবে না—ইত্যাদি। সত্যে সত্য,জ্ঞানে জ্ঞান, প্রেমে প্রেম ধারণা হয়! আরাধনার স্বরূপ সাধনের অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের গুণ আত্মস্থ করা, নিজেকে তদনুযায়ী উন্নীত করা, স্বরূপানুযায়ী জীবনকে গঠন করা, স্বরূপের গুণ সকল লাভ করা—অথবা স্বরূপে আত্মনিমজ্জিত হওয়া। স্বরূপ-সাধন কথার কথা—বাক্যবিন্যাস মাত্র,যতদিন স্বরূপে আত্মনিমজ্জন না হয়। যখন মানুষ ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরস্বরূপানুসারে আপনার প্রকৃতিকে গঠন করেন, তখনই পিতাপুত্রের মিলন হয়,তখনই চিন্ময়ে মৃণ্ময়ের মহাযোগ হয়। যোগ অর্থ আর কিছুই নয়—স্বরূপে আত্মগঠন,—স্বরূপে আত্মনিমজ্জন মাত্র। কথাটা পরিষ্কার করিতে পারিতেছি কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। আইনানুসারে পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হওয়া পুত্রের পক্ষে সহজ, কিন্তু পিতৃগুণে ভূষিত হওয়া সহজ নয়, তাহা সাধন-সাপেক্ষ। বিশ্বপিতার সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির উপকার গ্রহণ সহজ, কিন্তু তদীয় বিশেষ বিশেষ গুণে ভূষিত হওয়া মানব-পুত্রের পক্ষে সোজা নয়, তাহা কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। ঈশ্বরসাধনের অর্থই তদীয় গুণ সাধন; তাঁহার স্বরূপ অনুক্রমণ, অনুপ্রাণন, অনুধাবন, অথবা স্বরূপে আত্ম-নিমজ্জন। স্বরূপ সাধন অর্থ—স্বরূপত্ব প্রাপ্তি—গুণে গুণীর মহা মিলন। যাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে নাই, আরাধনা করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র; বাক্যবিন্যাসের ছটা মাত্র। সেরূপ করিলে ধর্ম্মাপরাধ হয়। কবি বলেন, "কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" পুত্রশোকের তীক্ষ্ণতা সে বুঝিবে না, যাহার পুত্র বিয়োগ না হইয়াছে। যে কখনও কাহারও প্রতি দয়া করে নাই, বা কাহারও নিকট দয়া পায় নাই, সে বিধাতাকে দয়াময় বলিলে কিছুই ভাব ধারণা হয় না। সেইরূপ, প্রেমিক ভিন্ন কেহ তাঁহার প্রেমস্বরূপ ধারণা করিতে পাবে না। পুণ্যবান ভিন্ন কেহ তাঁহার পুণ্যের ধারণা করিতে পারে না, ইত্যাদি। আরাধনা বক্তৃতা নয়, কবিতা নয়, ভাষা-বিন্যাস নয়,—তাহা প্রত্যক্ষানুভূতি, তাহা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, তাহা প্রত্যক্ষীর ভগবৎ-সম্ভোগ, তাহা আত্মদর্শীর নিগূঢ় তপস্যার বিভূতি। তাহা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট আত্ম-অভিব্যক্তি, তাহা আত্মা ও পরমাত্মার ব্যক্ত যোগ-লীলা, এবং মাহাত্ম্য-বিবৃতি, অচ্যুত-নিত্যানন্দের প্রকট নিদর্শন। যে বিশ্ব প্রেমে মজিয়াছে, সে-ই অভেদ-প্রেমে তন্ময় হইয়া গভীরতর হইতে গভীরতমে ডুবিয়াছে। ইহা অন্য দেশে কোন কালে সম্ভব হয় নাই,শুধু এই ভারতেই প্রাচীনকালে সম্ভব হইয়াছিল এবং একালে ব্রাহ্মসমাজে সম্ভব হইতেছে। কিন্তু কথা এই, আধুনিক আচার্য্যদের আরাধনা-বিবৃতি শুনিলে বহু হাব-ভাব-সমন্বিত জল্পনের কদর্য্য ভাষার ছলনায় প্রলুব্ধ হইতে হয়। যে কখনও কঠোর সাধনা করে নাই, নিজ জীবনে কখনও কোন সত্য উপলব্ধি করে নাই, অথবা সত্য কথা বলিতে বা সত্য আচরণ করিতে অক্ষম, সে সত্য-স্বরূপের কি ধারণা করিবে? এজন্য দেখা যায়, অনেক স্থলেই আরাধনা বক্তৃতার আকার ধারণ করে, তাহাতে কাহারও প্রাণস্পর্শ করিতে পারে না; মনে হয় যেন কল্পনার বাকচাতুরী চলিতেছে। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, আরাধনা স্বরূপ-ব্যাখ্যা নয়, আরাধনা কবি-কল্পনাও নয়। আরাধনা প্রত্যক্ষ ধারণা realisation,—গুণে গুণীর মহা মিলন, আত্মায় ব্যক্তিরূপে পরমাত্মার অভিব্যক্তি। আরাধনা ধ্যানের পূর্ব্বাহ্ন। প্রকৃত আরাধনা হইলে

ধ্যানের উদ্বোধনের আর প্রয়োজন হয় না। আরাধনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও সত্যমূলক হইলেই সর্ব্বথা প্রাণস্পর্শী হয়—তাহাতে মানবকে অচ্যুত পদে আরূঢ় করে। যে সাধক সত্যমূলক আরাধনা করিতে পারেন, তিনিও ধন্য হন, যিনি তাহা শুনেন, তিনিও কৃতার্থ হন। সত্যে যাঁহারা অটল, জ্ঞানে যাঁহারা দৃঢ়, প্রেমে যাঁহারা বিহ্বল, পুণ্যে যাঁহারা নিষ্কলঙ্ক, তাঁহারাই শুধু আরাধনার অধিকারী,তাঁহারা সচ্চিদানন্দে সদা বিভোর। আরাধনার পবিত্র ভূমিতে আরোহণ করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহারা নির্ব্বাক হইয়াও যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি না হইলেও তাঁহাদের আকৃতিতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি প্রকট হয়। আরাধনা করিবার সময় কখন কখনও ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নির্ব্বাক হইয়া যাইতেন, আরাধনা শুনিয়া ৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উন্মত্তের ন্যায় হইতেন, মহর্ষির মস্তকের কেশরাশি জাগরিত হইত, ব্রহ্মানন্দের মুখ রক্তাভ হইত, প্রতাপচন্দ্রের দুনয়নে জলধারা বহিত। উঁহাদিগের আরাধনার সময়কার আকৃতি দেখিয়া লোকেরা মোহিত হইয়া যাইত। চিকাগো ধর্ম্ম-সংঘের বিবৃতি-পুস্তকে প্রতাপচন্দ্রের আরাধনার সময়ের যে চেহারা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেও প্রাণ শীতল হয়। ধর্ম্মোন্মত্ত সাধকগণের নৈষ্ঠিক জীবনের স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিলে জীবন সার্থক হয়, ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়।

আর আমরা? আমরা আরাধনার মহার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছি। আমরা শুধু চীৎকার করিয়া ভগবানকে ও লোকদিগকে ভুলাইতে চাই! বিধাতা ধর্ম্মাপরাধ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।

সঙ্গণিকা।

(৫৪)

"সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি"—অবশেষে রুসিয়ার সন্ধি-কাঠে পা দেওয়ায় এই কথাটাই স্মরণ হইতেছে। ঢের ঢের ঘটনা ঘটিয়াছে,—এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সকলেরই সন্ধির পথে পদনিক্ষেপ করিতে হইবে। জেদ আর সুদীর্ঘ কাল চলিবে না, বোধ হয়।

(৫৫)

এক দিকে হোমরুলের আন্দোলন, এক দিকে নেতৃবর্গের দলাদলি, অন্য দিকে সি-আই-ডির বর্দ্ধিত অবিচার ও অত্যাচার—আমরা আজ কাল আছি ভাল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী সকলে ঘুষ এবং ব্যক্তিত্ব কিরূপ চলিতেছে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের আর হোমরুলের জন্য মন মাতে না। নেতৃবর্গের দলাদলির মূল সূত্র কোথায়? কুটীর বদলে প্রস্তর পাইলেও তাঁহারা তাহা লইয়াই কামড়া-কামড়ি করিবেন, যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের আর স্বায়ত্ত-শাসনের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্তি থাকে না। আর সিন্ধুবালাদের প্রতি যে অত্যাচার হইল, যে জাতির লোকেরা তাহাও অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারে, তাঁহারা স্বায়ত্ত শাসন পাইলেও আবেদন-নিবেদন যে ছাড়িবে না, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অপিচ, মহাত্মা মণ্টেগু থাকিতেও অত্যাচার যখন এত বাড়িতেছে, তখন হোমরুল যে পাওয়া যাইবে না, তাহাই বুঝা যাইতেছে। তাঁহারা কি জানেন না, আমরা কোন্ অতলে ডুবিয়া রহিয়াছি? শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় এ কথা বলিয়া নিন্দা-ভাজন হইলেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবার প্রবাসীতে "আত্ম শাসন" প্রচার করিয়া উপেক্ষিত হইলেন! এ সব হইলেও, আমরা জানি, আমরা কি উপাদানে গঠিত, তাঁহারা আমাদের নাড়ী নক্ষত্র জানেন। ভারতবর্ষকে নির্ব্বাক করিতে মণ্টেগু আসিয়াছিলেন, তাহা হইয়াছে। আর বাকী কি? বাকী ইনকম-টেক্সের পুনরুত্থান, সি-আই-ডির গাত্রোত্থান, দলাদলি,হাট লুট, ডাকাতি প্রভৃতির জাগরণ! আরো আরো কত কি? আর কেন, আমাদের নীরবে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়াই ভাল নয় কি?

(৫৬)

"যা শত্রু পরে পরে"—এবার মহাত্মা তিলক ও বিপিনচন্দ্র বিলাতে যাইবার অনুমতি পাইলেন, কিন্তু বেসান্ত অনুমতি পাইলেন না, ইহাতে সেই কথাই মনে হয়। লোকেরা বলাবলি করিতেছে—এ কি বিচার গো!!

(৫৭)

"নারায়ণ" ঘোষণা করিতেছেন,রামমোহন রায় ফেরঙ্গ বাঙ্গলা প্রবর্ত্তিত করেন,মহর্ষি কিছুই নহেন; আরো কত কত পত্রিকা ঘোষণা করিতেছেন, পি, সি, রায়ও কিছুই নহেন, গান্ধিও কিছুই নহেন। সবে ধন নীলমণিদের এদেশে যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন তোমরা বিজ্ঞ, আশা করিতে চাও, কর; আমরা কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া নৈরাশ্যেই আত্ম সমর্পণ করিতেছি! শেষে এদেশে চরিত্রহীন নেতৃগণই কি রাজত্ব করিতে থাকিবেন? ইলেকসন, তুমি কত দূর? ঘুষের রাজত্ব ও দলাদলি কত কাল এদেশে স্থায়ী? কে তাহার উত্তর দিতে পারে?

(৫৮)

কোন উচ্চ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,বঙ্গের হাট-লুঠের কারণ কি বস্ত্র ও লবণ-সমস্যা? তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহা নয়, তাহা নয়। উহা আরা-বক্‌সারের হিন্দু-উত্থানের প্রতিবাদ। সেখানে হিন্দুরা উঠিয়াছিলেন, এখানে মুসলমানগণ উঠিয়াছেন।" দুই দলে দলাদলি ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডে, নানা আফিসে, মিউনিসিপালিটীতে; হাটে মাঠে গোঠে—সর্ব্বত্র। বিকেন্দ্রীকরণ-নীতিই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইতেছে। একতা ভিন্নও কি দেশের উন্নতি হইতে পারে? ভাই, তুমি কি বল?

(৫৯)

৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের গুণের কথা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি সমাজে বিলাতফেরত চালাইয়াছেন, কায়স্থ সমাজকে মিলাইয়াছেন, রাজনীতির দলাদলি ভাঙ্গিয়াছেন—অন্তরে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী হইয়াও বিদেশীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়াও চরিত্রের অটল সিংহাসনে বসিয়া তিনি কত মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত লিখিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার পুত্রেরা "দানসাগর" শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, তা ভালই করিয়াছেন,কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রচারিত হইলে আমরা সুখী হইতাম এবং বিস্তৃত জীবনী লেখার জন্য কিছু উৎসৃষ্ট হইলে আনন্দিত হইতাম। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ "মাইকেল জীবনী" লিখিয়া অমর হইয়াছেন, আত্মীয় চন্দ্রমাধবের জীবনী লিখিয়া পুণ্যের তর্পণ করুন না? তাঁহার ত এখনও বয়স আছে, অবসর আছে, অর্থ-সম্পদ আছে—কিছুরই অভাব নাই।

(৬০)

বহু দিন অতীত হইল, এখনও যুদ্ধের অবসান হইল না, ইহা স্মরণে আমরা ম্রিয়মাণ। দেশ যায় যে, বিধাতা মানবকে সুবুদ্ধি দিন। আর রক্তপাত ভাল লাগে না।

(৬১)

ব্রাহ্মসমাজের কনষ্টিটিউসন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। বেদী ভাঙ্গার কথা এখনও সকলের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই, এখন কনগ্রিগেসনে রবিবারের উপাসনা ভঙ্গেরও কথা শুনা যাইতেছে। সাধনাশ্রমের উৎসবকে রবিবারের দুবেলা ব্রহ্মমন্দিরে করিতে দিয়া কনগ্রিগেসনের সম্পাদক নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন। এবার মাঘোৎসবের সময়ে কোন রবিবার যথাসময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা হয় নাই। অতঃপর কেহ যদি রবিবার প্রাতে বা সন্ধ্যায় বিবাহ বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্রহ্মমন্দিরে করিতে চাহেন, তাহা

না দেওয়ার কি যুক্তি সম্পাদকগণ দেখাইতে পারিবেন? সব বুদ্ধিমানের খেলা—চতুরে চতুরের মিলন দেখিতেছি। যে ঘুষ গ্রহণ করে ও যে ঘুষ দেয়, উভয়ই দোষী নয় কি? কনগ্রিগেসনের উপাসনা ভঙ্গের জন্য দোষী কে?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪০। দ্বিজেন্দ্রলাল—জীবন, শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ২৷৷০। পুস্তকখানি সুবৃহৎ,৭৭১ পৃষ্ঠা। শ্রীযুক্ত দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ, সহৃদয়, প্রতিভাশালী ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ মহাশয়ের জীবনচরিতের পর দেবকুমারের পুস্তক আরো ভাল হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হয় নাই। এই পুস্তকখানির সর্ব্বত্র খুব আদর হইয়াছে, শুনিয়াছি, প্রথম সংস্করণের পুস্তক প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এই সংবাদে আমরা যারপর নাই আনন্দিত। দ্বিজেন্দ্রলালকে এ দেশের লোকেরা খুব আদর করিতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়, কেন না, প্রতিভার আদর না বাড়িলে দেশের মঙ্গল নাই।

এই পুস্তকখানিতে এমন অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, যাহা না লিখিলে ভাল হইত। তাঁহার কলঙ্কের অনেক কথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে, দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। সে সকল অংশ একেবারে বর্জ্জন করাই ভাল ছিল। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কে তাহা গণনা করে? দ্বিজেন্দ্রলালের কোন দোষ থাকিলে কালের আবর্জ্জনায় তাহা মুছিয়া যাইবে, সে সকল আলোচনার আর কি প্রয়োজন? রবীন্দ্র-বিদ্বেষের কথা ঘোষণারও প্রয়োজন ছিল না, কেন না, সে সকল সামান্য বিষয়। জীবনকালে কত কত লোকের সহিত মতানৈক্য হয়, কে তাহা স্থায়ী সাহিত্যে স্থান দেয়? মধ্যে মধ্যে তাঁহার পুস্তকের তীব্র সমালোচনাও আছে, তাহারই বা প্রয়োজন কি ছিল? কোন্ লোকের কোন্ পুস্তক সর্ব্ববাদীসম্মত? সে সকল কথার আলোচনারই বা প্রয়োজন কি ছিল? দ্বিজেন্দ্রলালের অনিন্দিত প্রতিভা কিরূপে প্রস্ফুটিত হইল,তাহার ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবৃতি এই প্রথম খণ্ডে থাকিলেই ভাল হইত। পুস্তক খানি বিষয়-বিবৃতিতে কিছু কিছু জটিল হইয়াছে, ঘটনার পারম্পর্য্যও সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হয় নাই। অনেক বাহুল্য পত্রকে এই পুস্তকে স্থান দেওয়ায় পুস্তকের কলেবর অনেক বাড়িয়াছে। এই সকল গেল, দোষের কথা। গুণের কথা এই—পুস্তকখানি নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত,ইহা অন্ধ স্তাবকের বিবৃতি নয়, ভাষা ও রুচি মার্জ্জিত,—দ্বিজেন্দ্রলালকে মানব-দেবতা রূপে চিত্রিত করিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তক খানির কতকাংশ বাদ দিলে একখানি উপাদেয় পুস্তক হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুর এ দেশে অভাব নাই। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রধান। তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রন্থখানির কলেবর কিছু খর্ব্ব করিলে ভাল হয়। আমাদের দেশের আদর্শ জীবনচরিত যোগীন্দ্রনাথের "মাইকেল" ও চণ্ডীচরণের "বিদ্যাসাগর"। এই আদর্শ লইয়া দেবকুমার পুস্তক খানিকে সংশোধিত করিলে ভাল হইবে।

শবরী শ্রমণা। (১)

ভক্তির রহস্য সাধারণের দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয়। ভক্তগণই ভক্তির পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। তাঁহারা ভক্তিকে ভগবানের আকর্ষণী ও বন্ধন-রজ্জু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভক্তির পীযূষধারায় যাঁহাদের অন্তরাত্মা বিধৌত হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল ভক্তির মধুর ভাবে বিভোর হইয়া, এই দুঃখালয় সংসারেও অমল আনন্দের মৃদুল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া দুঃখের পরপারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ভক্তি-রসের মধুরিমা এক মাত্র ভক্তগণেরই আস্বাদ্য, যাঁহারা ভক্তিপন্থী নহেন, তাঁহারা ভক্তির তাদৃশ পক্ষপাতী হন না, ভক্ত কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"ভ্রমরা জানয়ে কমল মাধুরী
তেঁহ সে তাহার বশ,
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥"

নাভিমূলে কস্তূরী জন্মিলে, কুরঙ্গকুল যেমন তাহার মনোহর গন্ধে আনন্দিত হইয়া নানা রঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে—হৃদয়-কুঞ্জে ভক্তির কুসুম বিকসিত হইলেও ভক্ত রসিকগণের তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা বাঞ্ছিত প্রিয়তমের প্রত্যাশায় হৃদয়ে বাসরশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া অভিসারিকার মত আকুল প্রাণে, প্রিয়তম সখার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন, এবং কোন রকম সাড়া শব্দ কর্ণগোচর হইলেই চমকিত হইয়া প্রিয়তমের আগমনাশঙ্কা করিয়া থাকেন। তাই রসিক, ভক্ত কবি জয়দেব গাহিয়াছেন—

"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযা ং"

(গীতগোবিন্দ)

যখন অনুরাগের প্রবল তরঙ্গে, হৃদয় আহত হয়, এবং ভগবানের দুর্ব্বহ বিরহভারে জীবনকে ভার বলিয়া মনে হয়, এবং হৃদয়-বাঞ্ছিত সখার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই প্রাণের আরামপ্রদ হয় না, তখন ভক্তি পরিণত হইয়া প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"তদ্বিয়োগাসহং প্রেম" ঈদৃশ প্রাণের ব্যাকুলতা বা প্রেমই বাঞ্ছিত রত্ন লাভের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, এই প্রেমের আকর্ষণী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই গোলোকের চন্দ্র ভূলোকে উদিত হইয়া প্রেমিকগণকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। যতদিন পর্য্যন্ত আরাধ্য দেবতার সঙ্গলাভ না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত, প্রকৃত প্রেমিকগণের যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের স্বমুখ-বর্ণিত এই শ্লোকটী পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়।

"যুগায়িতং নিমেষেণ, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগোবিন্দের বিরহে আমার এক নিমেষ

(১) বাল্মীকি রামায়ণে শ্রমণী বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু ভবভূতি তাঁহার "উত্তররামচরিতে" ও মহাবীর-চরিতে "শ্রমণা" বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রমণী ও শ্রমণা এই উভয় শব্দই ব্যাকরণ শুদ্ধ, ও একার্থবোধক।

যেন, একটী যুগ বলিয়া মনে হয়, নেত্র অনবরত বারিধারা বর্ষণ করিয়া বর্ষাকালের ন্যায় আচরণ করিতেছে এবং এই সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিরহই মিলন সুখের উৎকর্ষ বর্দ্ধন করে,—

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে"
(সাহিত্য-দর্পণ)

কেহ বলিয়াছেন যে, মিলনাবস্থায় কেবল প্রিয়তমের একত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু বিরহে ত্রিভুবনই তন্ময় হইয়া যায়।

"সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং
বিরহে"॥ (সাহিত্য-দর্পণ)

যাহা হউক, শবরী শ্রমণা যে, ঈদৃশ ভক্তি ও প্রেমের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রের ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিতে করিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া, ভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং,
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং"॥

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তির এই নব লক্ষণ, শবরীর জীবনেই সম্যক প্রকারে পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই জন্যই সে ভক্তগণের চরম আদর্শ ও চিরস্মরণীয়।

শ্রমণা পঞ্চবটী বনবাসী কোনও চণ্ডাল-কন্যা, তাহার ধর্ম্মপিপাসা নিতান্ত বলবতী ছিল, কিন্তু উপদেষ্টার অভাবে প্রথমে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। পঞ্চবটী-বনস্থিত মুনিগণ, শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেন। শবরীরও উপদেশ লাভের ইচ্ছা অদম্য হইয়া উঠিল। সে চণ্ডাল-কন্যা হীন জাতি, মুনিগণের অস্পৃশ্য, তাই তাঁহাদের নিকট স্বকীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতে সাহস করিল না, কিন্তু মুনিগণের অনুগ্রহ প্রত্যাশায় সে প্রতিদিন প্রত্যূষে তাঁহাদের স্নানের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিত এবং কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আশ্রমে রাখিয়া যাইত। সুপ্তোত্থিত মুনিগণ, ইহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন; কিন্তু, কে এরূপ কার্য্য করে, তাহা জানিতে পারিলেন না। এক-দিন সশিষ্য মুনিগণ, সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া শবরীর তাদৃশ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিষ্ণু-ভক্ত, ও উদার-চরিত্র মুনি শবরীর অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মপিপাসা ও একান্ত গুরুভক্তি দেখিয়া তাহাকে শিষ্যা করিলেন, এবং রামমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। মুনি, অস্পৃশ্য চণ্ডালীকে শিষ্যা করিয়াছেন, এই অপরাধে তাঁহার ছাত্রবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। মুনি শবরীকে বলিলেন, "বহু বৎসর পরে, ভগবান্ নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন, এবং ভ্রাতার সহিত তোমার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবেন"।

শবরী শ্রমণা, গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইল, এবং পম্পাসরোবরের পশ্চিম তীরে লতাপাতা দ্বারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া আকুল প্রাণে তাহার অভীষ্ট দেবতা রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় রহিল।

"পত্রের কুটিরে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া,
শবরী রহেন রামচন্দ্র পথ চায়্যা,
তৃষিত চাতকী যেন মেঘ আগমন,
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥"
(ভক্তমাল)

শবরী সর্ব্বদা রামরূপ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত, অতি কষ্টে বনে যাইয়া ফল মূল সংগ্রহ করিয়া

আনিত, মনোহর সুগন্ধি কুসুমে মালা গাঁথিয়া, তাহার কল্পিত রামচন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ করিত। যে ফল মিষ্ট লাগিত, তাহা সে অতিশয় যত্ন ও অনুরাগের সহিত, রামচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিত।

"বন মধ্যে ফল ফুল আনে বহু দুঃখে,
মিষ্ট হ'লে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে",
"চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে,
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥"
(ভক্তমাল)

প্রকৃত ভক্তগণের এই ভাবটী বড় মধুর ও অপার্থিব, ভক্তির পরাকাষ্ঠা না জন্মিলে এই ভাবের আবির্ভাব হয় না। শবরী রাম-প্রেম মাতোয়ারা হইয়া, আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ফল সংগ্রহ করিতেও তাহার দুঃখ হইত, কারণ, সে বনে গেলে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হৃদয়-দেবতা যদি তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া যান। মিষ্ট ফল আহার করিতে বসিলে অমনি তাহার রামময় হৃদয় কান্দিয়া উঠিত, আর তাহা আহার করিতে পারিত না, রামের জন্য সেই উচ্ছিষ্ট ফল রাখিয়া দিত। এইরূপ ভাল-বাসিতে না পারিলে কি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায়?

এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, শবরীর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, তথাপি তাহার পিপাসিত কণ্ঠে বারি বিন্দুপাত হইল না, সে উন্মাদিনী প্রায় হইয়া বনে বনে রামচন্দ্রকে খুঁজিতে লাগিল।

একদিন সহসা অমৃতবর্ষী, স্নেহপূর্ণ, কর্ণা-ভিরাম ধ্বনি, তাহার কর্ণগোচর হইল। সে চমকিত হইয়া কাণ পাতিয়া রহিল, এবং উন্মত্তপ্রায় হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সে, সেস্থান হইতে নড়িতে পারিল না, এবং চিত্রপুত্তলিকার মত, অনিমেষ নয়নে ভুবন-মোহন রামচন্দ্রের শ্যামল কান্তি দর্শন করিয়া তাহাতে একেবারে ডুবিয়া রহিল।

ভাবাবেশে তাহার হৃদয়ে পীযূষময় প্রেম-পারাবার উচ্ছ্বলিত হইল। সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রামচন্দ্রও ভাবে বিভোর হইয়া নীরব রহিলেন। রামচন্দ্র ও শবরী উভয়েই পরস্পর মধুর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তাহারা দুই জনই ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া সুকুমারমতি লক্ষ্মণও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

চিত্রপুত্তলিকা প্রায়, অনিমিখ নয়নে চায়,
রামরূপে ডুবিল হৃদয়,
ক্রমে উঠে নানা ভাব, সুধা জিনি প্রেমার্ণব,
রোমাঞ্চাদি দেহেতে উদয়।
প্রভু ভৃত্যে দোহে কান্দে, দোহা প্রেমে দোহা কান্দে,
দুইজনে স্থির নাহি বান্ধে।
শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার প্রেম দেখি দোহাকার
তেহ পুনঃ ফুলি ফুলি কান্দে।
(ভক্তমাল)

প্রেমের সাগর উচ্ছলিত হইয়া ভক্তের হৃদয় যখন প্লাবিত করে, তখন তাহাদের অন্তরাত্মা কি যেন অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় পীযূষ রসের আস্বাদে আত্মহারা হইয়া, আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; ইন্দ্রিয় সকল যেন জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং নিজের আমিত্ব ভুলিয়া গিয়া, সেই মধুর রসে একে-বারে মিশিয়া যায়। সুতরাং সে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে, এবং কিংকর্ত্তব্যতা জ্ঞান তাহার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

রামচন্দ্রের ইন্দীবর শ্যামল কান্তি দর্শনে আজ রামময়-হৃদয়া শবরীরও তাহাই ঘটিল। আজ তাহার পিপাসাক্ষাম কণ্ঠে নব মেঘ বিনির্মুক্ত বারিধারা নিপতিত হইল।

যাহার বিরহে জগৎ তাহার নিকট জীর্ণারণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, কৌমুদী স্নাপিত মধুময়ী যামিনী, বা সুরভি কুসুমদাম-শালিনী বাসন্তী প্রকৃতির লোচন লোভনীয় সুষমা, কিম্বা, পঞ্চবটী বনসঞ্চারী মৃদুমন্দ সমীরণও তাহার সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিতে পারিত না।

এমন কি, পম্পাসরোবরের বক্ষে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গকুল মধুর কূজনে সন্তরণ করিত। কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া ঘ্রাণতর্পণ-সৌরভ বিস্তার করিত, মকরন্দ-পিপাসু অলি-কুল ফুলে ফুলে মনোহর ঝঙ্কার করিত, এবং পঞ্চবটী বনবাহিনী গোদাবরী, কুলু কুলু নাদে ও মৃদুল হিল্লোলে বহিয়া যাইত। কিন্তু যে রাম ধ্যানে নিমগ্ন শবরীর হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত না, সে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থান করিত, বাহ্য কোনও পদার্থের সহিত সে কোন সম্বন্ধ রাখিত না। ঈদৃশ পরাভক্তি প্রভাবে আজ তাহার সেই আরাধ্য দেবতা স্বয়ং তাহার কুটীর দ্বারে অতিথিরূপে উপস্থিত। যাহা তাহার কল্পনার বিষয় ছিল, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইল।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্তু যংপ্রাপ্য মুচ্যতেঽশুভাৎ॥
(ব্রহ্মোপনিষদ)

যে আনন্দ বাক্যও মনের অগোচর, যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, বাঞ্ছিত রত্ন লাভে, তাহার সেই আনন্দ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর শবরী কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া, রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা ও প্রণিপাত পূর্ব্বক বসিবার জন্য কুশময় আসন প্রদান করিল, এবং জল দ্বারা তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তাহা মস্তকে ধারণ ও পান করিল। তার পর বনজাত কুসুম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিল, এবং পূর্ব্বে আস্বাদন করিয়া যে সকল ফলের মাধুর্য্য পরীক্ষা করিয়াছিল, সেই সকল ফল ভক্তিপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে অর্পণ করিল।

"প্রত্যুদ্গম্য প্রণম্যাথ নিবেশ্য কুশ বিষ্টরে,
পাদপ্রাক্ষালনং কৃত্বা তৎ তোয়ং পাপনাশনং
শিরসা ধার্য্য পীত্বা চ বন্যৈঃ পুষ্পৈরমার্চ্চয়ৎ।
ফলানি চ সুপক্কানি মূলানি মধুরানি চ।
স্বয়মাস্বাদ্য মাধুর্য্যং পরীক্ষ্য পরিভক্ষ্য চ
পশ্চান্নিবেদয়ামাস, রাঘবাভ্যাম্ দ্রঢ়ব্রতা॥
(পদ্মপুরাণ)

ভক্তবৎসল রামচন্দ্র, শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল মূল সাদরে ভক্ষণ করিয়া ভক্তের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন।

তারপর রামচন্দ্র, মধুর বচনে শবরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার কাম ক্রোধাদি রিপুমণ্ডলী নির্জ্জিত হইয়াছে কি না, এবং যথাবিধি সংযম রক্ষা ও মানসিক মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে কি না। বৃদ্ধা শবরী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "তুমি দেবশ্রেষ্ঠ ও পুরুষোত্তম, আজ তোমার সন্দর্শনে আমার তপস্যার সিদ্ধি হইল, গুরুগণ পূজিত হইলেন, এবং আমার জন্ম সফল হইল। হে সুন্দর! তোমার শান্ত মধুর দৃষ্টিপাতে আমি চণ্ডালী হইয়াও পবিত্র হইলাম। হে অরিন্দম! আমি আজ তোমার প্রসাদে অক্ষয় লোকে গমন করিব।"

"তবাহং চক্ষুষা সৌম্য! পূতা সৌমেন মানদ!
গমিষ্যাম্যক্ষয়াল্লোকান্ ত্বৎপ্রসাদদরিন্দম!"
(বাল্মীকি রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড)

শবরী ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে পুনর্ব্বার বলিল, "আমার গুরুগণও তোমার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, আমি কোন ছার! আমি অস্পৃশ্য হীন জাতি, তাহাতে আবার নারী, আমি তোমার দাসের দাস, তার দাস ও তার দাস, এইরূপে পর পর শততম দাসের দাসী হইবার অধিকারও আমার নাই। তুমি মুনিগণের পরম আরাধ্য, আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের পক্ষে তোমার দর্শন লাভ কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। আমি এমন কোনও পুণ্যকার্য্য করি নাই, যাহার ফলে তোমার এই ভুবনমোহন রূপ আমার নয়নগোচর হইতে পারে। তুমি দেবগণেরও ঈশ্বর, তোমার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য। আমি তোমার স্তব করিতে জানি না, এবং আমাকে কি করিতে হইবে তাহাও জানি না, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

শবরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র কহিলেন যে, তাহার আরাধনায় পুরুষ স্ত্রী ও জাতি ও আশ্রম নির্ব্বিশেষে সকলেই অধিকারী, তাহার আরাধনায় স্ত্রীগত ও পুরুষগত বা জাতিগত বিশেষত্ব কিম্বা আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না—একমাত্র ভক্তিই তাহার উপাসনার কারণ। তাঁহাতে ভক্তিবিহীন হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও বেদাদি অধ্যয়ন করিলেও কেহ তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয় না।

"স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে বিশেষো বা জাতীনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেবহি কারণং॥"
"যজ্ঞদানতপোভির্ব্বা বেদাধ্যয়ন কর্ম্মভিঃ
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা"॥
(অধ্যাত্ম রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড)

এতদিন পরে শবরীর আশালতা ফলবতী হইল। তাহার চিত্ত এখন সর্ব্ব বাসনার অতীত। মুনি-যোগি-বাঞ্ছিত রামচন্দ্রের ইন্দীবর শ্যামল ভুবনমোহন কান্তি দর্শন করিয়া সে পূর্ণমনোরথ হইয়াছে। তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ, তাহার জীবন ধন্য ও কৃতার্থ, সে এখন সমস্ত অভাবের পর পারে। সে আর কিছুই চায় না। সে এখন অমিয়-সাগর সন্তরণশীলা রাজহংসী, জগত আজ তার কাছে মধুময়, জগতের প্রতি বস্তু হইতে মধু ক্ষরিত হইয়া, তাহারও হৃদয় মধুময় করিল। আজ দেবদুর্ল্লভ অমৃত পান করিয়া চণ্ডালীর সকল পিপাসার শান্তি হইয়াছে। তাহাদের এই মধুর ভাব দর্শন করিয়া পঞ্চবটী বনের পশুপক্ষিগণও মধুর ও বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হইল। মুনিগণ বিস্মিত হইলেন, পম্পাসরোবরের আনন্দে আত্মহারা হইয়া হংসকারণ্ডবগণের মধুর স্বরে মঙ্গলগীতি গাহিয়া উঠিল। আজ সে চণ্ডালী হইয়াও সাধারণের পূজ্যা হইল। তারপর রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "তোমার অর্চ্চনায় আমি প্রীত হইয়াছি, এখন তুমি মনের সুখে তোমার বাঞ্ছিত স্থানে গমন করিতে পার"। শবরী কোথায় যাইবে? তার বাঞ্ছিত স্থানই বা কোথায়? সে যে রামের ভুবনমোহন রূপ নয়নের অন্তরাল করিয়া ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ করিতে পারে না। জীবন ধারণের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা তার সম্পন্ন হইয়াছে। বৃথা জীবন ধারণের আর প্রয়োজন কি? জানি কি, তাহার এ হেন প্রাণারাম রামরূপ যদি অন্তর্হিত হয়। তাহার করতলগত বাঞ্ছিত রত্ন যদি হারাইয়া যায়, এবং তাহার এ হেন শান্তিময় সুখ স্বপ্ন কপাল গুণে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে, জরাতুরা শবরী শ্রমণা, শুষ্ক কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত করিয়া, তাহাতে বহ্নি সংযোগ করিল, তারপর

তাহার চিরবাঞ্ছিত, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, জটা-বল্কলধারী, নবীন সন্ন্যাসী, নয়নাভিরাম রামরূপ দেখিতে দেখিতে প্রজ্জলিত চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া ভক্তিযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করিল। পঞ্চবটী বনও বিহঙ্গকুলের কলরবে গাহিয়া উঠিল "জয় ভক্তির জয়"!!!

শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ।

কুম্ভ মেলা—প্রয়াগ।

বহু কালের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার পরই শুনিলাম, এবার মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভ মেলা হইবে। সুতরাং মনে খেয়াল উঠিল, কুম্ভ মেলায় যাইয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিব এবং যদি সম্ভব হয়, কিছুদিন সাধু সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। কিছুদিন পরে সংবাদ পত্রে দেখিলাম, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য অনেক যাত্রী-গাড়ী বন্ধ করিতে হইয়াছে, সুতরাং মেলার জন্য স্পেশেল গাড়ী দেওয়া হইবে না; অতএব সর্ব্বসাধারণে যেন মেলায় আসিয়া বৃথা কষ্ট না পান। তথায় গেলে তাহাদিগকে নানাবিধ কষ্ট ও অসুবিধায় পড়িতে হইবে। এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া অবশ্য হিন্দুমাত্রেই হাস্য করিয়াছিলেন—কারণ, হিন্দুমাত্রেই ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের নামে সামান্য অসুবিধা তো দূরের কথা, তাঁহারা এজন্য মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। আমি বহু কাল রথযাত্রার সময় পুরীধামে কার্য্য করিয়া দেখিয়াছি, তীর্থযাত্রিগণ তীর্থোপলক্ষে কত প্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারিগণও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের নামে ভারতবর্ষীয় লোক যে প্রকার দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে পারে, এ প্রকার অন্যত্রে দেখা যায় না। ইংরেজগণ প্রতি রবিবারে এক ঘণ্টার জন্য গির্জ্জায় গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতেও যদি কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে, তবে তাঁহারা তথায় এক ঘণ্টার জন্যও যাইতে নিবৃত্ত হন।

যাহা হউক, ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলাম না। তারপর যখন বিজ্ঞাপন দেখিলাম, ৩রা জানুয়ারী হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এলাহাবাদ এবং তন্নিকটস্থ ষ্টেশন সমূহের জন্য টিকিট দেওয়া হইবে না, তখন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলাম। আর এখন পূর্ব্বকার মত পদব্রজে যাইবার ব্যবস্থা নাই। এখন রেলের সুবন্দোবস্ত হওয়ায় পূর্ব্বকার ব্যবস্থা সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পদব্রজে তীর্থ করিয়া যে প্রকার জ্ঞান ও বহুদর্শিতা জন্মিত, এখন আর তাহা হয় না। টিকিট বন্ধ হইবার কারণ, যুদ্ধের জন্য রেলের ইঞ্জিনগুলি যুদ্ধের কয়লা বহন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং অতিরিক্ত গাড়ী চলিতে পারিবে না। বড় বড় আখড়াধারী সাধু মহান্তগণ রেলের সাহায্য বড় বেশী গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতেই হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতির সাহায্যে মেলা স্থানে আসিয়া থাকেন; সুতরাং রেলের টিকিট বন্ধ হওয়ায় তাঁহারা

বড় বেশী অসুবিধায় পড়েন নাই—তাঁহারা ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

উক্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া মেলায় যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহাশয়ের জনৈক ভক্ত আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়! স্বামিজী মেলা-স্থানে ধর্ম্মার্থ ঔষধালয় খুলিবেন, আপনি যদি দয়া করিয়া উহার ভার গ্রহণ করেন, তবে বড়ই সুখী হইব। আপনার যাতায়াতের খরচ ইত্যাদি সমস্তই স্বামিজী বহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" আমি অযাচিত এই নিমন্ত্রণ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ২রা জানুয়ারি তথায় যাইতে স্বীকৃত হইলাম। মেলা স্থানে যথাসময়ে যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময়ে এলাহাবাদস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় তথায় যাইয়া মিশনের পক্ষ হইতে কার্য্য করিবার জন্য তার করিলেন। ভগবানের কৃপা হইলে এই প্রকারেই চারিদিক হইতে সুবিধা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আর কালবিলম্ব না করিয়া ২রা জানুয়ারি প্রয়াগ রওনা হইলাম। টিকিট বন্ধের সেই দিনই শেষ দিন, সুতরাং গাড়ীতে বেশ ভীড় হইয়াছিল, এবং সময় মত গন্তব্য স্থানে পৌছিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা বিলম্ব হইল। সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনে পোঁছিয়া দেখিলাম, এক্কা ও গাড়ীর ভাড়া ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক মাইল রাস্তা, যাহা পূর্ব্বে ৩।৪ আনায় যাওয়া যাইত, এক্ষণে ১৷৹ টাকা ভাড়া দিয়া সেই স্থানে যাইতে হইল।

এলাহাবাদ মুটিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বাঘাম্বরি বাবার মঠে যাইতে হইল। মঠের কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, উক্ত বাঘাম্বরির বাবা ঝুসি নামক ত্রিবেণীর অপর পারে তেওয়ারি শিবালয়ে একটী ঔষধালয় স্থাপন করিবেন, আমাকে তাহারই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের লোক, সুতরাং ইহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ভোলানন্দ গিরি মহাশয়ের কার্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, অন্য একটী সুযোগ্য ডাক্তারকে তথাকার ভার দেওয়া হইল। স্বামিজীর ভক্ত তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। আমিও স্বামিজীর নিকটে গমন করিয়া সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ঝুসিতে কার্য্য করিবার অনুমতি গ্রহণ করিলাম।

বাঘাম্বরি মঠ দারাগঞ্জের নিকট। এই স্থান হইতে ত্রিবেণী সংযম অনুমান ২॥৹ মাইল। বাঘাম্বরি মঠের বাগানে ৩ রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। মঠের নামটী একটু নূতন রকমের। সুতরাং এই মঠের নাম ও তাহার স্থাপন সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমানে মঠের মহান্ত একজন বাঙ্গালী যুবক। ইনি পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কোন কোন স্থানে সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে বাঘাম্বরি মঠের ভূতপূর্ব্ব মহান্ত কৃষ্ণানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে মহান্ত মহাশয়ের চরিত্র-দোষ প্রকাশ পাইলে তদীয় শিষ্য এই বাঙ্গালী যুবক মঠের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ইহাঁকে গদীর মহান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে বাঘাম্বরি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা

করিতেছি। ভারত-সম্রাট আকবর সাহার সময়ে তদীয় গঙ্গাযমুনা সংগমের কেল্লার নিকট একজন মহাপুরুষ তথায় হনুমানজী প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেন। ইনি আপাদমস্তক ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত রাখিতেন। সেইজন্য তাঁহাকে সকলে 'বাঘাম্বরি বাবা' বলিয়া ডাকিত। এই মহাপুরুষের অদ্ভুত শক্তির কথা সম্রাটের গোচর হইল, একদিন তিনি তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। সেই সময়ে মহাপুরুষের অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল, সম্রাট আগমন করিলে, তাঁহাকে জ্বরের কথা বলা হইল এবং তিনি একটু দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাইবার মনস্থ করিতেছেন, এমন সময়ে বাঘাম্বরি বাবা সম্রাটের আগমন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জ্বর লইয়া কেন আসিলেন"? বাবা উত্তর করিলেন, "আপনার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিছু-ক্ষণের জন্য আমার ব্যাঘ্রচর্ম্মকে জ্বর দিয়া আসিয়াছি—আমার শরীরে এক্ষণে জ্বর নাই। আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আবার জ্বর নিজ শরীরে গ্রহণ করিব।" সম্রাট ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের নিকট গমন করিয়া সত্যই দেখিতে পাইলেন, চর্ম্ম জ্বরে কম্পিত হইতেছে। সাধুর এই প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে অনেক বিষয় সম্পত্তি দান করিলেন। সেই হনুমানজী অদ্যও বর্ত্তমান আছেন, এবং বর্ত্তমান কেল্লার নিকটেই মৃত্তিকা গর্ভে নিয়মিত ভাবে পূজিত হইতেছেন।

আমাদের দেশে যে সকল বড় বড় মঠ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্থাপন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল পূর্ব্বে কোন একজন মহাপুরুষের দ্বারা উহা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের প্রবল প্রতাপ আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। ইহারা অর্থের প্রত্যাশা করিতেন না, কিন্তু অর্থ নানা প্রকারে তাঁহাদের নিকট আগমন করিত। বর্ত্তমান মঠধারী একটী সচ্চরিত্রবান যুবক এবং ত্যাগী। বিস্তর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, নিজে অতি সামান্য বেশভূষায় কালযাপন করেন, এবং সদাসর্ব্বদাই বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। আশা করা যায় যে, ইহার তত্ত্বাবধানে গদির যশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এই স্থানে ৩ দিবস বাসের পর ঝুসী নামক স্থানে গমন করিয়া, তথাকার শিবালয়ে ঔষধালয় খুলিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের আরও ৩ জন যুবক ব্রহ্মচারী আমার সাহায্যার্থে আগমন করেন। এই শিবালয়ে হৃষীকেশ কৈলাসের অনেকগুলি সন্ন্যাসী বাস করিতেন। পরলোকগত স্বামী ধনরাজ-গিরি কর্ত্তৃক হৃষীকেশ কৈলাস স্থাপিত হয়, এবং তাঁহারই জনৈক ভক্ত কচ্ছদেশবাসী জেঠাভাই নামক একজন ব্রাহ্মণ এই ঔষধালয়ের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া-ছিলেন। কুম্ভ মেলা উপলক্ষে বম্বে প্রভৃতি স্থানের সেঠ ব্রাহ্মণ ও বালকদিগের দানের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এ সময়ে তাঁহারা অর্থ জলের মত ব্যয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা যেমন অর্থ রোজগার করিতে পারেন, আবার তেমনি ব্যয়ও করিয়া থাকেন। সমস্ত তীর্থস্থানে যে সকল ধর্ম্মশালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর লোক দ্বারা নির্ম্মিত। এই সমস্ত ধর্ম্মশালা দ্বারা অসংখ্য লোকের উপকার হইতেছে। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সময় দেখিয়াছি, এমন তীর্থস্থান নাই, যেখানে ২।১টী ধর্ম্মশালা নাই।

ঝুসী স্থানটী ঠিক গঙ্গার উপরে। এই স্থানেই B. N. W. R এর গঙ্গায় পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে গঙ্গার দৃশ্য অতি মনোহর এবং তদুপরিস্থ ইংরেজের কেল্লা অতি গম্ভীর ভাবে ইংরেজের কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে। নিম্নে গঙ্গা কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে এবং আমরা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তাহার প্রায় ১ মাইল নিম্নে যমুনার সহিত মিলিত হইয়া দুই স্রোত একত্রিত হইয়া সাগর সম্ভাষণে ধাবিত হইতেছে। কথিত হয়, এই স্থানে সরস্বতীও যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত আছেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সরস্বতী গুপ্তা আছেন। গঙ্গায় ঝুসীর তীরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে শিবালয়ে ছিলাম, উহাকে তেওয়ারির শিবালয় বলে। এই মন্দিরের গাত্রে সুন্দর সুন্দর পাথরে খোদিত নানাবিধ দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরদিগের অবস্থা এক্ষণে ভাল নহে। ঠাকুর সেবার বন্দোবস্ত সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

শিবালয়ের একটু দক্ষিণে গঙ্গাতীরে স্বামী যোগানন্দের পাঠশালা। এই স্থানে অনেকগুলি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ বালক শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে যে প্রকারে বিদ্যাদান করা হইত, এখানেও সেই প্রকারেই বিদ্যাদান করা হইয়া থাকে। ঝুসী-রেল-ষ্টেসনের নিকট বাবু কিশোরী লালের ধর্ম্মশালা। এই স্থানে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। ঠাকুরের মন্দির একটী সুন্দর বাগানের মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার চারিদিকে অতিথ থাকিবার জন্য অনেকগুলি গৃহ আছে। দিনরাত্র সদাব্রত চলিতেছে, নানা দেশের নানা প্রকার সাধু মোহন্ত আসিয়া, যিনি যে প্রকার আহার প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি তাহাই পাইতেছেন এবং আনন্দ সহকারে মন্দিরের চারিদিকে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেছেন। এই সমস্ত অতিথির জন্য কূপ হইতে জল তুলিয়া দেওয়ার জন্য একজন লোক নিযুক্ত থাকে। বড় বড় তিনটী রাস্তার সম্মিলন স্থানে এই ধর্ম্মশালা স্থাপিত, সুতরাং দিন রাত্র অতিথির অভাব হয় না। মন্দিরের মধ্যস্থিত বাগানে অনেকগুলি কমলালেবুর গাছে শত শত কমলালেবু পাকিয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া বড়ই আনন্দানুভব করিলাম। কেহ চেষ্টা করিলে এই স্থানে কমলালেবুর আবাদ সুন্দর ভাবে চলিতে পারে।

স্বামী যোগানন্দের পাঠশালার একটু দক্ষিণে হংস-তীর্থ। এখানে একজন মহাপুরুষ বাস করেন। এই মঠের মধ্যে একটী গুহা আছে, তথায় তিনি ধ্যান করিয়া থাকেন। হংস তীর্থের দক্ষিণে সমুদ্র গুপ্তের কেল্লা বা মঠ। এই মঠ গঙ্গাগর্ভ হইতে একটী কেল্লার মত দেখায়। গঙ্গাগর্ভ হইতে উহার উপর উঠিবার জন্য অতি সুন্দর সিঁড়ি আছে। এই মঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-দিগের দ্বারা স্থাপিত। এই স্থানে গঙ্গা পার হইলেই ত্রিবেণী ঘাট। এই ঘাটে প্রয়াগের পাণ্ডাদিগের আড্ডা আছে, তাঁহারা যাত্রী-দিগকে স্নান করাইয়া কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকেন। পাণ্ডাদিগের নিজ নিজ স্থান সন্ধান করিয়া লইবার জন্য নানাবিধ পতাকা দ্বারা চিহ্নিত আছে। কাহার পতা-কার উপর একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি, কাহার পতাকার

উপর একটী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, কাহার সিংহ মূর্ত্তি, কাহার পতাকার উপর এক খানা তাল পাখা বা একটী ঘটী। এই সমস্ত চিহ্ন না থাকিলে তাহাদের স্থান সন্ধান করিয়া লওয়া অসম্ভব ব্যাপার। স্থানে স্থানে কাঠের তক্তপোষ স্থাপিত আছে, তাহার উপর যাত্রিগণ বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া স্নান করেন এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তিলক, চন্দন গ্রহণ করেন। যাত্রীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থিতি করেন।

কেল্লার নিকটে বেণীমাধবের বাঁধ; তথা হইতে সঙ্গম স্থান প্রায় দুই মাইল। এই স্থানেই কুম্ভমেলায় আগত মোহন্ত ও সন্ন্যাসীগণ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন. বাঁধ হইতে সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত একটী অতি প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার দুই ধারে মোটা দড়ি দ্বারা ঘেরা ছিল এবং এই স্থান দিয়াই সন্ন্যাসীদিগের মিছিল সকল গতায়াত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া সকল রকম সুবিধাই করিয়াছিলেন। এই বড় রাস্তার দুই ধারে বড় বড় দোকান এবং বড় বড় সন্ন্যাসী মোহন্তদিগের আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত স্যানিটারি আফিস, ডাক্তারখানা, পুলিস কোতয়ালি, টেলিগ্রাফ আফিস, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। পানীয় জলের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম। মেলা স্থানে প্রায় এ প্রকার পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি অল্প দূরে দূরে জলের কল এবং তাহাতে দিবারাত্র প্রচুর পরিমাণে জল রক্ষিত হইয়াছিল। যাত্রীদিগের জন্য পায়খানার বন্দোবস্তও অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঝাড়ুদার রাস্তাগুলি সদা সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। সঙ্গম স্থান হইতে বাঁধ পর্য্যন্ত ৪টী উচ্চ মাচা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তদুপরি প্রহরীগণ দুরবীণ ও পতাকা হস্তে চারিদিক লক্ষ্য করিয়া পতাকার সঙ্কেত দ্বারা অন্য স্থানে সংবাদ দিতেছিল। এ সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বড় রাস্তাটীতে সদা সর্ব্বদা জল ছিটাইবার ব্যবস্থাও ছিল। মূল কথা, সকল দিক সুবন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই এবং অর্থ ব্যয় করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। মেলা স্থানে ত্রিবেণী পারে এবং গঙ্গার অপর পারে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মোট ৭টী ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সাধুগণও অনেকগুলি ডাক্তারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে: পূর্ব্বে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে সমুদ্র হইতে অমৃতের কুম্ভ উত্থিত হয়। বিষ্ণু এই কুম্ভ অসুরদিগকে ছলনা করিয়া ধন্বন্তরিকে প্রদান করেন। তিনি ইহা লইয়া যাইবার সময়ে ৪ স্থানে কুম্ভ নামাইয়া বিশ্রাম করেন। যে যে স্থানে কুম্ভ নামাইয়াছিলেন, সেই স্থানগুলি কুম্ভ মেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে প্রয়াগ, হরিদ্বার উজ্জয়িনী এবং নাসিক, এই ৪টী স্থানে কুম্ভ মেলা হইয়া থাকে। পর্য্যায়ক্রমে ৩ বৎসর অন্তর মেলা হয়, সুতরাং এক একটী স্থানে ১২ বৎসর অন্তর মেলার অধিবেশন হয়। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য্য এই মেলার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত সাধু মোহন্ত একত্রিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা

করিয়া থাকেন। কংগ্রেসে যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, এই মেলা স্থানেও তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হইয়া থাকে। এবার কুম্ভের স্নান ৪ দিন হইয়াছিল। প্রথম পৌষ সংক্রান্তি ১৩ই জানুয়ারি। এই দিনে সমস্ত সাধুদিগের মিছিল বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় ২৬ জানুয়ারি পূর্ণিমার দিন। এই দিবস কোন মিছিল বাহির হয় নাই। তৃতীয় কুম্ভমেলার দিন ১১ই ফেব্রুয়ারি অমাবশ্যায়। এই দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত সমস্ত মঠের মোহন্তগণ মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। ৪র্থ ১৫ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজার দিন। এই দিবসেও মিছিল বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বকার মত নহে; কারণ কুম্ভ স্নানের পরেই অনেক যাত্রী স্ব স্ব গৃহাভিমুখে রওনা হইয়াছিল। রেলের টিকিট বন্ধ থাকাতে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্নানের দিবস বেশী লোকের ভিড় হয় নাই, তবুও যাহা হইয়াছিল, তাহা সাধারণ মেলাতে প্রায় দেখা যায় না। স্নানের সময় কোন কষ্ট হয় নাই, কিম্বা কোন প্রকার দুর্ঘটনাও ঘটে নাই। কুম্ভ মেলার ৪ দিন পূর্ব্বে রেলের টিকিট খোলা হয় এবং সেই দিন হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অগণিত লোক মেলা স্থানে আগমন করিতে থাকে। রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণও ঘন ঘন স্পেশেল ট্রেন দিয়াছিলেন, সুতরাং ৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১১ই পর্য্যন্ত ৪ দিনে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। পূর্ব্ব হইতে এই সমস্ত লোকের থাকিবার কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না, কারণ গবর্ণমেণ্ট যে রেল খুলিয়া দিবেন, ইহা কেহই নিশ্চিত জানিত না। সুতরাং সহস্র সহস্র লোক রাত্রি দিন খোলা ময়দানে পড়িয়াছিল। কিন্তু Sanitary বন্দোবস্ত অতি উত্তম থাকায়, এই সমস্ত লোক অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিলেও, কোন প্রকার ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই।

কুম্ভ মেলায় সন্ন্যাসীর দলই প্রধান। বৈষ্ণব অতি সামান্যই আসিয়াছিল। সন্ন্যাসী আবার প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত; যথা দণ্ডী, পরমহংস, নাগা, অবধুত এবং আগেক্ষিয়া। এই সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ নির্ম্মিত আখড়ায় বাস করিতেন। প্রাধানতঃ ৭টী আখড়ার হিসাব আমরা দিলাম, এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট অনেক আখড়া ছিল। এই প্রধান প্রধান আখড়াধারীগণই মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণি, নিরঞ্জনি, জুনা, বৈরাগী, বড় আখড়া ছোট আখড়া এবং নির্ব্বাণি। বৈরাগীদিগের মধ্যে রামানুজির দলই বেশী ছিল। গৌড়ীয় অতি সামান্য। নির্ব্বাণি, নিরঞ্জনি এবং জুনা, এই তিন দলেই নাগা সন্ন্যাসী ছিল। এক এক দলে প্রায় ৩০০।৪০০ নাগা ছিল। ইহারা মেলায় স্নান করিবার সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দুই দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া "গঙ্গে হর হর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মিছিলের পাছে পাছে গমন করিয়াছিল। মস্তকে জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, গলায় গ্যাঁদা ফুল ও কাহার কাহার রুদ্রাক্ষ মালা, উলঙ্গ অবস্থা দেখিতে মন্দ লাগিল না; তবে প্রথাটা আমি সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এদেশে ধর্ম্মের নামে যাহা সম্পাদিত হয়, তাহাই ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্ম্মের নামে এদেশে যে কত বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহারা উলঙ্গ হইয়া যাইতেছে, সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক রাস্তার মধ্যে উহাদিগের পদধূলি গ্রহণ করিয়া

কৃতার্থা বোধ করিতেছে। দেখিলাম, অনেক বিলাতী মেম সাহেবও এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সহর হইতে আসিয়াছিলেন। প্রত্যেক দলের প্রথমেই নানাবিধ পতাকা, তৎপর সুসজ্জিত হস্তী, তৎপর উষ্ট্র, অশ্ব এবং নানাবিধ দেশী বিদেশী বাদ্য, তৎপর সন্ন্যাসীগণ, তাহার পশ্চাতে নাগাগণের দুই দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া শৃঙ্খলার সহিত গমন। জুনার মিছিলের সঙ্গে আবার ৩।৪ শত সন্ন্যাসিনী। তাঁহাদের মিছিলের সহিত শৃঙ্খলামত গমন দেখিয়া ও ঘন ঘন "গঙ্গে হর" শব্দ শুনিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে গৈরিক বসনাবৃতা ও ভস্মাচ্ছাদিতা দেখিলে, কেন জানি না, আমার বড়ই আনন্দ হয়। ইহারা সকলেই ব্রহ্মচারিণী কি না, জানি না, তবে স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচারিণী বেশ দেখিলেও আনন্দ হয়।

নাগা সন্ন্যাসীগণ মঠের মোহন্তদিগের সৈন্যবিশেষ। মঠ হইতে ইহারা যে জমা জমি পায়, তাহাই চাষ আবাদ করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করে, সময়ে মোহন্তদিগের প্রয়োজন হইলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। কোন মেলা স্থানে যাইতে হইলেও ইহারা সঙ্গে যায়। পূর্ব্বে ইহারা অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিত কিন্তু ইংরেজের আমলে তাহা বন্ধ হইয়াছে। ইংরেজের শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই নাগাগণ কুম্ভ মেলায় গমন করিয়া নিজ নিজ মঠের অধিপতির মেলার প্রাধান্য লাভের জন্য অন্যান্য মোহন্তদিগের নাগাগণের সঙ্গে লড়াই পর্য্যন্ত করিত। কুম্ভ মেলায় কোন্ সম্প্রদায় অগ্রে স্নান করিবে, ইহা লইয়া বিশেষ দাঙ্গা হইত, কিন্তু এক্ষণে ইংরেজের আমলে তাহা আর ঘটিতে পারে না। ইংরেজ-রাজ যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দেন, সেই প্রকারেই স্নানের ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে। এবারে সর্ব্ব প্রথমে গিয়াছিল নির্ব্বাণির দল, তদপর নিরঞ্জনি, জুনা, বৈরাগী, বড় আথড়া ও ছোট আথড়ার উদাসীগণ এবং সর্ব্বশেষে নির্ম্মলার দল। নাগাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে একটী গল্প শুনিয়াছি, তাহা এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মুসলমান রাজত্ব-কালে মুসলমান ফকীরগণ স্বভাবতই হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে তুচ্ছ করিতেন, হিন্দু সাধু-গণ ইহার প্রতীকারের জন্য সম্রাটের নিকট কোন সাহায্য পাইতেন না। সম্রাট বলিতেন, উভয় পক্ষই সাধু, তাহাদের বিচার রাজার দ্বারা হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীগণ একটী লিখিত হুকুম লইয়া নাগা সন্ন্যাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই নাগা দ্বারা তাঁহার মুসলমান ফকীর-দিগের সহিত লড়াই করিতেন এবং নিজ নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

বড় আথড়া ও ছোট আথড়ার উদাসী সাধুগণ সমস্তই নানকপন্থী। এই দুই আথড়া সদর রাস্তার ধারেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং তথায় সর্ব্বদাই নানা প্রকার বাদ্য বাজিত। এই আথড়াতে গ্রন্থ সাহেব পুস্তক পূজিত হইয়া থাকে। ছোট আথড়াতে স্বর্ণ নির্ম্মিত নানকের একটী অর্দ্ধমূর্ত্তি আছে। তাহা নিয়মিত ভাবে পূজিত হইয়া থাকে। মিছিলের সময় এই মূর্ত্তিটীকে পাল্কীতে বহন করিয়া লওয়া হয়। উদাসীগণ সকলেই জটা জুঠে সুশোভিত এবং সামান্য একটু কৌপীন মাত্র পরিহিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে বেশ সুশিক্ষিত। কেহ কেহ উলঙ্গাবস্থায় উপবেশন করিয়া থাকেন, কিন্তু মিছিলের সঙ্গে যাইবার সময় সামান্য একটু নেঙ্গট পরিধান করেন।

এবার মেলা উপলক্ষে ত্রিবেণী সঙ্গমে অনেকগুলি সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ১৫ই জানুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতিদিন বৈকালে সনাতন হিন্দু সভার অধিবেশন হইত। ইহাতে অনেকেই বক্তৃতা করিতেন। একদিন কাশীর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় অতি হৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ দিতে চেষ্টা করিলাম। এক সিংহিনী পূর্ণগর্ভাবস্থায় মেষের পালে আহার অন্বেষণে গিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শীকার ধরিবার সময় গর্ভস্থ শাবক বাহির হইয়া পড়ে এবং সিংহিনীর মৃত্যু হয়। সিংহ শাবক তদবধি মেষের দলে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ মেষের ন্যায় আহার করে ও তাহাদেরই ন্যায় ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকে। কিছুকাল পরে অন্য একটী সিংহ সেই মেষের দলে আসিয়া সিংহ শাবক-টীকে দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। তৎপর একটী কূপের নিকট যাইয়া সিংহ শাবকের নিজ আকৃতি দেখাইয়া বলিল, "দেখ তুমিও যাহা, আমিও তাহাই; তুমি সিংহ শাবক হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ মেষের সঙ্গে মিশিয়া, ছিলে"। আমরাও এই ভারতবর্ষে আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ মেষের প্রকৃতি লাভ করিয়া নিজের ক্ষমতা ইত্যাদি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নানক, কবির, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সন্তান হইয়া নিজের উচ্চাবস্থা ভুলিয়া কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি! আমাদের উচ্চ অভিমান একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। সদা সর্ব্বদা আমাদের হীনাবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে আমরা আরও হীন হইয়া যাইতেছি। আত্ম অভিমান বাড়াও, হৃদয় বাড়াও—সাড়ে তিন হাত দেহের মায়া ত্যাগ কর। কি প্রকারে হৃদয় বাড়াইবে? যুবক সংসারে যতদিন অবিবাহিত থাকে, ততদিন নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখে, তৎপর সে বিবাহিত হইলে নিজের ও সহধর্ম্মিণীর সুখের দিকে দৃষ্টি রাখে—সেই যুবকের যখন সন্তানাদি হয়, তখন তাহার হৃদয় আরও একটু বাড়িয়া নিজের, স্ত্রীর ও সন্তানদিগের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখে। ঘটনাক্রমে যখন আবার সেই যুবক গ্রামের মোড়ল হয়, তখন তাহার হৃদয় আরও বাড়িয়া গ্রামের প্রজা-দিগেরও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখে। এই প্রকারে যখন সে সমগ্র ভারতবর্ষের নেতা হয়, তখন সমস্ত দেশের লোকের সুখের জন্য ভাবিতে থাকে। এই প্রকারে হৃদয় বাড়াও। সাম্প্রদায়িক ভাব ত্যাগ কর। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের চর্চ্চা কর।

আরও অনেকানেক পণ্ডিতদিগের বক্তৃতা হইয়াছিল। সমস্ত বক্তৃতার সারাংশ দিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম।

কুম্ভ মেলায় আগত যাত্রীদিগকে সেবা করিবার জন্য এলাহাবাদের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি-সমূহ সেবা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রায় সাড়ে সাত শত সেবক (volunteers) সেবা কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। কটক, পুনা, হরিদ্বার হইতে কয়েকজন সুশ্রূষাকারিণীও আগমন করিয়াছিলেন। এই সেবা-সমিতির গঠন প্রণালী ও তাঁহাদের কার্য্য দর্শন করিয়া

মেলার যাত্রীমাত্রেই অত্যন্ত আনন্দিত এবং অশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়াছিল। ৮ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় সমস্ত সেবক সেবা সমিতির মণ্ডলে উপস্থিত হয় এবং ৯ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ্য একটী সভাতে শ্রীযুক্ত মালব্য মহাশয় এবং অন্য একটী উদ্যোগকারী ব্যক্তি তাহাদিগের কার্য্য বুঝাইয়া দেন। মালব্য মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই কার্য্যটী তিনি হৃদয় মনের সহিত করিতেছেন। যে সেবকের প্রতি যে কার্য্য দিলে সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সমিতির মণ্ডপে রুদ্র যাগও সম্পাদিত হইয়াছিল।

সেবকদিগের কার্য্যের বিবরণ সুন্দর রূপে বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে ১০ই তারিখ হইতেই তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়, কারণ ঐ দিন সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধোদয় যোগ থাকাতে বহুলোক গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়াছিল। সমস্ত মেলা স্থানটী যেন সেবকদিগের অধিকৃত স্থান। যেদিকে যাই, সেই দিকেই দেখিতে পাই, কোন না কোন সেবক কোন প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কেহ পথ হারাইয়া গেলে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতেছে, কেহ হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে খাটে তুলিয় হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছে, কাহার সন্তান হারাইলে তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ অনুসন্ধান আফিসে পাঠান হইতেছে এবং সন্তানটীকে তাহার মাতা পিতার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ছোট ছোট শিশুগুলি পথভ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে সুশ্রূষাকারিণীদিগের নিকট রাখিয়া তাহাদিগের অভিভাবকের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেছে। পথভ্রান্ত বালক বালিকাদিগকে উচ্চ মাচার উপর রাখা হইতেছিল, যাহাতে তাহাদের অভিভাবকগণ অতি সহজেই নিজ নিজ বালক বালিকাদিগকে খুঁজিয়া লইতেছিল। অনুসন্ধানকারী আফিস ৪টী স্থানে স্থাপিত হয়। এই চারিটী স্থান সদা সর্ব্বদাই লোক দ্বারা পূর্ণ। যাহাদিগের কোন প্রকার সন্ধান হয় নাই, তাহাদিগকে সমিতির ব্যয়ে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কতকগুলি সেবক অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা বড় বড় লৌহদণ্ডের শলাকা হস্তে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিলেন এবং কোন স্থানে অগ্নি লাগিলে তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ড দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যাহাতে অগ্নি বিস্তৃত হইতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছিলেন। এই প্রকার অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে একটী যুবক বিশেষ আঘাত পাইয়া হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য হয় এবং অন্য একটী যুবকের চক্ষে আগাত লাগায় এলাহাবাদ চক্ষু-চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হয়। কতকগুলি যুবক রবারের কোমরবন্ধ কোমরে বান্ধিয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম স্থানে স্রোতে অবস্থিতি করিতেছিল এবং যখনই কোন যাত্রীর স্রোতে ভাসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখনই জলে পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেছিল। ইহাদের কার্য্য দেখিয়া স্থানীয় বড় বড় উচ্চ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহাদের কার্য্য শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম, এই প্রকারে প্রায় ২৫০ যাত্রীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করা হইয়াছিল। সেবকদিগকে ধন্যবাদ দেওয়ার

জন্য যে সভা আহূত হয়, তাহাতে মালব্য মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখ করেন। ইহারাই সন্তরণ দ্বারা লোক উদ্ধার করিয়াছিল—শ্রীযুক্ত লালমোহন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালকাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর এবং শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ মান্না। মেলা ভঙ্গের পর এলাহাবাদে Home Rule League নামে একটী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে এই সেবকদিগের কার্য্যে আহ্লাদ প্রকাশ ও ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য পুরী গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় উপস্থিত হইয়া একটী বক্তৃতা করেন।

সেবক সমিতির কার্য্য বিবরণ শেষ করিবার পূর্ব্বে এতদ্‌ সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ত্রিবেণীর অপর পারে গঙ্গাতীরে ঝুসী নামক পল্লীতেও বহু সাধু মোহন্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। ঝুসী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একটী বাগানে প্রায় ৩।৪ শত বিরক্ত সন্ন্যাসী সামান্য সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ইহাঁরা মাধুকুরি ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কারণে লোকালয়ে আসিতেন না। এই সমস্ত সাধুগণের ও অপরাপর যাত্রীগণের পারাপার জন্য খেয়া ঘাট ছিল এবং দারাগঞ্জ ও ঝুসীর মধ্যে একটী পাণ্টুন ব্রিজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ব্রিজ দ্বারা আমাবশ্যার দিন সহস্র সহস্র লোক পার হইতেছিল। সামান্য প্রশস্ত পোলে এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে, পুলীশ ইহার সুবন্দোবস্ত করিতে অক্ষম হয় এবং পুল হইতে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক গঙ্গায় প্রবল স্রোতে পতিত হয়। সেবা সমিতির সেবকেরা এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হয় এবং পুলিশের সাহায্যে ভিড়ের সুবন্দোবস্ত করে। পুলিশের লোকেরাও সমিতির সেবকদিগের সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছিল।

এই সেবা কার্য্য ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বে ছিল কি না, জ্ঞাত নহি, কিন্তু বর্ত্তমান সেবা কার্য্য কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ দিতে চেষ্টা করিব। যদি ইহা সত্য না হয়, অন্য কেহ ইহার বিবরণ দিলে সুখী হইব। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় যুবক তথায় গমন করিয়া সেবা কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপর ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় যুবক দাসাশ্রম খুলিয়া অন্ধ আতুর ও অক্ষমদিগের সেবা কার্য্য করেন। এই কার্য্যে বাবু মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী এবং পরলোকগত ইন্দুভূষণ রায় প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অর্থাভাবে ও সেবকের অভাবে এই দাসাশ্রম উঠিয়া যায়। তৎপর ইষ্টবেঙ্গলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কতিপয় যুবক সঙ্গে তদঞ্চলের সেবা করেন। এই সেবা কার্য্য চলিতেছিল। তৎপর স্বামী বিবেকানন্দ সেবা কার্য্যটীকে অতি সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আজ যে স্থানে স্থানে সেবা কার্য্যের এত কৃতকার্য্যতা দেখিতেছি, ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ, তাহাতে বোধ হয় কোন প্রতিবাদ থাকিতে পারে না। কাশী, কনখল, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গুলির কার্য্য পরিদর্শন করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

সেবকদিগের কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া বেশ বুঝিলাম, এদেশ আবার জাগিবে।

সেবকদিগের আচার ব্যবহার, সুমিষ্ট কথা ও বিনয়ের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া বুঝিলাম, ইহাদের হৃদয়ে জন্মভূমির সেবাব্রত অঙ্কুরিত হইয়াছে। এক্ষণে বড় বড় দেশনেতা দ্বারা এই অঙ্কুর অবস্থাতে জলসেচন করিয়া যাহাতে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এই সেবকগণের ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম—আমাদের দেশের অবলাগণের প্রতি তাহারা কতদূর শ্রদ্ধান্বিত। এই শ্রদ্ধা প্রবল হইয়া প্রত্যেক যুবক ও পুরুষের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইলে আর সুকুরমণির শোণিতে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত হইবে না—আর রেলে বা পথে ভারতীয় রমণীর প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে পারিবে না। হা ভগবান, সেদিন কবে আসিবে, যেদিন দেখিব, একটী অবলার প্রতি অত্যাচার হইলে সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক মার মার শব্দে অত্যাচারীকে ভূতলশায়ী করিবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কুম্ভ মেলা উপলক্ষে অনেকগুলি সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে All India Hindu Conference বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সভার সেক্রেটারি কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সভা তিন দিন বসিয়াছিল। প্রথম দিনে প্রায় ২ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। মেলা ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধূলার প্রাবল্য হেতু ইহাতে অধিক লোকের সমাবেশ হইতে পারে নাই। প্রথম দিনের সভাতে কিরবী মঠের জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। সারদা মঠের শঙ্করাচার্য্য মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। পুরী গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য মহাশয়েরও উপস্থিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সভায় আসিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশ হইতেও অনেক ডেলিগেট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরং" গীতটী সমস্ত গীত হইবার পর কার্য্যারম্ভ হয়। এই গীতটী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজদিগের কর্ণে অত্যন্ত বিষবৎ বোধ হইত, কিন্তু ভগবানের কি লীলা! আজ এই সঙ্গীত সর্ব্বত্র গীত হইতেছে—এমন কি, মেশোপটেমিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ক্ষেত্রেও ধ্বনিত হইতেছে। শুনিতে পাই, কোন কোন ইংরেজও নাকি ভারতীয় সন্তানদিগের সঙ্গে এই "বন্দেমাতরং" গীত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বহু পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুরী গোবর্দ্ধন মঠের স্বামিজী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "ভগবানের অবতার দুই প্রকারে হয়—এক রূপের অবতার, অন্য মন্ত্র অবতার। এই বন্দেমাতরং গীতটী তাঁহার মন্ত্র অবতার, এই গীত দ্বারা ভারতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।" স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্য সত্যই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিরবী মঠের শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার মূল কথা এই যে, "ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বলে, কিন্তু যতদিন বেদ বেদান্ত উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ বিরাজিত থাকিবে, ততদিন এই ভাষার মৃত্যু হইতে পারে না।" তৎপর তাঁহার লিখিত ইংরেজী অভিভাষণ পঠিত হয়। এই অভিভাষণে সকল কথাই ব্যাখ্যাত হইয়াছিল—

তিনি বাল্যবিবাহকে জাতীয় অধঃপতনের একটী কারণ বলিয়া মনে করেন। বাল্যবিবাহ যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হয়—সেজন্য সকলেরই একান্ত চেষ্টা করা সঙ্গত। তিনি বলেন, ভারতে হাজার হাজার একবর্ষ বয়ঃক্রমের বিধবা আছে—ইহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না, তবে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়া দিলেই এই প্রকার বিধবা আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

শঙ্করাচার্য্য মহাশয়ের এই প্রস্তাব নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না? বাল্যবিবাহের বিষময় ফল সকলেই বুঝিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি "পুনরুত্থানের" দল যে আবার বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিতে চায়। এই সদ্যজাত দলটী যে পূর্ব্বকালের সমস্ত আচার ব্যবহার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছেন, তাহা কি স্বামীজী জ্ঞাত নহেন? মৃত সারদাচরণ মিত্রের মত শিক্ষিত ব্যক্তিও বলিতেন "বাল্যবিবাহই হিন্দু সমাজের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত"। All India Hindu Conferenceএর মত কি সমগ্র ভারতবর্ষের লোক গ্রহণ করিবে? ভারতের কোন কোন দেশে বাল্যবিবাহ আদৌ নাই; কিন্তু যে বঙ্গদেশ ও বিহার দেশে ইহার প্রাবল্য অত্যধিক, সেই প্রদেশেই যে "পুনরুত্থান" আরম্ভ হইয়াছে। আজ যদি গবর্ণমেণ্ট আইন করেন যে ১৪ বৎসরের নিম্নস্থা বালিকাদিগকে বিবাহ দিতে পারিবে না, তাহা হইলে ব্যাপারটা একবার কি দাঁড়াইবে, মনে করিয়া দেখ দেখি। হিন্দুসভা তখনই চীৎকার আরম্ভ করিবেন, "আমাদের হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল"। সম্মতি আইন বিধিবদ্ধের সময় কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, মনে আছে কি? বৃথা কথায় কোন কাজ হয় না। রাজার বিনা সাহায্যে এই কুপ্রথা এদেশ হইতে নির্ম্মূলিত হইতে পারে না। সম্প্রতি বাঁকীপুরে একজন ব্রাহ্মণ রাজা প্রকাশ করিয়াছেন—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা করাই ভারতের মঙ্গলের কারণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিলে ব্রাহ্মণের রাজত্ব কোথায় থাকে? চটিজুতা পায় দিলে এবং মস্তকে লম্বা শিখা রাখিলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না। কিম্বা বড় বড় সভায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া পৌত্রের অন্নপ্রাশনে বেশ্যার নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান করিলেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা পায় না।

এই সভায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পেও একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—ইহার প্রস্তাবক ছিলেন, মাতাজি স্বামিজী সদানন্দ। আমার বোধ হয়, ইনিই সেই কাশীর কৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর মকর্দ্দমা-সংশ্লিষ্ট শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী। ইহার এক্ষণে উচ্চাবস্থা—অনেক সভাতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন এবং স্থান বিশেষে চিকিৎসা কার্য্যও সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইনি বলেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। যে প্রয়াগে স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রয়াগে বালকদিগের বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার বিরুদ্ধে মিউনিসিপাল কমিশনারগণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, তৎপরে নিজেদের ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন।

মেলা ভঙ্গের পর শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় মেলার সমস্ত মেথর ও ডোমদিগকে লইয়া একটী সভা করেন এবং বক্তৃতা দ্বারা বলেন, তাহাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন করা হইবে। প্রচুর

পরিমাণে মোহন ভোগ প্রসাদ মেথরদিগকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

মালব্য মহাশয় মেথরদিগের অবস্থার কি প্রকার উন্নতি করেন, দেখিবার জন্য আরও কিছুকাল জীবিত থাকিবার জন্য যমরাজার নিকট দরখাস্ত পাঠাইলাম। সহরে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার বিস্তার হইলে নাপিতের অভাব হইবে বলিয়া একজন কমিশনার ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর মেথরদের অবস্থার উন্নতি হইলে সহরের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-উৎসব, তাঁহা কর্তৃক স্থাপিত সমস্ত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই দিনে সকল মঠেই সহস্র সহস্র দরিদ্র নারায়ণদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়া থাকে। এ বৎসর এলাহাবাদের উৎসব তথাকার মঠ মুঠিগঞ্জে সম্পন্ন না হইয়া ত্রিবেণী সঙ্গমেই হইয়াছিল। প্রায় ৫।৬ শত দরিদ্র ও সাধুদিগকে ভোজন দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ উপলক্ষে কাশীর সেবাশ্রম হইতেও অনেকগুলি ভক্ত তথায় আগমন করিয়াছিলেন।

কুম্ভ মেলায় বহু সাধুর আগমন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কে প্রকৃত সাধু এবং কেই বা তদ্রূপ নহে, তাহা বাছিয়া বাহির করা অসাধ্য ব্যাপার। একজন সাধুর প্রসঙ্গ এই স্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইঁহার নাম লালুয়া বাবা। ইনি চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করেন। **আমি তাঁহাকে দর্শন** করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই—ইঁহার ভজন সাধন প্রণালী অতি নূতন প্রকারের। ইনি প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থায় থাকেন, আবার কখন কখন শালও গায় দেন। অন্যান্য মঠের সাধুদিগের মধ্যে যেমন রাজসিকতার প্রাদুর্ভাব দেখিলাম, ইহাঁতে তাহা দেখা যায় না। ইনি প্রতি বৎসরই মাঘ মাসে ত্রিবেণীতে আসিয়া কল্পবাস করিয়া থাকেন। কোন কোন লোকের নিকট ইনি নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে ভগবান বাসুদেবের জন্ম হইয়াছে—শীঘ্রই প্রকট হইবেন।

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।

স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। (৭)

(১)

কর্ম্মফল।

আমি মূর্ত্তিমান কর্ম্মফল। আমার শরীর, আমার মন, আমার চেহারা, আমার গঠন, চোখের চাহনি, গায়ের রং, চলন ধরণ ধারণ, বুদ্ধি-বিদ্যা, আমার বিশ্বাস কর্ম্ম,—আমার সকলই কর্ম্মফলে এরূপ হইয়াছে। আমার যাহা কিছু, আমি যাহা কিছু,—কর্ম্মফলানুযায়ী। এমন আমার কিছু নাই, যাহা কর্ম্মফলে হয় নাই।

কাহার কর্ম্মফল? আমার। আমি চিরদিন ছিলাম, আমি চিরদিন থাকিব। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান, আমার অতীত কেহ নহে। আমি সর্ব্বকাল-ব্যাপী। জীব যখন জন্মে নাই, তখন আমি অজীবে ছিলাম, অনুশয়ী-নেত্র, গুপ্ত-চৈতন্য, নিদ্রিত। জীবে

জীবে, স্তরে স্তরে, সোপানে সোপানে যত জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে, আমার অস্তিত্ব সকলেই ছিল। পিতা জায়ার গর্ভে পুত্ররূপ ধারণ করেন—পিতামহ পিতারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পিতার মধ্যে আমি, পিতামহের মধ্যে আমি—লিঙ্গভেদ নাই। আমি পুরুষ, কিন্তু স্ত্রীরূপে মাতার দেহে--মাতার মাতার দেহেও আমি ছিলাম। সকল জীবে লিঙ্গ অভেদে চিরজীবী আমি। বিশ্বের সহিত আমার জ্ঞাতিত্ব। "বহুধৈব কুটুম্বকম্," পর আমার নাই, বৃক্ষ লতা তৃণ পশুপক্ষী সকলেরই সহিত আমার কুটুম্বিতা। নররূপে আজি আমাতে যাহা দেখিতেছ, ইহার নূতন কিছুই নহে। আমি প্রাক্তণ, কোটি কোটি পূর্ব্বপুরুষের সর্ব্বস্ব আমি, আমি বংশাবতংশ। পুরাতন পরমায়ু লইয়া আমার নবীন দেহ নূতন ভাবে গঠিত, প্রাক্তণ কর্ম্মফল। পুরাতন গুণে আমি গুণবান। জড় বা অজড় সকলই আমার পুরাতন।

আমার সকলই নূতন। আমি এখন যেমনটী, এমনটী আর কখনও ছিলাম না। আমি ছিলাম, কিন্তু সে আমি এ আমি নহে। আজ আমি যাহা, পূর্ব্ব নিমেষে তাহা ছিলাম না। এখন যাহা, পর মুহূর্ত্তে তাহা থাকিব না। চির দিন আমি থাকিব, কিন্তু এমন আমি থাকিব না। আমি পুত্রদেহে, পৌত্রদেহে অনন্তকালে অনন্ত ভাবে জীবিত থাকিব। আমি অজর, আমি অমর। ঐ অনন্ত অতীতে যে যাহা করিয়াছে, অনুসন্ধান কর, আমাতে তাহা পাইবে। আমি পিতার পুণ্য লক্ষণ, পিতার পাপ লক্ষণ। পিতামহের কর্ম্মফল, পূর্ব্বপুরুষের কৃতাকৃতের জীবন্ত নিদর্শন; অতীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভবিষ্যতের ভবিষ্য পুরাণ। এই মুহূর্ত্তে যাহা আমি করিতেছি, ইহার ফল কোটি কোটি বৎসর অধস্তন পুরুষেরা উপভোগ করিবে। যাহা হয়, তাহা চিরকাল যায় না। কিছুই জগতে মর্ত্ত্য নহে। আমি যেমন অমর, আমার প্রতিবাসী সকলে তেমনি অমর। আমি যাহা দেখিতেছি, ধ্বংস হইবে না। কাণে কাণে গোপনে যে কথাটা তোমায় বলিয়াছি, তাহা চিরদিন বিদ্যমান রহিবে। ব্যোমমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত (Photographed) হইবে না। তোমার হাড়ে হাড়ে শোণিতের কণায় কণায় তাহা আমি খুদিয়া দিয়াছি। সাধ্য কি তুমি ভুলিয়া যাইবে? কেহ কখনও তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।

আমি কর্ম্মফল মূর্ত্তিমন্ত। দেবতার সাধ্য নাই, কর্ম্মফল ভোগ হইতে আমাকে রক্ষা করেন, কর্ম্মফলের এক কণা লোপ করিতে পারেন। অন্য পরে কা কথা। অকিঞ্চিৎকর মনুষ্য, দেবনর বা নরদেব, ঈশা, মুসা, মহম্মদ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাহা জ্বলিয়াছে, তাহা নির্ব্বাণ হইবে না। নমস্কার শাক্যসিংহ, নির্ব্বাণ জীবের অসম্ভব নির্ব্বাণ নাই, কর্ম্মফল ভুগিতেই হইবে। অজ্ঞানতা হইতে সকলই—কিন্তু অজ্ঞানতা কোথা হইতে? অজ্ঞানতা কর্ম্মফল। একদিনের নহে, এক-জনের নহে—কোটি কোটি যুগে তাহার বৃদ্ধি, কোটি কোটি জীবে তাহার জল সিঞ্চন। অজ্ঞানতাও যাইবে না, বাসনায়ও ধ্বংস নাই। অদৃষ্ট কেবল ভবিষ্যত নহে, অতীত অদৃষ্ট। কত শাখা প্রশাখায়, কত নালী উপনালীতে উৎপাদন করিয়াছে অদৃষ্ট। অনুসন্ধান কর আজীবন, তবুও তাহা অদৃষ্ট থাকিবে। কারণ খুঁজিয়া মিলে না, কর্ম্মফল ভুগিতে হয়, সমস্ত হিসাব মাটী হয়, গণনা ভ্রান্ত হয়, যাহা ভাবি না, তাহা ঘটিয়া পড়ে। তাই বলে

অদৃষ্ট। অদৃষ্টে যাহা, প্রাক্তণ যাহা—তাহা ঘটিবেই ঘটিবে।

"বর বড় না কনে বড়"? "কনে বড়।" প্রকৃতি বড় না পুরুষ বড়? প্রকৃতি বড়। প্রকৃতি অন্নপূর্ণা, পুরুষ ভিখারী। প্রকৃতি পুরুষকে স্বেচ্ছামত উঠাইতে বসাইতে পারেন। প্রকৃতির আদেশে পুরুষ কখন শ্মশানচারী, কখন সংসারবাসী, কখন কবি, কখন যোগী। পুরুষের ছায়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পুরুষ মগ্ন। পরম জ্ঞানী, পরম যোগী প্রকৃতিপরায়ণ। প্রকৃতি ফল—প্রকৃতি কর্ম্মফল—দুর্ল্লঙ্ঘ্য, দুরতিক্রমণীয়। পুরুষ তাহার উপর আপন ছায়া ফেলিতে পারে। সে ছায়ায় কোন ফল হইবে কি না, তাহা প্রকৃতির অভিপ্রায় সাপেক্ষ। তোমার সাধ্য নাই, তোমার প্রকৃতি আয়ত্ত কর। দেবতার সাধ্য নাই, প্রকৃতি আয়ত্ত করিয়া দেন।

মানুষ স্বাধীন?—বাতুলের প্রলাপ। কর্ম্মফল, কর্ম্মফল—যাহা দেখ, যাহা ঘটে, সকলই কর্ম্মফলে। চুরি করি কর্ম্মফলে, ব্যভিচার করি, সেও কর্ম্মফলে। আবার সেই ব্যভিচারের ফল আমাকে ও আমার অনন্ত অধস্তন পুরুষকে ভোগ করিতে হইবে। যমদণ্ড কঠোর, তুমিই কাঁদ—আর তোমার মাই কাঁদুন, সে দণ্ড সংযত হইবে না। অনুতাপ, পরিতাপ, অতীত বিমুখ করিতে সক্ষম নহে। পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছেন, তাহাও ভুগিব, যাহা করিতেছি, তাহাও ভুগিব। ইচ্ছা একটী কারণ, সহস্রের একটী। ইচ্ছা কর্ম্মফলসম্ভূত, প্রকৃতি-সিদ্ধ। নদী জলের বুদ্‌বুদ, জলে উঠিয়া জলেই মিশায়। আমি কে? কর্ম্মফল। কি করি? কিছুই না।

যাহা কিছু করি, সকলই কর্ম্মফলে করায়। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সাধুকার্য্যের কর্ত্তা আমি নহি, সে গৌরব আমার প্রাপ্য নহে, পাপের কর্ত্তাও আমি নহি। জানামিধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানামি অধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ"। কর্ত্তা কর্ম্মফল, কর্ম্ম কর্ম্মফল, করণও কর্ম্মফল। অধিকরণ মাত্র আমি। সে অধিকরণ—কর্ম্মেরই রূপান্তর। আমার আমিত্ব নাই, আমার অহঙ্কার নাই। কর্ম্মে কর্ম্মযোগ, ফলে ফলযোগ—এই লইয়া আমার আমিত্ব। আশাও কর্ম্মফল, পূর্ত্তিও কর্ম্মফল, অপূর্ত্তি—সেও কর্ম্মফল। উৎপত্তি নিবৃত্তি কর্ম্মে কর্ম্মে। জলে জলাঞ্জলি। নদী জলের এক অঞ্জলি লইয়া তাহাতেই জলাঞ্জলি দিলে একবিন্দুও বাড়ে না। কিন্তু কর্ম্মফলে কর্ম্মফলের বৃদ্ধি হয়। কঠোর আয়সশৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য, দুর্ভেদ্য, নিরন্তর কেবল বাড়িতেছে। আমি পাপী কর্ম্মফলে, তুমি পুণ্যবান কর্ম্মফলে। উভয়েই কর্ম্মফল, ভিন্ন কর্ম্মের ভিন্ন ফল। পাপী পুণ্যবান হয়—কর্ম্মফলে। পুণ্যবান পাপ সঞ্চয় করে কর্ম্মফল। তুমি পাশ্চাত্য কর্ম্মফলে, আমি প্রাচ্য কর্ম্মফলে। ব্রাহ্মণ শূদ্র, আস্তিক নাস্তিক—কর্ম্মফলে, প্রকৃতি-সিদ্ধ। উন্নতি অবনতি কর্ম্মফলে। আস্তিক নাস্তিক হয়, জীব জীবত্ব হারায় কর্ম্মফলে। যোনি ভ্রমণ কর্ম্মফল মাত্র। Development and degeneration উন্নতি ও অবনতি। নীচযোনি হইতে উর্দ্ধযোনি, উর্দ্ধযোনি হইতে নীচযোনি ভ্রমণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। দর্শন ও বিজ্ঞান সহচর, সখা; আবার না বুঝিলে আত্মবিরোধ।

যাহা জানি, ইন্দ্রিয় হইতে। জড় অজড়, ঈশ্বর অনীশ্বর জ্ঞানই ইন্দ্রিয়মূলক। ইন্দ্রিয় কোথা হইতে? তোমার আমার ইন্দ্রিয়ে প্রভেদ কেন? দুই ভাই,—একজন লৌকিক, অপর

পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত কেন? প্রতিনিয়ত ক্রিয়া, প্রতি নৈমিত্তিক ক্রিয়া—সকলই কর্ম্মমূল। ইন্দ্রিয় কর্ম্মমূলক। তাই তোমার অদৃষ্টে নাস্তিকতা, আমার অদৃষ্টে ভগবদ্ভক্তি। আমার জ্ঞান অজ্ঞানতা, আমার কর্ম্মফলে। বৃক্ষ আছে দেখি না, কর্ম্মফল—দেখি, কিন্তু ঠিক দেখি না—কর্ম্মফল, ঠিক দেখি সেও কর্ম্মফল। আমার দেখায় না দেখায় জড়ের জড়ত্ব যায় না। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ পায় না।

কেহ পড়িয়া ঘুমায়, সেও কর্ম্মফল। কেহ মোহ ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করে, সেও কর্ম্মফল। সফলতা বিফলতা চেষ্টা-মূলক, চেষ্টা কর্ম্মমূলক। আমার কর্ত্তব্য কি? কর্ম্ম যাহা করায়। যদি কর্ম্মফলে উদ্যম জন্মিয়া থাকে, তাহা অধিকার করিয়াছি। যদি অধিকার করিয়া থাকি, চেষ্টা জন্মিবে। যদি চেষ্টা করি, অনন্তকালে সফল হইব। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাই পাপ না করিবার চেষ্টা করিব; আর যদি অদৃষ্টে থাকে, চেষ্টা করাও হইবে না। আমার সুকৃতিতে কোটি কোটি বংশ সুখী হইবে, তাই সুকৃতি করিব। যাহাদিগকে জগতে আনিতেছি, তাহাদিগকে সৎচরিত্র দিয়া যাইতে চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিব—সফল হইব কি বিফল হইব, বলিতে পারি না, তুমিও বলিতে পার না। সে আমার অদৃষ্ট মত ঘটিবে।

কর্ম্মফল যাহা ঘটিবেই, ঘটিবেই। দেবতার সাধ্য নাই, তাহা নিবারণ করেন। কিন্তু কর্ম্মে কর্ম্মফল আরও করিতে পারে। কর্ম্ম দুই প্রকার—প্রতিনিয়ত, প্রতিনৈমিত্তিক। প্রতিনিয়ত ক্রিয়া প্রকৃতির অনুযায়ী, প্রতিনৈমিত্তিক ক্রিয়া প্রকৃতি ও অবস্থার অনুসারী। উভয়েই কর্ম্মফলমূলক—কিন্তু প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টীতে কর্ম্মফলমূলকত্তার পরিমাণ অল্পতর। আবার একটী সাক্ষাৎ প্রকৃতিসিদ্ধ, অপরটী অসাক্ষাৎ-সিদ্ধ। প্রতিনৈমিত্তিক ক্রিয়া নিত্যক্রিয়ার অনুরূপ হইলে প্রাক্তন ফল পরিপুষ্ট। অননুরূপ হইলে কর্ম্মফলে প্রকার ভিন্নতা জন্মে। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। নিত্য বা নৈমিত্তিক উভয় ক্রিয়া অন্যতর ক্রিয়ার অন্যতর কারণ। প্রতিনৈমিত্তিক অনুরূপ ক্রিয়া যত অধিক হইবে, প্রাক্তন জন্মানুগত প্রকৃতি তত সঙ্কুচিত হইবে। চালনায় স্ফূর্ত্তি, বিকাশ, সম্প্রসারণ, চালনা অভাবে অপ্রাসরণ, সঙ্কোচন। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে সঙ্কুচিত হয়। কর্ম্মের পূর্ব্বে ইচ্ছা, ইচ্ছার পূর্ব্বে বাসনা, বাসনার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-বিকার। চালনার অভাবে কর্ম্মফলজনিত কর্ম্ম প্রথম ইচ্ছায়, তাহার পর বাসনায়, তাহার পর ক্রমে ইন্দ্রিয় বিকারে সঙ্কুচিত হয়। উর্দ্ধস্তর হইতে নিম্নস্তরে যত সঙ্কুচিত হইয়া আসে—ততই নৈমিত্তিক ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয়। নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিবর্ত্তনের মূল। এই জ্ঞান নির্ব্বাণের মূল—জ্ঞানীর পুত্র জ্ঞানীর নির্ব্বাণ লাভে সুবিধা অধিক। অজ্ঞানীর পুত্র জ্ঞানীর জ্ঞান অজ্ঞানতা-জড়িত। পূর্ণ জ্ঞান ঘটে না। পূর্ণজ্ঞান না হইলে মুক্তি মিলে না। পূর্ণজ্ঞান মিলে না, মুক্তিও ঘটে না। নির্ব্বাণ মুক্তি মোক্ষ-কল্পতরুর সুপক্ক ফল। জ্ঞান ভিন্ন ইন্দ্রিয় বিকার নিরাকরণ হয় না—মোহমায়া অজ্ঞানতা কাটে না। মুক্তি জ্ঞানে, মুক্তি কর্ম্মে। কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ড শ্রেষ্ঠতর। ধর্ম্মোপদেশের সার্থকতা নৈমিত্তিক ক্রিয়ায়। ধর্ম্মকর্ম্মের সার্থকতা এইখানে; উপাসনা, বন্দনা, প্রার্থনা, যজন, যাজন—সকলের সার্থকতা এইখানে। Heredity ও adoption,

অনুবৃত্তি ও পরিবৃত্তির এই অর্থ। নিত্য-ক্রিয়ার ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রবলতর কে? নিত্যক্রিয়া। গতিশীল কে? নৈমিত্তিক ক্রিয়া। নিত্য ক্রিয়া Conservative, নৈমিত্তিক ক্রিয়া Progressive।

নিত্য না নৈমিত্তিক? তুমি চলিবে কোন্ পথে? করিবে কি? তোমার বলিবার সাধ্য নাই। নির্ব্বাচন ক্ষমতা তোমার নহে। তুমি ভাবিতেছ,তুমি একাকী; মনে করিতেছ, যাহা খুসী তাহাই করিবে। তুমি একটী জীব নহ—কোটি কোটি জীবের উপাদানে যেমন তুমি গঠিত, তেমনি কোটি কোটি জীবন্ত জীবনকোষের সমষ্টি তুমি। আকার প্রকারে ইহাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। এই কোটি জীবনকোষের সাধারণ তন্ত্র দরবারে যাহা আদেশ হইবে, সে আদেশ কর্ম্মফল-জনিত, তুমি তাহাই করিবে। মাথা নাড়িবে না, হুঁ হাঁ করিবে না। আনন্দের সহিত তাহাই করিবে। মানুষ গোলামের গোলাম।

(২)

চন্দ্রনাথ বসু।—এ কথা কেহ শুনে নাই, শুনিবার কেহ ছিল না, তখন আকাশ ও ধরণী নিস্তব্ধ ছিল। বিহঙ্গ বা মানুষ তখনও জন্মায় নাই—গাহিবে কে? সেই দিনে, অতি প্রাচীন দিনে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের মধ্যক্ষেত্রে, বিশালব্যাপিনী ধরণী, তারকাখচিত নীলাম্বর, আঁধারপ্লাবিত পাতাল—সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—অনন্ত বিদীর্ণ হইল, সপ্তর্ষি উদিত হইল, বাণী স্ফুরিল, তারকাগণ অনিমেষে চাহিয়া রহিল। অনন্ত বিদীর্ণ করিয়া এক অতুল উৎস নির্গত হইয়া শ্বেতধারায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল পবিত্র ও প্লাবিত করিল। বেদগানে জগত সে শুভদিনের মঙ্গল ঘোষণা করিল। ইহারই নাম ত্রিধারা। পবিত্র নামে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ত্রিপদে বিশ্ব পরিপূরিত, বলীর আর স্থান নাই। ত্রিপথ ও ত্রিপদে ভিন্ন কি?

আলোকে ক্ষুদ্রতার পরিচয় হয়, আঁধারে ক্ষুদ্রতা লুকাইয়া যায়। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গায়ত্রীর জন্ম। কুরুক্ষেত্রের সমর-কোলাহলের মধ্যে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে ভগবদ্গীতা উদ্ভূত হয়। নীল অনন্তে বিষাদের গোধূলি ছায়ায় ত্রিধারার উৎপত্তি, বিদুরের অশোক ছায়ায় শান্ত তপোবনে বাল্মীকি শিষ্যের নিকট রামায়ণ রচনা করিতেন, সুরধুনীর পবিত্র সলিলে স্নানপূত হইয়া কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া বীণা হস্তে বাল্মীকি—শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ, যেদিন রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, ভারতের সে কি দিন ছিল? শোকস্তব্ধ হৃদয়ে বিষাদেরই গোধূলী ছায়ায় চন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিলেন—দুটী ধারা চক্ষু দিয়া ও একটী মুখ পবিত্র করিয়া বাহির হইল। 'ত্রিধারা'র সূচনা এইরূপ, "আছ—এখন কোথায় আছ,ঠিক জানি না। যেখানেই থাক, আশীর্ব্বাদ করি, এবার দীর্ঘজীবী হইও।" ভৈরব রাগে গায়ত্রী আরম্ভ হইল। "মা নিষাদ ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ" কোথায় ক্রৌঞ্চ-মিথুন, কোথায় প্রাণপুত্তলি! হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, নয়নে ধারা বহিল—কাঁদিয়া ডাকিলাম "আছ—কোথায় আছ ঠিক জানি না, আশীর্ব্বাদ করি, এবার দীর্ঘজীবী হইও।" সপ্তর্ষি মণ্ডলে ত্রিধারার উৎপত্তি গীত হইবে—এমন দেবমন্দিরের স্তব্ধ স্নিগ্ধ ম্লান আলোকে ক্ষুদ্রতা ধরিবার সামর্থ্য সমালোচকের নাই। শান্ত পবিত্র হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতে হয়।

বাঙ্গালায় ভূদেব ও চন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল। চন্দ্রনাথ ভূদেবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য।

ইংরাজী শিক্ষার আবর্ত্তনে বাঙ্গালায় যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে মাইকেল, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই বিচলিত হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহাদের নিকট হেয় ছিল। তাঁহারা ইংরাজী চিঠি লেখা, কথাবার্ত্তা কহাই গৌরবকর মনে করিতেন। ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিব, ইংরাজীতে বক্তৃতা করিব ও তাহাতে প্রশংসা অর্জ্জন করিব, ইহাই সে যুগের নব্য শিক্ষিতগণের সুখস্বপ্ন ছিল। সত্য সত্যই তাঁহারা ভগবদ্গীতা, রামায়ণাদিতে মুক্তা না পাইয়া ইলিয়াড, ইনিয়াডে মুক্তা পাইবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথও সেই যুগেরই লোক। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত, মেধাবী ছাত্র চন্দ্রনাথ কিন্তু আলেয়া-অনুধাবনকারী পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইংরাজী ভাষার কুহকে মজেন নাই—তিনি নিজের সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি বঙ্গভাষার চর্চ্চাতেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাই চন্দ্রনাথের বিশেষত্ব! লোকসাধারণ বাঙ্গালা যখন ভাষা ও সাহিত্যকে ঘৃণা করিত, তখন চন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই জন্যই চন্দ্রনাথ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলির যোগ্য।

ইংরাজী শিক্ষার আবর্ত্তন আর একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটায়। ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ শুধু যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে করিতেন না—তাহা নহে, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের সকল নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করাই সভ্যতা বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করাই তাঁহাদের নিকট মহা গৌরবকর বোধ হইত। সুরাপান তাঁহারা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিতে ভূদেব দণ্ডায়মান হন। ভূদেবের পর চন্দ্রনাথ উদিত হইল। তাই বলিয়াছি, বাঙ্গালা দেশে ভূদেব ও চন্দ্রনাথের মতন লোকের প্রয়োজন ছিল। ভূদেব ও চন্দ্রনাথ, উভয়ই এই কার্য্যে আজীবন নিযুক্ত ছিলেন।

শশধরী শক্তি বাঙ্গালা দেশে এক হুজুগ তুলিয়াছিল। চন্দ্রনাথদিগের প্রয়াস ঠিক সেইরূপ নহে। তাঁহারা হিন্দুত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া উপরের জীর্ণ অংশ সংস্কারে তৎপর ছিলেন। হিন্দুত্বের সংস্কার তাঁহারা অন্য ভাবে করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবু মহা সংযমী ছিলেন। 'সংযম শিক্ষা'য় যে তিনি শুধু বাগাড়ম্বর করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তিনি ঐরূপ সংযম শিক্ষা দানে যত্নবান ছিলেন। বিলাস ভারতের যে কি মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াই লোকের হৃদয় হইতে বিলাসের মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথের "শকুন্তলাতত্ত্ব" গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। সমালোচক চন্দ্রনাথ কোথাও সমালোচকের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"এর সহিত চন্দ্রনাথের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।

চন্দ্রনাথ প্রকৃতই একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসেবা অর্থের জন্য নহে, যশের জন্য নহে—তাঁহার সাহিত্যসেবা হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তির উপহার। সরকারী কাজ করিয়া যেটুকু সময় তিনি পাইতেন, তাহার অধিকাংশই সাহিত্য-সেবাতে যাপন করিতেন।

চন্দ্রনাথের মনের বল অতি দৃঢ় ছিল। যখন তিনি রোগ শয্যায়, সেই সময় তাঁহার একটী পুত্রের মৃত্যু হয়। সকলেই আশঙ্কা

করিয়াছিল, এই দারুণ সংবাদে তাঁহার শরীর আরও খারাপ হইবে। কিন্তু চন্দ্রনাথ ঐ সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “সে ভগবানের কাছে গিয়াছে—তাহার সকল কষ্টের অবসান হইয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই।” মনের দৃঢ়তা খুব বেশী না হইলে কি এই ভাবে বলা যায়? আর একবার রাজনারায়ণ বাবুতে এইরূপ মনের জোর দেখিয়াছি! যখন তিনি কঠিন রোগে শয্যা-শায়ী, সেই সময় তাঁহার একটী দৌহিত্র মারা যায়। রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আঘাত পাইবেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে ঐ কথা বলে নাই। পরে রোগ যখন বিশেষ বৃদ্ধি পাইল, তখন তিনি ঐ দৌহিত্রকে তাঁহার কাছে আনিতে বলেন। তাঁহাকে তখন বলা হইল, তাহার অসুখ করিয়াছে, সে আসিতে পারিবে না। স্নেহশীল রাজনারায়ণ তখন তাহাকে দেখিতে নিজেই যাইবেন বলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, দৌহিত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু শুনিয়া বলিলেন, “ইহাতে দুঃখ করিবার ত কিছুই নাই। তোমরা লুকাইতেছিলে কেন? ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন—তাহার আর দুঃখ ভোগ করিতে হইল না। এখন ত আমি নিশ্চিন্ত ভাবে মরিতে পারিব।” মনের এইরূপ তেজ থাকাতেই তিনি সমা-লোচক হইতে পারিয়াছিলেন।

(৩)

সাঁওতাল কাহিনী।

যেদিকে সূর্য্যের উদয় হয়, সেদিকে মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে কেবল জল ছিল, জলের নীচে মাটী ছিল। ক্রমে কাঁকড়া, চিংড়ি মাছ প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি হইল। তাহার পর পক্ষীর সৃষ্টি হয়। পক্ষীগণ জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইত, কিন্তু আহার পাইত না। তাহা দেখিয়া ঠাকুর কুম্ভীর, চিংড়ী মাছ ও বোয়াল মাছের সাহায্যে সমুদ্রের নীচের মাটী উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা কেহই সফল হইল না। সেই অপরাধে বোয়াল মাছের আঁইশ হয় না। তখন ঠাকুর কচ্ছপকে জলের মধ্যে পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। একটা কেঁচো সেই কচ্ছপের উপর লেজ রাখিয়া মুখ দিয়া সমুদ্রের তল হইতে মাটী তুলিয়া সেই মাটী মলদ্বার দিয়া কচ্ছপের উপর জমা করিল। এইরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঠাকুর একটা মই দিয়া সেই মাটী সমান করিয়া দিলেন। মইতে সে মাটী ভাঙ্গিল না, তাহাই পাহাড় হইল।

জমি সমান হইলে ঠাকুর তাহাতে বেণা বীজ বপন করিয়া দেন। ক্রমে অন্যান্য বৃক্ষ জন্মে। বেণা-বনে হংসডিম্ব হইতে নরনারী উৎপন্ন হয়।

বড়ঠাকুরের আদেশে পাখী দুটী আপনারা যাহা খাইত, তাহার রসে তুলা ভিজাইয়া নরনারীর মুখে চাপিয়া দিত। এই রকমে শিশু দুটী বড় হইলে তাহারা পূর্ব্ব দিকে হিহিড়ী পিপিড়ী দেশে নরনারীকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই নরনারীর নাম পিল-চুবুড়া ও পিলচুবুড়ী। ঘাসের বীজে তাহারা জীবনধারণ করিত। তখন তাহাদের পরিধেয় ছিল না, লজ্জাও ছিল না। লিটা (সয়তান) তাহাদিগকে ভাতে বাখর মিলাইয়া মদ প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেয়। এবং মারাং পুরালে (বড় পর্ব্বতের প্রেত) উৎসর্গ করিয়া মদ খাইতে পরামর্শ দেয়। তাহারা সেই ভাবে মদ প্রস্তুত করিয়া তিনটী সালপাতের

দোনায় মদ রাখিয়া এক দোনা মানাং পুরা-লেকে দিয়া অপর দুই পাত্র নিজেরা খায় এবং উন্মত্ত অবস্থায় সহবাস করে। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা আপন নগ্নতায় লজ্জা বোধ করে। তখন বট পত্র জোড়া দিয়া তাই পরিধান করিয়া নগ্নতা নিবারণ করিয়াছিল।

পিলচুবুড়া ও পিলচুবুড়ীর সাত পুত্র ও সাত কন্যা জন্মে। বুড়া যুবা পুত্রদিগকে লইয়া শীকারে যাইত—বুড়ী মেয়েদের লইয়া শাক তুলিত। শাক তুলা শেষ হইলে একদিন যুবতীরা চাপাসিয়া নামক বটবৃক্ষ তলে বিশ্রাম করিয়া ঝুরি ধরিয়া ঝুলিতে ও নাচিতে এবং গাহিতে লাগিল। এই সময়ে যুবকেরা একটী মৃগশিশু লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারাও যুবতীদের সঙ্গে নাচিতে লাগিল। তাহারা তখন এক একজন এক একজনকে বাছিয়া লইল। বুড়া বুড়ী কোন আপত্তি করিল না। তাহাদের অনেক সন্তানসন্ততি হইয়াছিল। কিন্তু আর কেহ ঐরূপ বিবাহ না করিতে পারে, এইজন্য গোত্র বা পরিবার হইল। সাতটী গোত্র এই রকমে হইল। (১) হাঁসদা (২) মুর্মু (৩) কিস্কু (৪) হোম্র (৫) মারণ্ডী (৬) সারণ (৭) টুডু।

সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে দেশ ছাড়িয়া তাহারা খোজকামন দেশে প্রস্থান করে। এখানে তাহাদের অনাচার বৃদ্ধি হইলে ঠাকুর অগ্নিজল বর্ষণ করিয়া সকলকে নাশ করেন। কেবল যাহারা হারাতা পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইল।

কিছুকাল হারাতা পর্ব্বতের নিকট বাস করিয়া তাহারা শশনিবেড়ার বিস্তৃত মাঠ লইয়া বাস করে। এখানে আরও পাঁচটী ভাগ হয় (৮) বাসকে (৯) বেশাড়ী (১০) পাওড়িয়া (১১) চঁাড় (১২) বেদেয়া (বেদেয়া সাঁওতাল এখন আর দেখা যায় না।)

“হিহিড়ী পিপিড়ীয়ে রে যোন জনমলেন
খোজ কামানরে বোন খোজলেন
হারাতারে বোন হারালেন
শশানবেদায়ে বোন জাড়ে না হো।”

শশানবেড়া হইতে সাঁওতালেরা জরপী দেশে এবং তথা হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া সিংদুয়ার গিরিসঙ্কট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কাঁয়শুদেশ ও তথা হইতে চাঁইদেশে উপস্থিত হয়। চাঁইদেশে তাহারা অনেক দিন বাস করিল। সেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে সাত নদী চাম্পোদেশে উঠিয়া যায়। এখানে শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক একটী গড় প্রস্তুত করিয়া এক এক জাতি বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিস্কুর রাজা ছিল, মুর্মুরা পৌরোহিত্য করিত। সারনরা প্রহরীর কার্য্য করিত। হোম্রামেরা যুদ্ধে যাইত, মারণ্ডীরা ধনপতি, টুডুরা বাস্তকর এবং হাঁসদারা ব্যবসায় করিত। চাম্পোদেশে তাহারা দীর্ঘকাল ছিল। সাঁওতালেরা সাধারণতঃ চাম্পোদেশই তাহা-দের আদিমনিবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। প্রথমে অনেক দিন পর্য্যন্ত দিকু (বিদেশী) দিগের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ হয় নাই। সাঁওতালেরা জঙ্গলে ও দিকুরা মাঠে বাস করিত। পরে দিকুদের সহিত তাহাদের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। “আমরা অরণ্য পরিষ্কার করি, দিকুরা আসিয়া কাড়িয়া লয়। যদি সাহেবেরা তাহাদের সহায়তা না করিত, এত দিনে আমরা তাহাদের গঙ্গাপারে তাড়াইয়া দিতাম।” একবার দিকুরা চাম্পো-

গড় জয় করিয়াছিল, সাঁওতালেরা পুনরায় তাহা কাড়িয়া লয়। এই সময় দিকুরা এই গান্টী করিয়াছিল।

দাদারে ইনদান সিন সঙ্কাং সিন
দাদারে ভুটা লোণ চায়নাক গড়
বহিন গে না ক্যাঁদো না সিজো
বহিন গে ছাড়ে কা শাকা বিচোন
বহিন গে কানাকা সোন বিচো
বাহন গে ভডিহোনা লোক চাম্পোকা
গড়।

(ক্রমশঃ)

(৪)

শ্রীচৈতন্যের অনেক পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছিল। অথচ ভাগবতে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্থে গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ
শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।
ভাগবত ১০।৮।৯।

গর্গাচার্য্য নন্দকে বলিতেছেন, হে নন্দ, তোমার এই পুত্র প্রতিযুগে শরীর ধারণ করাতে ইহার তিনটী বর্ণ হইয়া থাকে। যথা শুক্ল, রক্ত ও পীত। সত্যযুগে হংসাবতারে ইনি শুক্লবর্ণ হইয়াছিলেন, ত্রেতাযুগে হয়গ্রীবাবতারে রক্তবর্ণ, ইদানী দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণবর্ণ এবং ভবিষ্যতে (চৈতন্যাবতারে) গৌরবর্ণ হইবেন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপরের কথা—অতীত কথা শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া শ্রীভাগবতকার লিখিতে পারেন। বাইবেলে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত ছিল, আমরা অবিশ্বাসে বলিতে পারি, কূটব্যাখ্যা কি কষ্টকল্পনা করিয়া সেগুলি মিলান হইয়াছে? কেহ বা সে ভবিষ্যদ্‌বাণী গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে কুণ্ঠিত না হইতে পারেন। কিন্তু চৈতন্য জন্মের পূর্ব্বে ভাগবতের এই নির্দ্দেশ যে, তিনি পীত বা গৌরবর্ণ হইবেন—ইহা না প্রক্ষিপ্ত না কণ্টকলিপ্ত? অন্ধ আমরা জড় বুদ্ধিতে বিশ্বাসও করিতে পারি না যে, চৈতন্য জন্মিবার পাঁচ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভাগবতকার কি করিয়া ভবিষ্যৎবাণী করিলেন যে, শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ হইবেন।

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীমদ্ভাগবতকার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মহাভারতে পাইয়াছিলেন।

সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চদনাঙ্গদী

* * * *

সন্ন্যাস কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ।
অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৯ অধ্যায় ৭৫।৯২।

স্বর্গের ন্যায় তাঁহার গৌরবর্ণ, অঙ্গ গলিতস্বর্ণের ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতি শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল ভূষায় ভূষিত; তিনি সন্ন্যাসকারী, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, শান্ত এবং নিষ্ঠা ও শান্তি গুণযুক্ত।

এই যে শ্রীচৈতন্যের চেহারা, কে অস্বীকার করিবে? রূপ, বর্ণ, আকার, ভূষা, প্রকৃতি ও চরিত্র, কার্য্য ও কল্পনা, সকলই শ্রীচৈতন্যের।

ভাগবত হইতে মহাভারত আরো প্রাচীন। ভারতকার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ণে বর্ণে শ্রীচৈতন্যের ফটোগ্রাফ কি করিয়া তুলিলেন? শত হস্তীর অনায়ত্ত দুর্ব্বহ শীলাখণ্ড প্রাচীন আর্য্যগণ অবলীলায় আকাশে তুলিতে পারিতেন, ইহাও হয়ত বুঝিতে পারি। দূরবীক্ষণের অদৃশ্য ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ গণনা করিতেন, ইহাও হয়ত কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু দ্বিসহস্রবর্ষ পরে যাঁহার জন্ম হইবে, কি করিয়া কবি তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিলেন, বুঝিতে পারি না। এ কি কোন গুপ্ত শাস্ত্রের আবিষ্কার?

সংগ্রাহক ও প্রকাশক,
শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী।

একখানি পত্র।

("নীজ্‌সে দর্শন" ও স্পেন্সার সম্বন্ধে।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, নব্যভারত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

সেদিন আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় "নীজশে দর্শন (২)" নামক প্রবন্ধটী দেখিতেছিলাম (গত অগ্রহায়ণ ও পৌষের সংখ্যা দেখুন)। শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন দাস মহাশয় তাহার লেখক। দাস মহাশয়ের ভাষাটী অতি সুন্দর বোধ হইল। উহাতে প্রাঞ্জলতা আছে, ওজস্বিতা আছে, অগ্নি আছে, প্রাণ আছে, সরলতা আছে। আমি বোধ হয় দাস মহাশয় অপেক্ষা বয়সে বড়। তাই আমার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকার আছে। তাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁর লেখনীর উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকুক। এদিকে কিন্তু লেখক নীজসেকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে দাস মহাশয়ের সকল মতের সহিত আমাদের মিল নাই। দুঃখের বিষয়। কিন্তু আজ সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না। খালি একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। নীজ্‌সে যে একজন মোটের উপর সুলেখক ছিলেন, আর মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে নিজের আলোক অনুসারে দর্শন ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে প্রাচীন কুসংস্কার ও জনশ্রুতির (traditionsএর) হাত হইতে অব্যাহতি দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—মানব জ্ঞানকে স্বাধীনতার রাজাসনে বসাইবার জন্য সবিশেষ যত্নবান ছিলেন, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। কেবল ঐ চেষ্টা ও যত্নের জন্য—আর কিছুর জন্য হউক আর নাই হউক—কেবল ঐ চেষ্টা ও যত্নের জন্যও মানুষ নীজ্‌সেকে চিন্তা-জগতে একটী উচ্চ আসন দিবেন। তবে এখানে আপনার যে সকল পাঠকেরা নীজ্‌সের মতামত আলোচনা করিবার জন্য সময় ও অবসর পান নাই, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিতে চাই যে, ঐ নীজ্‌সেই জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কে (John Stuart Millকে) "block-head" বলিয়াছিলেন। Millএর শত দোষ থাকুক, কিন্তু তাঁকে "block-head" বলা এক "অতি" সাহসের কায। নীজ্‌সে মৃগী রোগাক্রান্ত ছিলেন; পাগলা গারদেও কিছুদিন বোধ হয় বাস করিয়াছিলেন। যদিও তিনি যখন পাগল হইয়াছিলেন, তখন মিল্‌কে ঐ গালাগালি দেন নাই, সুস্থ অবস্থাতেই দিয়াছেন, তবুও ঐরূপ উক্তিকে লোকে উন্মত্তের প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিবে? তাই বলিতেছিলাম, যিনি Millকে একটী blockhead বলিতে পারেন, তাঁর মতামতকে বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। যাহা হউক, এই সকল কথা আনুষঙ্গিক কথা মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীজসের মতামত সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমরা আজ এই পত্র লিখিতে বসি নাই। কি জন্য লিখিতে বসিয়াছি, এখন বলিতেছি। দাস মহাশয়ের প্রবন্ধ দেখিতে দেখিতে তাঁর একটী কথা নজরে পড়িয়া গেল, আর মনে বিশেষ খট্‌কা লাগিল। দাস মহাশয় বলিতেছেন :—

"ইংলাণ্ডের Spencer নাগরিকের বাবুয়ানাকেই সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জার্ম্মাণির নীজ্‌সে জাতীয়

জীবনের শৃঙ্খলাকেই সভ্যতার মাপকাটী বলিতেছেন। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, কাহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট?"

এ তুলনাটী ঠিক হইয়াছে কি না, তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। দাস মহাশয় স্পেন্সার সম্বন্ধে এখানে যা বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর বলিবার ভিত্তি (authority) কি, তাহা কি তিনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন? স্পেন্সারের ওরূপ মত আমরা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমরা আশা করি, দাস মহাশয় স্পেন্সারের পুস্তক বা প্রবন্ধাদি হইতে একটী কি দুইটী অংশ (পত্রাঙ্ক সহিত) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবেন যে, স্পেন্সারের ঐ মত। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নয়। হস্তীরও পা টলে; মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। স্পেন্সার একটা ভুল কথা বলিবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা দেখিতে চাই, তিনি কোথায় ঐরূপ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। "নাগরিকের বাবুয়ানা" যে প্রকৃত সভ্যতার "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" "মাপকাটী" হইতে পারে না, তাহা সকলেই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। খালি স্পেন্সার তাহা দেখিতে পাইলেন না,—এটা কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয়। আবার এইরূপও হইতে পারে যে, দাস মহাশয় স্পেন্সারের যে কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া স্পেন্সারের ঘাড়ে পূর্ব্বোক্ত মত চাপাইলেন, সে কথাগুলির আক্ষরিক অর্থ ঐ মতের পোষকতা করিতে পারে, কিন্তু ভাবার্থ তাহা নহে। এখানে, সম্পাদক মহাশয়, আশা করি আপনার পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন যে, স্পেন্সারের নৈতিক ও ধর্ম্ম-জীবন অতি উচ্চদরের ছিল,—সে কালের মুনিঋষিদের মত। ক্ষুদ্র মানব বিশ্বের মূল তত্ত্ব বুঝিতে পারে কি না, আর যদি পারে ত কতদূর ও কি ভাবে পারে, এই সুগভীর প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দেওয়া তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। এক দিকে যেমন সংযম, জ্ঞানপিপাসা, সত্যপ্রাণতা, ও জ্ঞান-গত স্বাধীনতা (intellectual freedom) তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল; অন্য দিকে তেমনি জ্ঞান প্রচারের ইচ্ছা, সুগভীর ধর্ম্মভাব ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনকে উজ্জ্বল করিয়াছিল। এখানে কেবল একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অষ্ট্রেলিয়া, ট্যাস-মেনিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম নিবাসীরা (aborigines) যাহাতে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে নির্ম্মূল না হয়, তার জন্য স্পেন্সার এক সময় এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, চিরদিনের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য-রত্নকে জলাঞ্জলি দেন। মানবহিতার্থে এ এক প্রকার martyrdom। যাঁর জীবনের আদর্শ ও সাধনা এত উচ্চ ছিল, তিনি যে নাগরিকের "বাবুয়ানাকে" প্রকৃত সভ্যতার "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" "মাপকাটি" বলিবেন—এটা বাস্তবিকই কেমন কেমন ঠেকে। না, শুধু এই কথাগুলি বলিলে ঠিক বলা হইল না। শুধু এই কথাগুলি বলিলে স্পেন্সারের প্রতি অবিচার করা হয়। ও কথাগুলি ত হইল অভাব-ব্যঞ্জক (negative) প্রমাণ যে স্পেন্সারের প্রকৃত মত তাহা হইতে পারে না—যাহা দাস মহাশয় তাঁর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। ভাব-ব্যঞ্জক (positive) প্রমাণও আছে। স্পেন্সার সর্ব্বপ্রকার "বাবুয়ানা"কেই অপকারী বলিয়া নানাস্থলে নানা ভাবে মত প্রকাশ করিয়া-

ছেন। ফ্যাসনের দাসত্ব, ফোতো নবাবী, বাবুগিরি—এ সবই অনেক স্থলে একই রকমের দুর্ব্বলতা—অনেক স্থলে একই জিনিষ। এখানে এ সম্বন্ধে স্পেন্সারের দুই একটী উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ফ্যাসনের দাসত্বের নানা দোষের মধ্যে একটী দোষ সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"It produces extravagance. The desire to be *comme il faut*, which underlies all conformities whether of manners, dress or styles of entertainment, is the desire which makes many a spendthrift and many a bankrupt. To "keep up appearances", to have a house in an approved quarter furnished in the latest taste, to give expensive dinners and crowded soirees, is an ambition forming the natural outcome of the conformist spirit. It is needless to enlarge on these follies." Spencer's Essays (A Selection) p. 103.

"Among the initiated (অর্থাৎ fashionable বাবুভায়াদের মধ্যে) are to be found neither the noblest in rank, the chief in power, the best cultured, the most refined, nor those of greatest genius, wit or beauty; and their reunions, so far from being superior to others are noted for their inanity" Id. p. 99.

Fashionable বাবুভায়াদের জীবন সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"And so life *a la mode* instead of being life conducted in the most rational manner, is life regulated by spendthrifts and idlers, milliners and tailors, dandies and silly women." Id. p. 99.

স্পেন্সার বলিতেছেন, মানুষ সাধারণতঃ জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের মধ্যে, সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। লোকে বেশভূষার জন্য যে অযথা সময়, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন:—

"Women particularly by the daily expenditure of their time, imply the belief that the chief business of life is to please the eye. From the American lady whose idea seems to be—Men must work that women may dress, down to the British kitchen-maid, whose pleasure during the week is in the thought of vying with her mistress on Sunday, the ambition which goes before all others is to satisfy the æsthetic want; or rather to obtain the admiration which is a concomitant or expected concomitant." Facts and Comments. p. 83.

এই সাজসজ্জার জন্য অসংযত, অযথা অভিলাষ চরিত্রকে কিরূপ বিগড়াইয়া দেয়, তার সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"Appearance will tend ever to become a primary end and use a secondary end; as with the savage who struts about in a mantle in fine weather but takes it off when it rains" Id. p. 84.

কতকগুলা নানা রকমের মূল্যবান জিনিস দিয়ে ঘর সাজান সম্বন্ধে বলিতে-ছেন:—

"Meanwhile, leaving out the question or original cost, they are

WATER DAMAGED.

in their multitude, constant sources of vexation." Id. p. 85.

আর একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনার পাঠক মহাশয়দিগকে জ্বালাতন করিব। কি সুন্দর ও সংযত ভাবেই স্পেন্সার বেশভূষা সাজসজ্জা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বাবুয়ানার বিরুদ্ধে তাঁর তেজস্বী লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন :—

"By all means let people have around a few beautiful things on which the eyes may dwell with pleasure day after day; but let not life be distorted by the distracting of attention from essentials. Here are parents whose duty it is to fit children for carrying on life, but who, guided by mere tradition or not even that, have bestowed scarcely a thought on education rationally considered. Here are people required to take part in the direction of social affairs by their votes, who are still guided by the crudest superstitions—"good for trade", fallacies and the like—who never dream of fitting themselves for their functions as citizens. And on all sides are those who ignore the natural world around, animate and inanimate, the understanding of which in its essential principles concerns alike the right conduct of life and the conception of human existence. Meanwhile endless care and thought are daily bestowed on a multiplicity of things which are expected to bring admiration; though, whether things worn or things displayed as ornaments, they as often as not do the reverse" Id. p. 87.

আমাদের বোধ হয় যথেষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে স্পেন্সারের অন্যান্য উক্তি উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যা উদ্ধৃত করা হইল, আপনার পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন, স্পেন্সার সর্ব্বপ্রকার বাবুয়ানাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন। এরূপ লোক "বাবুয়ানা"কে প্রকৃত সভ্যতার "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" নিদর্শন বলিতে পারেন না।

যদি বলিতেন, তাহা হইলে ইহাও তাঁহার মত হইত যে, যে জাতি যত 'বাবু' সে জাতি তত সভ্য, অর্থাৎ যে জাতির লোকেরা যত বাবু সে জাতি তত সভ্য ("cultured")। ব্যক্তি লইয়া জাতি। তাহা হইলে দাস মহাশয়ের মতে দাঁড়াইতেছে যে, স্পেন্সারের মতে যে ব্যক্তি যত বাবুয়ানা দেখাইবেন, সে তত cultured। আমরা স্পেন্সারের দুই চারিটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, স্পেন্সারের মত তাহা নহে। তাই দাস মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা। স্পেন্সার সম্বন্ধে দাস মহাশয়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির ভিত্তি (authority) আমরা দেখিতে চাই। সম্পাদক মহাশয়, আপনার অনেক পাঠকই বোধ হয় তাহা দেখিতে চাহিবেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনার আরও একটা কারণ আছে। আমরা দেখিতেছি, বঙ্গ সাহিত্যে ধীরে ধীরে একটী বিশেষ রোগ প্রবেশ করিতেছে। কোন গ্রন্থকর্ত্তাকে না বুঝিয়া, অনেক স্থলে না পড়িয়াই তাঁর ঘাড়ে একটী বিশেষ মত চাপান হয়। মনের মত একটা মত চাপাইয়া তারপর তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত লোক পর্য্যন্ত তা করিতেছেন।

এই সেদিন সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় তিনি স্পেন্সারের ঘাড়ে এমন মত চাপাইয়াছেন, যা আদবেই তাঁর মত নয়। এইরূপ মত চাপাইয়া তারপর Don Quixoteএর মত স্পেন্সারকে শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন। হা অদৃষ্ট! আরও কত কি কপালে আছে! আশা করি, দাস মহাশয় পূর্ব্বোক্ত অপরাধে অপরাধী নন।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি এই পত্রের যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

আপনার

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

বেদনা।

সংবিত্তি ও অনুভূতি—বাহ্যশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর আঘাত করিতেছে—ঐ আঘাত মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া মস্তিষ্কের চঞ্চলতা উৎপাদন করিতেছে। এই মস্তিষ্ক চাঞ্চল্যের উপর মানস প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি। এই সংবিত্তির ক্রিয়া কেবল ইন্দ্রিয়গ্রামেই আবদ্ধ নহে—ইহা সমস্ত শরীর যন্ত্রব্যাপী। বাহ্যশক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া মনকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত শরীর যন্ত্রটী কি একবারে নিষ্ক্রিয় থাকে—একবারে নির্লিপ্ত থাকে? উদ্বোধক যে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রামবিশেষের এবং মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে, তাহা নহে—ইহা হইতে যাবতীয় শরীর-যন্ত্রের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শরীর যতক্ষণ সজীব ততক্ষণ সংবিত্তি। যতক্ষণ শরীরযন্ত্রে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান, ততক্ষণই মানুষ সজীব। এই জীবনী শক্তির অনবরত হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। সংবিত্তি মাত্রেই সমস্ত শরীর-যন্ত্রটীর বৈদুর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়—হয় ইহার জীবনীশক্তিকে বৃদ্ধি করে, না হয় ক্ষয় করে। অতএব বাহ্যশক্তি হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হইতেছে, মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে—সমস্ত শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইন্দ্রিয় বিশেষের পরিবর্ত্তন হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর-যন্ত্রটীর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইন্দ্রিয় পরিবর্ত্তন জ্ঞান হইতে সংবিত্তি এবং সমস্ত শরীর-যন্ত্রটীর পরিবর্ত্তন জ্ঞান হইতে অনুভূতি হইতেছে। সংবিত্তি শরীরের অংশবিশেষে আবদ্ধ—কিন্তু অনুভূতি সমস্ত শরীরব্যাপী।

"পথধূলি হ'তে বুকে তুলি' তারে
ভাবে কবি বিস্মিত—
একি কুল-ভাঙ্গা ভাবের প্লাবন!
জীবন উন্মথিত!"

সংবিত্তির শ্রেণীবিভাগ সম্ভব কিন্তু অনুভূতির শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নহে। সংবিত্তির চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অনেকগুলি ইন্দ্রিয় আছে—কিন্তু বেদনার একটী মাত্র ইন্দ্রিয়—এ ইন্দ্রিয় শরীরের কোন অংশ বিশেষ নহে—কিন্তু সমস্ত শরীরটীই ইহার ইন্দ্রিয়। এই শরীরিন্দ্রিয়ের ক্ষয় বৃদ্ধিরূপ দুইটী ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং অনুভূতির দুইটী মাত্র

অবস্থা। শরীর-যন্ত্রের সহায় জ্ঞানে সুখের অনুভূতি হয়, এবং অন্তরায় জ্ঞানে দুঃখের অনুভূতি হয়। অতএব সুখ এবং দুঃখ এই দুইটী অনুভূতির গুণ। এই সুখ কিম্বা দুঃখকে একবারেই বিশ্লেষণ করা যায় না—ইহা আদৌ জটিল নহে।

সংবিত্তি ও অনুভূতির পার্থক্য—সংবিত্তি এবং অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য আছে। সংবিত্তি শরীর অংশ সম্ভূত এবং অনুভূতি সমস্ত শরীর সম্ভূত। সংবিত্তি একবারে আমার নিজস্ব সম্পত্তি নহে, কিন্তু অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব সম্পত্তি। নীল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলাম—আমার আনন্দ হইল। এখানে নীলবর্ণ আমার সংবিত্তি এবং আনন্দ আমার অনুভূতি। মনে হয় যেন নীলবর্ণ টী আকাশে আছে, আর আনন্দটী আমাতে আছে। মনে হয়, উত্তাপ অগ্নিতে আছে, এবং উত্তাপজনিত সুখ আমাতে আছে। অবশ্য বিজ্ঞানের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, নীলবর্ণের সংবিত্তি, উত্তাপের সংবিত্তি এবং সুখের অনুভূতি সকলই আমার মনে আছে—সকলই আমার মনের অবস্থা মাত্র, কিন্তু সচরাচর আমরা মনে করি, একটী বাহিরে আর একটী অন্তরে। প্রকৃত পক্ষে দুইই অন্তরে, কিন্তু তাহা হইলেও একটী অন্তরে আর একটী বাহিরে, এমন কথা মনে হয় কেন? অতএব মানিয়া লইতে হইবে যে, এই দুইএর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যখন উদ্বোধক মনুষ্য শরীরান্তর্গত নহে, তখনই যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়, এমন নহে। উদ্বোধক শরীরান্তর্গত হইলেও কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। দন্তের পীড়া হইলে যন্ত্রণা অপেক্ষা যন্ত্রণাজনিত অশান্তি যেন আমার অধিক নিজস্ব বলিয়া বোধ হয়। 'যন্ত্রণা' দন্তের মূলদেশের—আর 'অশান্তি' আমার—যন্ত্রণা দন্তে আর অশান্তি আমাতে। সংবিত্তি এবং অনুভূতি দুইটীই মনের অবস্থা, তবে অনুভূতি অপেক্ষা সংবিত্তি অধিক বস্তুবিষয়ক এবং সংবিত্তি অপেক্ষা অনুভূতি অধিক মনবিষয়ক। শরীরের কোন বিশেষ অংশে সংবিত্তির স্থিতি বলিতে পারা যায়, কিন্তু অনুভূতির স্থিতি সমস্ত সংজ্ঞাক্ষেত্র ব্যাপী। দন্ত পীড়ায় যন্ত্রণায় স্থিতি দন্তে, শরীরের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশে—কিন্তু যন্ত্রণাজনিত অশান্তি বর্ত্তমান সমস্ত অভিজ্ঞতাটুকু একবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে—সংজ্ঞাক্ষেত্রের যতটুকু বিস্তৃতি, ইহারও বিস্তৃতি ততটুকু। সংবিত্তিকে প্রদেশান্তর্গত করিতে পারা যায়, কিন্তু অনুভূতি সমস্ত সংজ্ঞাব্যাপী। আবার অভ্যাস বলে অনুভূতির লোপ হইতে পারে, কিন্তু সংবিত্তির লোপ হয় না। তুমি আজন্ম জনতাপূর্ণ কোলাহলপূর্ণ বৃহৎ নগরীতে লালিত পালিত হইয়াছ। তুমি কখনও প্রকৃতির নগ্নসৌন্দর্য্য দেখ নাই। আজ তুমি সামান্য একটী পল্লীগ্রামে আসিয়াছ। এখানে যাহা দেখিতেছ, তাহাই তোমার নিকট নূতন, তাহাই তোমার নিকট প্রীতিপ্রদ। তুমি দেখিতেছ,

"বাতাস এসে মধুর হেসে
খেলছে লুকোচুরি!
কাঁপছে পাতা দুলছে লতা
হাসছে ফুলের সারি।
কোথা হ'তে গন্ধটুকু
আসছে ভেসে ধীরি।
ওপারেতে শরষে ক্ষেতে
হলদে বিছানায়,
ঝিকিমিকি কি ও দেখি
ঝলসে আঁখি যায়।

পড়ি হাতে গোপাল সাথে
সাধের ভাষাণ গানে,
রাখাল কত যাচ্ছে পথ
চেয়ে আকাশ পানে।
ঘোমটা মুখে কলসী কাঁকে
গ্রামের মাঝ হ'তে,
বৌ দুটিতে যাচ্ছে চ'লে
বাঁকা সরু পথে।
নীল আকাশে ধীর বাতাসে
পাখী লাখে লাখে,
ছড়িয়ে ডানা কোন দেশেতে
যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।"

এখানে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহাই তোমার ভাল লাগিতেছে, তাহাতেই তুমি আমোদ পাইতেছ। কিন্তু গ্রামবাসীরাও ঐ সব জিনিষ দেখিতেছে, কিন্তু তোমার মত কি তাদের আমোদ হইতেছে? তুমি যদি এখানে কিছুদিন অবস্থান কর, তবে তুমিও কি এমনি আনন্দ উপভোগ করিবে? তখনও সেই ফুল, সেই গন্ধ, সেই ক্ষেত, সেই রাখাল, সেই গান থাকিবে, তবুও তোমার তেমনি আনন্দ কেন থাকিবে না? তখন তুমিই বলিবে—

"তখন ছিলাম যেই
এখনও আছি সেই,
সেই শারদীয় নিশা সেই উষা হায়!
শুধু নাই সে উল্লাস।"

এখানে সেই সংবিত্তি আছে, কিন্তু সেই অনুভূতি নাই। পুনঃ পুনঃ একই বস্তুর সংবিত্তি হইলে তৎসম্পর্কীয় অনুভূতির লোপ হয়। আরও সংবিত্তি অবধনান্তর্গত কিন্তু অনুভূতি অবধান-বহির্ভূত। সংবিত্তিকে যতই অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করা যায়, ততই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অনুভূতি অবধান করিতে চেষ্টা কর, দেখিবে অনুভূতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি এক খানি সুন্দর আলেখ্যে দেখিতেছ, এবং আনন্দ উপভোগ করিতেছ। যতক্ষণ তোমার দৃষ্টি আলেখ্যে, ততক্ষণ তোমার আনন্দ—ততক্ষণ তোমার অনুভূতি। অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, অনুভূতি বিলীন হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি যতক্ষণ বহির্মুখী, ততক্ষণ আনন্দ, কিন্তু দৃষ্টি যখন অন্তর্মুখী, আনন্দ তখন অন্তর্হিত। যদি তুমি আলেখ্যে চক্ষু সমর্পণ করিয়া আলেখ্য-সমুৎপন্ন অনুভূতির প্রণিধান মানসে মনোনিবেশ কর—অনুভূতি জিনিষটী কি? শরীরের না মনের? ইত্যাদি বিষয় যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, তবে দেখিবে, আনন্দের অবস্থা চলিয়া গিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংবিত্তি এবং অনুভূতি পৃথক জিনিষ—কিন্তু ইহাদের পার্থক্যের প্রকৃতি নির্ণয় সহজ-সাধ্য নহে—এই পার্থক্য মনে বুঝিবার জিনিষ, ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়।

উদ্বোধকের সহিত অনুভূতির সম্বন্ধ।—সুখ এবং দুঃখ, এই দুইটী অনুভূতির লক্ষণ। জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারী উদ্বোধক সুখকর, এবং ক্ষয়কারী উদ্বোধক দুঃখকর। কিন্তু কতটুকু সুখে কতটুকু শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং কতটুকু দুঃখে কতটুকু শক্তি ক্ষয় হয়, ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা এখনও অসম্ভব। সাধারণতঃ আমরা বাহ্য শক্তির মাত্রার সহিত সুখ দুঃখের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া থাকি। বহু পরীক্ষার পর পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, "একই অবস্থায়" অতি ক্ষীণ উদ্বোধকে অনুভূতি থাকে না; অতি তীব্র উদ্বোধকে দুঃখের অনুভূতি হয়, এবং নাতিক্ষীণ এবং নাতিতীব্র উদ্বোধকে সুখের অনুভূতি হয়। "একই অবস্থায়" এই কথাটী

অতি প্রয়োজনীয় কথা, কারণ অবস্থা-ভেদে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এক অবস্থায় যে উদ্বোধকে আমি নির্লিপ্ত, অন্য অবস্থায় সেই উদ্বোধকে আমি আস্থাবান হইতে পারি। যে উদ্বোধক শারীরিক ক্রিয়া অতিক্রম করিয়া মন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, তাহাই ক্ষীণ উদ্বোধক; যে উদ্বোধক শরীর-যন্ত্রের কার্য্যাবলি বিধ্বস্ত করিয়া দেয়. তাহাই তীব্র উদ্বোধক; আর যে উদ্বোধক শরীর-যন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করে, তাহাই মধ্যবিৎ উদ্বোধক। কিন্তু ক্ষীণ তীব্র ইত্যাদি অন্যসাপেক্ষ পদ। যাহা আমার নিকট 'ক্ষীণ', তাহা তোমার নিকট 'তীব্র' এবং অপরের নিকট 'মধ্যবিৎ' হইতে পারে। যাহা এখন আমার নিকট ক্ষীণ বোধ হইতেছে, আবার অন্য সময়ে তাহা তীব্র বোধ হইতে পারে। চিনির আস্বাদন তীব্র করিতে হইলে যত পরিমাণ চিনির দরকার, তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ তিক্ত বস্তুতে তিক্তবস্তুর তিক্ততা বাড়াইতে পারা যায়। এক রতি চিনিতে আর এক রতি চিনি মিশাইলে চিনির তীব্রতা বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু এক রতি কুইনিনে আর এক রতি মিশাইলে ইহার তীব্রতা বাড়িবে। কেহ কেহ বলেন যে সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকে সমপরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে উহার উদ্বোধককেও সাপেক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হয়। যাহার এক হাজার টাকা মাসিক আয়, তাহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে যতটুকু আনন্দ হয়, যাহার মাসিক একশত টাকা আয়, তাহার দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইলে ততটুকুই আনন্দ হয়। এটী সাধারণ নিয়ম হইলেও ইহাকে সার্ব্বজনিক নিয়ম বলা যায় না। উদ্বোধক এবং উদ্বুদ্ধ অনুভূতির সম্বন্ধে অনুপাত আছে, এইমাত্র বলা যায়। কিন্তু এ অনুপাতের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। শিশুর যে বস্তুতে প্রীতি হয়, তোমার তাহাতে অপ্রীতি হইতে পারে।

অনুভূতি এবং বেদনা প্রায়ই যুগপৎ।—অনুভূতির স্থায়িত্ব নির্ণয় করা আরও দুরূহ ব্যাপার। কখন একটী অনুভূতির আরম্ভ হইতেছে, আবার কখনই বা ইহার শেষ হইতেছে, বলা বড় সহজ নহে। শারীরিক অনুভূতি এবং বেদনা প্রায়ই এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়, এবং একটী আর একটীতে মিশিয়া যায় এবং দুইএরই প্রকৃতি এক বলিয়া একটীকে আর একটী হইতে পৃথক করা যায় না। অনেক দিন ধরিয়া তুমি তোমার বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছ। আজ তুমি সহসা তাহার সাক্ষাৎ পাইলে। তোমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দর্শনসংবিত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হইল, কিন্তু এই দর্শন-জনিত অনুভূতি অবিমিশ্র নহে। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার উদ্রেক হইল, এবং চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাসম্পর্কীয় অনুভূতি দেখা দিল—ভাব এবং বেদনা এক সঙ্গে দেখা দিল। বন্ধুর হাব ভাব দেখিয়া তোমার কত কথাই মনে হইল; কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা করিলে—

'আঁখি ছল ছল নিশ দিবা ভর
কঁহেতু বিরস ভেল?
কি দুঃখ জাগল পরানে তুঁহার
কাঁহে লো নয়নে লোর?
মেরা জান দিয়া মিটাইব তুয়া
বহুত পিয়াসা ঘোর।"

তুমি বহুদিন পরে আজ তোমার জন্মভূমি দর্শন করিলে। আনন্দে তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এই দর্শনজনিত আনন্দ অনুভূতি।

এই কি সে জন্মভূমি সুখময় স্থান?
শান্তিময় শৈশবের ক্রীড়া-নিকেতন
জননী জনমভূমি
এই কি সে স্থান তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী তোমারি কি নাম?
ধরায় ত্রিদিবালয় এই কি সে স্থান?

তার পর তোমার শৈশবের সুখস্মৃতি মনে হইল, কত চিন্তা কত বেদনার উদয় হইল। হয়ত আক্ষেপ করিয়া বলিলে—

"আমারও সাথে কি গো জন্মভূমি তব?
গিয়াছে ফুরায়ে সবি সাধের বিভব।
সেই খেলা হাসিখুসি
গেছে কি অনন্তে মিশি
সে দিনের সাথে হায় তোদের এখন,
হয়েছে কি অস্তমিত সে সুখ-তপন?"

এই প্রকারে অনুভূতির সহিত বেদনা মিশিয়া গেল। তুমি সান্ধ্য ভ্রমণের সময় পকেটে হাত দিলে, দেখিলে এক টুকরা কাগজ আছে। বাহির করিয়া দেখিলে, সেখানি একখানি একশত টাকার নোট। তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল—এটী অনুভূতি। কিন্তু এ ভাব অবিমিশ্র নহে। যেমন কাগজ খানি দেখিলে অমনি তোমার মনের ভিতর আনন্দের তড়িৎ-প্রবাহিত হইয়া গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংশয়, বিস্ময়, সন্দেহ তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এ নোট খানি কেমন করিয়া আমার পকেটে আসিল? কে রাখিল, কেন রাখিল? ইত্যাদি চিন্তায় তোমার মন অভিভূত হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোথায় অনুভূতির প্রান্ত এবং বেদনার প্রারম্ভ বলা অসম্ভব।

বেদনা।—শকট যানে আরোহণ করিয়া তুমি বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছ। অশ্বের পদধ্বনি এবং রথচক্রের ঘর ঘর শব্দ অনবরত তোমার কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে। তুমি কিছু না কিছু চিন্তা করিতেছ। হঠাৎ একটী চীৎকার ধ্বনি শ্রুত হইল। তোমার চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। ভাবসমূহের বিপর্য্যয় ঘটিল। তোমার মনে হইল, হয়ত কোন লোক গাড়ীর নীচে পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রকার চিন্তা হইতে তোমার মনে এক অভিনব অবস্থার উদয় হইল। করুণা এবং ভয়ে তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। এই নূতন অবস্থার নাম বেদনা। মানুষের মন কখনও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। ইহা কখনও চিন্তাশূন্য বা ভাবনাশূন্য নহে। এই চিন্তাস্রোত কখনও বা ক্ষীণ, আবার কখনও বা ক্ষরতর। আবার মনের অবস্থা সকল সময়েই, হয় সুখের না হয় দুঃখের, এবং এই সুখ কিংবা দুঃখ কখনও সুপ্রকটিত, আবার কখনও নিষ্প্রভ। মন সকল সময়েই নানা ভাবের লীলা-ক্ষেত্র। সময়ে সময়ে এই ভাব-স্রোত অন্য ভাবের সংঘাতে সহসা প্রতিহত হইয়া যায়, এবং আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আবার এই নূতন আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নানা ভাবের নানা চিন্তার যুগপৎ আবির্ভাব হয়। ভাব সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন একটী ভাবের একক আবির্ভাব বা তিরোভাব সম্ভব নহে। যখন যে ভাবটী সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থান অধিকার করে, তখন সে একক আইসে না—তাহার সহচরগণকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। এই প্রকারে নূতন এবং পুরাতন, বর্ত্তমান এবং অতীত ভাবসমূহের সমাবেশে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি হয়—এই অভিনব ভাবের নাম বেদনা।

সংবিত্তি এবং বেদনা।—সংবিত্তি এবং বেদনার মধ্যেও পার্থক্য আছে। ছুরিতে

আমার হাত কাটিয়া গেল। শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি হইল, ইহা সংবিত্তি। তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলে। আমার ক্রোধের অনুভূতি হইল, ইহা বেদনা। ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, কিন্তু মান অপমানের অনুভূতি নাই। তাহাদিগকে আঘাত কর, কাঁদিয়া উঠিবে, কিন্তু মিথ্যাবাদী বল, ভ্রুক্ষেপও করিবে না। সুতরাং সংবিত্তি আশৈশব বর্ত্তমান—বেদনানুভূতি সেইরূপ নহে, ইহার বিকাশ অনেক পরে। মস্তিষ্ক স্পন্দনের উপর মানস প্রতিক্রিয়ার নাম সংবিত্তি, অতএব ইহা একটী সামান্য মানসিক ক্রিয়া মাত্র—ইহা আদৌ জটিল নহে। কিন্তু বেদনা জটিল—ইহা একাধিক অনুভূতির সমন্বয়। ক্রোধ একটী বেদনা হইলেও ইহাতে ঘৃণা, অপমান, প্রতিহিংসা প্রভৃতি অপর অনুভূতিরও আভাষ আছে। সংবিত্তি শরীরের কোন্ দেশে অবস্থিত বলিতে পারা যায়, কিন্তু বেদনার সময় এরূপ দেশ নির্ণয় সম্ভব নহে।

সংবিত্তি।

১। উদ্বোধক—বাহ্যিক।
২। অবলম্বন—শরীর স্পন্দন।
৩। শারীরিক—অবস্থাজ্ঞান।
৪। সহজাত।
৫। অমিশ্র।
৬। প্রাদেশিক।
৭। অবচ্ছিন্ন।
৮। অব্যবহিতরূপে বোধগম্য।

বেদনা।

১। উদ্বোধক—আন্তরিক।
২। অবলম্বন—চিন্তা।
৩। মানসিক অবস্থাজ্ঞান।
৪। লব্ধ।
৫। জটিল।
৬। ব্যাপক।
৭। নিরবচ্ছিন্ন।
৮। ব্যবহিতরূপে বোধগম্য।

ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি বেদনা। ইহাদের মধ্যে কেহ বা সুখদায়ক, কেহ বা দুঃখদায়ক। অতএব সুখ দুঃখের অনুভূতিকে বেদনা বলিতে পারা যায়। কিন্তু মানুষের কি এমন বেদনা নাই—যাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়? বিস্ময় অনেক স্থলে সুখের এবং অনেক স্থলে দুঃখেরও হয়, কিন্তু কখন কখন "বিস্ময়" এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না কি, যখন ইহাকে সুখ বা দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইয়া উঠে? সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত মানসিক অবস্থা আছে কি না বলা কঠিন। ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি বেদনা আমাদের ইচ্ছা-প্রণোদিত নহে। মানসিক চিন্তা এই প্রকার বেদনার কারণ।

"ভূত ভাবী বর্ত্তমান একটী পলকে
মিলিল বিষাদস্নিগ্ধ আনন্দ পুলকে
আমার অন্তর তলে; অনির্ব্বচনীয়
সে মুহূর্ত্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমূক
আমার হৃদয় পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কি অনলে উজ্জ্বলিল!

কোন চিন্তা হইতে ক্রোধ, কোন চিন্তা হইতে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে। ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে চিন্তাস্রোত প্রতিহত করিতে পারি, এবং প্রতিহত চিন্তা হইতে তৎসম্পর্কীয় বেদনার দমন হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে এই প্রকার বেদনার উদ্বোধন করাও যেমন অসম্ভব, উদ্বদ্ধ বেদনার বিসর্জ্জন দেওয়াও

তেমনি অসম্ভব। মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম যেমন সংবিত্তি, তেমনি চিন্তার উপর মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম বেদনা। মস্তিষ্ক-স্পন্দনের উপর যেমন মনের প্রতিক্রিয়া হয়, চিন্তাক্রিয়ার উপরও তেমনি প্রতিক্রিয়া হয়, এবং এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়াই অনিচ্ছাসম্ভূত। অনুভূতি মাত্রেই মনের অবস্থা, কিন্তু এ অবস্থা এক প্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থা।

শৈশবকালের অনুভূতির লক্ষণ।—শিশুদিগের অনুভূতি স্বভাবতঃ স্বার্থময়, শারীরিক সুখ দুঃখ জড়িত। ক্ষুধার্ত্ত শিশুর যতক্ষণ ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়াছে, ততক্ষণ সে সকল বিষয়েই বীতস্পৃহ। এখন ইহাদের ইন্দ্রিয় লালসা প্রবল। নিজের সুখ ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ভয় বিস্ময় ক্রোধ শোক প্রভৃতির বিকাশ এখনও হয় নাই, তবে ইহাদের আভাষ মাত্র দেখা যায়। উচ্চাঙ্গের বেদনার আভাষ পর্য্যন্তও এখন দৃষ্ট হয় না। এখন ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ। অতীতের স্মরণ বা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং এ অবস্থায় অনুভূতি মাত্রেই প্রত্যক্ষ বস্তু-সমুদ্ভূত। প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্থানান্তরিত কর, তৎসম্পর্কীয় অনুভূতিও প্রায় বিলুপ্ত হইবে—ইহা স্মৃতিপটে ধারণ করিবার ক্ষমতা এখনও হয় নাই। এখন ইচ্ছাশক্তিও দুর্ব্বল, সুতরাং আত্মসংযমেরও অভাব। শিশু এখন অনুভূতির দাস। অনুভূতিকে সংযত করিবার সামর্থ্য ইহার নাই—যখন যে অনুভূতির উদ্রেক হইতেছে, সেইটীই প্রবল, এবং প্রচণ্ড হইতেছে। হাঁসি আসিলে, হাঁসিতেছে; কান্না আসিলে, কাঁদিতেছে—হাঁসি কান্না দমন করিবার শক্তি ইহার নাই। কিন্তু এই প্রকার প্রচণ্ড অনুভূতির স্থায়িত্ব অধিক হইলে ফল বিষময় হইত। হঠাৎ ইহার অনুভূতির উদ্রেক হয়, আবার সহসা ইহার বিনাশ হয়। প্রস্তর খণ্ডে বীজ নিপতিত হইলে সে বীজ যেমন "শিকর-গাড়িতে" পারে না, বালক হৃদয়ে অনুভূতিও তেমনি স্থায়ী হয় না। বালক তোমার উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে, আবার পরক্ষণেই দেখ হস্ত প্রসারণ করিয়া তোমার কোলে আসিতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, শীঘ্র সে ক্রোধ উৎপাটিত হয় না—তুমি চিন্তা এবং স্মৃতির দ্বারা ইহাকে সজীব রাখ। অতএব শৈশবকালের অনুভূতির লক্ষণ—

১। স্বার্থময়।
২। প্রত্যক্ষ বস্তু-সমুদ্ভূত।
৩। উগ্র।
৪। ক্ষণিক।

বেদনায় প্রকার।—বেদনা প্রথমতঃ স্বার্থময়—আত্মসম্পর্কিত। এই আত্মসম্পৃক্ত বেদনা, হয় সুখমূলক কিংবা দুঃখমূলক। শৈশবাবস্থাতেও এই সুখ দুঃখের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণার অশান্তি বালকের ক্রন্দনে প্রকাশ পায়। ক্রন্দনের মধ্যেও আবার অনেক সময়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন এবং যন্ত্রণাজনিত ক্রন্দন বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ সুখ দুঃখের পার্থক্য জ্ঞান হইতে সুখের প্রকারভেদ জ্ঞান এবং দুঃখের প্রকারভেদ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় নিজের সুখ অর্জ্জন এবং নিজের দুঃখ বর্জ্জন জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিজের অভাব অপনোদন এবং নিজের বাসনার তৃপ্তি হইলেই হইল। পরের সুখ

দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। নিজের স্বার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকে না। এই অবস্থায়—

"আপনা লইয়া ব্যস্ত
সবাই সংসার মাঝে
ভ্রমিতেছে নিরন্তর
যে যাহার নিজ কাজে।"

পরে যখন জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখন বুঝিলাম যে, অপরের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিলে নিজের স্বার্থেরও হানি হয়, সুতরাং নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অপরের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে; নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরের স্বার্থেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

"এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে
জান না হবে দিতে আপনা।"

এখন নিজের খাতিরে পরের জন্য অনুভূতি হইল—এইরূপ অনুভূতি আত্ম ও পরসম্পৃক্ত। কিন্তু মানুষ সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না। মানুষ অপরের সহবাস স্বভাবতঃই বাঞ্ছা করে—অপরের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্য স্বভাবতঃই লালায়িত। যখন জ্ঞানের আরও উন্মেষ হইল, তখন ভালবাসা সহানুভূতি ভক্তি সম্মান প্রভৃতি বেদনার বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রকার অপরের সুখ-দুঃখ-সম্পৃক্ত বেদনাকে পরানুসন্ধায়ী বেদনা বলে—

"ভেবেছিলাম, ছলের বলে কর্ব্ব শুধু
ভালবাসা আদায়;
কিন্তু তোদের ভালবাসা বুকে এসে আজ
যে আমায় কাঁদায়!
ঐ যে করুণ কণ্ঠধ্বনি আমার প্রাণের
কঠিন পাষাণ গলায়!
আশীর্ব্বাদে নত মাথা লুকিয়ে সুখী পরের
পায়ের তলায়।
আত্মপ্রেমের স্বার্থে আমার তোদের প্রীতির
ফোয়ারা গেল খুলে!
বিশ্বপ্রেমের উৎস আজি উৎসরিছে আমার
প্রাণের মূলে।"

পরে যখন আরও জ্ঞানের উন্মেষ হয়, মানুষ যখন সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখন আর এক প্রকার বেদনার উদয় হয়। এ বেদনা ব্যক্তিগত নহে; আপনার বা পরের চিন্তা সমুদ্ভূত নহে, ইহা আত্ম-সম্পর্কীয় নহে, পরানুসন্ধায়ীও নহে। এবম্প্রকার বেদনার নাম প্রীতি। সত্য সুন্দর এবং শুভের আদর্শ-চিন্তা-সম্পর্কীয় বেদনার নাম প্রীতি। অতএব বেদনা মোটামুটি এই কয় প্রকার—

১। আত্মসম্পৃক্ত।
২। পরসম্পৃক্ত।
৩। প্রীতি।

(ক) বুদ্ধিবিষয়িনী প্রীতি—(সত্যপ্রীতি)
(খ) সৌন্দর্য্যবিষয়িনী প্রীতি—(সৌন্দর্য্যে উল্লাস)
(গ) শীলবিষয়িনী প্রীতি।

বেদনার বিশেষত্ব।—বালক বালিকাগণের বেদনার স্ফুরণে বাধা প্রদান না করিয়া যাহাতে উহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বেদনাই বালক বালিকাগণের সুখের একমাত্র হেতু। সুখ দুঃখ বেদনার অবস্থা মাত্র। যে বিষয় হইতে কোন বেদনার উদ্রেক হয় না, সে বিষয়ের স্বার্থও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। বালক বালিকাদের বেদনা স্বার্থময় উগ্র এবং ক্ষণস্থায়ী। কোন কোন বেদনার উগ্রতা নষ্ট করিতে হয়, আবার কাহারও বা

উগ্রতা বৃদ্ধি করিতে হয়; কোন বেদনার স্থিতি এবং কোন বেদনার বিনাশ বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বেদনার উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। উদ্দেশ্য ব্যতীত কর্ম্ম নাই—এবং বেদনাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য—বেদনাই কর্ম্মের উদ্দীপক—

* * * "কর্ত্তব্য কি প্রেম বড়?
আমি মূর্খ, আমি বুদ্ধি, প্রেম উচ্চ, প্রেম
শ্রেষ্ঠতর।
প্রেম পথ দেখায় কর্ত্তব্য চলে সেই পথ বহি;
প্রেম দেয় বিধি, নিত্যকর্ত্তব্য পালন
করে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ! বাতুলের স্বপ্ন নহে;
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু, মিথ্যা
নাহি কহে।"

আবার কর্ম্ম হইতেই চরিত্র গঠন হয়, সুতরাং বেদনা চরিত্র গঠনের বিশেষ সহায়। সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বেদনা সংক্রামক। যুক্তি অপেক্ষা বেদনায় মন সহজে আক্রান্ত হয়। একের বেদনা অপরকে সহজেই স্পর্শ করে। কোন পাষণ্ড তাহার স্বার্থ পরিতৃপ্তির অন্তরায় ভাবিয়া এক জন দীনহীনকে বধ করিল। তুমি তাহাকে শাস্তি দিতে চাও—কিন্তু একা নহে, তোমার সঙ্গে আরও দশ জন আবশ্যক। তুমি তাহাদের নিকট ধর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, কর্ত্তব্যের কথা বল, হয় ত তাহাদের মন বিচলিত হইবে না—কিন্তু তুমি যদি বল—

"মায়ের সন্তান তোরা ভগিনীর ভাই
তোদের কি পুত্রস্নেহ পত্নীপ্রেম নাই?
তা যদি থাকিত হায়
তবে কি পাষাণ প্রায়
দীনহীন অনাথের বধিতে জীবন
নরপিশাচের রূপ করিতে ধারণ?"

তখন তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইবে, তখন তাহারা দলবদ্ধ হইবে, প্রতিশোধ লইবার জন্য দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হইবে। দেবনার উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন, কিন্তু সকল বেদনার নহে। যে সকল বেদনা সমাজ-দ্রোহী, যে সকল বেদনা সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, যে সকল বেদনা সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন কর। মন্দ বেদনা সকলকে উন্মূলন করিয়া ভালগুলির পুষ্টিসাধনে যত্নবান হও। বেদনা আমাদের সুখের হেতু, বেদনা কর্ম্মোদ্দীপক, বেদনা সংক্রামক, সুতরাং বেদনার উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। কিন্তু বেদনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধনে অন্তরায় আছে। প্রত্যক্ষ ভাবে বেদনাকে সংযমিত করা যায় না। উদ্দৃক্ত বেদনাকে দমন করিতে হইলে, মনকে বিষয়ান্তরে চালিত করিতে হয়। যে চিন্তা হইতে বর্ত্তমান বেদনার সঞ্চার হইতেছে, সে চিন্তা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ান্তরে ন্যস্ত করিতে হয়। আবার সদনুভূতির সঞ্চার করিতে হইলে তাহার অনুকূল উদ্বোধক বিষয়গুলির চিন্তা প্রয়োজন। অতএব বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় বেদনাকে প্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাধীন করা যায় না। আরও বেদনা মাত্রেই জটিল, সুতরাং ইহার উন্নতি সাধনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। এক এক সময় ভাব সকল এমন বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করা অসম্ভব হয়। কৃপণ সুখের আশায় অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু এমন দিন আইসে, যখন সে আর সুখের জন্য অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হয়—তখন সে অর্থ সঞ্চয়েই সুখ পাইয়া থাকে—সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে তাহার কষ্ট বোধ হয়।

বেদনার নিয়ম, জীবনধারণী নীতি।—সুখ

দুঃখ বেদনার অবস্থা। এবং এই অবস্থাদ্বয় কতকগুলি নিয়মবদ্ধ। জীবধারণের অর্থাৎ পোষণ বর্দ্ধনের পক্ষে যাহা কিছু অনুকূল, তাহাই সুখ এবং যাহা কিছু প্রতিকূল, তাহাই দুঃখ। এই নিয়মটীকে জীবধারণী নীতি বলে। কেহ কেহ বলেন যে, মানুষের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অসম্ভব। কিন্তু ইহার সদসদ্ব্যবহার সম্ভব। ইহার অসদ্ব্যবহার করিতে পারা যায়, আবার অতিরিক্ত ব্যবহারও করিতে পারা যায়। কিন্তু দুইটাই অন্তিম পন্থা এবং দুইটারই পরিণাম দুঃখ। জীবনীশক্তির অসদ্ব্যবহার কর, দুঃখ পাইবে, অতিরিক্ত ব্যবহার কর তবুও দুঃখ পাইবে। এই দুইটী অন্তিমের, মধ্য পথ অবলম্বন কর, জীবনীশক্তির সদ্ব্যবহার কর, সুখ তোমার পুরস্কার হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অনবরত জীবনশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হইলে সুখ এবং ইহার হ্রাস হইলে দুঃখ। আরও যাহা সুখদায়ক, তাহাই জীবনীশক্তির বৃদ্ধির সহায়, এবং যাহা দুঃখদায়ক তাহাই অন্তরায়।

উদ্দীপনী নীতি।—উত্তেজক ও উদ্দীপক কারণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলে সুখের পরাকাষ্ঠা হয়, কিন্তু তাহার সীমা আছে—তদতিরিক্ত অবস্থা দুঃখজনক। এই নিয়মকে উদ্দীপনী নীতি বলে। মানুষের শক্তি এবং বৃত্তি মাত্রেই উদ্দেশ্যমূলক। যে উত্তেজক এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়, তাহাই সুখদায়ক, এবং যাহা অন্তরায়, তাহাই দুঃখদায়ক। আবার, উদ্বোধকের মাত্রার উপরও সুখ দুঃখ নির্ভর করে। অর্থাৎ উদ্বোধকের শক্তি-প্রাচুর্য্য নিতান্ত কম হইলে সুখ দুঃখ কোন অনুভূতিই থাকে না। পরে উদ্বোধকের যতই শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, সুখানুভূতিরও ততই বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। এমন একটী সময় আইসে, যখন উদ্বোধকের শক্তি বৃদ্ধি হইলে আর সুখানুভূতির বৃদ্ধি হয় না; ইহা ক্রমশঃই কমিতে আরম্ভ হয়—পরে দুঃখে পরিণত হয়, এবং উদ্বোধকের আরও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে দুঃখের চরম সীমা উপস্থিত হয়। উদ্বোধক আরও বৃদ্ধি কর—দুঃখের অবসান হইবে—অনুভূতির লোপ হইবে। এই নিয়ম মাত্র সুখোৎপাদক উদ্বোধকেই প্রযুজ্য। তিক্ত বস্তুর সামান্য আস্বাদনে কি আমরা কষ্ট অনুভব করি না? দুর্গন্ধ বস্তুর সামান্য আঘ্রাণ কি আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে না? এখানে উদ্বোধকের শক্তি প্রাচুর্য্যের অভাব হইলেও দুঃখের বদলে সুখও অনুভব করি না। অতএব সুখ দুঃখ কেবল মাত্র উদ্বোধকের পরিমাণে নয়—ইহার প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে। যে উদ্বোধক স্বভাবতঃই দুঃখদায়ক, তাহার মাত্রা প্রারম্ভ সীমার নীচে থাকিলে কোন দুঃখেরই বেদনা হয় না, পরে ঐ সীমা অতিক্রম করিলে দুঃখানুভূতি আরম্ভ হয়, এবং মাত্রার বৃদ্ধি অনুযায়ী বেদনাও বৃদ্ধি পায়। এইরূপে যখন উদ্বোধকের মাত্রা প্রান্ত সীমা অতিক্রম করে, তখন বেদনাশক্তির লোপ হইয়া যায়।

বৈচিত্র্য নীতি।—কেবল উদ্বোধকের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গেই যে সুখ দুঃখের সম্পর্ক আছে, এমত নহে—ইহার পরিবর্ত্তনের উপরও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বেদনা সজাগ রাখিতে হইলে নব নব উদ্বোধকের প্রয়োজন। ইহাই বৈচিত্র্য নীতি। অবশ্য একই উদ্বোধকের হ্রাস বৃদ্ধি রূপ পরিবর্ত্তন আছে—কিন্তু এ পরিবর্ত্তন সকল সময়ে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। নূতন নূতন উদ্বোধকের প্রয়োজন। একই উদ্বোধক বহুক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে না কি? একই সঙ্গীত বারম্বার গীত হইলে তাহাতে সুখ পাও কি? একই পুস্তক কতক্ষণ পড়িতে পার? অনেকক্ষণ যাবৎ উপন্যাস পাঠ করিতে পার সত্য, কিন্তু একই উপন্যাসে কত নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ আছে। একই উপন্যাস হইতে কখনও ক্রোধ, কখনও ঘৃণা, কখনও আশা, কখনও আশঙ্কা প্রভৃতি কত ভাবের আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে।

"মধু পান করি, শুধু মধু সরোবরে
সন্তরণ নিরন্তর, সে বড় যাতনা।
অবিমিশ্র ভোগ-সুখ-প্রবাহ প্রহারে,
ক্লান্তিতে ইন্দ্রিয়কুল হারায় চেতনা।"

গ্রাহিণী নীতি।—মানুষের আর একটী গুণ আছে—সে যেমন অবস্থাতেই পড়ুক না কেন, সে সেই অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া লইতে পারে। ইহা গ্রাহিণী নীতি। সকল অবস্থাকে স্বপক্ষে—ক্রমে অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তুমি কাল স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলে—আজ তুমি সিংহাসনচ্যুত পথের ভিখারী। কাল যাহা অসম্ভব মনে করিয়াছিলে, আজ দেখিতেছ, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয়। ক্রমে ক্রমে তুমি এই নূতন অবস্থাকে আপনার করিয়া লইতেছ। তুমি কখনও বিদেশে যাও নাই। বিদ্যাভ্যাসের জন্য আজ প্রথম বিদেশে আসিয়াছ। এখানকার সবই তোমার নিকট নূতন—সবই যেন তোমার অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এ অপ্রীতি অধিক দিন থাকিবে না। যাহা প্রতিকূল মনে করিতেছ, তাহা ক্রমশঃ অনুকূল হইবে। তুমি তিক্ত দ্রব্য খাইতে পারিতে না—কিন্তু কিছুদিন বাধ্য হইয়া তোমাকে খাইতে হইয়াছিল—এখন আর তোমার নিকট তিক্তদ্রব্য তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না, বরং খাইতে বোধ হয় ভালই লাগে। অতএব দুঃখকে সুখে পরিণত করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

সংস্কার নীতি।—আবার অভ্যাস বলে সুখেও আমরা বীতস্পৃহ হইয়া থাকি। ইহা সংস্কার নীতি। সুখকর বিষয়ও দীর্ঘকাল যাবৎ উপভোগ করিলে সে বিষয়ে বিগতস্পৃহ হইতে হয়, ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত বৈচিত্র নীতি অনুসারে সত্য। স্থায়িত্ব হেতু সুখের বিনাশ হইলেও ইহা দুঃখে পরিণত হয় না, কিন্তু আর এক নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়। যদিও ইহা আর সুখদায়ক নয়, কিন্তু ইহার অভাব অত্যন্ত দুঃখদায়ক। তোমার চাকরটীকে এককালে তুমি বড়ই ভালবাসিতে—তাহাকে দেখিলেই তোমার আনন্দ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। আজ সে বাড়ী চলিয়া গেল। কেন তুমি এখন এত বিষণ্ণ?

* * "নিব না—তাহা,
পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায়।
না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া
না পারে থাকিতে এক তিল না দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া,
বৎসহারা গাভী মত মরে গরজিয়া।
আমিও যে পারিব না, কি যে সর্ব্বনাশী,
এত দেয় গালি তবু কত ভালবাসি!"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নানা কারণে আমাদের সুখ দুঃখের উদয় হয়। জীবনীশক্তির উৎকর্ষে বা অপকর্ষে উদ্দীপনীশক্তির হ্রাস বৃদ্ধিতে বা পরিবর্ত্তনে আমাদের সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আবার গ্রাহিণী শক্তি প্রভাবে আমরা দুঃখকে সুখে পরিণত করিতে পারি, এবং অভ্যাসবলে যে সুখে বিগতস্পৃহ

হৃদ, তাহার অভাব সহ্য করিতে পারি না। অতএব সুখ দুঃখের চারিটী মাত্র নিয়ামক—

১। জীবধারণী নীতি।
২। উদ্দীপনী নীতি।
৩। গ্রাহিণী নীতি এবং—
৪। সংস্কার নীতি।

বেদনার উদ্বোধক।—আমাদের মনের গঠন প্রণালী এইরূপ যে, কোন বিশেষ অবস্থায় পতিত হইলে বিশেষ প্রকার বেদনার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলেই হউক বা স্মৃতির সাহায্যেই হউক, অথবা কল্পনা সহায়েই হউক, মানুষ যখন কোন একটী বিশেষ অবস্থার সংঘর্ষে উপনীত হয়, তখন তাহার মনে এক প্রকার ভাবের স্ফুরণ হয়, এবং এই ভাবকেই বেদনা বলা হয়। ঘন ঘন অশনিপাতে কি আমাদের হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে না? অপমানের কষাঘাতে কি আমাদের ক্রোধের উদ্রেক হয় না? প্রিয়জন দর্শনে কি আমাদের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয় না? শিশুপুত্রের বিমল হাস্যে কি আমাদের মন স্নেহার্দ্র হয় না? সহোদরের বিজয়মাল্যে কি আমার অন্তরে গরিমার তুফান উঠে না? সুহৃদ্বি-রোগে কি আমি শোকবিহ্বল হই না? আমার বন্ধুর গৃহখানি অগ্নিদগ্ধ হইতেছে; দেখিলাম, বন্ধু আমার দ্বিতলের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ হইয়া প্রাণভরে চীৎকার করিতেছে, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেছে; দেখিলাম, তাহার উদ্ধার সাধন অসম্ভব; নিকটে সিঁড়ি নাই; ঐ উচ্চ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেও জীবনের আশা কম, অগ্নি ক্রমশঃই প্রচণ্ড হইতে লাগিল; ইহার লেলিহান শিখা বন্ধুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল; হৃদয় আমার আতঙ্কে গাড়ষ্ট হইয়া গেল; চিন্তাশক্তি লোপ পাইল; ক্রিয়াশক্তি শিথিল হইল। এমন সময় দেখিলাম, একজন সুদক্ষ লোক আসিয়া অতি নিপুণতার সহিত সেই কক্ষের জানালায় একটী সিঁড়ি লট-কাইয়া দিল, এবং নিমেষের মধ্যে আমার বন্ধুকে উদ্ধার করিয়া আনিল। এখন এক-বার আমার মনের অবস্থার বিষয় ভাব দেখি! যে ভীতির প্রচণ্ড আবেগে আমার হৃদয় এতক্ষণ উদ্বেলিত হইতেছিল, সে আবেগ এখন শান্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ একটী বেদনার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বেদনার উপর বেদনা আসিয়া আমার হৃদয়-মন্দিরকে আলোড়িত করিতে লাগিল। এখন আশার আলোকে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল; কৃতজ্ঞতারসে আমার হৃদয় আপ্লুত হইল; আহ্লাদের আবেগে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এখানে ভয় আনন্দ প্রভৃতি বেদনা-গুলি প্রত্যক্ষজ্ঞান সমুদ্ভূত। পরে যখন স্মৃতির সাহায্যে ঐ উদ্ধারকারী লোকটীর নিপুণতা, লোকটীর কৃতিত্ব, তাহার সাহস, তাহার অকৃত্রিম পরোপকারিতার বিষয় যতই আলোচনা করি, ততই আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতারসে ভরিয়া উঠে—ততই আমার হৃদয় তাহার প্রশংসায় বিভোর হইয়া উঠে। কল্পনাপ্রভাবেও বেদনার উৎস ফুলিয়া উঠে। দুইটী বালক নৌকাযোগে সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিতে গিয়াছে। বালক দুইটী সন্তরণপটু নহে—নৌকাচালনেও সুনিপুণ আকাশে মেঘ দেখা দিল। বাতাস উঠিল। ক্রমে ঘনান্ধকার মেঘে গগন ছাইয়া গেল। প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল। গঙ্গা-বক্ষে ভয়ানক তুফান উঠিল। এখন কল্পনা-সহায়ে উহাদের আসন্নবিপদের কথা ভাবিয়া আশঙ্কা ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরে শুনিলাম যে, তাহারা নিরাপদে গঙ্গার অপর পারে পৌছিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। এখন আবার অভিনব বেদনার সৃষ্টি হইল। আশঙ্কা ও আতঙ্ক, আশা ও আনন্দে পরিণত হইল।

বেদনার অভিব্যঞ্জক।—বেদনা মাত্রেরই অভিব্যঞ্জক আছে। ক্রোধ ভয় বিস্ময় প্রভৃতি পৃথক পৃথক বেদনার বিশেষ বিশেষ বাহ্য-লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। একটী বেদনাকে আর একটী বেদনা বলিয়া ভুল হয় না। বেদনাভি-ভূত হইবা মাত্রই তাহা তখন বাহ্যলক্ষণের দ্বারা বহির্জগতে প্রকটিত হইয়া পড়ে। তোমার বন্ধুর কোন সুসমাচারে তোমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার নয়নে, তোমার কপোলে, তোমার ললাটে, তোমার মনের বেদনার আভাষ প্রকটিত হইল। অথবা তুমি শোকবিহ্বল হইলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেদনা তোমার শরীরাবয়বে প্রতিভাষিত হইল। বেদনা মাত্রেই শরীরা-বয়বের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র, মাংসপেশি, চর্ম্মা-বরণ প্রভৃতি অনেক অঙ্গেরই বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, এবং এই সকল শারীর পরিবর্ত্তন হইতে মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া বেদনার উগ্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

এই প্রকার শারীর অভিব্যঞ্জক হইতে প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইহা যখন ভাষার সহিত ব্যবহৃত হয়, তখন ভাষার সম্পূর্ণতা আনয়ন করে, আর ইহা যখন ভাষার অভাবে ভাষার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তখন অনেক পরিমাণে ভাষার কার্য্য সম্পন্ন করে। মানুষের ভাষা সার্ব্বজনীন নহে, কিন্তু মানুষের ভাবের অভিব্যঞ্জক সার্ব্বজনিক। বাক্য মাত্রেরই মূলতঃ যাহাই হউক—বর্ত্তমান অর্থ কৃত্রিম এবং যাহারা এই কৃত্রিম অর্থ অবগত আছে, তাহাদেরই নিকট ভাষা কার্য্যকরী। আমার ভাষা তোমার নিকট অপরিচিত হইলে আমার ভাষা হইতে তোমার কোন ভাবেরই উদয় হইতে পারে না। কিন্তু সহজসিদ্ধ ভাব অভিব্যঞ্জকের অর্থ সকল সময়ে সকলেরই নিকট সমান। শিশু ভাষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কিন্তু শারীর অভিব্যঞ্জকের ভাব সহজেই বুঝিয়া লইতে পারে। তোমার ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশীকে কথায় "প্রিয়তম" সম্বোধন করিয়া তোমার ভাবভঙ্গিতে ঘৃণা বা ভয় প্রদর্শন কর, দেখিবে সে তোমার সংশ্রব হইতে দূরে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিবে। একটী চুম্বন, একটু হাঁসি সকল দেশেই ভালবাসার লক্ষণ বলিয়া পরিচিত, আবার দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ, মুষ্টিবদ্ধ হস্তোত্তোলন সকল সময়েই ক্রোধের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। শারীরিক অভিব্যঞ্জক সমূহ বিপন্নিবারণের সহায়ক। ক্ষুদ্র মার্জ্জার যখন একটী বৃহৎ বলবান কুকুরের সম্মুখীন হয়, তখন সে গর্জ্জন করিয়া লোম ফুলাইয়া তাহার শরীরের আয়তন বৃদ্ধি করে। মানুষও তাহার শত্রুর সমক্ষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগ সঙ্কুচিত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবার চেষ্টা করে। বিদ্যুৎস্ফুরণে আমরা নয়নদ্বয় আবদ্ধ করিয়া ফেলি, সর্পদর্শনে আমরা অতর্কিতে পশ্চাদ্পদ হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই ভাবব্যঞ্জকগুলি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তিক্তদ্রব্য আস্বাদন করিলে, মুখের বিকৃতি ঘটিবেই; হৃদয়ে আনন্দের লহরি ছুটিলে চোখের দীপ্তি ফুটিবেই। এই স্বভাবসিদ্ধ শারীরিক অভিব্যঞ্জকগুলি বংশপরম্পরানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং এখন উহাদের

কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং উহারা পূর্ব্বে যতটুকু কার্য্যকরী ছিল, এখন আর ততটা নাই।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বেদনা প্রধানতঃ সুখ এবং দুঃখ এবং ইহাদের শারীর অভিব্যঞ্জক বিবিধ।

সুখের শারীর অভিব্যঞ্জক।

মুখাবয়বের পেশি সম্বন্ধীয়।

অধর প্রান্তদ্বয়ের উন্নমন
নিম্ন নয়নস্থদের আকুঞ্চন
চক্ষুর সন্নিকটস্থ দেশের সঙ্কুঞ্চন
কপোলদেশের স্ফীতি
হাস্য
নয়ন নিমীলন
নেত্রদ্বয়ের আবেশ
দন্ত সংঘর্ষণ

শরীরকাণ্ড, গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশি সম্বন্ধীয়।

গ্রীবা-ভঙ্গিমা
স্কন্ধ দেশের উন্নমন
বিবিধ অঙ্গভঙ্গিমা
বাহুদ্বয়ের বিবিধ প্রকার সঞ্চালন
করতালি
পদদ্বয় বিস্ফারণ
পাদ প্রহার
বহুবিধ উল্লম্ফন
নৃত্য

রক্তকোষ সম্বন্ধীয়।

আরক্তিম গণ্ড
আলোহিত আনন
দেদীপ্যমান নয়ন
অশ্রুসিক্ত চক্ষু
প্রচুর লোলাস্রব
স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ মূত্রস্খলন

স্বর সম্বন্ধীয়।

দীর্ঘশ্বাস
চীৎকার
কূজন
গদ্গদস্বর
সঙ্গীত
মূকতা
অনভ্যস্ত তথাপি অনর্গল বাগ্মিতা
প্রলাপ বচন

স্তম্ভন সম্বন্ধীয়।

দর্শনপেশির শিথিলতা
টের দৃষ্টি
চিবুকের শিথিলতা
মূর্চ্ছা

দুঃখের অভিব্যঞ্জকগুলি অসংখ্য হইলেও তাহাদের কতকগুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

দুঃখের শারীর অভিব্যঞ্জক।

পেশির সঙ্কুঞ্চন সম্বন্ধীয়।

মুখাবয়বের শরীর কাণ্ডের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কেশমূল সম্বন্ধীয়	} পেশির সঙ্কুঞ্চন
আংশিক সম্পূর্ণ অবিরাম সবিরাম	} সংক্ষোভ

শিথিল পেশি সম্বন্ধীয়।

মুখের কতকগুলি পেশির শিথিলতা
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা
সকল প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গতির অভাব

শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাস স্তম্ভন
অনিচ্ছাপূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাস স্তম্ভন

সুদীর্ঘ-নিঃশ্বসন
সবিচ্ছেদ শ্বাস প্রশ্বাস
দীর্ঘনিঃশ্বাস
জৃম্ভন
ফোঁপান
গোঁ গোঁ শব্দ করা
চীৎকার

রক্তকোষ ও পরিপাক যন্ত্র সম্বন্ধীয়।

অশ্রু
লোলাস্রাবের অভাব
অতর্কিত মূত্রস্খলন
বমন
অতিসার
স্বেদস্রাব

রক্তপ্রবাহ সম্বন্ধীয়।

পাণ্ডুবর্ণ আনন
বিবর্ণ শরীর
আরক্তিম বদন

মন সম্বন্ধীয়।

অনভ্যস্ত হিতৈষিতা
ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর সহজ বশ
ধর্ম্ম ভাবের সহজ উদ্দীপন
মূকতা
অনভ্যস্ত অনর্গল বাগ্মিতা
প্রলাপ
ওতঃপ্রোতঃ চিন্তা

উপরি উক্ত বাহিক অভিব্যঞ্জকগুলি ক্ষণ-স্থায়ী। উহারা শরীরাবয়বের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখে না। কিন্তু একই অভিব্যঞ্জক বারংবার ব্যক্ত হইলে উহা শরীরের স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্নায়ুক্রিয়া এবং মানসক্রিয়ার সমন্বয়ে বেদনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কারণে আমার ভয়ের উদ্রেক হইল। ভয় হইতে আমার হৃৎপিণ্ডের এবং শ্বাস যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই পরিবর্ত্তনবার্ত্তা অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক কেন্দ্র যন্ত্রে নীত হইল এবং কেন্দ্র যন্ত্রের উত্তেজনা হেতু ভয়ের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাইল। যদি কেহ আমার ক্রোধের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহা হইলে ক্রোধাভিব্যঞ্জক শারীর পরিবর্ত্তন হেতু সে ক্রোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমাদের কোন বেদনাই অশরীরি নহে, এবং অপরাপর মানসিক বৃত্তি অপেক্ষা বেদনার অভিব্যঞ্জক স্পষ্ট এবং প্রকট। পৃথিবীর সকল বস্তুই কোন না কোন প্রকারে কোন না কোন বেদনার সৃষ্টি করিতেছে। বেদনার সংখ্যা এত অধিক যে ইহার হাত হইতে একবারে পরিত্রাণ লাভ করা মনুষ্য ক্ষমতারিক্ত বলিয়া বোধ হয়। তুমি সংসারের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তথাপি বেদনার সীমা লঙ্ঘন করিতে পার না। তুমি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছ, সংসারের মায়াজাল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছ—এই চিন্তা যখনই তোমার মনে উদয় হইবে, তখনই অহঙ্কার আসিয়া তোমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিবে। চিন্তা এবং বেদনা একই সূত্রে গ্রথিত।

শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।

(উপসংহার)

চরিত্রালোচন।

ব্লাভাস্কি-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, বাল্যাবধি তাঁহার কার্য্যে একটা অলোকিকত্ব, ভাবে একটা আত্যন্তিকতা এবং আচরণে একটা ঔৎকেন্দ্রিকতা বর্ত্তমান। তাহার শৈশবের ক্রীড়ার সঙ্গী

কতকগুলি অদৃশ্য জীব। লোকে দেখিত, তিনি গৃহের একটা অব্যবহার্য্য অন্ধকারাবৃত স্থানে একাকী বসিয়া আছেন, কিন্তু শুনিতে পাইত যেন তিনি সেই নিরালা স্থানে কাহাদের সঙ্গে সাগ্রহ কথোপকথনে নিযুক্ত। পরিণত বয়সে অদৃশ্য সহচরগণ তাঁহার বিস্ময়কর কার্য্যাবলিতে, শিক্ষায়, উপদেশে, গ্রন্থ প্রণয়নে নিত্য সহায়। এই অতীন্দ্রিয় ভাব তাঁহার জীবনের ভিত্তি বলিলেও হয়। ইহা মানবের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সাধারণ মানবের দুরধিগম্য। কাজেই কেহ কেহ তাঁহাকে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রহেলিকা' (Sphynx of the nineteenth century), কেহ কেহ তাঁহাকে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর দৈবজ্ঞা (Sibyl of the nineteenth century) ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। আবার অনেক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যাবলিতে চমকিত হইয়া তাঁহাকে "The Devil", "The horned and hooped one" অর্থাৎ শৃঙ্গখুরধারী বাইবেলোক্ত শয়তানের অবতার বলিয়া ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেন না, একালে সয়তান ছাড়া এ হেন অমানুষিক কাজ আর কাহার সাধ্য! তাঁহার জীবনের অতীন্দ্রিয়ত্ব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট অংশই দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যায়। যে স্থলে মনীষী অলকট, বেশান্ত প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যগণও তাঁহাকে এক দুর্ব্বোধ্য সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সে স্থলে আমাদের দ্বারা উহার ব্যাখ্যা-চেষ্টা সফল হইবার আশা করা অন্যায়। অতএব আমরা তাঁহাকে তাঁহার অলৌকিকতা বা অতীন্দ্রিয়তার ভিতর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব না। তবে তাঁহার জীবন-কথা বলিতে গেলে অলৌকিক ঘটনাবলি বাদ দিলে চলে না, তাই আমরা উহার কয়েকটী—সকল ঘটনা বলিবার স্থানাভাব হেতু কয়েকটী মাত্র—এই জীবনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

নীতিকার বলিয়াছেন, 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।' কিন্তু প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন আত্যন্তিকতার এক একখানি জ্বলন্ত ছবি। এই আত্যন্তিকতাই তাঁহাদিগকে সাধারণ মানব জাতির অনেক উর্দ্ধে দেবমানব পদে (Superman) স্থাপিত করিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই ব্লাভাস্কির নির্ভীক স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিত্ততারক্ষার্থ ঐকান্তিকতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। উহা যখন আত্যন্তিকতার (Extreme) মাত্রায় উঠিত, তখনি অপরিপক্ক বুদ্ধি বালিকায় স্বেচ্ছাচারিতা ও উন্মার্গগামিতার মূর্ত্তি ধারণ করিত। আবার এই আত্যন্তিকতা সংযুক্ত নির্ভীক স্বাধীন প্রকৃতিই যৌবনে তাঁহাকে ক্রমাগত দশবর্ষকাল ক্ষিপ্তের ন্যায় পৃথিবীর নানা দুর্গম স্থানে ছুটাইয়া আনিল। অরণ্য, কন্দর, মরু, পর্ব্বতের সমস্ত বাধা বিপত্তি তাহার আত্যন্তিকতার সম্মুখে উড়িয়া গেল! আবার প্রৌঢ়ে কর্ম্মক্ষেত্রে সেই আত্যন্তিকতা সহস্র ঝটিকার মধ্যেও তাঁহাকে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য হইতে তিল মাত্র বিচলিত হইতে দিল না। লাভে ক্ষতিতে, নিন্দায় প্রশংসায়, রোগে দারিদ্র্যে, সমভাবে শরীর পতন পর্য্যন্ত তিনি অভীষ্ট মন্ত্রের সাধন করিয়া গেলেন। অতুল বিভব সম্পদে যেমন তাঁহার নিস্পৃহতা, জীবনের ব্রত উদ্যাপনে—কঠোর তপস্যায় তেমনি তাঁহার আত্যন্তিকতা। আবার এক দিকে নির্য্যাতন, অন্য দিকে আত্মত্যাগ, এক দিকে দারিদ্র্য-ক্লেশ, অন্য দিকে মুক্ত-

হস্ততা, এক দিকে অতুল স্বাধীনতা, অন্য দিকে গুরুআজ্ঞাবশবর্ত্তিতা, এক দিকে যন্ত্রণা ভোগ, অন্য দিকে পরদুঃখ-মোচন চেষ্টা, এক দিকে তেজস্বিতার প্রজ্বলিত শিখা, অন্য দিকে সহৃদয়তার শীতল ধারা, তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা সম্পাদন করিতেছে।

অশনে বসনে, আকারে প্রকারে, আচারে ব্যবহারে, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে তিনি এক অপরূপ ঔৎকেন্দ্রিক (Eccentric) জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ঔৎকেন্দ্রিকতা তাঁহাকে জাতি-কুল-সমাজ-সংসৃষ্ট বিধিবন্ধনের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আর তিনি সতত নির্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সামাজিক বিধি নিষেধের উপেক্ষায় তাঁহাকে লোক-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহানুভবতা যেন আরও ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার হৃদয়ের গুণরাশী কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আমরা এস্থলে উহা, তাঁহার চরিত্রের অলৌকিকত্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মানবীয় অংশের ভিতর দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বস্তুতঃ, মাদাম ব্লাভাস্কির চরিত্র-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার মানসোদ্যান প্রকৃতির চারু হস্ত-রচিত যে মনোরম শোভা সম্ভারের ভাণ্ডার ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তিনি যে অতুল যোগ বিভূতিতে ভূষিত ছিলেন, তাহার কতক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই সকল বিভূতির অধিকারী বলিয়া যে তিনি জগতের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবার যোগ্য, ইহা আমরা মনে করি না। বিভূতি চমৎকারিত্বে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিতে পারে, এবং বিভূতির অধিকারীকে একটী দুর্জ্ঞেয় শক্তির আধার বলিয়া মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু লোকের প্রীতি শ্রদ্ধা লাভ করিবার মন্ত্র অন্য রূপ। পাণ্ডিত্যে, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, চিন্তার অপূর্ব্বত্বে, ধীশক্তির অসাধারণত্বে, বা কল্পনার মনোহারিত্বে কেহ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারেন, এবং লোকেও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিবে,সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার সহিত বোধ হয় তদপেক্ষাও দুর্ল্লভ, কতকগুলি হৃদয়ের গুণ সংযুক্ত না থাকিলে কেহ লোকের প্রীতিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়েও থাকি না, কিন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে গান করেন, আমি সেই খানেই থাকি।' অর্থাৎ, যেখানে প্রীতি, যেখানে অনুরাগময়ী ভক্তি, সেই স্থানই ভগবানের প্রিয়ভূমি। যাহা ভগবানকে বশীভূত করিবার মন্ত্র, তাহাই মানুষ বশীভূত করিবার মন্ত্র। এ মন্ত্র কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য সমষ্টি নহে, কিন্তু উহা উন্নত, উন্মুক্ত, উদার হৃদয়ের পবিত্র ধারা। উহার প্রকাশ বাক্যে নহে, কিন্তু কুসুম শোভাময় নন্দনের সুষমা লাঞ্ছিত দেবচরিত্রের বিকাশে। উহার পরিণতি শব্দে নহে, কিন্তু উচ্চ-নীচ-জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির সহিত একত্বানুভূতিতে। এই স্থানেই ব্লাভাস্কির বিশিষ্টতা। সমগ্র মানব জাতিকে কলহ বিবাদ ঘুচাইয়া এক ভ্রাতৃ ভাবে আবদ্ধ করিবার যে মহাধ্বনি তিনি তুলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ঐ মন্ত্র উদ্বোধিত। ব্লাভাস্কির হৃদয় মহত্ত্বের পুণ্যধারায় কিরূপ উচ্ছলিত ছিল, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ জনগণের উক্তিতেই প্রমাণিত। ইঁহাদেরই একজন লিখিয়াছেন;—

"তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে এতই মুগ্ধ হইতে হইত যে, তিনি ধর্ম্মনীতির কোন্ উচ্চসীমায় আমাদিগকে টানিয়া নিতেছেন, তাহাও ভুলিয়া যাইতাম। পর্ব্বতারোহণের সময় কখন কখন এরূপ হয় যে, সম্মুখস্থ স্তরে স্তরে সাজ্জিত পর্ব্বতমালা ও গভীর গহ্বরাদি বৃহৎ বস্তুগুলির দিকে মন না গিয়া সুন্দর পুষ্প. লতা, বৃক্ষ প্রভৃতির দিকেই মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে ; তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে এক উন্নত শীর্ষশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া চমক ভাঙ্গিয়া গেলে বুঝিতে পারি কত উচ্চে উঠিয়াছি। ঠিক সেইরূপ ব্লাভাস্কির হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে অনেক সময় আঁমরা তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানের উচ্চতা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম।"

ব্লাভাস্কির অসাধারণ মস্তিষ্কের পরিচয় জগৎ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ ছিল, ইহা অল্প লোকেরই বিদিত। যাঁহারা তাঁহার সহিত একত্র বাস করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্য্যের কতক পরিচয় লাভ করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়াছেন। বাহিরের লোক তাঁহার জীবনের এ অংশ কিছুই বুঝিতে পারে নাই, বরং অনেকে বিপরীত বুঝিয়াছে। কারণ তাঁহার স্পষ্টবাদিতা, কঠোর সত্যের আলোচনা, সাধারণের মতামতের প্রতি উপেক্ষা, বাহিরের লোক সমক্ষে যেন এ অংশ আবরণ করিয়া রাখিত।

ব্লাভাস্কি শারীরিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন না তাই বলিয়া তিনি কুৎসিৎ ছিলেন, এমন নয়। জীবনে যে তিনি নানা দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাঁহার মূর্ত্তিতে লক্ষিত হইত। দেখিলেই-বোধ হইত তিনি যেন কত কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া জীবনতরী চালাইয়া আসিয়াছেন। পরন্তু উহারই ভিতর হইতে একটা অদম্য শক্তিমত্তা ও সহৃদয়তার ভাব ফুটিয়া বাহির হইত। স্ত্রীজাতির অন্যান্য গুণের মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠব একটা বিচার্য্য বিষয় বটে। সে পক্ষে ব্লাভাস্কির দেহে লক্ষ্য করিবার বা আকৃষ্ট হইবার কিছু ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার স্থূল কায়, কতকটা চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট বৃহৎ মস্তক, তদুপরি অযত্নন্যস্ত কেশ ভার —রমণীজনোচিত কমনীয়তার বড় একটা পরিচায়ক ছিল না, ইহা তিনি নিজেও বিলক্ষণ বুঝিতেন। নিজের রূপ বর্ণনাচ্ছলে তিনি আমোদ করিয়া এক স্থানে লিখিয়াছেন:—

"An old woman, whether forty, fifty, sixty or ninety years old, it matters not ; an old woman whose Kalmuco-Bhudhisto-Tartaric features, even in youth, never made her appear pretty ; a woman, whose ungainly garb, uncouth manners, and masculine habits are enough to frighten any bustled and corseted young lady of fashionable society out of her wits."

অর্থাৎ, একটা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, বয়স চল্লিশ হউক, পঞ্চাশ হউক, ষাট হউক বা নব্বুই হউক, ক্ষতি নাই,—কিন্তু একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, যাহার মোঙ্গলিয়-বৌদ্ধ-তাতার ভাব মিশ্রণে গঠিত আকার প্রকার যৌবনেও যাহাকে কখন সুশ্রী দেখাইত না ; সেই স্ত্রীলোক যাহার সৌষ্ঠবহীন পরিচ্ছদ, চাষা ভূষার মত আচার ব্যবহার এবং পুরুষোচিত কার্য্য-কলাপ দেখিবা মাত্র সৌখীন সমাজের সুচারু বেশভূষিতা সভ্যা ভব্যা সুন্দরীর ভয়ে মূর্চ্ছা যান—"

নিজের নাসিকাটীকে তিনি আলুর সঙ্গে তুলনা করিতেন। এই আলু-নাসা (Potato nose) লইয়া তিনি প্রায়ই হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন। কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় নেত্র-দ্বয় অনেকের বর্ণনার বিষয় হইয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন,—"Those strange eyes", সেই অদ্ভুত নয়নদ্বয় ; কেহ লিখিয়াছেন,—"The largest and brightest blue eyes I have ever seen," এত বড় উজ্জ্বল নীল নয়ন আর দেখি নাই ; কেহ লিখিয়াছেন,—"It was her eyes that attracted me", তাঁহার চক্ষুই আমাকে আকর্ষণ করিল। একজন ভদ্রলোক নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—

"যে সকল সংস্কার দ্বারা তখন আমার ব্যক্তিত্ব গঠিত ছিল, প্রথম সাক্ষাৎ দিবসেই ব্লাভাস্কি একটী দৃষ্টি নিক্ষেপে সে সমস্ত সংস্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন। আমার এই যে পরিবর্ত্তন, পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়া নব-জীবন লাভ, যাহা তাঁহার একটী দৃষ্টি মাত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসাধিত হইল,—ইহা এক অদ্ভুত, অভিনব, দুর্ব্বোধ্য, অথচ একান্ত সত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার!"

বস্তুতঃ ব্লাভাস্কির আকৃতি প্রকৃতিতে স্ত্রীজনোচিত কান্ত কোমল ভাব অপেক্ষা পৌরুষ ভাবই অধিক লক্ষিত হইত। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, জ্যোতির্ম্ময় বিস্তৃত নীল নয়ন-যুগল, অন্ত-র্ভেদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন বলপূর্ব্বক লোকের সভয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। দৈহিক সৌন্দর্য্য গৌরবে শ্রেষ্ঠ না হইলেও তিনি যে অসামান্য মানসিক সম্পদে ভূষিত ছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহার যোগশক্তি, জ্ঞান গভীরতা দেখিয়া লোকেরা চকিত, স্তম্ভিত হইয়া থাকিত, অঙ্গসৌষ্ঠব লক্ষ্য করিবার তাহাদের অবসর কোথায়,—খুঁৎ ধরিবার শক্তি কোথায়?

পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের প্রতি তিনি কিছু-মাত্র মনোযোগ করিতেন না। রুচিপরতন্ত্র নর নারীগণের অঙ্গরাগ-বিলাস তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি সচরাচর একটা আলখাল্লার মত ঢোলা গাউন পরিয়া থাকিতেন, এবং গৃহাগত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি ঐরূপ পরিচ্ছদেই সাক্ষাৎ করিতেন। যখন বাহিরে যাইতেন বা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কাহারও বাটীতে বা কোন সামাজিক অনু-ষ্ঠানে উপস্থিত হইতেন, তখনও পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে কালোচিত বা কার্য্যোচিত পরিচ্ছদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না। চিরাচরিত প্রথার বিপরীত কার্য্য করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে সমাজে তাঁহার খুবই নিন্দা হইত, এবং সামাজিকেরা তাঁহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিত। কিন্তু তিনি উহাতে ভীত হইতেন না। তিনি চিরকাল সামা-জিক নিয়মশৃঙ্খল পদদলিত করিয়া চলিতেন। সামাজিক বুঝিত না যে, যিনি স্বীয় জন্মগত উচ্চ কুলমর্য্যাদা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন, বস্তুতঃ যিনি উচ্চ নীচ স্বজাতীয় বিজাতীয় সকলকে এক সাধারণ মিলন-ভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহার পক্ষে কোন সমাজ বিশেষের দাসত্ব করা কত অসম্ভব, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র সামাজিক রীতি কত অকিঞ্চিৎ-কর! সমালোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাঁহার পরোক্ষেই হইত। তাঁহার সমক্ষে কেহই উহা করিতে সাহসী হইত না। এক দিন

তিনি একটা অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিধিবিরুদ্ধ অপরূপ বেশ দেখিয়া নাট্যশালায় উপস্থিত এক ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া আপন বন্ধুগণের সঙ্গে একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সহসা একবার ব্লাভাস্কির অন্তস্থলভেদকারিণী দৃষ্টি সেই ব্যক্তির উপর পতিত হইবা মাত্র আর তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না!

ব্লাভাস্কির কথোপকথনের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তিনি কথা বার্ত্তায় লোককে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কথা কহিবার জন্যই বাক্যব্যয় করিতেন না! তাঁহার গল্পে, আলাপে, এমন কি, হাস্য-পরিহাসেও একটা উচ্চ লক্ষ্য থাকিত। তাঁহার নানা দিগ্দেশের অভিজ্ঞতা ও তথ্যপূর্ণ গল্পে শ্রোতা মাত্রেই আকৃষ্ট হইত। কি প্রাচীন কীর্ত্তিপূর্ণ ভারতভূমি, কি তিব্বতের তীর্থময় পার্ব্বত্য উপত্যকা, কি মিশরের পূর্ব্বতন সভ্যতা, কি পেরুর ইতিবৃত্ত, কি আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরের কুক্ষিগত একদা মহা প্রভাবশালী 'আট্লাণ্টিস্' (Atlantis) নামক মহাদেশ,—যে কোন বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে যখন তিনি উহার লুপ্ত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অজ্ঞাত পৌরাণিক চিত্রগুলি শ্রোতাগণের নিকট উপস্থিত করিতে থাকিতেন, তখন এই স্বল্পশিক্ষিতা রমণীর জ্ঞানের ও গবেষণার গভীরতা দেখিয়া কেহই বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারিতেন না। আবার গভীর বিষয়ের আলোচনার মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া সকলকে হাসাইতেন। তিনি নিজে বিলক্ষণ পরিহাস-পটু ছিলেন, এবং হাস্যরসপ্রিয় লোকের আদর করিতেন।

চিত্রকলায় ব্লাভাস্কির বেশ পারদর্শিতা ছিল। তিনি কখনও চিত্রবিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ কোথাও উল্লেখ নাই। কিন্তু তিনি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন। এক সময়ে তাঁহার অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রের স্বাভাবিকতা ও ভাবব্যঞ্জকতা দেখিয়া কর্ণেল অলকট বলিয়াছিলেন,—"আপনি এ গুলির সত্ত্ব বিক্রয় করুন, যথেষ্ট অর্থ পাইবেন।" ব্লাভাস্কি কেবল বলিলেন, "হাঁ।" কিন্তু এ ভাবটী বহু দিন স্থায়ী হয় নাই। চিত্রবিদ্যা চর্চ্চা বোধ হয় এইখানেই সমাপ্ত হয়।

আরও একটী ললিত কলায় ব্লাভাস্কির অসাধারণ অধিকার ছিল। পিয়নো (Piano) যন্ত্র তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে পারিতেন। তাঁহার সুগঠিত অঙ্গুলি স্পর্শে উক্ত যন্ত্র হইতে এরূপ চিত্তমুগ্ধকর সঙ্গীত স্রোত প্রবাহিত হইত যে, উহা শুনিলে মনে হইত যেন কোন গন্ধর্ব্ব ললিত তানে মর্ত্ত্যে স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্লাভাস্কি সাংসারিক কার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন। যাহাকে লোকে 'বিষয় বুদ্ধি' বলে, উহা তাঁহার কিরূপ প্রখর ছিল, অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহ-কার্য্যে তাঁহার যে মোটেই পটুতা ছিল না, ইহা একদা রন্ধন-বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়। পাচিকার উপর রাগ করিয়া একদিন তিনি নিজে ডিম সিদ্ধ করিতে গিয়া একেবারে ডিমগুলি জ্বলন্ত অগ্নির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহিণীপনার উত্তম প্রমাণ বটে!

ব্লাভাস্কি একেবারেই ঐন্দ্রিয়িক প্রভাব পরিশূন্য ছিলেন। ঐন্দ্রিয়িকতার ছায়া

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি এমনই দৈহিক প্রভাবের অতীত ছিলেন যে, তাঁহার সহযোগী, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক মহামতি অলকট বলিয়াছেন:—"Her every look, word and action proclaimed her sexlessness" অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিতে, কথায় এবং কার্য্যে লিঙ্গভাব-পরিশূন্যতার পরিচয় দিত। তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেই শুদ্ধচরিত্র লোকদিগের মনে এই ধারণা জন্মিত। অলকট অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"If there was a sexless being, it was she",—অর্থাৎ "স্ত্রীপুরুষ সংস্কার বর্জ্জিত যদি কেহ থাকে ত, তিনি ছিলেন।" তাঁহার শারীর-গঠনের মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীজনোচিত বিশিষ্টতার অভাব ছিল। শরীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, তাঁহার মানসিক উপাদানের মধ্যে স্ত্রীজনসুলভ ভাব যে অল্পই ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রমণী জাতির স্বাভাবিক সঙ্কোচ-ভীরুতা, কোমলতা, এবং দ্বেষহিংসামূলক ক্ষুদ্রতার ভাব তাঁহাতে মোটেই ছিল না। তিনি স্পষ্টবাদী, দৃঢ়-সংকল্প, কার্য্যতৎপর, অদম্য ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, আবার এদিকে সদাই মুক্তপ্রাণ, হাস্যপরিহাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বাহ্যিক স্ত্রী-শরীরের মধ্যে যে কি এক অপরূপ সত্ত্বা কার্য্য করিত, ইহা অনেকের বুদ্ধির অগম্য ছিল। বেসান্ত সত্যই বলিয়াছেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য বা বন্ধুগণও তাঁহার প্রকৃত সত্ত্বার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই। বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন স্ত্রীশরীরের ভিতরে কোন শক্তিমান পুরুষ কার্য্য করিতেছে। অলকটের নিকট লিখিত অনেক পত্রে মহাত্মারা ব্লাভাস্কিকে 'ভ্রাতা' ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার শরীরে কতকগুলি ক্ষত চিহ্ন ছিল। উহার একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রেরই যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ইটালির মুক্তিদাতা গেরিবল্ডি (Garibaldi) সহ তিনি মেণ্টেনার (Mentana) ভীষণ রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে আরও কতিপয় রমণীর সহিত তিনি স্বেচ্ছাসেনানী (Volunteer) দলভুক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার বাম হস্ত খড়্গাঘাতে দুই স্থানে ভগ্ন হয়। এবং তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধ ও চরণে দুইটী গোলা বিদ্ধ হয়। হৃদ্পিণ্ডের ঠিক নিম্নেই আর একটী অস্ত্রাঘাত-জনিত ক্ষত ছিল। এই ক্ষতটীর মুখ মধ্যে মধ্যে খুলিয়া যাইত। এই ক্ষতের মুখ খুলিয়া যাওয়ায় একবার তিনি কিরূপ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এই সকল কাহিনী তাঁহার পুরুষোচিত অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা ও সাহসের পরিচায়ক।

অলকট এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"তিনি জীবনে নানা দুঃখোদ্ভূত যে তিক্তাস্বাদ অনুভব করিয়াছেন, উহা তাঁহার বাহিরের সত্ত্বাকেই ক্লিষ্ট করিত। উহা তাঁহার প্রকৃত সত্ত্বা নহে। তিনি প্রায়ই আমাকে বলিতেন, তাঁহার প্রকৃত সত্ত্বার কার্য্যকলাপ গভীর নিশীথে সম্পন্ন হইত। তখন তাঁহার দেহ নিদ্রাভিভূত থাকিত বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুমণ্ডলীর পাদমূলে গিয়া উপস্থিত হইতেন! আমি ইহা বিশ্বাস করি। সর্ব্বদাই এক সঙ্গে কার্য্য করা হেতু আমি তাঁহার শরীরের নানা পরিবর্ত্তন দেখিতাম। আমি টেবিলের এক দিকে, আর তিনি অন্য দিকে উপবিষ্ট, এমতাবস্থায় কখন কখন দেখিতাম, তিনি

যেন এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আবার কিছুক্ষণ পরে শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত দেহটী অন্ধকারময় গৃহের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। আবার তিনি ফিরিয়া আসিলে যেন সমস্ত আলোকিত হইয়া উঠিত! যাঁহারা এ পরিবর্ত্তন দেখেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না কেন ধ্যানযোগীরা স্থূল দেহটীকে একটা খোসা মাত্র বলিয়া থাকেন।...তাঁহার বাহ্যসত্তার অনেক কার্য্য হয়ত আমাদের নিকট ভাল না লাগিতে পারে, এমন কি, অন্যায় বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সেই রহস্যময় অপর সত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ অর্পণ করিতেই হইত। আমাদিগকে একত্র থাকিতে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমি হয়ত তাঁহার সকল বিষয়ই বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, একাদিক্রমে ১৭ বৎসর কাল প্রাত্যহিক কার্য্যবশতঃ ঘনিষ্টতা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমার নিকট একটী জটিল রহস্যরূপেই প্রতীয়মান হইতেন। অনেক সময় মনে করিতাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে সেই রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার আন্তর সত্ত্বার গভীরতম প্রদেশের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত। আমি ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, প্রকৃত পক্ষে তিনি কে? ইত্যাদি।" ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

অনুচ্চজাতি ও স্বায়ত্ত-শাসন।

(৩০শে ফাল্গুন—হোমরুল-লিগ-হলে পঠিত)

বাঙ্গালার তথা-কথিত অনুচ্চ শ্রেণীর নাকি ভয় হইয়াছে যে, এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা অন্যান্য লোকের পেটের অন্ন ও পিঠের বস্ত্র, ক্ষেতের ধান ও পুকুরের মাছ কাড়িয়া লইবে এবং আইনের বলে তাহাদিগকে চিরকাল শিক্ষা-হীন ও সম্ভ্রম-হীন করিয়া রাখিবে। কেন না, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর চিরশত্রু।

শুধু আত্ম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগেরই স্বায়ত্ত-শাসনের বিরোধী হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কেন না, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া মাত্রই নিম্ন শ্রেণী সহসা বহুস্তর উপরে উঠিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, ভোটের জন্য নেতাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে হইবে, তাহাদিগকে খোসামোদ করিতে ও ঘুষ দিতে হইবে। যে দিন স্বায়ত্ত-শাসন ঘোষিত হইবে, সেই দিন সকলের লোলুপ দৃষ্টি মেজরিটীর দিকে পতিত হইবে, সুতরাং সেই দিনই তাহারা যেরূপ আদর ও মর্য্যাদা পাইবে, অন্য কোনও উপায়ে সহস্র বৎসরেও তাহা ঘটিত না। বাঙ্গালার হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ জন অনুচ্চ শ্রেণীর লোক, সুতরাং তাহারা যে শ্রেণীরই হউক, এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন অর্থে তাহাদেরই স্বায়ত্ত-শাসন বুঝাইবে।

কতকগুলি লোক, মূর্খ লোকদিগকে বুঝাইতেছে যে, স্বায়ত্ত-শাসন অর্থ এই যে,

ইংরাজের বদলে ব্রাহ্মণগণ আইন কানুন প্রস্তুত করিয়া নিজেরা দেশ শাসন করিবে এবং নিম্ন জাতির প্রতি অত্যাচার করিবে। ইংরাজ, যেমন ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে সমান ভাবে দেখে, ব্রাহ্মণেরা সেরূপ দেখিবে না, তাহারা চিরকালই নিম্ন শ্রেণীকে দাস করিয়া রাখিবে।

যদি এই কথাই সত্য হইত, তবে সর্ব্বাপেক্ষা কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি জাতির শঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল। কায়স্থের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, বৈদ্যদিগের ত একান্তই ভীত হওয়া উচিত, কেন না তাঁহারা সংখ্যায় একান্তই অল্প, ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ বৈদ্যগণকে মাঝখানে ফেলিয়া চাপিয়া মারিবে। কিন্তু বৈদ্যগণ অধিকাংশই সুশিক্ষিত, এরূপ চিন্তায় তাঁহারা বিচলিত হইবেন কেন? বস্তুতঃ যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে, স্বায়ত্ত-শাসন জিনিসটা যে কি, সে কথা তাহাদিগকে মোটেই বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই; তাহারা একটা ভয়ানক প্রবঞ্চনার মধ্যে পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হইলে, প্রতিনিধিরা এই বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কিরূপে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবেন, এ কথা ত ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান সমান শক্তি। মুসলমানেরাও কি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকে নিপীড়িত করার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে? ব্যস্ত হইলেই বা নিপীড়ন করিতে পারিবে কেন? স্বায়ত্ত-শাসনে যাহাদের জনবল অধিক, তাহারাই জয়যুক্ত হইবে।

ভারতে নিম্ন শ্রেণীর উন্নতির জন্য যদি কোনও উপায় থাকে, সে উপায় একমাত্র স্বায়ত্তশাসন। স্বায়ত্তশাসিত দেশে জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতে কাহারও শক্তি নাই। বিলাতের হাউস অব্ লর্ডস্ ও হাউস অব কমন্সের অবস্থা দেখিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়।

মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সভ্যরা ত একান্তই অনাহারী, সেই অনাহারী কমিশনারী চাকুরীর জন্য হোম্রা চোম্রা বাবুদিগকে কেমন করিয়া গরীব লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া খোসামোদ করিতে হয়, তাহা কাহারও অগোচর নয়। এখন যে সকল লোক করযোড়ে নমস্কার করিলে বড় লোকেরা প্রতি-নমস্কার করেন না, দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে নমস্কারের জন্য কাহার হাত আগে উঠিবে, তাহার ঠিক নাই।

তৃতীয়তঃ—স্বায়ত্তশাসনে দেশে ব্যয়-ভার অনেক কমিবে, তাহাতে নানা প্রকারের করভার লঘু হইবে। কেহ কি বলিতে চাহেন যে, নিম্নশ্রেণীর করভার কমিবে না, আরও বাড়িবে?

চতুর্থতঃ—যাঁহারা স্বায়ত্তশাসন চাহেন, দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তার এবং বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা তাঁদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে কি নিম্নশ্রেণীর অপকার হইবে? তাহাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখার কি ইহাই প্রধান ফন্দী?

পঞ্চমতঃ—স্বায়ত্তশাসনে জমীদারের অত্যাচার ও পুলিশের অত্যাচার প্রশমিত হইবে। ইহাতে কি নিম্নশ্রেণীর অনিষ্ট হইবে?

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বদেশীয় কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিও এই কথা বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর

হিন্দুগণ নিম্ন শ্রেণীকে তুলিয়া না লইবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে সামাজিক সম্ভ্রম না দিবেন, ততদিন আমরা স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য হইতে পারিব না। ইহা শুনিলে মনে হয়, স্বায়ত্তশাসনটা যেন শুধু উচ্চশ্রেণীর জন্যই চাওয়া হইয়াছে, হিন্দু সমাজের শতকরা ৭৫ জন লোক ইহার কিছুই উপকারিতা লাভ করিবে না। এরূপ উদ্ভট চিন্তা তাঁহারা কেন করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা প্রত্যেক দেশেই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উন্নত হয়, এ নিয়ম অনিবার্য্য। তাঁহারাও কি মনে করিয়াছেন যে, স্বায়ত্ত-শাসন অর্থ ব্রাহ্মণশাসন? বসন্তাগমে সমস্ত প্রকৃতি যেমন নূতন জীবন লাভ করে, বৃষ্টি ধারায় শস্য বীজ যেমন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, যে বস্তু পাইলে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরা সেইরূপ স্ফূর্ত্তি ও শক্তি লাভ করিবে বিশেষতঃ জনসাধারণের মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হইবে, সে বস্তুকে তাহাদের অনিষ্টের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে যাহা সহজে আসে, আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ দেশের অসাধারণ ব্যক্তিগণের মনে তাহা উদিত হয় নাই। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস যাহার সাক্ষী, আমাদের বিজ্ঞগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। যে বস্তুটী জন-সাধারণের সঞ্জীবনী মহৌষধ, সেইটীকেই অনিষ্টকর বলিতেছেন। তাঁহাদের এই ধ্বনির প্রতিধ্বনিত করিয়া বিপক্ষগণ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা এই বাজে কথাটাকে লুফিয়া লইয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য না হইলে এরূপ সঙ্কট সময়ে বিজ্ঞগণের এরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিবে কেন? বস্তুতঃ এ দেশের অনুচ্চ জাতিদিগের প্রতি যাহাদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে, তাহাদের প্রাণপণে এ দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আজকাল নিষ্পীড়িত জাতি বলিয়া একটা কথার সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশে যেন প্রবল পরাক্রান্ত পোপের অস্তিত্ব আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া কতকগুলি যুবক বালখিল্য মার্টিন লুথার সাজিয়া পুরোহিতের অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, ইহা যেমন আকাশের সঙ্গে লড়াই, নিষ্পীড়িত জাতির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধটাও অনেক পরিমাণে সেইরূপ। বিষয়টা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল।

(ক) বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতিরই অন্য জাতিকে শারীরিক নিপীড়ন করার অধিকার বা শক্তি নাই।

(খ) কোনও শ্রেণীর বৈষয়িক উন্নতির প্রতিরোধ করিতে কাহারও অধিকার বা শক্তি নাই।

(গ) কোনও শ্রেণীর লোকের বিদ্যা-শিক্ষার বাধা জন্মাইতে কাহারও অধিকার বা শক্তি নাই।

যদি বল এগুলি ইংরাজ রাজত্বের গুণ, আমি বলি, গুণ যাহারই হউক, এই সকল যে নাই, সে বিষয়ের সন্দেহ নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও যে এই সকল বস্তুর পুনরাবির্ভাব হইবে না, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ইংরাজ রাজত্বে যে দোষ নাই, স্বায়ত্তশাসনে তাহা থাকিতেই পারে না। বরঞ্চ এখনও জেলখানায় শ্রেণী বিশেষের কয়েদীকে মেথরের কাজ করিতে বাধ্য করা হয়, স্বায়ত্তশাসনে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দু সমাজের দুই রূপ বন্ধন আছে। ভোজ্যান্নতা ও জলচল। কোনও শ্রেণীর

হিন্দুই অন্য শ্রেণীর হিন্দুর পক্কান্ন ভক্ষণ করে না, একমাত্র ব্রাহ্মণের পক্কান্ন বাংলাদেশের সকল শ্রেণীই খায়; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে ব্রাহ্মণের পক্কান্নও অনেক হিন্দু খায় না! তুমি বৈদ্য কি কায়স্থ জমিদার, তোমার পাঁচ টাকা বেতনের রান্নাকরার ব্রাহ্মণের অন্ন যদি তোমার শিশু পুত্রটী ছোঁয়, তবেই তাহা তোমার পাচকের অখাদ্য হইল। এজন্য কি বৈদ্য কায়স্থ নিপীড়িত জাতি হইল? কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা কি নিপীড়িত জাতি? ইংরাজ কি নিপীড়িত জাতি? বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দুরা ইহাদের পক্কান্ন খায় না বলিয়া কি ইহারা নিপীড়িত জাতি? হিন্দু সমাজের মধ্যে যাহাদের পরস্পরের ভোজ্যান্নতা নাই, তাহারা কি পরস্পরের নিপীড়িত জাতি?

এখন জলচলের কথা! উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, সুবর্ণ বণিকের স্পৃষ্ট জল খায় না, তাই বলে কলিকাতার সুবর্ণ বণিকগণ কি নিপীড়িত জাতি? ঢাকার সাহা মহাশয়রা কি নিপীড়িত জাতি? সুতরাং নিপীড়িত কথাটা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে চলিল। প্রচণ্ড দৈত্য বলিয়া যাহাকে ধারণা হইয়াছিল, দেখা গেল, সেটা তালপাতার সেপাহী মাত্র।

যাঁহাদের জলচল নাই, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান ও ধনবান, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সম্মান পাইয়া থাকেন। বিদ্বান ও ধনী ইংরাজগণ হিন্দুর নিকট যেরূপ সামাজিক সম্মান পান, ইঁহারাও সেইরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন। তথাপি এই সকল শ্রেণীর জলচল না থাকায় ইঁহারা ক্ষুণ্ণ আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহারা কোন্ যুগে কি অপ-রাধে সামাজিক সাজা পাইয়াছেন, তাহা জানা যায় না; কিন্তু এখন যদি তাঁহারা সামাজিক সম্মান পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সমাজের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিয়া ইহা লাভ করিতে হইবে, এই সম্ভ্রম হিন্দু ভিন্ন অন্যের দেওয়ার অধিকার নাই। বিদেশী রাজা এ সম্মান দিতে পারেন না, সুতরাং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যাহারা ইহাদিগকে উত্তেজিত করে, তাহারা ইহাদের শত্রুতা করিতেছে; হিন্দু সমাজকে গালি দিয়া হিন্দুর চিত্তাকর্ষণ করার চেষ্টা বৃথা।

কলিকাতার ঠাকুর বাবুদের অপেক্ষা ধনে মানে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ পরিবার বাংলা দেশে কয়টী আছে? তাঁহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সমাজ বদলান নাই। আদি সমাজ "হিন্দু" নাম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। ঠাকুর বংশের অন্যান্য ধনী মানী জ্ঞানী পরিবার সমস্তই হিন্দুধর্ম্মে এবং হিন্দু সমাজে আছেন। তাঁরা যদি মুসলমান কি খ্রীষ্টান হইতেন, তবে এতদিনে তাঁহাদের জাতি ও বংশ জন-সমুদ্রে বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলাইয়া যাইত, বংশ-গত অস্তিত্ব থাকিত না। পূর্ব্ব পুরুষদিগের সঙ্গে এইরূপে সম্পর্ক ছেদন করার মতন নির্ম্মমভাব সকলের জন্মে না। ব্রাহ্মসমাজ নামতঃ জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বংশগত উপাধি রক্ষা করিবার ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে নষ্ট হয় নাই। উহা দগ্ধ বীজ হয় নাই, উহা হইতে পুনরায় অঙ্কুর উদ্‌গম হইতে পারে।

ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কি কারণে মুসলমান হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যদি সমাজের অত্যাচারে ইহারা মুসলমান হইয়া থাকে, তবে এখন হয় না কেন? বিগত ৩।৪ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু

সমাজ তাহাদের জন্ম অত্যুদার হইয়াছে কি? গত ৪০ বৎসরে বাঙ্গালা দেশে কয়টী হিন্দু মুসলমান হইয়াছে? বরঞ্চ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মাঝে মাঝে মুসলমান হইতেছে, নিম্ন শ্রেণীর লোক মুসলমান হইতেছে কি? যে সুযোগ্য স্বদেশী প্রচারককে সকলে দীন মহম্মদ বলিয়া জানিতেন, তাঁহার হিন্দু নাম ছিল মনোরঞ্জন গাঙ্গুলি, তিনি উচ্চ শ্রেণীর নৈকস্য কুলীন ছিলেন, উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার দুইটী বিবাহ ছিল। তিনি একজন বিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়াই মুসলমান জীবন পালন করিয়াছেন। সামাজিক অত্যাচারে পড়িয়া তিনি মুসলমান হন নাই। এরূপ আরও অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হইয়াছেন, ইহাদের সঙ্গে সামাজিক নির্য্যাতনের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তবে নানা আচার ভ্রষ্টতা ও "বাদ পড়ায়" অনেক হিন্দু মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আর মুসলমান শাসন কালে অনেক প্রজা যে জমিদারের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য এবং নানাবিধ সুবিধার জন্য মুসলমান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান হইয়া তাহারা মৌলবীদিগের প্রতাপে ও সাহায্যে অনেক সময় প্রবল হইয়া উঠায় অনেক লোক তাহাদের দেখাদেখি মুসলমান হইয়া থাকিবে; এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সুকঠিন। তবে সমাজের অত্যাচারে তাহারা যে মুসলমান হইয়াছে, এ কথার প্রমাণ নাই। সেরূপ হইলে এখনও সেইরূপ হইতেই থাকিত।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ফরিদপুরের ও বরিশালের অনেক নমঃশূদ্র খ্রীষ্টান হইয়াছে, অন্য কোথাও সেরূপ হয় নাই। আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, যাঁহারা ইহাদের বিষয় কিছুই জানেন না, কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারাই বেশী জোরে ইহাদের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। ঘটনাক্রমে বরিশাল ও ফরিদপুরের অন্তর্গত দেশীয় খ্রীষ্টানমণ্ডলীর সঙ্গে আমাকে বিশেষ ভাবে মিলিতে মিশিতে হইয়াছিল, আমি তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলাম। যখন অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ জানিলাম, তখন বিস্মিত হইলাম যে, আমাদের আনুমানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার পার্থক্য কিরূপ বিচিত্র।

খ্রীষ্টান হইলে লোকেরা কি কি সুবিধা পায়, তাহা অনেকেই জানেন না।

(ক) বাঙ্গালা দেশের অনেক জেলায় নমঃশূদ্রগণকে কারাগারে মেথরের কাজ করিতে হয়, কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে তাহাদিগকে সে কাজ করিতে হয় না।

নমঃশূদ্র জাতি বাঙ্গালার বীরজাতি। দাঙ্গা হাঙ্গামায় ইহারাই লাঠিয়াল সৈন্য ছিল, কাজেই ইহাদিগকে জেল ভোগ করিতে হইত, এবং জেলে মেথরের কাজ করিতে হইত। বস্তুতঃ বাঙ্গালাদেশের জেল সমূহে নমঃশূদ্র কয়েদী অত্যধিক। ইহারা মেথরের কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করে। পাদ্রী সাহেবগণ বুঝাইলেন, খ্রীষ্টান হইলে তাহাদিগকে এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে হইবে না। যাহারা খ্রীষ্টান হইল, পাদ্রীদিগের চেষ্টায় তাহারা এই কার্য্য হইতে পরিত্রাণ পাইল, এবং হিন্দু নমঃশূদ্রদিগকে "জেলের মেথর" বলিয়া গালি দিতে লাগিল। এজন্য অনেকে খ্রীষ্টান হইল। অন্যান্য অস্পৃশ্য জল নিম্নজাতি অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে নমঃশূদ্র-খ্রীষ্টান এত বেশী কেন? আর

বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় ঐ নিয়মটী দৃঢ় থাকায় বাঙ্গালা দেশে এই উভয় জেলায়ই খ্রীষ্টানের সংখ্যা অত্যধিক, ইহারই বা উত্তর কি?

(খ) জমিদারগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিত এবং নানা কার্য্যে বে-আইনীরূপে চাঁদা লইত ও বেগার খাটাইত, যাহারা খ্রীষ্টান হইবে, তাহারা এই সকল অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবে, এই প্রলোভন পাইয়া অনেকে খ্রীষ্টান হইল, এবং সত্যই অব্যাহতি পাইল। শুধু জমিদারের নহে, চাকর ও নীলকরের অত্যাচার হইতেও অব্যাহতি পাইল।

খ্রীষ্টানগণ শুধু যে জমিদারের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইল, তাহা নহে, জমীদারের প্রতি অত্যাচার করিয়াও তাহারা অব্যাহতি পাইতে লাগিল।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিব। বরিশালের কোন প্রসিদ্ধ গ্রামের "দাস" বংশীয় বৈদ্যগণ সে দেশের সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। খ্রীষ্টান প্রজাগণ দিবা দ্বিপ্রহরে দাসের বাড়ী ও বাজার লুণ্ঠন করিয়াছিল। এরূপ ঘটনায় আসামীদের অধিকাংশেরই সাজা হওয়া অনিবার্য্য ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেবগণ অর্থ দ্বারা ও নানা প্রকারে সাহায্য করিলেন, ফলে আসামীগণ সাজা পাইল না। এই ঘটনার পরে সে দেশের লোকেরা দলে দলে খ্রীষ্টান হইতে লাগিল। খ্রীষ্টানেরা জমিদারের ভয় রাখে না, পুলিশের ভয় রাখে না, পাদ্রী সাহেবরা সর্ব্ব ব্যাপারে তাহাদের রক্ষক।

(গ) খ্রীষ্টানরা দুর্ভিক্ষে ও দুঃসময়ে মিশন ফণ্ড হইতে সাহায্য পায়। তাহাদের বালক বালিকাগণ লেখা পড়ার সাহায্য পায়, চাকুরী পায়, ইহাদের মধ্যে যাহাদের একটু শক্তি আছে, তাহারা কেটিকেষ্ট অর্থাৎ গ্রাম্য প্রচারক হয়। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ এই যে, সাহেবদের কাছে ইহারা আবদার করিতে পায়।

(ঘ) বাঙ্গালা দেশের যে কোন একটা মিশনের রিপোর্ট দেখিলে প্রমাণিত হইবে যে, প্রত্যেক নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানের মাথা প্রতি হাজার টাকার উপর খরচ পড়ে। এত চেষ্টায়ও এখন অতি অল্প লোকই খ্রীষ্টান হয়। মিশন ফণ্ড গুলিতে এত অধিক টাকা সঞ্চিত আছে যে, পাদ্রীগণ তাহা কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। এই সময় মিশন ফণ্ডের কতক টাকা যুদ্ধ ফণ্ডে দিলে সাম্রাজ্যের উপকার হইতে পারে, কিন্তু এটা আমার অনধিকার চর্চ্চা। আমি বলি, নানা কারণে খ্রীষ্টান হওয়া কমিতেছে, হিন্দু সমাজের অবহেলা খ্রীষ্টান হওয়ার কারণ হইলে খ্রীষ্টান হওয়ার পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, কেন না দেশের লোকের মর্য্যাদা জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা শুনিলে অবাক হইবেন যে, দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে কিরূপ জাতিভেদ গজাইয়া উঠিতেছে। নারিকেলবাড়ী নামে একটী গ্রাম আছে, সে গ্রামের সকলেই স্বাধীন খ্রীষ্টান। যাহারা মিশন ফণ্ড হইতে চার্চ্চের ব্যয় গ্রহণ করে না, নিজেরা চালায়, তাহারা স্বাধীন খ্রীষ্টান। উক্ত গ্রামে প্রায় ষাট ঘর খ্রীষ্টানের বাস। একদিন রাত্রিযোগে সমগ্র গ্রামের প্রতিনিধি হইয়া চারিজন খ্রীষ্টান আমার নিকট উপস্থিত হইল, তাহাদের গ্রামবাসী সমস্ত খ্রীষ্টান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। একজন প্রচারকের মুখের কাছে কি দুরন্ত প্রলোভন! আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমারা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়াছ?" তাহারা বলিল, জানে নাই, আমাকে লইয়া গিয়া সকল জানিবে।

আমি। তবে ব্রাহ্ম হইতে চাহিতেছ কেন?

উত্তর। একটু "বেত্ত" (কারণ) আছে।

আমি। কি বেত্ত?

উত্তর। আমরা রমন-কার্ত্তিক (Roman Catholic)দিগের ভাত খাইয়াছি, এই জন্য প্রচারকগণ আমাদিগকে একঘরিয়া করিয়াছে, বলে যে জরিমানা দিয়া 'প্রাচিত্ত' না করিলে আমাদিগকে একঘরিয়া করিয়াই রাখিবে। আমরা ভাবিয়াছি যে, জরিমানা দিয়া উহাদের দলে না গিয়া ব্রাহ্মদলেই যাইব।

সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, ইহারা দলাদলি করিয়া ব্রাহ্ম হইতে চাহিতেছে, কিন্তু আমরা দুর্ভিক্ষে ইহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব না, সুতরাং ইহারা বড়ই অসুবিধায় পড়িবে, তাই বুঝাইয়া দিয়া ইহাদিগকে বিদায় করিলাম।

একজন মৃত্যু-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ খ্রীষ্টান আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। আমি তাহার কাছে বসিলে সে সজল নয়নে বলিল যে, আমি যদি তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করি, তবে সে সুখী হবে। আরও বলিল যে, একজন রমন-কার্ত্তিক (Roman Catholic) পাদ্রী সাহেবকে তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে বলায় এবং তিনি তাহার শিয়রে বসিয়া প্রার্থনা করায় তাহার আপন মণ্ডলীর ডুবিত (Baptised) খ্রীষ্টানগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহার জন্য প্রার্থনা করিবে না, তাই সে আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিতেছে।

বাগধা গ্রামের ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ আলোক খ্রীষ্টান ও আস্কর গ্রামের প্রৌঢ় কালীচরণ খ্রীষ্টান আমার কাছে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। আমি তাহাদিগকে "রায়" উপাধি দিয়াছিলাম। এই নূতন রায়দিগকে খ্রীষ্টানরা একঘরে করিল, তাহাদের জল বন্ধ, হুকো বন্ধ, ভোজ্যান্নতা বন্ধের ত কথাই নাই, অধিকন্তু কোনও খ্রীষ্টানই তাহাদের খেতের ধান কাটিবে না, ঘর ছাইবে না, কাট কাটিবে না এবং মরিলে তাহাদিগকে কবর দিবে না, এই সকল প্রতিজ্ঞা করিল। আমি বরিশালে আসিয়া খ্রীষ্টানদিগের এই সকল কথা একজন ইংরাজ পাদ্রী ও একজন বাঙ্গালী পাদ্রীকে বলিলাম, তাঁহারা উভয় অকপট ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। আমাকে ইংরাজ পাদ্রী মহাশয় বলিলেন যে, এরূপ বন্ধন না থাকিলে মণ্ডলী রক্ষা করা যায় না। আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি অশিক্ষিত খ্রীষ্টানগণ নিজ বুদ্ধিতে দলাদলি করিতেছে, পাদ্রী-দিগকে বলিলেই এই অত্যাচার নিবারিত হইবে, কিন্তু উত্তর শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। মণ্ডলী রক্ষার জন্য একঘরে করিতেই হইবে। যদিও কথাটা শুনিতে বিশ্রী, কিন্তু সমাজ রক্ষার সমস্যাও একান্ত সুকঠিন।

এই সকল ঘটনা দ্বারা আমি শুধু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি, বাঙ্গালা দেশের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে কিরূপে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং মণ্ডলী রক্ষার জন্য কিরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, নিম্ন শ্রেণীকে তাচ্ছিল্য করা একান্ত দূষণীয় কার্য্য বটে, কিন্তু সেই

তাচ্ছিল্য তাহাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণের প্রকৃষ্ট কারণ নহে।

আর জেলখানায় যে নমঃশূদ্রদিগের দ্বারা মেথরের কাজ করান হয়, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা ডাক্তার সাহেব-দিগের দুরন্ত অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ, হিন্দু কখনও নমঃশূদ্রের দ্বারা মেথরের কাজ করিতে পারে না।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বরিশালের "সহযোগী" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলাম, তখন এই বিষয় লইয়া কাগজে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলাম, জেলের সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট ডাক্তার সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার জেলের নিন্দা করিয়াছি, এই কথা লিখিয়া তিনি "সহযোগী" ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন, এমন নিন্দাকারী কাগজের তিনি গ্রাহক থাকিবেন না! আমি তাঁহাকে এই কার্য্যের বিশেষ দোষ দেখাইয়া পত্র লিখিলাম, এবং লিখিলাম যে, হিন্দু সমাজের সামাজতত্ত্ব না জানার জন্যই তিনি এই কার্য্যের দোষ বুঝিতে পারিতেছেন না, আমি তাহা দেখাইয়া দিয়া তাঁহার উপকারই করিয়াছি। আমার পত্র পাইয়া তিনি পত্র-বাহকের সঙ্গে সহযোগীর অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

কাব্য-পরিচয়।

প্রকৃতির লীলার বৈচিত্র্য ধরিয়া আমরা ঋতু বিভাগ করিয়াছি। প্রতি ঋতু তাহার সৌন্দর্য্যের বিশেষত্বে মানুষকে নূতন নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে; ঋতুলীলা কাব্যে সেই সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য ও ভাব-বৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির উৎসবে মাতিয়া মানুষ সেকালে যে উৎসব করিয়াছে, একালে যে উৎসব করিতেছে, এই দুই চিত্রই কবি রসময়ের ঋতুলীলা কাব্যে দেখিতে পাই। একালের চিত্রগুলি, কাব্যখানির পূর্ব্বভাগে, কবির নিজের তুলিতে আঁকা মৌলিক ছবি; আর সেকালের চিত্রগুলি, কাব্যখানির উত্তর-ভাগে মহাকবি কালিদাসের তুলিতে আঁকা ছবির প্রতিলিপি—"ঋতুসংহারে"র পদ্যানুবাদ—ষড়ঋতু উজ্জয়িনীর কবি দেড়-হাজার বছর আগেকার সমাজের পটে যে ছবি আঁকিয়াছেন, এখনকার বাঙ্গালাদেশের পটে সে ছবিটীর অবিকল প্রতিলিপি আঁকা চলে না; প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তবে ঐ রূপ-উপভোগে, সেকালে একালে রুচির প্রভেদ ঘটিয়াছে। সেই রসের বিচার করিয়াই কবি রসময় সেকালের সকল ছবির সকল অংশেরই অবিকল প্রতি-লিপি আঁকেন নাই; কিন্তু, যাহা চিরদিনের উপভোগ্য, তাহা একালের কবির নূতন পটে অতি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়াছে। প্রাচীন অক্ষর-ছন্দে সাজান সংস্কৃত ভাষার পোষাক খুলিয়া ফেলিলে প্রাচীনতার সৌন্দর্য্য বজায় রাখা কঠিন হয়; কিন্তু, কৌশলী কবির মাত্রা-ছন্দে ও মধুর শব্দ-যোজনায় প্রাচীনতার মাধুরী নষ্ট হইতে পারে নাই। মাত্রাছন্দের তাল ঠিক্ রাখিয়া পড়িতে না পারিলে কবিতা-গুলির সৌন্দর্য্য, ও অনুবাদের মাহাত্ম্য অনুভূত হইবে না।

ঋতুর গণনায় বসন্তই প্রথম ঋতু; আর এই বসন্ত হইল মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ) লইয়া। কবি কালিদাস যখন গ্রীষ্মের বর্ণনায় শুচি বা আষাঢ় মাসের কথা বলিয়াছেন, তখন, যে গ্রীষ্মঋতু, শুক্র (জ্যৈষ্ঠ) ও শুচি (আষাঢ়) লইয়া, তাহাকে নিশ্চয়ই তাঁহার কাব্যের প্রথম সর্গে স্থান দেন নাই; কিন্তু সৌরমাসের হিসাবে বৈশাখ প্রথম মাস বলিয়া, ও বৈশাখে খুব গরম পড়ে বলিয়া সকল ছাপা 'ঋতুসংহারে'ই প্রথম সর্গে গ্রীষ্মের বর্ণনা পাই। চৈত্র মাস যে 'সংবৎ সংবৎসরের' প্রথম মাস, তাহা পাঠকেরা নিশ্চয়ই জানেন। ঋতুর পর্য্যায়ের হিসাবে

এই কাব্যে বসন্তকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে,—ভালই হইয়াছে।

ঋতুর লীলায় ও উৎসবে আমাদের বাঙ্গালা দেশের একটা বিশেষত্ব আছে; জামাইষষ্ঠী, ভাইফোঁটা ও পৌষপার্ব্বণ প্রভৃতি এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী জাতির বিশেষ উৎসব। বাঙ্গালার খাঁটী সমাজ-পটে এই উৎসব গুলির ছবি, কবি রসময়ের তুলিতে বড়ই মনোহর ভাবে ফুটিয়াছে। প্রতি কবিতাতেই, কবি রসময়, ভাব-যোগে সেকালের সহিত একালকে একই সৌন্দর্য্যের বাঁধনে বাঁধিয়াছেন;—তাই প্রাচীন সৌন্দর্য্যের আবছায়া ভিত্তির উপর, নূতন সৌন্দর্য্য পূর্ণ-অবয়বে বিকসিত হইয়াছে। কোকিলের 'কুহু', চাতকের 'ফটিকজল', ময়ূরের 'কেকা', চকোরের সুধার পিপাসা চিরদিনই বর্ণিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উহারই ভিত্তির উপর কাব্যশিল্পী ঐ পাখীগুলিকে এমন ভাবে আঁকিয়াছেন যে, তাহাতে আর পাখীগুলিকে চিত্রিত পাখী বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় উহারা সজীব ও সচল। "ব্রহ্মার আসন" কথার ইঙ্গিতে ও প্রাচীন পৌরাণিক বা প্রাচীন পৌরাণিকী কথার উদ্বোধনে একটা অনন্ত আকাশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর সেই আকাশের উপর কবির মায়া-চিত্রিত হাঁস, থাসা উড়িয়া বেড়াইতেছে। চিত্রের এই সজীবতাই কবির গুণপনা। কোন সাধারণ শ্রেণীর শিল্পী, কোকিল, চাতক, ময়ূর প্রভৃতির দলে বায়সকে বসাইতে পারিতেন না,—কবির গীতের কাক, কোকিলের চেয়ে কম মনোহর হয় নাই। হাস্য রসের রচনায় কবি রসময় যে 'চাপাহাসি'র জন্য প্রসিদ্ধ, তাহাও কাকের 'কা কা' ধ্বনিতে বেশ লক্ষ্য করা যায়। ভাবের নূতনত্বে ও ভাষার মাধুরীতে এই কাব্যখানি বড়ই মনোহর হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নদী-বক্ষে। *

পূর্ণিমার ফুল্ল ইন্দু আকাশেতে ভাসে;
জ্যোৎস্নার নীরে ইন্দু মৃদু মৃদু হাসে।
মধুর বসন্ত আজি শোভে চারিধার—
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বার্ত্তা আনে কার!
অদূরে দেউটী জ্বলে নৈশ নদী-ঘাটে;
উপরে তারকা রটে গগনের পাটে।
প্রকৃতির রাণী-মুখে হাসির বিকাশ!
বাসন্তীর বুকে মরি জ্যোস্ন-ফুল রাশ!
শৈ-ই-ল কিরীটে মার সুধা-অংশু-ছটা!
মার পদ গঙ্গা-তলে স্বর্গ-চন্দ্র লুটা!
ছায়াপথে সুরবালা কিরণে নাহিয়া
নন্দনকানন পুষ্প ডালি যাবে দিয়া।
পুলক উছলে ধরা অন্তরীক্ষ ভরি—
অমিয় পুলকময় শান্ত নদী-বারি।
আকুল উচ্ছ্বাসে চলে সুখ-তরী বেয়ে;
পুলকে পরাণ নাচি দূরে যায় ধেয়ে।
"ছোট্‌টো মোদের পান্‌সী-তরী কে সঙ্গ
যাবি আয়"!

মধুরে মধুর মিলনে মধুর কর্ণধার গায়।
স্বরগে (ও) মরতে আজ প্রেম-আলিঙ্গন —
পূত কর-তোয়ে করে তরী সন্তরণ।
মধু-কর মধু-বায় মধুর বাহার!
মধু-নদী বহি যায় আনন্দে অপার!
মধু-নিশি মধু-মাস মধুর মিলন!
মধু-সুপ্ত বক্ষে মরি মধু-জাগরণ!
ত্রিদিব সুষমা আয় কে করিবি পান!
ভরা আলো-গাঙ্গে আহা বহেরে উজান॥

শ্রীযোগেশচন্দ্র লালা।

* বিগত ১৩২৪ বাং ১৩ই ফাল্গুন সোমবার মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে চট্টগ্রামের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ও জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয় কর্ণফুলী নদীতীরে তাঁহার নমুনা-বাজারস্থ ভবনে চট্টগ্রাম সহরের উকীল সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করেন। প্রীতি-ভোজের পর জ্যোৎস্নায় নদীবিহার করিবার জন্য ১টী 'সাম্পান' ও ১টী 'জালিবোট' রাখা হইয়াছিল। ঐ ফুল্ল-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে নদীবক্ষে সুখ-তরী যাত্রিদলে দীনহীন লেখকও একজন ছিল। এই কবিতা ঐ কবিমনোমোহিনী জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির ধ্যান-গাথা।

ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ও মতান্তরে মনান্তর।

বিদ্বেষ কখনও ধর্ম্ম নয়, ভিন্ন ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করা অথবা ধর্ম্মের নাম করিয়া অন্যকে বিদ্বেষ করাকেই ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বলা যায়। ধর্ম্ম-বিদ্বেষ মহাপাপ, কেননা, উহার অন্তরে নাস্তিকতা নিহিত থাকে।

মহিরাবণ যখন, অন্য কোনও রূপ ধারণ করিয়া দক্ষ-প্রহরী হনুমানকে প্রতারিত করিতে পারিল না, তখন বিভীষণের রূপ ধারণ করিয়া রাম লক্ষণকে চুরী করিল। এইরূপ পাপ পুরুষ যখন নিজের বেশে সরল সাধকের চিত্ত অধিকার করিতে পারে না, বিবেক-প্রহরীকে লঙ্ঘন করিতে পারে না, তখন ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করে। ধর্ম্মের গোঁড়ামীর মধ্যে এই পাপ সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারে, কেননা, যাহারা কোনও ধর্ম্মের গোঁড়া তাহারা প্রায়ই একদেশদর্শী হয়। এক-চক্ষু হরিণ যেমন এক পাশ হইতে ব্যাধের আক্রমণ দেখিতে পায়না, গোঁড়ারাও সেইরূপ তা'দের এক-পেশো-মতের বিরুদ্ধ দিকটা মোটেই দেখিতে পায় না। কোন নূতন ধর্ম্মমতে প্রবেশের পথে এই গোঁড়ামী তাহার চেলাকে খু'ব দ্রুত-গতিতে টানিয়া লয় বটে, কিন্তু সাধনের অবস্থায় উহা উন্নতির বাধা জন্মায়। সাধু-সঙ্গ-লাভ হইলে এই পাপ ধরা পড়ে এবং মহিরাবণের মত নিহত হয়, রাম লক্ষণ রূপী ধর্ম্ম রক্ষা পায়।

এই গোঁড়ামী তত্ত্বটীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই ইহার মতিগতি ও কার্য্যকলাপ বুঝা যাইবে।

কেহ যখন কোনও মতের গোঁড়া হয়, তখন সে মনে করে যে, তাহার যে মত ও যে পথ, সেই মতে ও সেই পথে যে চলে না, হয় সে মূর্খ, নতুবা প্রবঞ্চক। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই যে সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান পণ্ডিত এবং সরল ও বিশ্বাসী লোক আছেন, সে কথা ইহাদের মনেই আসেনা।

যদি এরূপ কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইত যে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধন পথ এক-রূপ এবং মূর্খ, নির্ব্বোধ ও কপটাচারীদিগের অন্য রূপ, তবে বরঞ্চ একটা মত ও একটা পথ লইয়া কতকটা গোঁরামী চলিতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। সকল মতে, সকল পথেই বিদ্বান্ মূর্খ, বুদ্ধিমান বোকা এবং সরল ও কপট একসঙ্গে চলিতেছে।

যিশুখ্রীষ্টে আত্মসমর্পণ না করিলে মানুষের মুক্তি নাই, খ্রীষ্টান না হইলে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে, অনির্ব্বাণ অগ্নিতে চিরকাল দগ্ধ হইতে হইবে, যে সকল খ্রীষ্টান প্রকৃতই এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং সরলচিত্ত লোকের অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজে এক সময় হাত তুলিয়া অধিকাংশের মতে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপিত হইত; ঈশ্বর "সর্ব্বশক্তিমান" কি বিচিত্র শক্তিমান, ইহা নির্দ্ধারিত হইত। ইহার কিঞ্চিত পরবর্ত্তী সময়, তথা-কথিত সংস্কার-যুগের আরম্ভে, ইহা বিচার্য্য বিষয় হইয়াছিল যে, বৃদ্ধা জননী গঙ্গাস্নান কিম্বা দেবদর্শন করিতে গেলে, ব্রাহ্ম তাঁহার জননীকে নিজের গাড়ী কিম্বা গাড়ী ভাড়ার পয়সা দিতে পারেন কিনা? এবং ব্রাহ্ম মতের বিরুদ্ধ কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি পাপী হইবেন কিনা? এই সকল আলোচনা যাঁহা-

দের মধ্যে উঠিত এবং প্রশ্রয় পাইত, তাঁহারাও বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং অকপট বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রচারিত সমস্ত ধর্ম্মই পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে। খাঁটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এবং আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ধর্ম্ম, শৈব ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, নানক-পন্থী, কবিরপন্থী প্রভৃতি যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্মেরই জন্মান্তরবাদ অন্যতম দৃঢ় ভিত্তি; আর খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা জন্মান্তরবাদ একেবারেই বিশ্বাস করেন না। এই বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীগিগের মধ্যে কোনও এক জনের সকলেই বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও অকপট এবং অন্য দলের সকলেই নির্ব্বোধ, মূর্খ ও কপট, এমন কথা কি কোনও স্থির-বুদ্ধি লোক বলিতে পারেন? তবে মতান্তর লইয়া এত মনান্তর ঘটে কেন? ঘটে শুধু গোঁড়ামীর জন্য। এই গোঁরামী হইতেই জগতের যত অশান্তি, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। এই গোঁড়ামী, ধর্ম্মের নাম করিয়া, পুণ্যের পোষাক পরিয়া, যত অধর্ম্ম করিয়াছে, স্বয়ং অধর্ম্ম নিজ বেশে তাহার শতাংশের একাংশ করে নাই।

কোথা হইতে গোঁরামীর উৎপত্তি হয়? অভিমানই ইহার জনক। অভিমানের উৎপত্তি স্থান অহঙ্কার। আমি, আমি, আমি, মানুষের এই যে "আমি", ইহাকে রাজা না করিয়া মানুষ আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে না। চক্ষু বুজিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, অন্ধকারের মধ্যে এক "আমি" সমস্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে, জগতের আর যত কিছু সমস্তই এই "আমি পূজার" উপচার। "আমির" মন্দিরে সে কিছুতেই "তুমি"কে ঘেসিতে দিবে না। কাজেই তোমার মত, তোমার বিশ্বাস, তোমার ধর্ম্ম; তোমার বুদ্ধি বিবেচনা, বিবেক বৈরাগ্য সকলই আমার নিকট অসত্য, অধর্ম্ম, অগ্রাহ্য ও অসহ্য। কাজেই আমি তোমাকে বাঁচিতে দিতে পারিনা, যথাসাধ্য তোমার সংহারের চেষ্টা করিব। আমি, আমি, আমি, সর্ব্বত্রই সেই "আমি" নিজের "আমিকে" বাড়াইবার জন্য অন্য শত শত "আমি"কে বলী দিতে উদ্যত। নিজের বিকেবের দোহাই দিয়া অন্যের বিবেককে বিনষ্ট করিতে হইবে, নতুবা বিবেকের মাহাত্ম্য কি?

এ রোগ সারে কিসে? এ ব্যাধির ঔষধ কি? বৈদ্য না আসিলে রোগ ধরিবে কে? ঔষধের ব্যবস্থা কে দিবে? এক জন "তুমি"র আসা চাই। সে "তুমি" হাট বাজারের "তুমি" নয়, যে তুমি আসিলে সকল "আমি"-কে মাথা নীচু করিতে হয়, সেই "তুমি"র আগমন চাই।

যে ব্যক্তি রোগে ফুলিয়া মোটা হয়, তাহাকে কদাচ সুস্থ বলা যায় না। অহঙ্কার মানুষকে মোটা করিতে চায়, কিন্তু সে মোটাত্ব স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, সুচিকিৎসক সে স্থূলত্ব নষ্ট করেন। কিন্তু তিনি আসিলে ত? তাঁকে ডাকে কে? অনেকেই মুখে ডাকে, বলে "হে তুমি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, একবার আমার ঘরে এসো। কিন্তু একটু সাবধানে আসিও, দেখো যেন তোমার মাথায় লাগিয়া আমার দ্বারের সুশোভন কুঞ্জলতাটী ছিঁড়িয়া না যায়, কাঁচা সিমেণ্টে তোমার পায়ের দাগ না বসে। হে আমার সর্ব্বস্ব, দে'খো যেন বসিতে যাইয়া আমার সখের চেয়ার খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিও না, টেবিলের সাজানো গুছানো সখের জিনিষগুলি এলো মেলো

করিও না। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, কিন্তু আমার আচড়ানো চুল গুলি যেন এলাইয়া দিওনা, পরিপাটী টেড়ীটা নষ্ট করিও না"।

তিনি বলেন, "আমি বস্‌বো কোথায়? তুই যে তোর সারা ঘর জিনিস পত্রে ভ'রে রেখেছিস্, একটু জায়গা ত খালি নাই, আমি বস্‌বো কোথায়? যে খানে বস্‌তে চাই, দেখি, সেই খানেই তোর জিনিস ভাঙ্গে, এটা পড়ে যায়, সেটা ছিঁড়ে যায়, ওটা এলিয়া যায়। আমাকে ডাক্‌লি, কিন্তু আমাকে স্বাধীনতা দিলি কই? এমন পরের ঘরে, এমন ভয় ভয় করে কি আমি থাক্‌তে পারি? আমার যে দম্ আটকে যায়। কোন্‌টা ভাঙ্গে, কোন্‌টা পড়ে, কি এলিয়ে যায়, তোর চক্ষু রয়েছে সেই দিকে, মন রয়েছে সেই দিকে, আমাকে যে ডাকছিস্, সে কতই আল্‌গা ডাক। আমার কত অসোয়াস্তি, এমন করে কি থাক্‌তে পারি? কৈ? বল্লিনে ত যে, "তুমি এসো, তুমি বসো, তুমি আমার ঘরে যেমন ইচ্ছা বিরাজ কর, তাতে আমার যা যায় যা থাকে, কিছুতেই দুঃখ নাই। কৈ, একবার বল্লিনে তো যে, সমস্ত হারিয়েও আমি তোমায় চাই।" মনে সর্ব্বদা চিন্তা, কিসে ষোল আনা বজায় থাকে। আমার দরদীরা আমার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়েছে, ইব্রাহিম পুত্র দিয়েছিল, তুই, কি দিতে পারিস্? আমি ঝড়ের মত ঢুকি, আর বরের মতন বসি, কি গেল কি থাক্‌লো তা আমি দেখি না, আর ষোল আনা আদর চাই। তুই আমার বাতাসই সইতে পাল্লিনে, আমায় আর কি দিবি।"

ঠাকুর, সত্যই তুমি দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে ফিরে যাচ্ছ, আমরা কেউই তোমার আদর জানি না, কিছু পেলে না কিছু পেলে না, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তুমি কিছুই পেলে না! কোথায় পাবে? আমরা যে পাপকে দখল দিয়াছি, এ হৃদয় যে তার সিংহাসন। আমার সর্ব্বস্ব তার, তোমায় কোথায় বসাব ঠাকুর? তুমি যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তুমি একাই এক, তুমি ত পাপের সঙ্গে-অংশী হয়ে রাজ্য করনা, তুমি চাও ষোল আনা। সয়তান অহঙ্কাররূপ ধারণ ক'রে আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার ক'রে ব'সেছ, তোমাকে বসাব কোথায়? শ্রীকবির সাহেব বলেছেন—

"প্রেমগলি অতি সাঁকরী তা'মেদো ন সমাহি।"

সত্যই প্রেমের গলিতে একসঙ্গে দুজন চল্‌তে পারে না, একজনকে মর্‌তে হয়, সেখানে "আমি" না ম'লে "তুমি" আস্‌তে পারে না, বীজ না মরিলে অঙ্কুর জন্মায় না, প্রেমরাজ্যের ইহাই নিয়ম। কিন্তু তুমি নিজে আমায় যদি না মার, তবে আমি কি ক'রে মরি? জগতে কোনও বস্তুই আত্মহত্যা করিতে পারে না, প্রদীপ আপনি নিবিতে পারে না, অন্যের প্রভাব বা অভাব চাই। অন্য বস্তুর সাহায্য অর্থাৎ সংযোগ বিয়োগ ভিন্ন কোন বস্তুরই পরিবর্ত্তন ঘটে না। মানুষ আত্মহত্যা করে, তাও অন্য বস্তুর সাহায্যে, মন আর শরীর অন্য বস্তুর সাহায্যে প্রাণকে বিনষ্ট করে, নিজকে কেউই মারিতে পারে না। মরা শরীরটাও নিজে নিজে পচে না, মন মনকে মারিতে পারে না। আমার এই ঘর-জোড়া, বাড়ী-ভরা অহংবুদ্ধিকে, মারিবে কে?

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
পাশনাশ হেতুরেষ নতুবিচার বাগ্‌বলম্।"

এই অহঙ্কার পাশকে নাশ করিতে ব্রহ্ম কৃপাভিন্ন অন্যের শক্তি নাই। তাই বলি, প্রভো, তুমি এস, তুমি আমাকে বেদখল কর,

আমার ঘর ভরে বসো, তোমাকে পাইলেই যে সর্ব্বস্ব পাইব, এই বুদ্ধি আমাকে দাও।

তুমি আসিলে টের পাওয়া যাবে, আমাকে তুমি নবজীবন দিয়ে নূতন বসন-ভূষণে মণিরত্নে সাজাবে। তখন সেই আমি নূতন "আমি হবে, দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হবে, শান্ত হবে, সমাহিত হবে। তার ক্রোধ, লোভ, হিংসা, সংকীর্ণতা কিছুই থাকিবে না, কেন না সর্ব্বত্রই সে 'তোমার' লীলা দেখিবে। সমস্ত সংসার তাহার মধুময় হইবে। সে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিবে না, কাহারও দ্বারা উদ্বেগ পাইবে না, সকলের মুখে তোমাকে দেখে সমদর্শী হবে। এ সকল লক্ষণ না হ'লে বুঝা যাবে যে, তুমি আইস নাই, এ ঘরে বর আসে নাই।"

সয়তান কোথায় লুকাইয়া থাকে, জানো? ধর্ম্মের পোষাক প'রে অবিশ্বাসরূপে মনের মধ্যে থাকে। তাকে ধরা বড় শক্ত! সে কেমন ক'রে সাধককে ভুলায়, জানো কি? ঈশ্বর আর মানুষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ঈশ্বরকে মানুষের চক্ষু হ'তে ঢে'কে রাখে। একটা সামান্য ছায়া যেমন সূর্য্যকে ঢেকে রাখে, সেইরূপ।

বস্তু থাক্‌লেই তাকে দেখা যায় না, কাছে থাকা চাই। কাছে থাকিলেও দেখা যায় না, সম্মুখের দিকে থাকা চাই। সম্মুখে থাকিলেও দেখা যায় না, মাঝখানে আবরণ না থাকা চাই। ঈশ্বরত কাছেই আছেন, সম্মুখে আছেন, তবে আমরা দেখি না কেন? মাঝখানে আবরণ আছে. সয়তান গোঁড়ামী-মাঝখানে দাঁড়িয়েছে, তাই তাঁকে দেখি না।

সয়তান বলে, "হে জীব, আমার চক্ষে চক্ষে তাকাও, ও লোকটাকে (ঈশ্বরকে) দেখিও না। আমি তোমাকে ওর মূর্ত্তি গড়িয়া দিতেছি, সেই মূর্ত্তির পূজা কর। সে পূজায় তোমার নিজেরই পূজা করা হবে। কি মন্ত্রে পূজা কর্ত্তে হবে, সে মন্ত্র আমিই পড়াচ্ছি। পড়, "হে অন্তর্যামিন্, তুমি শুধু আমার অন্তর্যামী হবে, যার তার অন্তর্যামী হ'তে পার না। তা যদি হও, তবেই ত আমার সর্ব্বনাশ, তবে ত তুমি, যত সব বোকা মূর্খ, কুসংস্কারীগুলির মনের ভাবও বু'ঝে ফেল্‌বে, তারা যে অশুদ্ধ নাম ধরে তোমায় ডাকে, যে কোনও রূপ তোমাতে আরোপ করে, যে কোনও বস্তু দিয়ে তোমার পূজা করে, সকলই ত তুমি গ্রহণ কর্‌বে, কেন না অন্তরে অন্তরে সকলেই ত তোমাকে চায়। এমনি করে যদি তুমি সকলের অন্তর্যামী হও, তবে আর আমার গোঁড়ামী কোথায় থাকে? তবে ত ঠাকুর বড়ই গোলমাল হ'য়ে যাবে। না, তা কখনই হবে না, তুমি শুধু আমাদের অন্তর্যামী। যিহোবা শুধু ইহুদীয় ঈশ্বর, একমাত্র এস্রাইলের বংশের রক্ষা দেবতা, সেই বংশের জন্য তিনি সবই করেন, তাদের শুধু রক্ষা করেন, তা নয়, তাদের বিপক্ষ বিনাশ করেছেন, সেইরূপ, হে পরমেশ্বর, তুমি শুধু আমাদের অন্তর্যামী হও, আমাদের রক্ষী-দেবতা হও এবং আমাদের মত-বিরোধীদিগের অথবা ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে পরিত্যাগ কর। তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি।"

আবার পড়,—"হে সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার সমস্তশক্তি শুধু আমাদের দার্শনিক-মতের গণ্ডীতে অবরুদ্ধ থাকুক। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ বট, তা ব'লে তুমি ভক্তের ইচ্ছানুরূপ যা তা মূর্ত্তি ধর্‌তে পার না, শুধু আমাদের বুদ্ধির অনুযায়ী, আমাদের

অনুমতি অনুসারে তোমার স্বরূপ হ'তে হবে। তুমি ততটুকুই সর্ব্বশক্তিমান্, যতটুকু আমরা এলাউ (allow) করি। দেখো যেন, হে প্রভো, ভু'লে গিয়ে ওদের বাড়ীতে পুতুল সেজে বসোনা। তুমি যে সোজা লোক, কে তোমায় ভুলিয়ে নেয় ঠিক কি? আবার কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, রাম, বৌদ্ধ কারু মধ্যে ঢুকে পড়ো না। হজরৎ মহম্মদের কাণে শব্দ করে কথা বল্‌তে যে'য়োনা। আদি-ব্রাহ্মসমাজের দেবেন্দ্রনাথকে বোলপুরে কিছু করতে "হুকুম" করোনা। এমন কি, কেশবের ভিতরেও কথা বলো না। কেশব পাগল হয়ে গিয়েছিল, সে বল্লে কি না, "শুধু যে সকল ধর্ম্মের মধ্যে সত্য আছে, তা নয়, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই গোটা সত্য।" একি বদ্ধপাগলের উক্তি নয়? এরূপ বলা ব্লাস্‌ফেমী (blasphemy) অর্থাৎ তোমারই নিন্দা করা। এতটা তুমি স'হিবে কেন? আমরা "ব্রহ্ম" বলি বলেই তুমি ত আর হিন্দু ঋষির ব্রহ্ম নও, তুমি আমাদের (Jealous God)। ঠিক নামে না ডাকলে তুমি কেন চটে যাবে না? সকল ধর্ম্ম সত্য করার তোমার দরকার কি? ব্যাকরণ ভুল কবিতা লিখ্‌লে অধ্যাপক কি তা অম্‌নি মেনে নেন? কখনই নয়, অশুদ্ধ কেটে দেন। সেইরূপ যারা ভুল ভাবে তোমাকে ডাকে, তাদের ডাক তুমি শুনবে কেন? সমস্তটা অশুদ্ধ ব'লে কে'টে দিবে। বল্‌তে পারো যে, তুমি সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্যামী, তুমি সব সংশোধন করে নিবে, কিন্তু সেটা ভাল কি? যে অধ্যাপক গোঁজামিল দিয়ে শেখায়, তা'র ছাত্র কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। আর ওদের জন্য তোমার অত গরজই বা কি? অত কর্ত্তে যা'বে কেন? যারা তোমাকে খারাপ নামে ডাকে, অশুদ্ধ উপাধি দেয়, তা'দের শাস্তি দেওয়াই উচিত। সংশোধন কর্ত্তে যা'বে কেন? সংশোধন কর্‌লে তাদের সেই অশুদ্ধ ডাকটা যে সার্থক হ'য়ে গেল, তবে ত হিন্দু ঋষির কথা, ভ্রান্ত ব্রাহ্ম কেশবের কথা সত্যি হ'য়ে যায়—"সকল ধর্ম্মই সত্য" হয়ে পড়ে। কোনরূপে ডাক্‌লেই হলো? তবে গোঁড়ামী দাঁড়ায় কোথায়? হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি, সকল ধর্ম্মের লোককে এখন অনর্থক দয়া করার শক্তি তোমার না থাকুক।"

আরও মন্ত্র পড়, এইটাই প্রধান মন্ত্র। এইটাই অবিশ্বাসের বীজ মন্ত্র। স্যাণ্ডো পালো-য়ানের যেমন সর্ব্বাঙ্গীন্ ব্যায়াম-কৌশল, ধর্ম্মটাও সেইরূপ একটা মানসিক ব্যায়াম মাত্র। "সর্ব্বাঙ্গের এবং সমুদয় মনোবৃত্তির সমভাবে অনুশীলনই ধর্ম্মসাধন।" এ সাধনার ব্রহ্মকৃপার দরকার নাই, একতরফা ডিক্রি। পুরুষকার অর্থাৎ অহঙ্কারই এ সাধনার গুরুদেব। হঠাৎ যে রত্নাকর বাল্মীকি হলেন, চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোক হলেন, দুষ্ট সল সেণ্ট-পল হলেন, হজরৎ-বিদ্বেষী কোরাস খলিফা ওমর হলেন, জগাই মাধাই বৈষ্ণব হলেন, দুর্দ্দান্ত লালাবাবু মাটীর মানুষ হলেন, এই প্রকারের যত গল্প, সে সবগুলিকেই অবিশ্বাস কর্ত্তে হবে। বিনা অনুশীলনে এক ঘণ্টার মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন কি ক'রে হয়? এগুলি মানিতে গেলেই ভগবানের "অহৈতুকী কৃপা" মান্‌তে হয়, তবে ত বুদ্ধির গর্ব্ব, বিদ্যার গৌরব, সবই মলিন হ'য়ে গেল, ধর্ম্ম নিজেই একটা স্বতন্ত্র জিনিস হলেন। এগুলি ভারি গোলযোগের কথা, তাই বলি "ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্" মিথ্যা কথা, অলসদিগের খেয়ালের

স্বপ্ন। এও কি হয়? এ যে লটারিতে লক্ষ টাকা পেয়ে এক ঘণ্টায় বড় মানুষ হওয়া, ধর্ম্মরাজ্যের এরূপ লটারি আমরা মানি না। হঠাৎ লোক ধার্ম্মিক হ'তে পারে না, হিন্দু বল্‌তে পারে পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফল, আমরা জন্মান্তরের কুসংস্কার মানি না, সুতরাং পাপী হঠাৎ পুণ্যাত্মা হয়, তাও মানি না। তাই বলি, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" এ ধর্ম্ম মানিতে পারি না, তাই পড় মন্ত্র,—"আত্ম বুদ্ধিই কেবলম্" "ব্রহ্মাকৃপাহি নিষ্ফলম্।" "ধূলা ঝেড়ে কর কোলে" এ সব কাল্পনিক প্রার্থনা, মেয়েলী ছড়া, কাপুরুষের উক্তি।

যে ভাবে লিখিলে বিষয়টী স্পষ্টরূপে বুঝান যায়, সেই ভাবেই লিখিত হইল, ব্যঙ্গ করা উদ্দেশ্য নহে; সমস্ত কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ যে অন্তর্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সমদর্শী, ভাবগ্রাহী, কৃপাময়, ধর্ম্মের এতগুলি সংস্কার পরিত্যাগ না করিলে গোঁড়ামী ও ধর্ম্মবিদ্বেষ টেঁকে না।

রাক্ষসের পুরীতে বন্দী, উপকথায় রাজকন্যা বা রাজপুত্রের শিয়রে ও পৈথানে (পায়ের কাছে) দুখানা সোণার কাঠি রূপোর কাঠি থাকিত। পায়ের কাঠি মাথায়, আর মাথার কাঠি পায়ে আসিলে তাহারা জাগিয়া উঠিত, আবার উহা উল্টাইয়া দিলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইত। সেইরূপ, কোন কোন্ লোক মনে করেন যে, ভগবানের সোণার কাঠি রূপার কাঠি তাঁদেরই হাতে। তাঁহারাই তাঁহাকে জাগাইতে পারেন, তাঁহারাই ঘুম পাড়াইতে পারেন, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। এই ভাব ভারতীয় ভাব নয়, ঋষি-প্রতিষ্ঠিত ভাব নয়, এ ভাব ভারতে টিকিবে না, অনর্থক মতান্তরে মনান্তর ঘটাইয়া অপরকে ও আপনাকে উদ্বিগ্ন করিলে, অপরের ও আপনার, উভয়পক্ষেরই অনিষ্ট হয়। অপরের ধর্ম্মমত যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামাজিক অনিষ্ট উৎপন্ন না করে, ততক্ষণ তাহা লইয়া মনান্তর উৎপন্ন করিলে সেই মনান্তরটাই সামাজিক অনিষ্টের কারণ হয়। এক মাঝি যেমন ঘাটের নৌকা ঘাটে বেঁধেই সারারাত্রি বৈঠা মেরেছিল, তাতে নৌকা এক হাতও এগোয় নাই; সেইরূপ, অনেকে মনের ও প্রাণের বন্ধন খুলিয়া না দিয়া চিরকাল প্রার্থনা করেন এবং একটা মতের গণ্ডিতে আপনাকে বন্দী করেন। এটা একটা নূতন রকমের "অচলায়তন"-ঈশ্বর নাম ধরে ডাকিলেও এই গভীর অচলায়তনের বাহিরে যাওয়ার শক্তি নাই। সত্যটা পাছে নিজের মতের বিরুদ্ধ হয়, এই ভয়ে সদাই ভীত। ইতিহাসে সত্য গোপন করিতে হয়, সমাজে সত্য গোপন করিতে হয়, ধর্ম্মমতে সত্য গোপন করিতে হয়, সদাই সত্যের ভয়ে ভীত, পাছে সত্য জয়যুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পিত অচলায়তনের মেম্বররা সর্ব্বদা ভীত ছিল যে, পাছে জানালা দিয়া বাহিরের বাতাস ও আলো তাহাদের গায়ে লাগে,—নূতন অচলায়তনের সভ্যরা সে ভয় ত রাখেই রাখে, তাহার উপর সুবিধা পাইলেই অন্যের গায়ে ইট পাটকেল ছুড়িতে কসুর করে না। এটা একান্তই সংকীর্ণ খ্রীষ্টানী মত, উদার ধর্ম্মমত নহে।

ঈশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময়, অন্তর্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তাঁহার উদ্দেশে কোনও প্রকারের পূজা প্রার্থনাই নিরর্থক হয় না। ব্যাকরণ ভুলের জন্য কাহারও ভক্তি বিনষ্ট হয় না। এই প্রচলিত কথা এদেশের অশিক্ষিতেরাও জানে যে, "বিষ্ণায় নমঃ"

বলিলে তিনি গ্রহণ করেন, কেন না "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"।

পুরাতন তত্ত্ব-বোধিনীতে রামমোহন রায়ের সময়ের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের একটী উপদেশে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি প্রাসাদের ছাদে কিম্বা বৃক্ষে আরোহণ করিলে পরম্পরা সম্পর্কে পৃথিবীই যেমন তাহার আশ্রয়, সেইরূপ, যে কোনও নামে যে কোনও ভাবে, যে কোনও বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে পরম্পরা সম্পর্কে ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়। এই মোটা কথাটা ভারতবর্ষ কখনও ভুলিবে না। ঈশ্বরকে সে কখনই কাণা কালা অজ্ঞ ও অক্ষম মনে করিবে না। ব্রাহ্মসমাজের যে যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রকাশের সঙ্গে সংকীর্ণতার আবর্জ্জনা ভেসে এসেছিল, অন্য ধর্ম্মে পরিত্রাণ নাই, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা চিরকালের জন্য নরকে যাবে, এই সংকীর্ণতা ও গোড়ামী ষোল আনা গৃহীত না হইলেও ইহার যে কু-বাতাস ব্রাহ্মসমাজের গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কু-সংস্কারের যুগ গত হইয়াছে। যে প্রতিভান্বিত পুরুষের অঙ্গুলী সঙ্কেতে উহার উদ্ভব হইয়াছিল।' তিনি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে ঐ সকল অবৈধ ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে কুসংস্কার কখনও ঘুচিল না। এই সংকীর্ণতা ভারতের যুগধর্ম্মে কখনও স্থান পাইবে না। কেন না, উহা সত্যের এবং ঈশ্বরের ভাবের বিরোধী।

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
পাশনাশহেতুরেষ নতু বিচার-বাগ্‌বলম্।
দর্শনস্য দর্শনেন ন মনোহি নির্ম্মলম্
বিবিধ-শাস্ত্র জল্পনেন ফলতি তাত কিংফলম্
ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্"।

বিদ্যাবুদ্ধি কিছুতেই চিত্ত নির্ম্মল হয় না, ব্রহ্মকৃপাই সার। জাতিনির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, আশ্রম-নির্ব্বিশেষে, অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই সেই কৃপার গোলা খোলা রহিয়াছে।

"ধনী কি নির্ধন জ্ঞানী কি অজ্ঞান,
নাহি দে'খে কারু জাতিকুল মান
সেই যেতে পারে ভবনদী পারে
ব্যাকুল হৃদয়ে যে যেতে চায়।"

ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁহাকে চায়, তাঁরই নাম ভক্ত, ভক্তকে যিনি ব্যাকুল হ'য়ে তুলে নেন, তিনিই ভগবান্।

এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকে না।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

বায়স।

(ভাবাবিষ্ট কবির প্রতি)

"বসন্তে পিক, গ্রীষ্মে চাতক,
বর্ষায় শিখী—কেকা-সাধক,
শরৎ-শোভা মরাল গায়ক,
হেমন্ত যায় ফাঁক;
ছাড়্‌লে চকোর, হয়ে বিভোর,
উড়িয়ে ভাবের ঝাঁক।

এখন কবি আকুল নিজে
শীতের পাখী লিখ্‌বে কি যে?
হিমেল বাতাস—তবু ভিজে
যাচ্ছে, ঘেমে টাক্;
নয়ন তুলে, চাওছে ভুলে,—
দাঁড়িয়ে আমি কাক।

"থাকৃতে সহজ সরল প্রথা,
বাড়াও কেবল মাথাব্যথা;
ভাবনা?—লিখ্‌লে আমার কথা,
পা'বে পরিপাক।
কবি কেন মৌনী হেন?
শোন আমার ডাক।

শীত এলে পাই আমরা স্ফূর্ত্তি,
নিসর্গ দেন, নূতন কুর্ত্তি,
দেখে এমন চিকণ মূর্ত্তি,
লাগ্‌ছে না ক তাক্?
শীতে সকল পাখী বিকল,
সহায় কেবল কাক।
কি বল্‌লে? এ কর্কশ স্বর
শুনে আস্‌ছে কর্ণজ্বর?
হেরে কৃষ্ণ কলেবর,
রুদ্ধ তোমার বাক্?
কোথায় বায়স, পাবে সরস
চাটু-পটু হাঁক?

তোমরা কবি, কল্পনা-দাস,
আমরা করি বাস্তবে বাস;
নাইক মোদের রূপাভিলাষ,
বাহ্য বিলাস জাঁক;
কাজের কথা শোন, বৃথা—
নিট্‌কে-না ক নাক।

ফুলের গন্ধ, মলয়-হাওয়ায়,
গুঞ্জন-কুজন, চাঁদের সুধায়,
রামধনুকের রঙ্গীন নেশায়,
শক্তি কর্‌লে থাক্;
জীবন-ধারণ হয় কি কখন
বিহন অন্ন-শাক?

জন্মায় কত ফল ও ফসল,
কেমন মাটি, তাপ, বাতাস, জল,
দেখাও দেশের স্বাস্থ্য ও বল,
অভাব ঘুচে যা'ক;
পৌষে মিঠে পায়স-পিটে
বিলাও লাখে লাখ্।

বটে—আমরা বারমেসে?
কারণ, থাকি আপন দেশে।
কোকিল আসে কেমন ভেসে
বাজিয়ে মোহন শাঁক?
পাখীর নায়ক, পিক যে গায়ক,
গলায় মধুর চাক।
তুষ্ট তা'রা মোদের পুরে,
স্বেচ্ছাচারী ভবঘুরে,
মজায় 'কু'-মন্ত্রসুরে
এম্‌নি দুর্ব্বিপাক!

কি চাটুকার—ঋতুরাজার,
গৃহ-হারার থাক্।
জেনেও তোমরা ভজ্‌বে মেকি,
আসলে নাই ভক্তি, একি?
বাহবা কবির ঢেঁকি,
তর্কে, প্রাড়্‌বিবাক্!

মন্দ-যত, স্বজাতু-রত
হেসে বায়স গেল উড়ে;
খাঁচার কোকিল, ভাঙ্গা সুরে
বল্‌লে,—বাপ্, কুচক্করে
কটু ভাষী কাক;—
কণ্ঠে কোকিল জয়ী অখিল,
রাজাও কবি ঢাক।

শ্রীরসময় লাহা।

মানবোৎকর্ষ-বিজ্ঞান।

"No statement of the Universe can have any soundness which does not admit its ascending effort.—"

Emerson.

কয়েক বৎসর হইতে পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে Eugenics কথাটী লইয়া আলোচিত হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী Eugenics সম্বন্ধে অনেক মতামত প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও কেহ ইহার সঠিক মীমাংসায় উপনীত হন নাই। Eugenics তত্ত্ব এখনও একটা সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই তত্ত্বটী যে সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়,তাহা বড় বড় বৈজ্ঞানিকেও স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। মহামতি Sir Francis Galton এই তত্ত্বটীকে জাতীয় চৈতন্যের মধ্যে এক নবধর্ম্ম বলিয়া প্রবেশ করাইতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"If the principles he was advocating were to become effective, they must be introduced into the national conscience, like a new religion." জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠায় এই উৎকর্ষ-বিজ্ঞানকেই তিনি সর্ব্বপ্রধান সহায়ক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

কেবল বংশবৃদ্ধিই জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে, বংশোৎকর্ষই জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান, ইহা পাশ্চাত্য ভবিষ্যৎদর্শী-গণ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন, এবং আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই তত্ত্বটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার চশ্‌মা পরিয়া আমরা Eugenics-সমস্যাকে একটা সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছি, তথাপিও এতদ্‌প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বিষয়টী ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে নূতন নহে, বরং ভারতীয় সভ্যতা এ বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

যাহা হউক, অগ্রে আমি পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে এই মানবোৎকর্ষ বিজ্ঞান কি ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাই বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞান প্রধানতঃ মানব জীবনে দুইটা প্রভাব বা প্রাপ্ত-অধিকার লক্ষ্য করিয়াছে, তন্মধ্যে একটী পিতৃমাতৃদত্ত অধিকার (parental heritage) ও অপরটী social heritage অর্থাৎ সামাজিক অধিকার—একটী প্রকৃতি (nature) অপরটী অভ্যাস (nurture). এই দুইটী প্রভাব দ্বারা মানব-চরিত্র প্রতি-নিয়তই গঠিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান parental heritageকে nature বা স্বভাব বলিয়াছে, কিন্তু দেখিতে হইবে, এই যে পিতৃমাতৃদত্ত অধিকার, ইহাও কি একটা সংসর্গ নহে? আমি প্রথমে পিতামাতার সংসর্গ প্রাপ্ত হইরা বীজরূপে মাতৃগর্ভে বর্দ্ধিত হইতে থাকি, তাহার পর যথাকালে জীবরূপে ভূমিষ্ঠ হই। যেদিন হইতে আমি জীবরূপে শুধু জননীর ক্রোড়ে নহে, জন্মভূমির ক্রোড়ে লালিত হইতে থাকি,

সেদিন হইতে সামাজিক অধিকারও আমাকে তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত করিতে থাকে—সেইদিন হইতে আমার জীবন গঠনের জন্য আমার পিতামাতাই একমাত্র সহায়তা করেন না, সে সহায়তায় আমার প্রতিবেশী, আমার সমাজও হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। জীবরূপে আমি আসিয়া দাঁড়াইলেই আমার সংসর্গ অর্থাৎ আমাকে যাঁহারা ঘিরিয়া আছেন, তাঁহারা আমাকে স্থান দিতে বা আপনার করিয়া লইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া বসেন। আমি ছাড়া আর যাহা কিছু, পিতা বল, মাতা বল, প্রতিবেশী বল, সকলেই আমার সংসর্গ এবং এই সংসর্গ হইতেই আমার অভ্যাস জন্মে। প্রকৃত আমি স্বভাব বা সংস্কাররূপেই থাকি, এ জন্মের অভ্যাস আজীবনকাল কেবল সেই স্বভাবের উপর প্রলেপ দিতে থাকে। আমি একটা সংস্কার মাত্র, আমি ব্যতীত সকলই সংসর্গ। এই সংস্কার এমনি স্বাধীন যে, প্রতিবেশী ত দূরের কথা, সে আপনার পিতামাতারও বশ নহে।

আবার সংসর্গও বড় কম শক্তিশালী নহে, ইহা আমার আমিত্বকেও লোপ করিয়া দেয়। জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি আমি সংসর্গ-বশে কত মূর্ত্তিই না ধারণ করিতেছি, আমি কাল যেরূপ ছিলাম, আজ সেরূপ নাই—সংসর্গ এমনি শক্তিশালী যে, সে আমার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার আকৃতিকেও বদ্‌লাইয়া দেয়।

Bateson বলেন—"Diversity of environment is the ultimate measure of diversity of form."

Wilson বলেন—"The body of the child has never been the body of the parent. It is a new body, built up from different surroundings; hence it is quite clear as the environment varies so does the individual."

Archibald Reid বলেন—"The child is a recapitutation of the parent, but may add or subtract. He terms it progressive or regressive variation."

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মানব-চরিত্রের অনুশীলনের জন্য সংসর্গ উন্নত হওয়া দরকার। ব্যক্তি যেরূপ সংস্কার লইয়াই আসুক না কেন, সমষ্টিকে উন্নত সংসর্গ লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

Darwin তাঁহার The descent of man গ্রন্থে বলিয়াছেন—"It is worthy of remark that a belief constantly inculcated during the early years of life whilst the brain is impressible, appears to acquire almost the nature of an instinct; and the very essence of an instinct is that it is followed independently of reason."

ব্যক্তির বাল্যকালই বড় ভয়াবহ কাল, বাল্যকালকে অবহেলা করিলে পরবর্ত্তী জীবনে কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করিবে না। বাল্যকালের ধারণার উপরেই মানবের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

এক্ষণে, দেখা যাউক, এই যে সংসর্গ, যাহার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অগ্র হইতে সাবধান হইতে বলিয়াছেন, ইহার আরম্ভ কোথায়? সংস্কাররূপী আমি, পুনরুৎপত্তি-বীজ রূপী আমি কোন্ দিন হইতে সংসর্গ লাভ করি? বেদ সংস্কারকে রেতঃ বা অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি বীজ বলিয়াছেন। এই পুনরুৎপত্তি বীজ যখন পিতৃ-বীজ ও মাতৃগর্ভ মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়, সেই দিন হইতেই আমি সংসর্গাভিভূত হই। স্মৃতির রাজ্য (memory-world) হইতে যখন আমি অনুভূতির রাজ্যে (domain of perception) আসিয়া পড়ি, তখন হইতেই সংসর্গ (environment) আমার ভিতর ক্রিয়া করিতে থাকে, আমাকে গঠিত করিতে থাকে। তিনটী শক্তির সম্মিলিত ক্রিয়ায় জীবের জন্ম প্রথমতঃ তাহার অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তিবীজ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতৃবীজ, তৃতীয়তঃ মাতৃক্ষেত্র।

আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি বীজ বা সংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। মহামতি Fechner তাঁহার Theory of Life after death গ্রন্থে স্বীকার করিতেছেন,—"The scientific watchword is continuity. We must be able to see continuity, smooth transition before we can believe in survival. We continue to exist as conscious selves after death."

প্রফেসর Weismann ও বীজের প্রবাহত্ব বা পুনরুৎপত্তি (continuity of Germ-plasm) স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই Germ-plasm (লিঙ্গ-শরীর) সংসর্গ-রহিত হইয়াও স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরও ইহার নাশ নাই। Fetchner ইহাকে memory continuity বলিয়াছেন, এই memory continuity ই সংস্কার! জীবের মৃত্যুতেও তাহার ভাবনা-ময় শরীরের নাশ হয় না—তাহার ব্যক্তিত্বেরও নাশ হয় না, সে তাহার সংস্কারের অনুযায়ী সংসর্গ সহযোগে আবার জন্মগ্রহণ করে—তবে তেমনটী আর থাকে না।

সংসর্গ হইতেই আমাদের অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমাদের সংস্কার প্রবাহাকারে নিত্য, কিন্তু আমাদিগের সংসর্গ ক্ষণিক ও পরিবর্ত্তনশীল। আমার বাল্যকাল ও বৃদ্ধকালে কত প্রভেদ, অথচ আমি সেই মানুষ-সংসর্গবশেই নিত্য পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি ধারণ করিতেছি, অথচ আমি সেই মানুষ! এই সংসর্গই আবার মৃত্যুর পর আমার ভাবনাময় শরীরে পরিণত হইতেছে। আমি এই জগতে আসিয়া কেবল সংসর্গ সঞ্চয় করিয়া যাইতেছি। ইহজন্মের সঞ্চিত সংসর্গই আমার পরজন্মের সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া নানাবিধ সংসর্গই আমাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। এই সংসর্গের জটিল রহস্য ভেদ করিতে মহামতি Fechner বলিতেছেন—"The body of today is the effect of the body and its environment yesterday. My body is not the same for two consecutive seconds. We are continually affecting the external world by our actions and words even by unspoken or unacted thought. The matter which has been affected by our activities forms the body of our post-mortem consciousness."

সংস্কার ও সংসর্গের আমরা নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিলাম। এইবার আমরা জীবের জন্ম প্রকরণ ও তাহার ক্রমোন্নতি ও অবনতি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জীবের জন্ম প্রকরণে আমরা তিনটী ক্রিয়া দেখিতে পাই। প্রথমে সূক্ষ্ম বীজের ক্রিয়া, দ্বিতীয়, স্থূল বীজের ক্রিয়া, তৃতীয় ক্ষেত্রের ক্রিয়া। এই ক্রিয়াত্রয়ের সম্পূর্ণতায় জীব জন্মলাভ করে। সূক্ষ্ম-বীজকে আমরা memory-continuity বলিব; স্থূল বীজকে আমরা Intrinsic potentiality বলিব এবং

ক্ষেত্রকে (soil) আমরা Extrinsic stimulation বলি।

Intrinsic potentialityকে Wilson সাহেব, Prepotency বলিয়াছেন। "Prepotency is the term applied to that increased power of transmitting the peculiarities of the parent to the offspring." পিতৃমাতৃ সংযোগ হইতে জীব যে সব প্রকৃতি-বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়, সেই শক্তিকে Prepotency কহে।

ভগবান্ মনু জীবোৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তপোবীজ প্রভাবৈস্ত ত গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহজন্মতঃ॥

মনু, ১০।৪২॥

অর্থাৎ জীব তপঃ ও বীজ প্রভাবে ইহলোকে যুগে যুগে জন্মিয়া উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

জীবকে বৈজ্ঞানিকেরা variation বলিয়াছেন। এই variation দুই প্রকার ; তন্মধ্যে একটী Progressive variation (উৎকর্ষ) ও অপরটী Retrogressive variation (অপকর্ষ)। অপকর্ষকে বৈজ্ঞানিকেরা Degeneracyও বলিয়া থাকেন।

মনু নারীকে ক্ষেত্রস্বরূপা (soil) এবং পুরুষকে বীজস্বরূপ (seed) বলিয়াছেন। মনু ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, কারণ বীজের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া সকল প্রাণীই (উদ্ভিজাদিও) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব আমরা যখন জীবকে বীজের দিক দিয়া বিচার করিতে যাই, তখন সংস্কার রূপ জীবের সূক্ষ্ম পুনরুৎপত্তি বীজ ও স্থূল পিতৃ-বীজের ক্রিয়া দেখিতে পাই। আবার যখন তাহাকে ক্ষেত্রের (soil) দিক দিয়া অন্বেষণ করি, তখন মাতৃগর্ভ হইতেই ক্ষেত্রের (environment) আরম্ভ দেখিতে পাই। এই ক্ষেত্র মাতৃগর্ভ হইতে কেবল মাতৃক্রোড় পর্য্যন্তই প্রসারিত নহে, এই ক্ষেত্র জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিস্তারিত, এই ক্ষেত্র জাতীয়তা হইতে বিশ্বমানবতা পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। বীজ যেমন দ্বিবিধ, ক্ষেত্রও তেমনি দ্বিবিধ। জননী ও জন্মভূমি একেরই প্রকারান্তর মাত্র। জীবের জন্ম বা মৃত্যু তত রহস্যজনক নহে, যত রহস্যজনক যত ঘটনাবহুল জীবের দশমাস দশদিন গর্ভাবাস কাল! External stimulation মাতৃগর্ভ হইতেই আরম্ভ হয়। মাতৃগর্ভ জীবের ছাঁচ বিশেষ। গঠন-ক্রিয়া মাতৃগর্ভেই সূচিত হইয়া থাকে এবং অতি বৃদ্ধও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধাত্রী ধরিত্রীর ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় গঠিত হইতে পারে।

আমরা জীবের জন্ম-রহস্য একরূপ লোভ করিলাম, এইবার তাহার উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে Eugenics সেইদিনই সফলতা লাভ করিয়াছিল, যেদিন হইতে মনু দেখাইলেন ;—

বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ
উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে।৯।৩৪॥

অর্থাৎ, কোন স্থানে বীজের প্রাধান্য, কোথায় বা ক্ষেত্রের প্রাধান্য ; কিন্তু যে স্থানে উভয়ের তুল্যতায় যে সন্তান উৎপত্তি হয়, সেই সন্তানই প্রশস্ত। এই তুল্যতা রক্ষার জন্যই হিন্দুর বিবাহে এত বন্ধন। হিন্দুর বিবাহ মন্ত্রে ভার্য্যা ও ভর্ত্তা একাত্মক হইয়া যায়। আমি যুজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি হইতে কয়েকটী মন্ত্রের অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভর্ত্তা বলিতেছেন, "হে মদ্রুতে, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, আমার চিত্তের অনুচিত্ত হও। একমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। প্রজাপতি

তোমাকে আমার নিমিত্ত নিযুক্ত করুন। তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত, মাংস মাংসের সহিত, ত্বক ত্বকের সহিত একাত্মীকৃত করিলাম। তোমার এই হৃদয় আমার হৃদয় হউক, আমার এই হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।" এতদ্ভিন্ন ঋক্ সকলেও পতি পত্নীর একত্ব হইবার মন্ত্র আছে।

পতিপত্নীকে এত একাত্মীভূত করিবার কারণ কি? তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সন্তানের গর্ভাবাসকালকে শুদ্ধ ভাবে রাখিবার জন্য অথবা তৎকালীন মাতার মানসিক অবস্থাকে স্থির রাখিবার জন্য! ভাল বাপ মায়ের মন্দ ছেলে হয় কেন? এই দশ মাস দশদিনের গর্ভাবাসকাল অনুসন্ধান করিয়া দেখিও, তাহা হইলে হয় ত কারণ খুঁজিয়া পাইবে। গর্ভাবাসকালে Internal stimulation বড় কম হয় না—প্রতিবেশ প্রভাব গর্ভাবস্থাতেও প্রবেশ করে। বীজের নিকট হইতে আমরা অনেক পাই বটে, কিন্তু ক্ষেত্রের নিকট হইতে আরও পাই! ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইলে বীজ লুপ্ত প্রায় হয়। ক্ষেত্র ও বীজের বৈষম্যহেতুই জগতে মানবজীবনের আজ এত বৈষম্য ; ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়া তবে বীজকে রোপিত করিতে হইবে, তবে Eugenics সফলতা লাভ করিবে। বীজ যত উন্নত ও শক্তিশালী হউক না কেন, ক্ষেত্র যদি সামান্য বিকৃত হয়, তবে সব পণ্ড হইয়া যায়। গর্ভাবস্থাতেও পিতৃপ্রভাব নষ্ট হইতে পারে—এমন কি, শ্বেতকায় পিতামাতার পুত্র নিগ্রোরূপী হইয়া জন্মিয়াছে, ইহাও বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে। Monsterosityও(রাক্ষস-জন্ম) মূল এইখানে। সন্তানের মন মাতা গঠন করেন, সে মন কত প্রকারেরই না হইতে পারে! পতিপত্নীর যেখানে মমতা ও একাগ্রতা, সেখানেই Eugenicsএর সফলতা, যেখানে বৈষম্য ও প্রতিলোম, সেখানেই অপশদের (degenerates) উৎপত্তি --বর্ণশঙ্করের কুফলতা। এমন কি, গর্ভিনী অবস্থায় মাতার দৃষ্টির শুদ্ধাশুদ্ধের উপরও সন্তানের চরিত্রের শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, দশমাস দশদিন গর্ভাবাসকালের ন্যায় জাতকের জীবনের রহস্য ও ঘটনাময় কাল আর নাই। সন্তান সাধু কিম্বা সয়তান হইবে, এই গর্ভাবাসকালই তাহার একমাত্র উত্তর দিতে পারে। গর্ভিনী অবস্থাতে নারীকে বিশেষ করিয়া স্বামীর সহিত আত্মিক সম্মিলনে দিনপাত করিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রমে অপশদ ও বর্ণশঙ্করের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এ জগতে মনের বিস্তারও রহস্যময়। পুরাকালের ভারতবর্ষে পতিকে দারপরিগ্রহকালে অঙ্গীকার করিতে হইত—

ভাবেহি বিবাহবহৈ সহরেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনাবহৈ পুত্রানং বিন্দাবহৈ অর্থাৎ আমাদের বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় হউক। আমাদের উভয়ের রেতঃ সংযম করিতে হইবে ; পরে যথাসময়ে পুত্রোৎপাদন করিয়া আনন্দানুভব করিব। এখন যেমন ভারতের অবনতির যুগে বিবাহে কলুষভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ভারতের উন্নত অতীতকালে তাহা ছিল না। তখন,—

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্র নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি এইরূপে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

Eugenicsকে সফল করিবার জন্যই পুরাভারতে ব্রহ্মচর্য্যের এত কঠোরতা—

মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এত নিয়ম পালন। দারাভিগমন সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অনেক উপদেশ আছে, সে সব কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে চাহি না। আসল কথা এই যে, উপযুক্ত সন্তান লাভ করিতে হইলে পিতামাতাকেও উপযুক্ত হইতে হইবে।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা Progressive variation বা জীবোন্নতির কথা বলিলাম, এইবার retrogressive variation বা Degeneracyর কথা বলিব।

Degeneracy লইয়া পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীগণের মধ্যে মহা মত পার্থক্য অদ্যাবধিও চলিতেছে, সে সব মতের পৃথক পৃথক আলোচনা করিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু সে দুরাশা স্থগিত রাখিয়া আমি খুব সংক্ষেপেই এই অপকর্ষ তত্ত্বের আলোচনা করিব। Degeneracy সম্বন্ধে Morel বলিতেছেন—A morbid deviation from an original type অর্থাৎ পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য হইতে বিকৃত ভাব ধারণ করার নামই অপকর্ষ। অপকর্ষ দুই প্রকার, ব্যক্তিগত হিসাবে যে অপকর্ষ তাহা Degeneracy এবং জাতিগত হিসাবে যে অপকর্ষ, তাহাকে আমরা Decadency বলিব।

অনেক বৈজ্ঞানিক মানব মনে পশুভাবের প্রাধান্যকেও Degeneracy বলিয়াছেন। আমেরিকার Dr. Davenport মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Feeble mindedness is an uninterrupted transmission from our animal ancestry." রুশিয়ার V. A. Moschkoff নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, "Degeneracy is due to a reversion to the pithecanthropic element." (অর্দ্ধ মানব ও অর্দ্ধ পশু ভাব)।

ইনি মানুষকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের মানুষকে তিনি white diluvial (সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন) বলিয়াছেন এবং অপরটীকে তিনি Pithecanthropus type (বৃক্ষ মূর্ত্তি বলিয়াছেন। জগতের যত বড় কাজ ও ভাল কাজ প্রথমোক্ত মানুষেরা করিতেছে, শেষোক্ত প্রকারের মানুষ অনেকটা পশু-ভাবাপন্ন, জগতের যত অন্যায় ও হেয় কাজ ইহাদের দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। কেহ কেহ মানবকে Dolicho-cephalic এবং Brachy cephalic আকারে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সমগ্র মানব জাতি Dolicho-cephalic হইতে Brachy cephalic অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বলাবাহুল্য, জার্ম্মাণ, সুইডিস এবং জাপানী-দের মস্তক গঠন Dolicho cephalic. এই শেষোক্ত অবস্থা, মানবের অতি নিকৃষ্ট রাক্ষস অবস্থা।

নরনারীর পার্থক্যেও এই অপকর্ষের নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। Velpeau বলেন—"Women are degenerate beings of a primitive masculine."

Darwin বলেন—"Man is only a woman who has finished the cycle of her evolution."

Spencer বলেন—"Women is only a man paralysed and arrested in his evolution."

তজ্জন্য সুসভ্য অবস্থায় আমরা নরনারীর

পার্থক্য যতটা দেখিতে পাই, অসভ্য ও বর্ব্বরজাতির মধ্যে সে পার্থক্য ততটা দেখা যায় না। তথায় নরনারীর প্রকৃতি ও আকৃতি অনেকটা এক—সামর্থ্যেও এক। নারী সুসভ্য অবস্থায় আসিয়া অবলা ও পুরুষের দাসী হইয়া পড়িয়াছে। নারীর দৈহিক ও মানসিক অপকর্ষ বর্ত্তমান যুগের সুসভ্যতারই ফল।

বর্ত্তমান যুগে অনেক পুরুষকেও নারী-ভাবাপন্ন দেখিতে পাই—ইহাকেও এক প্রকার Degeneracy বলিতে হইবে, অনেক কবি ও সাহিত্যিকও এই দলভুক্ত। যাঁহারা প্রতিভার বরপুত্র বলিয়া 'বড়াই' করেন, তাঁহারাও ইটালীর মনস্তাত্ত্বিক Lombrosoর মতে এই তালিকাভুক্ত (Prof. Lombroso regards the "man of genius" as an aberrant and almost as morbid type.)

Mercier সাহেব তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Conduct and its disordersএর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"We find men with the characteristic womanly qualities of passivity of willingness to be controlled and protected rather than eagerness to control and protect; of tact rather than domination; of intuition rather than reasoning; of sympathy and pity rather than equity and justice."

এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোপীভাবসম্পন্ন বৈষ্ণবধর্ম্মকে আমরা নারী ধর্ম্ম বলিতে পারি। পুরুষ এখানে নারী হইয়া পড়িতেছে। অতএব বলিতে হইবে, বৈষ্ণব ধর্ম্মও একপ্রকারে Degeneration. এই নারীভাবাপন্ন ধর্ম্মে পরম্পরাগত বিশিষ্টতা (original type) রক্ষিত হইতেছে না। নিজে দাসীভাবে রহিলাম—'পুরুষের দাসী'। (পরমহংসদেব)—ইহাই এ ধর্ম্মের উপাদান। এতদ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ Degeneracyরই সহায়তা করিতেছে। কথাগুলি আমরা বিজ্ঞানের দিক দিয়া বলিতেছি, অনুরাগের দিক দিয়া নহে। অতএব সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহা অপ্রীতিকর হইলেও আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনারা যখন কোন স্ত্রীলোককে পুরুষভাবাপন্ন হইতে দেখিলে সৃষ্টির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে পান, তখন, পুরুষকে স্ত্রীভাবাপন্ন হইতে দেখিলে নিয়মের ব্যভিচার বলিবেন না কেন? Degeneracy ব্যভিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারী এবং নারীত্বের বৃদ্ধি বিজ্ঞানের মতে জাতীয় অবনতির একটী অন্যতম কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। নারী পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হইলে এবং পুরুষ নারীর অধিকারকে বরণ করিয়া লইলে নৈতিক অবনতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে ব্যভিচারের উৎপত্তি হয়।

অথচ পুরুষের মধ্যে নারী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, নারীর ভিতর পুরুষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, বিজ্ঞান ইহাও বিশ্বাস করিতেছেন। যেখানে যে ভাবের বৃদ্ধি, সেইখানেই অপচয় এবং অপকর্ষ দেখা গিয়াছে।

"নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী।"

ইহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য কথা হইলেও এই ভাব যখন মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে, তখনই আবার বলিতে হইয়াছে—

"বাজ্‌বে মহেশের বুকে
নেমে নাচ মা ক্ষেপা মাগী।"

তাহা না হইলে Degeneracy ত দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিটাই যে লোপ পায়।

আমি পুরুষ, কিন্তু স্ত্রীরূপে মাতার দেহে আমিই ছিলাম, আমিই আবার জায়ার গর্ভে পুত্ররূপ ধারণ করিব। নারী ভিন্ন পুরুষ যে অসম্পূর্ণ জীব। ইহা বিজ্ঞান উড়াইয়া দিতে পারে নাই, বরং বিজ্ঞান স্বীকার করিয়াছে।

"Any individual…is never to be designated merely as a man or woman, but by a formula showing that it is a composite of male and female characters in different proportions." Weininger's Sex and character.

Weininger আরও বলিয়াছেন—"Every single organ and every single cell possesses a sexuality lying somewhere between arheno-plasm (পুরুষাংশ) and thelyplasm (স্ত্রী অংশ)।

এতদ্দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা জগৎকে অগ্নি-সোমাত্মক বা হরগৌর্য্যাত্মক বলি, তাহা বড় মিথ্যা কথা নহে। Weininger প্রত্যেক cellএর মধ্যে এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

Leland তাঁহার The alternate sex নামক রহস্যজনক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"That in proportion to the female organs remaining in man and the male in woman, there exists also in each part so much of their peculiar mental characteristics."

K. H Ulrichs লিখিয়া গিয়াছেন—"There are men of feminine soul enclosed in male body or in other cases women whose definition would be just the reverse…… People of this kind are called urnings."

বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের ভিতর এ ভাব (urning love) আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। ইহাও Degeneracyর লক্ষণ কি না—তাহা একমাত্র Lombrosoই উত্তর দিতে পারেন।

বর্ত্তমান যুগের নারীর ভিতর পুরুষভাব দেখিয়া Weininger বলিতেছেন—"It is only the male element in emancipated woman that craves for emancipation."

আমরা নানাদিক হইতে ব্যক্তিগতভাবে অপকর্ষ তত্ত্ব আলোচনা করিলাম, এইবার জাতিগতভাবে এই অবনতিবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

এই যে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে সমগ্র য়ুরোপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ইহাও য়ুরোপীয় জাতির বর্ব্বর ভাবাপন্নতারই (savage instinct) পরিচয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি জাতীয় অপকর্ষ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং যুদ্ধবশতঃই পুরুষের ক্ষয় ও নারীর বৃদ্ধিতে বর্ণশঙ্কর জন্মাইয়া থাকে, ইহা আমাদিগের গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব যুদ্ধ জাতীয়-অস্বাস্থ্যেরই (morbidity) পরিচয়—আসুরিকভাব যুদ্ধ হইতেই জাগিয়া উঠে। এই আসুরিক ভাব জাতিগত অপকর্ষেরই ফল। এবজন্যই একজন বৈজ্ঞানিক দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—"The wolf in man is still within call" and retrogression into primitive herd emotion is an ever present tendency."

বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি আরও বহু কারণে

ঘটিয়া থাকে। আমাদিগের সংহিতা সমূহে বর্ণ সঙ্কর-প্রকরণ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

ব্যভিচারেণবর্ণনামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥

বৃহৎ মনুসংহিতায় নারদ বলিয়াছেন,—

আনুলোম্যেন বর্ণানাৎ যজ্জন্ম স বিধি স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥

আমরা এই দুইটী শ্লোক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এক সময়ে হিন্দুজাতির ভিতর Eugenics কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এই শ্লোকদ্বয়ই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাল হইতেই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে পঞ্চমবর্ণ ছিল না। বর্ণ সকলের ব্যভিচারে অর্থাৎ প্রতিলোম বিবাহে সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয়। অনুলোম বিবাহে বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হয় না। এমন কি, ব্রাহ্মণের শূদ্রা-পত্নীতেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয় না। ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হন না, কিন্তু জাতীয় উন্নতির সহায়তা করেন। ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা-ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন না, অথচ জাতীয় উন্নতির সহায়ক হন, বৈশ্যও বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, ইহাতেও বর্ণের ব্যভিচার হয় না। কারণ ইহার সকলগুলিই অনুলোম বিবাহ। পূর্ব্বে অনুলোম বিবাহ ছিল বলিয়াই হিন্দুজাতি হিসাবে অভাবনীয় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কারণ এই অনুলোম বিবাহে পতিত জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা ছিল, ইহাকেও একপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিতে হইবে। অনুলোম বিবাহ যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য, তেমনি অবেদ্যাবেদন বিজ্ঞানের যুক্তিতে অতীব নিন্দনীয় কর্ম্ম। অবেদ্যা-বেদন অর্থে স্বগোত্রে বিবাহ। ইহাও জাতীয় অপকর্ষের একটী সর্ব্বপ্রধান কারণ। ইহাতে কেবল যক্ষ্মা প্রভৃতি উৎকট ব্যাধিরই সৃষ্টি হয় না, ইহাতে সৃষ্টি-শক্তিহীন করিয়া প্রকৃতি বংশ লোপ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য।

Wilson বলিতেছেন—"Crossing or new blood, gives vitality and strength to body or mind But inbreeding has its advantages by way of selection, variation and species. If it be fortunate, it perpetuates in the human race some of the best families but where it is carried too far and ends in degeneracy, which is too conspicuous in much of our aris-to-cracy. Nature tries to curtail the series by sterility."

আমাদিগের ভিতর আজ এত হাহাকার কেন, গৃহ অরণ্য হইয়া যাইতেছে কেন,—এত হিষ্টিরিয়া ও বন্ধ্যত্বের আধিক্য কেন? কারণ আমরা সুবিধাবাদ, বিলাস ও দেশাচাররূপী যথেচ্ছাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছি এবং প্রকৃত শাস্ত্রবাক্য ও বিজ্ঞান হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। অনুলোম বিবাহ আধুনিক সুবিধাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, পূর্ব্বকালে মন্দকে তুলিয়া ধরিবার জন্য ভালকে আত্মত্যাগ করিতে হইত, এমন কি, তেজঃপুঞ্জকলেবর মুনি ঋষিরাও সংসারী হইয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে আপনার শক্তিদান করিতেন। মনুর নবম অধ্যায়েই লিখিত হইয়াছে, অক্ষমালা বশিষ্ঠের সহিত ও অধমযোনিজা শারঙ্গী মন্দপালের সহিত সংযুক্তা

হইয়া পূজনীয়া হইয়াছেন। আসল কথা এই যে, নারী অধম যোনিজা হইলেও সে যদি ভর্ত্তাত্মিকা হইতে পারে, তবে সেই মিলন হইতে কখনই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জন্যই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মিক সম্মিলন—তাহা না হইলে সে-বিবাহ বিবাহই নহে।

এতদ্ভিন্ন কামবিবাহে ও পরদার গমনেও বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য ব্রাহ্মণকে শূদ্রা বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—কারণ এইরূপ বিবাহে বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি না হইলেও পারশবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই মিলনজাত পুত্র অনুলোম ক্রমে হইলেও মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরদার গমন করিলেও অবেদ্যাবেদন হয়। মনুসংহিতায় আছে—

তৎপ্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞান বেদিনা।
আয়ুষ্কামেণবপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি॥

মনু ৯।৪১॥

অর্থাৎ প্রাজ্ঞবিনীত জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কখনও পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে না। এই নিয়মের ব্যভিচারে কেবল ব্যক্তিগত অধঃপতনই হয় না, জাতিগত অপকর্ষও ঘটিয়া থাকে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এইরূপ যথেচ্ছাচারিতার ফলে কিরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একমাত্র বৈজ্ঞানিকেরাই সাক্ষ্য দিতেছেন। বিশেষতঃ য়ুরোপে পরদার গমন এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তথায় বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি নানা অবৈধ উপায় দ্বারা হ্রাস করা হইতেছে। বর্ণশঙ্করের উৎপত্তিতে জাতীয় অবনতি ঘটে সত্য, কিন্তু নরনারীর এইরূপ বংশ হ্রাস চেষ্টাও জাতি অধোগতির পক্ষে কম সহায়ক নহে। য়ুরোপের বিলাসী ও বিলাসিনীরা যে পণ করিয়াছে, তাহারা বংশবৃদ্ধি হইতে দিবে না। আমার মনে হয়, এই পণ ভাঙ্গিবার জন্যই যেন এই মহাযুদ্ধে য়ুরোপের সামাজিক জীবনকে নূতন ছাঁচে গঠিত করিতেছে। এই যুদ্ধ বিদ্রোহী ও ব্যভিচারী য়ুরোপের শাসকরূপেই যেন বিধাতার সদেচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। ফরাসী সমাজ বৈজ্ঞানিক M Jacques Bertillon সম্প্রতি বলিয়াছেন—"In Paris, Berlin, Vaina, London fertility is greatest among the poorer classes, while it gradually diminishes as comfort and luxury increase." এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের বিলাসী বাবু সম্প্রদায়ের চৈতন্য হইবে কি?

Dr. Saleeby তাঁহার The Methods of Race-Regeneration নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন—"We cannot raise the race by degrading individuals. Whatever lowers the humanity of fathers and mothers, whatever elevates the physiological above the psychological, the body above the mind, is an enemy to the race and no method for its regenerators."

আমাদিগের সামাজিক জীবনের ভিতরেও ভোগভূমি য়ুরোপের অনেক পাপ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে, এইজন্যই আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রীতদাস হইতে কর্ম্মভূমির ভারতভূমির সন্তানদিগকে নিষেধ করিয়া থাকি। আজ Eugenicsকে সফল করিতে হইলে পুরাভারতের বিধিনিয়মকে আবার মানিয়া চলিতে হইবে। অন্ধ হইয়া নহে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহায়ে মনু প্রভৃতি জাতীয় উন্নতি-নির্দ্দেশকদিগকে বুঝিতে হইবে।

অনুলোম বিবাহের উদ্দেশ্য কি? ইহাতে জাতিগত উন্নতি কি হইতে পারে? ইহা বাস্তবিকই এক্ষণে ভারতের উন্নতিকল্পে ভাবিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

মনু আর একটী বড় মূল্যবান কথা বলিয়াছেন—স্বকর্ম্মত্যাগেও বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হয়। ইহাও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য! আমরা Degeneracy অর্থে প্রথমেই দেখাইয়াছি—a morbid deviation from an original type. আজ জাতিগত ব্যভিচার সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রত্যেক মানব সকর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী পতিকে, পুত্র পিতাকে, ছাত্র শিক্ষককে, বর্ত্তমান অতীতকে এখন আর বড় একটা মানিয়া চলে না—তাহার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা চলিয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শৃঙ্খলা নাই বলিলেই হয়। শৃঙ্খলা (uniformity of character) জাতির ভূষণ। জগতে যত বড় জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের ভিতর একটা ছাঁচ—একটা পদ্ধতি—একটা uniform সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—হায় সে uniform আমাদিগের কোথায়? যে জাতির uniform নাই—সে জাতি এ বিরাট জগতে মাতাল অথবা উলঙ্গ হইয়া ফিরিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজ আমাদিগের সেই অবস্থা।

Whetham তাঁহার Heredity and Society নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The work of civilization has been to differentiate between one type of character and ability and another, as to fit each into that portion of the social structure where it can be of the greatest value. There is no record of any race that has risen into prominence without having first of all undergone a lengthy process of careful graduation. A disintegration of society and the breaking up of these natural divisions seems to be a preliminary step in national decay."

এইজন্যই দূরদর্শী মনু স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। স্বকর্ম্মত্যাগে জাতিগত শৃঙ্খলার লোপ হয়।

জাতীয় উন্নতির পক্ষে বিশিষ্টতা (uniformity) যেমনি প্রয়োজন, বিচিত্রতাও (differentiation) তেমনি প্রয়োজন। এইজন্যই বর্ত্তমান যুগের Democracyকে আমরা অনেকটা ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকি। ইহা মানুষকে সমান করিতে চায়, কিন্তু উন্নত করিতে চাহে না—ইহার পরিমাণের দিকেই লক্ষ্য, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধতার প্রতি উদাসীন। ইহা বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইহার চিন্তার বিষয় নহে। এই জন্যই আমরা বিশ্বমানবতা কথাটীকেও ভয়ের চক্ষে দেখি, কারণ আমরা জানি, এই দুঃখময় জগতে উদার হইয়া সকলকে সুখী করিতে সাহসী হওয়া সহজসাধ্য নহে, তাহাতে পরিণামে ব্যাঘাতই ঘটিয়া থাকে। জাতীয়তাবোধ—দেশাত্মবোধ জাগতিক উন্নতির সোপান—বিশ্ববোধ পরমার্থিক উন্নতির জন্য। দেশাত্মবোধ রক্ষা করিবার জন্যই আমরা কিঞ্চিৎ স্বার্থপর হইতে চাই—কিন্তু দেখিতে হইবে, স্বার্থপর হইতে গিয়া আমরা যেন ভারতের বিরাট জাতীয় স্বার্থকে হারাইয়া না ফেলি! সমাজের যখন ভ্রূণাবস্থা, তখন জাতীয়তাই সমাজ গঠনের একমাত্র

সহায়। সমাজ যখন নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভূষিত, অবয়ব প্রাপ্ত (organised), তখন জাতিভেদ (differentiation of type) অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক, তখন জাতিভেদ দোষাবহ নহে। জাতিভেদ হইতে যখন ঘৃণা ও প্রতিযোগিতার উৎপত্তি হয়, তখনই সর্ব্বনাশ—তখনই বুঝিতে হইবে জাতীয় অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে—ছিন্নমস্তা আপনার রুধির আপনি পান করিতেছে। যতদিন জাতিভেদ সহযোগিতার অনুকুল—ততদিন জাতিভেদ জাতীয় উন্নতির সোপান। যতদিন "সকলে আমরা পরের তরে" ততদিন আমরা অমৃতের পুত্র, আর যখনই আমার আমার—তখনই জানিতে হইবে, জাতি হিসাবে আমরা মৃত। বিশ্বমানবতা অরণ্য, জাতীয়তা বনস্পতি,—জাতিভেদ তাহার শাখা-প্রশাখা। বনস্পতি না থাকিলে যেমন অরণ্য বুঝা যায় না—জাতীয়তা না থাকিলে তেমনি বিশ্বমানবতা কেবল theory মাত্র হইয়া থাকে। আবার জাতিভেদ (ঘৃণাবর্জ্জিত) না থাকিলে জাতীয়তার তেমন পরিপুষ্টি বা সর্ব্বাঙ্গীনতা ঘটে না। ফলমুল শাখাপ্রশাখাহীন বৃক্ষের কোন মূল্যই নাই!

আজ যেমন ভারতবর্ষ হইতে জাতিভেদ পিচ্ছীল করিবার আবশ্যক হইয়াছে, যুরোপ ও আমেরিকায় তেমনি জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর আসিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের এখন উন্নতির ভ্রূণ অবস্থা এবং য়ুরোপ ও আমেরিকা উন্নতির অবয়বী অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে অবয়বী অবস্থা (organised state), সেখানে জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই ভারতের উন্নতির যুগে এত সংহিতার উদ্ভব হইয়াছিল। য়ুরোপের সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখিয়া সমাজ বিজ্ঞানবিৎ Whetham বলিতেছেন—"The existence of defective class of people is directly due to that interference with natural selection which is the outcome of the *unregulated humanitarianism* of western society". নিয়মের ব্যভিচার ঘটিলে ভাল কার্য্যও পণ্ড হইয়া থাকে, প্রাকৃতিক নিয়ম অতি সদাশয় ব্যক্তিকেও অজ্ঞতাহেতু মার্জ্জনা করে না—প্রকৃতির বিচার সর্ব্বত্রই একভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় জগৎ পরিমাণকেই যথাসর্ব্বস্ব ভাবিয়া qualityকে অবহেলা করিয়াছে, তাই আজ চারিদিক হইতে তাহার কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। যে স্ত্রী স্বামীর গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, স্বামীর অর্থকেই ভালবাসিতে চাহে, সে স্ত্রীর যে অবস্থা হয়, আজ স্বার্থপর য়ুরোপেরও সেই অবস্থা। Patten তাঁহার The new basis of Civilization নামক গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—'The real wealth lay in the farmer's field, in the cows udder and not in the quantitative produce of the factory. The quantitative methods of industry ignore the motive of joy and rackon only with the motives of greed and hunger"

হে আমার উপবাসী ভারতবাসি, উপবাস তোমার ব্রত! তুমি যখন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে বাস করিতে, তখনও তুমি উপবাস করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে! আর আজও সেই উপবাস তোমার ধর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে, আজিও তোমার নিরন্ন মুখে সন্তোষের হাসি দেখিতে পাইতেছি, তাহা

কিসের বলে? কোন্ দৃঢ়তায় আজিও তুমি সমুন্নত ও সমুদার ভাব ধারণ করিয়া সুদিনের অপেক্ষা করিতেছ? তুমি আজ জগতের এত নিম্নে, তবুও তুমি মানবতার কত উচ্চ আসনে এখনও বিরাজমান, তাহা যখন ভাবি, তখন ভারতবাসী বলিয়া গৌরব এবং গর্ব্ব না করিয়া থাকিতে পারি না। তুমি দরিদ্র হইয়াও এখনও দাতা—তুমি ভিক্ষুক হইয়াও এখনও ভিক্ষাদানে অকাতর। তোমার বিশিষ্টতা দানে—তোমার বিশেষত্ব পালনে, পোষণে—অপরের মুখের আহার তুমি কাড়িয়া খাইতে জান না। তুমি ত্যাগ করিয়া ভোগ করিতে চাও। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ইহাই তোমার চির সনাতনী বাণী! হে উপবাসধর্ম্মী, সংযমী ও সন্ন্যাসীগণ! মনে রাখিও, তোমরা কর্ম্মভূমির সন্তান! মনে রাখিও, তোমরা কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, অপরে ভোগ করিতে আসিয়াছে! ভারত কর্ম্মভূমিস্ত, অন্যেতু ভোগভূময়—তোমাদিগের পিতৃপিতামহের এই কথাটী যেন আবহমানকাল তোমাদিগের কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত করে। তোমরা অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ! পৃথিবীর আর সকল জাতিই জ্ঞান গরিমায়, বীরত্বে মহিমায় এখনও তোমাদের অতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও তোমাদিগের দেশে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জন্মায়—এখনও তোমরা জগৎকে চমৎকৃত করিতে সক্ষম—তোমাদিগকে দেখিয়া এখনও জগৎকে অবাক হইতে হয়। তাহা কিসের বলে? পূর্ব্বপুরুষের তপস্যার প্রভাব এখনও তোমাদিগকে ত্যাগ করে নাই—এখনও তোমরা পরম্পরাগত প্রকৃত স্বাস্থ্য হারাও নাই—এখনও তোমাদিগের বিষ্ণু-পঞ্জর ভাঙ্গে নাই—এখনও তোমাদিগের বংশাবলীর ধারা বজায় আছে। অন্যান্য জাতির পরিমাণ দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইও না—অন্যান্য জাতির অসার সুখসম্ভোগ দেখিয়া ভাসিয়া যাইও না। গুণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিও—গুণের আদর করিও। কেবল মানুষ বাড়াইয়া লাভ কি—মানুষের গুণ বাড়াইতে হইবে—তবেই সমাজ-সমস্যার সমাধান হইবে। য়ুরোপের লোহালক্কড় ও কারখানার ফাঁকা উন্নতি দেখিয়া ভুলিও না—জান না কি, ওই কারখানার অন্তরালে কত ভ্রূণহত্যা হইতেছে, কত নারীর সতীত্ব যাইতেছে, কত শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, কত মানুষ মাতাল হইয়াছে, কত যুবক চোর-ডাকাত হইয়া পড়িতেছে, বিলাসী ধনগর্ব্বীর কত পৈশাচিক অভিনয় চলিয়াছে। "For efficiency we have neglected character, for the almighty dollar we are destroying man"—ইহাই আজ য়ুরোপ ও আমেরিকার চিন্তাশীলগণের মহা ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বিচক্ষণ Patten যে বলিয়াছেন, কৃষকের ক্ষেত্রে এবং গাভীর স্তনে প্রকৃত ধন নিহিত রহিয়াছে, কলকারখানার সামগ্রীর ভিতর নহে—ইহা বড় খাঁটি কথা, ভারতীয় সভ্যতার প্রথম ও প্রধান কথা! ভারতের কর্ম্মভুমিতে স্বয়ং ভগবান্ হলচালন ও গোপালন করিয়া থাকেন। হায়, ভারতবাসি, তুমি কি গোপাল এবং হলধররূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? সে গোধন, সে ধান্যলক্ষ্মীর আজ অতি হতশ্রী। আজ "গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়।" যে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও গাভী অলঙ্কাররূপে বিরাজ করিত, গাভীতেই যে ভারতীয়

সভ্যতার প্রতিষ্ঠা—ভারতীয় শিশুর জীবন ধারণ, সে ভারতবর্ষ এক্ষণে কসাইয়ের লীলা-ভূমি হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা তুলসীদাস প্রকৃত সুখের মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"ছোট ঘর, মোটে বস্ত্র পঞ্চধেনু হরদোয়।
সোজন সুখী হ্যায় দুহিতা যিস্‌কো নহি হোয়॥"

সে simple living এবং high thinking—সে পঞ্চধেনুর অবিরল দুগ্ধ দান আজ কোন ঘরেই ত নাই, আজ তাহার পরিবর্ত্তে সেই লক্ষ্মীছাড়া গৃহে Condensed milk এর টিন ও মদের বোতলই নয়নগোচর হয়। হায় কি অভাবনীয় অধঃপতন!! মাতৃস্বরূপিনী গাভী নাই বলিয়াই আজ ভারতীয় শিশুর এতাদৃশ অকালমৃত্যু—হিন্দুজাতি অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। হিন্দুজাতির কৃষি ও গাভীর প্রতি অবহেলা—কেবল স্বকর্ম্ম-ত্যাগই নহে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ। তজ্জন্য আজ ভারতবাসীমাত্রেই অল্প বিস্তর বর্ণশঙ্কর Degenerates হইয়া পড়িয়াছে। এই অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পুনরায় আমাদিগের জাতীয়স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। জাতীয়স্বরূপ হারাইয়া আমরা অপরূপ ও বিরূপ হইয়া পড়িয়াছি। আজ এই উত্থানের দিনে তাহার আমূল সংশোধনের আবশ্যক, তবেই আমরা উৎকর্ষলাভ করিতে সক্ষম হইব। প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি, আমাদিগের আলোচ্য বিষয়টীকে মহামতি Galton জাতীয় উত্থানের মধ্যে নবধর্ম্ম—নব প্রেরণা, নব আভিজাত্যরূপে প্রবেশ করাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সেইরূপ আজ আমাদিগকেও এই উৎকর্ষ-তত্ত্বটীকে মনে প্রাণে বিশেষ ভাবে ধরিতে হইবে। গুণের পূজা—গুণের আরাধনা যেন আমাদিগের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার ধর্ম্ম হয়। গুণাঃ পূজা-স্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।—এই মহাবাক্য যেন আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মের ধর্ম্ম হয়। জাতীয় জীবনে আজ গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, গুণীকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে—তিনি নারী হউন, অথবা শূদ্রই হউন। আমরা যেন এই কথাটী মনে রাখি যে, "To aim at economic change, without seeking to change the quality of the human elements is to waste good energy to no purpose."—Whetham."

আমরা অধিক চাহি না, অল্প চাই, কিন্তু ভাল চাই। খাদ্যের বিষয়ে যেমন এই নিয়ম—খাদকের বিষয়েও এই একই নিয়ম। এই নিয়মপালনে দুঃখ দারিদ্র্য ও ব্যাধি, ইহার পালনে সুখ, উন্নতি ও স্বাস্থ্য। সেই দেশই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, যে দেশের নর-নারীর চরিত্র উন্নত, যে দেশের শিশু হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও অকাল মৃত্যুহীন, যে দেশের গাভীই জননী এবং ধান্যই লক্ষ্মী এবং সর্ব্বোপরি যে দেশের বিলাস এবং অপব্যয় নাই—অশিক্ষিত হইলেও সে দেশ সুশিক্ষিত। স্বাস্থ্য লইয়া অজ্ঞানান্ধকারে থাকাও ভাল, রোগের আকর হইয়া শিক্ষার আলোকে কাজ নাই। অগ্রে উন্নত স্বাস্থ্য, পরে শিক্ষা—অগ্রে উন্নত চরিত্র বল, পরে শিক্ষা। 'Better to be a son of a robust rogue than to be a son of a consumptive bishop"—Dr. Starr Jordan. বিশেষজ্ঞগণ কেন এমন কথা বলেন? কারণ স্বাস্থ্যরক্ষাই যে জাতীয় জীবন রক্ষার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উপাদান। স্বাস্থ্যহীন ধার্ম্মিক ধর্ম্মধ্বজী নহে ত কি?

হে স্বাস্থ্যহীন শিক্ষক, স্বাস্থ্য ও চরিত্রবান সরল মূর্খের নিকট তোমার পাণ্ডিত্যের অভিমান—তোমার theoryর মূল্য কতটুকু। Eugenicsএর সফলতা স্বাস্থ্যরক্ষায়—চরিত্র রক্ষায়। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র রক্ষাই জীবনের প্রধান শিক্ষা ও দক্ষতা—ধর্ম্মের দ্বার এবং সোপানস্বরূপ! শস্যশ্যামলা ধরিত্রী ও নবোদিত সূর্য্যের মুখের দিকে তাকাইলে আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না—আমরা দেখি, কেবল ওই রক্তরাগে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র কণায় কণায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ওই ফুলে, ওই ফলে, ওই লতায়, ওই পাতায়, ওই স্বাস্থ্যের হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ওই অভিনব চরিত্রের অভিনয় চলিয়াছে। স্বাস্থ্য বাহিরে, চরিত্র ভিতরে, স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য রূপে, চরিত্র শস্যরূপে, রসরূপে রসময়ের লীলার অভিনয় করিতেছে। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির চিকিৎসা চলে, কিন্তু চরিত্রহীনের চিকিৎসায় বড় বড় বৈজ্ঞানিককে হার মানিতে হইতেছে। পৃথিবীর পাগলা গারদ, জেলখানা, মাতৃমন্দির প্রভৃতির খতিয়ান করিয়া দেখিলে তবে চরিত্রহীনগণের মর্ম্ম বুঝা যাইবে। পৃথিবী স্বাস্থ্যহীনগণের দ্বারা তত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই, যত ইহাদের দ্বারা হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ, য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় চরিত্রহীনতায় তত পাকা হইয়া এখনও পড়ে নাই, ইহাই রক্ষা—কিন্তু আর বড় অধিক বিলম্ব নাই! এখন হইতে সাবধান না হইলে মানবোৎকর্ষ-বিজ্ঞানকে নবধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া না লইলে আমাদিগের জাতীয় উন্নতির আশা মুকুলেই ঝরিয়া পড়িবে। ভবিষ্যতের ভারত-বর্ষ উন্নত নরনারীর ও তেজোময় সন্তান-গণের অপেক্ষা করিতেছে। ইহা যেন সতত আমরা মনে রাখি, মনুষ্যজাতির জন্মরহস্য গরু ঘোড়ার Breedingএর ব্যাপার নহে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার! যিনি পুত্ররূপে আসিতেছেন, তিনি সৃষ্টিধররূপে আসিতেছেন—বংশকে কেবল বৃদ্ধি করিতে নয়—শ্রেষ্ঠ করিতে আসিতেছেন, তিনি কেবল স্নেহের পাত্র নহেন, শ্রদ্ধার পাত্র! আধুনিক জনকজননী ও প্রতিবেশীবর্গ ইহা যেন ভুলিয়া না যান। সেই নিঃসহায় অতিথিকে কত যত্নে রক্ষা করিলে তবে সে মানুষের মত মানুষ হয়। বঙ্গের জনকজননী ও প্রতি-বেশীগণ, হে ভবিষ্যতের অভিভাবকগণ, আজ সত্যসত্যই কি আপনারা এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত? ভারতের উন্নত সন্তান ভারতের উন্নত ভবিষ্যৎ! ইহা যেন তোমাদের ধ্যান ধারণার বিষয় হয়।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

শান্তিশতক।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বহু যত্নে চিন্তামণি করিয়া অর্জ্জন
কাচমূল্যে মূঢ় নর ত্যজে যথা তায়,
ভবভোগলিপ্সা তথা করিয়া পোষণ
আমার মানবজন্ম ফলশূন্য হায়!১১।

বিধির বিধানে,—যাহা চাহিতে না হয়
যেন সমীরণ ভুঞ্জি' বাঁচে সর্পগণ,
ভোজন করিয়া সুখে তৃণাঙ্কুরচয়
ভূতলেতে পশুগণ করয়ে শয়ন।

* কবিবর শিহ্লন প্রণীত।

সংসার-সাগর নর তরে বুদ্ধিবলে,
ভিক্ষারূপ যেন বৃত্তি তবু তার হায়
যেই বৃত্তি আচরণ করিবার ফলে
নিভি' যায় হৃদয়ের গুণ সমুদায়।১২।
মিথ্যা চাটু বাক্য কভু না কর ভাষণ,
ধনি-মুখপানে নাহি চাও বারবার,
না শুন তাদের সেই গর্ব্বিত বচন
প্রত্যাশা করিয়া নাহি ধাও পুনর্ব্বার!
যথাকালে বালতৃণ করহ ভোজন,
নিদ্রাগমে হও মগ্ন আনন্দে নিদ্রায়,—
করিয়াছ কোথা, কোথা তপঃ আচরণ,
—হে কুরঙ্গ, একবার কহত আমায়।১৩।
ছিঁড়ি' যায় একে একে যাহে মর্ম্মচয়
এখন বেদনা নিজে করি' আস্বাদন,
কহিতেছি,—কষ্ট যেন কাহারও না হয়
যাচ্ঞারূপ পরিভব অসহ্য ভীষণ!
যাচ্ঞা গৌরব হরে দেখ ভ্রাতৃগণ,
বিকারের কেলিস্থলী এই যাচ্ঞা হয়,
যাচ্ঞা সম্মানে মসী করয়ে অর্পণ
নাশ করে যাচ্ঞা গুণ পর্ব্ব সমুদয়।১৪।
ইচ্ছামত বনভূমে চরে মৃগগণ,
ভক্ষণ করয়ে তৃণ অযত্ন-অর্জ্জিত,
ধনিগণে দৈন্য কভু না করে জ্ঞাপন,
হায় রে তাহারা পশু, আমরা পণ্ডিত!১৫
কোথায় যেতেছ ভাই? যথা ধনিগণ।*
কেন? যাচ্ঞা করি' যদি কিছু ধন পাই
সে ধনে রক্ষিত তবে হইবে জীবন।
যাচ্ঞা ফল অপমান কিন্তু জেনো ভাই।
অগ্রে যাচ্ঞা অপমান পরে দেয় ধন,
হায় রে সে ধন হয় মানীর নিধন॥ ১৬॥
যেইকালে যাচ্ঞা বাক্য করি উচ্চারণ
সে বাক্যের সনে দেখ প্রাণ নাহি যায়,
আপনি জানায় ইথে কাঠিন্য আপন
প্রাণের কাঠিন্য কিবা বর্ণিব কথায়!
আপনারে করি তাই নিজে তিরস্কার
হায়রে প্রাণের স্থৈর্য্য যেহেতু জানিয়া
ভিক্ষাতরে যাই আমি দ্বারেতে সবার
জীবন বিয়োগ ভয়ে কাতর হইয়া।১৭।
সরসিজ পত্রপার রহে যেই জল
তা'র প্রায় হয় প্রাণ সর্ব্বদা চঞ্চল।
বিবেক হারায়ে, হেন রাখিতে জীবন
কোন্ কর্ম্ম মোরা নাহি করি আচরণ!
সামান্য অর্থের গর্ব্বে অন্ধ ধনিগণ,
ভিক্ষাতরে তবু মোরা তেয়াগি' লজ্জায়,
নিজ গুণ কথা করি তা' সবে জ্ঞাপন,
জানি নাকি কিবা ঘোরপাতক তাহায়।১৮।
শরীর ঘৃণিত অতি, ঘৃণ্য অর্থ ধন,
ধীরে ধীরে মানবের আয়ুঃকাল যায়,
পান্থসনে পথে যথা পান্থের মিলন
সেইরূপ বন্ধুযোগ দুদিনে ফুরায়।
অসার সংসার এই, সুখ হেথা নাই,
এ সংসার পরিত্যজ্য—ইত্যাদি বচন
সকলের মুখে শুধু শুনিবারে পাই,
বল দেখি অনুভব করে কয়জন!১৯।
চঞ্চল সংসার সুখ, বিদ্যুতের প্রায়,
অজ্ঞান-আঁধার মনে আনে অনুক্ষণ,
পরিহরি' এ ভবের সুখ সমুদায়
পাপহীন শমসুখ ভুঞ্জিব এখন।—
—এ সব উদ্গীর্ণ বাক্য মোরা সর্ব্বক্ষণ
শূন্য মনে পাঠ করি, লজ্জা নাহি হয়,
হায়রে যেমতি ওই শুক পক্ষিগণ
অর্থ নাহি বুঝে তবু কত বাক্য কয়!২০।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

* এই শ্লোকটী প্রশ্নোত্তর ক্রমে রচিত।

গবর্ণমেণ্টের কো-অপারেটিভ বিভাগ সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা।

জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানী সকল তাহাদের নিজ অংশ খরিদ করতঃ তাহা পুনরায় বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে আইনতঃ অক্ষম। কিন্তু কো-অপারেটিভ্ ডিপার্টমেণ্টের সীমাবন্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী সকল যদিও মুখ্যত তাহাদের অংশ খরিদ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হন, তথাপি কোন মেম্বারের স্থান ত্যাগ ইত্যাদি কারণে তাহাকে বাই"ল"এর বিধানানুযায়ী অংশের দত্ত টাকা মাত্রই প্রদত্ত হইবার নিয়ম থাকায়, গৌণত অংশ ক্রয় করিবার ক্ষমতা সোসাইটী সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কারণে অংশ ক্রয় ও বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী সকলে করা হয় নাই, সেই কারণেই সম্ভবতঃ কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী সকলে প্রকারান্তরেও অংশ ক্রয় বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও রিজার্ভ ফণ্ডকে অংশীগণ মধ্যে অবিভাজ্য করা হইয়াছে।

জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানী সকলে রিজার্ভ অংশ রাখিবার ব্যবস্থা আছে এবং তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রিমিয়ামে বাজারে বিক্রয় করিবার ক্ষমতাও কোম্পানী সকলের আছে। কিন্তু কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী সকলে রিজার্ভ অংশ রাখিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রিমিয়ামে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাতে যে গতাসু মেম্বারের সমূহ ক্ষতি এবং আগত মেম্বারের যে অত্যধিক লাভ, তাহার প্রতি যেন লক্ষ্য না রাখিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ যে মেম্বার সোসাইটী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, হয়ত তিনি এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার অর্থানুকূল্যেই হয়ত ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া সেই সময়ে সমিতির সংরক্ষিত তহবিলে বেশ টাকা জমিয়া গিয়াছে। ইহা হয়ত উক্ত মেম্বারের বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে ও তাহার প্রদত্ত মূলধনের সাহায্যে হইয়াছে। চলিয়া যাইবার সময়ে যদিও তিনি তাহার প্রদত্ত মূলধনের টাকাটী মাত্র ফেরৎ পাইবেন, কিন্তু গত বহু বৎসরের পরিশ্রম ও ব্যাকুলতার ফলস্বরূপ সংরক্ষিত তহবিলের অংশ, যাহা তাহার প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণানুযায়ী তাহার ন্যায়ত পাওয়া উচিত, তিনি পাইলেন না। অথচ যিনি অতঃপর সমিতির নূতন কিম্বা উক্ত খরিদা অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তিনি কোন সুকৃতির বলে উক্ত সঞ্চিত তহবিলের উপকার প্রাপ্ত হইতে যাইতেছেন? ইহা কি তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য?

গতাসু মেম্বারকে উক্ত সংরক্ষিত তহবিলের উপকার হইতে যেরূপ বঞ্চিত করা হইতেছে, তৎবিপরীতে নূতন মেম্বারকে তাহার উপকার প্রাপ্ত হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া অন্যায়রূপে উপকৃত করা হইতেছে। ইহার প্রতিকার কল্পে গতাসু মেম্বারকে তাহার প্রদত্ত মূলধনের অনুপাতানুযায়ী সংরক্ষিত তহবিলের অংশ ও তাহার প্রদত্ত অংশের মূল্য তাহাকে দিয়া অংশের মূল্য ও তদনুপাতানুযায়ী সংরক্ষিত তহবিলের প্রদত্ত অংশ প্রিমিয়াম স্বরূপে নূতন মেম্বারের নিকট আদায় করিয়া লইবার

ব্যবস্থা করিলে কোন পক্ষেরই আক্ষেপ ও দুঃখের কারণ থাকিবে না। ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার প্রতিকূলে যে সকল কারণ বলেন, যদিও তাহা কতক পরিমাণে যুক্তি-সঙ্গত, তথাপি এই মেটিরিয়েলিজ্মের দিনে তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না. উহা পরার্থপরতার দিনেই সম্ভব। আমরা স্বার্থ-রক্ষার্থে মাত্রই শিক্ষিত, পরার্থ-পরতা আমা-দিগেতে কিরূপে সম্ভব? যাহাতে এই দুই ভাবের সমন্বয় হইতে পারে,তাহা কি সমবায় বিভাগের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না?

এই কো-অপারেটিভ্ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য বোধ হয় লোকের মধ্যে স্বাবলম্বন আনয়ন করতঃ অতঃপর পরস্পরের মধ্যে প্রীতিস্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ধন ও জনবল বৃদ্ধি করা। যদি ইহাই এই বিভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহাকে বহু মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া বহু আপদ বিপদের সহিত সংগ্রাম করতঃ লক্ষ্যপথে চলিলে তবেই এই গুরুতর উদ্দেশ্যসাধনে অদূর ভবিষ্যতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এই বিভাগের ক্ষমতা যথোচিত আছে। ক্ষমতা কার্য্যতৎপরতা আনয়ন করে। কার্য্য-তৎপরতা মনুষ্যের মধ্যে তাহার যাবতীয় সদ্গুণ সকলে কর্ম্মান্বিত করে। কিন্তু যখনই ক্ষমতা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ লোকের মধ্যে কার্য্যতৎপরতা আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মান্বিত না করে, সুতরাং ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস না পাইয়া পূর্ব্ববৎ শান্তিতে বিরাজ করিতে ইচ্ছা করে, তখনই জানিতে হইবে যে, ক্ষমতা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার অধীনস্থ লোক সকলের আর উন্নতির আশা নাই। জীবনসংগ্রাম কার্য্যতৎ-পরতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে, কাজেই লোক কর্ম্মান্বিত হয়। শান্তি তদ্বিপরীত ফল আনয়ন করতঃ লোককে অকর্ম্মণ্য করে।

এই বিভাগের ধুরন্ধরগণ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এক মাইল রেডিয়াসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সমবায়-সমিতি সকল গঠন করিয়া গিয়া-ছেন। তাহার ফলে উক্ত সকল সমিতিতে পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং তাহাদের কার্য্যপ্রণালী জটিল হইতে জটিলতর ও শ্রমসাধ্য হইবেই; ইহা স্বাভাবিক। এই জটিলতা ও শ্রমসাধ্যতাই কার্য্যতৎপরতাকে আনয়ন করিবে এবং লোককে কর্ম্মান্বিত করিবে। তদ্বিপরীত অবস্থা ঘটিলে অর্থাৎ সমিতিগুলিতে পঞ্চাশ রকম সংখ্যক সভ্য থাকিলে তাহার কার্য্য সরল ও সহজসাধ্য হইবে, সুতরাং লোকের কার্য্যতৎপরতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-শিথিলতা আসিবে। ব্যক্তির কার্য্যকুশলতা-হীনের সঙ্গে সমিতির তৎপর সেণ্ট্রাল সমিতি-গুলির তদূর্দ্ধে বিভাগীয় কর্ম্মশিথিলতা আসিবার সম্ভাবনা হইবে। যে বিভাগের উদ্দেশ্য এত মহৎ, তাহার পক্ষে ব্যক্তির কর্ম্ম-কুশলতা বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখাই কি কর্ত্তব্য নহে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক-বৎসর যাবৎ এই বিভাগের কার্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাঁহারা ইতিমধ্যেই শ্রান্তক্লান্ত হইয়া সরল ও সহজসাধ্য করিয়া এই বিভাগের কার্য্য চালাইতে চাহিতেছেন। নতুবা কেন তাঁহারা পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ সভ্য-সমন্বিত সমিতিগুলির কার্য্যের জটিলতা ও গুরুত্ব নাশ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছেন? কর্ম্মই ধর্ম্ম। কথায় বলে, দশের লাঠি

একের বোঝা। আবার একতাতেই উন্নতি, বিচ্ছিন্নতাতে পতন। একতাতে বল সঞ্চয়, বিভিন্নতায় বলহীন। পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ সংখ্যক সভ্য সমন্বিত সমিতিগুলি সুনিয়মে কার্য্য চালাইবার ব্যয়ভার বহন করিতে ও পার্শ্ব-বর্ত্তী লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ও সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম। পঞ্চাশের কম সভ্য-সমন্বিত সমিতিগুলি তাহা করিতে স্বভাবতই অক্ষম। অক্ষম ব্যক্তি বা সমিতি হইতে কি মহৎ কার্য্যের উদ্ধারসাধন সম্ভবপর?

এই বিভাগ সমবায়নীতি বঙ্গদেশ মধ্যে প্রচার করিতেছেন। সমবায়নীতি ভিন্ন ধর্ম্মাব-লম্বী, ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন-উদ্দেশ্য-সমন্বিত লোক দ্বারায় উত্তমরূপে প্রচারিত ও অবলম্বিত হওয়া সম্ভবপর হয় না। ব্যষ্টি লইয়া পরিবার, পরিবার লইয়া গ্রাম, গ্রাম লইয়া জনপদ। জনপদপতিরই অপর এক অংশ এই কো-অপারেটিভ বিভাগ। ব্যষ্টি, পরি-বার, গ্রাম এবং জনপদের যে ধর্ম্ম (ধর্ম্ম অর্থে এই স্থলে বিভাগীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে।) ভাষা এবং উদ্দেশ্য, বিভাগেরও সেই ধর্ম্ম, ভাষা এবং উদ্দেশ্য হইবে। সুতরাং একই উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যসাধন পক্ষে একই ভাষা আবশ্যক। অতএব এই বিভাগীয়ের যাবতীয় কার্য্য যাহাতে বঙ্গভাষায় পরিচালিত হয়, এমন কি,আগামী কন্‌ফারেন্সের বৈঠকে পর্য্যন্ত যাহাতে বৈদেশিক ভাষায় কার্য্য পরি-চালিত হয়, তৎবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই সংশ্রবে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা—এই বিভাগের মুখপত্র মাসিক পত্রিকাখানি বাঙ্গালা ভাষায় পরি-চালিত হইলে, এতৎ সংশ্রবের গ্রামিক, এমন কি, নাগরিকগণও উহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এবং ইচ্ছা করিলে বিভাগীয় কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বীয় মত অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতেও সক্ষম হইবেন, তাহাতে কার্য্যপ্রণালী সুন্দরভাবে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা হইবে। ইংরাজী ভাষা গ্রামের কয়জন লোক জানেন? ইংরাজি পত্রিকা পড়িয়া নাগরিকগণের কয়জন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ ও উক্ত ভাষায় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে সক্ষম? যাঁহারা পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতীব অল্প।

শ্রীজগদিন্দ্রদেব রায়।

সঙ্গণিকা।

(৬২)

১৩২৪ সাল শেষ হইল—আপদবালাই চুকিল। এই বৎসর বঙ্গে শুধু যেন অন্তরীনদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিবার জন্যই আসিয়া-ছিল। সদলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বেঙ্গল-সিবিল রাইটস্ কমিটী গঠন করিয়া যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে এবং শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ-সমর্থনে, মনে হয়, কিছু ফল ফলিতে পারে। কত পরিবারে যে হাহাকার উঠিয়াছে, উক্ত কমিটী তাহার অলিখিত ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন। সে ইতিহাস সংগৃহীত হইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, ব্যাপার কত শোচ-নীয়। তাঁহাদের ব্রত অতি পবিত্র, তাঁহাদের চেষ্টায় সুফল ফলুক।

(৬৩)

বৎসরটা যাইতেছে, তবুও রুষ-জর্ম্মাণ-রুমেনিয়ার সন্ধির কথা ফেলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলিতেছে। বুঝা যাইতেছে না, পরিণাম কোথায় এবং কি? দুই পক্ষই জয়ের আশা করিতেছেন, কিন্তু কাহার জন্য ভবিষ্যৎ প্রসন্ন হইবে, কেহই বলিতে পারেন না। ঘোরান্ধকারে তাহা নিমগ্ন।

(৬৪)

হোমরুলের পাণ্ডাগণ বিলাতে যাত্রা করিতেছেন। দেশের জন্য কাজ করিতে যাঁহারা আনন্দিত, বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। চুঁচুড়ায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হইল, কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এবার এই সময়ে হইল না! ঢাকার সাহিত্যপরিষদ্ কি করিতেছেন?

(৬৫)

ষড়যন্ত্রের কথাটা আমাদের নিকট কাল্পনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এমন লোক কে আছেন, যিনি ভবিষ্যৎ বুঝেন না? কল্পনা জল্পনা, ভ্রম প্রমাদ চতুর্দ্দিকে নয় কি?

(৬৬)

আগের কাজ আগে, পরের কাজ পরে। সাহিত্যই দেশোন্নতির মূল সোপান। কিন্তু এবার সাহিত্য সম্মিলন হইল না।* সাহিত্যের হাট ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেছি। সংবাদ পত্রসকল যাইতেছে, অসংখ্য পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইতেছে! প্রেস-আইনের কঠোরতায় কত প্রেস গিয়াছে, আরও কত যাইবে, কে জানে? কল্পনা-বলে সকলকে পায়ের নীচে রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। পরপ্রত্যাশার চরম পরিণতির দিন উপস্থিত হইয়াছে। এহেন দুর্দ্দিনে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, আর, দাস মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাকে "ফেরঙ্গ" বাঙ্গালা বলিয়া উপহাস করিতেছেন! হায় দুর্দ্দিন!! সকলে প্রেস ও সাহিত্যকে রক্ষা করিতে অগ্রে সচেষ্ট হউন, নচেৎ দেশের আশা নাই।

* শুনিতেছি, ৩০শে চৈত্র (১৩২৪ সাল) হইবে।

(৬৭)

শুনিতেছি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয় এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার হইয়াছেন। অনুরোধ ও উপরোধ এবং খোসামুদী ও পাপাচারের রাজত্ব শেষ হইলেই দেশের রক্ষা। স্বায়ত্তশাসন কি খোসামুদী এবং ঘুষের রাজত্বের জন্য? প্রত্যক্ষদর্শীগণ একথার উত্তর দিন।

(৬৮)

এবার দুইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন হইয়াছিল। সুতরাং বক্তৃতার অবসর খুব হইয়াছিল। মামুলি কথা ভিন্ন বক্তৃতা সকলে কোন নূতন কথার প্রবর্ত্তনা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উৎকর্ষসাধন তত হউক বা না হউক,—মনুষ্যত্বলাভের সাহায্য হউক বা না হউক, পরপ্রত্যাশীর দল খুব পুষ্ট হইতেছে। সমীকরণ বা উন্নয়নের পরিবর্ত্তে উপনয়নের বা ভেদ-সৃজনের আয়োজন খুব হইতেছে। ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে!!

(৬৯)

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু চলিতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালা-লেখকের তেমন উত্থান কোথায় হইতেছে? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃতবিদ্য মাত্রেই প্রেসের সহিত কোন না কোনরূপে যুক্ত হইতে অভিলাষী হন। কিন্তু এদেশে সে দৃষ্টান্ত বিরল। কাব্যবিশারদের "গোলামখানা" কি না, এখানকার বিধি ব্যবস্থা অন্য প্রকার।

(৭০)

বাল্যবিবাহ দূষণীয়, পাপকর্ম্ম বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যগণ কাজে তাহার অন্যথা দেখাইতে পারিতেছেন না। পণপ্রথা নিবারিত হইতেছে না, ছাত্রাবস্থায় বিবাহিত হওয়ার প্রলোভনও নিবারিত হইতেছে না। কোথায় বা সংযমশিক্ষা, কোথায় বা ব্রহ্মচর্য্য? পরন্তু অপ্রাপ্ত বয়সে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকাদিগের সহিত বিবাহিত হওয়ার জন্যই অনেকে প্রলুব্ধ। ফল এই হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন ছাত্রেরা বাহির হইতেছেন, তখন পিতার গুরুভার তাহাদের মস্তকে চাপিতেছে। জীবনসংগ্রামের কঠোরতায় তাঁহারা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইতেছেন। ইহার ফলে একদিকে এনার্কিজম্, অন্যদিকে গোলামগিরি বাড়িতেছে। হয় এদিক, নয় ওদিক; হয় স্বাধীন, নয় পরমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্যই অনেকে লালায়িত হইতেছেন। এনার্কিজম না থামিলেও দেশের উন্নতি নাই, খোসামুদী না কমিলেও মনুষ্যত্বের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। ঘুষের মাত্রা দিন দিন যে বাড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় যেন তাহার কারণ রূপে বিদ্যমান। এ কিরূপ ধর্ম্ম ও নীতিহীন শিক্ষা দেশে সংক্রামিত হইল?

(৭১)

অগ্রে শুনিতাম, শিক্ষিত লোক পুলিসে বা আফিসে ঢুকিলে ঘুষের মাত্রা কমিবে? কিন্তু কই তাহা হইল? কত শত সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঘুষের হাটে আত্মচরিত্র বিক্রয় করিতেছেন, দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নূতন নূতন প্রণালীতে আরও "দেব্রাদারদের" কার্য্য চলিতেছে। স্বাধীনতার সেবক উকীল মোক্তারগণ ঘুষ দিতেছেন, কেরাণী হাকিমগণ ঘুষ নিতেছেন। শিক্ষার হাট বেশ জমিতেছে!!

(৭২)

শুধু হিন্দুসমাজে নয়, এদেশের আদর্শ ব্রাহ্মসমাজেও অপ্রাপ্ত-বয়স্কাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন হইতেছে, অধ্যয়নের সময়েই কোর্ট-সিপ চলিতেছে। ঘটকের কাজ পরিবারে পরিবারে চলিতেছে এবং সকলে নির্ব্বাক হইয়া তাহা দেখিতেছেন এবং গলাধঃকরণ করিতেছেন, কোন উচ্চবাচ্য নাই। বিপত্নীকদের বিবাহ? তাহা যেমন হিন্দুসমাজে, তেমনি ব্রাহ্মসমাজেও চলিতেছে। পূর্ব্বের সংস্কারকদল এখন স্বর্গে, এখন গোজামিলের রাজত্ব, যেন-তেন-প্রকারেণ-ভাবে কার্য্য করিবার জন্য সকলেই লালায়িত। এসকল কথা লিখিলে সকলে চটিয়া লাল হন, নিমন্ত্রণ বন্ধ করেন। পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত-বয়স্কাদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইলে দোষের বলিয়া প্রতিপন্ন হইত এবং এইজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-পরগাছার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সে সব ইতিহাসের কথা বিস্মৃতিতে নিমগ্ন, এখন বালিকাদের দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসর হইতেই কোর্টসিপ আরম্ভ হইতেছে এবং নেতাগণ ও আচার্য্যগণ তাহাই অনুমোদন করিতেছেন!! পাত্র ধরিবার জন্য পিতামাতারা কত কত রূপ ফাঁদ পাতিতেছেন! রক্ত মাংসের শরীরধারীদিগকে ভুলাইতে আর কি লাগে? ফুৎকারে অসাধ্য সাধিত হইতেছে—চতুর্দ্দিক নীরব—এইরূপ ধারা ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এক সময়ে মনে করিতাম, একটা আদর্শ ধরিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজ চলিতে পারে, কালে সেই আদর্শে দেশ অনুপ্রাণিত হইবে। এখন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ দিন দিনই খর্ব্ব হইতেও খর্ব্বতর হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণের আধিপত্য যত বাড়িতেছে, সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে দুর্নীতি, দুরাচার, অসংযত ব্যবহার ততই সমাজে বদ্ধমূল হইতেছে, এমন টু করিবারও কাহার সাধ্য নাই। পরন্তু এ সকল কথা ব্যক্ত করিলে সকলে বিরোধী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়-জয়কারধ্বনিতে সংস্কারমণ্ডলীকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। আদর্শ-সূর্য্যকে মহা দুর্নীতি-রাহু গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে!!

(৭২)

যজন যাজন এদেশের চিরন্তন প্রথা—

ইহাতে দেশের উন্নতিও হইয়াছে, অবনতিও হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণেরা এদেশের ধর্ম্মরক্ষা করিতেন, কালে সেই ব্রাহ্মণগণই যাজ্যগণের ধর্ম্মচ্যুতির কারণ হইতেছেন। ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত থাকায় পূজা অর্চ্চনা ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্যের হাতে গিয়াছে, গৃহস্থেরা ধর্ম্মে উদাসীনতা শিক্ষা করিয়াছেন। অপিচ যাজ্যগণের দুষ্কৃতি ও দুর্নীতি অর্থের লালসায় ব্রাহ্মণগণ হজম করিতে করিতে দেশে অনাচার এবং কদাচার বদ্ধমূল হইয়াছে এবং ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, মদ্যপান ও নানা অনাচার বিকাইতেছে। অনেকে একটী একটী পরকীয়া রাখিতেছেন এবং সর্ব্বত্রই বাহ্যানুষ্ঠানের জয়পতাকার তলে দুর্নীতি নৃত্য করিতেছেন!! যাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বার্থের মায়ায় সকল অনাচার ও কদাচার দেখিয়াও দেখেন না, বরং প্রশ্রয়ই দিয়া থাকেন। এইরূপে, ধর্ম্মকর্ম্ম এখন পাপকর্ম্মে পরিণত হইতেছে, কেহ কিছু বলিতেছেন না। বলিলেই বা শুনে কে? দেশ যে মরণের কোলে! আশা ছিল, ব্রাহ্মসমাজ এহেন অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবেন। এজন্য ব্রাহ্মসমাজকে একটু বিপথে যাইতে দেখিলেই আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতাম। ব্রাহ্মসমাজের এবং দেশের মঙ্গল সাধন ভিন্ন আমাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু দেশ তাহা বুঝিল না, অন্য রূপে আমাদিগের অনিষ্টসাধনে চেষ্টা করিলেন। তাহা-করেন করুন, ক্ষতি নাই। জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর কোন্ পিতা, বা কোন্ মাতা বা কোন্ বন্ধুকে ভয় করিব? ব্রাহ্মসমাজ নূতন পুরোহিতের সৃষ্টি করিয়া স্বার্থের হাট বসাইয়াছেন, যজন যাজন ক্রিয়া চলায়, এখন আর যাজ্য গৃহীরা নিজেরা উপাসনা করিতে পারেন না, অন্যের মুখের দিকে সর্ব্বক্ষণ তাকাইয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সব আচার্য্যের হাতে। আচার্য্যগণ দেখিলেন, স্বার্থসাধনের এ ত বেশ উপায়, যাজ্যগণকে বশ করিয়া বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে যাজ্যগণের ধর্ম্মকর্ম্মে উদাসীন হইয়া কেবল স্বার্থসাধনে সচেষ্ট রহিলেন, উপাসনা ব্যবসাদারীতে পরিণত হইল। ক্রমে ক্রমে উপাসনার প্রতি উদাসীনতা বাড়িতে লাগিল, চাউল কলার কথা তাঁহারা ভাবিতেছেন না বটে, এবং শ্রাদ্ধের গামছা লইয়া আজও কাড়াকাড়ি করিতেছেন না বটে, কিন্তু টাকা রোজগারের কৌশলে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। টাকা পাইলে যাজ্যের সব দোষ মার্জ্জনীয়, তাঁহারা যাহা করুন না কেন, সবই চালাইয়া লইতেছেন। এইরূপে নব-পুরোহিতেরা যাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, কাহার শিষ্য কত ঘর, এখন তাহার হিসাব লইয়া অনেকে ব্যস্ত। বাল্যবিবাহ প্রকারান্তরে পোষিত হইতেছে, পাঠ্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালিত হইতেছে না, বৃদ্ধ বিপত্নীকগণও বিবাহের জন্য মাতিতেছেন, সে দিকে দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি নাই, ব্যভিচার ও মদ্যপানের দিকেও। এই রূপে ব্রাহ্মসমাজকে এবং তৎসহ দেশকে রসাতলে নিমগ্ন করিবার জন্য পুরোহিতগণ তৎপর। তাহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বিরক্ত হন। কথা বলা বন্ধ করেন— কতরূপে কত অনিষ্ট করেন? ইহা কি কম দুঃখের বিষয়, যে ঢাকা নগরে উৎসবে সহস্র লোকের সমাগম হয়, সেখানে নাকি পুরোহিত না গেলে উপাসনা চলে না! এত উপাসক কি কেবল ঘাস কাটিবার জন্য আবশ্যক? সামান্য সামান্য কাজেও আচার্য্য না হইলে কাজ চলে না, ইহা কি? পৌরোহিত্যের এই স্রোত বন্ধ করিবার লোক কি ব্রাহ্মসমাজে নাই? সব কি গড্ডালিকা-প্রবাহের দল? কে এ কথার উত্তর দিবে?

পুরোহিত বা আচার্য্যগণ কি করিতেছেন? কেহ ব্যভিচার করিয়া কোন মহিলার সহ মিলিত হইয়াছিলেন, ৮।১০ বৎসর পর সে বিবাহ রেজেষ্টারি করিতেছেন এবং তাহাতেও আচার্য্য পাইতেছেন। কেহ বিবাহানুষ্ঠানে মদের স্রোতে ভাসিতেছেন, তাহাতেও আচার্য্য পাইতেছেন। কত লোক কতরূপে কুকার্য্য করিতেছেন, আচার্য্যের অভাব

হইতেছে না। এইরূপে, যজন যাজনের ভিতর দিয়া, দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। কেহ কিছু প্রতিকার করিতেছেন না। বরং যে প্রতিবাদ করে, তাহাকে অপদস্থ করেন। সব যেন মৃতবৎ। ব্রাহ্মসমাজ কি দুর্নীতি-সমরে মৃত্যুমুখে পড়িবে?

(৭৩)

সমাজ-মন্দিরে গার্হস্থ্যানুষ্ঠান-প্রথা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শুধু কান্তিচন্দ্রের আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়াছে; আর কোন গার্হস্থ্যানুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির খ্রীষ্টীয় চর্চ্চের অনুকরণে সকল গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাতে কি সনাতন মত সকল সুরক্ষিত হইতেছে? ৺প্রমদাচরণ সেন কন্যার অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্টসিপ করিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, এখন আর সেরূপ নিন্দা কেহ করে না। কেশবচন্দ্রের বড় পুত্রের বিবাহে পাত্রীর বয়স বেশী ছিল, তখন খুব আন্দোলন উঠিয়াছিল, এখন আর সেরূপ আন্দোলন হয় না। কন্যাপণ নিন্দিত, কিন্তু স্বেচ্ছাদান নিন্দার্হ নয়,— তাহারও নিন্দা হইতেছে, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী, কন্যা যেন স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কেহ কিছু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিলেই সকল পুরুষের কাণ খাড়া হয়। কন্যাপণের পথ ধরিয়াও কত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে। বরের হাটে কতই টানাটানি চলিতেছে! আর কন্যাদিগকে সাজাইয়া কতরূপে পাত্রকে হাত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার বয়স অল্পই হউক বা বেশীই হউক, সেদিকে দৃষ্টি নাই। কন্যা-দায় বিষম দায়, ইহার জন্য কত কত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে। ব্রহ্মমন্দির এখন তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন। অপিচ বিপত্নীক বিবাহও ব্রহ্মমন্দিরে হইতেছেন। কেহ কোন উচ্চবাচ্য করেন না। ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে একবার উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আন্দোলন উঠিয়াছিল, কিন্তু বিপত্নীকের বিবাহে আন্দোলন উঠে নাই। এবার রবীন্দ্রনাথকে সভ্য করিবার সময় আন্দোলন উঠিয়াছিল, কিন্তু কত শত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মসমাজ সভ্যরূপে স্থান দিয়াছেন! ব্রহ্মমন্দির, তুমি কি দুর্নীতি রক্ষার নব কাশী-বৃন্দাবন হইবে? তোমাকে পারিবারিক দুষ্কৃতি এবং সুকৃতির সহিত যুক্ত করা সঙ্গত কি? শুধু ধর্ম্মই তোমার লক্ষ্য হউক।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪১। কৃষ্ণাবতার-রহস্য। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কৃত, মূল্য ॥০।

গ্রন্থকার বলেন—"এতদ্ভিন্ন সমাজের অজ্ঞ ও গতানুগতিক প্রকৃতির লোকদিগের মধ্যে পূর্ব্বপ্রচলিত এবং বংশানুক্রমিক আচরিত বৈদিক ও স্মার্ত্তিক ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধুনা কৃষ্ণের নামে যে সকল সহজসাধ্য উপধর্ম্ম ও সাধনপ্রণালী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যাজনা করিতে গিয়া সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, অনিষ্ট ও পাপের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়, তাহার প্রতিরোধ কি বাঞ্ছনীয় নয়? বাস্তবিক সমাজের এতাদৃশী শোচনীয় অবস্থায় কৃষ্ণের অবতার-রহস্য সমালোচিত হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল এবং সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। লেখক উল্লিখিত প্রয়োজন বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে যথাসাধ্য শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন না।" গ্রন্থকার ঋষিপ্রতিম প্রবীণ ব্যক্তি,—তিনি নিরপেক্ষ, ন্যায়বান এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি। তাঁহার গবেষণা অসাধারণ। তিনি ধীর এবং স্থিরভাবে তত্ত্ব সকলের মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। সকলে তাঁহার সহিত একমত নাও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তি যে উপেক্ষার বিষয় নয়, যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন,

তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি একজন সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার গভীর গবেষণা ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইলাম।

৪২। পাগলা ঝোরা। বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসর শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত, মূল্য ১।০।

ইহাতে এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১। তামাকুতত্ত্ব, ২। মশকসঙ্কট, ৩। শ্যামের বাঁশী, ৪। ধর্ম্মে মতি, ৫। বিবাহে বিবিধ বাধা, ৬। বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ, ৭। বঙ্কিম-চচ্চরী, ৮। বিবিধ বর্ণবোধ, ৯। ভর্ত্তার উত্তর, ১০। ভারতবর্ষের বর্ষারম্ভ, ১১। সমালোচক-রহস্য, ১২। চুটকী, ১৩। নদীয়ার কুরুক্ষেত্র, ১৪। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ১৫। দর্পহারী মধুসূদন, ১৬। দাদা মহাশয়, ১৭। গাছছোলা, ১৮। কাশীবাস।

এ সকল প্রবন্ধই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "শ্যামের বাঁশী" ও "সমালোচক-রহস্য" নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ললিতকুমার হাস্যরসোদ্দীপকে অদ্বিতীয় কবি, শ্রীযুক্ত ডি-এল রায়ের পরে তাঁহার ন্যায় এতৎসম্বন্ধীয় লেখক আর দেখা যায় না। তিনি ভাষাবিৎ, তিনি চিন্তাশীল, তিনি প্রতিভাশালী, তিনি বিজ্ঞ। সরসতা চিন্তায়, চিন্তায় প্রতিভা, প্রতিভায় বিজ্ঞতা—সব মিলিয়া মিশিয়া এ দেশে যে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহা সকলের উপভোগ্য। এরূপ লেখকের লেখা পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা বিশেষ আনন্দসহকারে ললিতকুমারের লেখা পাঠ করিয়া সুখী হইয়া থাকি। ললিতকুমারের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক, ঘরে ঘরে তাঁহার লেখার আদর হউক।

৪২। কর্ম্মফল। সামাজিক উপন্যাস, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। বিপত্নীক পুনঃ বিবাহ করিলে সন্দেহের আগুনে কিরূপে দগ্ধ হয় এবং পারিবারিক অমঙ্গল সৃজন করে, শিবনাথের কাহিনীতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। উদ্দেশ্য ভাল, রুচি ভাল, লেখাও ভাল।

৪৩। জীবন-সংগ্রাম। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ-বিরচিত, মূল্য ১।০। ইহাও একখানি উপন্যাস। নরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গের একটী আদর্শ চিত্র পাঠকসমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, সৎপথে থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিলে কিরূপে উন্নতি লাভ করা যায়, নরেন্দ্রনাথের জীবনে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা উচ্চাঙ্গের উপন্যাস না হইলেও, মোটের উপর বেশ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অনেক উপদেশ এ পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। রুচি মার্জ্জিত এবং লেখা প্রাঞ্জল।

৪৪। প্রদীপ ও চেরাগ। মোহাম্মদ-হেদায়েতুল্লা প্রণীত, মূল্য ১৲। প্রদীপ ও চেরাগ, মসজিদ ও মন্দির, দোস্ত ও দুষমন—এই তিনটী ক্ষুদ্র গল্প এই পুস্তকে আছে। যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহা ভাল। মুসলমান-বন্ধুরা আজকাল কিরূপ পরিপাটী বাঙ্গালা লিখিতেছেন, এই পুস্তক তাহার উদাহরণ। বাঙ্গালার দুটী সন্তান হিন্দু ও মুসলমান। দুই সন্তান একমন হইয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। গ্রন্থকারের গল্প রচনার শক্তি আছে, ভাষাও বেশ।

৪৫। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গ দাসানুদাস শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত, মূল্য ৵০। সংক্ষিপ্ত পুস্তক, মোট ৪৩ পৃষ্ঠা—ইহারই মধ্যে শ্রীচৈতন্যের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দিগিন্দ্র বাবু ক্ষমতাশালী লেখক—তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় প্রভূত পরিমাণে পাইয়া সুখী হইলাম।

৪৬। মা। প্রসাদীপদচ্ছায়া, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মূল্য ॥০। গানগুলি পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল পড়ে। বিশ্বাস ভক্তির বিবৃতি। পড়িয়া সুখী এবং উপকৃত হইলাম।

৪৭। পূজা। শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ।০। যে উদারতা ধর্ম্মপিপাসুর একমাত্র সম্বল, ইহাতে তাহার পরিচয় পাইলাম। লেখা ভাল, গান ভাল।